নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]   [বৈশাখ, ১৩২৭ সাল।

নববর্ষে।

"নব রে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব।"

তার সবটুকু যে নূতন। বর্ষের প্রথম দিন নূতন, ঋতুর প্রথম পদক্ষেপ যাহা আমাদের চেতনার স্পর্শে জাগিয়া উঠে, সেও তো তেমনি নূতন; মাসের প্রথম দিনটা, তাও আশার ঝুলি পাবিয়া ভনুধ্বনি বাহিয়া আসিতে ছাড়ে না; আর দিনের প্রথম ঊষা, তাও কেমন নূতন সুখের সাজে বাড়া। কেমন তরুণ লালিমা ও নব অনুরাগ লইয়া আসিয়া বলে, "দেখ দেখ, একবারটি আঁখি বিকশিত করিয়া দেখ, সেই আমি কেমন হইয়াছি।" বর্ষ, ঋতু, মাস, দিন, দণ্ড ক্ষণ যেমন করিয়াই বড় ছোট করিয়া ভাঙিয়া লও, এ নূতনকে পুরাতন কে করিতে পারিবে না। তাই বলি—

"নব রে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব।"

গঙ্গা বহিয়া যায়,—তরঙ্গে দুলিয়া, জোয়ারে ভরিয়া, ভাটায় সরিয়া, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ—চিরদিনই তো বহিয়া যায়। যে গঙ্গার তটে সাম-গায়ক তোমরা নবা গ্রাম গড়িয়াছিলে, সে তো এই গঙ্গা? যে গঙ্গা পবিত্র কোটি তীর্থের পুণ্যধূলি বুকে মাখিয়া, "যুগ যুগ ধরি" হিন্দু বৌদ্ধ যবন ইংরাজ কত চন্দ্র জ্যোতিষ্ক উল্কার জ্যোতিতে পতিতপাবনী নাম সার্থক করিয়া আছে, সে কি এই একই গঙ্গা। নয়? অথচ কোন্ দুইটি শুভক্ষণে যে এক দেখি? এই যে এতক্ষণ মৃদু মৃদু ভাব-হিল্লোল বিলাস দেখিলে, এই যে ঢেউ

জলে সোণালী ঝিকিমিকি চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, যে সঙ্গমপাগল জলতরঙ্গ কল কল ছুটে যাবে, এই যে এখনি সম্মুখে চলিয়া পড়িল, সে যে এই ছিল—এই ..., আবার নূতন ঢেউ-ভাঙ্গা জল নূতন আলোর খেলা নূতন উচ্ছল গতি আসিয়াছে। সেই বহু পুরাতন বাঙ্গলার শ্যামল বুকের হীরার মালা গঙ্গা বটে, তবু ক্ষণে ক্ষণে এর কত নব নব বিবর্ত্তন। বাঙ্গলার জীবন-গঙ্গাও যে এমনি, পুরাতন বলিয়া দেখিলে বড় পুরাতন, আর নূতন ভাবিতে গেলে 'নিতুই নব রে নিতুই নব।'

পুরাতন গিয়া নূতন আসিল, তবে তাই হল। সেই মা, সেই দেউল, সেই পূজা, শুধু তাই রাঙ্গা পা দু'খানি কাল ভরিয়াছিলে রক্ত জবায়, আজ বুকে ধরিয়া নয়ন জলে ধুইয়া পূজিব শ্বেত শুভ্র শতদলে। কাল যে বরাভয়করা মা হইয়া আসিয়া স্নেহকোল পাতিয়া ডাকিয়া ছিল, যাহার অমন করিয়া মা হওয়ায় তোমরা দলে দলে মায়ের ছেলে হইয়া বাহির হইতে পারিয়াছিলে, আজ সে যে কি হইয়া আসিয়াছে তাহাতো মুখে বলিবার নয়। সে অনশ্বরস্বরূপা প্রেমনটময়ী লীলাতুরা জগচ্ছক্তি এই আমার গঙ্গাভাগীরথীপূতা মাটির মা অন্তরে যে কি হইয়াছে, কি রূপ ধরিয়াছে, কি অ ... পাগল করিয়াছে তাহা আমি বলিব না গো বলিব না। শুধু সেই লীলারাধার বাঁশরী লইয়া মরিব, শুধু তারে আমার মরম দেউলে তোমাদের হৃদয় দীপে দীপে আরতি সাজাইয়া মন মানস পূজিব।

এই কাননকুন্তলা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুজলা সুফলা কমলাকান্তের 'সে ভাব ভাবিয়া সহজে পাগল' হইবার ধন সে কি পুরাতন নয়? কিন্তু যাহাকে পাইয়া সাধ মেটে না, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিলেও মধুস্পর্শ ফুরায় না, সে কেমন করিয়া পুরাতন হইবে? তাই নব যুগে আজ নূতন করিয়া সেই চির পুরাতন রূপ দেখ। ভাষা ফুরাইবে না, প্রাণ মাটির প্রেমে পাগল হইয়া বলিবে—

> যে জগত রাধা সে তো মোরি মাঝে।
> নারী আর মোর আসিবে কি কাজে?
> ভোগেতে সাকারা
> মোক্ষে নিরাকারা
> মোরে ত্রিপুর সুন্দরী দিয়েছে অভয়।

জগতে বহু প্রিয় সম্বন্ধ আছে একে একে সব বলিয়া ডাকিলেও ... বলা যায় না, যাহার মৃন্ময়ী রূপ উত্তরের শুভ্র তুঙ্গ হিমমণ্ডিত শিরছবি ...

এই নদীহারমেখলা আসিন্ধুবেলা শ্যাম তনুখানি ভরিয়া যাঁর মন আঁখি জুড়াইতেছে, তাহাকেই তো চিন্ময়ী সত্তায় ভাবিয়া বঙ্গের খুঁটি অর্থ পদাবলী ভাগবত স্রষ্টা। এমন চির পুরাতন নিত্য নূতন মায় বুক না পাইলে কি প্রেমে মত্ত গোরা জ্ঞান ভক্তিতে পাগল কমলাকান্ত রাম প্রসাদ জন্মায় গো ?

পুরাতন অনেক আছে, নূতনও কত পাইবে ; কিন্তু যুগ যুগান্তের আস্বাদে সুধায় মধু পয়োধরা চির নবীনা স্নিগ্ধ তরুণ কমনীয়তায় লাবণীমাখা এমন অনির্ব্বচনীয় আর কোথায় আছে ? যাহাকে ভাল বাসিলে বিশ্বের হিতে মানুষ এমন আপনাভোলা দিগম্বর রূপ ধরে, যাহাকে ধ্যেয় ইষ্টরূপ করিলে কামনাপরতন্ত্র জীব আপ্তকাম দশায় শিবত্ব পায়, সে পুরাতনকে ওগো বঙ্গবাসি, আজ বৈশাখের প্রথম দিনে নারায়ণের বুকে নূতন করিয়া দেখ। দেখ চিত্ত-কমলে কি ভাব-সাগরে প্রেমের দ্যুতিমাখা স্নিগ্ধ অমল কমল-কামিনী দুলিতেছে। দেখ দেখ, একবার আত্মস্থ হইয়া আপনার মনিকোঠায় বাঙ্গলার মনকোকনদে দেখ। বুঝিবে দুঃখ মায়ের আটখানি বাহু, অসীম প্রেমের জোরে টানিয়া বুকে বাঁধিয়া এক করে। বুঝিবে সুখ সম্পদ জয় প্রতিভা সেই বাঙা হাতের বরাভয়, একবারটি ভুলিতে দেয় না দীন মৃত্তক্লেরও মা আছে।

সত্যই তো সে কথা। তোমার কি নাই বল দেখি ? ওগো কান্ত বসের রসিক। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার অধিক এমন মন প্রাণ জোড়া আর কাহার কি ধন আছে ভাই ? ওগো মাতৃহারা শিশু। রামপ্রসাদের মায়ের মত আর কোন মা এমন করিয়া মা হইতে জানে ? ওগো শক্তির কাঙ্গাল। তন্ত্রের শিবশক্তি কত তড়িতোজ্জ্বলা রণবিলাসিনী রূপ দেখিতে চাও ? এ সব তো তোমার ভাগীরথী আম বন তাম্রলিপ্তি নবদ্বীপের মত পুরাতন, সব নূতন ডাকের গহনা, সব নব সাজসজ্জা খুলিয়া একবার দেখ না সেই বাঙ্গলার ধনকেই তো পাইবে। যার এত আছে, তার তো এই কল্পতরু মূলে চতুর্ব্বর্গ ফল কুড়াইয়া পাইতে বিলম্ব নাই। ওগো শব-সাধক। শব দেখিয়া ভয় পাইও না। ওগো কুঞ্জের পথিক। শবকুরী-ঝলক আর সতিমির রজনীতে গহন পথ দেখিয়া থামিও না, অভিসারের শেষে যে বঁধু আছে গো বঁধু আছে। ওগো প্রেমের পথের যাত্রী। অশান্ত ইউরোপ আমেরিকাকে দেখাও কোন্ দিকে শান্তির আত্মরসের পরসঙ্গম মিলিবে।

নিবেদন।

১৩০৮—১৩২০।

আপন প্রবৃত্তির হস্তে নিপীড়িত হইয়া যে দিন আত্মবিস্মৃত বাঙ্গলাদেশ যন্ত্রণায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিনও তাহার মানস-চক্ষে আপনার স্বরূপ পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। অতীতে কোন্ স্রোত ধরিয়া তাহার জীবনধারা বহিয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যতে কোথায় তাহার গন্তব্য, সে কথা ভাবিবার তখন অবসর নাই। সে দিন বাঙ্গলাদেশের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া যে তীব্র আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া সমগ্র ভারতকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অন্ধ অহঙ্কারের খেলা; মঙ্গলময়ের শঙ্খনিনাদ তাহাতে সম্যক ফুটিয়া উঠে নাই। যাঁহার করস্পর্শে এই জাগরণ, তাঁহার পূর্ণ মূর্ত্তি তখনও বাঙ্গালীর চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় নাই।

অহঙ্কার-প্রসূত কর্ম্ম চিরদিনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ লক্ষ্য করিয়া চলে; সেই জন্য আদর্শ ও উপায় লইয়াও অনেক মতভেদ হইয়াছিল। কেহ বা প্রপিতামহের সঞ্চিত ছাঁচখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "যাহা পুরাতন, তাহাই সনাতন; অতএব বাঙ্গলাকে সেই ছাঁচে ঢালাই কর। অতীত যুগের অনুষ্ঠানগুলি ফিরাইয়া আন, প্রাণও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে।" যাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার অল্পবিস্তর আস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা দেশটাকে যতদূর সম্ভব ইউরোপের কাছাকাছি টানিয়া লইয়া গিয়া সেই ঈপ্সিত প্রতীচ্যের রঙে রঙিয়া এক বর্ণসঙ্কর আদর্শ গড়িতে গিয়াছিলেন, সে নকল হীরায় মায়ের গৌরব বাড়িল না। যাঁহারা জীবনের ঠিক ধারাটির সন্ধান পাইয়া মায়ের নামে ডাক দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সে অযথা অনুকরণ হইতে মুক্ত হন নাই। ভারতের ইতিহাসের মাঝে একটি বিলাতী ইতিহাসের পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া জুড়িতে গিয়া বিফলতা আসিল—তাহা আর বিচিত্র কি?

বিদ্বেষ-মূলক আদর্শ সম্বল করিয়া অধিক দিন কর্ম্ম ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকা চলে না। ইউরোপের দেশগুলা যে অর্থে মুক্ত, শুধু সেই অর্থে মুক্ত হইতে পারিলেই কি আমরা সম্পূর্ণ সুখী? ইহাই কি আমাদের জাতীয় চরম পরিণতি? জীবনসংগ্রামে অপর জাতির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া আহার্য্য ও ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহা-

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও দক্ষিণ হস্তের বদ্ধমুষ্টি দেখাইতে পারিলেই কি আমাদের অন্তরাত্মার চরম তৃপ্তি ?

মানুষ ত হইতে হইবে, কিন্তু এইটুকু লইয়াই কি মনুষ্যত্ব ? সত্ত্বদৃঢ় শার্দ্দূলত্বই কি মনুষ্যত্বের নামান্তর ? একটা অন্ধ নিরানন্দময় জড় শক্তিই কি সামাজিক ইতিহাসে আপনাকে ধারাবাহিকরূপে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে ? সে শক্তির কি নিয়ন্তা নাই ?

ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যুষিত ভারতের অতীত ইতিহাস অপচ্ছায়ার মত চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণত্বের ক্ষীণ জ্যোতি যুগযুগান্তরের তিমির জাল ভেদ করিয়া এখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে কোথায় তাহার প্রভাব ? আভিজাত্যস্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যশক্তির ভারমাত্রবাহী বলীবর্দ্দ বিশেষ ও পরধর্ম্ম আশ্রয়কারী ক্ষত্রিয় ইহাই না অতীত ভারতের আদর্শের ভগ্নাবশেষ। সনাতনধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, কোথায় আজ তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব ? ভারতের সাধনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া ঋষি মন্ত্রবীরগণ যে অমৃতভাণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও আজ কালপ্রভাবে হলাহলে পূর্ণপ্রায়।

তবে কি আমাদের অতীত যুগের অমৃত সন্ধান প্রয়াস একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন মাত্র ? নিষ্ফল ব্যর্থতাই কি ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ?

মন যখন এই সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান, তখন একজন মহাপুরুষের মুখে এ প্রশ্নের যে মীমাংসা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বোধে বিশ্বাস করিতে সাহসে কুলায় নাই। ভারতের সঞ্চিত অতীত কর্ম্ম নাকি নিঃশেষিত প্রায়, তপঃপ্রভাবে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ভারত নাকি আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ভাগবলীলাকেন্দ্ররূপে আবার নাকি জগতে জ্ঞান ও শান্তির ধারা বর্ষণ করিবে, মানবের মধ্যে একাত্মবোধ সঞ্চারিত করিয়া প্রেমের বন্ধনে "ছিন্ন, খণ্ড, বিক্ষিপ্ত" জগৎকে এক করিয়া বাঁধিবে।

অহংকারাতিরিক্ত বস্তুর সন্ধান যাঁহাদের মিলে নাই, তাঁহাদের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করাই অস্বাভাবিক। আমরাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তাহার পর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া বহুদিন পাষাণী অহল্যার মত জীবন্মৃতপ্রায় হইয়াছিল। নিষ্ফল কর্ম্ম বাসনা আমাদেরই হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিয়া হাহাকারমাত্রে পরিসমাপ্ত হইতে লাগিল। অপরিণত মানবহৃদয়ের সহস্র দুর্ব্বলতা চারিপার্শ্বে উন্মত্ত ভাবে উলঙ্গ নৃত্য করিয়া আপনাকে আপনাদেরই চক্ষে ক্রমশ

হীন ও বীভৎস করিয়া তুলিল। প্রাণ আপনার হলাহলে তিক্ত হইয়া উঠিয়া ভগবানের এই সুন্দর জগৎ আমাদের রসনায় বিস্বাদ করিয়া তুলিল। বিশ্বেশ্বরের সিংহাসনের দিকে বদ্ধ মুষ্টি দেখাইয়া বিদ্রোহীর মত দিন কাটাইতে লাগিলাম।

সে দিন বুঝি নাই যে, অহঙ্কার ভাঙ্গিয়াই ভগবান মানুষকে আপনার করিয়া লন; অহঙ্কারেই মানুষকে ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। অহঙ্কারই মানুষী শক্তিকে ভাগবতী শক্তির ধারা বলিয়া জানিতে দেয় না।

কিন্তু এক দিন অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাপ-পুণ্য, অভিমান ও অশান্তির বোঝা কাঁধ হইতে নামাইয়া দিতে হইল। সে দিন দেখিলাম যে, মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা কেবল হৃদয়ের পাষাণ তল ভেদ করিয়া ভগবানের করুণাধারার আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা মাত্র।

আপনাদের হৃদয়ে যে বাণী ধ্বনিত হইল, দিকে দিকে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিয়া কত স্পর্দ্ধা দলিত করিয়া, অহঙ্কারাশ্রিত রজঃশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া যে মঙ্গলময়ী শক্তি জগতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার হস্তে আপনাকে যন্ত্র স্বরূপ ছাড়িয়া দেওয়ার চেষ্টা নানাস্থানে মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। যুগযুগান্তের আবর্জ্জনা রাশি ধৌত করিয়া যিনি মানবের হৃদয়ে সিংহাসন পাতিয়া বসিবেন, তাঁহার আগমনবার্ত্তা চারিদিকে সূচিত হইতেছে। পূর্ণাদর্শ সর্ব্বত্র প্রকটিত না হইলেও রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য-নীতি আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। যে অহংজ্ঞান মানুষকে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে বিশ্বমানবরূপী নারায়ণের জগতে আত্মপ্রকাশোপযোগী লীলাকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে, এই আশার বাণী মানুষের কাণে কাণে কে বলিয়া দিয়াছে। অনেকেই আজ এই নবজীবনকে বরণ করিয়া লইতে সমুৎসুক।

হে বাঙ্গালী! বিশ্বাস কর, এই জীবনযজ্ঞের তুমিই প্রধান ও প্রথম পুরোহিত। তোমার অতীত জীবনের সমগ্র সাধনা এই আত্মনিবেদনকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মরূপিণী গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র স্বহস্তে অতি আদরে তোমার বাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; গগনভেদী হিমাদ্রি তোমার মাথার মুকুট অতলস্পর্শী সমুদ্র তোমার পাদপীঠ; আর্য্য, মোঙ্গল দ্রাবিড়ী সভ্যতার সার তোমার মধ্যে সংগৃহীত। জ্ঞানের আদিগুরু কপিল তাঁহার অংশাবতার ন্যায়াচার্য্যগণের তোমরা বংশধর, ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যের

প্রেম তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, কলির বেদ তন্ত্রশাস্ত্র তোমাদেরই দেশে উদ্ভূত।

আপনার অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের তত্বাঙ্গের সমন্বয় তোমাদের দেশেই সাধিত হইয়াছে। সে অতীত সাধনা লুপ্ত হয় নাই; কর্ম্মজগতে তাহা প্রয়োগ করিবার দিন আজ আসিয়াছে। সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত তপস্যাই আজ তোমাকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। যে শক্তি জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের ত্রিধারারূপে মানুষের মনে প্রবাহিত, তাহাই পূর্ণরূপে তোমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাকে নব যুগধর্ম্ম প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিবে।

এক দিকে ভোগবাসনাপীড়িত অভিজাতবর্গের উন্মত্ত হুঙ্কার, অপর দিকে দীন দরিদ্র নির্য্যাতিতের আর্ত্ত ক্রন্দন! এক দিকে সংসারাতিক্রমপ্রয়াসী ইহামুখ-বিমুখ সাধু, অপর দিকে বাসনাচঞ্চল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ভোগবিলাসের দাস গৃহস্থ—দেখিতেছ না—মানুষ সর্ব্বত্রই আপনাকে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে? যিনি মর্ত্তে সেই সর্ব্বদুঃখহরা অমৃত মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত করাইয়া সংসারকে ভূস্বর্গে পরিণত করিবেন, দেখিতেছ না তিনি তোমাদেরই প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন?

হে আমার দেবাংশ-সম্ভূত স্বদেশবাসিগণ। তোমাদের বহুযুগের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ আবার পূজায় পূত হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া প্রেমমন্ত্রে বঙ্গের—ভারতের—বুঝি নিখিল জগতের চিত্তকমলারূঢ়া মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া কৃতার্থ হও।

ইহাই আমাদের নিবেদন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র ও চিঠি।

মার্শেলিস্ ও পারিস।

আমি মার্শেলসেই জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে লণ্ডনে আসিয়াছি। জাহাজে আসিলে আরও ৬।৭ দিন দেরি হইত; আর সমুদ্রের তরঙ্গরঙ্গে বিস্তর দুর্ভোগও ভুগিতে হইত। আট বৎসর পরে মার্শেলসে পা দিয়াই বুঝিলাম, এ মার্শেলস্ আর সে মার্শেলস্ নাই। এখানে যুদ্ধের কোনও দৃশ্যের অভিনয় হয় নাই বটে, কিন্তু সারা দেশেই তাহার ঢেউ লাগিয়া সমাজটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া গিয়াছে। মার্শেলস্ বন্দরে জাহাজের ভিড় খুব বেশিই দেখিলাম—আট বৎসর আগে বা কুড়ি বৎসর আগে এত দেখি নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে যুদ্ধ-জাহাজই বেশী; তার পর ডাঙ্গার উপরেও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের স্মৃতি সর্ব্বত্রই জাগিয়া আছে। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই কেবল ফরাসী সিপাহিদের জনতা। আগে যা' তা' কাজের জন্য লোক পাওয়া যাইত। এখন পুরুষ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সহযাত্রীদের কেহ কেহ সহর দেখিবার জন্য "গাইড্" চাহিলে কুক কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ সাফ বলিয়া দিলেন, তাঁদের কোনও "গাইড্" নাই। পূর্ব্বে সর্ব্বদাই দু'চার জন কুকের আফিসের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিত। বিশেষতঃ বিদেশী যাত্রীর জাহাজ বন্দরে লাগিলেই তারা আসিয়া আপনা হইতে জুটিত। এবারে একটিও পাওয়া গেল না। কুকের আফিসের সাহেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই চারি বৎসরের যুদ্ধে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, বিদেশী লোকে ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। এই ক'মাস যুদ্ধ থামিয়াছে। কিন্তু যারা বাঁচিয়া আছে, তারাও ত সকলে ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং লোক পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে।

জাহাজে থাকিতে লোকে আমাদের কতই ভয় দেখাইয়াছিল যে ফরাসীদের ভিতর দিয়া যাবার চেষ্টা করিলে, পথিমধ্যে কতদিন যে আটকা পড়িয়া থাকিতে হইবে, তার ঠিকানা নাই। গাড়ী পাওয়া নাকি দুর্ঘট ছিল। বিশেষ শোবার ব্যবস্থা নাকি আদৌ ছিল না। ছয় সাত দিনেও মার্শেলস্ হইতে পারিস পৌঁছা যাইবে কি না, সন্দেহ। এইরূপ কত কথাই না শুনিয়াছিলাম। মার্শেলসে নামিতে না নামিতেই দেখিলাম, এ সকল কল্পনা মাত্র। রেল চলা-একরূপ পূর্ব্বেরই মতন আবার আরম্ভ হইয়াছে। আর পয়সা দিলে, শোবার গাড়ীতে বা Sleeping cars'এও স্থান পাওয়া যায়। আমরা চৌদ্দ জনের

ঘণ্টায় মার্সেলস্ হইতে পারিসে পৌছি। আগে ১২ ঘণ্টায় গাড়ী যাইত। এখনও একখানা ট্রেণ বার তের ঘণ্টায় যায়। আমরা বৈকালে ছয়টার সময় মার্সেলস্ ছাড়ি। এ সময়ে এ দেশে ন'টা সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত বেশ আলো থাকে। সুতরাং প্রায় তিন চার ঘণ্টা কাল আলোয় আলোয় দেশ দেখিয়াছি। ফরাসী-দের বাহিরের চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে, এই সে দিন এ দেশটার উপর দিয়া অমন ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে। লোকে বলে, ফরাসীদেশে এখন লোক নাই। কাগজ পত্রে, জনসংখ্যার হিসাবে, দেখা যায় লক্ষ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে মারা গিয়াছে। তা ছাড়া কত লোক কাণা খোঁড়া হইয়া যে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তার সংখ্যাও সামান্য নয়। এ সকলই সত্য। কিন্তু দেশের চেহারা দেখিলে এত লোকক্ষয় যে হইয়াছে, ইহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। চাষবাস যেমন হইত, তেমনি হইতেছে। কোথাও ত পড়ো জমি, কোথাও ত জঙ্গলজঙ্গাল দেখিলাম না। রেলপথের দু'ধারে, আগেকারই মতন ক্ষেত্রগুলি হয় সময়োচিত শাক সব্জীর বা ফলফুলের ফসলে ভরা, আর না হয়, সবে শস্য কাটা হইয়া, খড়ের গোড়া গুলিতে সোণার পাত দিয়া যেন মোড়া এমনি বোধ হয়। অন্য জমি আবার নূতন ফসলের জন্য সাজান রহিয়াছে। দেশে যদি লোক না থাকে, বা এতই কমিয়া থাকে, তবে এ সকল কাজ করিল কে? কতবার যে এই প্রশ্ন মনে জাগে, বলিতে পারি না।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিদেশীর পক্ষে সহজ নয়। লোকক্ষয় যে হইয়াছে, ইহা ঠিক। এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু ফরাসী জাতির ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রাণশক্তি আছে, যাহাতে এ সকল ক্ষতি সহজে ও স্বল্প কালের মধ্যেই পূরণ করিয়া লয়। ১৮৭০-৭১ ইংরাজির জার্ম্মাণ যুদ্ধেতেও ফরাসীদের এইরূপ দুর্গতিই ঘটিয়াছিল; বরং ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছিল। লোক ভাবিয়াছিল ফরাসীরা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না—পারিলেও কত দিন যে লাগিবে, তার ঠিকানা নাই। কিন্তু পোনর কুড়ি বছর যাইতে না যাইতেই ফরাসীরা আপনার নষ্ট শক্তি ফিরিয়া পাইল। এবারেও এই ক'মাসেই তার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ জাতটাকে দেখিলে, ইহাদের সাংসারিক অভ্যুদয় সম্বন্ধেও বলিতে ইচ্ছা হয়—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।"

১৮৭১ ইংরাজিতে হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন;—

"তোরও তরে কাঁদি আর ফরাসী জননী"।

কিন্তু ভারতের যে কান্না এই পঞ্চাশ বৎসরেও ত থামিল না। ফরাসীস্ পড়িয়া আবার উঠিয়া, এই যুদ্ধে কত বিক্রম, কত শৌর্য্য, কত ত্যাগ দেখাইয়া এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা হইতেও আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রবল পশুশক্তির নির্ম্মম-লীলা-ভূমি ইউরোপে আত্মার শক্তি যদি কোথাও সঞ্চিত থাকে, তবে সে টুকু আছে ফরাসীতে। বিদেশীয়েরা ফরাসীদের যতই নিন্দা কুৎসা করুক না কেন, ইউরোপে যদি কোনও জাত মানুষের হৃদয়কে আপনার হৃদয় দিয়া নিকটে টানিয়া আনিতে পারে, সে কেবল পারে এই ফরাসী জাত।

চোখ মেলিয়া একটু নিবিষ্টচিত্তে এই দেশটার ভিতর দিয়া একবার চলিয়া গেলেই, ইহার কারণ নির্দ্ধারণও অসাধ্য হইবে না। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতন ফরাসীসেও বিস্তর কলকারখানা আছে; কিন্তু ইংলণ্ডে যেমন লোকে কলকারখানা করিতে গিয়া, কৃষিকর্ম্ম অনেকটা ছাড়িয়া দিয়া, গ্রাম গুলিকে সহরে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে, ফরাসীসে সেরূপ হয় নাই। ফরাসী জাতটা এখনও মাতা ধরিত্রীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ যথাসাধ্য চুকাইয়া কেবল ইটপাটকেলের ভিতরে গিয়া আশ্রয় লয় নাই। গাছ যেমন মাটি ছাড়া হইলে ভাল করিয়া ডালপালা ছড়াইয়া পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না, মানুষের পক্ষেও অনেকটা সেইরূপই হয়। চাষবাস ছাড়িয়া দিলে মানুষের মনুষ্যত্বও শুকাইয়া যায়। ফরাসীস্ চাষবাস ছাড়ে নাই। রেলপথের দু'ধারে তার প্রচুর প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই জন্যই কোনও রাষ্ট্রবিপ্লবে ফরাসীস্ জাতির প্রাণটাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাত সহর ও সহরগুলিতেই প্রায় আবদ্ধ রহিয়াছে। রাজধানী পারিসের রাজপথ শোণিতপ্লাবিত করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ফরাসীস্ জাতিকে বিধ্বস্ত বা একেবারে বিচলিত করিতে পারে নাই। এই কারণেই এই পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে বিস্তর লোকক্ষয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি জাতির প্রাণটা কেবল বাঁচিয়া আছে নয় কিন্তু সতেজ রহিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই এই প্রাণশক্তি সমাজশরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া, সমগ্র জাতিটাকে সতেজ ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

ফলতঃ আজ আট মাস মাত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই মনে হয় যেন পারিস এই পাঁচ বৎসরের স্মৃতিটা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। অথচ পারিস যতটা সহিয়াছে, লণ্ডন এতটা সহে নাই। লণ্ডনের উপরে যেমন পারিসের উপরেও সেইরূপ বিমান মার্গ হইতে কত বোমা বৃষ্টি,

হইয়াছে। ইহার উপরে লণ্ডনে যাহা হয় নাই, পারিসে তাহাও হইয়াছে। আকাশ হইতে বোমাবৃষ্টি আর মাটিতে বহু বহু যোজন অন্তর হইতে কামানের গোলাবৃষ্টিতে পারিসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, দিন রাত কামানের বজ্রনাদ, তার উপরে রাত্রে বিশেষভাবে বিমান-পোতের শব্দ এ সকল মিলিয়া এই চারি পাঁচ বৎসর কাল পারিসের নরনারীর কাণ ও প্রাণ দুই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। সে সময়ের কথা স্মরণ করিয়া, পারিসের লোকে এখনও—"ওঃ" "ওঃ" বলিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া থাকে। বোধ হয় স্মরণ মাত্রেই সেই দুঃস্বপ্ন চারিদিকে জাগিয়া উঠে। কিন্তু পারিস এ সকল মনে করিতে চাহে না। বিগত দুঃখের স্মৃতি ভুলিয়া থাকার শক্তিটা আছে বলিয়াই পারিস এত সত্বর আপনার পূর্ব্ব জীবনের ছিন্ন সূত্রকে এত সহজে আবার গুছাইয়া বাঁধিয়া দিতে পারিতেছে।

আট বৎসর পরে পারিসে আসিয়া, তাই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। পথে সেইরূপ লোকের জনতা, সন্ধ্যার পরে সেইরূপ আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, রঙ্গ-তামাসা। আর রাত্রে সেইরূপই বিলাস-তরঙ্গ, তেমনি রহিয়াছে। তবে আগেকার মতন উজ্জ্বল আলো নাই। রাস্তার সব আলো মনে হইল যেন এখন আর জ্বলে না। আর দেখিলাম—খাদ্যের বিশেষ চিনির অভাব। আমার হোটেলে চা ও কফিতে চিনি দিতে পারিল না; সাকারিণ (saccarine) দিল। এই বস্তুটি সকরা-সার বটে, কিন্তু লোকে বলে এক কণা পরিমাণ সাকারিণের ভিতর যে মিষ্টত্ব থাকে সাধারণ লোকে তাহা সহিতে পারে না, তাদের রসনায় ইহা তিক্ত বোধ হয়। আমার ত সেই দশা হইয়াছিল। দুটি মাত্র সাকারিণ কণা চা'এ দিয়া মুখে দিতে গেলাম, তিক্ত বোধ হইল; গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না। আর একটা পরিবর্ত্তণ লক্ষ্য করিলাম। আগে পারিসে খাবার দোকানগুলি রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। এখন নয়টা বাজিতেই বোধ হয় বন্ধ হইয়া যায়। আমি শুনিলাম পারিসে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এখন খাবার সময় বাঁধিয়া দিয়াছেন। অপরাহ্ণ চার ঘটিকার পরে পারিসের এখন কোথাও মধ্যাহ্নের খাবার বা লঞ্চ (lunch) পাওয়া যায় না। কোনও দোকানে যদি দেয়, তবে তার জরিমানা হয়। এই পাঁচ বৎসরের যুদ্ধের ফলে সারা ইউরোপে যেন একটা নিত্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তারই জন্য ক্রমশঃ খাবার বিষয়ে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টকে একটা ধরাকাটা ও বাঁধাবাঁধি করিতে হইতেছে।

আট বৎসর পরে।

ঠিক আট বৎসর পরে আবার লণ্ডনে আসিয়াছি। লণ্ডন আমার অপরিচিত নয়। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বার বৎসর কাটাইয়া ছিলাম। আবার দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে তিন বৎসর কাটাইয়া গিয়াছি। কিন্তু এই আট বৎসরে যেন সবই বদলাইয়া গিয়াছে। জায়গা গুলো যেমন ছিল, তেমনি আছে। পথঘাট আগেকার মতনই রহিয়াছে। বাড়ীগুলো ঠিক যে যেখানে ছিল, সবই সেখানে রহিয়াছে। তবুও সে লণ্ডন যেন এ লণ্ডন নয়। তাই ভাবি, একি আমার চোখেরই দোষ? কিছুই ত বদলায় নাই, অথচ সবই যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, দেশে বসিয়া, খবরের কাগজে এই পাঁচ বৎসর কাল, যুদ্ধের নানা সংবাদ পড়িয়া, আমার মনে লণ্ডন সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। এই ক বৎসরের মধ্যে লণ্ডনের উপরে কত উপদ্রব হইয়াছে। মাসের পর মাস, রাতের পর রাত, আততায়ী বিমান-পোতের বহর চড়াও করিয়া চারিদিকে বোমাবৃষ্টি করিয়াছে। এ সকল পড়িয়া ভাবিয়াছি লণ্ডন বুঝি এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম যে কত ভাঙ্গা চুরাই না দেখিব। কিন্তু সুখের বিষয় তার কিছুই দেখিলাম না। লণ্ডনে যারা এই যুদ্ধের সময় কাটাইয়াছে, তারা বলে যে জর্ম্মাণ জেপেলিন বহর অনেকবার আসিয়াছে বটে, এমন সময় গিয়াছে যখন লোক রাত্রে ঘরে শুইতে পারে নাই। সহরের মাটির নীচ দিয়া যে রেল চলিয়াছে, ঐ সুড়ঙ্গে যাইয়া লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ রাতের পর রাত কাটাইয়াছে। মাঝে মাঝে এ সকল সুড়ঙ্গে এতই জনতা হইত যে মানুষের চাপে নাকি মানুষ মরিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জর্ম্মাণ-জেপেলিনের বোমাবৃষ্টিতে অতি অল্প লোকই মরিয়াছে। আর ইহার কারণ এই যে এই অসুরেরাও যেখানে সেখানে বোমা ফেলে নাই। প্রায়ই রেল ষ্টেশনে কিম্বা বড় বড় হোটেলে যেখানে কোনও না কোনও আকারে সমরায়োজন চলিত, সে সকল স্থানেই বোমা ফেলিতে চাহিয়াছে। তবে আকাশ হইতে বোমা ফেলা ব্যাপারটাই অতিশয় নৃশংস। নিশানা ঠিক রাখা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং ষ্টেশন ও বড় বড় হোটেলের উপরে না পড়িয়া, সময় সময়ে এ সকল বোমা আশে পাশেও পড়িয়াছে। ইহাতে যুদ্ধের আয়োজনের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই; এমন স্ত্রী ও বালক বালিকারাও মাঝে মাঝে হত ও আহত

হইয়াছে। আর এখনকার কর্তৃপক্ষ জেপেলিন-বহরের গাতরোধ ও তাদের নষ্ট করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেও যে লোকের কোনও অনিষ্ট হয় নাই এমনও নহে। জেপেলিন আকাশে উড়ে আকাশের দিকেই আণ্টি-এয়ার-ক্রেফ্‌ট (anti aircraft) কামান গুলির মুখ ছিল। আর আকাশে থুথুই ফেল আর গোলাই ছোঁড় তাহা আবার নিজের গায়ে আসিয়া পড়িবেই পড়িবে এই আণ্টিএয়ারক্রেফ্‌ট কামানের গোলাবর্ষণেও যে লোক কিছুই উৎখাৎ হয় নাই, তাহাও নয়। ফলতঃ কোন্‌টার উৎপাৎ বেশি ছিল, লোকে এখন ঠিক ঠাওর করিতে পারিতেছে না।

এই কারণেই এত উৎপাতেও লণ্ডনেব বাহিরের চেহারার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তবুও যে লণ্ডনটি আজ কেমন নূতন নূতন ঠেকিতেছে তাহার হেতু ইট্‌কাঠে নয়, কিন্তু মানুষেব চালচলনে। মানুষগুলো বদলাইয়া গিয়াছে—এটা খুবই চোখে ঠেকিতেছে।

সিপাহীব প্রাদুর্ভাব

প্রথমেই এখন চোখে ঠেকে—"খাকি"। বিশ বৎসর পূর্ব্বে, বুয়র যুদ্ধের পরে এই "খাকি" কথাটা এদেশে খুব চল্‌তি হইয়াছিল। সে সময়েই ইংরাজী সিপাহীরা সমরক্ষেত্রে পূর্ব্বকার "লাল কুর্ত্তি" ছাড়িয়া এই মেটে রঙ্গের "খাকি" পোষাক ধরিয়াছিল। কিন্তু সে সময়েও পথে ঘাটে এত "খাকি" দেখা যায় নাই। বুয়ার যুদ্ধের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন অবস্থাই লণ্ডনে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এবারে লোকে জর্ম্মাণ দেখিলেই, বা "হুণ" বলিয়া সন্দেহ করিলেই যেমন তাড়া করিয়াছে, সেবারে বুয়রদেব সম্বন্ধেও প্রায় তাহাই হইয়াছিল। এবারে যেমন "কায়সারের" নামে লোকে ক্ষেপিয়া উঠে, সেবার সেইরূপ "ক্রুজারের" নামে ক্ষেপিয়া উঠিত। আমি নিজে কতকটা তার ভুক্তভোগী। তখনও ইংরেজ সাধারণে আমাদের পোষাকের সঙ্গে তত পরিচিত হয় নাই। আমি তখন সর্ব্বদাই গেরুয়া পাগড়ী পরিতাম। আমার পাগড়ী দেখিয়া একদল লোক, একদিন একটা মদের দোকানের সামনে আমাকে "ক্রুজার" বলিয়া তাড়া করিতে আসিয়াছিল। সে পূর্ব্বেও দেশে একটা ঘোরতর সমরবিকার উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধের পরেও লণ্ডনে এত "খাকির" প্রাদুর্ভাব দেখি নাই। তখনও ইংরেজ সিপাহীরা লালকুর্ত্তি ছাড়ে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন পথে ঘাটে কচিৎ

কখনও দু'একটি সিপাহী দেখিয়াছি মাত্র। রবিবার সন্ধ্যাকালে, ষ্ট্র্যাণ্ডে যখন লণ্ডনের পারিচারিকা সমাজের বহর চলিত, তখন মাঝে মাঝে দুএকটি চাকরাণীর সঙ্গে দুএকটি গোরা সিপাহী দেখিয়াছি বটে। কিন্তু সাগরে জলবিন্দুর মত তারা ঐ জনসংঘের মধ্যে মিশিয়া যাইত। আর আজ? আজ এমন একটা রাজ পথ নাই, চৌপহর দিনে এমন একটা সময় নাই, যেখানে ও যখন বামে, দক্ষিণে, সমুখে, পশ্চাতে "খাকির" ভিড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যাহ্নে খানাখানাতে (Restaurant'তে) বসতে যাই— সেখানে "খাকি"। রাত্রে হোটেলে ফিরিয়া আসি—সেখানেও সেই "খাকি"। লণ্ডনটা যেন একটা বিশাল সেনা-নিবাসে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্র কেবল সিপাহী। কেহবা কচিৎ নিঃসঙ্গ, কেহ বা সখা-সঙ্গে, আর অধিকাংশই—বিশেষতঃ সন্ধ্যা-সমাগমে—"যুগল রূপে" সহরময় বিহার করিতেছে।

ফলাফল

এত "খাকির" ছড়াছড়িটা কিন্তু কোনও জাতিরই ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর হয় না। প্রথমতঃ এই "খাকি" বস্তুটা কি? "খাকিটা" আর কিছুই নয়, কেবল জাতির পশু-শক্তির চিহ্ন, প্রতিমা, বা প্রতীক মাত্র। "খাকির" পূজা মানেই পশুবলের পূজা। মানুষ যার পূজা করে, তার উপরে তার নির্ভরটা স্বভাবতঃই অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যায়। যে জাতি এতটা পরিমাণে "খাকির" উপাসক হইয়া পড়ে। পশুবলের উপরে তার নির্ভর নিতান্তই বাড়িয়া যায়। আর পশুবলের উপর নির্ভর বাড়িলেই আত্মার শক্তির উপরে আস্থা আপনা হইতেই কমিয়া যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে কোথাও, কোনও দিন, আত্মার শক্তির উপরে তেমন আস্থা ছিল না। এখানে ধার্ম্মিকেরা এবং আস্তিকেরা পর্য্যন্তই সর্ব্বদাই রামও কহিয়াছে, কাপড়ও তুলিয়াছে। পিউরিটানেরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দোহাই দিত। ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনী ভগবানের কৃপা ভিক্ষা না করিয়া কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। কিন্তু তাদেরও সর্ব্বদা বারুদের আধারটা শুষ্ক করিবার উপদেশ দেওয়া হইত। Pray but keep your power dry—ভগবানকে ডাক্‌তে হয় ডাক; ডাকা ভাল বটে। কিন্তু দেখ যেন বারুদটা না ভিজিয়া উঠে। এই সভ্যতা ও সাধনায় কোনও দিন ভগবান "লা-সরিক—অনন্ত অংশীদার" ছিলেন না। ইহা সর্ব্বদাই সংসারের উপরে, দুনিয়ার কল কৌশলের উপরে, জড়শক্তি ও পশুশক্তির বা পেশি-শক্তির উপরে

নির্ভর করিয়া চলিয়াছে। এই যাদের প্রকৃতি, তাদের পক্ষে এই অভিনব "খাকির"—উপাসনাটা আদৌ কল্যাণকর হইতেই পারে না। কিন্তু একথা বুঝেই বা কে, আর বলেই বা কে? যারা বুঝে তাদের কথা কেহ কাণে তুলে না। তারা "প্যাসিফিষ্ট" অর্থাৎ ঐকান্তিক শান্তির উপাসক। তারা দেশদ্রোহী। এই কয় বৎসর তাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। এখনও তাদের কোনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

তারপর, এই পশুশক্তির বা পেশি-শক্তির উপরে যখন যেখানেই লোকের নির্ভর একান্ত বাড়িয়া পড়ে, সেখানে কোনও দিন সমরায়োজনের বিরাম হয় না, হইতেই পারে না। আর যেখানে সর্ব্বদা একটা জাতিকে ঢাল-তলবার বাঁধিয়া থাকিতে হয়, সেখানে লোকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সমর ব্যাপারটাই সেনাগণের ঐকান্তিক বশ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল ছকবন্ধ খেলার গুটির মতন—সেনাপতিগণ এ সকল গুটি দিয়া এই সাংঘাতিক খেলা খেলিয়া থাকেন। দাবার গুটির যেমন কোনও ব্যক্তিত্ব নাই—সেইরূপ সেনা সঙ্ঘের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদেরও কোনও স্বাতন্ত্র্য, কোনও স্বাধীনতা নাই, থাকিতেই পারে না। যখন কোনও জাতি সর্ব্বদা সমর-সজ্জায় সাজিয়া থাকে, সে জাতির লোকেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এমন কি তাহাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ প্রাপ্ত হয়। জর্ম্মানীতে ইহাই হইয়াছে। জর্ম্মান জাতির অদ্ভুত শক্তি, তাহাদের ঘননিবিষ্টতা, বিধানানুগত্য, দেশভক্তি সমরকুশলতা এ সকলই জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এরূপ প্রণালীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জাত দুনিয়ায় আর একটিও খুজিয়া পাওয়া যায় না। আর এ সকলই জর্ম্মানের বিজিগীষার বা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসকলের উপরে আপনার বিজয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিবার বলবতী বাসনার ফল। জর্ম্মানী প্রায় শতবৎসরকাল অনন্যকাম হইয়া সমর-দেবতার ভজনা করিয়াছে। জর্ম্মানীতে প্রজার স্বত্বস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সুখভোগ বিলাসকামনা, সকলই এই দেবতার বলি আহরণ করিয়াছে। আধুনিক সভ্যজগৎ ইহার কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে। আর করিয়াছেই বা বলি কেন? এখনও করিতেছে, ভবিষ্যতে আরও করিবে।

এই যুদ্ধের-অবে, সংগ্রামের অবসানেও সমরায়োজনের বিরাম হয় নাই। ইংরাজ সর্ব্বদাই লক্ষ্মীর ভজনা করিয়াছে। ইংরাজ কোনও দিনই জর্ম্মানের

মতন সংঘবদ্ধ হয় নাই। এই জন্যই এদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতকাল ধরিয়া এতটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের প্রয়োজনে চারিদিকে এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে হয়। খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা, বেচা কেনা, সকল বিষয়েই লোকের আগেকার স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছিল। যুদ্ধ ত প্রায় নয় দশ মাস থামিয়াছে, কিন্তু সে পূর্ব্ব ব্যবস্থা এখনও অনেকটা চলিয়াছে, কতদিন যে চলিবে, ইহা বলা যায় না। এবারেও চিনি, মাখন, মাংস, কয়লা এ সকলের নিরিক্ বাঁধা হইয়াছে। অক্টোবর মাস হইতে, সরকারের টিকিট দেখাইয়া যার যতটা বরাদ্দ আছে, তাকে ততটা চিনি, মাখন বা মাংস বা কয়লা কিনিতে হইবে। পয়সা দিয়াও কেহ ইহার বেশি পাইবে না। তবে ঘুষ দিয়া কি করা যায় না করা যায়, সে কথা স্বতন্ত্র। তারপর যুদ্ধের সময় স্ত্রী বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ছাড়া প্রায় সকলকেই সেনাদলভুক্ত হইতে হইয়াছিল। যারা লুকাইয়া থাকিত, তাদের শাসনের ও দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন ততটা ধরাকাটা নাই বটে, কিন্তু সে আইনখানি উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কোনও কথা এখনও কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও চারিদিকে লোককে সিপাহী হইবার জন্য ডাকিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সুতরাং ইংরাজের সমরায়োজন যে বিশেষ সংকুচিত হইবে, এমন মনে হয় না। আর এই সহরময় কেন, দেশময় 'খাকির' প্রাদুর্ভাব দেখিয়াও ইংরাজের রণচণ্ডীর পূজা সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঋণ-শোধ।

এই সিপাহীর প্রাদুর্ভাবের আরও একটা কারণ আছে। লোকের মুখে সে কথা মাসে মাসে শুনিতে পাওয়া যায়। সে কারণ—কৃতজ্ঞতা। এ বেচারিরা এই পাঁচ বৎসর কতই না ক্লেশ পাইয়াছে। ভাল খাওয়া, ভাল পরার মুখ দেখিতে পায় নাই। একটু আমোদ আহ্লাদ করিবার সুযোগ ও অবসর পায় নাই। এখন যদি তারা একটু সুখ একটু সখ খুঁজিয়া বেড়ায় তাহা তাদের প্রাপ্য। এই ভাবে, এই কবছরে জাতটাকে ইহারা যে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছে তাহার কতকটা পরিশোধের জন্য, বহুলোকে এখন সিপাহীদের এত আদর, এত যত্ন, এত সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে। এই কবছর এরা স্ত্রীলোকের মুখ দেখে নাই। আহা। এমন যদি একটু ফ্লিটনাষ্টি, একটু ইয়ারকি একটু—কি বলিব? রসলীলা (?) করিতে চায়, করুক।" এরূপ ভাবটাও লোকের মনে যে নাই

তাহা বলিতে পারি না। আর এই কবছর সিপাহীদের এত বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে, যে এখন যদি—যে সকল কুমারীর কোথাও কোনও বাঁধা-ধরা নাই—আর এরূপ স্ত্রীলোক এদেশে অসংখ্য বলিলেও হয়—তারা এসকল সিপাহীদের একটু সঙ্গসুখ দান করে, সমাজ তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিতে বড় চায় না। এইজন্ত সমাজে যে অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িতেছে না, তাহা নহে।

কর্ম্মফল।

সমাজকে ইহার কর্ম্মফল ভুগিতে হইতেছে। এই অল্পকালের মধ্যে এখানে রোগ বিশেষ একটা প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে লোকনায়কেরা চারিদিকে মুখ ফুটিয়া ইহার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতাবৎকাল ভদ্রসমাজে এ সকল রোগের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইত না। প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে ইহার উল্লেখ হইত না। এখন আর চুপ করিয়া গেলে চলে না। জাতিটা উৎসন্নের পথে দাঁড়াইতেছে। অতএব এই নিদারুণ রোগের প্রতিষেধের জন্ত একটা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার নাম—National Council for the Prevention of Venereal Diseases - বোম্বাই'এর ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড সিডেন্‌হাম এই সমিতির সভাপতি। এই সমিতির একটা বিজ্ঞাপনে পড়িলাম যে বহুকাল পূর্ব্বে এদেশে যখন প্লেগ-মহামারী উপস্থিত হয় তখন যে বাড়ীতে এই রোগ ঢুকিত, তাহার দরজার মাথায় একটা কাল ক্রস্ বা ত্রিশূল আঁকিয়া দেওয়া হইত। আজ যদি এই নূতন প্লেগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সহরের বহু সহস্র বাড়ীর দ্বারদেশে এই চিহ্ন আঁকিতে হইত। কিন্তু গোপনে গোপনে এই নিদারুণ রোগ জাতির প্রাণক্ষয় করিতেছে। ইহার প্রতিষেধের জন্ত এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই ব্যাপারটা কতদূর সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, ইহার আরও প্রমাণ পাইতেছি। আগামী সপ্তাহে এখানে International Brotherhood অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের বা সৌহার্দ্দের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টায় একটা আলোচনা সভার বা কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে। অনেক বড় বড় ধর্ম্মযাজক, বক্তা, রাষ্ট্রনীতিক, সমাজ সংস্কারক ও অধ্যাপকেরা ইহাতে বক্তৃতাদি করিবেন। প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ মহাশয় এই বৈঠকে একদিন বক্তৃতা করিবেন, এরূপও শোনা যায়। এই কন্‌গ্রেসের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে ১৬ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার অপরাহ্নে যে বৈঠক হইবে তাহার আলোচ্য বিষয়:—Brotherhood and the Fight Against Venereal Disease. ইহা হইতেই ব্যাপারটা

কতটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেবল ইংরাজকে নয়, কিন্তু ইউরোপের সমুদায় লোককে এই পাঁচ বৎসরের যুদ্ধের ভীষণ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইতেছে। আর কেবল যুদ্ধেরই বা বলি কেন? শত শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপ যে কাম দেবতার ভজনা করিয়া আসিয়াছে, স্বাধীনতার নামে যে অসংযমের, রসের ভাণ করিয়া যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগের পথে চলিয়াছে, এখন তাহারই কর্ম্মভোগ করিতেছে। ইউরোপের সমাজ-সমস্যা এ সকলে মিলিয়া কতটা যে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভাবিলে ভবিষ্যতের বড় আশা ভরসার আশ্রয় থাকে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অপরাধের টান।

কামনায় যাহা পাইনি গো তাহা
অযাচিত ধন পেয়েছি,—
যার দিয়া থাকি মন চাঁদে নাকি
জনম জনম চেয়েছি।
জগতের নাটে এই ঘাটে ঘাটে
ঘরের বিফল কাজে,
(নিতি) গোপন কি রস ছিনুরে বিবশ
অচেনা প্রেমের লাজে।
(করি) এ ঘর বাহির যমুনারি তীর
যত রে জলকে যাই,
প্রমের হেলায় দুখ কামনায়
(যেন) বুক ভরে কারে পাই।
(সখি) তিল তুলসী কে দিয়েছে আসি
কে তার নিয়েছে নাম?
বিমুখ আমার করমেরি ভার
(ওগো) শুধু তা' মিলাল শ্যাম।
পতাপতি মোর দুখ আঁখিলোর,
(যত) সংসার বহন ছিল,

যা' করেছি সব হয়ে পূজা জপ
বঁধুরে বরিয়া নিল।
এই জীবনে আছে, সে মোরে পেয়েছে
নিতি করি অন্বেষণ—
(এ) লীলাটি ভরিয়া স্মরিয়া-স্মরিয়া
(তার) এ নামে বংশীবাদন।
(আমি তো) রহিনু পাসরি, কানু কানু করি
(মোর) সে ভুল টানিল তায়।
(পলাতে) চরণ নূপুর বাধা বাধা সুর
ভুলিয়া তারে ভুলায়।
(আমার) মানা যে মানে না সাধ্য সাধনা
(তার) এ শুধু আপনি করে।
এত অনাদর সব রোষ মোর
কেন তার মন হরে?
(আমার) ধরম করম সব আচরণ
কি করিতে কিবা হয়!—
অকাজে সুকাজে গরবে গো লাজে
কেবলি তাহারি জয়।

ঠিকে ভুল।

১লা ফাল্গুন—আবার নবীন বসন্ত আসিয়াছে। আম্র মুকুলের গন্ধ বহিয়া নব নব কিশলয় গুলি দোলাইয়া সেই চিরপরিচিত দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। প্রকৃতিরাণী ফুল সাজে সজ্জিতা হইয়া ঋতুরাজকে ডাকিয়া কাছে বসাইবার জন্য আপনার শ্যামল অঞ্চলখানি বিছাইয়া দিয়াছে। নব বসন্তের সাড়া পাইয়া কত সুদূর দেশ হইতে অজানা পাখীগুলি আসিয়া মনহরা সুরে বসন্ত আবাহন গাহিতে ব্যস্ত। আজ মনটা যেন ঘরে থাকিতে চাহে না,—আমার মন যে আজ কোথায় উদাস হইয়া যাইতে চাহে তা'

বলিয়া 'আর কি হইবে? এ দুয়ার একবার খুলিলে বন্ধ করা কঠিন হইবে। থাক্, ওগো, রুদ্ধ হইয়া থাক্। আজ এই মধুদিনের সূর্য্যোদয়ে আমার প্রবাসী প্রিয়ের হস্তচিহ্নভরা প্রীতিপূর্ণ একখানি চিঠির আশা। সে হাতের সে লেখাগুলি আমার নিকটে কত যে জীবন্ত তাহা আমি ছাড়া আর এমন করিয়া কে জানে? সে অক্ষর গুলি তো তাঁহারই অজস্র প্রেমমগ্ন আধমেলা নয়ন দুইটীর নীরব সম্ভাষণ। আজ দীর্ঘ সুদীর্ঘ একটা বছর আমাদের চিঠি লিখিয়া চিঠি পড়িয়া কাটিয়া যাইতেছে। কু'ক্ষণে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী ডাক্তার হইয়াছিলেন, তাই ছুটী নাই। হায়, সদাশয় ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের কি ঘরে স্ত্রী নাই? তারা কি বিরহবিধুরা দশায় তোমাদের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না? মিলনের আশায় এ মরুশুষ্ক হৃদয়কে আর কত সজীব রাখিব? এ যে বিরহের তাপে বৃন্তচ্যুত এ ফুল যে শুকাইয়া যাইতেছে। আমার তাপদগ্ধ হৃদয়ে স্নিগ্ধ সব-জুড়ান জ্যোৎস্নালোক যে তাঁহার চিঠি, অন্ধকারে যে আলোক রেখা। সেই চিঠির আশায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের এ আকুলতা, এ উচ্ছ্বাস। তাই "মনের কথা আমার" (ডায়েরী), এ গোপন হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস সমস্ত দিন বসিয়া তোমার বুকে প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া সংসারের যে আরও কাজ আছে। ঝড়ুয়া ডাকিয়া গেল, এইবার উঠি।

২রা—আজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠিয়াই তাঁর চিঠি পাইয়াছি। এ যে বড় আদরের, বড় আনন্দের জিনিস; এবার তাঁর এ চিঠিখানি আরও আনন্দময়, এ যেন আনন্দ ধাম হইতে আনন্দ সাগরে স্নান করিয়া আনন্দ গীতি গাহিতে আসিয়াছে। আমার প্রিয়তম শীঘ্র আসিবেন। এ কথাটী বহন করিয়া মানুষ দূত আসিলে আমার অর্থবিত্ত সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতাম, কিন্তু এ যে চিঠি! ইহাকে কি দিব? আমার উৎসুক নয়নের নীরব দৃষ্টি দিয়ে ইহাকে অভ্যর্থনা করে—আমার জ্যাকেটের নীচে যেখানে তাঁর সাথে মিলনের আশায় এত স্পন্দন এত আকুলিব্যাকুলি সেইখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। ঠুনি ঠাকুরঝি অনেক খুঁজিয়া সমস্ত ঘরটা খানাতল্লাস করিয়া তার দেখা না পাইয়া রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। সে ত জানে না—আমার প্রিয়তমের অজস্র ভালবাসা মাখা চিঠিটা আমার কোথায় লুকান আছে।

৩রা—সোনাপুর থেকে নরেশ ঠাকুরপো আমাদের সকলকে নিতে

আসিয়াছেন। দশই ফাল্গুন তাহার বিবাহ, এ বিয়েতে আমাদের সকলকেই যাইতে হইবে। শুনিয়া ভয় হইতেছে—তিনি যে শীঘ্র বাড়ী আসিতে চাহিয়াছেন। এতদিনের পর বাড়ী আসিয়া যদি কাউকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে তাঁর মনটা কেমন হইয়া যাইবে? আবার বিয়েটা দেখারও বড় লোভ হইতেছে। সেখানে আমার কত বাল্যসখীদের সহিত দেখা হইবে, কিন্তু কোন আনন্দই আমার সে প্রিয়সন্দর্শনের সাথে তুলনা হইতে পারে কি? তিনি যে আমার অতুলনীয়।

৫ই—ভাই "মনের কথা", কাল সমস্ত দিনটার ভিতরে একবারও তোমার সাথে দেখা করিতে পারি নাই, রাগ করিও না। কাল বড়ই ব্যস্ততায় দিন কাটিয়া গিয়াছে, নরেশ ঠাকুরপোর সাথে মা টুনী ঠাকুরঝিকে লইয়া সোনাপুর চলিয়া গিয়াছেন। নরেশ ঠাকুরপো আমাকে লইয়া যাইবার জন্য খুব আগ্রহ করিতেছিলেন কিন্তু মা রাজী হইলেন না, সেই জন্য আমার যাওয়া হইল না। মা বলিলেন "বউমার আর যাওয়া হইবে কেমন করিয়া, আমি না গেলে দাদা রাগ করিবেন, তাই টুনীকে নিয়ে ঘুরে আসি, অজিনের শীঘ্র আসিবার কথা আছে, বউমা বাড়ীতেই থাকুক"। মা গেলেন, ভাই বোনরা গেল; আমি বাড়ী থাকিয়াই যেন তাঁর মা বোন আত্মীয় স্বজন সকলের অভাব পূর্ণ করিতে পারিব। মার কথায় বড় লজ্জা হইতেছে।

দিদিমা আমার পাহারায় রহিলেন, থাকো ঝিটা পর্য্যন্ত কান্নাকাটি করিয়া মার সঙ্গে গেল। খালি বাড়ীতে আজ দিদিমার উপহাসের স্রোতটা আরও বেশী বেগে বহিতেছে। দিদিমা কিন্তু সেকালের মানুষ, তবুও তাঁর সাথে কাহারও পারিয়া উঠিবার উপায় নাই। আমি দিদিমার কথা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই, একটা জলজীয়ন্ত সতীন নিয়ে ঘর করিয়াও দিদিমার হাসির উৎস শুকায় না। আমরা হইলে বোধ হয় এক দিনের তরে সহিতে পারিতাম না। যা হ'ক্ ধন্য মেয়ে, বাপু। ঐ শোন দিদিমা রেণ্ রেণ্ করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, দিবা রাত্র এত ডাকা কেন বাপু?

৬ই—কাল দিদিমার কোলের কাছে শুইয়া দাদা মহাশয়ের গল্প শুনিতে শুনিতে অনেক রাত্রি জাগিয়াছিলাম। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিতে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখি নন্দ ঠাকুরের তখনও শুভাগমন হয় নাই, উনুন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আজ মা বাড়ীতে নাই, বীরু ঠাকুরপোও বাড়ী ছাড়া, কাজেই নন্দ ঠাকুরকে পায় কে? নন্দ ঠাকুরের কল্যাণে আজ

আমাকেই অন্নপূর্ণা হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অন্ন যা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার পরিচয়টা আমি নিজে নাই দিলাম। সরকার কাকা চক্ষু লজ্জার খাতিরে ভাত সম্মুখে করিয়া নন্দ ঠাকুরের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে ছিলেন, আর ঝড়ুয়া "হামারা আজ বদ্ হজমী হোগা" বলিয়া থালা শুদ্ধ ভাত রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দিদিমার নিরামিষ তরকারি আর কুলের আচারে এ যাত্রা দারুণ ক্ষুধার হাত হইতে প্রাণ রক্ষা হইল। মেয়েছেলে হইয়া রান্না জানি না কি লজ্জার কথা, এইবার রেশম পশম চুলোয় যাক্, রান্না শিখিতে হইবে। সন্ধ্যা বেলা চোরের মত গুটি গুটি পায়ে নন্দ ঠাকুরকে রান্না ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া বলিলাম "ও বেলা এস নাই কেন?" সে অম্লান বদনে বলিল, "মার মরা খবর পেয়েছিনু কি না তাই গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিনু, মা"। আমি বলিলাম "দুই মাস আগে না তোমার মা একবার মরেছিল?" নন্দ উত্তর করিল "আমার ত আর একটা মা নয়"। তা তো ঠিকই, তার বাপ তো আর খৃষ্টান নয় যে বহু বিবাহের সুখ সুবিধায় বঞ্চিত।

৭ই—খালি বাড়ীতে দিদিমার সাথে গল্প করিয়া সময় যেন কাটিতে চাহে না। নরেশ ঠাকুরপোর বিয়ের আরও তিন চারদিন বাকি, উনি ত 'শীঘ্র' আসিতে চাহিয়া একেবারে চুপ, "শীঘ্র" যেন আর আসিতে চাহে না। দিদিমার রসিকতায় অস্থির হইয়া উঠিতেছি। আজ দুপুর বেলা দিদিমার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছিলাম, দিদিমা বলিলেন "বেণু তোর মুখটা এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন? মনটা বুঝি ভাল নাই?" আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "কেন দিদিমা, ও কথা বলছ কেন? দিদিমা প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বোম্বের মেয়েদের পর্দা নাই জানিস ত?" "তাতে কি হয়েছে দিদিমা"? আমি এই কথা বলিয়া দিদিমার পাকা চুল তুলিতে আমার ভয়ত্রস্ত মনটাকে আরও নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। দিদিমা বলিলেন "হবে আবার কি? তোর রসরাজ যে জাল ছিঁড়েছেলো, তাই ছুটী নাই। তুই নিশ্চয় জানিস্ ও একটা মহারাষ্ট্রী কি গুজরাটী না নিয়ে ফিরছে না। অহিন ত তার ঠাকুরদাদারই নাতী"। আমি চেষ্টা করেও দিদিমার পরিহাসের উত্তর দিতে পারিলাম না। দিদিমার কি সর্ব্বনেশে কথা। দীর্ঘ এক বছর বোম্বে গিয়াছেন, কে জানে সেখানে কি লইয়া আছেন? স্ত্রীলোকের মনের ও জীবনের পরিধি বড় ক্ষুদ্র, তাই এত সন্দেহ, সম্বলের মধ্যে একটু 'যা আছে তা'

হারাইবার এত ভয়। আজি বার বার করিয়া কত কথাই মনে আসিতেছে, কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না।

৮ই—আজও প্রভাতের অরুণোদয়ের সাথে সাথে একটা আশা লইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার আশালতাকে হৃদয় হইতে পথের ধূলিতে বিসর্জ্জন দিয়াছি। তাঁর কোনই খবর নাই। শুনিতেছি বোম্বে মহামারীতে শত শত লোক চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতেছে। মাগো! বাবা গো! আমার যে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তিনি আসুন বা না আসুন দুই ছত্র চিঠিতে তাঁর মঙ্গল সংবাদ পাইলেই যে বাঁচি। কটক হইতে বাবা পত্র লিখিয়াছেন মার বড় জ্বর হইয়াছে। মনটা তাই আরও অস্থির। স্বামী সুদূর বোম্বেয় আত্মীয় বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিসের আশায় এত দীর্ঘ দিবা দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। মা, বাবা ভাই বোনরা সব কটকে, আমি শুধু এইখানে বিষাদের অশ্রু চক্ষে লুকাইয়া আমার সর্ব্বস্ব ধনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

৯ই—আজ বিকাল বেলা ও বাড়ীর সতী দিদি আসিয়াছিলেন, আমি খালি বাড়ীতে চুপটি করিয়া থাকি বলিয়া দিদিমা দিদিকে ডাকাইয়াছিলেন। সতী দিদিকে আমার বড় ভাল লাগে। কি উপাদানে দিদিকে যে ভগবান গড়িয়াছেন আমি শুধু তাই ভাবি। এ জগতের মানুষ কি এমন হইতে পারে গা? আহা, সতী দিদি ভাগ্যদেবতার দ্বারা বড় বিড়ম্বিতা, সে বিষাদ প্রতিমার মুখের দিকে চাহিতেই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। স্বামী বিবাহের অনতিকাল পরে পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন সংসার লইয়া সুখী হইয়াছেন, ভ্রমেও দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন না। কিন্তু তবুও দিদির কি ভালবাসা, কি ভক্তি, স্নেহ! এ মর জগতে এ আপনাভোলা প্রেমের উপমা হয় না। স্বামীর উপেক্ষিতা হইয়া সংসারের নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও দিদি সেই খানেই স্বামী-গৃহে থাকিতে চায়। বাপ মা কত বলিয়া কহিয়া কয়েকটা দিনের জন্য এবার এখানে আনিয়াছেন। আমি বলিলাম "তুমি বল্লেই আবার সেখানে যেতে চাও, এমন স্বামী! তোমার কি রাগ হয় না দিদি?" দিদি একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "তোরা তাঁকে যতটা নিষ্ঠুর মনে করিস তিনি তা নয় বোন, তাঁর অমতে আমার শ্বশুর তাঁকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন —তাই তিনি—তা'হোক, তাতে কি হয়েছে? তিনি যে অন্যকে নিয়ে সুখী হয়েছেন এতেই আমার সুখ। তাদের সেবা করে, তাদের সুখ সচ্ছন্দ চোখে

দেখেই আমি সুখী হই, রেণু। তাঁর মুখ ছাড়া আমার কামনার আর কি থাকতে পারে, বোন?" আমি বলিলাম "দিদি, যে তোমার এমন সুন্দর আশা পূর্ণ জীবনটী ব্যর্থ বিফল করে দিল তার সুখ সুখ করে তুমি বলেই পাগল হও। যে তোমাকে শুধু ভাল বাসতে পারে নাই নয়, তোমার গলায় সতীনের মত পাষাণ বেঁধে তোমার ভরাডুবি করেছে, তুমি বলেই তাকে ভালবাস"। আমার কথায় বাধা দিয়ে দিদি ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন "তাঁর দোষ দিস্ না, রেণু, তিনি আমাকে ভাল বাসিতে পারেন নাই, এ আমার অদৃষ্টের দোষ। সে সুখ ভগবান আমার অদৃষ্টে লেখেন নাই, তা কি করে হবে? তবুও আমি সুখী, বোন, তাঁর সুখ চক্ষুতে দেখেই আমার জীবন সব চেয়ে সফল হয়েছে।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া হিন্দুর সমাজের এই মহিমাময়ী কামনাশূন্যা দেবী প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিস্ময়বশে পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধন্য হইতেও ভুলিয়া গেলাম। বাপ মার 'সতী' নাম রাখা সার্থক হইয়াছে বটে। এমন সতী শুধু ভারতেই হইত, আর আজও যে হয় তাই এত দূরে পড়িয়াও এদেশ এত বড়।

১০ই—আজ নরেশ ঠাকুরপোর বিয়ের দিন, এই দশই ফাল্গুন আমারও বিয়ের তারিখ। আজ বারবার করিয়া আমার সেই অতীত জীবনের কথাগুলি হৃদয় দুয়ারে কি সুখেরই আঘাত করিতেছে। দুই বছর পূর্ব্বের সেই বাসন্তী সন্ধ্যাটী আজ আমার মনের ভিতরে তার সমস্ত রস মাধুর্য্য লইয়া উপস্থিত। সে দিনের মত আজ এ সন্ধ্যাটী বড় মধুর বড় মনোরম—চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল। অন্ধকার তরুশ্রেণীর মধ্য হইতে সে দিনের মত আজও শুক্ল পক্ষের উজ্জ্বল চাঁদ রূপার থালার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বসন্তের মৃদু সমীরণটুকু বেলফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ গায়ে মাখিয়া সেদিনেরই মত আজও অভিসারে পাগল। কিন্তু সেদিনের মত আজ আর তাহার স্পর্শে তো সে মাদকতা নাই। আজ মনে পড়িতেছে বাল্যের শত স্মৃতি ভরা পিতৃভবনের কত চিত্র। বাবা, মার স্নেহভরা আনন্দপূর্ণ মুখচ্ছবি, আত্মীয় বন্ধুদের কলহাস্য, সেই সানাইয়ের আসন্ন-বিদায়-করুণ রাগললিত ঝিঙ্কার মধ্যে একটী চন্দনে চর্চ্চিত তরুণ মুখের কোমল দৃষ্টি, আমার হৃদয় মাঝে আজও তা' তেমনি তেমনি চিরাঙ্কিত। যার শুভসমাগমে আমাদের বৃহৎ ভবনটীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল কত হাস্য কৌতুকে গৃহখানি মুখরিত হইয়াছিল আজ বার বার করিয়া সেই নব পরিচিত নবীন অতিথির স্নিগ্ধ নয়ন দুইটীর

মধুর দৃষ্টি মনে পড়িতেছে। আমার মুকুলিত হৃদয়ে যে দেব মূর্ত্তির আলেখ্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল আজ যেন সে মূর্ত্তিটী আরও উজ্জ্বল হইয়া আরও মধুরতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর ঘরে গিয়া আজ সে দিনের সেই কথাগুলি স্মরণ করিয়া আমার ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিয়া আসিলাম। আমার সেই স্বাগত মধু দিনটি অনন্ত রসময়েরই জীবন্ত বিগ্রহ, আমি কেবল এই ইষ্টেরই পূজারী।

১১ই—দুপুর বেলা দিদিমার রান্নার কুটনা কুটিতেছিলাম। বাইরে গোলমাল শুনিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একখানা বোম্বাই গাড়ী আসিয়া আমাদের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী থামিতেই তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। চক্ষু আমার জুড়াইয়া গেল, আহা! ওগো, আজ দেখ হৃদয় আমার কেমন শীতল হইল। আনন্দের আবেশে আমার ভাবনদী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ও কি? এ কে? একটী পোনর যোল বছরের মেয়ে তাঁর পশ্চাতে নামিয়া আসিল। মেয়েটী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা, তার সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু শুকতারার মত জ্বলজ্বল করিতেছিল। মেয়েটীর সুন্দর মুখের মৃদু হাসিটুকু আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। কে আমার স্বামীর সাথে সেই সুদূর বোম্বাই হইতে আসিতে পারে? কাহারও কথা মনে হইল না। হঠাৎ স্বপ্নের মত দিদিমার সে দিনের কথাগুলি মনে পড়িল, দিদিমা যা' বলিয়াছিলেন এ বুঝি তাই হইল। আমার কপাল বুঝি পুড়িল। তা ছাড়া আর কি সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু এখন উপায় কি? আমি কেমন করিয়া এমন স্বামীকে মুখ দেখাইব? চিন্তার অবকাশ কোথায়? দিদিমার ঘরে তাঁহার উচ্চ হাসি শুনিতে পাইলাম, দিদিমা বলিতেছিলেন "রেণু যে 'সতীন' সইতে পারে না অহিন, তুই সেই সতীনই এনেছিস্"। তাঁর কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনুমানেই আমার যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইলাম। কতক্ষণ পর চাহিয়া দেখি তিনি আমার ঘরের দিকেই আসিতেছেন। পশ্চাতে সেই মেয়েটী সলজ্জ প্রফুল্ল মুখে আসিতেছে। তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "কুন্দকে শীগ্‌গির খেতে দাও, ও রাত থেকে কিছু খায় নাই।" পরে মেয়েটীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কুন্দ, ইনিই তোমার দিদি"। মেয়েটী নত হইয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল, তিনি হাসিভরা মুখে আমার দিকে চাহিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি কুন্দর স্নানাহারের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলাম।

আমার বড় ভয় হইতেছিল পাছে ইহার সম্মুখেই আমার হৃদয়ের সব জ্বালা প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্বামীর উপর যত ভালবাসা, যত প্রীতি কেমন করিয়া যেন এক নিমিষেই দারুণ বিদ্বেষে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এই স্বামী'— ইহারি জন্য আমার কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করা? কত আশাপূর্ণ নয়নে সুদূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াছিলাম, হায়, ইহাকেই এত ভালবাসা এত পূজা? আমার সেই অসীম, অনন্ত প্রেমের কি এই প্রতিদান? নাম 'কুন্দ,'—মরণ আর কি? এ যেন বঙ্কিমবাবুর দ্বিতীয় "বিষ বৃক্ষের" অবতারণা। বুকের ভিতরে অজস্র অশ্রু আকুলি বিকুলি করিতেছিল। সমস্ত দিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যা বেলা কি কাজে যেন আমার ঘরে যাইয়া দেখি তিনি চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন "রেণু, তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন? শরীর তো ভাল আছে?" আমি কোন উত্তর না দিয়া ঘর ছাড়িয়া আসিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "রেণু, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কুন্দ কোথায়? তার কথা"—আমি তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। দিদিমার ঘরের দিকে যাইতে দেখিলাম, কুন্দ তাঁহার পাকাচুল তোলায় লাগিয়া গিয়াছে। এ বাড়ীতে আসিয়া এই কাজটী বরাবর আমার হাতেই ছিল, আজ দেখিতেছি সেখানেও অন্যের অধিকারের বিজয় পতাকা। প্রতিদিন দিদিমা রেণু, রেণু, করিয়া উতলা হইয়া উঠেন, আজ দিদিমারও দেখিতেছি রেণুর খবরের দরকার নাই। কোথায় যাইব? কোথায় জুড়াইব? আমার স্থির হইবার ঠাঁই কোথায়? একবার মনে ভাবিলাম তাঁহার কাছে যাইয়া তাঁহার কুন্দ লাভের কথাটা সবিস্তারে শুনিয়া আসি, কিন্তু সে কঠিন কাজ পারিলাম না। অনুমানেই বুঝিলাম কুন্দ লাভ করা তাঁহার ডাক্তারী বিদ্যারই ফল। হয় ত কুন্দর আর কেহ ছিল না। তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় ডাক্তারের হাতে মেয়েটীকে অর্পণ করিয়া দিব্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন, আর কর্ত্তব্যপরায়ণ ডাক্তার তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। এ কথা আর নূতন করিয়া শুনিয়া কি হইবে? উপন্যাসে যথেষ্ট জানা আছে। রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বীরু ঠাকুরপোর পড়িবার ঘরে তেতালার নিভৃত কক্ষে দরজা বন্ধ করিবার পর কোথা হইতে যেন বন্যার স্রোতের মত অশ্রুজলে আমার দুই চোখে ধারা ছুটিল, কিছুতেই সে অজস্র অনাহত অশ্রুস্রোতকে, বাধা

দিতে পারিলাম না। কতক্ষণ পর মন কিছু শান্ত হইলে কাগজ কলম লইয়া মাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম, কিন্তু কাগজের পর কাগজ চক্ষুর জলে নষ্ট করিয়াও মাকে একখানি চিঠি লেখা ঘটিয়া উঠিল না। জানি না কত রাত্রে আমার বন্ধ দুয়ারে শব্দ হইল এবং মৃদুস্বরে ডাক আসিল "রেণু দুয়ার খুলিয়া দাও"। আমি আলো নিভাইয়া কাঠের মতন শক্ত হইয়া তেমনি বসিয়া রহিলাম। তাঁর ব্যথিত কণ্ঠের অনেক কথাই আমার কাণে আঘাত করিতেছিল, কিন্তু আমি অটল হইয়াই রহিলাম। সিঁড়িতে মৃদু মন্দ জুতার শব্দ ধীরে মিলাইয়া গেল। আমি দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িলাম। পাশের বাড়ীতে টুনী ঠাকুরঝির সই বিভা সেতারের সুরে সুর মিলাইয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল "আর কেন, আর কেন, দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ"।

১২ই—প্রভাতের সর্ব্বযাতনাহর স্নিগ্ধ সমীরণ স্পর্শে আমার প্রাণের জ্বালা অনেকটা জুড়াইয়া গেল। আজ প্রথমেই সতী দিদির কথা মনে পড়িতেছিল। আজ বড় সাধ হইতেছে সতী দিদির পায়ের কাছে বসিয়া তাহার নিষ্কাম ব্রতের দীক্ষা লই। কি করিলে সতী দিদির মত হওয়া যায়? আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া ঝড়ুয়া ডাকিল "মায়ী, চিঠ্‌ঠি"। চিঠি হাতে লইয়া দেখি এ তাঁর লেখা চিঠি, চার দিন আগে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এ চিঠিটা বাহিরের ঘরে তক্তপোষের নীচে পড়িয়াছিল। আজ তাঁর আদেশে ঘর সাফ করিবার সময় পলাতক চিঠিটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বুঝিলাম জানলা দিয়া চিঠি খানা ফেলিয়া দিয়াই পিয়ন তার কাজ শেষ করিয়া গিয়াছে, আর কর্ত্তব্যপরায়ণ চাকরদের এদিকে খবর লওয়ার কোনই দরকার হয় নাই। চিঠিটা একবারে না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কাজে অতটা পারিয়া উঠিলাম না। চিঠি খুলিয়া পড়িলাম, লেখা আছে।

"রেণু আমার,—

ইহার আগে যে চিঠি লিখিয়াছি তাহাতেই জানিতে পারিয়াছ আমি শীঘ্র যাইতেছি। পরশু দিন রওনা হইব স্থির করিয়াছি। দুই মাসের ছুটীও লইয়াছি, ইহার পর আর এখানে আসিতে হইবে না। কলিকাতার কাছেই এবার থাকিতে পারিব, কাজেই আমাকে আর লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিতে হইবে না, বুঝিলে রেণু? তোমার কাকা কৈলাস বাবুর মেয়ে কুন্দ তার স্বামী

ধীরেনের সাথে এখানে আসিয়াছে। ধীরেন পুণায় বদলি হইল, তাই কুন্দকে আমার সাথে তোমার কাছে পাঠাইতেছে। ধীরেন পুণায় বাসা ঠিক করিয়া কুন্দকে লইয়া যাইবে। কুন্দ তোমাকে দেখিবার জন্য খুব ব্যাকুল। আমার ভারী ইচ্ছা হইতে ছিল কুন্দর কথা আগে তোমার কাছে কিছুই না লিখিয়া একেবারে লইয়া গিয়া চমকাইয়া দিব, কিন্তু অত সাহস রাখিতে পারিলাম না। তুমি হয় ত স্বামীর সাথে বোনকে দেখিয়াই মূর্চ্ছা যাইবে। তোমাদের অসাধ্য কাজ নাই, তাই সব খুলিয়া লিখিলাম। আমি ভাল আছি। আজ আর বড় চিঠি লিখিবার দরকার নাই, কেমন রেণু? ইতি—

জীবনে মরণে
তোমারই মহিন।

ওগো আমি এ কালো মুখ কোথায় লুকাইব? এ পাপ সন্দেহের কথা কেমন করিয়া তাঁহার কাছে কহিব? কুন্দর কাছেই বা কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাইব? কাকার মেয়ের নাম ত মন্তু বলিয়াই আমরা জানিতাম। কাকা চিরকালই দূর বিদেশে চাকুরী করিতেন, তাই তাঁহার সহিত আমাদের সর্ব্বদা দেখাশুনা হইত না, ছয় সাত বছর পূর্ব্বে কুন্দকে দেখিয়াছিলাম, তখন উহাকে সকলে "মিন্থু" বলিয়া ডাকিত। তাঁহার উপর ভারী রাগ হইতে লাগিল, কেন আমাকে আগে বলেন নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম তাঁর এতটুকু দোষও নাই। তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, কুন্দর কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমিই ত অভিমানের জ্বালায় চলিয়া আসিয়াছিলাম। ছিঃ ছিঃ, আমি এত ছোট, এত ক্ষুদ্র আমার মন। কোন্ মুখে কেমন করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইব? চাহিয়া দেখি তিনি আসিতেছেন। ঘরে ঢুকিয়া বেদনাকাতর স্বরে কহিলেন "রেণু, তোমার কি হ'লো আমায় খুলে বল, এত দিন পর বাড়ী এসে তোমার এমন ব্যবহার সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই তা' তো তুমি জান।" আমি কোন কিছু না কহিয়া তাঁহার দুটী পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলাম। আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রু জলে তাঁহার পা' দুটী সিক্ত হইয়া গেল। তিনি আমার মাথাটী তাঁহার বুকের উপর তুলিয়া লইলেন, আমার হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। তিনি চিঠিটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া অভিমানজড়িত কণ্ঠে কহিলেন। "এত অবিশ্বাস রেণু! তুমি যা সন্দেহ করেছ, আজ সকালে এ চিঠি দেখেই আমি

বুঝেছি"। আমি কোন মতে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া কহিলাম "আমাকে ক্ষমা কর।"

তিনি আমার মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাইতে হবে না রেণু, তোমার কোন অপরাধ আমার কাছে দাঁড়াতে পারে না। কুন্দর কাছে একবার ক্ষমা চেয়ো।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

অন্ন ব্রহ্ম।

যে ভারতবর্ষ একদিন শুধু আত্মাকে লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিল, আজ সে অন্নকেই লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মাই একমাত্র সত্য, আত্মাকেই জান, আর সকল কথা ছাড়িয়া দাও—একদিন বুক ফুলাইয়া সে এই মন্ত্র প্রচার করিতে দৃক্‌পাত করে নাই, আজ কিন্তু দেখিতেছি সব ভুলিয়া সে 'কোথায় অন্ন' 'কোথায় অন্ন' করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। হরিবাসরের, উপবাসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে এক দিন আমাদের কোনই কষ্ট হয় নাই, আজ কিন্তু সেই দগ্ধোদরের পূর্ত্তিই হইয়া উঠিয়াছে আমাদের চতুর্ব্বর্গ। কি অধঃপতন, নয় কি? সে গৌরবের আধ্যাত্মিকতার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা হইয়া পড়িয়াছি ঘোর জড়বাদী। O tempora, O mores; হায়রে, তে হি নো দিবসা গতাঃ —

কিন্তু কেন এমন হইল? বাস্তবিকই কি ইহা অধঃপতন? এই অধঃপতনের অন্তরে কি ঊর্দ্ধে আরোহণের কোন ইঙ্গিত নাই? দেশে আমাদের আধ্যাত্মিকতার দিনে প্রচুর অন্নসংস্থান ছিল কিনা, আজ সে অন্নের তিরোধান হইতেছে কিনা বা কি রকমে—এই সব প্রশ্ন আমরা তুলিব না, অর্থতত্ত্বের দিক হইতে

আমরা কোন সমস্যা তুলিতেছি না। তুলিতেছি আমাদের মনস্তত্ত্বের— অধ্যাত্মেরই দিক হইতে।

আত্মাকে ছাড়িয়া আজ যে আমরা অন্নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছি, ইহার আর সব কারণ যাহাই হউক, ইহার মূল—আধ্যাত্মিক—কারণ এই যে, এক দিন অন্নকে ছাড়িয়া আমরা আত্মারই দিকে অতিমাত্র ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ—ক্ষতিপূরণের দাবী। পাশ্চাত্যের এক মনীষি-এমার্সন এই তথ্যটির বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন. তাঁহার কথাতেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। মানুষ উন্নতির বা বিবর্ত্তনের পথে চলিতে চলিতে যদি কোন সত্যকে ডিঙ্গাইয়া অগ্রসর হইয়া যায়, তবে তাহাকে ফিরিয়া সেই পরিত্যক্ত সত্যটি কুড়াইয়া লইয়া আবার চলিতে হয়—ইতিহাসে ইহারই নাম দেয় বিপ্লব (Revolution)। প্রকৃতিকে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না, তাহার প্রতি স্তরের সত্যকে মানিয়া ক্রম করিয়া তবে উপরে উঠা দরকার, নতুবা এই উপরে উঠা কোন রকমেই পাকা বা স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষ আজ এই কথাটিকেই প্রমাণিত করিতেছে। অন্নকে প্রেয় বলিয়া সে হেয় জ্ঞান করিয়াছিল, নিম্ন বা অধম স্তরের সত্য বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়াছিল আত্মার স্বরূপের দিকে, তাই আজ তাহাকে ফিরিয়া আবার অন্নের ব্রহ্মত্বকে স্বীকার করিতে হইতেছে। নৈদং যদ্ উপাসতে—সত্য কথা, কিন্তু ফিরিয়া ঐ জ্ঞান লইয়াই যখন আবার বলিতে পারিবে ইদং যদ্ উপাসতে'—ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, তখনই হইতেছে পূর্ণজ্ঞান।

অন্নও ব্রহ্ম—এ শুধু পশুর উপলব্ধি নহে, ইহা দেবতারও উপলব্ধি, ইহা আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষেরও মুখে শোভা পাইতে পারে। অন্নের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন নিগূঢ় ভাবে, সর্ব্বভূতে যেমন সেই রকম অন্নেরও অন্তরে আছেন সৎ-চিৎ-আনন্দ—এই হিসাবে নয়, সাধারণ ভাবে অন্নেও ব্রহ্মপুরুষ অধিষ্ঠান করিতেছেন, ভারতবর্ষ এ কথা কখনও অস্বীকার করে নাই, তাহার অভাবই এইখানে যে শুধু এই কথাটিকেই সে জোর করিয়া বলিয়াছে, কিন্তু যে কথাটি তাহার প্রাণে প্রাণে লাগে নাই তাহা এই যে, অন্নের যে বিশেষ রূপ, তাহার যে পার্থিব রস, সেটিও পরমার্থই, ব্রহ্মই। অন্নের অভ্যন্তরে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি অর্দ্ধেক সত্যের উপলব্ধি. পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হইতেছে তখন যখন অন্নের ব্যবহারিক মূর্ত্তিকে বাদ দিয়া নয় বিলোপ করিয়া নয়, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া তাহার সবখানি তাহার অন্তর বাহিরকে ব্রহ্মত্বে মণ্ডিত করিতে পারি।

সুপ্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মদৃষ্টি স্বরূপ ছিল যে উপনিষদ তাহা এক দিন এই ভাবেরই একটা কথা বলিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহে দারুণ কষ্টে ব্রহ্মচর্য্যসাধন করিয়া, সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন, পিতার নিকট আসিয়া অবশিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বেরও শিক্ষা করিলেন। এক দিন আরুণি শ্বেতকেতুকে পরীক্ষা করিবার জন্য—অথবা হয়ত তাহাকে চরম শিক্ষাটি দিবার জন্যই ডাকিয়া বলিলেন, "শ্বেতকেতু, পঞ্চদশ দিন অভুক্ত থাকিয়া ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও"। শ্বেতকেতু তাহাই করিল, অভুক্ত অবস্থায় ষোড়শ দিনে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। আরুণি শ্বেতকেতুকে তখন ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের কথা বলিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু উত্তর করিল, "আমার সে সব কিছুই মনে পড়ে না।" আরুণি তখন শ্বেতকেতুকে খাইয়া আসিতে বলিলেন, আহারের পর শ্বেতকেতুকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হউক না কেন; সে তৎসমস্তেরই যথাযথ উত্তর দিল। আরুণি তখন বলিলেন, "শ্বেতকেতু! পুরুষের আছে ষোলটি কলা, পনর দিন তুমি অনাহারে ছিলে, তাই একে একে সেই ষোল কলার পনরটি তোমার লোপ পাইয়াছিল। ইন্ধনের অভাবে প্রজ্বলিত অগ্নি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যখন খদ্যোতের মত হইয়া পড়ে তখন সেই অগ্নি সব কিছু জিনিষ দগ্ধ করিতে পারে না, খদ্যোতের অনুরূপই হয় তাহার শক্তি, আবার ইন্ধন পাইলে সেই খদ্যোতপ্রায় অঙ্গার সর্ব্বশক্তিমান হুতাশন হইয়া উঠে। তোমারও ঠিক তাহাই হইয়াছে, ভোজনের পর লুপ্ত পনরটি কলা তোমার আবার প্রকাশিত হইয়াছে, তাই তোমার স্মৃতিতে সব ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং মনে রাখিও, এই সমস্ত আধার অন্ন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, অন্নই ইহার মূল—অশনায়েতি তত্রৈতৎ শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি, তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাৎ। ইহারই উপর ভর করিয়া, ইহারই প্রতিষ্ঠায় প্রাণে তেজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, জাগ্রত সজীব করিতে হইবে তোমার ব্রহ্মত্বকে—এবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ। এইরূপে যখন সৎপদার্থ পাইবে তখনই যথার্থতঃ বুঝিবে সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। অন্নকে বাতিল করিতে নাকচ করিতে হইবে না, অন্নকে সৎপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, সৎপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্নকে ভোগ করিবে, সৎ'এর সত্তায় অন্নকে রূপান্তরিত করিবে। 'আমি নিরপরাধী'—ইহাই সত্য বলিয়া যাহার অন্তরাত্মা জানে, সে এই সত্যাভিসন্ধের বলে তপ্ত পরশু

হাতে লইয়াও অক্ষত থাকে, ও অভিযোগ হইতে মুক্ত হয়, সেই রকম সংপ্রতিষ্ঠ পুরুষও অন্নকে প্রাণকে মনকে লইয়া খেলিতে পারে, ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হয়।" আরুণির এই উপদেশ আমরা উপনিষদের অন্যত্রও বহু পাই। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"-সংবৃত্ত যাহা ছাড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, আপনার ভিতর হইতে বাহিরে সৃষ্টি করিয়াছে,—ভগবানের প্রদত্ত ভগবৎসত্তায় মণ্ডিত করিয়া পাই আমরা যে অন্ন তাহা ভোগ করিতে হইবে। এই কথারই সমর্থন করিয়া গীতা বলিতেছেন—"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥" ভোগ বা কর্ম্ম যে বন্ধনেরই হেতু হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বরং ভোগের কর্ম্মের দ্বারাই ব্রহ্ম উপচীত হয়—শ্বেতকেতুর যেমন হইয়াছিল। তাই খ্যাতনামা গো-লোভী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মজ্ঞানেও কিছু ময়লা ধরে নাই। তাই শ্রুতি উপনিষদ বলিতেছেন অতিবাদী হইও না, একদিকের সত্যকে—আত্মাকেই একান্ত করিয়া ধরিও না, জানিও আবার প্রাণকে, আত্মরতি হও, কিন্তু সে আত্মায় আত্মার রমণ প্রাণের হিয়ার মধ্যে—কর্ম্মে ভোগে ফুটাইয়া ধর। এইটি যদি করিতে পার তবে তুমি শুধু ব্রহ্মবিৎ হইবে না, তুমি হইবে ব্রহ্মবিৎ দিগেরও মধ্যে শ্রেষ্ঠ—

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈ র্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

পশু বা একান্ত যে জড়বাদী তাহার অভাব এইখানে—সে অতিবাদী। প্রকৃত পক্ষে সে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, সে জানে অন্নকে অন্ন বলিয়াই, উদরপূর্ত্তির উপকরণ বলিয়া, আর এই অন্নময় অন্ন ছাড়া আর কিছু যে আছে বা থাকিতে পারে তাহাও তাহার বোধে বা বুদ্ধিতে আসে না। আমরাও এক দিন জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক আত্মা ছাড়া আর কিছুকে জানি নাই, পাই নাই, আমরাও জড়বাদীরই মত অন্নকে শুধু অন্নময়, উদরপূর্ত্তির উপকরণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। জড়বাদীরই মত আমরা বুঝি নাই অন্নময় অন্ন ছাড়া আছে আর এক অন্ন, অন্নেরও আছে ব্রহ্মতেজ। তাই ব্রহ্মতেজকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে, তেজ খসিয়া পড়িয়া, রহিল নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, সে ব্রহ্মও ক্রমে নির্ব্বাণ ও লয়ে মিশিয়া গেল। উপনিষদ যে 'তেজোব্রহ্মে'র কথা বলিয়াছেন, তাহা হইয়া পড়িল তমোব্রহ্ম—এই তমোব্রহ্মেরই রূপ হইতেছে যাহা

নিছক জড় বা অন্ন। অন্নকে বাদ দিয়াছিলাম, তাহাকে সমুন্নত রূপান্তর করিতে পারি নাই, তাই ফিরিয়া আজ সেই অন্নেরই মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

ব্রহ্মকে লইয়া—আর সব বাতিল করিয়া আমরা একদিন শুধু ব্রাহ্মণই হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিলাম, তাই আমরা আজ সকলে একেবারে শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু ব্রহ্মের যে আছে চারিটি অঙ্গ বা স্তর—সোঽয়ং চতুষ্পাদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই ধর্ম্ম বা শক্তি চতুষ্টয় মিলিয়াই পূর্ণব্রহ্ম। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, আমাদের সামাজিক জীবনকে যদি পরব্রহ্মের আধার করিয়া তুলিতে হয়, তবে ব্রহ্মের এই চারিটি ভাবকেই গ্রহণ ও পালন করিতে হইবে। শুধু জ্ঞানের পরিচর্য্যা করিলেই চলিবে না, আমাদের দেখাইতে হইবে ধর্ম্মে শক্তি, উৎপাদনে প্রাচুর্য্য ও কৌশল, ব্যবহারে ভোগে অক্লান্ত সামর্থ্য। জাতির অধ্যাত্ম-জীবনের সাথে চাই রাষ্ট্রশক্তি (political life), অর্থ সম্পদ (economic life), আর সুস্থ সবল স্থূলজীবন (physical life), এই ত্রয়ীর মধ্যেই অধ্যাত্মকে বিকশিত জাগ্রত করিয়া ধরিতে হইবে। এই চারিটির সম্মিলনেই পূর্ণজীবন, অর্থাৎ পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন।

যে অধঃপতন আমরা আজ আমাদের মধ্যে দেখিতেছি, যে অন্নবাদ আমাদের জীবনকে অন্তরবাহিরকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই, ভিতরে ভিতরে তাহা হইতেছে একটা পূর্ণসামঞ্জস্যের চেষ্টা, একটা মহত্তর আধ্যাত্মিকতায় উঠিবার প্রয়াস। দেশ যে আজ রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি ঐহিক লৌকিক আন্দোলনের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে, এক অন্ন সমস্যারই তাড়নায় অধ্যাত্ম সমস্যাদি পিছনে লুকাইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে অধ্যাত্ম সাধকদের ভয় করিবার কিছু নাই। এই ব্যাপারের মূল কারণ, ইহার নিগূঢ় অর্থ আমরা যেমন বুঝি, তাহা হইতেছে স্থূলের মধ্যে তুরীয়ের, অন্নের মধ্যে অধ্যাত্মের আবির্ভাব প্রয়াস। অধ্যাত্মের মধ্যে একটা চাপ, একটা নূতন প্রেরণা, অভিনব সৃষ্টিস্পন্দন ব্যবহারের লৌকিকের স্তরে দেখা দিয়াছে অন্নসমস্যারূপে। শূদ্রধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম আর ক্ষত্রধর্ম্ম মানুষের দেহ প্রাণ মন (ঋষি আরুণি কথিত 'ত্রিবৃৎ', সৎ'এর ত্রিধা ভিন্ন বিকাশ—ক্ষিতি অপ তেজ) এত দিন আমাদের ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম, আমাদের আত্মার সৎপুরুষের কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। তাই ইহারা গোপনে গোপনে শক্তিসংগ্রহ করিয়া বিপুল বেগে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদিগকে হয়ত অনেকখানি দমন বা সংযত করিতে হইবে অথবা আরও ঠিকভাবে বলিতে গেলে, ইহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া

তুলিতে হইবে। কিন্তু দমন সংযম বা শোধন অর্থে নিগ্রহ বা বর্জ্জন নহে। চর্চ্চা করিতে করিতে, কিকশিত করিতে করিতেই ইহাদের রূপান্তর করিতে হইবে। ভারতের পক্ষে সে রূপান্তর খুব কঠিন হইবে না, বোধ হয় তাহা আপনা হইতেই অনেকখানি হইবে ও হইতেছে। কারণ, যে জিনিসটি একবার আমরা অন্তরাত্মায় প্রাণে অনুভব উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা সাময়িক কোন কারণে ভুলিয়া গেলেও অতি সহজেই ফিরিয়া জাগিয়া উঠে। একবার যে বিদ্যা অধিগত করিয়াছি, আর একটি বিদ্যা শিখিবার জন্য তাহাকে কিছু দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিলেও তাহা হারায় না, সামান্য চেষ্টাতেই তাহা আবার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে। অধ্যাত্মবিদ্যা ভারতের প্রাণের অতি আপনার বস্তু, অন্য বিদ্যাকে কুড়াইয়া লইবার জন্য সেটিকে ফেলিয়া যদি কখন কিছু পশ্চাতে সে হটিয়া আসে তবে সেই অধ্যাত্মপ্রেরণারই বলে সে অন্যকে লইয়া আবার অধ্যাত্মে ফিরিয়া আসিবে—"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ"। তাই ত শ্রীভগবান আশ্বাস দিয়াছেন—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশ স্তস্য বিদ্যতে।"

কিন্তু শুধু ইহাই নয়। মানুষকে যতখানি অন্নগতপ্রাণে, জড়বাদী বলিয়া আমরা মনে করিতে চাই, বাস্তবিক সে ততখানি নয়। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের, আবেগে, অন্তঃপুরুষের ইষণার বলে সে ঘুরিয়া হউক ফিরিয়া হউক ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে, আত্মাকে ব্রহ্মকে খুঁজিতে চলিয়াছে, আত্মার ব্রহ্মের দ্বারাই আপনার সত্তাকে সমস্ত জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের ধরণটি আমরা কিছু বলিয়াছি, এই সঙ্গে ইউরোপের ধরণটিও উল্লেখ করিয়া উভয়ের তুলনা করিতে চাই। ইউরোপের প্রাণ চিরকালই অন্নপ্রধান, ইউরোপের ঝোঁক বাহিরের ভৌতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে, এ কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিবেন। ইউরোপে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না, সেখানে পাই বিপুল পরিমাণে লৌকিক জ্ঞানের রাজনীতির, অর্থনীতির কথা। ইউরোপের প্রাণে জীবনে, তাহার প্রতিষ্ঠান সমূহে ক্ষত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তি যতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যতখানি ছড়াইয়া আঁকড়িয়া আছে, ব্রাহ্মণশক্তি তেমন কিছুই করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইউরোপ যে ব্রহ্মের অধ্যাত্মের পথে চলিতেছে না, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। ইউরোপের সাধনধারা ভারতের সাধনধারা হইতে বিভিন্ন মাত্র। ভারতবর্ষে কেমন করিয়া জানি না একটা জন্মসিদ্ধ সহজ দৃষ্টি, দিব্য প্রেরণার বলে অথবা বহুপ্রাচীন তমসাবৃত কোন যুগযুগব্যাপী সাধনার ফলে কিম্বা

ভগবৎ প্রসাদে, একেবারে চরম জ্ঞানে উঠিয়া গিয়াছিল, পাইয়াছিল ইন্দ্রিয়-গ্রামের অতীত, সৃষ্টির অতীত সেই সৎপ্রতিষ্ঠা সেই সদ্বস্তুন, সেখান হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নীচের প্রতিস্তর ক্রমে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে, সৎএর মধ্যে শক্তির লীলা ফুটাইয়া ধরিতে। আগে তাহার বেদান্তসাধনা, পরে তাহার তন্ত্রসাধনা। ইউরোপ কিন্তু আগে সে সৎ বস্তু পায় নাই, বেদান্তের পথে চলে নাই। ইউরোপ চলিয়াছে ধীরে ধীরে, নীচে হইতে গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক স্তর প্রত্যেক সোপান ক্রমে পার হইয়া—ইউরোপ সব জিনিস চায় যে 'সায়ান্স'। ইউরোপে জ্ঞান—তুরীয়ের ভূমার জ্ঞান, দৃষ্টি (Intuition) হইতে আরম্ভ করে নাই, সে বিজ্ঞান বিশেষের জ্ঞান, বিচার বিতর্ক (Intellection) হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপ তাই গোড়াতে আত্মার অপেক্ষা অন্নকেই মর্য্যাদা করিয়া আধিভূতকে একান্ত করিয়া ধরিয়া ক্রমে উপরে উঠিতেছে, অধ্যাত্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্নকে আধিভূতকেই স্বীকার করিয়া একমাত্র সত্যরূপে ধরিতে ধরিতে ইউরোপ কি রকমে অন্নের অন্তরালে আত্মার অধ্যাত্মেরই মধ্যে যাইয়া পড়িতেছে, আধুনিক ইউরোপের সে বিবর্ত্তন ইতিহাস খুবই চমৎকার ও শিক্ষাপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার জড়বাদ কি রকমে বিংশশতাব্দির প্রাণ-বাদে আসিয়া পড়িয়াছে, সে প্রাণবাদও কি রকমে আজ অধ্যাত্মের দুয়ারে গিয়া আঘাত করিতেছে তাহার পরিচয় সুধী সমাজের সকলেই জানেন। প্রথমে হীকেলের materialism, তারপর বের্গসনের vitalism, তারপর অয়কেনের (spiritualism)।

তারপর আমরা আরও বলিতে চাই, ইউরোপে যে অধ্যাত্মপ্রবাহ ভিতরে ভিতরে জাগিয়া উঠিতেছে তাহা ভারতের অধ্যাত্ম সিদ্ধি সাগর অপেক্ষা বেশী সজীব সতেজ। হইতে পারে ইউরোপের অধ্যাত্ম দৃষ্টির সম্মুখে এখনও একটা আবরণ রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইতে পারে নাই, এখনও সেখানে আছে অনেকখানি চঞ্চল অশুদ্ধ রজঃ, কিন্তু তবুও তাহা জীবন্ত, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মত তাহা তমঃ প্রধান নহে। আর ইউরোপের আধ্যাত্মিকতা—সে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া সকল সত্তাকে কুড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়—জগৎকে পৃথিবীকে অন্নকে বাদ দিতে চাহিতেছে না, তাহার চেষ্টা জগৎকে পৃথিবীকে অন্নকে বেড়িয়া ধরিতে, অন্নকেও আত্মারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইউরোপে তাহার সমস্ত নূতন

শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়া আজ এই কথাই ব্যক্ত করিতেছে—অসীমের অরূপের আনন্দ, ভাগবত্ রসই চাই ; কিন্তু সীমার রূপের আনন্দে পার্থিব রসেরই মধ্যে। ইউরোপের আজ কালকার সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক সকল বিপ্লব সকল আলোড়ন আন্দোলনের মধ্যে এই কথাই ফুটিয়া উঠিতেছে। Socialism, Syndicalism, Bolshevism অর্থাৎ সমাজের শূদ্রশক্তি—কার্য্যপ্রণালী তাহার যতই রিক্ত বিকট হউক না কেন, সজ্ঞান আদর্শ তাহার যতই অসম্পূর্ণ থাকুক না কেন—চাহিতেছে, ইহার অন্তরের প্রেরণা হইতেছে অন্নকে ধরিয়া অন্নকে ঘিরিয়া সমাজের একটা আধ্যাত্মিক রূপ দিতে।

অন্নবাদী ইউরোপের প্রাণে আত্মার সাড়া দিয়াছে, আর অধ্যাত্মবাদী ভারতের প্রাণ অন্নের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। শূদ্র ইউরোপ ব্রাহ্মণ্য পাইতে চাহিতেছে, ব্রাহ্মণ ভারত শূদ্রকে বরণ করিতে চলিয়াছে। এক স্থানে দেহ চাহিতেছে আত্মা; আর এক স্থানে আত্মা চাহিতেছে দেহ। এই দুইটি ধারাএকই ভাবের অভিব্যক্তি, দুই দিক হইতে একই লাভে পৌঁছিবার প্রয়াস। এসিয়া ও ইউরোপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে জগতের পরম কল্যাণ যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহারা এই কথাটিই বলিতে চাহেন। অধ্যাত্ম-জীবন আর কর্ম্ম ও ভোগ জীবন, সৎপ্রতিষ্ঠা আর পার্থিব প্রতিষ্ঠান সমূহ মিলাইয়া ধরিতে হইবে। ব্রহ্মকে অন্নের মধ্যে জীবন্ত করিতে অন্নকে ব্রহ্মসত্তায় গড়িয়া তুলিতে হইবে, পৃথিবীকে স্বর্গে রূপান্তর করিতে, স্বর্গকে পৃথিবীর উপর নামাইয়া ধরিতে হইবে। পৃথিবী ও স্বর্গ, দেহ ও আত্মা, অন্ন ও ব্রহ্ম একই সত্তার দুভাগ দুইদিক দুইভঙ্গী, উভয়কে লইয়া পূর্ণ জীবন পূর্ণ পরমার্থ।

অন্ন শুধু অন্নের জন্য প্রিয় নয়, আত্মারই জন্য অন্ন প্রিয়—এ কথা সিদ্ধান্ত করা চলে না যে অন্নের প্রয়োজনীয়তা নাই বা অন্ন প্রিয় নয়, ইহা হইতেই পারে না। অন্নও প্রিয়, আত্মাও প্রিয়, উভয়ে মিলিয়া এক মহাপ্রিয়কে সৃষ্টি করিতেছে। আত্মাপ্রিয় হয় না তখন যখন শুধু অন্নকেই দেখি, অন্ন যখন আত্মাকে ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখে, কিন্তু অন্ন আবার প্রিয় হয় না যখন শুধু আত্মাকেই দেখি, আত্মা যখন অন্নকে গ্রাস করিয়া লোপ করিয়া ফেলে। তাই জগতের—মানব জাতির অন্তরাত্মা ইউরোপের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছে অন্নকে ব্রহ্মরূপে পাইয়া আনন্দ-উপলব্ধি করিতে, আর ভারতের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছে ব্রহ্মকে অন্নরূপে পাইয়া ভোগ করিতে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।*

আজ স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশত সাংবৎসরিক জন্মোৎসব। এই পবিত্র দিবসের পুণ্যস্মৃতি আজ আমরা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিব।

যে অলোকসামান্য শক্তিশালী জীবন সহসা বাঙ্গালী জাতির অভ্যন্ত জড়ত্বের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বন্যার মত সুবিপুল উচ্ছ্বাসে, একদা অপ্রতিহত প্রবাহে জগত উপপ্লাবিত করিয়াছিল আজ তাহার প্রশান্ত পরিণতি এক মহনীয় আদর্শরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। উৎসবের পুণ্যলগ্নে এই গৌরবময় মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী মহিমার ত্যাগের গৈরিক পতাকামণ্ডিত সমুন্নত শিখরমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আইসে, বাঙ্গালীর অবসন্ন জাতীয় জীবনের অন্তরালে এ প্রচণ্ড বিক্রমের বীজ কোথায় লুকাইত ছিল এবং কেমন করিয়া পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিল ?

আমরা দেখিতে পাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘাতপ্রতিঘাতলব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে এই জীবন ক্রমে পরিণতি লাভ করে নাই। অন্তর্নিহিত গর্ব্বোদৃপ্ত আত্মশক্তির বিপুল প্রেরণায় ইহা প্রচণ্ড অবহেলা ভরে প্রতিকূল ঘটনাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া স্বমহিমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল— ইহা এক অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার।

যাহা প্রচণ্ড ও প্রবল, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক সহ্য করিবার ক্ষমতা ভীরু ও দুর্ব্বল বাঙ্গালীর নাই, তাই তরুণ যুবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের জীবনের উদ্দামগতি গতানুগতিক পন্থা পরিহার করিয়া অবিচলিত বীর্য্যের সহিত যখন এক স্বতন্ত্র পন্থায় অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অনেকেরই দৃষ্টিতে উহা উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু যুক্তিপন্থী যুবক স্বীয় আদর্শকে সাধারণের অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনার অতীত প্রদেশে—বহু উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া জীবন প্রভাতেই সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। জন্মগত জাতিগত সংস্কার, দেশাচার, লোকাচারের বন্ধন পশ্চাতে ফেলিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিতেও

---

* বিগত ২৫শে জানুয়ারী ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। প্রণালীবদ্ধ উপাসনা, সংস্কারের উত্তেজনা, সাম্প্রদায়ীক মতবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়া কোনরূপ সত্যের সাক্ষাৎ না পাইয়া তিনি আহত হইলেন, উদ্যম বিসর্জ্জন দিলেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ে ও নানাস্থানে নানাপ্রকার আদর্শের নীরস খোসা চর্ব্বণ করিতে করিতে ক্ষুব্ধ যুবক সন্দেহবাদী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেন না। "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" যুবকের এই ব্যাকুল প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া কতজন স্তব্ধ হইলেন, কেহ বা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-লব্ধ খানিকটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উদ্বমন করিলেন, কেহ অস্বীকার করিলেন,—কেহ উহা যে একটা অসম্ভব ব্যাপার তাহাই যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া এক দীন দরিদ্র পূজারী বহু দিন এই যুবকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসু যুবককে বিস্ময়স্তম্ভিত করিয়া দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"তুমিও দেখিতে পাইবে, যদি আমার উপদেশ মত আচরণ কর।"

এই ঘটনার পর হইতে নিখিল ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তির উপর এক জগদ্ব্যাপী অখণ্ড আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য গড়িবার জন্য দ্বিতীয় চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মত এই ব্রাহ্মণ গুরু ও শূদ্র শিষ্যের নিঃশব্দ উদ্যম চলিতে লাগিল। পরমহংসের উক্তিগুলি বিনা বিশ্লেষণে নির্ব্বিচারে গিলিয়া ফেলিবার মত সুবোধ শিশু নরেন্দ্রনাথ কোন দিনই ছিলেন না। প্রায়ই তর্কের তুফান উঠিত। একদিকে অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান, অপরদিকে অসামান্য তীক্ষ্ণ প্রতিভা। গুরু ও শিষ্যের এই মানসিক দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যেও এক অপরূপ প্রেমসম্বন্ধ আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তোলে। পরমহংসের শুভ্র ও পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ অনেক কথাই শুনিয়াছিলেন, তথাপি এই প্রত্যক্ষবাদী সত্যের সাধক নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত অসঙ্কোচে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতবাদ ও প্রভাব অতিক্রম করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রান্ত আদর্শের জীর্ণ আবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনের মধ্যে স্বীয় আদর্শের সন্ধান পাইল। স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে সতর্ক প্রহরীর মত সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ যতই এই অদ্ভুত পুরুষের সঙ্গ করিতে লাগিলেন ততই চমৎকৃত হইয়া দেখিতে

লাগিলেন। পুস্তকে যে সমস্ত উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় লিখিত আছে, এই মহাপুরুষের মন তদপেক্ষা বহু উন্নততর ভাবভূমিতে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে—উহা যুক্তি, বিচার, কল্পনা ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে—যাহা পরিমাণ করিতে যাওয়া হাস্যকর মূঢ়তা মাত্র। সত্যকে বুক দিয়া আলিঙ্গন করিবার মত দৃঢ়তা ও সাহস তাঁহার জন্মলব্ধ—এ ক্ষেত্রেও তিনি বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের অনুনয় ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বনে শ্রীগুরু নির্দ্দিষ্ট সাধন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এমন সময় একদিন অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগ, প্রচুর সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত যুবককে পথের ভিখারী করিয়া দিল। বিমুখ ভাগ্যের ধিক্কারে আহত বুভুক্ষু যুবক দারিদ্র্যের নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার দুঃখকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য বিপদ বাস্তুভিটাখানি পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইলেও তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন না। অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত প্রশংসনীয় আত্মাভিমানকে উন্নত করিয়া অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। রূপ ও ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন তাঁহার পবিত্রতার কঠোর প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া গেল। বন্ধুগণের অনুকম্পাভরে প্রদত্ত সাহায্য বিনীত সারল্যের সহিত উপেক্ষা করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। স্বীয় অন্নমুষ্টি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীগণকে প্রদান করিয়া ক্ষুধিত যুবক নগ্নপদে নগ্নমস্তকে প্রতপ্ত মধ্যাহ্নে কলিকাতার রাজপথে চাকুরীর সন্ধানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন—অবশেষে সন্ধ্যার পর অবসন্ন দেহে ব্যর্থ চেষ্টার শ্রম ক্লান্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন,—এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সম্পদের দিনে যাঁহারা বান্ধব বলিয়া পরিচিত হইতে গৌরববোধ করিতেন, বিপদকালে তাঁহারা মুখ ফিরাইলেন। এমন কি, অনেকে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসা পর্য্যন্ত রটনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এই পঙ্কিল আবর্ত্ত-সঙ্কুল ঘটনার স্রোত তাঁহার জীবনকে ভাসাইয়া লইতে পারিল না। সত্যলাভ করিবার প্রবলতম আগ্রহে তিনি অনায়াসে বিঘ্নবহুল ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম পথে গর্ব্বিত পদক্ষেপে চলিলেন। সাধারণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তিনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না, কেন না, ঘনীভূত বিপদের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়াও তাঁহার ধ্যান দৃষ্টি লক্ষ্যের উপর অবিচলিত নিষ্ঠায় স্থাপিত হইয়াছিল।

আবার দুর্দ্দিনের অবসানে তিনি অনায়াসে সংসার সম্পর্কে একান্ত উদাসীন হইয়া আত্মোপলব্ধির জন্য কঠোর সাধনায় রত হইলেন। গুরুশক্তি প্রভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া আপ্তকাম সন্ন্যাসী যখন শুনিলেন তাঁহার স্কন্ধে যুগধর্ম্ম প্রচারের মহাদায়ীত্ব ভার সমর্পিত হইয়াছে, তখন বিস্ময়-স্তম্ভিত যুবক কিছুতেই নিজেকে আচার্য্যপদের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। এ কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতির আশায় তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবিচলিত কণ্ঠে গুরু উত্তর করিলেন "তুই পারবিনে? তোর হাড় করবে" অবশ্য গুরুর আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী আচার্য্যব্রত স্বীকার করিলেন, কিন্তু মুক্তিকামনা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের ন্যায় তাঁহার অশান্ত অন্তরাত্মা উন্মুখ আগ্রহে জগজ্জাল ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তখন পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতেছিলেন। নানাদেশের কত জ্ঞানী, গুণী, সজ্জন সঙ্গে বিবিধ শিক্ষা লাভ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মুক্তিকামনায় গাজীপুরে সাধু পাওহারীবাবার নিকট গিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। হিমালয় শৃঙ্গে গভীর তন্ময় ধ্যানেও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। বিরক্ত সন্ন্যাসী হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন।

ভারতবর্ষের শেষ প্রস্তরখানির উপর উপবিষ্ট হইয়া অশান্ত যোগী আত্মস্থ হইলেন। বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া যে চিন্তাভার তাঁহার মস্তিষ্ককে পীড়িত করিয়াছে, আজ তাহা সরাইয়া রাখিয়া ধ্যানমগ্ন হইবা মাত্র তাঁহার দিব্য-দৃষ্টির সম্মুখে জননী জন্মভূমির পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিল।। মহাপুরুষের তপোমার্জ্জিত নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বোধিদ্রুম-মূল-সমাসীন শাক্যকুমারের ন্যায়, বীর সন্ন্যাসীর বজ্রকঠোর হৃদয় সহস্র সহস্র অজ্ঞ, অত্যাচারে পীড়িত, উপেক্ষিত দেবঋষির বংশধরগণের জন্য কাঁদিয়া উঠিল! নিজের মুক্তিকামনাকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়া স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ধ্যানাসন হইতে উত্থিত হইলেন। উচ্ছ্বসিত নীলসিন্ধুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া করুণা-কাতর সন্ন্যাসী কি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল হৃদয়ের উদ্বেলিত প্রেম সমুদ্রের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবির তুলনা করিতেছিলেন, কে বলিবে? আজ তিনি নিঃশেষে বুঝিলেন, মানব কল্যাণ-ব্রতে আত্মদানই উপযুক্ত গুরু দক্ষিণা! ইহার অল্পদিন পরেই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের

মত নির্ম্মল বিভায় বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু ঝলসিত করিয়া বিবেকানন্দের অপ্রত্যা' শিত অভ্যুদয় ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় ঘটনা।

এই পরাধীন পতিত জাতির পতনোন্মুখ সভ্যতা ও উপেক্ষিত ধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এক সুমহান প্রয়াসে কটির কৌপীন মাত্র সম্বল কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী 'হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে অর্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন'। দিগ্বীজয়ী বীরের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর ইহাতে যে বৈদ্যুতিক উচ্ছ্বাস জীবন্মৃত জাতির শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পুনরায় নবীন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে—তাহারই আশ্চর্য্য খেলা প্রত্যক্ষ করিয়া আজ আমরা এই মহাপুরুষের স্মৃতিপূজাকে জাতীয়-সার্ব্বজনীন উৎসবে পরিণত করিয়াছি।

আমাদের জাতীয় জীবনের এক অতি সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তেই বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন আমরা জাতিগত সার্থক গৌরববুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, জাতীয় ইতিহাসের ধারা হইতে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নানাস্থান হইতে সংগৃহীত এক বস্তুতন্ত্রহীন আদর্শ খাড়া করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রসূত অবিবেকী দম্ভে আমরা ভারতবর্ষকে ইউরোপের সস্তা দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত করা অতীব সহজ ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতা ও আদর্শের নকল করিতে গিয়া আমরা যত নাকাল হইয়াছি ও হইতেছি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই। সন্দেহসঙ্কুল সমস্যার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে আমরা যখন ক্রমে ক্রমে জাতীয় আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতেছিলাম,—ব্যভিচারে, অনাচারে, কদাচারে, দ্বন্দ্বে, কলহে জাতীয় জীবনস্রোত পঙ্কিল ও পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিতেছিল,—নির্লজ্জ পরানুকরণ প্রবৃত্তির অসংযত দৌরাত্ম্যে স্বজাত্যাভিমানী ভারতবাসীগণ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন,—এমন সময় বিবেকানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের রুদ্রদণ্ড উদ্যত করিয়া জরাগ্রস্ত চিন্তার উপর এক অতি নির্ম্মম আঘাত করিলেন।

কি বিরাট সে উদার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি—যাহা ভেদাভেদ সমস্ত সঙ্কীর্ণ প্রাচীর গুলি উল্লঙ্ঘন করিয়া,—কৃত্রিম জাতিভেদের অর্থহীন প্রথা লুপ্ত করিয়া, চরম একত্বানুভূতির অতলে ডুবিয়া—দীন, দরিদ্র, পতিত, এমন কি অস্পৃশ্য পারিয়াকে পর্য্যন্ত নারায়ণ জ্ঞানে পূজার আদেশ ঘোষণা

করিয়াছে। ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রসুপ্ত মনুষ্যত্বকে সম্মান করিতে হইবে, শ্রদ্ধা করিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে—খাদ্য দিয়া বিদ্যা দিয়া, জ্ঞান দিয়া পুষ্ট ও বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। অস্পৃশ্য, অনধিকারী বলিয়া কাহাকেও সরাইয়া রাখিলে চলিবে না,—আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে। ভবিষ্যতে ভারতের গৌরবময় উদ্বোধনের প্রথম সোপান স্বরূপ এই নারায়ণ জ্ঞান মানবসেবা ব্রতের আশু প্রয়োজন যদি আজও আমরা না বুঝিয়া থাকি, বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন—আর বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা তো প্রত্যক্ষ।

বিবেকানন্দের চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিতে করিতে আমরা অনেকেই নৈরাশ্যব্যঞ্জক কাতর কণ্ঠে বলিয়া থাকি, "হায়। বিবেকানন্দ যদি আজও বাঁচিয়া থাকিতেন।" এই উক্তি গভীর ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বলিয়া অনেক সময় আমাদের ভ্রম হয়, কিন্তু অনিবার্য্য স্থলেই যে উহা দুর্ব্বল ও লঘুচেতা ব্যক্তির আলস্যের বিজৃম্ভণ তাহা আমি অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই ছত্রভঙ্গ বিপর্য্যস্ত জাতির ম্রিয়মান মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিয়া তুলিতে বিবেকানন্দের মত পুরুষসিংহের একান্ত প্রয়োজন, সন্দেহ নাই,—কিন্তু বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে কেবলি কি মহাপুরুষগণ অসাধ্য সাধনের অভিনয় করিয়া যাইবেন, আর আমরা করতালি ধ্বনি সহকারে তাঁহাদের কার্য্যের সহিত আমাদের সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিব? আজ বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মদিনে আমরা কি একবার ভাবিয়া দেখিব না—তাঁহার জাতির কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গের প্রশংসনীয় কাহিনী আমরা ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব, না শক্তির সহিত কর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবার ব্রত গ্রহণ করিব।

কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বিবেকানন্দের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব সকল দিক হইতে এত বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার জীবন চরিত আলোচনা কালে উহা স্বতই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া তোলে। এবং বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না যে বক্তৃতায়, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে, কর্ম্মে তিনি একান্ত স্বাভাবিক ভাবে যে বিশেষত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড় ছিলেন। 'ত্রিশকোটী মানবের আধ্যাত্মিক, নৈতিক' সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করিয়া এই ভারতবর্ষকে আর একবার নিজের পায়ের উপর

দাঁড় করাইয়া দিবার সুমহান সঙ্কল্প ধ্রুবতারার মত এই মহাপুরুষের হৃদয়ে চির প্রোজ্জ্বল ছিল। এই সম্প্রদায়প্লাবিত দেশে তিনি কোন নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই, অথবা আমরা বেশ জানি সে ক্ষমতা তাঁহার প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সামান্য একটা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার ভাব ও চিন্তাগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকুক—এইরূপ একটা হীন সংস্কার শ্রীগুরুর শিক্ষায় কোন দিনই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার ভাবরাশি জগতের, ভারতের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর। সমাজ বা সম্প্রদায় গঠন নহে—মানুষগঠনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সেই জন্যই বেলুড়মঠকে তিনি কখনও কখনও "Humanity manufacturing machine' বলিয়া অভিহিত করিতেন। ভারতের পুনরুত্থান কল্পে তিনি "আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" কয়েক সহস্র শক্তিমান সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লোকশিক্ষা ভার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—অন্ততঃ এক সহস্র শিক্ষিত ও হৃদয়বান যুবক জাতির কল্যাণে ভগবচ্চরণে আত্মবলি—জীবন বলি প্রদান করিবে এ ধারণা তাঁহার ছিল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর চিন্তারাজ্যে এই অপ্রতিহত যোদ্ধার পুণ্যস্মৃতির পদতলে দাঁড়াইয়া আজ আমরা ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ ও ক্ষুদ্র ধারণা দিয়া উহাকে খর্ব্ব বা খণ্ডিত করিয়া দেখিব না। আমরা দেখিব, ভারতের পুনরুত্থানকল্পে সন্ন্যাসীর অপরিহার্য্য নেতৃত্বকে প্রমাণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোন্ মহাশক্তি বিবেকানন্দরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তর্ক বিতর্কের ধূলিজাল উড়াইয়া তাঁহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে মলিন ও অস্পষ্ট করিয়া তুলিব না, চিন্তা করিয়া দেখিব তিনি কেন সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় তাঁহার দেশের মাটির উপরেই পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন?

অমাবস্যার নিশীথিনী—অন্ধকারে সব শুব্ধ। বুভুক্ষু বাঙ্গালীর পাষাণবক্ষে দুর্ভিক্ষের চিতাচুল্লী থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পেচকের কর্কশ চীৎকার—আর শিবাকুলের আনন্দ ধ্বনি॥ বন্যার প্রবল প্লাবন, ঝঞ্ঝার উন্মত্ত ধ্বংসলীলা, ব্যাধির বাধাহীন রাজত্ব যেন বাঙ্গালীজাতির অস্তিত্ব ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য একযোগে প্রস্তুত হইয়াছে। সমস্যার পর সমস্যা, বিঘ্নের পর বিঘ্ন, দুর্দ্দশার পর দুর্দ্দশা—ইহাই বাঙ্গালীর অদৃষ্ট। অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কোন্ পাপে পুরুষকার হারাইয়া প্রেতের মত এই অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে কে বলিবে? জাতির এই মহাদুর্দ্দিনে ক্রমাবনতির স্রোত

রুদ্ধ করিতে আরুণির মত গুরুভক্ত শিষ্যের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ গুরুভক্ত শিষ্যের উজ্জ্বল আদর্শ আমরা বিবেকানন্দের মধ্যে পাইয়াছিলাম। অতীত গৌরবের মহাসমাধিভূমি খনন করিয়া এই মহাপুরুষ আমাদিগকে জাতীয় সম্পত্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার দেখাইয়া গিয়াছেন। জানিয়া, শুনিয়া, দেখিয়া, বুঝিয়াও আজ পর্য্যন্ত কেন যে আমরা 'নিজবাস ভূমে পরবাসী' হইয়া আছি এ সমস্যার মীমাংসা কে করিবে?

স্বামী বিবেকানন্দের মতে পদমর্য্যাদাহীন, চরিত্রবান, দরিদ্র বাঙ্গালী যুবকগণের দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হইবে। এই পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখ দৈন্য, বিশ্বের স্তূপাকৃতি আবর্জ্জনা, হৃদয়ের জ্বলন্ত উৎসাহাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া—রজঃশক্তিদৃপ্ত বিশ্বামিত্রের ন্যায় নবীন সৃষ্টির উদ্বোধন করিবার ব্রতগ্রহণ করিবার জন্য আজও বিবেকানন্দের অমর কণ্ঠের আহ্বানবাণী আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। কালের চক্র ঘুরিয়া আজ আমাদিগকে একটু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই, যাহা একান্ত অসম্ভবই ছিল—আজ তাহা সম্ভব হইতে চলিয়াছে। ভগবানের মঙ্গলাশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া এই মহাজাতি শতাব্দীর মোহতন্দ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পুনরায় অগ্রসর হইবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী বিবেকানন্দের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালী কি গৌরব অনুভব করিবে না?

আজ বিংশ শতাব্দীর অতীতপ্রায় প্রথম প্রহরে আমরা একবার সিদ্ধসঙ্কল্প সন্ন্যাসীর শুভ্র কর্ম্মজীবনখানি অপ্রমত্ত হইয়া স্মরণ করিব। যাহা সহিষ্ণু কাঠিন্যে পাষাণ প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান হইয়া একদা পাশ্চাত্য সভ্যতা সাগরের প্রচণ্ডবন্যার বিদ্যুদ্বেগ প্রতিহত করিয়াছিল। ভারতের অবতার, দেবদেবী, মন্ত্র, গুরুবাদ, সাধনা ও সিদ্ধি লইয়া সে সময়ে বিবেকানন্দ অবতীর্ণ না হইলে আজ আমাদের কি শোচনীয় দুরবস্থাই না হইত। ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মহিমাময় চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া গৌরব অনুভব করিব। অথচ আমরা ভুলিব না যে এই গৌরব বুদ্ধি যেন অবিবেকী দম্ভে পরিণত হইয়া তাঁহার পুণ্য চেষ্টাকে লজ্জিত লাঞ্ছিত না করে, তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার পথে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন না করে।

উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়াই আমরা এ কাল পর্য্যন্ত জাতীয় ইতিহাস

গড়িয়া আসিয়াছি। কখনও প্রবলগতিতে কখনও বা প্রশান্ত প্রবাহে আবার কখনও বা ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে। এখনও ইহাতে স্রোত আছে, তরঙ্গও উঠে—শুকায় নাই। কেবল আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ইহার পথের আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালী যুবক, আমরা এ দায়িত্বভার বিনম্রভাবে স্বীকার করিব। অনাহারে অবিচারে আমাদের প্রাণ মরে নাই—কেন না একটা জাতি আমাদের মুখের দিকে বড় আশায় তাকাইয়া আছে। আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থে ভুলিয়া, ক্ষুদ্র ঈর্ষায় জ্বলিয়া ক্ষুদ্র বিলাসে ডুবিয়া একটা জাতির জীবন সাধনকে বিফল করিয়া দিব না। সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া আজ আমরা নির্ভীক চিত্তে নবাভাবিতের মন্ত্রগুরুর পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া কবির ভাষায় মুক্তকণ্ঠে বলিব—

——অগ্নে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
কর মোরে সম্মানিত নব-বীর বেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত চিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মায়ের কথা।

আমাদের বাঙ্গলা দেশ শক্তির পীঠস্থান। নারীর এত বড় পূজার তীর্থ কোন্ দেশে আছে? মান্দ্রাজে মহারাষ্ট্রে বেহারে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্চনদে ভারতের যেখানেই দেখ শিবের পূজা, হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের পূজা, গণপতি শ্রীকৃষ্ণ এমন কি অলখের পূজার কত মন্দির তীর্থ কত কুণ্ড ও মঠ

দেখিবে, কিন্তু বাঙ্গলার মত এমন আম নারিকেল বাঁশের ছায়ায় শীতল গঙ্গাজলে ধোয়া প্রেমে মাখামাখা মায়ের দেউল দেখিবে না। এমনটি আর কোথায়ও নাই। সতীর প্রেমের গড়া অঙ্গখানি বিষ্ণুচক্রে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া কত স্থানেই না পড়িল; কিন্তু আনন্দময়ীর প্রাণটুকু কিনা জাগিল শুধু বাঙ্গলায়। এদেশে মায়ের জলজলে ভর আছে, এ মাটির সোণার ধূলা নিছক প্রেমেই গড়া, তাই সকল দেশের কৃষ্ণ এখানে আসিয়া রাধাশ্যাম, দ্বারকার রাজা এখানে স্থির বিজুরীলতার অঙ্গে নীল মেঘ হইয়া তাহারই সোণার শোভা বাড়াইতেছে। এ কি কম দেশ! অন্য দেশের তুলসীদাস রামায়ণ গান করে, নামদাস তুকারাম নানক নিরঞ্জনের সহিত সখ্য দাস্যরসে মন মিলায়। আর এই প্রেমের দেশে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—সেই কান্তরসের পাগলগুলা বুকের ঠাকুরকে রাধা সাজাইয়া অনন্তের ঠাকুরের সহিত "এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ" সেখানে কি সুধার সায়রে মিলন ঘটায়! মায়ের সব জুড়ান কোলটুকু পাইবার কামনায় রামপ্রসাদের কেমন মা মা নামে এ দেশের মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস ভরা! কোন্ দেশের কোন্ সাধকের কমলের কমলে এমন করিয়া "পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতনী" নাচিয়াছে বল দেখি? কোন্ চিন্ময়ী মা-টির কোলে জন্মিয়া একাধারে লক্ষকোটী নারীর সঞ্চিত প্রেম বুকে ধরিয়া এমন আর একটি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ কোথায় কৃষ্ণ নাম লইয়াছে?

কিন্তু নারীর এমন তীর্থ এমন অনুপম সতীপীঠ বঙ্গভূমে আদ্য শক্তির যে অবমাননা হইতেছে তাহা আর কোথায়ও নাই। এই আদ্যাশক্তির দেশে কি-না মেয়ে-জন্মিলে ভয়ে ভাবনায় মা বাপের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। এমন দেশে কি না আমরা দাসী বিক্রয়ের ব্যবসায়ী, প্রেমের ত্যাগের আপ্রাণ সেবার এমন কমনীয় জীবন্ত বিগ্রহ বাঙ্গালীর মেয়ে তাই আগুণে পুড়িয়া মরে, ভগবানের যে দান হইতে অতি বড় দীন, ভিখারী, কীট-পতঙ্গ অবধি বঞ্চিত নহে, সেই আলো বাতাস অবলীলা গতি মুক্ত স্বাধীনতা ও জগতের নানামুখী বৈচিত্র সুখে নিঃশেষে বঞ্চিতা বাঙ্গালীর মা বোন স্ত্রীর মত হতভাগিনী শুধু এই দেশেই আছে। যে দেশে জগচ্ছক্তির এত অপমান, যে দেশের অর্দ্ধেক চৈতন্য এত মূক ও জ্ঞানপঙ্গু, যে দেশের মায়ের বুকে জাতির মাতৃপ্রেরণা ও সৃজনীশক্তির সাড়া নাই, সে দেশের দৈন্য অবসাদ যে ঘুচিতে চাহে না তাহা তো বিচিত্র নয়। শক্তিকে আমরা বড় শক্তিহীন করিয়াছি, রেল পথে তাই কাষণ্ডর হাতে লাঞ্ছনার কথা সহজে জড়সড় ভয়ত্রস্তা পিঞ্জরের বিহঙ্গী

কেবল বাঙ্গালীর কুলবধূর উপরই হইতে শুনি। বাঙ্গালীর মেয়ে সত্যবালা তাই বলিতেছেন, "অসাড়তা জাতির সর্ব্বাঙ্গে। কথাও সর্ব্বাঙ্গে।"

বাঙ্গালী মাটির দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা গড়িয়া ঢাক ঢোল ফুল চন্দন বিল্বপত্রে জড়রূপার পূজা করে, আর তাহারি ঘরে চিন্ময়ী জীবন্ত শক্তির কত অবহেলা! বাঙ্গালী কাশীতে অন্নপূর্ণা, উত্তরে জ্বালামুখী, ব্রজপুরে শ্রীরাধা ও বঙ্গে আদ্যাশক্তির চরণে গিয়া মাথা খোঁড়ে, আর নিজের আপনার আত্মশক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সকল প্রকার অন্তঃপ্রেরণার পথ রুধিয়া আপনি অঙ্গহীন হইয়া থাকে। আমরা দেশের কাজে ছুটি, ঘরের মা বোন সে ত্যাগের মহিমা বোঝে না, পায়ের শিকল তাহারা পা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। আমরা ভগবানের নামের সঙ্কীর্ত্তনে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরি, আমাদের অপর আধখানা অঙ্গ সংসারের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে পরবিধনকে অভিসম্পাত করে। আমাদের বিদ্যা যশ দেশের কাজ যত মহাপ্রাণতা সব বৈঠকখানার জিনিস, তাহা বাহিরে রাখিয়া অন্তঃপুরে যাইতে হয়, আমাদের অর্দ্ধাঙ্গে উৎকট জীবনের লক্ষণ আর অপরার্দ্ধে পক্ষাঘাত। যে মা জঠরে ধরিয়া কোলে করিয়া স্তন্যমধু পিয়াইয়া এ জড়দেহ গড়ে, সে জ্ঞানের অমৃত নিষেকে তখনকার কোমল মনটুকু তো গড়িতে পারে না, যে জীবন-সহচরী আসিয়া অগ্নি দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া একাত্ম হয়, সে তো আমাদের জীবনের যত বড় বড় জগদগামী ভগবৎমুখী ধারাগুলির কোনটিরই সন্ধান রাখে না।

এ পাপ নারীর নহে, পুরুষের। তবু দেখ এত অবহেলা এত দৈন্যেও বাঙ্গালীর ঘরে নিঃস্বার্থতা ও সংযমের কি পবিত্র ছবি! ঘরের সকলকে খাওয়াইয়া খুদকুঁড়া একমুঠি অন্ন তাহারা খায়, দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে অত সেবায়ও কাতরা হইতে জানে না, বুক পাতিয়া সমস্ত সংসারটুকু জুড়িয়া কেমন শীতল সর্ব্বসন্তাপহারী জুড়াইবার ঠাঁই গড়িয়া রাখে। তাহাদের শাঁখের রবে হুলুধ্বনিতে আজও কত কল্যাণ, তাহাদের আপনা ভোলা শুধু দিবার কাঙাল প্রেমে কত মধু, তাহাদের সতীত্বের মাতৃত্বের পুণ্যে আমাদের মরা দেশে এখনও কত প্রাণ। বাঙ্গালীর মেয়ে আজও অন্য দেবতা ভুলিয়া পতিদেবতার পূজা করিতে জানে, কিন্তু এ দেশের পুরুষ তাহার ঘরের দেবীকে চিনে না। জীবনের সকল দিক দিয়া নারীকে জীবনব্রতের সঙ্গিনী করিবার কথায় এ দেশের পুরুষের হাসি পায়।

তবু আমাদের সব ছিল। যে দেশে নারী ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িত্রী, যে দেশের দর্শন নারীর মুখে বিচারিত, সে দেশের বড় স্ত্রীশিক্ষা আর কোন দেশে ছিল না। স্বামীর নিন্দায়, স্বামীর মরণে, স্বামীর লজ্জায় যে দেশের পতিগতপ্রাণার ছিল, স্বেচ্ছামরণ, যে দেশের নারী পতির জীবনব্রতের উদ্‌যাপনে অসিকরা, রণরঙ্গিনী হইত, সে দেশের বড় সতী আর কোন দেশে নাই। আবার যে দেশের শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু ব্রাহ্মণী, চণ্ডীদাসের "কাম গন্ধ নাহি যায়" এমন বিশুদ্ধ স্বরূপা পূজার বিগ্রহ রজকিনী রামী, সে দেশের মেয়ে যে স্বর্গের অধিক —গঙ্গার বড় মুক্তিপ্রদা। বাঙ্গালীর মেয়ে সত্যবালা কি বলিতেছেন শোন—

"ভারতের দিব্য অনুভবের প্রথম বিকাশ যে দিন মানব কণ্ঠে প্রথম অঙ্কিত হইল। মানুষ জলেস্থলে অন্তরীক্ষে আপনার রহস্যময় অন্তঃপুরে যে "এক" আছেন, তাঁহারই বন্দনামুখর মণ্ডলী গড়িয়া আপনাদের হিন্দুত্বের সৃষ্টি করিতে বসিল, সেদিন, সেই জাতির গঠনের দিনে, দেশগে গিয়া বেদের সূক্তে সূক্তে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, সর্ব্বত্রই সমবেত কণ্ঠধ্বনি। পুরুষের সহিত নারীর চেষ্টা। সেখানে অত্রি আছে, বিশ্ববারাও আছে, কশ্যপ আছেন, ইন্দ্র-মাতৃগণও আছেন। অপালা, লোপামুদ্রা, অদিতি, যমী, দশাশ্বতী কত নাম করিব? * *

"এখনও মানব প্রাণের চিরন্তন প্রার্থনারূপে মৈত্রেয়ীর রমণীকণ্ঠের রমণীয় বাণীই শান্তি বহন করিয়া আমাদের গৃহে ধ্বনিত হইতেছে—"অসতো মা-সদগময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র-যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

* * * *

"তাহার পর বৌদ্ধযুগের প্রথম উন্মেষকাল। তরুণ শাক্য সিংহ সেদিন আর সাধক নহেন—সিদ্ধ। সেদিন ভিক্ষুনী সঙ্ঘে তাঁহার মাতা আসিয়াছেন, বনিতা আসিয়াছেন। নারী ঘরের কোণে থাকিবে, পুরুষ বাহির লইবে, পুরুষ মানাইবে, নারী মানিবে, সে সম্পর্ক সহসা অন্তর্হিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্যে বিকশিত হইতে লাগিল,—জগদ্ব্যাপী নির্ম্মমতার মহানল "নির্ব্বাণ কর নির্ব্বাণ কর।"

"* * সে দলে অনন্তসঙ্কল্পপরায়ণা ব্রতধারিণীরূপে ছিল না কি সুমেধা, —রাজকন্যা? শুভা,—চর্ম্মকার কন্যা? অম্বপালী,—বারাঙ্গনা?"

ইউরোপ মাটির মেয়ের পূজা করে, ভোগের দাসী ইন্দ্রিয়-সুখের পুতুলও কর্ম্মক্ষেত্রের বিগ্রহ লইয়াই তাহার নাড়াচাড়া, চিন্ময়ীকে চিনি চিনি করিয়াও

ঠিক চেনে না,—রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে ম্যাডোনার পূজাটুকুই ঐ চিনি চিনি করা। মধ্যযুগের chivalryর দিন ভোগ মূর্ত্তির—মাটির মেয়ের পূজার কাল। তাহাদের মেয়ে কাম সাধনার সাধ্য। তাই মেয়ের কাছে এত বাছ বিচার, এত ভব্যতা সভ্যতা, এত সমীহ লজ্জা। আমাদের মেয়ে ত্যাগ ও বিমল তপস্যার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, তাই একবসনা আভরণহীনা সে স্নিগ্ধ রূপে এত প্রাণভোলান মাতৃভাব। নবতন্ত্রের পুরোহিত বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, তাহাদের ঘরের মেয়ে রত্ন অলঙ্কারে ভূষায় সাজিয়া মনহরা পরীটি হইয়া থাকে, আর বাজারের মেয়ে অর্দ্ধনগ্না, আমাদের ঠিক উল্টা—যত সাজ সজ্জা বাহিরে ভোগের দোকানে, ঘরে কিন্তু নিরাভরণা মাতা একবস্ত্রা অথচ শ্রীসম্পদে বিভূষিতা কি মধুর রূপ! নারী মায়ের জাতি, তাই সাজিবার জন্য সাজিলে তাহার সব সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, মেয়ে শক্তির প্রতিমা, বড় সহজে দেবী আবার তেমনি সহজে পিশাচী—যখন যে দিকে টানে বড় দুর্দ্দমণীয় বলে টানে, তাই আমার আনন্দময়ীরা মা হইতে জানিলে এতগুলি মানুষ এত সহজে তার ছেলে হয়। তবে মেয়ের মধ্যে একবার মায়ের ভর আসিলে, বাহিরের বেশ ভূষার ঐশ্বর্য্যে সে মা চাপা পড়ে না, আরও ঐশ্বর্য্যময়ী জগদীশ্বরীরূপে জাগিয়া উঠে।

তাই বলি, ওগো শক্তি পীঠের সন্তান বাঙ্গালী! মায়ের বুকের পাষাণ তুলিয়া লও, মাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে মায়ের মত মা হইতে দাও, দেখিবে পটের দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা নামিয়া আসিয়া তোমার গৃহ অঙ্গনে রন্ধনশালায় চণ্ডীমণ্ডপে একাধারে বিরাজ করিবে। তখন দেবীর কোলে দেবতা জন্মিবে, তোমার ঘরের স্বর্গটুকু বাহিরে আসিয়া গ্রাম নগর মন্দির পণ্যশালা ভরিয়া নব নন্দন কানন রচিয়া তুলিবে, "দেশ জাগো" বলিয়া আর অরণ্যে বসিয়া প্রতি সন্ধ্যায় শিয়াল ডাকিতে হইবে না।

তাই বলি এক কথায় আমাদের সেই চিরপুরাতন অথচ নূতন যুগের মত নূতন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা হউক—সেই শ্রী সেই স্ত্রী আর পূর্ণ মুক্তি। আমরা পুরাতন হইতে গিয়া জ্ঞানে কর্ম্মে মুক্তিতে সকল গভীর ধারায় বঞ্চিতা দাসী গড়িয়া রাখি, আর নূতন হইতে গিয়া গৃহিণীর আসন হইতে ব্রতচারিণীকে তুলিয়া দিয়া বিবি সাজাই। প্রবীনে ও নবীনে আমরা সমান তামসিক।

তাই বলি মেয়ে আর ছেলে দুইকে গড়, একজন পড়িলে আর একজন সহব্রতী তাহাকে তুলিয়া ধরিবে,—জীবন পথ বড় মনোরম, বড় সুগম হইবে—

সমস্ত যাত্রাটুকু তীর্থের ধূলিতে মনের মিলনে শুভের মঙ্গলকলসে কল্লোলিত উৎসবরমণীয় হইয়া উঠিবে।

মেয়েকে মাতৃত্বের গৌরব বুঝাইয়া দাও,—বুঝাও যে অত বড় গৌরব রাজরাজেশ্বরীরও নাই। ছেলে কোলে মায়ের মত বর ও অভয়ের অমন ছবি, প্রেম ও নির্ভরের অমন চূড়ান্ত মেলা, স্বর্গ ও পৃথিবীর অমন পাবন সঙ্গমতীর্থ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়ের কোলের ছেলে—ও তো ছেলে নয়, ও যে দেশ—ও যে পুরাতনের সবটুকু আবার ভবিষ্যতের আরো কত কি। মাকে শুভ দিয়া তাহার কোলের সেই নন্দনের কুঁড়িটিকে বর্ণে মধুতে গন্ধে শতটি দলের নয়নরঞ্জন শোভায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মা শুধু শিশুর দেহের মা নয়, তাহার কোমল হৃদয়বৃত্তি গুলির মা, মুকুলিত জ্ঞানের প্রতি দলটির মা, আত্মার অন্তর্লীন দেবত্বটি অবধি ধরিয়া জীবনের সবটুকুর স্তন্যদায়িনী মা, পশুর মা আর মানুষের মায়ে এইখানে তফাৎ।

তাই বলি মা হইবার মত করিয়া গড়ার নামই স্ত্রীশিক্ষা। মা গড়িতে গিয়া সবার আগে হৃদয়টি গড়িতে ভুলিও না, বহির্জগতের জ্ঞান দিতে গিয়া মেয়ের বুকের মাঝে পরমার্থের পতিতপাবন তীর্থটি রচিয়া দিও, জগতের অঙ্গনে মেয়ের নূতন মুক্তির সংসার পাতিতে গিয়া ভারতের সতীর গৌরব ও মায়ের স্বর্ণ আসন তাহাকে দেখাইয়া দিও। তবেই সে স্ত্রীশিক্ষা সার্থক হইবে।

ভারতের নারীধর্ম্মের যুগযুগান্তের অখণ্ড আকাশছোঁয়া একটি ইতিহাস আছে, য়ুরোপের দান কুড়াইয়া লইতে গিয়া জাতির সে ধারাটি যেন হারাইয়া না যায়। নকল চিরদিনই নকল, আসলের খুব কাছাকাছি হইলেও আসলের দামে তাহা বিকায় না। চৈত্রের ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় সত্যবালার ডাক শুনিয়া প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁর প্রাণে নূতনের বাঁশী, আমার প্রাণে পুরাতনের বাঁধা, সঙ্গত জমিয়াছে ভাল। আমিও সত্যবালার সহিত বলিতে চাই,—"আমার অন্তরে যে সুর ধ্বনিত হইয়া এমন উজানে বহিয়াছে, সেই সুর যদি ইহাদের কর্ণে তুলিতে পারি। * * * ভালবাসার বাঁশী কোন্ রন্ধ্রে ভরিব, তবে সে ধ্বনি ফুকরিবে,—তাহার প্রত্যক্ষ বোধ আজ আমার তপস্যা"।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

রামগোপাল ঘোষ

কর্ম্ম জীবন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (Montifeare Joseph) যোসেফ নামক একজন ইহুদি কলিকাতায় ব্যবসা করিতে আসেন ও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের নিকট গ্রাণ্ট লেনে অফিস খুলেন। কলভিন কোম্পানী নামক কুঠির টমাস অ্যাণ্ডারসনের নিকট তিনি একখানি পরিচয় পত্র আনিয়াছিলেন। যোসেফ অ্যাণ্ডারসনের নিকট একজন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রার্থনা করায়, অ্যাণ্ডারসন হিন্দু কলেজের একটি কর্ম্মপটু ও বুদ্ধিমান ছাত্রকে পাঠাইয়া দিবার জন্য ডেভিড হেয়ারকে অনুরোধ করেন। কলেজে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি রামগোপালের উপর হেয়ারের দৃষ্টি ছিল। রামগোপাল হেয়ার সাহেবের 'বড়ের' মধ্যে একজন। বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইয়া, উড়ানী গায়ে ও চটি জুতা পায়ে দিয়া, বেশ ভূষায় ভূষিত ধনী সহাধ্যায়ী অপেক্ষা, সকাল-সকাল কলেজে আসিতে সক্ষম হইতেন এজন্য তিনি চিরকাল 'হেয়ার সাহেবের বড়ে' বলিয়া বড় গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন। হেয়ার তাঁহাকে অধ্যবসায়ী ও কার্য্যক্ষম বলিয়া জানিতেন ও তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও সমধিক অবগত ছিলেন, সে কারণ তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার্থ অ্যাণ্ডারসনের নিকট প্রেরণ করেন। অ্যাণ্ডারসন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশানে যাতায়াত করিতেন এবং এই সূত্রে উহার উজ্জ্বল রত্নটিকে চিনিতেন। তদ্ব্যতীত হেয়ার সাহেব তাঁহার জন্য সুপারিস্ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সুগঠিত সুন্দর আকৃতি ও ভদ্রোচিত ব্যবহারাদিতে যোসেফ তাঁহাকে প্রথম দর্শনেই পছন্দ করিয়াছিলেন, তবে কার্য্যক্ষেত্রে রামগোপাল কিরূপ বুদ্ধির পরিচয় দেন দেখিবার জন্য সাহেব তাঁহাকে দেশের উৎপন্ন কাঁচা ও শিল্পজাত বস্তু এবং যে যে স্থানে এ শ্রেণীর যে সকল বিশিষ্ট বস্তু জন্মায়, তাহার যে অংশ দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হয় ও যে অংশ রপ্তানী হয় এক কথায় বাঙ্গালার দেশোৎপন্ন কাঁচা ও শিল্পজাত বস্তুর তালিকা এবং বাঙ্গালা দেশের রপ্তানীর একটি সম্পূর্ণ বিবরণী প্রস্তুত করিতে বলেন। উপাদান স্বরূপ যোসেফ তাঁহাকে কেবল কয়েক দিস্তা কাগজ ও একতাড়া হাঁসের পেন কলম দেন। রামগোপাল

এই বিবরণীটির উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য সময় লইয়াছিলেন। তাঁহাকে ইহার জন্য বহু পুস্তকের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল, বহু ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ সঙ্কলন করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালে বাহির হইতেন, ব্যবসায়ী, দোকানদার, প্রত্যেকের নিকট যথাসম্ভব খবর লইতেন, নানা উপায়ে সে সকলের সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতেন। ইহার ভিতর সুবিধামত একস্থানে অতি সংক্ষেপে আহার শেষ করিয়া লইতেন। এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া তিনি দেশোৎপন্ন কাঁচা ও শিল্পজাত বস্তুর যে তথ্য সংগ্রহ করেন তাহা সে সময়ে আর কেহ জানিতেন না। বিবরণী পাঠ করিয়া যোসেফ চমৎকৃত হন। বিবরণীতে রামগোপাল বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সাহেব অনেক প্রয়োজনীয় বস্তুর সন্ধান লাভ করেন। ইহার পর ৫০৲ মুদ্রা মাসিক বেতনে তিনি যোসেফের নিকট চাকরীতে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স সতের বৎসর মাত্র।

প্রথম হইতেই যোসেফ রামগোপালকে সুনজরে রাখিয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি যোসেফের কার্য্যে এরূপভাবে আপনাকে নিয়োগ করিলেন যে তাহাতে যোসেফের ব্যবসায়ের যে দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল সে উন্নতিতে তাঁহার কার্য্যকুশলতা অনিবার্য্যরূপে প্রকাশ পাইল, সুতরাং রামগোপালেরও ত্বরায় উন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় ব্যবহার্য্য রংএর বড় অভাব ছিল। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনে প্রস্তুত রংএর তখনও প্রচলন হয় নাই। ভারতবর্ষের নীল তখন পৃথিবীর নীল রং যোগাইত, যোসেফ লাল রং হস্তগত করিবার জন্য কুসুম ফুলের সন্ধান লইতেছিলেন। য়ুরোপবাসিনী রমণীগণের মুখলাবণ্য বর্দ্ধন করিবার জন্য যে গোলাপী (Rouge) রুজ ব্যবহৃত হয়, তাহার রং কুসুমফুল হইতে গৃহীত হইত। রামগোপাল এই রংএর আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ অনুমান করিয়া কুসুমফুলের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারেন যে ঢাকা ও তন্নিকটস্থ স্থানে প্রচুর পরিমাণে কুসুমফুল উৎপন্ন হয় ও এ খবর যোসেফকে জ্ঞাপন করেন। যোসেফ তাঁহাকেই ঢাকা যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ঢাকায় সে সময় রেলপথ ছিল না, ষ্টিমার ছিল না, পূর্ব্বাঞ্চলে যাইবার একমাত্র যান নৌকা, আবার পথে ডাকাইতেরও অত্যন্ত ভয় ছিল সুতরাং পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল।

তিনি এ সকল জানিয়াও তৎক্ষণাৎ সম্মত হন। নবীন যৌবনের অপ্রতিহত উদ্যমে তিনি অসম্ভব বলিয়া কিছু স্বীকার করিতেন না। গৃহে ফিরিয়া এ প্রস্তাব তাঁহার পিতার নিকট প্রকাশ করেন। রামগোপাল গোবিন্দ চন্দ্রের একমাত্র পুত্র—তাহা না হইলেও সে সময়ে কোন্ পিতা পুত্রকে কষ্টসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল দূর দেশে ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রেরণ করিতে পারিতেন? পিতা ও পরিবারস্থ সকলে ঘোর আপত্তি করিলেন, জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়া তিনি নৌকাযানে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন।

ঢাকায় চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ এই কুসুম ফুলের ব্যবসা চলিয়াছিল। সরকারী কাগজ পত্রে প্রকাশ এক বৎসর ঢাকা ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থান গুলিতে দুই লক্ষ টাকার কুসুম ফুল বিক্রয় হইয়াছিল। অধুনা এ স্থান হইতে কুসুম ফুলের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, শুধু নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি দুই একটি স্থানে এখন কচিৎ কুসুম ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকায় পৌছিয়া তিনি প্রধান প্রধান ব্যবসাদারদিগের সহিত আলাপ করিয়া লন এবং তথাকার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। মিশুক ব্যবসাদারের যেরূপ সুবিধা হয়, তাহা তাঁহার হইয়াছিল। কুসুম ফুল সরবরাহ করিবার জন্য যে সকল সংবাদের প্রয়োজন ছিল, তাঁহা ব্যতীত তিনি ঢাকার স্থানীয় উৎপন্ন বস্তুর বিবরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কুসুম ফুলের কার্য্যে বিশেষ লাভ হয়। কলিকাতাস্থ কলুটোলা নিবাসী হরিমোহন সরকার তখন যোসেফের মুচ্ছুদ্দি, রামগোপাল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

ইহার পর তিনি রেসমের অনুসন্ধানে মেদিনীপুরে গমন করেন। অবশ্য তখন নৌকাই বাঙ্গালা দেশের যাতায়াতের যান ছিল। বাষ্পীয় শকট, মটরগাড়ী, ডুবো বা উড়ো জাহাজ প্রভৃতি দ্রুতভ্রমণের কথা তখন পুরাণের পুঁথীতে পাওয়া যাইত মাত্র, অশ্বারোহণে যাইবার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ছিল, নদীবহুল বঙ্গদেশে নৌকা যানই সুগম ছিল। তিনি নৌকায় করিয়া মেদিনীপুরে গমন করেন। রেশম ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার সহিত টাকার তোড়া ছিল। নৌকা যখন ঘাটালের সমীপবর্ত্তী হইতেছিল, সেই সময় একটি টাকার তোড়া হঠাৎ শিলাই নদীর জলে পড়িয়া যায়। শিলাই রূপনারায়ণে আসিয়া মিশিয়াছে। রূপনারায়ণে অত্যন্ত কুম্ভীরের ভয়, তখন

আরও অধিক ছিল। তিনি মাঝীদের এ নিমজ্জিত থলী উঠাইতে বলায় তাহারা কুম্ভীরের ভয়ে কেহই রাজী হয় নাই। পুরস্কার প্রাপ্তির লোভেও প্রাণের মায়া কেহই ছাড়িতে চাহিল না। তাহারা বলিল, "আমরা নিত্যই এই জলে কুম্ভীর দেখিতেছি, আর বিশ্বাস না হয়, তীরে নৌকা লাগাইয়া স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি কেহ এই নদীতে নামিতে রাজী হয়, তাহা হইলে আমরা নামিব।" ইহা শুনিয়া তিনি অবিচলিত চিত্তে স্বয়ং জলে নামিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন, মাঝীরা নিবারণ করিল, বাধা দিল। তিনি লাফাইয়া পড়িলেন, মাঝিরা ব্যাকুল হইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিল। নদীর জলে টাকার তোড়া কোথায় পড়িয়াছিল, তাহার স্থিরতা ছিল না; তিনি ডুব দিয়া তলদেশ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিলেন, বালি ভিন্ন অন্ত কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। মাঝীরা এবার তাঁহাকে নৌকায় উঠিয়া আসিবার জন্ত সাগ্রহে অনুরোধ করিল কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিবার স্বভাব তাঁহার ছিল না, দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ডুব দিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ চেষ্টার পর তিনি টাকার তোড়া তুলিয়া নৌকায় ফেলিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সন্তরণপটু ও বলিষ্ঠ রামগোপাল কুম্ভীরের মুখ হইতে এইরূপে টাকার তোড়া উদ্ধার করেন। বিশ্বাস পূর্ব্বক যে অর্থ তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল প্রাণপাত করিয়া তাহার রক্ষা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে গিয়া সেই অর্থে তিনি যোসেফের জন্ত রেশমের কার্য্য করেন। এ কার্য্যেও যোসেফ যথেষ্ট লাভবান হন। ইহার পর রামগোপাল রেশমের ব্যবসা উপলক্ষে কাশিমবাজারে গমন করেন এবং সেখানেও সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে অর্থদানে বিমুখ হন নাই।

ইহার পর রামগোপালের উপর যোসেফের বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তাঁহার ব্যবসা-বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি অচিরে তাঁহাকে যোসেফের আফিসের মেরুদণ্ড করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে যোসেফ নূতন কার্য্যের প্রবর্ত্তন ও উন্নতির জন্ত য়ুরোপ যাইবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার সাধুতায় ও কার্য্যদক্ষতায় যোসেফের এত বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাঁহার কারবারের সমস্ত ভার যুবক রামগোপালের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। রামগোপাল শুধু সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন না, কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট বিচক্ষণতা প্রমাণিত হইয়াছিল, তিনি অনায়াসে সদাগর যোসেফের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি যোসেফের নির্ব্বাচনের সফলতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যত্ন ও বুদ্ধি-

সহকারে ব্যবসাটি চালাইয়া প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনে ব্যবসার বৰ্দ্ধিত আয় তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করেন। কৃষ্ণদাস পাল এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Ram Gopal fully justified his master's choice, he conducted business with care and prudence and showed good profits to him on his return to India." বলা বাহুল্য যোসেফ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যোসেফ কেলসেলের সহিত মিলিত হন ও তাঁহার অংশীদার হন। রামগোপাল এই যৌথকারবারের মুচ্ছুদ্দি নিযুক্ত হন। কিন্তু কেলসেল কাহারও সহিত একসঙ্গে কারবার করিতে পারিতেন না। অল্পকালের মধ্যেই যোসেফের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ হইল ও দুই অংশীদার পৃথকরূপে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রামগোপালকে উভয়েই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের একজনের কারবারের তিনি মুচ্ছুদ্দি পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যোসেফের সহিত তিনি মিলিত হন, কিন্তু কেলসেলকে অংশীদার লওয়ায় এবং উভয় অংশীদারের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করায়, যোসেফই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। রামগোপাল উভয় কারবারেরই ভিতরকার অবস্থা অবগত ছিলেন। তিনি কোন্ কুঠিতে যোগ দিবেন তাহা স্থির করিবার জন্ত তাঁহার পূর্ব্ব সাহায্যকারী অ্যাণ্ডারসন এবং কলভিন নামক আর দুইটি ইংরাজ সওদাগর ও তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন। সকলেই এক বাক্যে তাঁহাকে কেলসেলের সহিত কার্য্য করিতে উপদেশ দেন, তিনিও কেলসেলের সহিত মিলিত হইয়া নূতন উদ্যমে ও পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা লইয়া নূতন কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি কেলসেল কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি নিযুক্ত হন। সদাগরের বাটীর মুচ্ছুদ্দি তখন একটি সম্মানের পদ ছিল। বঙ্গবাসী তখন চাকুরীগতপ্রাণ হয় নাই, স্বয়ং ব্যবসা করা বা তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সে জন্য তিনি মুচ্ছুদ্দির সম্মান পিতাকে দিবার জন্য কেলসেলের কুঠীর সহিত যে লেখাপড়া হয়, আমরা শুনিয়াছি, তাহা তাঁহার পিতার নামে করিয়াছিলেন। দায়িত্ব অবশ্য রামগোপালের উপরই ছিল এবং কার্য্যাদিও তিনিই চালাইতেন। এই সময় ৪৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট্ কেলসেলের আপিশ ছিল।

কেলসেল তাঁহার ন্যায় কার্য্যতৎপর, পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যপ্রিয় ব্যক্তিকে

মুচ্ছুদ্দি পাইয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। রামগোপালও তাঁহার স্বভাবসুলভ দক্ষতার নিমিত্ত সর্ব্ব কার্য্যই প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যবসা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সেই জন্য অনেকে বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার অনুসন্ধানের বিশাল পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। সওদাগর এম, সি, ভাইসস্মিথ (M. C. Vicesmith) কোম্পানীর স্মিথ সাহেব কোন একটি প্রয়োজন উপলক্ষে একবার কেলসেলের নিকট গমন করেন। কেলসেল তখন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তাঁহাকে তাঁহার মুচ্ছুদ্দি রামগোপালের নিকট প্রেরণ করেন এবং সাহেব তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আপিসে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার মুচ্ছুদ্দিকে বলিয়াছিলেন যে মুচ্ছুদি রামগোপালের তুলনায় তাঁহার মুচ্ছুদি সামান্য দালাল মাত্র। কৃষ্ণদাস পাল এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Mr Smith was struck at the fund of information which Babu Ram Gopal possessed and on returning to his office he remarked to his Banian, that he and others of his class were not better than mere brokers, but the only man among them who was fit to assist the English merchants was Babu Ram Gopal Ghose."

এই সময় মতিলাল শীল ব্যবসা সূত্রে কেলসেলের কুঠীতে যাতায়াত করিতেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি কেলসেলের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তিনি যুবক রামগোপালের ইংরাজোচিত কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "Robert" (রবার্ট) ভবিষ্যতে ব্যবসায় ও জীবনে বিশেষ উন্নতি করিবেন। রামগোপাল তখন ব্যবসায়ীর সমাজে অনেকের নিকট 'রবার্ট' নামে পরিচিত ছিলেন।

(৬)

বিদ্যানুশীলন ও "জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা"।

রামগোপাল কর্ম্ম-নির্ব্বন্ধে এত অধিক পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে কখন বিস্মৃত হয় নাই। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও জল হাওয়ার দোষে বিদ্যালয় ত্যাগের পর এ দেশে শিক্ষিতদিগের জ্ঞান

অনুশীলনে যে জাতিগত ঔদাসিন্য দেখা যায় তাহা হইতে তিনি আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। য়ুরোপীয়ানদিগের ক্লাব, লাইব্রেরী, সংবাদপত্রের দ্বারা বিদ্যার অনুশীলন ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধিত হয়। আমাদের দেশেও একটি প্রবাদ বাক্য ছিল যে যদি "না পড়াও পোত সভায় নিয়ে থো"—পুত্রের শিক্ষাদানে অক্ষম হইলে তাহাকে সভাতে, শিক্ষিতদিগের সহিত মিশিতে দিতে হয়। সভাসমিতিতে শিক্ষিতের সাহচর্য্যে অনেক অশিক্ষিতের অনেক জ্ঞান লাভ হয়, এইরূপে একের শিক্ষার ফল সাধারণে উপভোগ করিয়া একটি পরিণত মানসিক সমবায়ের সৃষ্টি করে। তদ্ব্যতীত প্রণালী সহকারে দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, বহু কার্য্য সম্পন্ন করিবার অবসর পাওয়া যায়। ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগের মনোমধ্যে এ সকলের উপকারিতা বিশেষভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি হইয়াছিল, রামগোপাল কর্ম্মজীবনে অবিরত পরিশ্রম করিয়াও, উহার সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। তিনি সদাগর আফিসের কর্ম্মের অবকাশে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাহিত্য মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। সেক্সপীয়র রচিত নাটক পাঠে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। নিজ বাটীতে বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া নাটক গুলির গুণ ও সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতেন। এই সময়ে তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ যে "জ্ঞানান্বেষণ" নামে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন, তাহার আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। প্রতি শনিবারে তিনি হিন্দু কলেজে যাইয়া তথায় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত ইংরেজী সাহিত্যাদির আলোচনায় সপ্তাহের শেষ দিন যাপন করিতেন। এই সময় স্পীড নামক এক ব্যক্তি হিন্দু কলেজের প্রথম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের বর্ণনাশুদ্ধি শোধন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। স্পীড বলিতেন "একটিমাত্র বর্ণনাশুদ্ধি দ্বারা সুপণ্ডিতেরও সাহিত্যে অখ্যাতি হইতে পারে"। যোসেফ ইহুদি ছিলেন, শনিবার তাঁহার আফিস বন্ধ থাকিত; রামগোপাল নির্ভুল বানান শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতি শনিবারে স্পীডের নিকট হইতে অন্যান্য ছাত্রের সহিত একত্রে শ্রুতিলিপি গ্রহণ করিতেন।

বহুকালাবধি রামগোপাল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ডিরোজিওর বিদায়ের পর সভাটি হেয়ার স্কুলে উঠিয়া যায়

এবং মহামতি হেয়ার সভাপতি হন, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইবার উদ্যোগ হয়। রামগোপাল ও ডিরোজিওর অন্যান্য ছাত্রেরা ইহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। ইহারা লিপিলিখিত সমিতি (Epistolery assouiation) নামে একটী সমিতি ও একটি (circulating library) স্থাপন করেন। উৎকৃষ্ট পুস্তক ক্রয় করিয়া বন্ধুদিগের মধ্যে পাঠের জন্য বিতরিত হইত এবং লিপিলিখন সভার অধীনে পুস্তকের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিপি কৌশল অভ্যাস করা হইত। প্রধানতঃ রামগোপাল ও রামতনু উভয়ে এই দুই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। রামগোপাল সান্যাল মহাশয় সংগৃহীত মুদ্রিত পত্রাবলীর মধ্যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারি তারিখে রামগোপাল ঘোষের এক পত্র পাঠে বুঝা যায় যে শেষোক্ত সভাটি অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি কলিকাতা হইতে গোবিন্দচন্দ্রকে লিখেন যে লিপিলিখন সমিতির পুনর্জ্জীবন প্রয়োজন এবং অবসর পাইলে তিনি ইহার পুনর্জ্জীবনের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন।

বিলাতে যাঁহারা বাগ্মী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, প্রচারক প্রভৃতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বাক্‌শক্তি ও প্রতিভা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট তর্কসভার যুক্তি ও ভাষা প্রয়োগের যথাযথ অনুশীলনে গঠিত হইয়াছিল। অনেকে সে সময়ে যে উৎসাহ লাভ করেন তাহা অদম্য উদ্দীপনার চিরন্তন উৎসরূপে মনোমধ্যে আজীবন রহিয়া গিয়াছে। বহু মনস্বীর চিন্তা শক্তি এই সভায় সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে নূতন সজ্জায় বাহির হয়। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, ডাবলিন প্রভৃতির পক্ষে যাহা মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে, বাঙ্গালার মাটিতে কলিকাতার আবহাওয়ায় তাহা অসম্ভব নয় স্থির করিয়া রামগোপাল ও তাঁহার বন্ধুবর্গ মানসিক বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত করিবার ও উহাদিগের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে অ্যাকেডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের শেষ অবস্থায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা" (Society for the Acquisition of General knowledge) নামক একটি সমিতির প্রস্তাব করেন। তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রাজকৃষ্ণ দে এই পাঁচজন স্বাক্ষরিত একখানি অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত করিয়া এই উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা আহূত হয়।

জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার অনুষ্ঠান পত্রে সভার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে যে শিক্ষালাভ হয় তাহারই উপর সাংসারিক জীবনের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। উহার উন্নতি করিতে হইলে অনুশীলন আবশ্যক। সভ্যদেশে এই অনুশীলন সভা সমিতির দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে যে সভাগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়াছে এবং বাকীগুলি মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত বাঙ্গালী-লেখনী প্রসূত সন্দর্ভের নিতান্ত বালকসুলভ প্রকৃতি হইতে অনুশীলনের দীনতা বেশ বুঝা যায়। এ সময় গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় এদেশীয়দিগের মধ্যে গৌরব বা তৃপ্তি বোধ করিবার উপযুক্ত চিন্তাশীলতা ও উচ্চ আদর্শ চরিত্র উভয়েরই অভাব। অনুশীলনের প্রতি-যোগিতায় জ্ঞানোপার্জ্জনের আনুকূল্য, সভার সভ্যদিগের মধ্যে সৌহৃদ্য সংস্থাপন ও হিতকর কার্য্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার সৎ উদ্দেশ্যে ১২ই মার্চ্চ সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় সংস্কৃত কলেজের হলে ইহার আনুষ্ঠানিক সভা সমাহুত হয়। সেই তারিখেই সাধারণ 'জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা'র সৃষ্টি হয়। এই সভায় সকল সভ্যকেই চাঁদা দিতে হইত না, কিন্তু যিনি প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অসমর্থ হইতেন ও তাহার সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে অক্ষম হইতেন তাঁহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। এইরূপে প্রবন্ধ পাঠকের অনুশীলনের অবহেলার নিমিত্ত দণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল।

তদানীন্তন সময়ের সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠান পত্র বিতরিত হইয়াছিল। আহুত সভায় প্রায় তিনশত যুবক সমাগত হয়। এই অধিবেশনে রামগোপালের বক্তৃতা করিবার কথা ছিল কিন্তু সেইদিন তাঁহার শিশুপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কলিকাতা হইতে ১৭ই মে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য মনোনীত হন :—

সভাপতি :—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, সহকারী সভাপতি :—কালাচাঁদ শেঠ ও রামগোপাল, সেক্রেটারি :—রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র, কোষাধ্যক্ষ :— রাজকৃষ্ণ মিত্র।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ :—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন,

মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ দে। ইঁহাদিগের মধ্যে মাধবচন্দ্র অচিরে কর্ম্ম নির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

রামগোপল এই সভার উৎসাহী সভ্যগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। সভার একটি অধিবেশনে বিশৃঙ্খলা ঘটে, তজ্জন্য তিনি কয়েকজন সভ্যের প্রতি তীব্র ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহার জন্য পরে তিনি দুঃখিত হন ও পদত্যাগ করিবারও ইচ্ছা করেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আন্তরিক যত্ন করিতেন। তাঁহার বিরক্ত হইবার কারণ এই যে, সভার কার্য্যাদি প্রধান সভ্যদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগকে সভায় যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই। সাধারণে যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, সাধারণে যাহাতে সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারে, প্রকৃত জননায়কের এই বিশেষত্ব তাঁহার চরিত্রে প্রথম হইতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। Black Acts বা কালা আইনের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন যে স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য তিনি উহার সমর্থন করিতে বাধ্য। তাঁহার ব্যক্তিগত মঙ্গল তুচ্ছ করিয়া তিনি ভারতবাসীর উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। সে সময় সমস্ত ব্যবসা য়ুরোপীয়ানদিগের হস্তে ছিল। এদিকে তিনি স্বয়ং ব্যবসায়ী ছিলেন। কালা আইনে বেসরকারী ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধে ক্ষতির সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য একমাত্র তিনিই ইহার স্বপক্ষতা করেন। এ কারণে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাঁহার দেশবাসীর মঙ্গল ভুলিতে পারেন নাই। নিমতলা ঘাট হইতে শবদাহ শ্মশান স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার নিজের দেহ যেস্থানেই পোড়ান হউক তাহাতে তিনি দুঃখিত ন'ন, কিন্তু দেশের লোক এই পরিবর্ত্তন বিশেষ হানিকর বলিয়া মনে করে, সুতরাং তিনি দেশের মুখপাত্ররূপে ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচনা করেন। নিজের সুখ দুঃখ ও অভিমত তাঁহার দেশবাসীর নিকট বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের মঙ্গল ও সম্মানের পতাকা হস্তে তিনি অগ্রসর হইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমরা যথাস্থানে ইহার সম্যক্ আলোচনা করিব। তিনি সেই পত্রেই জ্ঞানোপার্জ্জনী সভার অধিবেশনের স্থান সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা শুধু হলটি

ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, কিন্তু সভার জন্ত আলোক ও আসবাব আপনাদিগকেই যোগাইতে হইবে। ব্যয়ের জন্ত স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা সংগৃহীত হইবে। তিনি গোবিন্দ চন্দ্রের নিকট হইতে এবং অন্ত রায় বাহাদুর বন্ধুর নিকট হইতে সমধিক অর্থের আশা করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড নরগেট (Norgate) কৃষ্ণমোহনের হস্তে ও রামগোপালের একটি সাহেব বন্ধু রামগোপালের হস্তে প্রত্যেকে পঞ্চাশ মুদ্রা এককালীন দান করেন। প্রায় দুইশত ব্যক্তি এই সভার সভ্য তালিকাভুক্ত হন ও কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসরকাল ইহা স্থায়ী হয়। এই সভার মুদ্রিত কার্য্যাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইতিহাস, দর্শন ভূবৃত্তান্ত, সাহিত্য কবিতা, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হইত। তদানীন্তন সময়ে এই সভাটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আলোচনার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত।

ভিটা সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপ।

কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়াছেন:—"As Banian to Kelsall and Co. he (Ramgopal) literally rolled in prosperity. He then used to reside at the Kamarhatty groves, the well known residence of Mr. Dowdswell, one of the first members of the Board of Revenue and latterly of Mr. Dorin, Vice President of the Supreme Council He had a large establishment, an open table and was profuse in his liberality. রামগোপাল কেলসেল কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দিরূপে প্রচুর ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় (রাম) তনুর সহিত কামারহাটি কুঞ্জ নামক বাগানবাড়িতে বাস করিতেন। এই বাগানে এখন সুবিখ্যাত কামারহাটি জুটমিল চলিতেছে। তাঁহার পূর্ব্বে রেভেনিউ বোর্ডের প্রথম মেম্বর ডাউডসওয়েল, বড়লাটের মন্ত্রীসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডোরিন এবং তাঁহার পরে কলিকাতা সদর কোর্টের জর্জ স্মিথ, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার ব্রমলি, কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রার (পরে সার) টমাস টার্টন (Thomas Turton) ব্যারনেট প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই কামারহাটি কুঞ্জে বাস করেন। রামগোপাল অতিশয় বন্ধুপ্রিয় ছিলেন, বন্ধুবান্ধব না হইলে থাকিতে পারিতেন না। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ

করিয়া পরিতোষ সহকারে বন্ধু-সৎকার করিতেন। কাহারও অর্থের প্রয়োজন হইলে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। পূর্ব্বোল্লিখিত মুদ্রিত পত্রাবলীর মধ্যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার এক পত্রে ও সেই সময়ের দৈনিক লিপিতে লিখিত হইয়াছে যে কাশিপুরের Gun foundryর এক কর্ম্মারশালায় একটি অভিজ্ঞ য়ুরোপীয়ানের অধীনে তাঁহার লৌহের ষ্টিমার নির্ম্মিত হইতে ছিল। বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র তখন চট্টগ্রামে, রামগোপাল সেই পত্রে লিখেন যে হয় ত একদিন এই ষ্টিমারে চড়িয়া গিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিবার সুখানুভব করিবেন। ষ্টিমারখানির নাম ছিল 'লোটাস' (lotus)। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন "লোটাস ষ্টিমারটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা তাহার নামের উপযুক্ত ছিল। সেটিকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত।" এই ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পূজার ছুটিতে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার সহিত রাজমহল ও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসেন। রামগোপাল কামারহাটি হইতে কখন এই ষ্টিমারে, কখন বা, পাল্কীগাড়ি বা বগী আরোহণ করিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। তাঁহার দুটি বিলাতী অশ্ব কলিকাতার বাঙ্গালীদিগের মধ্যে 'হাওয়া' ও সাহেবদিগের মধ্যে 'Thunderer' নামে খ্যাত ছিল।

এই সময় তিনি রাগাটিস্থ ভিটার সংস্কার সাধন করেন, তথায় নূতন দরদালান বৈঠকখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন ও বাটির অনেকাংশের পরিবর্ত্তন করিয়া পৈতৃক ভিটাখানিকে তাঁহার সম্পদে শ্রীমণ্ডিত করিয়া সজ্জিত করেন। জননীর ইচ্ছানুসারে এই পৈতৃক আবাসস্থানে তিনি মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পূজাদি আরম্ভ করেন। যাহা পুরাতন তাহার ইতিহাস আছে, সময় তাহার সহিত একটি না একটি ঘটনা সংযুক্ত করিয়া তাহার উপর আপনার বিশিষ্ট মোহর অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, পুরাতন তাই সর্ব্বদাই আলোচনা ও শিক্ষার স্থল, নূতনের বিশেষত্ব একটি মুখর সমস্যা। পুরাতন জাতি তাই মানবচরিত্র শিক্ষার বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, এদিকে নূতন জাতি মানব চরিত্রের একটি অপরিহার্য্য সমস্যা। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অপূর্ব্ব দেশ যেখানে মিশর, গ্রীস, রোমান সভ্যতার ন্যায় একেবারে প্রাচীন সভ্যতার চিতা ভস্মের উপর ফিনিক্সের ন্যায় সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতার সৃষ্টি না হইয়া, পুরাতন হিন্দু সভ্যতার মেরুদণ্ড লইয়া বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি প্রত্যেক যুগেই জাতির চিত্ত বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সে দেশে জাতির পবিত্র শিক্ষা ও সমস্যা উভয়েরই বিচিত্র

সম্মিলন। ভারতে সংস্কারক তাই অতীতের সুবিচারিত প্রজ্ঞা ও নূতনের জীবনীশক্তি লইয়া পরিবর্ত্তনশীল সমাজ মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। রামগোপালও ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে সেই পুরাতন পথের একজন নবীন পথিক। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে তদানীন্তন বেঙ্গলী সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাই লিখিয়াছিলেন যে "তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মনুষ্য সম্প্রদায়ের প্রতিভূ, সাহসী ও ক্ষমতাশালী—যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্কট সময়ে অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।" A typical man; a man of nerve, fit to command in a crisis of change." তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কেহ সে দিকে হেলিয়াছিলেন, কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জননীর ইচ্ছানুযায়ী সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে দুর্গোৎসবাদি পূজা আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতামহ বা পিতা ধনী ছিলেন না, তাঁহারা গৃহে প্রতিমাদি আনয়ন করিয়া পূজা করেন নাই, নব্যবঙ্গের অগ্রণী রামগোপাল ইচ্ছা করিলে প্রতিমাদির প্রবর্ত্তন বন্ধ করিতে পারিতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার "কেশবচন্দ্রের জীবনী ও উপদেশ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের বিশিষ্ট প্রতিনিধি স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষই হিন্দু চিত্তের কতক মৌলিক শক্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। " the first generation whose prominent peoresentalive was perhaps the late Ramgopal Ghose, retained some trace of the original vigour of the Hindu mind." বুঝি ইহাই তাঁহাকে ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে পুরাতন প্রথা রক্ষা করিবার সহজ উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, তিনি তাই হিন্দুর প্রাচীন অতীতের বিরাট বেদীর উপর আসন গ্রহণ করিয়া নব যুগ মন্দিরে সনাতনের আরাধনা করেন। এইরূপে প্রাচীন ও নূতনের অপূর্ব্ব মিশ্রণে তদানীন্তন আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তিনি যে জীবনযাপন করেন তাহাই বিংশ শতাব্দীর বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হইতেছে।

৯. সদাগর আফিসের কর্ম্ম বাহুল্যের নিমিত্ত পূজাদির সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হইলেও পূজার বিশিষ্ট অংশগুলিতে আপনার কর্ত্তব্য প্রায়ই বাদ দিতেন না। রাজনারায়ণ বসু যে বৎসর গৌড়ের পথে ত্রিবেনী হইতে বাগাটিতে গিয়াছিলেন সে বৎসর রামগোপালের সম্পর্কীয় একটি বৃদ্ধ লোক পূজার তত্ত্বাবধান করেন। শান্তিজল লইবার দিন তিনি

রামগোপালকে শান্তিজল লইতে দেখিয়াছিলেন। রামগোপালের পরিবার মধ্যে ব্রত, উপবাস, পূজাদি সমস্তই বিধিমত সুসম্পন্ন হইত। তাঁহার জননী দুইবার তুলট বা তুলাব্রত সমাধা করেন। তিনি নিজবাটীতে মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ দেন এবং অতি সমারোহের সহিত সভাশেষ করেন। তিনি 'বারমাসে তের কীর্ত্তি' সম্পন্ন করিতেন। দুর্গা পূজা, ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থব্যয় করিতেন। সাম্বৎসরিক জাতীয় উৎসবের আনন্দে স্বজন ও বান্ধবদিগের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। দুর্গা পূজার সময় জননী যখন প্রতিমা সমক্ষে 'ধুনা' পোড়াইয়া মঙ্গল কামনা করিতেন, তখন বুড়া বয়স পর্য্যন্ত রামগোপাল কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া জননীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিতেন। প্রতি বৎসরেই দেবী চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত সদাগর আফিসে 'পয়াদিনের বিক্রয়' (Lucky day sale) নামে একটি বিশেষ ক্রয় চুক্তি সমাধা করিবার প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তিনি আজীবনই ব্যবসায়ী সুতরাং তাঁহার নিজের আফিসেও এই ক্রয় সংঘটিত হইত, এজন্য শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইত। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় তিনি তাহার পত্নির অঞ্চলে কনকাঞ্জলি দিয়া কলিকাতায় ফিরিতেন।

দুর্গা পূজার প্রায় দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যাদির উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আবর্জ্জনা শূন্য করিয়া বাগাটির বাটিতে সঞ্চিত হইত। এখানে বলিয়া রাখা উচিত ঘোষ পরিবার বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া রামগোপালের পূজায় কখন জীব বলী হইত না। জননী বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিতেন, অনেককে পুত্রকে যাইয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইত, অন্য কাহারও নিমন্ত্রণে জননী সন্তুষ্ট হইতেন না। এই সময় হইতে পূজার তিন দিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বিকালে নিঃস্ব ও আতুরদিগকে ভোজন করান হইত। এরূপ ভোজনকারীদিগের সংখ্যা বা সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিত না, যে যখন আসিত, যতবার আসিত আহার পাইত। প্রধানতঃ সকালবেলা পকান্ন, মুড়ি, মুড়কি বা চিড়া. মধ্যাহ্নে ভাত, ডাল, মাছের তরকারি, জিলিপি ও পায়স, বিকালে জিলিপি, মিঠাই, পানতুয়া, বোঁদে প্রভৃতি বিতরিত হইত। রামগোপাল প্রতি বৎসর প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা মূল্যের নূতন কাপড় দান করিতেন। পূজার ষষ্ঠির দিন পরিবারভুক্ত ও আত্মীয় স্বজন সকলকে 'কোরা' কাপড় পরিতে হইত। বরাহ নগরের উদয় তাঁতীর সে সময় উত্তম বস্ত্র বয়নের

জন্য খ্যাতি ছিল, তাহার কোরা কাপড়ে গোলাপী 'কোর' থাকিত*, ষষ্ঠির দিন সকলে সেই কাপড় পরিয়া মহানন্দে যাপন করিতেন। প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার পূর্ব্বে পনের দিন যাবৎ তখনকার প্রসিদ্ধ গায়ক জগমোহন (বা জগা) সেকরার চণ্ডীর গান হইত। জননী যাত্রা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রথমে দুর্গোৎসবের সময় যাত্রা হইত, কিন্তু সে সময় যাত্রা হইলে নিমন্ত্রিতদিগের আহারাদির অসুবিধা হইত বলিয়া কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে নারাণ দাসের যাত্রা হইত। যাত্রায় তখন 'পেলা' দিতে হইত। যাত্রার আসরে রেকাবী করিয়া টাকা সংগৃহীত হইয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিত। নবমীর দিন বাগানটিতে সাপ খেলাইতে আসিত। প্রায় দশ পনের দল মাল নানাপ্রকার ভীষণদর্শন ও বিষাক্ত সর্পের নানাবিধ কৌশলাদি দেখাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে আনন্দ প্রদান করিত। আমরা রামগোপালের পূজার একটি নকসা চিত্র এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীপ্রিয়নাথ কর

ব্রজ-গোপাল।

সুচারু শিখি-পাখা-ভূষণে মনোরম, শোভিত মৃগমদ-তিলকে;
কপোল পরশিতে বিলোল, ঝলমল কনক-কুণ্ডল ঝলকে!
কমল-দল জিনি আয়ত আঁখি দুটী, কণ্ঠে ত্রিবলী-রেখা সে,
মৃদুল স্মিত হাসি, সুভগ-বৈভব, আননে অরুণ বিকাশে।
অধরে সুললিত, মুরলী বিমোহিনী;—নীরদ-শ্যাম-ছবি ভাসে রে!
শান্ত-বিভাযুত সুঠাম বঙ্কিম, উজল রবি-কর-বাসে রে!
বিবিধ-বন-ফুল-মালিকা-বিভূষিত ব্রজ-গোপ-বাল মুরতি
প্রণমি ব্রজপুর-বিলাস-লীলা-রত, সঙ্গে শত গোপ যুবতী।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম্, এ।
কুচবিহার।

---

* আঁচলায়।

জেরাও-ং

(গল্প)

(প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প লেখক Adrienne Cambry এর একটি গল্প হইতে)

দৃশ্য ।

[সামান্ত একটি কক্ষ, দুইখানি চেয়ার, একটি টেবিল, ও ক্ষুদ্র-একটি পুস্তকাগারে গৃহখানি সজ্জিত। ক্লোতিলদ্ টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্টা, তাহার পুস্তক-কয়টি টেবিলের উপর রাখা আছে।]

রেনের টুপি-হস্তে প্রবেশ।

রেনে—নমস্কার মাদ্‌মোয়াজেল্ (মহাশয়া), আপনার কুশল ত ?

ক্লোতিলদ্—আজ্ঞে, হাঁ। ধন্যবাদ মিঃ রেনে। আপনি ভাল আছেন্ ত ?

রেনে—আমি !—হাঁ, চির দিনই যেমন থাকি।

ক্লোতিলদ্—চিরদিনই যেমন থাকেন—সে আবার কেমন কথা !—খোলসা করে বল্‌তে হয়।

রেনে—আপনি বেশ জানেন আমি পীড়িত।

ক্লোতিলদ্—না, আমি ত তা' জানি না।

রেনে—জানেন না। তবে সে আমার দুর্ভাগ্য।

ক্লোতিলদ্—বাস্তবিক আপনার পীড়ার কথা আমি কিছুই জানি না।

রেনে—কেন—প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় ল্যাটিন পড়তে যখন আপনার নিকট আসি, তখন বরাবর ত এ কথা আপনাকে জানিয়ে থাকি।

ক্লোতিলদ্—ল্যাটিন পড়া !—আসুন তবে আরম্ভ করা যাক্। সব দিনই ত শুধু বাজে কথায় কেটে যায়।

রেনে—(বিরক্তি সহকারে) সে অপরাধ আমার নয়। আপনিই ত আমার স্বাস্থ্যের কথা পেড়ে থাকেন, সৌজন্যের খাতিরে বাধ্য হয়েই না আমায় উত্তর দিতে হয়। আমি বুঝতে পারি নে আপনি নিরর্থক আমার স্বাস্থ্যের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন—আপনি ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ক্লোতিলদ্—এ আপনার কল্পনা মিঃ রেনে। আজ বুঝি বা কল্পনার দৌড় আরো অনেক দূরে গিয়েছে। মিঃ রেনে, আপনার কল্পনাশক্তি বেজায় প্রখর !

রেনে—আমার তা' বেশ জানা আছে, মাদ্‌মোয়াজেল। শিশুকাল থেকে

লোকে এ কথা আমায় ব'লে আসছে। যখন ছ-বছরেরটি ছিলাম, তখন নিজের কাছে নিজে গল্প আবৃত্তি করে আমি কৌতুক উপভোগ করতুম, নিজের মনে নিরিবিলি কত কি বকতাম, তাই এমন রুগ্ন হয়ে পড়েছি। এই কল্পনাপ্রাখর্য্যই ত আমার রুগ্নতার কারণ.........

ক্লোতিলদ্—(রেনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) যেমন রুগ্ন আজ দেখাচ্ছে।

রেনে—হাঁ—হাঁ—আজ বড় রুগ্ন দেখাচ্ছে না কি?

ক্লোতিলদ্—বাস্তবিকই কি আপনি তাই বিশ্বাস করেন, না—এ আপনার কল্পনার খেলা?

রেনে—না—না—এ আমার কল্পনা নয়। সারা জীবন ধরে এ ব্যাধি আমি পোষণ করে আসছি এবং এতেই আমার জীবনলীলার সাঙ্গ হবে।

ক্লোতিলদ্—আমরা সবাই একটি না একটি মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছি; অল্পবিস্তর অনেক কাল ধরে তাকে সইতেই হয়। এই ত জীবন। আসুন এখন তবে পড়া আরম্ভ করা যাক্। বাড়ীতে বেশ মন দিয়ে পড়েছেন ত?

রেনে—হাম্। (Hum!)...........এ আমার মাথায় ঢোকে না, ছাই।

ক্লোতিলদ্—বটে! আপনার মাথায় ঢোকে নাই ঠিক। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা মিঃ রেনে, কারণ আপনার এ বয়সে কেউ কিছু নূতন শিখতে গেলে বিষয়টিতে তিনি যে আকৃষ্ট এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে তাতে আনন্দ পাবার ত কথা. সুতরাং উন্নতিও দ্রুত হওয়া উচিত।

রেনে—তা হ'লে আপনি আমায় একটি মস্ত গর্দ্দভ বলতে চান। হাঁ তা বেশ বুঝা গেছে।

ক্লোতিলদ্—না—না, এমন কথা আমার মনেও আসে নি। হয় ত ল্যাটিন পড়তে আপনার ভাল লাগে না, তা না লাগবারই কথা।

রেনে—না, সে কথা মিথ্যা, বরং ল্যাটিন শিখতে আমার অনেক কালের সাধ। আমার বাবাই এ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ল্যাটিন কোন কাজেরই নয়।

ক্লোতিলদ্—আর আপনার বুঝি ঠিক তার উল্টো ধারণা?

রেনে—আমি যখন ল্যাটিন শিখতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, এমন সময় একদিন শুনলাম যে, যে সকল যুবকরা দিনের বেলায় কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকে, তাদের সন্ধ্যার পর এই বাটীতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

ক্লোতিলদ্—সে আপনি বেশ [illegible]ছেন,—এইখানে পড়তে এসে। আমাদের আরো অনেক ছাত্র আছে।

রেনে - (চিন্তিতভাবে)—আপনার ছাত্রদের মধ্যে যুবক ছাত্র আছে ?

ক্লোতিলদ্—হাঁ, অনেক যুবক আছে।

রেনে—তারা খুব সৌভাগ্যবান্।

ক্লোতিলদ্—আপনার তুলনায় কোন অংশে বেশী নয় তা ঠিক জানবেন।

রেনে—হাঁ, তা'রা আমার চেয়ে বেশী ভাগ্যবান বই কি, কারণ তারা আমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান।

ক্লোতিলদ্—সে আপনারই দোষ, আপনি ত চেষ্টা করবেন না।

রেনে—বটে, আপনার ঐ রকম ধারণা !

ক্লোতিলদ্—হাঁ, প্রথম প্রথম আপনি বেশ মনযোগ দিয়ে পড়েছিলেন বটে ; ফলে শব্দ প্রত্যয়গুলি অনায়াসেই শিখে ফেলেছিলেন। ঐ সর্ব্বনাম শব্দেই......

রেনে—আঃ ! সর্ব্বনাম। ঐ সর্ব্বনামগুলি—কি বিপদ ! (আবৃত্তি করিয়া) হিক্ (Hic) হেক্ (Hoec) হক্ (Hoc) ! হুইক (Huic) হক্। (hoc) হাক্। (hac) হো। (hoc) ॥

ক্লোতিলদ্—(হাসিতে হাসিতে)—হাঁ, এইবার আমরা ক্রিয়াপদে এসেছি।

রেনে—"সুম্" (Sum)—আমি হই—I am ... আমি .....কি ?

ক্লোতিলদ্—মস্ত একটা পাহাড়, যেখানে ছিলেন, অচলের মত ঠিক সেইখানে আছেন, কারণ ঐখান থেকেই আপনার উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। এখন "আমো" (amo) এই ক্রিয়াপদটার রূপ করুন।

রেনে—"আমো"—ভালবাসি—আচ্ছা, মাদমোয়াজেল, আপনি জানেন কি এই "ভাল বাসিকে" নিয়ে সবাই কেন ক্রিয়ারূপ সাধতে আরম্ভ করে, আরো ত অনেক পদ আছে ?

ক্লোতিলদ্—(উদ্বিগ্ন হইয়া)—তা' কি জানি......সাধারণ নিয়ম হবে বোধ হয়। তা "ভালবাসি" শব্দে যদি আপনার আপত্তি থাকে আরো অনেক ঐ একই ধাতুর শব্দ আছে, আপনি পছন্দ ক'রে নিতে পারেন।

রেনে—না, না, আমি সাধারণ নিয়মকেই মেনে চলি, আমি "ভাল বাসিকেই" বেশী পছন্দ করি। (ক্লোতিলদ্ সঙ্কুচিত ভাবে কাগজ পত্তর উল্টাইতে লাগিল, যেন কত ব্যস্ত।)

রেনে—বলিতে পারেন, মাদমোয়াজেল, আমি কি ভাবছি ?

ক্লোতিলদ্—না, মশাই।

রেনে—আমি মনে মনে ভাবছি যে আমার জীবনে এ একটা বড় হাস্যাস্পদ ঘটনা।

ক্রোতিলদ্—কি ঘটনা?

রেনে—এই আপনার ন্যায় কুমারীর কাছ থেকে ল্যাটিন শিক্ষা। মনে হয় বিশ্বের সনাতন পদ্ধতি গুলি একেবারেই রাহুগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। সেকালের দিনে মহিলার ল্যাটীন পড়াবার কথা ত শুনিনি।

ক্রোতিলদ্—কেন মশাই, সেকালে অনেক বিদুষী মহিলার কথা শুনতে পাওয়া যায়। যদিও স্বীকার করি যে সে সময়ের অধিকাংশ স্ত্রীলোক একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এখনকার মত অর্দ্ধশিক্ষিতার ভাগ অনেক কম ছিল।

রেনে—সে যা হোক, আজ কাল ল্যাটীনই মেয়েদের একটা "ফ্যাসান" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রোতিলদ্—কারণ পুরুষেরা ঐটেকে উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেছেন বলে, স্ত্রী জাতির কর্তব্য এই দীপ শলাকাটুকু নির্ব্বাপিত না হতে দেওয়া এবং সময়ে পুনরায় ঐটিকে পুরুষের হাতে অর্পণ করা।

রেনে—বটে। বটে। এ আপনাদের খুবই সাধু উদ্দেশ্য।

ক্রোতিলদ্—(গম্ভীর হইয়া)—আমি আপনাকে মিনতি করছি, আসুন—আমরা আমাদের কাজ করে যাই, পড়া ছেড়ে আবার বাজে কথায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

রেনে—রাগ করবেন না মাদমোয়াজেল, আপনি বিরক্ত হলে আমি এর বেশি আর কিছুই শিখতে পাবব না।

ক্রোতিলদ্—আপনি দেখছি বেজায় অভিমানী।

রেনে—আমায় এ রকম ব্যতিব্যস্ত করে তুললে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই, রূঢ়-বাক্য বলে কেউ কোন দিন আমার কাছে থেকে কিছুই আদায় করতে পারেনি; শুধু মিষ্টি কথায় আদর করে যদি একবার "এস রেনে"...... তাহোলে.. ..

ক্রোতিলদ্—(হাসিয়া ফেলিয়া)—আমি ত আর যা হোক (অনুকরণ করিয়া) "এস রেনে" বলে আপনাকে অভিভাষণ করতে পারিনে।

রেনে—কেন? বাঃ! এই ত আপনি বেশ বলেছেন।

ক্রোতিলদ্—তবে আসুন এখন পড়া আরম্ভ করি। আজ কোন্ খানে পড়া?

রেনে—Gerundএ। gerund কাকে বলে মাদমোয়াজেল?

ক্লোতিলদ্—এই এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। Gerund ক্রিয়ামাত্রবোধক ধাতুরূপের একটা রূপ বিশেষ। এটি এক রকম রূপ করণ, ক্রিয়ার্থে কি ঘটতে যাচ্ছে বা কি ঘটা উচিত এটি এই ভাব জ্ঞাপক।

রেনে—এ সব বেশ ত নির্ব্বিঘ্নে ব্যাখ্যা করে গেলেন, এসব কেমন করে জানলেন?—

ক্লোতিলদ্—আমি যা' শিক্ষা দিচ্ছি তা' যদি আমার না জানা থাকে সেটা আমার পক্ষে তাহ'লে—

রেনে…হাঁ হাঁ, তাত বটেই।

ক্লোতিলদ্—তারপর indicative moodএর বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের "o" স্থানে andi, ando, andum বসিয়ে Gerund করতে হয়। দৃষ্টান্ত…… দেখুন, একটা দৃষ্টান্ত দিন ত।

রেনে—'Amo'—"আমি ভালবাসি"… …আমি ভালবাসি।

ক্লোতিলদ—আপনি ভালবাসেন, সে বেশ বোঝা গিয়েছে। আপনি ভাল বেসেছেন। তারপর, বর্ত্তমান কাল?

রেনে—বর্ত্তমানে। হে বিধাতা, কি বিড়ম্বনা!!

ক্লোতিলদ্—আপনি কি বলছেন?

রেনে—কিছুই নয়, মাদমোয়াজেল, আপনি ব্যাখ্যা করতে থাকুন।

ক্লোতিলদ—তাহলে আপনিই বলুন ভাল বাসা'র Gerund কি হবে।

রেনে—Gerund! ভাল বাসার Gerund! কি শ্রুতিমধুর ক্রিয়াপদ! এর আবার Gerund?

ক্লোতিলদ্—আপনি আদৌ মনোযোগী নন, মিঃ বেনে।

বেনে—হাঁ, আমি খুব মনযোগী, এই দেখুন না, "o" স্থানে andi বসাতে হবে, এইত?

ক্লোতিলদ্—শুধু andi নয়, ando ও andum, হাঁ, এইত বেশ!

রেনে—কিন্তু এই andi, ando, andum, এ গুলির তাৎপর্য্য কি।

ক্লোতিলদ্—বেশ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এই amo ক্রিয়া পদটি…

বেনে—এর 'o'র স্থানে andi বসিয়ে হল amandi।

ক্লোতিলদ্—বাহ! বেশ।

রেনে—তারপর, ando যোগে হল amando।

ক্লোতিলদ্—হাঁ ঠিক। বেশ। বেশ।

রেনে—আবার andum বসিয়ে হল amandum।

ক্লোতিলদ্—বাঃ! আপনি তা হলে বুঝেছেন দেখছি।

রেনে—(আহ্লাদে গদ গদ হইয়া) amandi, amando, amandum—এগুলিতে যেন ঠিক চীনে বাদামের গন্ধ, কি সুমিষ্ট! এখন এই gerund গুলির অর্থ কি?

ক্লোতিলদ্—এদের gerund বলে না, amo এই ক্রিয়াপদের gerund রূপ। এদের তিনটি রূপ আছে—amandi—ভালবেসে, amando—ভালবাসার সহিত, amandum—ভাল বাসতে।

রেনে—ভালবেসে, ভালবাসার সহিত ও ভালবাসতে। সবই বেশ বোঝা গেল।

ক্লোতিলদ্—কেমন করে?

রেনে—হ্যাঁ, জীবনে আমরা এই তিন অবস্থার একটি না একটিকে আশ্রয় করেই তো বেঁচে আছি। কেউ বা ভালবেসে জীবনে সুখী হয়েছে, কেউ বা ভালবাসায় সুখী হচ্চে, আর কেউ বা ভালবাসবার আশায় জীবন অর বহন করে আসছে। কবির কথায় বলতে গেলে—

ধনী বা নির্ধনী হও
বাজা, মহারাজ,
প্রভু সে যে নিত্য রহে
শিয়রে জাগিয়া
বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে, অতীতের
ত্রিকাল ব্যাপিয়া।

ক্লোতিলদ্—বাঃ! বেশ খামখেয়ালি অর্থ তো!

রেনে—সে যা হোক, আমি যে বুঝেছি এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

ক্লোতিলদ্—এ পর্য্যন্ত আপনি তা হলে শিখেছেন। এখন gerund বেশ সহজ হয়ে এসেছে তো?

রেনে—সে আপনারই অনুগ্রহে, মাদ্‌মোয়াজেল্। কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে শীঘ্রই আবার ভুলে যাই।

ক্লোতিলদ্—না, বার বার আবৃত্তি করবেন ও সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দেবেন, তা হলে ভুলবেন না। বেশ আসুন আমরা উদাহরণ দিই। আমি প্রথমে আরম্ভ করব, আপনার কিন্তু শেষ করতে হবে। রাজী আছেন ত? উদাহরণ যথা—

"আমি পড়তে পড়তে হাঁটি"—"ambulo"—

রেনে—Ambulo .. ..amando... ..

ক্লোতিলদ্—আমি আপনাকে "পড়ার" gerund করতে বলেছি "পড়া" lego, ঠিক "ভালবাসার" মত একই ধাতুরূপ।

রেনে—"ভালবাসার" gerund রূপ আমার বেশী পছন্দ হয়, ambulo, amando—এই ঠিক, নয় কি মাদ্‌মোয়াজেল।

ক্লোতিলদ্—হাঁ, ঠিক বটে, কিন্তু আমি ত আপনাকে তা' জিজ্ঞাসা করিনি।

রেনে—কিন্তু আমরা যে "ভালবাসা" নিয়ে আরম্ভ করেছি।

ক্লোতিলদ্—আপনি বড় অবাধ্য ছাত্র, সব বিষয়েই আপনার তর্ক বিতর্ক করা চাই।

রেনে—রাগ করবেন না, রাগ করবেন না, মাদমোয়াজেল। আপনি বিরক্ত হলেন ?

ক্লোতিলদ—হ্যাঁ, আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। আপনার মতন নই যে "এস রেনে" বলে ডাকতেই গলে যাব।

রেনে—কিন্তু এই অসন্তুষ্টির স্বরও এত মধুর! আমি আর কোন দিন এমন কোকিলকূজনরব শুনিনি। আপনাকে এই ভাবে "রেনে" বলে ডাকতে শুনলে আমি যে gerundএর di, do, dum ভুলে যাই।

ক্লোতিলদ্—আমি যদি রূঢ়ভাবে কিছু বলে থাকি সে মশাই, আপনারই হিতের জন্য, তা'তে আমার কোনই স্বার্থ নেই।

রেনে—আপনি তবে রাগ করেছেন যে দেখছি।

ক্লোতিলদ্—হাঁা, একটু করেছি বই কি ? আপনার মত এরকম আর একটি ছাত্রও আমার যোটে নি।

রেনে—বাট।

ক্লোতিলদ্—কেন ? আপনার প্রশংসার জন্তে বলা হয় নি !

রেনে—গভীর সন্দেহের বিষয়—আপনার চোখের তারা যদি ছাপাতে পারতেন, মাদ্‌মোয়াজেল।

ক্লোতিলদ্—আমার সকল ছাত্রই মনযোগী, পরিশ্রমী, ও যত্নশীল; বস্তুত তারা আমার গৌরবের বিষয়।

রেনে—আর আমি—আমি আপনার বুঝি.........

ক্লোতিলদ্—আমি তা' বলি নি। সে যাই হোক, আপনি আমার সকল

ছাত্রের মধ্যে সব চেয়ে বড, আর সকলে আপনার তুলনায় নাবালক বললেও হয়।

রেনে—খুব সত্যি; আমারও বিশ্বাস যে আমার বয়সী অতি অল্প ছাত্রই আছে। ত্রিশ বৎসর বয়সে নূতন বিদ্যোপার্জ্জনে সাধ, এ অতি হাস্যাস্পদ ব্যাপার নয় কি?

ক্লোতিলদ—হাঁ লজ্জার কথা বটে যদি পাঠে উন্নতি দেখাতে না পারা যায়।

রেনে—এবং যেহেতু আমি কোনই উন্নতি দেখাতে পারিনি… আমি বেশ বুঝতে পারছি মাদ্‌মোয়াজেল, তবে এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া যাক; এবং অতি সন্তোষের সঙ্গে আমি আপনার দেনা পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছি।

ক্লোতিলদ্—এ্যাঃ। কি বলছেন!

রেনে—কিছুই নয়, মাদ্‌মোয়াজেল; তবে আসি।

ক্লোতিলদ—কেন, আপনার হয়েছে কি?

রেনে—(দুঃখিতভাবে)—তাতে আপনার কিছু যায় আসে না।

ক্লোতিলদ—কিন্তু হঠাৎ এ ভাবের কারণ কি? আপনি কি ল্যাটিন ছেড়ে দিলেন?

রেনে—তার সঙ্গে সঙ্গে gerundio, আমি ও শিখে উঠতে পারব না।

ক্লোতিলদ—আপনি সবে মাত্র আরম্ভ করেছেন, দুদিন বাদে সহজ হ'য়ে আসবে।

রেনে—পড়বার জন্যে আর আমায় অনুরোধ করবেন না। অনেক আয়াস স্বীকার ক'রে "ভালবাসা" পর্য্যন্ত এসেছি, আর তা' থেকে আমার নিস্কৃতি নেই। "কালের" অপেক্ষায় আমি আর থাকতে পারি নে।

ক্লোতিলদ্—কিন্তু আপনি ত একরূপ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন—"gerund" পর্য্যন্ত এসেছেন।

রেনে—amand—"ভালবাসিয়া"—এইখানেই আমি শেষ করতে চাই। "ভালবাসিয়া" তবে আমি বিদায় গ্রহণ করি। আপনি এই লাইনটি অনুগ্রহ করে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন কি, মাদ্‌মোয়াজেল।

ক্লোতিলদ্—নিরর্থক মশাই।

রেনে—তবে আমি যাই। যদি আবার কোনদিন ল্যাটীন পড়তে আরম্ভ করি ত পুরুষের শরণাপন্ন হব।

ক্লোতিলদ্—আপনার যথা অভিরুচি। আমারও যদি ছাত্র পছন্দ করে

নেবার স্বাধীনতা থাকতো তা হলে আমি সকল ছাত্রকে নিতাম না, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, পড়িয়ে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়, আমি স্বাধীন নয়।

রেনে—মাদ্‌মোয়াজেল ক্লোতিল্‌দ! দেখুন, আমার দিকে একবার তাকান। আপনাকে বেদনা দিয়েছি। আঃ! আপনি যে কাঁদছেন! আমার অপরাধ হয়েছে, ঐ "জেরাণ্ডই" যত অনর্থের কারণ। একবার চেয়ে দেখুন। আমি বিদায় নিচ্ছি সত্যি কিন্তু এভাবে নয়। আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার সৎসাহসের জন্যে আমি অন্তরের সঙ্গে আপনাকে সাধুবাদ করছি। এ বড় মধুর দৃশ্য—আপনার মত নিঃসহায় বালিকাকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করতে দেখা। আমি আপনার গুণে মুগ্ধ—আমি আপনাকে ।

ক্লোতিল্‌দ—আপনি!

রেনে—হ্যা—আমি আমি যে তা' ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করে বলে উঠতে পারছিনে। তবে যদি অনুমতি করেন ল্যাটিনে বলতে পারি কি?

ক্লোতিল্‌দ—ল্যাটীনে! ল্যাটীনে বলতে পারবেন না।

রেনে—পারবো—ছোট একটী ছত্রে, এত ছোট যে দুটী কথার বেশী হবে না, এমন কি এক কথায়ও হ'তে পারে।

ক্লোতিল্‌দ—তবে বলুন।

রেনে—আপনি বেশ জানেন, সেই ক্রিয়াপদটী আমরা যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। amo "ভালবাসি"।

ক্লোতিল্‌দ—শুধু ক্রিয়াপদ—কর্ম্ম নাই?

রেনে—দেখুন, মাদমোয়াজেল, উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ আমার কম্পিত, শঙ্কায় হৃদয় আমার চঞ্চল, আমার সাহসে কুলাচ্ছেনা, হায়, আপনি যদি আমায় একটু উৎসাহ দিতেন, একটুখানি কোমল স্বরে যদি একবার বল্‌তেন !

ক্লোতিল্‌দ—কি বলব—"এস রেনে"?

রেনে—আঃ! কি সুন্দর! কি মধুর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত। আমার শঙ্কা দূর হয়েছে, সাহস জেগেছে, হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার আজ খুলে দেখাব, খুলে বলব এ ক্রিয়ার কর্ম্ম কি?—"আমি ভালবাসি" .. কাহাকে।......কাহাকে এ হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে ভাল বাসি? তোমায় ক্লোতিল্‌দ।

ক্লোতিল্‌দ—আমায়! সত্যিই কি আমায়!

রেনে—কেন সন্দেহ ক্লোতিলদ্! আমি কি তোমায় শুধু স্তোক বাক্যে ভুলাচ্ছি? আমায় কি অন্তঃসার শূন্য একটা অপদার্থ বলে মনে কর?

ক্লোতিলদ্—না! আপনি হয়ত ক্ষণিকের উত্তেজনায় ভ্রান্ত হয়েছেন, ভ্রম ··· আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করি যে।

রেনে—কি স্মরণ করিয়ে দিতে চাহেন? বুঝেছি আপনি আমায় পছন্দ করেন না।

ক্লোতিলদ্—হাঁ, আপনাকে আমার।

রেনে—তবে কি আপনার আর কোন উদ্দেশ্য আছে, আর কাউকেও কি ভাল বাসেন?

ক্লোতিলদ্—না। আমার কথা কে আর ভাববার আছে?

রেনে—তবে আর কিসের চিন্তা? আমি তোমায় ভালবাসি—যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিন থেকে ভাল বাসতে আরম্ভ করেছি, সেইদিন থেকে তোমার মোহন প্রতিমাখানি হৃদয়ে ধরে পলে২ তোমারই চিন্তা সার করছি। এস হৃদয় রাণী! বল আমার এ সাধ মিটবে কি? প্রাণের এ আকাঙ্ক্ষা মিলবে কি? তুমিত আমার জান। তবে বল, একটী বার বল উত্তর দাও।

ক্লোতিলদ্—আমি জানি আপনি মহাশয় হৃদয়বান্ পুরুষ। এই আমার উত্তর, মিঃ রেনে।

রেনে—ধন্যবাদ, তোমায় শত ধন্যবাদ। আজ আমি বড় সুখী। আবার আমরা ল্যাটীন পড়তে শুরু করব। ঊষার প্রথম আলোকে যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছি সেইদিন তার শুভ উদ্বোধন, আর আবার যে দিন বিধাতার আশীর্বাদে এ পৃথিবীর চক্ষে তোমায় আমায় মিলন হবে সেইদিন ল্যাটীন দেবতার মঙ্গলগীতি আবার বেজে উঠবে।

ক্লোতিলদ্—মনে পড়বেত কোন খানে আমরা ক্ষান্ত দিয়েছিলাম?

রেনে—"জেরাণ্ড" ভালবাসার জেরাণ্ড—ভালবাসিয়া, ভালবাসার—ভালবাসিতে। উদাহরণ—যথা—ভালবাসিয়া সুখী হইয়াছি—amandi, ভালবাসার সুখে জীবন পথ অতিক্রম করিতেছি—amando, এইবার তোমার পালা ক্লোতিলদ্, উদাহরণ সম্পূর্ণ করে দাও।

ক্লোতিলদ্—তোমায় ভালবাসতে জীবন ধারণ করে থাকবো—'amandum'।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু।

ব্যক্ত।

ব্যক্ত যদি হে হ'তে প্রাণাধিক
সবার আঁখির আগে।
(তবে) শত জনমে মরণে ছুটিয়া লুটিয়া
কে চাহিত তোমা এমন করিয়া,
দীপ্ত তিয়াষে জ্বলিয়া দহিয়া
নিত্য দীপক রাগে।
ভালই করেছ হে প্রিয় আমার!
নিতি নব প্রেম তোমার পূজার,
তোমা বিনা কা'রে শোভিত সে আর,
(তোমারই উদ্দেশে জাগে!)
পূত ধূপবাস ওহে মহেশ্বাস
ছুঁয়ে আসে নিত্য তোমার সকাশ,
বিরহ বেদনা আকুল নিশ্বাস
নিতি ছুটিত না তব আগে।
ভুবন জুড়িয়া তোমার আরতি,
ফুটে শত গান উঠে শত স্তুতি,
মিটে গেলে আশা, খুঁজিত কি বাসা,
(হেন) নিতি নব অনুরাগে?
গোপন পীরিতি গোপনে বিতরি
জগতের মন কবি চির চুরী
(হেন) কব লুকাচুরী লুকায়ে মাধুরী
বহি গুপ্ত গোপন রাগে।

শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

"জন্ম অপরাধী"।

"জন্ম অপরাধী" একখানি হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের দৈন্যের ছবি। প্রকাশক ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের কব মজুমদার কোম্পানী, মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া।

লেখিকার হাতের শেখ আন্দু, নমিতা ও মঙ্গল মঠ নামে আরও তিনখানি ছবি আছে, সে গুলির পরিচয় জানি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "জন্ম অপরাধী" আমাদের গৃহস্থ জীবনেব বড নগ্ন দীনতার ছবি, অনেকে হয়তো অতিরঞ্জিত ভাবিবেন। কিন্তু যে সমাজের ভিতরের কথা জানে সে বুঝিবে ব্যাপারটা অত্যুক্তি নহে, শাশুড়ী ও স্বামীতে মিলিয়া প্রহার করিতে করিতে বধূকে হত্যা করিবার কথা তো আমরাই জানি। সুখেব ঘরের বাসিন্দা এ দুখের মর্ম্মন্তুদ চিত্র দেখে নাই, তাই বিশ্বাস করে না, সর্পের দংশন যে সহিয়াছে সেই বিষেব জ্বালা বুঝে। লেখিকা সমাজের এই আঁধার পূতিগন্ধভরা কোণটুকু আলো ধরিয়া দেখাইয়া ভাল করিয়াছেন, পাপ বাদুড চামচিকার জাত, আলোয় থাকে না। তবে শুধু দুঃখ বেদনা অত্যাচারের ছবি আঁকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে হতভাগিনীদের জুড়াইবার পথটিও দেখাইতে হইবে। শুধু বিদ্রোহ নিরাশা জ্বালার উদ্রেক করিলে স্নেহলতাব দল বাড়িবে, দুঃখিনী মায়েরা মরিয়া জুড়াইতে চাহিবে। সেটা ভাল নয়।

আর্ট বা রচনা-কলার দিক দিয়া কয়েকটি কথা বলি। লেখিকার চরিত্র অঙ্কণে ভগবদ্দত্ত শক্তি আছে, বড জা' আব শাশুড়ীর চিত্রে তাহা বেশ পরিস্ফুট। কিন্তু শুধু আর্টের দিক দিয়া লেখা হয় নাই বলিয়া সে শক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, রসের ছন্দে অবলীলা গতিভঙ্গে তেমন মনোজ্ঞ হইয়া ফুটিতে পারে নাই। নিষ্ঠুব নীচমনা স্বামীর দুর্ব্যবহারের অতিমাত্রা দেখাইতে গিয়া আর্টের হানি হইয়াছে। বঙ্কিমেব ভ্রমরের উপরও দুর্ব্ব্যবহাব হইয়াছিল, কিন্তু অল্পে অথচ কত দুবপনেয় করিয়া সে ব্যথা ফুটান, ভ্রমরের সতীধর্ম্মের সোণার গায়ে সে মসীলেপ আরও কত প্রস্ফুট মর্ম্মন্তুদ। বীণার বাদক যেমন ঐ সরা তার কয়টির মধ্য হইতে কত করুণ কান্ত ভাবপাগল রসের মূর্ত্ত রূপ কত বৈচিত্রে জাগাইয়া তোলে, সাহিত্যে বড চিত্রকরও তেমনি। নয়টি রস আর বহুভঙ্গিম মানব

জীবন লইয়া সে গড়িতে না পারে এমন ছবিই নাই ; অথচ সব হুবহু ভগবানের সৃষ্টি—সহজ স্বাভাবিক—যেন ঠিক এমনিটিই কত দেখিয়াছি।

তবে লেখিকাকে দোষ দিতে ইচ্ছা করে না, তাহার কারণ এখানি ঠিক আর্ট রচনা নহে। আচার ধর্মের বর্ব্বরতা আর সমাজের গলিত ক্ষত দেখাইতে গিয়া তাঁহার লেখনী অশ্রুমাখা। ইউরোপে নারীর বিদ্রোহ রুদ্ররূপ ধরিয়াছে, রুস বলিতেছে—no subject race, no subject class, no subject sex—আমাদের, কায়মনে প্রার্থনা ভারতের তপঃশান্ত বুকে এ প্রতিক্রিয়ার পৈশাচ লীলার যেন আবশ্যক না হয়। হিন্দু সচেতন হইয়া আপন পথে আপনার দৈন্য দূর করুন।

ফাল্গুনী।

কবির সতর্কতা।

ফাল্গুনীর কবি তাঁহার এই নাট্যকাব্যটির ভাবী সমালোচকদিগের সম্বন্ধে নাট্যের 'ভূমিকা' ও 'সূচনার' মধ্যেই এমন একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার অর্থ খুব স্পষ্টই বুঝা যায়। অর্থাৎ এই নাটকটির যথার্থ তাৎপর্য্য পাঠকেরা নিশ্চিতই বুঝিতে পারিবে না, এবং পদে পদে ভুল করিবে, এবং কবিকেও অযথা গালি দিবে।

কবি গোড়া হইতেই সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে "খুব বড় দূরবীন এবং খুব জোরালো অনুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।" নাটকের মধ্যে 'সর্দ্দার' বলিয়া যে চরিত্রটির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কবির "ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোন একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন"। এবং তজ্জন্য তিনি পুনরায় সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে "লোকটা তত্ত্ব কথা নহে, সত্যকারই সর্দ্দার।" তারপর সূচনাতেই কবিকে যখন প্রশ্ন করা হইল যে এই রচনাটির মধ্যে কোন তত্ত্বকথা আছে কিনা, কবি স্পষ্ট উত্তর দিলেন—'কিছু না'। এমন কি কবি 'রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের' ডাকিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন, কেন না—'তারা কাব্য শুনে ও তর্ক করে'। আশ্চর্য্য।

ইহার পরেও এই কাব্য লইয়া তর্ক করিতে যাওয়া যে নিশ্চিতই অতি বড় দুঃসাহসের কার্য্য সে বিষয়ে আমার ও আপনাদের সন্দেহ করিবার কারণ

অতি অল্প। তবে কি না বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি দুঃসাহসের অন্ত নাই, এই যা ভরসা।

নাট্যের উপাখ্যান।

এই নাট্যের গোড়ায় একটা 'সূচনা' নাট্য আছে। এক ছিল রাজা। একদিন রাণী দেখিতে পেলেন যে তাঁর 'কানের কাছে দুটো পাকা চুল'। রাজা অমনি আসন্ন বার্দ্ধক্যের ভয়ে—রাজ কার্য্য ছেড়ে ছুড়ে শ্রুতিভূষণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যবারিধি হইতে বাছা বাছা শ্লোক উদ্ধার করিয়া রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন। দ্বারে চীন সম্রাটের দূত,—দুর্ভিক্ষ-কাতর প্রজাবৃন্দ,—সকলেই নিরর্থক অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত। এমন সময় কবিশেখর আসিলেন। কবি তখন মহারাজের মন হইতে বার্দ্ধক্যের ভয় ও এবম্বিধ নিষ্ফল বৈরাগ্যকে দূর করিয়া দিবার জন্য "বিশ্ব কবির গীতিকাব্য থেকে ভাব চুরী করে, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চল্‌চে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা"—এই তত্ত্ব (?) গুড়ি,—এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য 'ফাল্গুনী' নাট্যটির অবতারণা করিলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে মহারাজের শ্বশুরের ছেলেগুলির সহিত রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রের দল বাদ পড়িয়া থাকিলেও, মহারাজের শ্বশুরের মেয়েটিকে, কি কবি—কি মহারাজা কেহই' ভুলেন নাই।

তারপর—এইবার মূল নাট্যের কথা। একদা ফাল্গুনে 'যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে"। তাকে ধরিবে বলিয়া পণ। গুহার মধ্যে ঢুকিয়া যখন 'তাহাকে ধরিল তখন'—দেখিতে পাইল যে সে তাদেরি সর্দ্দার। পেছন থেকে ঐ সর্দ্দারকে দেখিয়াই বুড়ো বলে ভ্রম হইয়াছিল। ধূলোর ভিতর থেকে যৌবনের দল তাকে চিনিতে পারে নাই। তারপর যৌবনের সর্দ্দারকে ঘিরিয়া প্রশ্ন করিল তবে—'বুড়ো কোথায়'? সর্দ্দার বলিল—'কোথাও ত নেই'। 'তবে সে কি'? 'সে স্বপ্ন'। চন্দ্রহাস জিজ্ঞাসা করিল সর্দ্দারকে যে 'তবে তুমিই চিরকালের'? সর্দ্দার বলিল—'হাঁ'। 'আর আমরাই চিরকালের'?—'হাঁ'।

কবি সর্দ্দারের কাজ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন 'চালাইয়া লওয়া পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। 'আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে'।

এই নাটকখানিতে যৌবনের দলকে—এই বক্ষ্যমান সর্দ্দার ব্যক্তিটি এই প্রকারে চালাইয়া লইবার কার্য্যে ব্যাপৃত।

সর্দ্দার ছাড়া, এই যৌবনের দলের মধ্যে একজন আছেন 'চন্দ্রহাস'। তিনি দলের খুব প্রিয়। আর একজন আছেন—'দাদা'—'ইহার বয়স সবার চেয়ে কম। ইনি সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছেন। কিন্তু ইনি ভাবে কার্য্যতায় ও উক্তিতে সকলের চেয়ে প্রবীন। "প্রাণের আনন্দটাকে ইনি অনাবশ্যক বোধ করেন আর কাজটাকেই সার মনে করেচেন"। ফাল্গুনীর উৎসবের শেষে ইহার প্রবীনত্বকে যৌবনের দল জোর করিয়া নবীন করিয়া দিয়া তবে ছাড়ে। তা ছাড়া আছে একজন অন্ধ বাউল। এরি কাছে থেকে চন্দ্রহাস প্রথমে বুড়োর খবর পায়। বাউলটি অন্ধ হইলে কি হয়—পায়ের শব্দ শুনতে পায়—এবং সব দিয়ে শুনে। এই বাউলটিই শেষ পর্য্যন্ত বুড়োকে গুহা হইতে বাহির হইবার সময় দেখাইয়া দেয়।

তার পর মাঝি, কোটাল, দলু এই তিনটি ছোট ছোট চরিত্রের অবতারণাও নাটকটির মধ্যে আছে। যৌবনের দলকে সেই বুড়োর অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে ইহাদেরও শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

এই নাটকটার দৃশ্যও আবার—'পথে, ঘাটে, বনে, বাদাড়ে।'

নাটকটির আখ্যান চারি ভাগে বিভক্ত। যথা সূত্রপাত,—সন্ধান, সন্দেহ ও সমাপ্তি। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গান আছে। কেবল যৌবনের দল—কথার জবাব দিতে হলেও গান গায় নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। তাদের মতে 'সাদা কথায় বলতে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না'। নাটকটির স্থান, কাল, পাত্রগণ ও উপাখ্যানের, তাৎপর্য্য সম্বন্ধে—এই পর্য্যন্ত।

মেটারলিঙ্কের—"News of Spring!"

(The Double garden)

P 155—166.

ফাল্গুনী নাট্যের এই যে উপাখ্যান অংশের মূল ভাবটি, এই যে বসন্তের উৎসব ('feast of roses andanemones of soft air and dew of bees and birds'), এই যে অন্ধকার গুহার মধ্যে বৃদ্ধ শীতের অনুসরণ ("looking for winter and the print of its footsteps. Where

is it hiding ?") এই যে 'দাদা' জাতীয় জীব যাহারা 'প্রাণের আনন্দটাকে অনাবশ্যক বোধ করেন এবং নিতান্তই উপহাস্যাস্পদ হইয়া ভয় করেন ("They are rugged old men, too wise to enjoy unforeseen pleasures. They are wrong); এই যে যৌবনের দলের বসন্তের ছুটিতে পথে ঘাটে বনেবাদাড়ে খেলার জন্য বাহির হইয়া পড়া ("running round the garden of its holidays, the fragrant valleys, the tender hills, hills which the frost has never brushed with its wings") ইহার সহিত আমরা মেটারলিঙ্কের 'দি ডাবল্ গার্ডেন' পুস্তকে "News of Spring"—এই আখ্যানটিকে মিলাইয়া পড়িবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করি।

News of Spring আখ্যানটি খুব ছোট হইলেও তাহার সমস্ত অংশ এখানে তুলিয়া দিয়া আপনাদের বিরক্তিভাজন হইতে চাহি না। তবে খানিকটা উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না।

একটা 'Eternal Summery'র অনুসন্ধানের কথাই মেটারলিঙ্ক বলিতেছেন। ফাল্গুনীর গানের বিষয়টা যেমন কবি বলিয়াছেন "শীতের বস্ত্রহরণ"—এখানেও গানের মজ্জার ভিতরে শীতের যুগান্তব্যাপী ভয় সিঁধাইয়া রহিয়াছে ("they have the terror of winter in their marrow") তাহাদের জন্যই মেটারলিঙ্ক Eternal Summer বা চিরবসন্তের অবতারণা করিতে চাহিয়াছেন।

* * I am looking for Winter and the print of its footsteps. Where is it hiding ? It should be here, and how dares this feast of roses and anemones, of soft air and dew, of bees and birds display itself with such assurance during the most pitiless mouth of Winter's reign ? And what will spring do, what will spring say, since all seems done, since all seems said ? I sit superfluous, then, and does nothing await it ?

No ; Search carefully : you shall find amid this life of unwearying youth the work of its hand, the perfume of its breath which is younger than life. Thus there are foreign trees yonder, taciturn guests * * * they come from the land of fog and frost and wind. They are aliens, sullen

and distrustful. They have not yet learned the limpid speed ·· they have the terror of winter in their marrow, they will never loose the habit of death. They have too much experience, they are too old to forget and too old to learn. Their hardened reason refuses to admit the light when it does not come at the accustomed time. They are rugged old men, too wise to enjoy unforeseen pleasures. They are wrong.

* For here, around the old, around the grudging ancestors, is a whole world of plants that know nothing of the future, but give themselves to it. They live but for a season ; they have no past and no traditions and they know nothing, except that the hour is fair and that they must enjoy it. While their elders, their masters and their gods, sulk and waste their time, these burst into flower, they love and they beget." * * আর নাই তুলিলাম।

কবি স্বয়ং বলিয়াছেন যে 'বিশ্ব কবির গীতি কাব্য থেকেই ত ভাব চুরি করেছি'। আর আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে 'ফাল্গুনী নাট্যের মূল ভাবটি মেটারলিঙ্কের News of Spring হইতে লওয়া। চুরি শব্দটা কবি ব্যবহার করিলেও আমার তাহাতে নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ হয়। এবং ইহা কোন ক্রমেই কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না।

ফাল্গুনী রূপক নাট্য।

কিন্তু মেটারলিঙ্ক তাহার যে ভাবটি গদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, ফাল্গুনীর কবি, তাহা অন্য আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মেটারলিঙ্কের গদ্য, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং ভাবের মৌলিকতা হইতে ফাল্গুনীর কবি বঞ্চিত হইলেও,—তাঁহার সৃষ্ট নাট্যকাব্যের কলাসৌন্দর্য্যের উপরেও তিনি কবি প্রতিভার অনেকটা দাবী করিতে পারেন,—ইহা সত্য। সুতরাং এক্ষণে ফাল্গুনী নাট্যের কলা-সৌন্দর্য্যের বিচারেই প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

ফাল্গুনী একখানি নাটক। ইংরেজীতে যাহাকে বলে drama। কতকগুলি চরিত্রের অবতারণা করিয়া, তাহাদের পরস্পর মেলামেশা ও ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া, কাব্যের মূল ভাবটি প্রকাশ করার মধ্যেই কবির কৃতিত্বের পরিচয় এখানে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। যদিচ মেটারলিঙ্ক লিখিয়াছেন গল্পকাব্য আর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাব লইয়া লিখিয়াছেন নাট্যকাব্য, তথাপি এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিচার হইবে এই বলিয়া যে তিনি নাট্য রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন কতদূর।

এখন বিবেচ্য এই যে ফাল্গুনী নাটক হইলেও কিরূপ নাটক? সাধারণতঃ নাটকের বিষয় নির্ব্বাচন এবং তদুপযোগী স্থান, কাল ও পাত্র পাত্রীগণের যেরূপ সমাবেশ আমরা দেখিতে অভ্যস্ত, ইহা সে প্রকারের নহে। এই নাটকের আকার ও প্রকার ভেদ আমাদের কিঞ্চিৎ কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে। যে মূল ভাবটি নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহা নাটকের যোগ্য কি না এবং নাটকীয় রূপ ভিন্ন অন্যরূপে বা আকারে তাহার সম্যক প্রকাশ হইতে পারিত কি না,—সে বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সমস্ত চরিত্রের সমাবেশের মধ্য দিয়া নাটকের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে,—এবং এই নাটকটি এমন একটি অপরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিতে ব্যগ্র।

নাটকীয় চরিত্রগুলি রক্ত মাংসের স্বাভাবিক মনুষ্য নহে,—ইহাই আমাদের ধারণা। এমন হইল কেন? স্বাভাবিক মনুষ্যচরিত্রের ভিতর দিয়া উল্লিখিত নাটকের মূল ভাবটি প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়াই কি কবি তাই সমস্ত অ-স্বাভাবিক অ-মানুষ চরিত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন? নাটকীয় চরিত্রগুলি এক শ্রেণীর জীব তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে তাহারা এ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই বলিয়াই কি—কবির সৃষ্টিতে আজ তাহারা প্রাণ পাইয়া ধন্য হইল? নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টিতে ফাল্গুনীর কবি তৎকর্তৃক একাধিকবার উল্লিখিত বিশ্বকবির নিকট কতটা ঋণী, তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে তিনি এই সমস্ত অ-মানুষ জীব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকবির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করিয়া থাকিবেন। এমন কথাও উঠিবে, জানি, যে আধুনিক সাহিত্যে নাটকের জন্মান্তর হইয়া রূপান্তর হইতে চলিয়াছে। আগেকার মত নাটক আর এখন চলিবে না, আগেকার নাটকীয় মাল মশলারও নাকি ভারী বদল হইয়া গিয়াছে, এখনকার নাটকের

অভিনব খাঁটি মাল মসলাতে এইরূপ ভাবরূপী বিগ্রহরূপী চরিত্রের সৃষ্টি সমাবেশ ও কল্পনা ব্যতীত, উন্নতিশীল মানব সমাজের ও মানবের ব্যক্তিগত জীবনের নূতন নূতন ভাবগুলির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। কাজেই এই সমস্ত নব নব 'হব হব রস' ও ভাবের সম্যক উন্মেষ ও প্রকাশের জন্যই এইরূপ চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়াই এবম্বিধ রূপক নাট্য এ যুগে সৃষ্টি হইবে এবং হইতেছেও।

এই শ্রেণীর সমালোচনা কোন দেশের রূপক নাটকের উল্লেখ করিয়া কোন কোন সাহিত্য মহারথীদের বাণী—তাহাও আমরা মোটামুটি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ফাল্গুনীর কবির পক্ষেও কি ইহাই জবাব ?

"ইউরোপে বিগ্রহরূপী নাটকের যুগ স্বরু হইয়াছে।" তবে আর কি ? ইউরোপে যাহা স্বরু হইয়া গিয়াছে, এখানে আর তাহার জন্য দেরী করা চলে না। ধ্বনি হইতে প্রতিধ্বনির যতটুকু মাত্র ব্যবধান সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেই যথেষ্ট। তাহার অধিক কাল অপেক্ষা করা অস্বাভাবিক ও দোষাবহ। রবীন্দ্রনাথ তাহার অধিককাল অপেক্ষা করেন নাই। সমালোচক হঠাৎ একটা সত্য কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে বিগ্রহরূপী নাটকের যুগ স্বরু হইয়াছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'ও 'ডাকঘর' [ফাল্গুনী] স্বভাবতঃই (?) মেটারলিঙ্ককে স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যাহা ইউক মেটারলিঙ্ক ও তজ্জাতীয় কবিগণ যে হিসাবে ইউরোপের স্বাভাবিক বিকাশ, ফাল্গুনীর কবি ঠিক সেই হিসাবে বাঙ্গলার স্বাভাবিক বিকাশ কি না—তাহাই অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। যদি তাহা না হয় তবে বেলজিয়মের 'দক্ষিণ হাওয়া' বাঙ্গলার বনে আসিয়া কিরূপে যে বসন্তের ফুল ফুটাইবে, আর কতক্ষণই যে 'দোদুল দোলায়' দুলাইবে তাহা আমাদের মত নির্ব্বোধ ব্যক্তিদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা, কবির নানারূপ ব্যঙ্গ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার সত্ত্বেও, সুকঠিন।

কেনই বা মেটারলিঙ্ক এমন বিগ্রহরূপী হেঁয়ালী কাব্য লিখিতে গেলেন। আর কেনই বা দুষ্ট বুদ্ধি সাহিত্যিকেরা তাহার ইংরেজী অনুবাদ ছাপায়। অনেকের বিশ্বাস এ দুইটি দুর্ঘটনা না ঘটিলে এত তাড়াতাড়ি হয় ত বা আমাদিগকে এমন আচমকা বিব্রত হইতে হইত না।

বাঙ্গলা সাহিত্যে রূপক বা হেঁয়ালী নাটকের এই হঠাৎ আমদানীতে ইউরোপের আধুনিক 'মিষ্টিক' সাহিত্যের সহিত ইহার সগোত্র ও স্বজাতীয়ত্ব কল্পনা করিয়া আমরা কোন গৌরব ত অনুভব করিই না, পরন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্যে যথেষ্ট আশঙ্কাই আমাদের মনের মধ্যে উদয় হয়। আমরা

এত রাতারাতি ইউরোপ হইয়া উঠিলাম কিরূপে? কোন দিকেই ত কোন মিল দেখি না। অথচ হঠাৎ সাহিত্যের একটা কোন রঙ্গীন কথার ব্যর্থ প্রলাপে ঝাপসা হইয়া উঠিতেছে কেন? আর একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া বাঁচিয়া থাকাই যে, এমন কি আমাদের পক্ষেও, পরম পৌরুষ নহে, সহজ গদ্যে রবীন্দ্রনাথই ত তাহা অনেকবার বলিয়াছেন।

লজ্জা ও গৌরবের বিষয় এক নহে। হীন পরানুকরণ লজ্জারই বিষয়। বিশ্বব্যাপকতার প্রাণহীন মিথ্যা আবরণে ঢাকা দিলেও পরানুকরণ পরানুকরণই। তা ছাড়া আর কিছুই নহে। জাতির হৃদিশতদল হইতে যে সাহিত্যের উদ্ভব নয়, তাহাকে বিশ্বসাহিত্যের অনর্থক দোহাই দিয়া বাচাইবার চেষ্টার মত বিড়ম্বনা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য ভিন্ন আর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে কচিৎ দেখা গিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ইহাই এক প্রধান বিশেষত্ব।

ফাল্গুনীর নাটকীয় শিল্প-নৈপুণ্য।

যাহা হউক আলোচ্য ফাল্গুনী নাটকখানির চরিত্রের অভিব্যঞ্জনা ইউরোপীয় আধুনিক মিষ্টিক কবিদের অনুকরণে হইয়া থাকিলেও, নাটকীয় শিল্প নৈপুণ্য ইহাতে কতদূর ফুটিয়া উঠিয়াছে আমরা এক্ষণে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব।

নাটক হিসাবে ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি দোষ অত্যন্ত প্রকট বলিয়া আমাদের ধারণা। যৌবনের দল একটা রূপক। তাহাদের অদ্ভুত রকমের কথাবার্ত্তা ও হাবভাব চলাফেরা নাটকের মূল ভাবটিকে সম্যক্ বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই আবশ্যক। সে হিসাবে তাহাদের অস্বাভাবিকতাই এক্ষেত্রে আর্টের প্রয়োজনানুসারে স্বাভাবিক। 'ভদ্রলোক মাত্রেই ঐ কথা বলে' যে ইহারা সব অদ্ভুত, এবং ইহাদের সকল কাজই 'ছেলে মানুষি'। কেহ যদি ইহাদের 'জোর করে বোঝাতে চায় তা হলে' ইহারা 'জোর করে ভুল বুঝবে' এই ইহাদের পণ। ইহাদের 'গোড়া থেকেই এই দশা। আর অন্তিম পর্য্যন্তই এই ভাব।

কিন্তু এই সমস্ত চরিত্রের বিকাশে স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। স্বভাবতঃই যে ইহারা এইরূপ সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত রকমের ছেলেমানুষ ও অবুঝ, ইহারাই যে নবীন প্রাণ, প্রাণের অশান্ত দুর্দ্দম চলার বেগে ইহারা যে নিরন্তর

আত্মসম্বন্ধে একেধারে উদাসীন, এই কথাটি ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করার কৃতীত্বেই নাটকীয় শিল্পকলার সার্থকতা। কিন্তু কবি এখানে তাহা পারেন নাই। কেননা এই যৌবনের দল, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহারা সত্য সত্যই ভাল মানুষ, কেবল মুখে জোর করিয়া বলিতেছে মাত্র যে "ভালমানুষ নইরে মোরা ভালমানুষ নই"।

ইহারা সত্যি পাগল নয়, পাগল সাজিয়াছে। পাগলামী ইহাদের স্বভাব নয়, ইহাদের উপর একটা প্রাণহীন মিথ্যা আরোপ মাত্র। ইহারা জীবন নয়, নাটকের এ্যক্টার। ইহারা জীবনের কথা বলে না, নাটকের কথা বলে। কোটাল যখন ইহাদের পাগল ঠাওরায়, অমনি ইহারা বলাবলি করে 'দেখেচ? ধরা পড়েচি।' যখন ইহাদের ছেলেমানুষ বলে তখন আবার বলাবলি করে 'ঐ রে, আবার ধরা পড়েচি'। 'আমরা ধরা পড়ে গেছিরে, আমরা সহজ মানুষ না।'

সত্যিকার স্বাভাবিক পাগলের দল আত্মসম্বন্ধে কখনই এরূপ সচেতন হইতে পারে না। কেবল যাহারা পাগল না হইয়াও পাগলামীর ভাণ করে, তাহাদের মুখেই ঐরূপ কথা শোভা পায়।

কবি যৌবনের দলকে প্রস্ফুট করিতে যাইয়া তাহাদের স্বভাব চিত্রিত করিতে পারেন নাই, এবং নিতান্তই ব্যর্থকাম হইয়াছেন। আর্টের দিক হইতে নাটকের চরিত্রের এই অসঙ্গতি দোষ সমস্ত নাটকখানিকেই হীনপ্রভ করিয়া, ফেলিয়াছে। আমরা তত্ত্ব কথার দোহাই দিতেছি না, চরিত্রাঙ্কণের দোষই উদ্ঘাটন করিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, এই এক দোষেই সমস্ত নাটকখানি আর্টের দিক হইতে নিতান্ত নিম্নস্তরে আসিয়া পড়িয়াছে।

সন্দেহ পর্ব্বটিই সমস্ত নাটকের মধ্যে শিল্প কলার দিক হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে। তবে 'সন্দেহের' মধ্যেই climax আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নাই। সন্দেহেই climaxর আরম্ভ কিন্তু 'সমাপ্তির' ও কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়া climaxর শেষ, যেখানে যৌবনের দল হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়াছে এবং এমন কি অন্ধ বাউলকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া বলিতেছে- "ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ। যেন কাল বৈশাখীর প্রথম মেঘ। দাও ভাই দাও, ওকে বিদেয় করে দাও।"

অন্ধ বাউল চরিত্রটি বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। বরং নাটকীয়

মূল ভাবের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে খাপ ছাড়া বলিয়াই মনে হইবে। যাহারা প্রাণের আবেগে বসন্ত উৎসবে ঘরের বাহির ছুটিয়া আসিয়াছে এবং 'নয়ন মুদে ধ্যান করব না' আর 'মনের কোনে জ্ঞান খুঁজব না' বলে যাদের আগাথেকে গোড়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা, তাদের পরিসমাপ্তি এই ধ্যানী, জ্ঞানী, অথচ অন্ধ বাউলের সাহচর্যে, ইহা শেষ পর্যন্ত মূল ভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে নাই। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটকের 'ঠাকুর্দা' চরিত্রের একটা রকমফের (edition) এডিসন এই অন্ধ বাউল। হয়ত একটা 'অধ্যাত্মরস'-সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রয়োজনে ইহার অবতারণা। নাটকের অভিব্যক্তির দিক হইতে অন্ধ বাউল চরিত্রের বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। কবির পরিণত বয়সের ব্যক্তিগত জীবনের দিক হইতে এই চরিত্র সৃষ্টির কোন সার্থকতা আছে কি, না, তিনিই জানেন।

নাটকের গীতি কাব্যাংশ।

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিশেষ বিকাশ গীতি কবিতায়। তিনি বিশেষরূপে গীতি কাব্যেরই কবি। সুতরাং ফাল্গুনীর মত রূপকজাতীয় নাট্যেও গীতি কবিতার অজস্র প্রস্রবণ যেন চারিদিক হইতে শত ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। এজন্য ফাল্গুনী শুধু রূপক জাতীয় নাট্য নহে,—গীতি কবিতার বহুল সংমিশ্রণে ইহার আরো একটি নূতনরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এত গুলি গানের মধ্যে একটা খুব বাধামুক্ত সরল প্রাণের স্বাভাবিক উক্তি আমরা অতি অল্পই খুঁজিয়া পাই। অনেক গানের অর্থ বুঝি না বলিয়াও আক্ষেপ করি না। কেন না নিশ্চয় জানি অনুবাদ হইবা মাত্র দূর সিন্ধু পারের বিদেশী এবং বিদেশিনীরা অচিরেই ইহার সদর্থ গ্রহণে সমর্থ হইবেন। এইখানে কবিরও সার্থকতা। ভুল করিয়া বাঙ্গালী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখন সংশোধন করাও সম্ভব নয়। তাই এ জন্মে অনেক বাঙ্গলা গানের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

একটি গীতি কবিতায় গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটি রসের সৃষ্টিই শোভনীয়। বিচিত্র বা বিসদৃশ রসের সমাবেশ একটি গীতি কবিতার মধ্যে অশোভন। সাধারণ ভাবে রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতায়, এবং বিশেষ ভাবে ফাল্গুনীর অনেক গুলি গানের মধ্যেই একটা গানে বা কবিতায় বিপরীত বা বিসদৃশরসের অবতারনা গান গুলিকে শিল্প নৈপুণ্যের দিক হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান

দিতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে গুলিকে উল্লেখ করিব মনে করিয়া ছিলাম, স্থানাভাবে এ যাত্রা তাহা পারিলাম না। পাঠকগণের নিকট এই ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই।

উদ্দেশ্যমূলক কি না?

ফাল্গুনী রূপক নাটক তাহা দেখিলাম। কোথাকার কোন ভাবকে কি রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলাম। নাটকীয় শিক্ষাকলায় নৈপুণ্যও দেখিলাম। ইহার গীতি কাব্যের অংশও দেখিলাম।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া—আমি মনে করি না।

আমার বিশ্বাস এই নাটক খানি কেবল রূপকজাতীয় নয়। উদ্দেশ্য-মূলকও বটে।

ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যে যে সমস্ত নানা ভাবের সুর শুনা যাইতেছে তাহার মধ্যে বিদ্রোহের সুরটা খুব অস্পষ্ট নয়। বরং বেশী রকমের স্পষ্ট। ফাল্গুনীর মত অনুকরণ সাহিত্যেও তাহার ঝাঁঝটা যেন আমরা দেখিতে পাই। কবি তাঁহার এই কাব্যে একটা বাধামুক্ত, উদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের জয়গান গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে 'শ্রুতিভূষণের বৈরাগ্যবারিধি' আর 'দাদার চৌপদীকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিতরকার সুরটাও যেন দেশের প্রাচীন সংস্কার বা ট্রাডিসন বা কনভেনসনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহেরি সুর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার যে স্তরে ফাল্গুনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সহিত এই বিদ্রোহের সামঞ্জস্য আছে।

আমাদের দেশেও যখন জীবনের লীলা চলিয়া আসিয়াছে,—চলিতেছে এবং চলিবে তখন আমাদের মধ্যেও ভাঙ্গা গড়ার নিত্য প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু অস্মদ্দেশের কোন প্রাচীন মত বা সংস্কারকে ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইলে তাহা কি মেটারলিঙ্কের অনুকরণ-সাহিত্য দ্বারা সম্ভব হইবে? রাজা রাম-মোহনের পর হইতে ধর্ম্মে ও সমাজে যাহা সম্ভব হইল না, এবং যে জন্য সম্ভব হইল না, তাহাই কি সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রতিভা দ্বারা এত সহজে সুসম্পন্ন হইবে? আমাদের এরূপ আশা নাই, আশঙ্কাও নাই। প্রতিভা ও জাতীয় ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ নিস্ফল হয়, শ্রদ্ধেয় রাজ নারায়ণ বসু

মাইকেল প্রসঙ্গে তাহা বলিয়াছেন। কেহ ইচ্ছা করিলে তাহার পুনরুক্তি করিতে পারেন। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন।

আর্ট আনন্দের সৃষ্টি। তাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। এই কথা রবীন্দ্রনাথ তখনি বলিতে সুরু করিয়াছেন, যখন তাঁহার গল্পে, উপন্যাসে হেঁয়ালী নাট্যে, এমন কি কবিতায় একটা সমাজসংস্কার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা তার স্বরে তিনি ঘোষণা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অভিমত তাঁহার রচিত সাহিত্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিতেছে না। লোকে যাহা বলে তাহা প্রায়ই করে না। সে কথা লইয়া আক্ষেপ করিয়া আর কি হইবে? তবে আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়া একটা বিশেষ সামাজিক মতবাদ প্রচার করা, ইহাও আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা লক্ষণ। আর তাই বলিয়াই রবীন্দ্র সাহিত্যেও ইহারি একটা ছায়া অনিবার্য্যরূপেই আসিয়া পড়িয়াছে। এবং এইরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমশঃ বিশ্ব সাহিত্য হইয়া উঠিতেছে।

"কবির কৈফিয়ৎ"

সবুজ পত্র—জ্যৈষ্ঠ ১৩২২।

ফাল্গুনীর কবি যেমন এই নাট্য রচনার প্রথম হইতেই পাঠকবর্গকে নানাদিক হইতে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য একটা উৎকণ্ঠা দেখাইয়াছেন; তেমনি কাণাঘুষায় বাতাসে ইহার এক অপ্রিয় সমালোচনা শুনিয়া এক অযাচিত কৈফিয়তের অবতারণাও করিয়াছিলেন।

ফাল্গুনীর অনেক রকমের সমালোচনা অনেক স্থানেই শুনিয়াছিলাম। কবি হয়ত সেগুলিকে "কীট পতঙ্গের উপদ্রব" বলিয়া প্রতিষেধ কল্পে লেখনী ধারণ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এমন অনেকের নিকট ফাল্গুনীর অপ্রিয় সমালোচনা শুনিয়াছিলাম, যাহারা, কবি হয়ত বিশ্বাস করিবেন না, কীট পতঙ্গ নহে।

নিন্দা সমালোচনা নহে। প্রশংসা সমালোচনা নহে। অথচ সমালোচনায় এই উভয়েরি অবসর আছে। কাব্য সৃষ্টি যেমন নিখুঁত হয় না, সমালোচনাও তেমনি নিখুঁত নাও হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কবিমাত্রই কেন যে ঋষি হইবেন, আর সমালোচনা মাত্রই কেন যে কীট পতঙ্গের উপদ্রব হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে একান্তই অক্ষম। বাঙ্গলায় সমালোচনা নাই। কে

আসে, হইতেও পারে। কেহ হয়ত আরো একটু অগ্রসর হইয়া পালটা জবাবে বলিতে পারেন, বাঙ্গলায় সমালোচনা নাই বলিয়াই ছোট গল্পে, উপন্যাসে ও কবিতায়, কীট পতঙ্গের উপদ্রব এত বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। পরকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার একমাত্র উপায় নিজে অসহিষ্ণু হওয়া, এমন কথা স্বদেশী বিদেশী কোন পণ্ডিতই বলিবেন বলিয়া ভরসা হয় না।

'সবুজ পত্রে' ফাল্গুনীর কবির কৈফিয়ৎ পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। স্নায়ু কত দুর্ব্বল হইলে মানুষ এত সহজে বিচলিত হইতে পারে। কৈফিয়ৎ পড়িয়া বুঝিলাম, কবি কোন্ সমালোচনা এবং কাহার সমালোচনাকে প্রতিষেধ করিবার জন্য দুই হাতে কালি উঠাইয়া সবুজ পত্রের পৃষ্ঠাগুলিকে লেপিতে ছিলেন।

এমন একটা সমালোচনা, একটা খুব বড় জায়গা হইতেই উঠিয়াছিল যে এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের দিনে, যখন সমগ্র মনুষ্য জাতি যুদ্ধের নামে এক বিরাট হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত, যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের নরনারী এই নৃশংস হত্যার সম্মুখে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা বক্ষে চাপিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে, ভীতিবিহ্বল চক্ষে দণ্ডায়মান, তখন এসিয়ার—পোয়েট লরিয়েট, (তিনি ত আর শুধু বাঙ্গালীর নন্!) একজন প্রসিদ্ধ বিশ্বকবি কি করিয়া হঠাৎ এমন অসময়ে আচমকা যৌবনের দল লইয়া ছুটী ছুটী বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন? জগতের দুঃখ কি তাঁহাকে আঘাত করে নাই! অথবা কে জানে সমস্ত জীবনটাই যাহার কাছে একটা প্রকাণ্ড অবসর, একটা বড় রকমের ছুটী, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা তাঁহার কাছে এই একই ভাব। রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার বিরুদ্ধে, ফাল্গুনীর, ছুটী, বসন্ত ও যৌবনের দলের সমর্থনে এবং স্বীয় কবি প্রতিভার সমর্থনে, সবুজ পত্রে "কৈফিয়ৎ" প্রকাশ করেন। অতিশয় মন্দভাগ্য আমরা, কেন না ঐ কৈফিয়ৎ পড়িয়া আমাদের কোন উপকারই হইল না। এবং এ কথাও ভয়ে ভয়ে লিখি কেন না বাঙ্গলা পদ্যের ছন্দ লইয়া যিনি নাকি সম্প্রতি 'ভেল্কীবাজী' খেলিতেছেন, তিনি হয়ত বা আমাদের এই রবীন্দ্র প্রতিভা বুঝিবার অক্ষমতার উপর কোন্ না একটা ব্যঙ্গ কবিতা না লিখিয়া বসেন। সত্যই বাঙ্গলা সাহিত্যে আজ কীট পতঙ্গের উপদ্রবের অন্ত নাই।

কৈফিয়ৎ ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ফাল্গুনীর একটা মোটামুটি ভাব লইয়াছিলাম। যৌবনের দলের বসন্ত উৎসবের একটা তাৎপর্য্য শিল্পকলার নানা অসঙ্গতি ও অক্ষমতা সত্ত্বেও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ

এই ক্রুদ্ধ কৈফিয়ৎ, আর বাঙ্গালী পাঠক সমাজের উপর অযথা উদ্ধত ব্যঙ্গ, কবির এই অসহিষ্ণু মেজাজে, আর কবি হয়ত অবগত নহেন তাঁহার জন কয় নির্লজ্জ স্তাবকের অপ্রত্যাশিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, আমাদিগকে একেবারেই 'আশাহীন, ভাষাহীন' করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্র সাহিত্য যে পড়িতে পারিব এমন ভরসাই হয় না। অনেকে ত সে আশা একেবারে পরিত্যাগই করিয়াছেন।

যাহা হউক রাবিন্দ্রিকগণ মাঝেমাঝে কথায় কথায় রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য সমালোচকদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দেন। সম্প্রতি দেখিতেছি কবি নিজেও এমন কথা বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন যে, "অথচ আমার ঐ বই খানা সমুদ্রের ওপারে খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছে।"

'রাজা', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' এই তিনখানি ঠিক একই শ্রেণীর হেঁয়ালী কাব্য? সাধারণ ভাবে রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালীনাট্য গুলি সম্বন্ধে একজন বিদেশী সমজদার পণ্ডিত কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিব। কেন না রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকগণ বিদেশীর সমালোচনাই অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন।

—"The cauciously nurtured spirituality and the peculiar symbolism (to name two matters only) of the lyrics are foreign to our poetry. The plays can scarcely be said to be drama, as we conceive it. Their symbolism, besides distracting attention from concrete character and action produces (in the king of the dark chamber [রাজা] particularly) an obscurity that might seem fatal to drama,—" J. C. Rollo ,— Principal pachayappay College, Madras *

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

* প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এই সমালোচনাটি আমি এক সান্ধ্য সম্মিলনীতে পাঠ করিয়াছিলাম। বন্ধুগণ সকলেই ঘোর রাবিন্দ্রিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু অজিতকুমার এখন পরলোকে। তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠের পর অতিশয় উষ্ণ হইয়া ছিলেন। এতদিন এই প্রবন্ধ ছাপান হয় নাই। শেষাংশে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সমগ্র মূল প্রবন্ধটিই ছাপান গেল।

—লেখক।

আমাদের কথা।

আমি বার বৎসর একরকম জীবন্ত সমাধিতে ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" ও "ডাকঘর" দুইটির কোনটিই চক্ষে দেখিতে পাই নাই। তাহার উপর আমি একটু আধটু কবি হইলেও হইতে পারি, সমালোচক বোধ হয় নই। ভবিষ্যতে সমালোচনা শিখিব ইচ্ছা আছে, কাহার কাছে শিখিব তাই ভাবিতেছি।

নারায়ণের ভার লইয়া অবধি আমি যে ভয় করিতেছিলাম, শেষটা তাহাই হইল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার মণি, গিরিজাবাবুও বড় প্রিয়তম। আমার উভয় সঙ্কট, আমি দুই জনের কাহাকেও ব্যথা দিয়া আমার মনের কাছে নিষ্পাপ থাকিতে পারি না।

তবু যে কেন গিরিজাবাবুর এ অপ্রিয় সমালোচনা নারায়ণ ভৃগুচিহ্ন স্বরূপ বক্ষে ধরিল তাহার কারণ আছে :—

প্রথমতঃ নারায়ণ পক্ষপাতশূন্য ও সমদর্শী, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মাত্রই তাই। মাধুর্য্য ও তত্ত্ব বিলাইতে যাহার জন্ম সে নারায়ণের এই ব্যক্ত লীলার মতই শুদ্ধ নিষ্পাপ ও আনন্দের ধ্বনি। ভগবানের রচনায় গালাগালি নাই, ভাল ও মন্দ সব লীলা সিন্ধুর রঙ্গময় বীচিবিভঙ্গ মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-সাহিত্য রচনার দিক দিয়া আবার গিরিজা বাবুর বাঙ্গলার নিজস্ব ধারার দিক দিয়া সত্য তো উভয় দিকেই আছে। এই দুইটির সুন্দর সামঞ্জস্যই পূর্ণ সত্য, একে অন্যের অভাবে অঙ্গহীন। বাঙ্গলার ধারা না হারাইয়া বিশ্ব-সাহিত্য রচিতে হইবে। বেদ অপৌরুষেয় এ কথা যে মানে সে বিশ্ব-সাহিত্যকেও মানে, বেদ অর্থে চারখানি বহি নয়, সনাতন তত্ত্ব, যাহা দেখিয়া ও পাইয়া ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। এ তত্ত্ব সকলেরই জ্ঞানে নিত্য বর্ত্তমান (কেবল সাধনলভ্য), তাই সনাতন, তাই অপৌরুষেয়। যে সাহিত্যে তাহা যত ফুটে তাহাই তত বিশ্ব-সাহিত্য, তাহা পড়িয়া তত জগজ্জনে রসবোধ করে। প্রত্যেক দেশ—আপন আপন ধারায় ভাবে ভঙ্গিতে এই বিশ্ব-সাহিত্যের —অপৌরুষেয় রসের ফুল ফুটায়।

তৃতীয়তঃ এ প্রসঙ্গ যখন উঠিয়াছে তখন রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহার একটা চূড়ান্ত মিমাংসা হইয়া যাক। আমাদের একান্ত বাসনা "কীট পতঙ্গ" বা "স্তাবক" বাদে প্রধান রথী দুইজন ব্যক্তিগত কটকাটব্য ত্যাগ করিয়া

শান্তভাবে নিজের নিজের দিকের চূড়ান্ত কথা লিখিয়া যান, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের বড় আদরের জিনিস হইবে।

চতুর্থতঃ আমরা গিরিজা বাবুর মুখে রবীন্দ্রনাথের যে গুণকথন শুনিয়াছি কোন চাটুকারে তাহার অধিক প্রশংসা আর কি করিবে? গিরিজা বাবু রবীন্দ্রনাথকে এত আপনার ভাবেন এত শ্রদ্ধা করেন বলিয়া তাহার ত্রুটি গিরিজা বাবুর অঙ্গে এত বাজে। পরের জন্য সাহিত্য বনের তুচ্ছ পত্রোত্তের জন্য কে কবে এমন করিয়া ব্যাকুল হয়? রবীন্দ্রনাথকে তিনি কোজাগরীর ষোলকলা পূর্ণশশি দেখিতে চান। তাই তাঁহার অপ্রিয় কথাও রবীন্দ্রের পায়ে নিবেদিত হইবার যোগ্য।

প্রধানতঃ এই কয়টি কারণে আমরা গিরিজা বাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কথা ছাপিব। আমি সম্প্রতি নারায়ণের রথ কবি চিত্তরঞ্জনের কাছেও এ প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিলাম, তাঁহারও ইচ্ছা নয় কেহ কাহাকেও অসহিষ্ণু ভাবে বিচার করে। অসীম ধৈর্য্য অপরাজেয় সংযম বিনা অপক্ষপাত বিচার সম্ভব নয়।

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ বিচার করিবার সময় রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে আসিবে না। বঙ্গ সাহিত্যে এত বড় প্রভাব সরিয়া না গেলে, ঠিক রবীন্দ্রনাথের তুল্য শক্তিমান বড় কবি না জন্মিলে এবং এই পক্ষপাতিত্ব ও সংঘর্ষের ভাব কাটাইয়া না উঠিতে পারিলে রবীন্দ্রের যথার্থ আসন রবীন্দ্রকে দিব কিরূপে? এখন পাশ্চাত্য ভাবের অনুরঞ্জনা ও বাঙ্গলার নিজস্ব ধারা এই দুই তরঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়াছে, কিন্তু সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব পূর্ণ পরিণতি আসে নাই। আসিলে যে যাহার আসনেই বসিবেন, সকলের নিয়ামক যিনি তিনিই অপূর্ব্ব উপায়ে অনুপম লীলাচাতুর্য্যে এ সমস্যার সমাধান করিবেন। আমরা নিয়ন্তা নাই হইলাম।

আর একটি কথা বীণাপাণীর বড় ও ছোট কোন সাধকের ভুলিলে চলিবে না, যে, ইষ্টদেবতার শ্রীমন্দিরে চন্দন পুষ্প বিল্বপত্র গঙ্গোদকই লইয়া যাইতে হয়, কোন প্রকার অশুচি আবর্জ্জনা লইতে নাই। সাহিত্য-সেবা যে পূজা, বড় পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান, বাণীপিঠ যে বারাণসী ও গঙ্গোত্রীর অধিক মুক্তিপ্রদা। এ তীর্থের জ্ঞানযোগীর কি সংযম হারাইলে চলে? যাহা মৌলিক ও নবীন সৃষ্টি creative literature, যাহা রসের প্রস্রবন ও আনন্দের তত্ত্ব তাহাই তো চিরদিন টিঁকিবে। যজ্ঞের স্থানে গোহাড় ফেলা ব্রাহ্মণের কাজ নহে, নীচ রাক্ষসবৃত্তি, অসংযমী বুঝিতে পারে না যে যাহা সত্য ও চিরন্তন গ্রন্থগুলির

রসান দিয়া দ্বেষ ও ঘৃণার রাঙ্‌তা পাতে সে খাঁটি সোণার শোভা বাড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই। সত্যের বড় প্রতিষেধক গালাগালি যে আর কিছুই নাই। আমাদের সকলের কাছে যুক্তকরে একান্ত অনুরোধ সকলে সত্যই বলিয়া যান, অপ্রিয় ঘৃণার ভাষায় ছোট বড কোন স্বতীর্থ সাহিত্যসেবীর মর্য্যাদার হানি করিবেন না।

সামাজিকত্ব ও জীবত্ব

আমি অর্থাৎ এই ব্যক্তি যাহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ, যাহার কথা শুনিতেছ, যাহার কায ও হাবভাব সর্ব্বদা সমালোচনা করিতেছ, সেই আমি সামাজিক জীব। আমি কেমন করিয়া সামাজিক জীব হইলাম, তাহাই ভাবিতেছ ?

এই আমির ভিতর আর একটা আমি আছে, যাহার পারিভাষিক নাম হইতেছে আত্মা। আত্মা কে ? না, যে "বিষয়ী অর্থাৎ যে কর্ত্তা, যে ভোক্তা, যে সুখী, যে দুঃখী যাহার জন্য বিষয়রূপী সমস্ত জগৎ।" এই যে বিশ্বজগৎ, যাহার ভিতর তুমি আমি একটা পরমাণুর মত কোথায়—কোন্ কোণে পড়িয়া আছি, সেই বাহ্য বিশ্বজগৎ সেই আত্মারই, সেই আন্তর্ আমিরই কল্পনাজাত তাহারই অনুমানগোচর, তাহারই স্বপ্নের বিষয়, আবার কেবল এই বিশ্বজগৎই ধ্যান ও ধারণা, চিন্তা ও অনুভূতি, কল্পনা ও কামনা। এই বাহ্য বিশ্বজগৎকে লইয়াই সেই আন্তর্ আমি। উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ইহাদের একেকে ছাড়িয়া অপরে দাঁড়াইতে পারে না। কারণ সেই আন্তর্ আমির "প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অনুমানের যে ভাগটাকে বাহ্য জগৎ আখ্যা দিই, সেটা বাদ দিলে" সেই আন্তর্ আমির "নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কতটুকু থাকে, নির্দ্দেশ করা" দুরূহ। অর্থাৎ এই বাহ্য জগৎকে সেই আন্তর্ আমি হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবা চলে না। একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব। একের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে অপরের অস্তিত্ব লোপ পায়।

বিশ্বজগতের সহিত যখন আন্তর্ আমির এরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তখন এই বিশ্বজগৎকে অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া ভুল। বিশ্বজগৎকে মানিলে সমাজকেও মানিতে হয়। কারণ, আমার এই যে দেহ, তাহা একা আমার চেষ্টায় রক্ষা

পাইতেই পারে না, পুষ্ট ও পরিণত হইবে কেমন করিয়া? চারিদিকের বিরুদ্ধ শক্তিচয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলেই দল বাঁধিতে হয়ই। দলই সমাজ। সুতরাং আমার মধ্যে যে আন্তর্ আমি, তাহার বাসভূমি-স্বরূপ আমার যে ভৌতিক দেহ, তাহা রক্ষার জন্য যাহা সাহায্য করে, তাহা কি বাস্তবিকই অগ্রাহ্য করিবার বিষয়?

এই বিরুদ্ধ শক্তিচয় কোথায়? কেন, এই বিশ্বজগৎ মানিলে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত যাহা কিছু সবই তো মানিয়া লওয়া হয়। "মৎস্য, কুম্ভীর, কচ্ছপ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, পর্ব্বত, গহ্বর"—কিছুই বিশ্বাতীত নহে। এই সকলের সহিতই সেই আন্তর্ আমির তথা এই ভৌতিক দেহেরও সম্পর্ক রহিয়াছে। তা ছাড়া এই দেহটাও তো সেই আন্তর্ আমির "কল্পিত, সৃষ্ট, অনুভূতিগত, প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতেরই অংশীভূত।" আর সবই যেমন "সেই আন্তর্ আমির প্রত্যক্ষগত ও বহিঃস্থ, ইহাও তেমনি" আন্তর্ আমির "প্রত্যক্ষ গত ও বহিঃস্থ।"

সমস্তই আন্তর্ আমির অনুমান লব্ধ বা সৃষ্ট হইলেও, সেই সমস্তই বাহতঃ বিভিন্ন রূপেই প্রকাশ পায়। এই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে যেমন একটা মিল আছে, তেমনি একটা বিরোধও আছে। আর সেই বিরোধ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান।" এই মিল ও বিরোধ যে সেই আন্তর্ আমি ছাড়া, তাহা নয়। এগুলিও তাহার কল্পনা, তাহার অনুমান, তাহার সৃষ্টি। সুতরাং মিলের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধকেও মানিয়া লইতে হয়।

যখনই আন্তর্ আমি বিশ্বজগৎকে কল্পনা করিতেছে, তখনই বিশ্বজগৎটাকে আপনা হইতে পৃথক করিয়াই কল্পনা করিতেছে। এই পৃথক্ ভাব হইতে বিরোধের সৃষ্টি। "এই বিরোধ লইয়া জীবনের উৎপত্তি, এই বিরোধেই জীবনের সমাপ্তি।"

সুতরাং বিশ্বজগৎ একদিকে যেমন আমার মিত্র, অন্যদিকে তেমনি আমার শত্রু। আমার অর্থাৎ আমার এই ভৌতিক দেহেরও বটে আর এই দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী আমিরও বটে। বিশ্বজগৎকে ছাড়িলে যেমন আমির (তথা আমার) কিছু থাকে না, তেমনি আবার তাহার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেলেও আমির অস্তিত্ব থাকে না। বিশ্বজগৎ হইতে স্বতন্ত্রভাব রক্ষা করাতেই আমির অস্তিত্ব। বিশ্বজগতের আক্রমণ হইতে, তাহার গ্রাস হইতে, তাহার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাওয়াই আমির তথা

আমার)" জীবন-ব্রত। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার সহিত আমির সম্বন্ধ নির্ণয়ই সমস্যা, তাহার প্রতি আমির কর্ত্তব্য-নির্ণয়ই আমির জীবন। "সেই সম্বন্ধ নির্ণয় ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের অপর নাম ধর্ম্মব্যবস্থা।"

জগৎটাকে যদি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা যায়, যদি জগতের বিভিন্ন অংশের সহিত আমির (তথা আমার) সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, আমির সহিত মুখ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায় প্রথমে আমির শরীরের অর্থাৎ আমার, পরে পুত্রপৌত্রাদির পরে "পত্নী, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের। এইরূপে ক্রমশঃ মুখ্য গৌণ পরম্পরায় জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, কুল, বর্গ, এইরূপে চলিয়া শেষে মানবজাতি, জীবকুল ও জড়জগতে গিয়া শেষ হয়। শেষ হয়— ঠিক বলা যায় না, কেন না, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া আর একটা এমন প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা হয়ত কোন কালেই প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। প্রত্যক্ষের অতীত অতীন্দ্রিয় এই প্রকাণ্ডতর জগৎ রহিয়াছে, যাহা আমির কল্পনার বিষয়, সুখ-দুঃখের হেতু, আমির চিন্তার ধ্যান ও আমির আশার লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ জগতের সহিত দৈনন্দিন নিত্য আবশ্যক কাটা ছাঁটা রুটিন-অনুযায়ী কারবার সমাপ্ত করিয়া একটু অবকাশ পাইলেই, আমি (অর্থাৎ আন্তর আমি) সেই অতীন্দ্রিয় জগতে আশ্রয় লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে গা খুলিয়া বিহার করিয়া বেড়াই ও হাওয়া খাই।"

"সম্বন্ধ অবশ্য সেই খানেই মুখ্যতর, যেখানে ঘনিষ্ঠতা অধিক, যেখানে কারবার ও নিত্য আদান-প্রদান অধিক। সুতরাং আমি ছাড়া সমগ্র জগতের মধ্যে প্রথমে দাঁড়ায় আমি (অর্থাৎ দেহধারী আমি বা আমার দেহটা), পরে পুত্র পরিবার লইয়া মানব-জাতি, পরে জীবসমূহ লইয়া জড়জগৎ ও সর্ব্বশেষে সর্ব্বতোভাবে আমির রচিত ও কল্পিত সেই অতীন্দ্রিয় মানসরাজ্য।"

এই যে মুখ্য-গৌণ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ লইয়াই আমার কর্ত্তব্য ভেদ। তুমি আমি অভেদ বলিয়া তোমার উৎকর্ষে আমার উৎকর্ষ, তোমার অপকর্ষে আমার অপকর্ষ, আবার তেমনি তুমি-আমি স্বতন্ত্র বলিয়া তোমার স্বার্থে আমার অনর্থ, তোমার মঙ্গলে আমার অমঙ্গল। এই উভয় দিক্ হইতে বিচার করিয়াই তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়। ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] সংখ্যা নারায়ণে "অরবিন্দের পত্র" ও দ্বীপান্তরের কথার প্রথম

অরবিন্দের কিশোর বয়সের ছবি।

আমরা জগতের কোন কাজ বাদ দিতে চাই না, রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে। এই সকলকে নূতন প্রাণ নূতন আকার দিতে হ'বে।

আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে * * * অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খাম খেয়ালী নয়, রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ।

লাখ লাখ শিষ্য চাই না, এক শ' ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পূরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাহাই যথেষ্ট।

নারায়ণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ সাল।

চাতক।

[শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।]

১

"দে জল, দে জল"
দারুণ বৈশাখী দিন,
ধরা তপ,—ছায়াহীন,
চারিধারে আগুন কেবল।
সমীর থমকি রহে,
বহে কিবা নাহি বহে,
ভীতিভরা সারা ধরাতল।

২

"দে জল, দে জল"
কে তুই রে হেনকালে
পাখীরূপী বসে ডালে,
উদ্ধপানে নয়ন যুগল;
কাতর, পাগল-দৃষ্টি—
করিস করুণা-বৃষ্টি,
প্রাণগলা সুর অবিরল?

৩

"দে জল, দে জল"
অন্তর জগৎ জুড়ে
তোর কিরে গেছে পুড়ে
তোর বিশ্ব জলন্ত অনল।
তাই কি উদাস সুর,
কাতরতা সুমধুর—
চায় পাখী সলিল তরল?

৪

"দে জল, দে জল"
একি রে নিয়তি হায়,
(তুই) এত যদি পিপাসায়,—
আছে ওই অনন্ত অতল
সীমা হারা মহাসিন্ধু,
চাস তুই কয়বিন্দু,
তৃষা তোর কতই প্রবল?

"দে জল, দে জল"
'সপ্তসিন্ধুময়ী ধরা'
পিয়ে জল প্রাণভরা
মিটা তোর প্রাণের অনল
(যদি) সে জল অপেয় হ'বে,
নদ নদী কত ভবে,
তবু তোর একি জ্বালা বল্?

৬

"জল দে, জল দে"
ছুঁবি না সে বিন্দুবারি,
বুঝি তোর তৃষাহারী :
ডাকিস্ রে সজল জলদে ;

প্রাণ-পণা তোর ডাকে
দেবে সাড়া যেথা থাকে,
তুই হেথা চেয়ে আশাপথে।

৭

"জল দে; জল দে"
দগ্ধকারী বজ্রানলে
হায় রে মরিবি জ্বলে,
দিয়ে যাবে ছোট বুক মথে;
তবু তোর এক আশা,
এক লক্ষ্য, এক ভাষা,
এক বারি এ তৃষা মিটাতে।

৮

কি মহা সাধন!
এই তোর মহাস্বর্গ
এই মৃত্যু, চতুর্ব্বর্গ,
পাখী তোর নিয়তি এমন;
তুই যেন আর্য্যবালা
বুকে বহি' মহাজ্বালা,
পতিপানে দুইটি নয়ন!

৯

মানুষের প্রেম ছাই
আজ আছে, কাল নাই
জানে, তবু আর্য্য নারী মন
দেব কি দানব হো'ক
স্বর্গে কি নরকে রো'ক
পতিব্রতা,—পতিই জীবন!

১০

"দে জল, দে জল"!
বিশ্ব ভুলি ভোলা মেয়ে,
এক লক্ষ্য থাকে চেয়ে,

চাহে না সে অনন্ত অতল ;
সাজে প্রাণ তৃপ্ত তার,
সে চাহে না পারাবার,
আ মরি রে, প্রেম-শতদল !

১১

ওরে বিহঙ্গম !
তুইও যেন হিন্দুবালা
পর-পদে প্রাণ ঢালা
সঁপে দেওয়া জীবন মরণ ;
জানিনাক' একি ব্রত,
কোন পাখী তোর মত,
তোর কণ্ঠ ভূলোক-মোহন।

১২

স্বরগ স্বপন !
দে জল দে জল ঢালি
কিসের অনল জ্বালি
তোর প্রাণ করেছে দাহন,
যে জ্বালা নেবে না হায়,
সাগরে ডুবালে কায়
বিনে নব ঘন-বরিষণ !

১৩

প্রাণ যায় গলে,
শুনি শুনি তোর সুর,
ওরে পাখী মধুর,
ভুলে যাই সে সুরের বলে
আমিও, আমিও যে রে
অফুরন্ত সিন্ধু ছেড়ে
তৃষা দূর করি বর্ষাজলে

বাঙলা ভাষার বনিয়াদ।

[অধ্যাপক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ।]

বেদের ভাষা অনার্য্যের মুখে পড়িয়া প্রাকৃত হইল—প্রাকৃত হইতে আবার বাঙলা প্রভৃতি জন্মাইল। বেদের ভাষা স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে চলিতে থাকিলে যে ভাষাতে পরিণত হইত, বাঙলা প্রভৃতিব সে পরিণতি দেখায় না। আর্য্য ভাষা অনার্য্য-ভাষীর হাতে পড়াতেই এ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হয় নাই। বাঙলার ধাতু ও শব্দ অনেক পরিমাণে বৈদিকভাষা হইতেই লওয়া—কিন্তু বাক্য-বিন্যাসরীতি ও উচ্চারণ পদ্ধতির দিক দিয়া দেখিলে আর্য্যভাষার বিশুদ্ধ ধারা ইহাতে মোটেই পাওয়া যায় না। "দ্রাবিড়ী ভাষাগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাঙলারও সেই ছাঁচ। আমরা আর্য্য ভাষা বলি, কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য্য ধরণে আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে। ভাষার ধ্বনিগুলি বদলাইতে পারে, তাহাদের সমষ্টি ধাতু শব্দগুলি আর প্রত্যয়গুলিও বদলায়, কিন্তু কোনও জাতির মধ্যে তাহার চিন্তা-প্রণালীটি সহজে বদলায় না;—কারণ সেটা মস্তিষ্কের জিনিস, ধ্বনি বা শব্দের মত সহজে অনুকরণীয় নয়। অন্য জাতির প্রভাবে পড়িয়া এক জাতি নূতন ধ্বনি, শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় শিখিয়াছে, আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু যেরূপ চিন্তায় তাহারা অভ্যস্ত সেরূপ ভাবে চিন্তা করাটা শীঘ্র ছাড়িতে পারে না;—সাধারণতঃ তাহাদের নূতন করিয়া শেখা অন্যজাতির ভাষার শব্দ, ধাতু, প্রত্যয় তাহারা নিজ ভাষার বাক্য রচনার অনুরূপ করিয়া লয়।" (অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়)

বাঙলা ভাষার বনিয়াদ কোথায় দেখিতে গেলে, আমরা তাহার বাক্যবিন্যাস-রীতি (Syntax), স্বর এবং উচ্চারণ (Accent and Pronunciation), এবং শব্দ সমূহের (Vocabulary) দিক হইতে তাহাকে বিচার করিব।

বৈজ্ঞানিক ভাবে ভাষার জাতি নিরূপণ করিতে হইলে Syntax এর সাক্ষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

বৈদিক, অবেস্তা এবং প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় ক্রিয়ার কাল বুঝাইতে কত রকম রূপ ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃতে সেগুলির অনেক বজায় থাকিলেও প্রাকৃতে এবং বাঙলা প্রভৃতি ভাষার প্রাচীনরূপে, ইহারা মোটামুটি ভাবে তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। "প্রাচীন দ্রাবিড়ে দুইটি Tense ছিল,—... আর

কয়েকটির সৃষ্টি হয়। দ্রাবিড়ে, কোলে এবং ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় Prefixএর হাঙ্গামা নাই, সবই Suffix ; আমাদের ভাষাগুলিতে তাই, কিন্তু বৈদিকে তা' নয়। বৈদিকে Preposition ছিল, সেগুলি সংস্কৃতে ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত উপসর্গে পরিণত হইয়াছে। ত-তবৎ প্রত্যয় দিয়া তিঙন্ত ক্রিয়ার কাজ সারা তো সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে সাধারণ। যেমন—সঃ গতঃ, অশ্বম্ আরূঢ়বান্। দ্রাবিড়েও ঠিক সেইটি দেখি। বৈদিকে তা' নয়—স অগাম, অশ্বম্ অরুক্ষৎ। বাঙলার যে অতীত আর ভবিষ্যতের প্রত্যয়, তা' এই 'ত' আর 'তব্য' হইতে হইয়াছে, কোনও বৈদিক তিঙ্ থেকে নয়। এ ছাড়া, অনেক বাঙলা idiomএ দ্রাবিড়ের ছাপ পাওয়া যায়। বাঙলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ঘটা, সহায়ক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রভৃতি—আর নানা চল্‌তি বাক্যরীতি—এ সব দ্রাবিড় ভাষার অনুযায়ী।

লৌকিক সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়াছড়ি দেখা যায়। "তদাকর্ণ্য তথাগত্য স ক্রোধম্ অধিগম্য তং নিহত্য গৃহং গত্বা গুহাম্ আবিবেশ" এইরূপ বাক্য কেবল লৌকিক সংস্কৃতেই সম্ভব। প্রাকৃত এবং বাঙলাতে এইরূপ হইয়া থাকে—কিন্তু বৈদিকে ইহার চলন নাই। এস্থলে আমি শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বিরাজবৌ" হইতে দুইটি লাইন তুলিয়া দেখাইব। "চল' বলিযা বিরাজ উঠিয়া পড়িল, এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিযা শুইযা পড়িল।" (৫৬ পৃঃ)

"তাহাকে পাশে লইযা দ্রুতপদে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিযা হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর ধীরপদে ফিরিয়া গিযা রাজেন্দ্রের অদূরে আসিযা দাঁড়াইল।" (৭৬ পৃঃ) এই অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল প্রচলন অনার্য্য প্রভাবেই হইয়াছে।

সংস্কৃতে দেখিতে পাই একের অধিক কর্ত্তা বা কর্ম্মকে সংযুক্ত করিতে হইলে, 'চ' নামক অব্যয়ের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়—যেমন,

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে।
ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

কিন্তু প্রাকৃতে সংযোগবাচক অব্যয়টি মাত্র শেষের কথাটিতে যুক্ত হয়। আমরা বাঙলাতে এখনও তাই করি—"রাম শ্যাম হরি ও যদুও গেল।" বৈদিকে সমাস খুব কমই দেখা যাইত। যাহা কিছু সমাস, তাহার অধিকাংশই দুই বা তিন পদের এবং তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসেরই বাহুল্য ছিল। পরবর্ত্তী কালের লৌকিক সংস্কৃতের পাতাজোড়া বড়-বড় সমাস কথাবার্ত্তার ভাষায় চলিতে

পারে না। ভাষায় মৃত অবস্থায় উহা চলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মূলে ঐ সংযোগবাচক অব্যয়ের অপ্রয়োগ পদ্ধতিই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়—"রাম-শ্যাম হরি-যাদবঃ", বলিলেই সমাসের দ্বারাই কাজ সারা হইয়া যাইবে।

বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন দ্রাবিড় ভাষায় নাই—বাঙলাতেও নাই। তবে সংস্কৃতের অনুকরণে পণ্ডিতি বাঙলায় ইহার প্রচলন হইয়াছে। ব্যাকরণের শুদ্ধতাব দ্বারা আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে যতই সুন্দরী করিবার চেষ্টা করি না কেন—প্রাণের ভাষা কিন্তু সুন্দর না হইয়া যায় না।

'কি সুন্দর ভাষা', 'কি সুন্দর মেয়েটি'—এইগুলি বাঙালীর কানে ভাল শোনায়, না—'কি সুন্দরী ভাষা', কি সুন্দরী মেয়েটি' ইত্যাদি ভাল শোনায়? শুধু কানে শোনা নয়, বলিতে গেলেও প্রাণের আবেগে এই ব্যাকরণ-অশুদ্ধ ভাষাই বাঙ্গালীর মুখে আসিয়া পড়িবে।

এখন উচ্চারণের কথা ধরিব। "বৈদিক-পূর্ব্ব ভাষাব উচ্চারণের ধ্বনি সমষ্টির যাহা বিশেষত্ব, ভারতে দ্রাবিড়ের সংঘাতে আসিয়া তাহা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। বৈদিক-পূর্ব্ব ভাষায় কতকগুলি উষ্ম ধ্বনি ছিল, সেগুলি বৈদিকে মেলে না, আবার এটাও দেখি যে, দ্রাবিড়ে উষ্ম ধ্বনির একান্ত অভাব। আদি আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ছিল না। মূর্দ্ধন্য ধ্বনি বিশেষভাবে দ্রাবিড় ভাষার ধ্বনি; সেগুলি অন্য প্রাচীন ভাষায় মেলে না। যত এ দিকে আসি, ততই দেখি ভারতের আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধন্যের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে।" এখনো দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাইলে বুঝিতে পারিবেন, দ্রাবিড়ী ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ, ণ প্রভৃতির কিরূপ আধিক্য। এক ভদ্রলোক বুলপি বরফের হাঁড়ি নাড়ার সঙ্গে দ্রাবিড়ী কথাবার্ত্তার উপমা দিয়াছিলেন, উপমাটি ঠিক 'কালিদাসস্য' না হইলেও, ইহার মূলে বেশ খানিকটা সত্য আছে। বেদে পর্য্যন্ত এইরূপ উচ্চারণের প্রভাব রহিয়াছে। 'বিকট' প্রভৃতি শব্দ বেদেও মেলে। 'বিকৃত' হইতে 'বিকট' হইয়াছে—ইহা ভাষাতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই জানেন। আদিস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক উচ্চারণ বা একটির লোপ কোল এবং দ্রাবিড়ী উচ্চারণের বিশেষত্ব—যথা, স্ফটিক - ফটিক, স্থির—থির, স্কুল—ইস্কুল ইত্যাদি। প্রাকৃতে ও আমাদের ভাষায় এই ধারা অটুট রহিয়াছে। ইউরোপীয় ভাষায় এবং আফগানী, কাফির, ঈরাণী প্রভৃতি ভাষায় কিন্তু পূর্ব্ব ধারাই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সন্ধির অভাব আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। বৈদিকে সন্ধির নিয়ম তত বাঁধাধরা নয় বটে, কিন্তু সেটা সকল কথিত ভাষাতেই দেখা যায়।

"গাড়ারোহণ" বাঙলায় চলে না। "কনক-আসনে ব'সে দশানন বলী" ইত্যাদি স্থলে ছন্দের অনুরোধ অপেক্ষা ভাষার মর্ম্মগত প্রকৃতি অনুসারেই সন্ধি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের সন্ধিযুক্ত পদগুলি বাহির হইতে আমদানী এবং সেগুলিকে গোটা বলিয়াই ধরা হয়; যেমন 'শবাসনা' ইত্যাদি।

এখন শব্দসমূহের কথা আলোচনা করিব। "দ্রাবিড় শব্দ আধুনিক বাঙলায় অনেক আছে, আর সেগুলি একবারে ঘরোয়া শব্দ, যা' লোকে বই পড়ে শেখে না, যা' পরিবারে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসে। সংস্কৃতেও বিস্তর দ্রাবিড় শব্দ আছে। Kittelএর কন্নাড়ী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় প্রায় ৪৫০ সাধারণ সংস্কৃত শব্দ দেওয়া আছে, যেগুলি দ্রাবিড় থেকে নেওয়া। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বাঙলা ভাষায় অনেক দ্রাবিড় কথা বাহির করিয়াছেন।"

দ্রাবিড় ভাষা হইতে বহু শব্দ আর্য্য ভাষায় প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিবাদে ভদ্রবেশে চলিয়া যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ 'ঘোটক' কথাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেদের প্রাচীন অংশে ঘোটক শব্দ পাওয়া যায় না। দ্রাবিড় ভাষা হইতে একটু ভদ্রবেশ ধারণ করিতে গিয়া আমাদের চিরপরিচিত "ঘোড়াই" ঘোটক নাম পরিগ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

সংস্কৃতে দেশী শব্দ বলিয়া যে একশ্রেণীর শব্দ আছে,—তাহার মধ্যে খুঁজিলে অনেক অন্-আর্য্য শব্দ পাওয়া যাইবে। তবে বর্ত্তমান ভাষাবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে তাহাদের অনেকগুলিই বিকৃত সংস্কৃত শব্দ—যাহাদের প্রকৃত স্বরূপ ঠাওরাইতে না পারিয়া অভিধানকারগণ দেশী বলিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। আমাদের আটপৌরে ভাষার মধ্যেই কত যে অন্-আর্য্য শব্দ রহিয়াছে, তাহার খোঁজ নাই। বাঙলায় মূর্দ্ধন্যযুক্ত শব্দ পাইলেই বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হওয়া উচিত। এই সকল শব্দের মূল অনুসন্ধান করিলেই অনেক অন্-আর্য্য শব্দ বাহির হইয়া পড়িবে।

বাঙলা দেশের স্থানের নামের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে মেলে না। অধ্যাপক সুনীতিবাবু তাঁহার "বাঙ্গলা ভাষার কুলজী" নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই সকল নামের ইতিহাসের অনুসন্ধান কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়াছেন। হাবড়া, বিষ্ড়া, চাপড়া, চুঁচুড়া, বগুড়া, বাঁকুড়া, খাটাইল, টাঙ্গাইল, নড়াইল, মন্দাইল, ময়াইল, বাসাইল, সরিষাকান্দি, ভীলাকান্দি, হাইলাকান্দি; আমগাছি,

ঝিকড়াগাছি, সারগাছি; শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি—এই সকল অসংখ্য ইতিহাসবিহীন নামের মধ্যে যে কত অনার্য্য শব্দ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উড়িষ্যার অনেক গ্রামের নাম যে দ্রাবিড় শব্দ, পণ্ডিত-প্রবর বিজয় বাবু তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙলা দেশেও এইরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক।

একটি ছোট খাট আদিম বাঙ্গালী পরিবারের কল্পনা করা যাক। তাহার নিত্য অবশ্য ব্যবহার্য্য শব্দের মধ্যে কিছু অনার্য্য শব্দ এখনো আমাদের জানা আছে কিনা দেখা যাক।

১। টিকি, চুল, দাড়ি, মুণ্ড, গাল, চোয়াল, মাড়ি, পেট, ঠ্যাং, ভুঁড়ি, টুঁটি, হাঁটু।

২। ছেলেপিলে, বেটা বেটি, খোকা খুকি।

৩। চ্যাপ্টা, খেঁদা, বোঁচা, ঢ্যাঙ্গা, খাটো, বেঁটে, ন্যাকা, হাঁদা, বোকা, চিমড়ে, কুচুটে, বিটকেল, ছ্যাঁচড়া, ম্যাচলা, ছিঁচকে, ঠ্যাটা, কচি, কাঁচা, কুচি, আস্ত, টুকরা, চওড়া, বেঁড়ে, চ্যাৎড়া, ফাটা।

৪। ঘাটা, আঁচড়, আঁচুলি।

৫। হাঁটা, চাটা, সাঁটা, আঁটা, বাঁটা।

৬। চটকানো, কচলানো, ওতলানো, সাঁতলানো, বাগানো, পটানো, ফাটানো।

৭। হাঁড়ি, বেড়ি, খোলা, ঝাঁঝরি, চিমটে, বঁটি, জাঁতি, ডাবর, ডিবে।

৮। মাকড়ী, নং।

৯। লাঠি, ঠেঙ্গা, ঢেঁকি, কুলো, ধুচনি, কাঠা, ঝাটা, খাজুই, চুবড়ি, টুকনি, ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারি, টোকা।

১০। ঢাক, ঢোল, ডগর, ডমরু।

১১। ডোঙ্গা, চোঙ্গা, কেঁড়ে, নাদা।

১২। ভিটে, চাল, পিঁড়ে, মটকা, খুঁচি, বাতা, আড়।

১৩। গাড়ি, মাঠ, গোঁয়াড়।

১৪। গাছ, ডাল, গুঁড়ি, ডগা, গুটি, বট, স্যাওড়া, কচা, ভেরাণ্ডা, ভেঁট, পিটুলি, আতা, জিবলি, ছোলা, মুগ, মটর, খ্যাসারি, ডাব, পটোল, এঁচোড়, ওল, কচু, মান, কুল।

১৫। পলো, ছিপ, বর্শি, বটে, লগি, হাল, ডাঁসা, ট্যাংরা, চিংড়ী, ন্যাটা, বাটা, পুঁটী, ভেটকী, চ্যাঙ, ব্যাঙ।

১৬। ঘোড়া, ভেড়া, পাটা, মেকুর, টিয়া, চিল, ফিঙে, শালিক, দয়েল।

১৭। গণ্ডা, কুড়ি, বুড়ি, পণ, কড়া।

১৮। কাল, ইস্, নিড়েন, কাওড়া, কোদাল, শাবল, খোন্তা।

১৯। খাদা, বিঘা, কাঠা।

২০। ডালা, লেজ।

২১। মুড়ি, মুড়কি, গুড়, পাটালি।

২২। পোকা, ফড়িং।

২৩। খোয়াড়, খ্যাঁট, চোট, পৈনাট।

২৪। ঠাকুর।

২৫। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মুখে প্রচলিত অশ্লীল শব্দগুলি যাহা ভদ্রলোকের প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া ঠিক অবিকৃত অবস্থায় চলিয়া আসিয়াছে—শুনা যায় উড়িষ্যার জঙ্গলে সে শব্দ প্রচলিত আছে, সুদূর আসামেও নাকি তাহারই ব্যবহার আছে।

এই সকল শব্দের মধ্যে হয়তো অনেক বর্ণচোরা শব্দ আছে। আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষার পণ্ডিত এরূপ ভাষাতত্ত্ববিদের চেষ্টায় তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। তবে উপরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক শব্দ, বা খোকাখুকি, ছেলেপিলে গাছ, ঠাকুর প্রভৃতির মত সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দগুলি যখন অনার্য্য ভাষার, তখন বাঙলা ভাষার আদি শব্দ সমষ্টি যে অনার্য্যই ছিল তাহা বলা যাইতে পারে। আর পূর্ব্বেই বাক্যবিন্যাসরীতি এবং উচ্চারণের কথা আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে, সেখানেও অনার্য্য ভাষার ছাপ কতখানি রহিয়াছে। এই সকল সূত্র ধরিয়া আরো অনেক অনুসন্ধান করিতে হইবে—বৃথা গর্ব্ব এবং অন্ধ সংস্কার পরিহার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হইতে হইবে, তবেই বাঙলা ভাষার বনিয়াদ কি তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝিতে পারিব।

স্বয়ম্বৃত।

[শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।]

উন্মুখ শত কুমারী চিত্ত বরিতে তোমারে নিত্য হে।
(ঐ) জ্ঞান-প্রসূনে ফুল্ল মালিকা (করি) ভক্তি-চন্দনে লিপ্ত হে!
পার্ব্বতীর মত কৈশোরে যোগিনী,
(কত) চিত্ত বালিকা সাজি তাপসিনী
(হয়ে) সংসার বাসনা রিক্ত হে।—
(ফিরে) বিজন গহনে ক্লিষ্ট অনশনে
(হিম) তুষারে তনুয়া সিক্ত হে।

বরিতে তোমারে হে বর-বল্লভ,
লভিতে তোমারে জীবন দুর্ল্লভ,
(কিছু) জানে না তোমার কি রূপ, সৌরভ;
(তুমি) মধুর কি কটু তিক্ত হে!
তবু কেন হিয়া চাহে গো তোমারে
জানে না পাবে না বুঝিবারে হা রে!
পরা, কি অপরা সবই আসে হেরে
(ঐ করি) আঁখি দুটি নীর-সিক্ত হে।
(শুধু) তুমি বর যারে সে লভে তোমারে
(মোরা সবে) বৃথা ভ্রম ভ্রমি ক্ষিপ্ত হে!

সঙ্গম-তীর্থে।

[শ্রীশিবরাণী দেবী।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবলক্ষ্মীকে আমার মত কেহ চিনিত না, আবার আমার জীবনের পথের পাশে অনাদরে আধফোটা সে মুকুলটি আমিই সবার অপেক্ষা দেখিয়াও দেখি নাই। ফুল তো ফুল, অমন কতই না দেখিয়াছি। ফুটিলে ওর মধ্যে যে আবার ওরকম গন্ধ অত নয়নাভিরাম রূপ উছলিয়া উঠিবে তাহা কে জানিত? যে দিন সে সাড়া পাইলাম "চির জীবনের মত বঞ্চিত হইয়াই পাইলাম। তখন সে উষার তোলা জীবনটি পূজার সাজি হইতে গঙ্গাজলে চন্দন তুলসী ভরা নৈবেদ্যের ডালায় অঞ্জলি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে আমার মনভরা কান্না আর ভক্তিনত পূজা। যে দিন নবলক্ষ্মীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছি "একি সেই লক্ষ্মী? রাতারাতি কোন্ সোণার কাঠির ছোঁয়ায় সেই কালো এমন ধারা আলোর আলো হলো?" সে দিন হইতেই আমার জীবনের মোড় ফিরিল। কথাটা গোড়া হইতে বলি। আমার বাড়ী হালীসহর, চাকুরীস্থান বর্ম্মায় মুলমীনে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে লতার মত লক্ষ্মী সেই কৈশোরে কবে যে আমার জীবনে আসিয়া আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় হইয়া ঢুকিয়াছিল তা' মনে নাই। সমাজ-সংস্কারক ঠাকুর! ভ্রূকুটি করিও না বাপু; বলিয়া ফেলি, আমাদের হইয়াছিল বাল্যবিবাহ! বরাবর এক সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরের শিকের তোলা আমচুর কাসন্দি চুরি করিয়া খাইয়াছি, রাগ হইলে গুম্ গুম্ করিয়া মেয়েটাকে ধরিয়া কিলাইয়া দিয়াছি, তার খিমচুনির জ্বালায় কালো পিঠভরা চুলের মুঠি ধরিয়া মর্ম্মান্তিক টানিয়া তাহাকে কাঁদাইয়াছি, এই তো মনে আছে। সে স্ত্রী আমি স্বামী এ ভাব অন্তরে ঢুকিতে অনেক দেরি হইয়াছিল, তার অনেক আগে আমি বর্ম্মার পোষ্টমাষ্টারী পাইয়াছিলাম, লক্ষ্মীকে চাকুরী স্থলে আনিবার বহু পূর্ব্বে একেবারে বকিয়া গিয়াছিলাম।

মা যখন আমাদের গাঁয়ের গুড়গুড়ে ভটচাযকে সঙ্গে দিয়া লক্ষীকে বর্ম্মায় পাঠাইয়া দিলেন, তখন উনপঞ্চাশটি নেশা আমার উল্টো ট্যাঁকে গোঁজা, নাপোর বোন তারা আমার ঘরের উপদেবতা। নবলক্ষ্মী সন্ধ্যার নির্ব্বাক ছায়ার মত কখন যে আসিল, কখন যে আমার গাঁজার কল্কেটি হইতে সেই কটা উচ্চিপরা পেত্নিটির দুর্ব্বাক্যগঞ্জনা অবধি সমস্ত ভারটুকু মাথায় করিয়া কুড়াইয়া লইল, তাহা আমরা কেহ টের পাইলাম না। শুধু দুইটি ভাব স্পষ্ট হইয়া আমাদের এতকালের পাতা উচ্ছৃঙ্খল সংসার ভরিয়া রহিল; একটা অন্তঃসলিলা চোরা ফল্গুর মত স্বস্তির ভাব, সেটা আমার মনে। আর একটা নিজের ঘরে হঠাৎ কোথা দিয়া কেমন করিয়া পর হইয়া পড়ার ভাব, তাহা আমার বর্ম্মী স্ত্রীর মনে। আগে আমি তারার মন যোগাইয়া আড়ষ্ট হইয়া চলিতাম, জুয়ার আড্ডায় আড্ডায় রঙ্গীন লুঙ্গিপরা চুলে রেশমী রুমাল বাঁধা বর্ম্মা ইয়ারদের সহিত নিশি ভোর করিতাম, আর "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" চাকুরী করিতাম। আমার বর্ম্মী গৃহিণী মোটা থপথপে দজ্জাল স্বাধীন জেনানা, স্বাধীন—কারণ সে বেতের আসবাব তৈয়ারী করিয়া যা রোজগার করিত, তাহাতে আমারও পুষিত। আমার চাকুরীর সেই একশ' বিশ টাকা মাহিনা পাবার ঠিক পরদিনই জুয়ার আড্ডাগুলি দু'চার দান ছক্কা পঞ্জায় গ্রাস করিত, শেষটা গাঁজার জন্য কি খোসামোদটাই না করিয়া যে তারার কাছে নাজেহাল হইতে হইত, তাহা আমিই জানিতাম। নবলক্ষ্মী আসার পর হইতে দিব্য আরামে একশ' বিশ টাকা উড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া নেশা তো অযাচিতভাবে পাইতামই, উপরন্তু অনেক দিন পর সেই আম-কাঁঠাল কলার গাছে ঘেরা শান্ত সবুজ বাঙ্গলা দেশের চচ্চড়ি সড়সড়ি ভাজা মাছের ঝোল আর ভাতে মনের সুখে এ কামনাদগ্ধ—শ্রান্ত দেহটাও জুড়াইতাম।

নবলক্ষ্মী যে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে তারাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পাশে সরাইয়া দিয়া তাহার গেঁজেল লম্পট অপদার্থ স্বামীধনটির সহিত সমস্ত সংসারের ঝাঁট রান্না সেবাটুকু অবধি অধিকার করিয়া অটল ঘর-জোড়া গৃহিণী হইয়া বসিল, তাহা বর্ম্মী বেচারী বুঝিতে পারিল না। সে চেয়ার তৈয়ারি করিত আর দিবারাত্র চিল চেঁচাইয়া ঝগড়া করিত। কিন্তু নির্ব্বাক্ শান্ত কঠোর হইতেও কঠোর সেই সিন্দুরশোভনা বধূরূপটিকে এক চুলও নড়াইতে পারিত না। তবু তারা বাটুত না, কারণ সে বনের পশুর মত করিয়াই আমায় ভালবাসিয়াছিল।

তবু আমি নবলক্ষীর দিকে ফিরিয়া চাহি নাই। কে চায় ? খোলা মাঠের ঠাণ্ডা কোল আর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বাতাসটুকুর মত এমন করিয়া জন্মাবধি অক্লেশে কিছু পাইলে কে তার মর্ম্ম বোঝে ? লক্ষীর সেবা না হইলে আমার চলে না তাহা বোধ হয় বিকারে অচেতন রোগীর মত না বুঝিয়াও শুশ্রূষার প্রেমস্পর্শটি বুঝিতাম, কিন্তু তখন হাতীর দাঁতের চৌকো কালো কালো দাগওয়ালা জুয়ার দানার পড়তিই শয়নে স্বপনে জাগরণে চক্ষে দেখিতেছি, আর তাহার ব্যস্ত-ব্যাকুল টানাটানি বকাবকি হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতেছি। লক্ষী যে নরম দুধের মত শয্যায় আমায় শোয়াইয়া প্রত্যহ ভিন্ন শয্যায় একটা তুচ্ছ মাদুরে মাটিতে শোয়, আব সকালে সন্ধ্যায় শুচি স্নাতা হইয়া তুলসীতলায় অতক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করে, তখন আমাকেও ছোঁয় না, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার সময় আমার ছিল না। তাহাকে তো কখন আপন বলিয়া কণ্ঠহার করিয়া তুলিয়া লই নাই, সুতরাং বঞ্চিত হইবার দুঃখ আমায় বিঁধিবে কি করিয়া ? এখন মনে হয় লক্ষী কিন্তু সেই আসন্ন কালরাত্রি টের পাইয়াছিল, নহিলে এমন পতিগতপ্রাণা এত সাধ্বী এ রকম শক্ত মেয়ে নিজের হাতে গাঁজার কল্কে সাজিয়া আমায় দেয়, জুয়া খেলিতে অমূল্য চরিত্রধন পাঁকে ফেলিতে একবারটি বারণ করে না। শেষে বুঝিয়াছিলাম সে নীচের আদালত ছাড়িয়া দিয়া একেবারে হাইকোর্টে তাহার নালিশ পেশ করিয়াছিল। তাই তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াই এমন নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী আসিয়া আমি খপ করিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিয়া দাঁড়াইলাম। লক্ষী চৈতন্যভাগবতের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, সন্ধ্যার ঘোরে সেই জীবন্ত সন্ধ্যার বিগ্রহটি তেমনি আশার প্রতীক্ষায় ভয়ে স্তব্ধ। যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে সহজ গলায় আমি বলিলাম, "ওগো, চট্ ক'রে খানকতক কাপড় আর টাকাকড়ি একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নাও তো।" লক্ষী ক্ষণেক থম্‌কিয়া রহিল, তাহার পর আমার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। আমি নড়িতে পারিলাম না, ভয়ে উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট উৎকর্ণ হইয়া ঠিক তেমনিই বসিয়া রহিলাম।

তারা পাড়ায় বেত কিনিতে বাহির হইয়াছিল, কিছুই টের পাইল না। লক্ষী তুলসীতলায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুঁটুলিটি হাতে আমার সঙ্গে চিরজীবনের মত সেই দিন পথে বাহির হইল। যদি বুঝিতাম সে আর ঠিক সংসারী হইয়া ফিরিবে না, তাহা হইলে জেলে যাইতাম, কিন্তু পলাইতাম না।

সে শ্যাম রাজ্যের সীমানার ১২ মাইল এ দিকে, তখনও ইংরেজ-রাজত্বের এলাকায়। চারিদিকে বন বন আর বন, আরাকানের জটাকুটের বিরাট বেড়ে ছায়াশ্যাম কানন ভূমি। ঘন বনে বাঘ ভাল্লুকের রাজ্যে বাঙ্গালীর মেয়ে এমন অকুতোভয় হয়, সে জ্ঞান আমার এই প্রথম হইল। পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া অর্দ্ধাহারে নেশার অভাবে কঙ্কালসার আমার তখন বিষম জ্বর। লক্ষ্মীর কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছি, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অবধি ইচ্ছাটি নাই। এত দুঃখে এত পরিশ্রমে ও ক্ষুধায়ও নবলক্ষ্মীর যৌবনশ্রীভরা কমনীয় দেহলতা ঠিক তেমনি সরস পেলব সুপুষ্ট সুশীতল, সে শ্যামবর্ণ এখন আরও উজ্জ্বলশ্যাম, আরও বিপদে পড়িলে দ্বিগুণ অভাবের মধ্যে বোধ হয় গৌরাঙ্গী পটে আঁকা বীণাপাণিটি হইয়া উঠিবে। দুঃখ এমন সুখদ কেমন করিয়া হয়?

দুই একবার, বন খস্ খস্ করিল, তাহার পর লক্ষ্মীর বাহু দুইটি আকুল আগ্রহে আমায় জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম চারিদিকে লাল পাগড়ী পুলিশ, একজন ইউরোপীয় ইন্সপেক্টর টুপি খুলিয়া রাঙ্গা মুখের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিতেছে, "ইউ সন্ অব্ এ বিচ্। হোয়াট্ ডেভিলস্ ড্যান্স্ ইউ হ্যাভ্ লেড্ আস্, ইউ নো?" লক্ষ্মীর মাথায় কাপড় নাই, সেই আয়ত অশ্রু-সজল ভাবউদাস চক্ষু দুইটি সাহেবের মুখে রাখা। সকলে মিলিয়া বোধ হয় লাথি ঘুঁসায় অস্থির করিয়া আমায় উঠাইয়া দাঁড় করাইত, কেবল সাহেব হাত তুলিয়া তাহাদিগকে ঠেকাইয়া ডুলি আনিতে বলিল। আমায় থানায় লক্ষ্মী কোলে করিয়া লইয়া গেল, কি পুলিশে ধরিয়া লইল বুঝিতে পারিলাম না।

যে দিন জ্ঞান হইল, সে দিন দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ঘরে লোহার খাটে নরম বিছানায় শুইয়া আছি, সারি সারি তেমনি খাটে আরও আশে পাশে কত রোগী। শুনিলাম এটা মুলমীনের জেল হাঁসপাতাল, লক্ষ্মী রোজ আসিয়া দুই দণ্ড আমার পায়ের কাছে বসিয়া যায়। তখনই সে আসিল, পায়ের ধুলা লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার অঝোর অশ্রু ধারায় আমার পা ভিজিয়া গেল। আমি বড় কষ্টে বলিলাম, "ওগো! আফিং আছে?" লক্ষ্মী এদিক ওদিক চাহিয়া খোঁপার মধ্য হইতে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। সে দিন আর সে দাঁড়াইতে পারিল না, থর থর করিয়া সে লাবণ্যে মাখা প্রেমশীতল দেহখানি তার কাঁপিতেছিল।

৮

আমার নামে দুই হাজার টাকার সরকারী তহবিল তছরূপের মোকদ্দমা হইল। তিন মাস আদালত আর হাজত করিলাম ; সেই সময় সব হারাইয়া আমি লক্ষ্মীকে পাইলাম। আগে হইতেই পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আহা ! এমন সম্পদের অধিকারী আবার জীবনে আর কিছু চায় ? নবলক্ষ্মী আমার স্ত্রী, কিন্তু তখন সে নারীর অঙ্গে শুধু সেবার করুণাস্পর্শ ও নয়নে অনুপম সান্ত্বনার প্রেমস্নিগ্ধ চাহনী জাগিয়া রহিয়াছে। সে তাহার জগৎ ভুলান সম্মোহিনী শক্তিতে পুলিশ প্রহরী-দের "মাঈ" হইয়া বসিয়াছিল, নবলক্ষ্মীকে অদেয় তাহাদের কিছুই ছিল না ; তাই সে আদালতে ও জেলে আমার সেবা প্রাণ ভরিয়া আশা মিটাইয়া করিতে পাইত। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পাপে ও নেশায় শীর্ণ দেহে অকালবৃদ্ধ আমি নবলক্ষ্মীর প্রেমে পড়িলাম, মরণাপন্ন হইয়াও আফিং ছাড়িয়া দিলাম। সে আমাকে খাওয়াইত, বাতাস করিত, ধোয়াইয়া আঁচলে দু'খানা পা মুছিয়া দিত, আর আমি সব ভুলিয়া তাহাকে দেখিতাম। খোঁপার মধ্য হইতে কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া নবলক্ষ্মী নিত্য সাধিত, আমি মাথা নাড়িয়া বলিতাম, "না"। সে হাসিয়া তাহা সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছে লুকাইয়া রাখিয়া দিত। আমার ভাবান্তর দেখিয়া সে এত দিন পর প্রফুল্লমুখে হাসিয়াছিল, হাসিলে তাহার বয়স বোধ হইত বার কি তের !

নবলক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া আমি আত্ম অপরাধ স্বীকার করিলাম, আমার পক্ষের উকিল চটিয়া গেল, নবলক্ষ্মী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে আপন গহনা বেচিয়া আমার পক্ষে উকিল দিয়াছিল, এতদিন আমার আফিং ও আহার যোগাইয়াও এই নিত্য নিরাভরণার স্ত্রীধন অলঙ্কার কয়টি তখনও শেষ হয় নাই। অপরাধ স্বীকার করিলে সাজা হইবে, নবলক্ষ্মীকে পাইব না ; এমন করিয়া পাইয়াও হারাইব। কিন্তু সে কমনীয় তেজে শান্ত কত নয়নবিমোহন অথচ কত কঠোর মাধুরী ছবি দেখিয়া মিথ্যা মুখে আসিল না, আজন্ম পাপের ব্যবসায়ী আমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র শুচি হইবার সাধ হইল।

আমার তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বিচারপতি বলিলেন, অপরাধ স্বীকার না করিলে এ গুরুতর অপরাধে সাত বৎসর সাজা অধিক হইত না। সাত বা তিন বৎসর তো দূরের কথা, সে অবস্থায় সাত দিন আমার জীবনলক্ষ্মীকে চক্ষের আড় করিলে আমার যে গুরুদণ্ড হয়, তাহার উপযোগী গুরুতর পাপ বুঝি ইহ-সংসারে নাই। সে কাঁদিল, দরবিগলিতধারে আ-কবরীকম্পিতা দশায় তবু হাসিয়া

বিদায় লইল, আমায় সাহস দিবার জন্য তাহার এ হাসি! লক্ষ্মীর সীমন্তের ডগডগে সিন্দুর রেখা দেখিতে দেখিতে অন্ধ ঝটিকা বুকে রুধিয়া শুষ্ক রক্তচক্ষে আমি বিদায় লইলাম। জেলে গিয়া আছড়াইয়া লুটাইয়া পড়িলাম, ক্ষোভে ক্রোধে নিরাশায় পাগলের মত বিধাতাকে অজস্র অভিসম্পাত দিলাম। উঃ বাসনার কি দাহ! এমনি করিয়া চাহিয়া এই রকম বঞ্চিত হওয়াই বুঝি কুম্ভীপাক নরক!!

(৬)

জেলে আর সব কয়েদী খাটে, খায়, কঠিন প্রাণ আরও কঠিন করিয়া পাপাচরণ করে আর নরকে বসিয়া নির্লজ্জ হাসি হাসে। সে ব্যর্থতার অবনতি কি করুণ! মনের দুয়ার দিয়া সে কি মর্ম্মস্পর্শী আত্মঘাত!! সেখানে আমিই একা বিদ্রোহী। কাজ করি না, প্রায় খাই না, কেবল বেত, বেড়ি, হাতকড়ি একান্তবাস, এমনি সাজার পর সাজা ভোগ করি, আর মানুষ দেখিলে অভিসম্পাত করি। জেলের দারোগা সিপাহী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে লইয়া হারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, এত সাজা দিয়া আমার জেদ ভাঙ্গিতে না পারিয়া তাহারা আমাকে রেঙ্গুন জেলে বদলী করিল। সেখানে আসিয়াও আমার সেই ভাব, উপরন্তু আমি আবার আফিং ধরিলাম, যতদূর উঠিয়াছিলাম ততদূর পড়িলাম। আমায় বেত মারিলে আমি হাসিতাম, মাংস কাটিয়া রক্ত পড়িত, আর আমি তারস্বরে 'এক' 'দুই' 'তিন' করিয়া গুণিতাম; কত বেত মারা হইল জল্লাদের মারের সঙ্গে সঙ্গে বড় হাবিলদারের গুণিবার কথা, তাহার স্বর ডুবাইয়া দ্বিগুণ চিৎকার করিয়া আমিই গুণিতাম। হাতকড়িতে বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিলে অশ্লীল কদর্য্য ভাষায় গালি পাড়িতাম। এইরূপে একবৎসর কাটিল।

দ্বিতীয় বৎসরে আমি ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া মৌন নিলাম। মনের বিদ্রোহ নিস্তেজ হইয়া আসিল, হাওয়ার সহিত লড়াই কত দিন আর চলে? একদিন ডাকে নবলক্ষ্মীর পত্র পাইলাম। ছাপ রেঙ্গুন পোষ্ট আফিসের। তবে সে এখানেই আছে!! সে লিখিয়াছে, "আমি তোমার কাছে কাছেই আছি, তোমাকে এখানে এনেছে, আমিও এসেছি। তুমি ভাল হও, কাজ কর, তা হ'লে আমাদের দেখা হবে। তুমি সাজায় আছ, আমি তাই কোন উপায় করিতে পারিনে।" সেই দিন আমি আবার আফিং ছাড়িলাম, আবার নিত্য নিয়মিত খাইতে লাগিলাম। এক সপ্তাহ পর কাজ চাহিলাম, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার সুমতি দেখিয়া এত খুসী হইলেন, যে, পায়ের বেড়ি কাটিয়া একেবারে নিজের আপিসে রাইটারের কাজে

আমাকে লইলেন। তাহার দুই মাস পর আবেদন করিয়া অনুমতি পাইয়া নবলক্ষ্মী আমার সহিত দেখা করিতে আসিল।—আমার স্বর্গের রুদ্ধ দুয়ার আবার খুলিয়া গেল। সে দিন কথা বেশী বলিতে পারিলাম না, শুধু আমার দুই চক্ষের এক আনন্দোৎসব গেল। সে দেখা ফুরায় না, ফুরাইবার ভয়ে বড় অস্থির করে।

এক বৎসর বিদ্রোহ, এক বৎসর মৌন, এমনি করিয়া দুই বৎসর গিয়া আমার সুখের দিন আসিল। আমার সাজার এই শেষ বৎসর। জানি না কেমন করিয়া, বুঝি শুধু নবলক্ষ্মীকে অতৃপ্ত চক্ষে দেখিয়া দেখিয়া আমি সব চেয়ে বড় শিক্ষা শিখিলাম। বাসনায় বড় দুঃখ, শুধু একান্ত ভাবে মন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াই সুখ, সে সুখের সিন্ধুকে প্রতিদানের বিন্দু এক রতিও বাড়াইতে পারে না। আমি মৌন সুখে মহা ধ্যানে বাকি এক বৎসর কাটাইয়া দিলাম। শুনিলাম নবলক্ষ্মী গহনা বেচিয়া রেঙ্গুনে দোকান দিয়াছে, একজন চীনা মেয়ে সে দোকানে বেচাকেনা করে; দু'জনে নাকি সই। নবলক্ষ্মী তুলসী মূলে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করে, শুদ্ধাচারে তপস্বিনীর মত থাকে, আর দুই বেলা জেলে আমার সংবাদ লয়। আমি যে দিন রেহাই হইলাম, সে দিন নবলক্ষ্মীর সহিত দেখা না করিয়া রেঙ্গুন ত্যাগ করিলাম। যাইবার সময় পত্র লিখিয়া গেলাম, "আমি এ অশুদ্ধ দেহ লইয়া তোমার ঘরে উঠিব না—ও ঘর আমার তীর্থ। আমি তীর্থের বাসের পুণ্য সঞ্চয় করিতে চলিলাম। লক্ষ্মী, আমি এবার তোমায় পাইয়াছি, আর হারাইবার ভয় নাই। শুধু আশীর্ব্বাদ করিও তোমার সাধ পূর্ণ করিয়া তোমারি মনের মানুষ হইতে পারি।"

তার পর যখন দু'জনে দেখা, সে দশ বৎসর পরে। জগন্নাথে সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য যেখানে নীলের পায়ে আপনাকে ঢালি দিয়াছিলেন সেইখানে। আমি মনের সব বোঝা নামাইয়া তখন বড় আধারে মুক্তির আনন্দে আছি, জগৎ আমার কাছে নবলক্ষ্মীর ছবি। হৃদয়ে অপরিমেয় প্রেম, মধুর মমতা, আপ্তকাম শান্তি, ও অপরাজেয় সুখ। এ সাধনা আমায় কে শিখাইল, কিছু না দিয়া এত দানে আমার বুক কে ভরিয়া দিল? বলিব? নবলক্ষ্মী। কবে জান? তবে বলি শোন। তখন আমরা পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেছি—শ্যামবাজারের পথে। অত দুঃখ আমি কখন পাই নাই, পাপের ব্যবসায়ী সুখের পতঙ্গ আমার দুঃখ সহিবার সামর্থ্য আদৌ ছিল না। দুঃখের কশাঘাতে আমার ক্ষণিক চৈতন্য হইয়াছিল। একটা গ্রামে আমরা দুই মাস ছিলাম, আমার ফুঙ্গীর (সন্ন্যাসী) বেশ দেখিয়া সকলে বড় ভক্তি করিত। একদিন হৃদয়বৃত্তির জ্বালা সহিতে না পারিয়া এক কুস্থানে গিয়াছিলাম। শেষ রাত্রে বাহির হইয়া দেখি দুয়ারে নবলক্ষ্মী, পাছে আমার

কলহ হয় ভয়ে সে দুয়ার আগুলিয়া সারা রাত্র বসিয়া আছে। হঠাৎ মনে হইল গলিত শব কোলে বেহুলার কথা। আমি এত বড় পামর, তারপরও নবলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিয়াছিলাম। একদিন সে তুলসী প্রণাম করিতেছিল, আমার ডাক শুনিতে পায় নাই। আমি তাহাকে ও তাহার ইষ্টদেবতাকে লাথি মারিয়া সে দিন রাগের জ্বালা মিটাই। নবলক্ষ্মী আমার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমার দেবতা তোমার ডাক শুনি নি, লাথি মেরে জ্ঞান দিয়েছ বেশ করেছ।" তুলসী গাছকে লাথি মারিয়াছিলাম সে জন্য সে বড় কান্না কাঁদিয়াছিল, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সেই দিন জীবনে সেই প্রথম আমি তুলসী মূলে ঠাকুর প্রণাম করি। জেলে বসিয়া বসিয়া এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া আমি যাহা শিখিবার শিখি; নবলক্ষ্মী নামে আমার স্ত্রী, কখন আমার সত্যকার স্ত্রী হয় নাই। কিন্তু সে আমার কে বল দেখি? এমন সুন্দর চূড়ান্ত অনুপম ভাবার অধিক কিছু আর কাহারও আছে কি? এখন আমরা দুজনেই সংসারী। কিন্তু এ সংসার বুঝাইবার নয়, আমরা এ উহাকে এক অনির্বচনীয় অখণ্ডের মধ্যে পাইয়াছি। এ আমাদের ত্যাগ ভোগ মোক্ষ ও বন্ধনের সঙ্গম তীর্থ।

শিল্পকলার কথা।

প্রত্যেকটি কলাবিদ্যা আপনাতে আপনি পূর্ণ, কোনটি কোনটির অপেক্ষা রাখে না (sui generis), মানুষের অন্তরাত্মা হইতে সবগুলিই যুগপৎ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। যে প্রেরণার সার্থকতার জন্য এক দিন মানুষের কণ্ঠে সুর দেখা দিল, সেই প্রেরণার সার্থকতার জন্য সেই দিনই তাহার হাতে উঠিল তুলিকা, বাটালি আর লেখনী। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য আর কাব্য—মানুষের একই সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টি, প্রত্যেকটিই আপন আপন ধরণে সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, সকলেই সকলের সমান, 'কেহ নহে ঊন'। সুতরাং মোলিয়েরে যে নৃত্যের ও সঙ্গীতের দুই ওস্তাদের মধ্যে একটা কলহের চিত্র দিয়াছেন (Le Bourgeois Gentilhomme) সেই রকম শিল্পীতে শিল্পীতে দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাই। তবে দ্বন্দ্ব যে সময়ে সময়ে দেখি তাহার কারণ শিল্পীদের আপন আপন শিল্পটির উপর আত্যন্তিক অনুরাগ, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধের একদেশদর্শিতা।

ঐতিহাসিক হিসাবে বোধ হয় আগে পরে নাই, ভিতরের সারবস্তুর মূল্য হিসাবেও বড় ছোট নাই; তবুও তত্ত্বের দিক দিয়া, অন্তরাত্মার অভিব্যক্তির দিক দিয়া কলাবিদ্যাগুলিকে স্তরে স্তরে আমরা সাজাইতে পারি, গুণ কর্ম্ম হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটা তারতম্য, অথবা তারতম্য যদি না বলিতে চাই তবে, একটা ক্রম নির্দ্দেশ করিতে পারি। মূলতঃ যেমন চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে আগে পরে বা শ্রেয় হেয় নাই অথচ সেখানেও একটা স্তর বিভাগ যেমন করা যায় বা আছে; অথবা যেমন দেহের পক্ষে মাথার ও পায়ের সমান প্রয়োজন, এমন কি সেই প্রয়োজনীয়তা হিসাবে উভয়ের মর্য্যাদাও সমান অথচ মাথার স্থান মাথায় আর পায়ের স্থান পায়ে—সেই রকম শিল্পবিদ্যা সকল সমান্তরাল রেখায় চলে, এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও আমরা ন্যায্য ভাবেই দেখাইতে পারি যে সেখানে আছে উপরের বলিয়া রেখা, আর নিম্নের বা তলের রেখা।

ভিতরের, অন্তরের উপলব্ধিতে পাওয়া একটি সত্যসুন্দরকে বাহিরে রূপ দিয়া সৃষ্টি করার নামই কলা, শিল্প বা আর্ট। আর্টে আর্টে পার্থক্য এই বাহিরের রূপের উপকরণ বা মালমসলার পার্থক্যে। গায়ক সত্যসুন্দরকে রূপান্বিত করিতে চাহিতেছেন ধ্বনির, স্বরের সহায়ে, চিত্রকর চাহিতেছেন রং এর রেখার সহায়ে; ভাস্কর চাহিয়াছেন কঠিন নিরেট বস্তু—পাথর, আর কবি চাহিয়াছেন মানুষের মুখের বাক্য বা কথা। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই ভিতরের সত্যসুন্দর। যে উপকরণের ভিতর দিয়াই হউক না কেন, যিনি যখনি সেই সত্যসুন্দরকে একটু জাগ্রত, জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই ততবড় স্রষ্টা বা শিল্পী, এই হিসাবে সকল শিল্পের সমান মর্য্যাদা। বীথোবেন, রাফাএল, মাইকেল এঞ্জেলো আর সেক্‌সপীয়ার সমানভাবে আমাদের আদরণীয় বরণীয় নমস্য।

কিন্তু উপকরণের পার্থক্য যদি শুধু উপকরণেরই পার্থক্যে আবদ্ধ থাকিত, সে পার্থক্য যদি আর কোন পার্থক্যকে সঙ্গে ডাকিয়া না আনিত, তবে ঐখানেই সকল কথার শেষ হইত। কার্য্যতঃ দেখি উপকরণের ভিন্নতা আনিয়া দিয়াছে তদীয়ও ভিন্নতা, আধারের ধরণ ধারণ তুলিয়া দিয়াছে আধেয়ের, সেই এক সত্যসুন্দরেরই মধ্যে এক একটা বিশেষ ভাব বা প্রকরণ। অথবা অন্য দিক হইতে যদি আমরা দেখি, তবে বলিতে পারি, ভিতরের উপলব্ধির একটা বিশেষ ভাব, অন্তরাত্মায় আবির্ভূত সত্যসুন্দরের একটা বিশেষ ধরণ শিল্পীকে বিশেষ বিশেষ ধারায় চালাইয়া লইয়াছে, তুলিয়া দিয়াছে এক এক শিল্পীর হাতে এক এক যন্ত্র। এখন আমরা বলিতে চাই এই অন্তরের ভাবে একটা ক্রম আছে, সেই ক্রমানু-

সারেই শিল্প সমূহে একটা স্তর বিভাগ করা যাইতে পারে, মূলতঃ যদিও সে ভাব হইতেছে এক অখণ্ড সাম্য-স্বরূপ।

সত্যসুন্দরের যে ভাবময় সত্তাটুকু, যে অরূপ রহস্য লাঞ্ছনা, যে অনন্ত দ্যোতনা সকল সীমা কাটিয়া মুছিয়া দিয়া কেবলই আপনাকে দূর হইতে দূরে ছড়াইয়া চলিয়াছে, গান তাহাই ফুটাইতে চাহিতেছে। সেই ভাবকে, অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিতকে অসীম অরূপকে নির্দ্দিষ্ট অর্থের বিশেষ রূপের মধ্যে প্রথম ধরিতে চাহিল চিত্র; ভাস্কর তাহাকে আরও স্ফুট আরও স্পষ্ট, আমাদের এ জগতের স্থূলের কেবল আলো ছায়া রেখা রংএর বাহারে নয়, কিন্তু মাংসপেশীর মধ্য দিয়া যেন আমাদেরই মত শরীরী ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। কবি তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি রূপের বিগ্রহের মুখ দিয়া আবার কথা ফুটাইতে চাহিতেছেন। গান যেন অন্ধ সেই অন্বেষী ঋষিবর; চিত্রে তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে, দেহও দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে দেহ এখনও সূক্ষ্ম দেহ, ভাস্কর্য্যে তিনি যেন তাঁহার স্থূল ভৌতিক দেহটি পাইয়াছেন। গান অন্ধ, চিত্র ও ভাস্কর্য্য অন্ধ না হইলেও মূক—মূক ঋষি কথা পাইয়াছে, পূর্ণ-ভাবে প্রকট হইয়াছেন কাব্যে। গান হইতেছে যেন যোগ-সমাধি, সে সমাধির উপলব্ধি ব্যুত্থানের পথে যেন চিত্রে ভাস্কর্য্যে স্ফুটতর হইয়া ক্রমে কাব্যে পূর্ণ জাগ্রত হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি আর্ট হইতেছে সত্যসুন্দরের সৃষ্টি কিন্তু সৃষ্টির জন্ত সৃষ্টির মূলে চাই একটা আবেগ, একটা নিবিড় চঞ্চলতা। সকল সত্তাই হইতেছে গতির সমষ্টি বা সংহতি। সত্যসুন্দরের অঙ্গে অঙ্গে যে লাবণ্যের ঢেউ উঠিয়াছে, সত্যসুন্দরের যে প্রাণতরঙ্গ তাহা যখন শিল্পীর প্রাণের উপর দিয়া আঘাত করে, তখনই শিল্পীর মধ্যে জাগিয়া উঠে তাঁহার সৃজন আবেগ। প্রাণের স্পন্দনই সৃষ্টির মূল—সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই মূল আবেগ বা স্পন্দন, এই গতিলাস্য হইতে উঠিয়াছে শব্দ, ধ্বনি মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছনার যে সূক্ষ্ম স্বরূপ—অন্তরাত্মার যে প্রথম স্পন্দন, প্রাণের নিভৃত সত্তায় যে কলগতি—তাহারই নাম নাদব্রহ্ম, উহার স্থূলরূপ বা পরিণতিই হইতেছে শব্দ ধ্বনি। স্থূল শব্দ বা ধ্বনির সহায়ে সঙ্গীত সেই নাদব্রহ্মকে প্রকট করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে —যে নাদব্রহ্ম আত্মার সাড়ার মৌলিক অভিব্যক্তি, আদিম উল্লাস। তাই গানই হইতেছে আদি আর্ট—সকল আর্টের প্রতিষ্ঠা। সত্যসুন্দরের সত্তায় যে মূর্চ্ছনা, গানে তাহারই নাম সুর। সুরই আর্টের গোড়ার কথা। কিন্তু সত্তার গতি মূর্চ্ছনাই সব নয়, মানুষ সত্যসুন্দরের সাগরের ঢেউএর শুধু কলরোল

শুনিয়াই থামিয়া যাইতে চায় না। গতির আছে একটা ভঙ্গী একটা ধারা, তাহাকে রেখায় তুলিয়া দেখান যায়; তরঙ্গের গায়ে গায়ে আছে একটা আবেগের রংএর খেলা, তাহাকে ফলাইয়া ধরা যায়। গতির একটা দিক—তাহার মূর্চ্ছনাটি আমরা কান পাতিয়া শুনিতে পারি; কিন্তু গতির আর একটা দিক, তাহার রূপটি চক্ষু দিয়াও যে দেখিতে চাহি। প্রথমে নাম শুনা—পূর্ব্বরাগ

'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"

তারপর রূপ দেখা—অনুরাগ—

"মেঘ মালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু"—

গানের পর তাই তখন ছবির জন্ম। গান দিতেছে সত্যসুন্দরের ভাবটুকু (ইংরাজীতে ইহাকে আমরা বলিতে পারি Intuition, আর ইহারই অন্য নাম 'শ্রুতি' নয় কি?)—এই ভাব হইতেছে যাহা অবাঙমনসগোচর, যাহা সূক্ষ্ম সাধারণ। কিন্তু ভাবের আছে একটা বিশেষ প্রকরণ একটা রূপকরণ (Ideation বা Imaging—ইহাই না 'স্মৃতি'?)—চিত্র চাহিতেছে এই জিনিষটি দেখাইতে, সূক্ষ্মকে সাধারণকে একটা স্থূলতর বিশেষ আধারের মধ্যে ধরিয়া দিতে। গান যেন সাধারণ সূত্র, আর চিত্র যেন তাহারই বিশেষ উদাহরণ। প্রথমে শ্রুতির বেদের তত্ত্ব, তারপর স্মৃতির পুরাণের রূপক।

কিন্তু শ্রবণের পরে, দর্শনের পরে চাই যে স্পর্শন;

অনুরাগের পরে এখন মিলন, এখন যে

"প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"—

তাই ত ভাস্কর্য্যের স্থাপত্যের উদ্ভব। গতির সুর আছে, গতির ধারা আছে, গতির আবার আছে একটা বস্তুসত্তা। কারণ, গতি এক হিসাবে কতকগুলি দ্রব্যের ভৌতিক পদার্থের—স্থূল অণুপরমাণুর—অর্থাৎ যাহা স্পর্শেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাদের একটা সাজানর সমাবেশের ধরণ, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ। স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য সত্যসুন্দরের গতি লাঞ্ছনাকে এই ভৌতিক পদার্থগত সম্বন্ধের, আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়ে প্রকটিত করিতেছে,—ধরিয়া দিতেছে। সত্যসুন্দরের আছে অসীম অরূপ ভাব, তারপর আছে সসীম ব্যঞ্জনা-পূর্ণ রূপ। এই রূপের আবার প্রথম বিকাশ চোখের দেখায়—রেখায়, রেখায় ও রঙে, চিত্রবিদ্যা উঠিয়াছে এই স্তর হইতে। রূপ আরও স্পষ্ট, আরও স্থির নিবিড় হইয়া উঠে স্পর্শে, মাংসপেশীর চালনায়—যখন হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া একটা বস্তুর বিগ্রহেরই পরিচয় আমাদের হয়; এই স্পর্শ পেশচালনা, হাতে নাড়া চাড়া, এই বস্তু

পরিচয় জন্ম দিয়াছে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যাকে। সকল শিল্পের মূলে আছে যে গতিবেগ তাহাকে ধরিয়া জমাট করিয়া স্থায়ী স্থাণু—বস্তু করিয়া রাখিতে চাহিতেছে সেই শিল্প।

কিন্তু স্পর্শেও মানুষের শেষ তৃপ্তি নয়, মানুষ চায়
আবার মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে—

"সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে—"

এই 'বাখান' ব্যতীত ভিতরের উপলব্ধিটি বাহিরে সম্পূর্ণরূপে, একেবারে শেষ করিয়া যেন ঢালা হয় না, বাক্য ছাড়া অন্তরের অনুভব যেন সবখানি ব্যক্ত, পরিস্ফুট হয় না। তাই কাব্যের উদ্ভব। মিলনের পর সম্ভোগ – কিন্তু সম্ভোগের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়াছে এই কথা বলা। কবির প্রাণ তাই 'কথা কও', 'কথা কও' বলিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই

'কি আর কহিব আমি'

বলিয়াও, কবি তাঁহার বলা শেষ করিতে পারিতেছেন না, ফিরিয়া আবার বলিতেছেন।

সত্যসুন্দরের যে গতিছন্দ দিব্যকর্ণে তাহা শুনিয়া শিল্পী গানের সৃষ্টি করেন, সত্যসুন্দরে যে ভঙ্গিমা তাহা দিব্য চক্ষু দিয়া দেখেন আর ছবি আঁকিয়া তুলেন, সত্যসুন্দরের সত্যকে গতির আধারকে—অন্তরাত্মার স্পর্শ দিয়া আলিঙ্গন করেন আর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলেন। আর সত্যসুন্দরের সাথে অন্তরাত্মার বাণী দিয়া আলাপন করেন, আর কাব্য সৃষ্টি করিতে থাকেন।

এই আলাপন কথা বলা মানুষের যতখানি সোজাসুজি অতি আপনারই জিনিষ ততখানি আর কিছুই নয়। ভাষার মধ্যে মানুষের মানুষত্ব যেমন স্পষ্ট ধরা দিয়াছে, আর কোন জিনিষে তেমন ধরা দেয় নাই। মানুষ মানুষ—কারণ, তাহার ধর্ম্ম মনন চিন্তন, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনা। আর এই সব কথা বা ভাষার মধ্যেই আসিয়া জমা হইয়াছে, বাক্যরূপেই ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তির আবরণই ভাষা, কে বলিয়াছিল? আমরা মনে করি, ভাষাই ত ভাবের ভাস্বর বিগ্রহ! শ্রবণ দর্শন স্পর্শন জিনিষের ভিতরকার পরিচয় দেয় যেন গৌণভাবে; অথবা জিনিষটি ঠিক ঠিক দিলেও, জিনিষের যে বার্ত্তা, যে 'প্রাণের কথা' তাহা পূরাপূরি দিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যান্য শিল্প হইতে কাব্যের পার্থক্য এই যে, কাব্যের মধ্যে যতখানি চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তির খেলা (intellectual) আছে

অন্যত্র তাহা নাই, তাই কাব্যে মানুষ যেমন আপনাকে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করিতে পারে আর কোথাও তেমনটি পারে না। গান দিতেছে উক্ত অশরীরী তুরীয় ভাব, চিত্র ও ভাস্কর্য্য দিতেছে এই ভাবের সাথে সাথে একটা বাহ্যরূপ। কিন্তু ভাব ও রূপের মাঝখানে একটা জিনিষ আছে সেটি গান, চিত্র বা ভাস্কর্য্য দেয় নাই—এটি দেওয়া তাহাদের ধর্ম্ম নয়। এই মাঝখানের জিনিষটি কি? আত্মা ও আত্মা অধিষ্ঠিত দেহ এই দুই'এর মাঝে আছে কি? আছে অন্তঃকরণ। ভাবের ও রূপের মাঝে আছে অর্থ, চিন্তা—'বাখান'। আত্মা, ভাব হইতেছে যেন সূর্য্য; দেহ, রূপ হইতেছে যেন পৃথিবী, কিন্তু অন্তঃকরণ, মন, চিন্তা, অর্থ হইতেছে অন্তরীক্ষ। কবি পৃথিবী ও সূর্য্যকে মিলাইয়া ধরিয়াছেন; তাঁহার মধ্যে অন্তঃকরণটি সুপরিস্ফুট, ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া মনের চিন্তার সহায়ে তিনি ভাবকে রূপান্বিত, আত্মাকে শরীরী করিয়া তুলিয়াছেন। কবির উপকরণ, বাক্য এই অন্তঃকরণের মনের চিন্তার বাহন। অন্যান্য শিল্পে অর্থগৌরব যদি থাকে তবে আছে মৌন ভাবে কাব্যেই তাহাকে সাক্ষাৎভাবে পাই।

ইদানীন্তন কালের ঝোক অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা কাব্যেরই উপর যে বেশী দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের কথাটিই প্রমাণিত হয়। কারণ আধুনিক যুগ অন্তঃকরণের ধর্ম্মে যেমন অনুপ্রাণিত চিন্তাসমূহে যেমন আঢ্যে, সে রকম আর কোন যুগে ছিল না।

প্রাচীনতর যুগে কাব্য সৃষ্টি যথেষ্টই হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সব শিল্প বিদ্যাই মানুষের ভিতর হইতে যুগবৎ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তবুও তখন কাব্য অপেক্ষা অন্যান্য শিল্পেরই ছিল প্রাধান্য ও প্রসার। এক সময়ে ছিল গান। আমাদের বেদ কাব্যহিসাবে ততখানি লক্ষিত হইত না যতখানি হইত মন্ত্রের গানের হিসাবে। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" কারণ সামবেদ হইতেছে সামগান। তাই গীতার নাম গীতা। এই গানেরই জের বঙ্গ সাহিত্যে আমরা টানিয়া আনিয়াছি পদাবলীগাথা পর্য্যন্ত। প্রাচীন গ্রীসে গানের রাজা অরফিউসের প্রতিভা গ্রীসের সকল শিল্পসৃষ্টির গোড়ায়। গান যে আদি মৌলিক শিল্প তাহাও এই সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারি। আর এক এক সময়ে ছিল চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রাধান্য ও প্রসার—যেমন ভারতে বৌদ্ধ-যুগ ও মোগল যুগ, ইউরোপে মধ্যযুগ ও রেণাসেন্সের যুগ। আধুনিককালে কিন্তু চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সে রকম প্রভাব ত নাই, বরং এই দুইটি বিদ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ইহার কারণ, আমরা নির্দ্দেশ করি, বুদ্ধিবৃত্তির উপর আধুনিক

প্রাণের আত্যন্তিক ঝোঁক। কিন্তু কি চিত্রে কি সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে এই বুদ্ধি বৃত্তির খেলার তেমন সুযোগ নাই, আধুনিক শিল্পীর মন এই সব কলায় তেমন তৃপ্তি পায় না। সঙ্গীতবিদ্যাও কাব্যের তুলনায় যেন পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। ফলতঃ কাব্য আধুনিক জগৎকে যেন ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধিতে প্রাণ আধুনিক যুগসাহিত্যের সহিত যে যে মিল ও যে সহজসম্বন্ধ একটা পাইয়াছে আর কোন শিল্পের সাথে তাহা পায় নাই। এই সাহিত্যের মূল্য কি, সে কথা আমরা উত্থাপন করিতেছি না, আমরা শুধু দেখাইতে চাহিতেছি সাহিত্যের প্রভাব কতখানি হইয়াছে।

শুধু তাহাই নয়, কাব্য যেন আর আব শিল্পকে নিজের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক শিল্পের আপন আপন অভিব্যঞ্জনাটী ধরণধারণটী কাব্য আপনার মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারে, সে সামর্থ্য কাব্যের আছে। গান গাহিবার বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখনই আমরা পাইয়াছি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, শেলী, রবীন্দ্রনাথ, ভেরলেন মেটেরলিঙ্ক—সমস্ত গীতিকাব্য ইহার ফল। কাব্যের মধ্যে কেবল কথার সহায়ে ছবি আঁকিয়া যাইতে পারা যায় কি রকমে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ফরাসী কবি থেওফিল গোতিয়ে (Theopile Gautier); কালিদাসকেও আমরা এই সঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যের গঠনে দেখিতে পাই গানের ও চিত্রেরই প্রভাব। আর ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ভঙ্গিমা লইয়া সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্যটা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভর্জিল বা মিলতনের, আমাদের মধুসূদনের কাব্য, কর্ণেইর নাটক যেন এক একটী মর্ম্মরে প্রস্তুত অট্টালিকা। প্রতি সর্গ, প্রতি অঙ্ক, প্রতি ছত্র যেন এক একটী প্রস্তর মূর্ত্তি, এক একখানি শিলাস্তম্ভ—এমন নিবিড় সংহত নিথর স্থাণু একটা ভঙ্গী তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যের সাধারণ রচনাভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি দেশরীতির দিক দিয়া বিচার করি, তবে দেখিতে পাই এক একটি দেশের কাব্য-সৃষ্টিতে এই রকম এক একটি বিশেষ শিল্পের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে মোটের উপর দেখিতে পাই, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রভাব—সংস্কৃতে কিছু রচনা করিতে গেলে আপনা হইতেই সে কেমন পাথরের মূর্ত্তি হইয়া উঠিতে চায়। লাতিন সাহিত্য এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপ। ইতালীয় সাহিত্যে গুণিগণের লীলায়িত মূর্চ্ছনা; গ্রীক সাহিত্যও অনেকখানি এই ধরণের—গ্রীকের শিল্প-দেবীর নাম (Muse Mousa) হইতেই আসিয়াছে সঙ্গীতের নাম (music)। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যও এই গানেরই ধর্ম্মে

অনুপ্রাণিত। আর ছবির ধরণে কাব্য আঁকিয়া তোলার দৃষ্টান্ত আমি দেখাইতে চাই—ফরাসীর ভাষায়। সূক্ষ্ম সুষীম তরলিত রেখায় ভাবের প্রতি অঙ্গ ফলাইয়া ধরা, ব্যঞ্জনার আলো ছায়ার রঙে রঙে বক্তব্যকে বিচিত্রিত করিয়া ধরা—একটা রূপকে চোখের সম্মুখে জলন্ত চলন্ত সবাগ করিয়া ধরা ফরাসী সাহিত্যের জন্মগত অবয়সিদ্ধ কৃতিত্ব।

কাব্যকে তাই আমরা সকল শিল্পের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। ব্রাহ্মণের মত কাব্যের প্রাণ হইতেছে জ্ঞান, ব্রাহ্মণেরই মত কাব্যের উদ্ভব সহস্রশীর্ষ পুরুষের মুখ হইতে—জ্ঞানের প্রেরণায় বাক্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্য সত্যসুন্দরকে উপলব্ধি করিতেছে,—প্রকটিত করিতেছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অন্তরাত্মার একটা সংহত শক্তিবোধের সৃষ্টি, শিল্পবিদ্যার মধ্যে উহারা তাই ক্ষত্রিয়, সহস্রশীর্ষ পুরুষের বাহুবলেই ভর করিয়া উহারা যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। চিত্রবিদ্যাকে বলা যাইতে পারে শিল্পের বৈশ্য—বৈশ্যের ধর্ম্ম যে নৈপুণ্য, কৌশল, চমৎকার করিয়া সাজান, তাহাই যেন চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর সঙ্গীত হইতেছে শূদ্র—সঙ্গীত সকল শিল্পের গোড়ায়, পদমূলে, প্রতিষ্ঠায়, উহার ধর্ম্ম আর সকল শিল্পবিদ্যার সেবা করা, সকল শিল্প বিদ্যাকে ললিত কলার একটা মূল ভঙ্গিমা বা সুর দিয়া সে চলিয়াছে।

সঙ্গীত হইতেছে শূদ্র; সঙ্গীতের স্থান সকলের নীচে, কিন্তু অধম বলিয়া নয়, সে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া। পাছে আমাদের কথা কেহ ভুল বুঝেন, তাই আমরা সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিতে চাই। যখনই কোন শিল্পকলায় একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখনই দেখিতে পাই, মূলে রহিয়াছে সেই শিল্পকলায় সুরের পরিবর্ত্তন, একটা নূতন সুরের সৃষ্টি—সেই শিল্পকলার প্রতিষ্ঠায় আছে যে সঙ্গীতের ভাগ তাহার একটা অভিনব রূপ ও ভঙ্গী। গানে যাহাকে সুর বলি, চিত্রে ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে তাহাই সামঞ্জস্য সমজাত সম্মেলন, কাব্যে তাহাই ছন্দ। বাল্মীকি অনুষ্টুপ ছন্দ রচিয়া সংস্কৃতে আদিকবি আখ্যা পাইয়াছেন। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুর দিয়া বাঙ্গলার কাব্য প্রাণের একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে রূপান্তর আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার বস্তু দানের উপর ততখানি নির্ভর করে নাই, যতখানি করিয়াছে তিনি যে ভঙ্গী যে ছন্দ যে সুর দিয়াছেন তাহারই উপর। রোদিন বা মেষ্ট্রোভিকের মূর্ত্তিরচনা, মিলেট ও হুইস্‌লার অথবা আমাদের অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন ভাস্কর্য্যে চিত্রে সামঞ্জস্য সমজাত সম্মেলনের একটা

নূতন ধরণ নূতন ভঙ্গী দিতেছে অর্থাৎ সুরটি বদলাইয়া দিতেছে, তাই তাহারা একটা যুগ পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে।

আর দেশে দেশে যে শিল্পকলার পরিকল্পনায় পার্থক্য, তাহা মূলত প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছে এই মৌলিক সুরপরিকল্পনার পার্থক্যকে ধরিয়া। এক এক দেশের প্রাণে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে এক এক রকম সুর; তাই রূপকরণের কথনের ধারা দেশে দেশে বিভিন্ন। গ্রীক বা হিব্রু যে আমাদের কাছে কেবলই গ্রীক ও হিব্রু, তাহার কারণ ইহাও বটে যে গ্রীক বা হিব্রু ভাষার অক্ষর আমাদের ভাষার অক্ষরের মত নয়, উহাদের শব্দ কোষ ভিন্ন, ব্যাকরণ ভিন্ন, কিন্তু আসল কারণ গ্রীকের হিব্রুর ছন্দ বা সুর ভিন্ন রকমের। অক্ষর পরিচয় সহজ, শব্দকোষ বা ব্যাকরণ আয়ত্ত করাও খুব কঠিন নয়, কিন্তু যতক্ষণ কোন ভাষার ছন্দ, গতিভঙ্গী, সুর হৃদয়ঙ্গম না করিতেছি ততক্ষণ সে ভাষার উপর আমার পূর্ণ অধিকার হয় নাই। পরন্তু, শব্দকোষ, ব্যাকরণ, এমন কি অক্ষরপরিচয়ও যদি তেমন পাকা না হয়, কিন্তু ছন্দবোধ থাকে পূর্ণমাত্রায়, তবে সে ভাষার স্বরূপটি বা অন্তরাত্মাটিরই সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ যে প্রাচ্যের চিত্র, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অপারগ, আর্চার (Archer) সাহেবের মত শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিও যে ভারতের শিল্পকলাকে অবলীলাক্রমে "barbarous, barbarian, barbarism" আখ্যায় ভূষিত করিতে পারেন, তাহার কারণ এই যে, বিদেশী বিদেশীর সৃষ্টির উপকরণ গঠন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিলেও সেই উপকরণের গঠনের ছন্দকে সুরকে সহসা ধরিতে পারেন না। বিদেশীয় কথার অর্থ বুঝিতে পারি, তাহার পরিচয় সব জানিতে পারি, তাহার মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহার প্রাণের সুর যদি আমার প্রাণে না বাজে তবে বিদেশীকে আমি চিনি নাই।

তাই দেখি সুরকে গানকে যখন ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে, তখন শিল্প হইয়া পড়িয়াছে কৃত্রিম জড় পদার্থ। এত সুরকে গানকে হারাইয়া যদি বস্তু লইয়াই সে থাকে, তবে আর্ট তার প্রাণও হারাইয়া শব দেহটিকে লইয়া থাকে। কাব্য তখন হয় বাক্যসংগ্রহ, চিত্র হয় রংএর ও রেখার সমষ্টি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য হয় পাথরের পুঞ্জ। কাঠামকে যদি সঞ্জীবিত করিতে হয় তবে প্রয়োজন তাহাতে সঙ্গীতের উদ্বোধন, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের প্রাণ বহাইয়া দেওয়া। ফলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদের জড়ত্বের পর আজ শিল্পজগতে যে নূতন সৃষ্টি দেখিতেছি

তাহার সর্ব্বত্র গানেরই প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য, চিত্র এমন কি ভাস্কর্য্য পর্য্যন্ত যেন গানকেই মূর্ত্তিমান করিতে চাহিতেছে। Mystic school, Impressionist school—আমাদের বাংলার ভাবাত্মক (আধ্যাত্মিক) অঙ্কনরীতি গানেরই প্রভাবে ভরপুর। জীবন্ত শিল্পরচনায় ইহাই শেষ কথা, শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি না হইতে পারে—কিন্তু নূতন জীবনের, আর্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ইহা যে আরম্ভ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

রাধিকা,—যমুনাতটে।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম, এ।)

সখি পরাণ সঁপিনু হরি পায়,
যবে যমুনা সিনানে পেখনু মূরতি,—
সো শ্যাম সুঠাম কায়।

সই রূপেতে বিভোর, ধাওল পরাণ, রাখিতে নারিনু ফিরে।
মুরলীর রবে বিসরি আপনা,- ভাসিনু পীরিতি-নীরে॥
তেঁই হায় পাগলিনী আপনা বিকায় তেঁহারি কমল পায়।
তেঁহারি লাগিয়ে সকলি ডারিনু— পরাণ, যৌবন কায়॥
সই সব সমর্পিনু, আপনা ভুলিয়া, শ্যামক পীরিতি আশে।
সাজানু বাসর,— প্রাণ মাতোয়ারা, মজনু প্রেমের রসে॥
ওই যমুনা সলিল,— তেমতি নেহারি তরল পীরিতি ওর।
নীলাকাশ সম সুবিশাল হিয়া,— অনুরাগ ভরে ভোর॥
হায় প্রেমক নিকুঞ্জে অটুট সোহাগে শ্যামরায়ে পূজি নিতি,—
বিসরি ধরায়, স্বরগ লভিনু, শ্যাম-অভিসারে মাতি॥

পুন নিমিখে কে যেন, দিঠির আড়ালে, বরজ হানিল শিরে।
পলাল চকিতে নিদয় বঁধুয়া,— তেয়াগি নয়ন-নীরে।
হায় পরাণ পিঁজরে আছিল গোপনে পবাণ বিহগ মোর,
আজু সুখেরি বাসরে কে সে রে কাটল তেহারি বাধন ডোর?
তুঁহু কহলো যমুনে কুলু কুলু রবে,— কথি মোর বনমালি?
কহলো বিটপি, হেরেছ কি তারে,— যাহে প্রাণ দিছি ডালি॥
সখি হায়-একাকিনী যমুনা-পুলিনে দিবস-নিশীথ জাগি,
ভাসি আঁখি-নীরে দীরঘ বরষ নিদয় কালিয়া লাগি।—
আর তুঁহু কালাচাঁদ, হিয়ার নাগর, কথি কোন্ উপবনে
রহলি ভুলিয়া, কুহক মায়ায় কোন্ নাগরীর সনে?
সখি কে জানিত আগে সুধাতরু শাখে হেন হলাহল ফলে?
—তেঁই কতনা যতনে বাড়ায়ু সিঞ্চয়া প্রেমের নয়ন জলে!
হায় এত যে সোহাগ,- সব পাশরিলি? ইহ সে পুরুপ রীতি।
মুই যমুনা সলিলে, তু লাগি ডুবিব, শ্যাম তু নিদয় অতি॥

সখি প্রাণ স পি দেছি তাবি পায়
যবে যমুনা সিনানে পেখয়ু মূরতি,
সো শ্যাম সুঠাম কায়।
আজু দলিয় চরণে চলি যায়।—
তেঁই যমুনা সলিলে মরিয়া লভিব
হামারি নাগর রায়॥

অরবিন্দের পত্র।

—⊱—

স্নেহের—

তোমার তিনখানি চিঠি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে উঠে নি। এই যে লিখ্‌তে বসেছি, সেটাও একটা miracle; কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon, বিশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যা' এই পাঁচ সাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ করে যদি postএ দিতে পারি, তা হ'লেই miracleটা সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে, তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জান্‌বে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা,—যা'কে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চল্‌তে হবে। * * * যা' নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম,—যা' দিয়েছিলেন * * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক, ওদিক ঘুরে দেখা, পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটা ওটা ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটার পিছনে যাওয়া।

তারপর——তে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন। তার' সম্পূর্ণ theory যোগ শরীরের দশ অঙ্গ, এই দশ বৎসর ধরে তাহারই development করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয় নি। আর দুই বৎসর লাগতে পারে। আর যত দিন শেষ না হয়, বোধ হয় বাঙ্গলায় ফির্‌তে পার্‌বো না।——ই আমার যোগসিদ্ধির নির্দ্দিষ্ট স্থল অবশ্য এক অঙ্গ ছাড়া; সেটা হচ্ছে কর্ম্ম। আমার কর্ম্মের কেন্দ্র বঙ্গদেশ, যদিও আশা করি তার পরিধি হবে সমস্ত ভারত ও সমস্ত পৃথিবী।

যোগ পন্থাটা কি, তা' পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই

মাত্র বলতে পারি যে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণকর্ম্ম ও পূর্ণভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত, মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত কর্‌তে পারে, অনন্ত, অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধ'রতে হ'লে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নাই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক এক জন করতে পারেন বটে, কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত আছেনই। ভগবান্ মানুষে যা চা'ন, সেটা হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্ত্তিমান্ করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—to realise God in life।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য কর্‌তে পারে নি, জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবন-শক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্", ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েক জন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু, সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হ'য়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হ'য়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক levelএ যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তা'র পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞান ভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব; জগতের সমস্যা solved হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন, এত দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখ্‌তে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়, গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম"। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মনবুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হ'ল আত্মার পাঁচটা ভূমি। যতই উচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolutionএর চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই সন্নিকট হ'য়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হ'য়ে যায়। অখণ্ড, অনন্ত, আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকসিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই আমার যোগ-পন্থার central clue, তার মূল কথা।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরেই আমি এই মাত্র বিজ্ঞানের তিনটী স্তরের নিম্নতম স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান্ আমার through দিয়ে অপরকেও অল্প আয়াসে বিজ্ঞান সিদ্ধি দিবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নহি। যাহা হবার, ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহমের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নাই। যদি কর্ম্ম সিদ্ধি নাও হয় আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুন্‌ব না; ভগবান যখন চালাবেন, তখন চল্‌ব।

বাঙ্গালা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতনরূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এও দরকার ছিল। বাঙ্গলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেই গুলির সংস্কার exhaust করে আসল সারটী লয়ে জমী উর্ব্বর করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা—অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যাহা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা—লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ আছে যে ভগবানের সঙ্গে জগতের একটী সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটী অর্থ হয়। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটী অনিবার্য্য। মনের ধর্ম্ম এই খণ্ডকে লয়ে পূর্ণ বলা, আর সকল খণ্ডকে বহিস্কৃত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন—(পূর্ণকে) মূর্ত্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) শিষ্যেরা তাহা পায় না, মূর্ত্ত নহে বলে। পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; তা'তে বিচলিত হই না। অধ্যাত্ম ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত দলই হো'ক—পরে দেখা যাবে। এটী নবযুগের শৈশব, এমন কি embryonic অবস্থা। আভাষ মাত্র, আরম্ভ নয়।

* * *

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি সংঘ চাই। তুমি হয়ত বলবে, সংঘের কি দরকার? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে থাকব, সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যে যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু সত্যের একটী দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে

নয়, জীবনকেও চালাতে হবে ; আবার মুক্তি ভিন্ন জীবনের effective গতি নাই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয় ; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলে রূপ গ্রহণ। আমরা জগতের কোনও কার্য্য বাদ দিতে চাই না, রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে ; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন ? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি, না করলে দেশ উঠত না ; আমাদের Experience লাভও পূর্ণ development হতো না। এখনও তা'র দরকার আছে বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার ; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তা'রই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise করতে চায়, * * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism. সে রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নাই, যার যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়। এই সকল অশুদ্ধরূপে Spiritual শক্তি ঢাললে— কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিসটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে। সর্ব্বক্ষেত্রে তাই। Spiritual influence দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended হবে শিব মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটা প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই প্রাণ, সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত মন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য, আমাদের আদর্শের Spirit ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা' না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসে নি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম ছড়ান রূপ ; যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে ; পরে Spiritual Communeএর মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ,

যুগানুরূপ আকৃতি দিবে। শক্ত বাঁধারূপ নয়, অচলায়তন নয়; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা' ছড়িয়ে যেতে পাবে, নানাভঙ্গী লয়ে এটীকে ঘিরে, ওটীকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে; করতে করতে Spiritual Community দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea, এখনও পুরো developed হয় নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা' সকলে করতে পারে। বড় আধার, ক্ষুদ্র আধার আছে মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তার পর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তাবও কিছু ঠিক নাই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না, ঠেলে উঠে। * * * আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

* * *

* আমি যা অনেক দিন থেকে দেখছি তার দু একটী কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, চিন্তা করবার অক্ষমতা বা চিন্তা "ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটী ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটী জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেই খানে; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা' মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তার পর ভারত দেখ। কয়েকজন Solitary growth ছাড়া, সর্ব্বত্রই • • • সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man ; যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা, য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনে সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে তবে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার Fatal limtation আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics, yogic hallucination ; ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitationও surmount করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে ; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই ; সহজের উপাসক ; সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন ; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটা ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের Capacity আছে, intuition আছে ; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না ; সহজে সারতে চায় ; চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞান শূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি, জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে— খেতে পাচ্ছেনা, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত,

ব্যবসা বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তির সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে ও আর কোথাও তত নাই। আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁক ডাক, মাতামাতি ছিল না, কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তা'রা, তা' বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলচ চাই ভাব উন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ও সব করেছিলাম স্বদেশীর সময়ে, যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয় নি। হয়েছে; যত movement হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা' অধিকাংশ possibilityর বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise করবার এটা ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement, ভাব, মন মাতানকে base করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল, বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভাগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা' দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটুলি St. Peterএর চাদরের মত; অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজগিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয় নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হই নি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে? *

ইতি—

তোমার 'সেজদা'।

পত্র ও চিত্র।

[শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।]

ইউরোপের ভবিষ্যৎ।

দেশে বসিয়া আমরা ভাবি, আমাদের কি হইবে? চারিদিকে যে ভীষণ পশুশক্তির আস্ফালন দেখি, তাহার মাঝখানে একটা নিরীহ, ধর্ম্মভীরু, নির্ধন জাতির ভবিষ্যতের আশা কৈ? কিন্তু বিলাতের ও সমগ্র ইউরোপের অবস্থা যখন স্বচক্ষে দেখিবার ও ভাবিবার অবসর হয়, তখন কেবল আমাদের নয়, এদেরও ভাগ্যে কি যে আছে, তাহা ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না। আমরা একদিকে, একভাবে, বিপন্ন হইয়া আছি। কিন্তু এরাই বা কি? এরাও ত আর এক দিকে, আর একভাবে অর্থনাশের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

* এই পত্র খানি সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই, সেটা এক জনকে বলিবার ধারা, সকলকে বলিবার ঠিক ধারা সেটি নয়। অধিকন্তু ইহাতে বাঙ্গালার দৈন্য ও অপূর্ণতার কথাই আছে, যতখানি আলোর কথা না বলিলে শুধু কালো করবার দোষ কথটির পরিচয় ছাড়া কিছুই বলা হয় না। কারণ সে সোনার বাঙ্গালার ভবিষ্যতের কথাও ত অনেক খানি। অধিকন্তু শুধু অসঙ্গতি অপূর্ণতার কথায় নিরাশা জাগায়। তাই এত পত্র খানি এই ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণকে——দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি বলিয়াই এ ভাবেও প্রকাশ করা হইল, সেই জন্য অরবিন্দ সংকল্প করিয়াছেন শীঘ্র আর একটি প্রবন্ধে বাঙ্গলার আলোর দিক——অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রেরণার দিকটিও তিনি বলিবেন।

সহঃ সম্পাদক।

এই যে এত বড় একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়া গেল, লক্ষ লক্ষ প্রাণী, কোটি কোটি মুদ্রা নষ্ট করিয়া, ইউরোপ আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রাম করিয়া, পুরাতন রাষ্ট্র সম্বন্ধ একেবারে উলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর আগেকার রাষ্ট্রশক্তি সকল আজ হৃত বল ও লুপ্তগৌরব হইয়া, নিরাশার নিবীড় অন্ধকারের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মানুষের সকল যখন যায়, তখনও তার দুরাশা বা লোভ যায় না। রাজত্ব নাই, রাজপাট নাই, রাজ-দরবার নাই—রাজশক্তি নাই; অথচ কি জর্ম্মান কৈসর অথবা অষ্ট্রিয়ার সম্রাট, কাহারই ত রাজ্য লোভ নষ্ট হয় নাই। তাঁদের দলও যে দেশে নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহাও নয়। এরাও আবার কি করিয়া লুপ্ত রাজপাট দখল করিবে, তাহাই কল্পনা করিতেছে, আর এদের বন্ধু ও অমাত্য বর্গও কি উপায়ে আবার রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের অধিকার ফিরিয়া পাইবে, সে পক্ষে গোপনে গোপনে কতই না আয়োজন, কতই না ষড়যন্ত্র করিতেছে। দশ বার বৎসর পর্ত্তুগ্যালে রাজতন্ত্র শাসন ভাঙ্গিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পর্ত্তুগ্যালের রাজা, রাজপরিবার এই দশ বার বৎসর কাল এখানে, কুটুম্বের দ্বারে আশ্রয় পাইয়া আছেন। কিন্তু তাঁদের আশা ত যায় নাই। রাজ্য নাই, পদ নাই, ধন নাই, গৌরব নাই, তথাপি "ন ত্যজ ত্যাশাতাগুম্"—অন্ততঃ রাজা উপাধিটা ছাড়িতে পারিতেছেন না। রাজতন্ত্রবিরোধী ইংরাজেরা এই জন্য কত বিদ্রূপ করে, কিন্তু সেদিকে ইহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। যদি বা, কোনও উপায়ে আবার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পান, সেই আশায় তীর্থের কাকের মতন ইংরাজ রাজের দরবারে পড়িয়া আছেন। এই যুদ্ধের ফলে যাদের সিংহাসন বিধ্বস্ত হইয়াছে তাদেরও ঐ একই দশা। হলাণ্ডে কৈসর, অন্যত্র অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব সাহান-সা, সকলেই ঐ দুরাশার সূত্র ধরিয়া পড়িয়া আছেন। কেবল পড়িয়া আছেন নয়, পড়িয়া পড়িয়াও লাঙ্গুল-সঞ্চালন করিতেছেন, কোথায় কি ষড়যন্ত্র হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সম্ভব হইলে তাহাতে গোপনে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়িতে পাই যে জর্ম্মানীতে আবার সৈন্য সামন্ত সংগৃহীত হইতেছে। পরাভূত জার্ম্মাণ জাতি আবার একটা লড়াই বাধাইবার চেষ্টায় আছে। গোটা জর্ম্মানীটা ত এখনও বিদেশীয় শক্তির দখলে আসে নাই। রাইন নদীর উপত্যকাতেই কেবল মিত্রশক্তি সকলের সৈন্যদল যাইয়া বসিয়াছে। আর যেখানে জর্ম্মনীর বুকে শত্রুসৈন্য শিবির-সন্নিবেশ করে নাই, সেখানেই জর্ম্মানীর

সমবায়োজন চলিতেছে। সত্য মিথ্যা বলা কঠিন, তবে এসকল গুজব মাঝে মাঝে খুবই রাষ্ট্র হইতেছে। আর সত্যই হউক কি মিথ্যাই হউক একটা কথা ত মানিতেই হইবে। জর্ম্মাণেরা যে সহজে নিজেদের উদ্ধারের আশা বা সংকল্প বা প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া—"খোদা যা করেন" বলিয়া বসিয়া থাকিবে, এরূপ কল্পনাও ত করা যায় না। তারা সে জাতই নয়। সুতরাং যুদ্ধ থামিয়াছে বলিয়াই যে সকল আপদ বালাই চুকিয়াছে, এরূপ ভাবিবার কোনই হেতু নাই। সন্ধির সর্ত্ত সকল সহি হইয়াছে বটে, কিন্তু সন্ধি আর শান্তি এক বস্তু নয়। ইংরাজের ভাষায় "পীস" বলিতে আমরা যাকে "শান্তি" বলি, তাহা বুঝায় না। শান্তিতে কেবল প্রকাশ্য সংগ্রামই থামিয়া যায় না, কিন্তু সংগ্রামের আশু আশঙ্কার পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এই শান্তি ইউরোপে এখনও দূরে, বহু দূরে।

আর ইহাই যে ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় অনিবার্য্য। আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়া গিয়াছেন, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। এই ত্যাগের পথই একমাত্র শান্তির পথ। কিন্তু ইউরোপের সে ত্যাগের শক্তি কৈ? জর্ম্মানী ও তাহার মিত্র সংঘের ধ্বংস সাধন করিয়া, মিত্রদলও ত কেবলই নিজের লাভ খুঁজিতেছেন। এই জন্য শান্তির বৈঠক শেষ হইতে না হইতেই মিত্রদলের মধ্যে চারিদিকে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। এই কাড়াকাড়ি হইতে যে এখনও আবার একটা মারামারি বাধে নাই, তার মূল হেতু পীড়াও থাকিলেও কারওই আর মারামারি করিবার শক্তি নাই। সকলেই নিজের ঘর সামলাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তথাপি সাম্রাজ্য ফিউমে, আসিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ-সিরিয়ার, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সানটুঙে, এখনই কাড়াকাড়ি লাগিয়াছে। সানটুঙ্গ ছিল চীনের, হয় জার্ম্মানের, গত যুদ্ধে জাপান জর্ম্মানকে সানটুঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নিজে সেখানে যাইয়া বসেন। এখন তিনি সানটুঙ্গ ছাড়িতে চান না। চীনও ছাড়িতে রাজি নয়। মার্কিণের সঙ্গে জাপানের মিত্রতা কখন্ ভাঙ্গে বলা যায় না। মার্কিণের চক্ষে জাপান বিভীষিকার কারণ হইয়া আছে। জাপানের অভ্যুদয়ে, জাপানের সমর শক্তির বৃদ্ধিতে, জাপানের রাষ্ট্র বিস্তারে মার্কিণের আপত্তি। সুতরাং মার্কিণ এই ব্যাপারে চীনের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। সানটুঙ্গ লইয়া এখনি একটা যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিবে, এ আশঙ্কা নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের যুদ্ধের বীজ এখানে রহিয়া যাইবে। সিরিয়া লইয়া রেষারেষি ইংরাজে ফরাসীতে। আপাততঃ একটা গোঁজামিল দেওয়া হইয়াছে বটে—

আসিয়া মাইনরে কতটুকু ইংরাজের শক্তিচ্ছায়াতলে, আর কতটুকই বা ফরাসীদের অধিকারের আওতায় থাকিবে, আপোষে ইহার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে বটে। কিন্তু এ বালির বাধ কদিন টিকিবে, কে বলিতে পারে? ফিউমের গোল ত মিটেই নাই, বরং আরো পাকাইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে মিত্রশক্তিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ভাগ বাটোয়ারা লইয়া মন কষাকষি আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইবারই কথা। ত্যাগের পথ ত এরা জানে না। আর লোভ যেখানে নেতা নীতি সেখানে শক্তির সহায় হইতেই পারে না।

এইত ইউরোপের আন্তর্জাতিক অবস্থা। যুদ্ধ থামিয়াছে। সকলেই যুদ্ধের চিরবিরাম সাধনের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, বার বার একথা শুনিয়াছি, যুদ্ধের মাঝখানে ইহারা সরল ভাবেই এই সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিল, এরূপ বিশ্বাসও করা যাইতে পারে। বিপদে পড়িলে, মানুষ সর্ব্বদাই অশেষ প্রকারের সাধু-সংকল্প করিয়া থাকে। কিন্তু আজ দুনিয়ায় কেহই এ কল্পনাকে আমল দিতেছে না। যুদ্ধ শেষ হয় নাই, সংগ্রামের আশঙ্কা নষ্ট হওয়া দূরে থাক্ বরং আরও বাড়িয়াই গিয়াছে, সকলেই একথা বুঝিতেছে। লাট কর্জন সে দিন পারস্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া, এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন। এই যুদ্ধটা কোন্ দিকে কোন্ সূত্রে, কাদের ভিতরে প্রথমে বাধিবে, বলা সম্ভবপর নয়। তবে সকলেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এ ত গেল বাহিরের কথা। প্রত্যেক দেশের ভিতরের অবস্থা আরও মন্দ। এই ইংলণ্ডে যে ভীষণ অশান্তি চারিদিকে প্রধূমিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া এদের ভবিষ্যৎও যে খুব আশাপ্রদ, এমন মনে হয় না।

বাহিরে যেমন জাতিতে জাতিতে অসূয়া ও বিদ্বেষ প্রধূমিত হইতেছে, প্রত্যেক জাতির ভিতরে সেইরূপ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে ততোধিক অসূয়া ও বিদ্বেষ জাগিয়া আছে। ধনে ও জনে বহুদিন হইতেই একটা রেষারেষি চলিয়া আসিতেছে। যারা জনখাটিয়া খায় তারা নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। আর না হইবারই কথা। ধনী তাদের শরীর মন পেষণ করিয়া ক্রোরপতি হইবেন, আর তারা দারিদ্রের দায়ে চিরদিন ধ্বংস করিবে, এও ত সঙ্গত নয়,—সম্ভবও নয়। অথচ ধনীর ত্যাগের শক্তি নাই। এই যুদ্ধের সময় ইহারা অশেষ ধন উপার্জ্জন করিয়াছে। এ দেশের লোককে শোষণ করিয়া, নিজেদের তহবিল স্ফীত করিয়াছে, লোকে খেতে পায় নাই—কারণ ইহারা লাভের লোভে খাদ্যের দাম চড়াইয়াছিল। শীতে লোকে বস্ত্র পায় নাই—ঐ একই কারণে। ঘর

বাড়ী মেরামত হয় নাই—লোকাভাবে ও অর্থাভাবে, এ সকল এত দিন, নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছিল। জার্ম্মানীর ভয়ে, স্বদেশের প্রতি মমতায়, নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পে এই পাঁচ বৎসরকাল ইংরাজ জনসাধারণে এ সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়াছে বটে, তবু খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমে নাই—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব যায় নাই, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। যারা যুদ্ধে সিপাই ছিল, তারা দলে দলে ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু থাকিবার স্থান নাই,—খাইবার আয়োজন নাই। অন্য দিকে ধনীর ধনের, ভোগের, বিলাসেরও কোন ব্যাঘাত হইতেছে না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এই কয় মাসের মধ্যে বার বার ধর্ম্মঘট হইয়াছে। এই সপ্তাহে অর্দ্ধলক্ষ শ্রমজীবী ধর্ম্মঘট করিয়া লোহা ও ইস্পাতের কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আজ ৩'দিন রেল কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিবার ভয় দেখাইতেছে। কয়লাখনির শ্রমজীবী-রাও তাহা হইলে কাজ বন্ধ করিবে। খনির কাজ বন্ধ হইলে, আলো বন্ধ, রান্না বন্ধ, যাতায়াত বন্ধ—চারিদিকের সকল কাজকর্ম্ম বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে। ইংরাজ এই ভীষণ সমস্যার মুখে দাঁড়াইয়াছে। ইহার নিদান নির্ণয় সহজ নহে। আর এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মনে হয়, আমাদের অন্য কারণে, ভিন্ন অবস্থাধীন যে দশা, ইংরাজেরও প্রায় সেই দশাই হইতেছে। ভবিষ্যৎ তাহারও আশাপ্রদ নয়। এখন উভয়েরই ভরসা এক—ভগবান্।

বিলাতের অবস্থা।

দেশে বসিয়া আমরা কেবল আমাদের অবস্থার কথাই ভাবি, আর ভাবিয়া ভাবিয়া ভবিষ্যতের কোনও কূলকিনারা দিশা পাই না বলিয়া নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু একবার বাহিরে দুনিয়ার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে, এই ভ্রম দূর হইতে বড় বেশি কালবিলম্ব হয় না।

এই ইংরাজদের কথাই দেখুন। এরা ত যুদ্ধ জয় করিয়া জগতে একরূপ অদম্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এক দিন রুশ ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সে রুশ আজ ছত্রভঙ্গ, শতধা বিচ্ছিন্ন, আত্মদ্রোহে উৎসন্নের পথে দাঁড়াইয়াছে। তারপর ইংরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে, জার্ম্মান। সে জার্ম্মান্ প্রভুশক্তি আজ বিনষ্ট, জার্ম্মানির রাষ্ট্রবল আজ নিঃশেষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইউরোপ মহাদেশে আজ ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। এশিয়ায় আছে চীন ও জাপান। কিন্তু জাপান ইংরাজের মিত্র, চীন এখনও সংহত ও

সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। বহিল কেবল আমেরিকা। আমেরিকা বহু দিন হইতে জাপানের অভ্যুদয় দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া আছে। সুতরাং আমেরিকা ইংরাজের সঙ্গে কোনও রূপ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে সাহসী হইবে না'। এই যুদ্ধে ইংরাজকে বর্ত্তমান জগতে একরূপ অসপত্ন প্রভুত্ব দিয়া গিয়াছে। দূর হইতে আমরা ইহাই দেখিতেছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া, ইংলণ্ডের ভিতরকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ইংরাজের ভবিষ্যৎ যে একেবারে নিষ্কণ্টক এমন কল্পনার অবসর আর থাকে না। বাহিরে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু ভিতরে বিপ্লবের আগুন ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে। ধনে ও জনে যে সংগ্রামের আয়োজন চলিয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, জগতের ভাগ্য-বিধাতা ভগবানই কেবল জানেন।

আর্থিক অবস্থা।

প্রথম ইংরাজের আর্থিক অবস্থা, আমাদেব দেশে যেমন, এই দেশেও সেইরূপ সাধারণ লোকের জীবিকা-উপার্জ্জন ও জীবনযাত্রানির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আর যে কারণে আমাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, প্রায় সেই একই কারণেই বিলাতে অন্নকষ্ট উপস্থিত। আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের অগ্নিমূল্য হইয়াছে, এখানেও তাহাই; আমাদের দেশে সোণারূপা অদৃশ্য হইয়াছে, এখানেও সেই অবস্থা। আমরা এখন কেবল কাগজের টাকা দিয়াই কেনা-বেচা কবিতেছি। এ দেশেও সেইরূপ। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম বিলাতে আসি, পকেটে সর্ব্বদা সোণা ঝকমক্ করিত। ব্যাঙ্কে চেক্ লইয়া গেলে, চক্‌চকে গিনি ও পাউণ্ড মিলিত। আধ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সোণার মুদ্রা চলন ছিল। এই দুই মাস এখানে আছি, বিস্তর টাকা প্রতি সপ্তাহে খরচ হইতেছে, কিন্তু একটি স্বর্ণ মুদ্রার রূপ এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দেশে সোণা আছে কি না, তাহাই সন্দেহ হয়। সহজ অবস্থাতেও সভ্যসমাজে কাগজের নোট চলে বটে, কিন্তু প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট যত নোট ছাপাইয়া বাজারে ছড়াইয়া দেন, তার পশ্চাতে রাজকোষে সর্ব্বদাই এত সোণা রূপা থাকে যে যখন ইচ্ছা তখনই লোকে ভেরজুরিতে যাইয়া, নোট দিয়া সোণার বা রূপার মোহর বা টাকা বাহির করিয়া আনিতে পারে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজের আইন অনুসারে, এক পাউণ্ডের নীচেই কেবল রূপা চলতি ছিল। পাউণ্ডের উপরে সকলকেই চাহিলেই সোণার সভারেন্ দিতে হইত। এখন আর সে আইন কাগজে কলমে আছে কি না, ঠিক জানি না, কিন্তু কাজে নাই। কেবলই কাগজ চলিতেছে। এই সকল নোটের পেছনে

কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা মজুত নাই। ইহার অর্থ এই যে, এত বড় দেশের সব লেনা দেনা এখন ধারে চলিতেছে। নোটটা ত "অস্য কর্জ্জপত্র মিদং" মাত্র। নোটগুলি সরকারের হাতচিঠা বা হ্যাণ্ডনোট বই আর কিছুই নয়।

পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বাজারে যত নোট চালাইতেন, তার বার-চৌদ্দ আনার পরিমাণ সোণার সভারেণ নিজেদের তেরজুরিতে মজুত রাখিতেন। এখন এ দেশে যত নোট চল্‌তি হইয়াছে, তার দুই আনা পরিমাণ সোণাও সরকারের তেরজুরিতে মজুত নাই। কোনও জমিদার বা বেপারি যদি নিজের জমিদারীর বা বেসাতির মোট মূল্য যত, তার চাইতে বেশি টাকার হাতচিঠা বা দস্তাবেজ দিয়া টাকা ধার করেন, তাঁহার দেউলিয়া হইবার বেশি দেরি থাকে না। এখানকার গভর্ণমেণ্টেরও প্রায় সেই দশা। বেশকম এই যে জমিদার বা বণিক লোকের উপরে ট্যাক্স বসাইয়া টাকা তুলিতে পারেন না, গভর্ণমেণ্ট তাহা পারেন। এই জন্যই গভর্ণমেণ্ট সহজে দেউলিয়া হয় না।

কিন্তু ট্যাক্সেরও একটা সীমা আছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রায় সেই সীমার প্রান্তেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই যুদ্ধে তাঁহারা আট হাজার মিলিয়ান্ পাউণ্ড ঋণ করিয়াছেন। এই ঋণের সুদ হিসাবে তাঁহাদিগকে প্রতিবৎসর চারিশত মিলিয়ান্ পাউণ্ড দিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশের সাকুল্য রাজস্ব দুই শত মিলিয়ান পাউণ্ডের কিছু কম ছিল। যুদ্ধের সময় রাজস্ব কিছুটা বাড়িয়া যায়। ইন্‌কম্ ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি হয়। ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের পূর্ব্বে নিজ নিজ ব্যবসায়ে যতটা লাভ করিতেন, তার চাইতে যে পরিমাণে বেশি লাভ যুদ্ধের সময় করিয়াছেন, তাহার উপরে শতকরা আশি টাকা হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্য হয়। এই অতিরিক্ত লাভের ট্যাক্স হিসাবেও বিস্তর রাজস্ব আদায় হয়। এইরূপ যুদ্ধের সময় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। অতিরিক্ত লাভের ট্যাক্স এখনও আছে, কিন্তু তার হার কমিয়া, শতকরা আশি টাকার পরিবর্ত্তে শতকরা চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা হইয়াছে। একে যুদ্ধের সময় যতটা লাভ হইয়াছিল, এখন ততটা লাভের সম্ভাবনা আদৌ নাই। তার উপরে ট্যাক্সের হারও কমিয়াছে। সুতরাং অতিরিক্ত লাভের ট্যাক্সের হিসাবে এই কয় বৎসর যতটা রাজস্ব আদায় হইতেছিল, এখন ততটা হইবার কোনও আশা নাই। এখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব, ১৯১৩-১৪ সাল অপেক্ষা বেশী হইলেও, খর্চ্চা যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে আয় বাড়িবার কোনওই সম্ভাবনা নাই। আয় অপেক্ষা ব্যয় যখন বাড়িয়া যায়, তখনই লোক

দেউলিয়া হইবার পথে যাইয়া দাঁড়ায়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টেরও এই অবস্থা আজ উপস্থিত।

আপাততঃ তাঁরা নোট সৃষ্টি করিয়া আসন্ন প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। কিন্তু ইহার ফলে দেশে টাকার দাম একেবারে কমিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বে এক পাউণ্ডে যে বস্তু মিলিত, এখন দুই পাউণ্ডেও তাহা মিলে না। এই দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন লোকের সংসারকষ্ট অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বহু লোকের আলয় আশ্রয় মিলিতেছে না। তার উপরে যাহারা এই পাঁচ বৎসর ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল, তারা ফিরিয়া আসিতেছে। এই সূত্রে জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে কিন্তু আলয় আশ্রয়ের বা অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা সেই হারে বাড়িতেছে না। চারিদিকে এইজন্য হাহাকার উঠিতেছে। ইতিহাসে এই ভাবেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সূচনা হয়। সেই মহাপ্রলয়ের লক্ষণ চারিদিকে এখানেও উকি মারিতেছে। প্রশ্ন এই :—এই ভীষণ সমস্যার মীমাংসা কোথায়?

এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কেবলই কাণের কাছে অনাহত বাঁশী বাজিতেছে—

এ বিপ্লব জলতরঙ্গ রোধিবে কে, রোধিবে কে?
হবে মুরারে। হবে মুরারে।

কর্ম্মনাশা তোমার স্নেহ।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

তুমি, এমনি করেই মিশেছ মোর
দিবানিশির কাজে,
ক্ষণেক তুমি আড়াল হ'লে
কি লাজ লোকের মাঝে।
আজি, কাজেতে হাত দিতে প্রাতে
তোমার নীরব কণ্ঠ ফেরে সাথে
"তিলেক তুমি দাঁড়াও সখি
মুখ বাজিয়ে লাজে,"—
মধুর তোমার কণ্ঠ খানি
আমার বুকে বাজে।

থমকে দাঁড়াই — পাসরিয়াই
সকল কাজের কথা,
শুনে কাণে আবাহনের
সেই যে ব্যাকুলতা।
শিথিল ক্রোধে আনে দেহ
কর্ম্মনাশা তোমার স্নেহ
না জানি তায় জড়ান হায়
কেমন মাদকতা,
লোকের মাঝে কি লাজ সে দেয়।
ভুলিয়ে কাজের কথা।
নিশীথিনীর নীরবতায়
মগন বিশ্ব যবে,
আমার হৃদয় ভবন ভরা
তোমার কণ্ঠরবে।
তন্দ্রা অলস স্বপন সুখে
কি গান শুনি তোমার মুখে,
দূরেতে রও কিংবা কাছে?
সে দিন কবে হবে
যে দিন, দূরত্ব যে ভবে না আর
স্মৃতির মাঝাৎসারে।

দ্বীপান্তরের কথা।

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অকূলে যাত্রা।

সে দিনটা বোধ হয় ১৯০৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর। বার বৎসরের কারা-জীবনের ওলটপালটে আর বেশি কিছু হয় নাই, কেবল স্মৃতি শক্তিটা প্রায় মৃতকল্প দশায় পড়িয়া চিঁ চিঁ করিতেছে। অতীত ঘটনাগুলা সব হইয়া গিয়াছে যেন এক ছিলিম গাঁজার নেশার অলৌকিক ধুম্রমার্গী দর্শন; কোন্ ঘটনাটা যে কবে কাহার পর ঘটিয়াছিল, তাহা বলে কাহার সাধ্য, আমার তো নয়ই। সুতরাং দ্বীপান্তরের কথা লিখিতে গিয়া মজা হইবে মন্দ নয়, আগাগোড়া সব উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে দিয়া না বসিয়া থাকি। তবে পারের কাণ্ডারী আছে উপেন, সে যবনিকার অন্তরাল হইতে বেশ জোর গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া "পার্ব্বতীসুত লম্বোদর" বলিয়া যাইবে, আর আমি, আশা আছে "পাক দিয়া গড়া লম্বাকর" বলিব না, ঠিক উপেনেরই যথাসাধ্য অনুবৃত্তি করিয়া যাইব। সুতরাং হে সুধীজন! এ দ্বীপান্তরের কথা আমাদের দুই জনের দুই মুখের এক কথা, ইহাতে সত্য বলিয়াছি প্রিয় বলিয়াছি, শাস্ত্র বচন লঙ্ঘন করিয়া অপ্রিয় বা অসত্য বলি নাই।

আলিপুর জেলে আমরা থাকিতাম 'চোয়াল্লিশ' ডিগ্রিতে। এখন সে আলিপুর জেল প্রেসিডেন্সি জেলে পরিণত হইয়াছে; সেদিন দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া তাহার সে নবকলেবরধারী সমৃদ্ধ রূপ দেখিয়া আমাদের সে পুরাতন শরশয্যাটিকে আর চিনিতে পারি নাই। থাকিতাম চোয়াল্লিশ ডিগ্রিতে, এই খানে ভাষ্যের দরকার চোয়াল্লিশ ডিগ্রিটা যে কোন থার্ম্মোমেটার ঘটিত Sub-normal ব্যাপার নয় তাহা না বুঝাইলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না। চোয়াল্লিশ ডিগ্রি মানে সারি সারি এক লাইনে ৪৪ খানি কুঠুরি, সেগুলি গায়ে গায়ে হইলেও প্রত্যেক কুঠুরিটির আলাদা পাঁচিল ঘেরা তিন চার হাত করিয়া উঠান আছে। উঠানে একটি মাত্র কাঠের দরজা, তাহার গায়ে এক ইঞ্চি গোল কাঁচ লাগান এক একটি ছিদ্র,এই ছিদ্রে চক্ষু লাগাইয়া বাহিরের প্রহরী ভিতরের খাঁচার দ্বিপদ জানোয়ারটি কি করিতেছে, তাহা দেখিতে পায়। সকলগুলি কুঠুরির সামনে দিয়া লম্বা উঠান

চলিয়া গিয়াছে, এ উঠানেটিও পাচিল ঘেরা। এখানে একটি sentry-box বা প্রহরীর বিশ্রামের জন্য কাঠের রথের মত ঘর আছে। এই উঠানে কাঁধে বন্দুক লইয়া ধরাকে সরাজ্ঞানি করিয়া রক্তমুখ গোরা সান্ত্রীটি ঘোরে। এই উদ্দিপরা হেলমেটধারী নীল-চক্ষু পেয়াদা গুলি দূর হইতে দেখিতেই আতঙ্কের জিনিষ, কিন্তু পরে তাহাদের সহিত ভাব করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, নিতান্ত সরল পোষা মেনী বিড়ালটির মতই নিরীহ।

এই চোয়াল্লিশ ডিগ্রির প্রথম তিন চারখানি কুঠুরির নাম condemned cell বা ফাঁসির আসামীর ঘর। আমি আর উল্লাস দা' তখন গলায় দড়ি দিয়া ওপারে যাইবার যাত্রী, মাথার উপর মিহী সূতায় বাঁধা খড়্গের মত ফাঁসির হুকুম ঝুলিতেছে। হাইকোর্টে আপিল চলিতেছে, জজ সাহেব সুবিচার করেন তো আন্দামানে জীয়ন্তে কবরস্থ হইতে যাইব, আর অবিচার করেন তো দড়ী বলিয়া ঝুলিয়া পড়িব। আর আর সকলে পাটের ফেঁসো ছাড়াইত, স্নানাহারের সময় বাহিরে উঠানে ঘুরিত ফিরিত, এবং চৌকিদিগের চক্ষু এড়াইয়া পরস্পরের সহিত দুই একটা চোরা চাহনী বা কথা বলিয়া লইত, নিদেন পক্ষ মনের সুখে মুখ ভেঙ্গাইয়া লইত। আমরা মরণপথের যাত্রী বলিয়া এ সুখ হইতে বঞ্চিত ছিলাম, দিবারাত্র একরূপ বন্ধ থাকিতাম; আমাদের স্নানাহার ছিল ঐ বন্দ ঘেরা চার হাত প্রস্থ উঠানটুকুতে। মানুষের মুখ দেখিতে যা ঐ মণ্ডামার্ক জেলার হিল সাহেব, একজন "মাঝে মাঝে তর দেখা-পাই" গোছের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ছ্যাকরা গাড়ীর রোগা ঘোড়ার মত শীর্ণ windblown চেহারার ওয়ার্ডার উইলশ সাহেব, আর দিন দু'টো অপর এক এক জন জেল পুলিশ। প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে মাথার উপরে একটু খানি আকাশ, চৌদ্দ হাত উঁচু দেওয়ালের ওপারে কয়েকটা আম কাঁঠাল পিপুল অশ্বত্থের রৌদ্র মাখা মাথা এবং, মুক্ত পাখীর আনা গোনা ও অবাধ কাকলী। সবুজ দূর্ব্বা বা গোটা ফুল এ সব সাত মাস দেখি নাই, নিতান্ত নির্মাল্যক জীবনে পরিচিতের সাক্ষাৎ বা দর্শনও একটিবার ঘটে নাই, তবে সাধন ভজনে আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিলাম বলিয়া স্নেহ মমতার ও চক্ষু কর্ণের সে দুর্ভিক্ষও সহিয়াছিল, তেলা গায়ে জলের মত সব দুঃখ দৈন্য গড়াইয়া পড়িয়াছিল, কাঁটা হইয়া বুকের মধ্যে ফুটিয়া থাকে নাই।

হিল্ সাহেব অত দুর্দ্দান্ত হইয়াও আমায় বড় ভাল বাসিতেন, দুই হাতে তুলিয়া খোকার মত নাচাইতেন, বলিতেন, "এই মানুষ এত বড় সাঙ্ঘাতিক কাজ করিয়াছে তাহা তো বিশ্বাস হয় না।" কিছু দিনের জন্য একজন নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়াছিলেন, তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে আমার সেজদা'কে (অরবিন্দ) লেখা

চিঠি পড়িয়া ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহাকে সাধন দিতে হইবে। আমি তো মহা ক'াপরে পড়িলাম, কত করিয়াই বুঝাই যে, "সাহেব আমি নিজেই এ সব বিষয়ে আনাড়ি পথিক, দিবার আমার কিছুই নাই, কিন্তু 'ভবী ভুলিবার নয়'। দু' চার দিন পিছু লাগিয়া না পারিয়া শেষে সাহেব চটিয়া গেলেন। হেড ওয়াডার উইলশ আমাকে স্বর্গীয় পরম পিতার প্রেম ও পাপীর অনুতাপের কথা বুঝাইবেই বুঝাইবে, তাহার অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া আমিও ভক্ত গরুড়টির মত শুনিতাম; সে যে কি রকম কালাপাহাড়কে ধরিয়াছে তাহা আর ব্যক্ত করিয়া মর্ম্মব্যথা দিতাম না। তাহার বাপ ছিল ইঞ্জিনিয়ার, কতকগুলা মরিচাধরা পুরাণ পেরেক জলে সিদ্ধ করিয়া লোহাকষ (iron tonic) তৈয়ার করিয়া ছেলেদের নাকি খাওয়াইত। ছেলের বুদ্ধিতে কেন যে এমন মরিচা ধরিয়াছে, ইহার পর আর তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। লোকটি কোয়েকার, (quaker) অতি সরল, তবে আইনের মর্য্যাদাব অতি বড় গোঁড়া।

ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় বোধ হয় আমার ও উল্লাসদা'র ফাঁসির হুকুম ঘুরিয়া যাবজ্জীবেৎ তাবৎ কালাপাণিসই হইবার হুকুম হইল। সেবার মরিতে গিয়াও মরিতে ইচ্ছা হয় নাই, কায় মনে ডাকিয়া ছিলাম যে, "এবারকার মত জীবনটা ফিরাইয়া দাও, এখনও যে 'সর্ব্ববন্ধনমুক্তির বুক জুড়ান সুখে আরাম করিয়া মরিতে পারিব না।" যেমন ভাব তেমনি লাভ, তাই ঠাকুর বুঝি শুনিলেন। মরণটা সেবার আমার রগ ঘেঁসিয়া গেল; পাশের কুঠুরি হইতে আজ চারুকে বাঘে লইল, কাল কানাইয়ের ঘাড় ভাঙ্গিল, দু'দশ দিন পর সত্যেন মামাও ইংরাজ-কেশরীর উদরস্থ হইল। আমার কাছে কিন্তু বাঘ আসিয়া পোষা মেনী বিড়ালটির মত গা শুঁকিল, চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাড় মটকাইবার আয়োজন করিয়া সহসা গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। তিন তিনটা আস্ত পেট্রিয়ট ভারত উদ্ধারীক খাইয়া বোধ হয় বাঘের পেট ভরা ছিল।

হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর দিনও আলিপুর জেলে ছিলাম। তাহার পর অকূলে পাড়ি দিবার—আন্দামান যাইবার পালা। ১১ই ডিসেম্বর বিকালে সাধারণ কয়েদীর চালান বেড়ি পরিয়া ঝমর ঝম্ শব্দে মল বাজাইয়া S. S. Maharaja চড়িবার উদ্দেশ্য তক্তা ঘাটে যাত্রা করিল। আমাদিগকে বিকালে বাহির করিবার সব আয়োজন করিয়াও আবার কি ভাবিয়া আহারাদি করাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে ঘরে পুরিল। রাত্র তিনটা কি চারটার সময়ে "উঠ উঠ জাগো জাগো" রব। সেই হাড়ভাঙ্গা শীতে হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে

হাঁটুর উপর অবধি ধুতি হাত কাটা পিরাণ ও মাথায় পগগ পরিয়া গেটে গিয়া সারি বাঁধিয়া বসিলাম। সে এক চড়ক পূজার সঙ আর কি। গলায় গরুর ঘন্টার মত লোহার হাঁসলিতে (ring) বাঁধা তক্তি, পায়ে বেড়ি আর ঐ পোষাক!! আমরা ত এ উহার চেহারা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়াই খুন; অবশ্য এখনও জেলের অধিকারের মধ্যে, তাই গড়াগড়ি দিয়া চাপা হাসির পেট ফুলানটা কমাইবার কোন উপায়ই আমাদের ছিল না।

সংসারে সুখ দুঃখ সব অবস্থার কথা, এক অবস্থায় যাহা বুকভাঙ্গা দুঃখ, অন্য অবস্থায় তাহাই স্পৃহণীয় সুখ। একজন ঠাকুর-বাড়ীর দিব্য কার্ত্তিকটির মত সাজা-গোজাছেলেকে তাহার মটর গাড়ী হইতে টানিয়া নামাইয়া অনবজ্ঞি এই সঙ সাজাইয়া দাও, সে হয়তো অপমানে ক্ষোভে সোজা দৌড়িয়া গিয়া "মা গঙ্গে! নাও" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিবে। আমাদের কিন্তু বড় সুখ হইল। একই ভাবে বন্ধ থাকিয়া পাটের পেসো ছাড়াইয়া পেয়াদার গুতায় কাষ্টমোন অভ্যাস করিয়া করিয়া সব হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এ রকম নূতন সঙ দেওয়াও একটা নূতন কিছু বলিয়া বড় আনন্দ-দায়ক হইয়াছিল, এই অকূল দেশী ভাসাইয়া উল্টো-বাজার দেশে যাবাটা মনে হইতেছিল যেন একটা মজার picnic বা চড়ুইভাতী।

বাহির হইয়া দেখি, দুজন মহাকালা সাইকাতার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী খানি যেমনি লম্বা, তেমনি চারিদিকে গুলগুলি কাটা বারান্দা, তেমনি চলিতে গমগমে আওয়াজ দেয়। এই গাড়ীতে আমরা কোট নাইতাম। আমরা তখন সরকারী বেগম, ততোধিক অধিক পর্দানসিন ও অসূর্য্যম্পশ্যা, তাহাতেই গুড়ি গুড়ি উঠিয়া তালাচাবি-বদ্ধ হইয়া মনের সুখে জাহাজ-ঘাটে যাত্রা করিলাম। চারিদিকে পুলিশ ঘোড়সওয়ার, পাদানিতে, উপরে, পাশে গোরা শাস্ত্রী, গাড়ীখানি পথ কাঁপাইয়া চলিল। সোডাওয়াটারের বোতলের ছিপি হঠাৎ খুলিলে যেমন করে, গাড়ী চলিতেই আমাদের সাত মাসের আঁটা পেটের ছিপিটা খুলিয়া তেমনি দশা হইল। হুড়ি কি মরি করিয়া এতদিনের গুদামজাত কথা গুলা ফোয়ারার মত বাহির হইতে লাগিল।

জাহাজ-ঘাটে পহুছিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, তখনও রাত আছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইমার্সন সাহেব ঘাটে বাইক্ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দিকে দিকে পুলিশ সওয়ার। কালাপানি বৈতরণীর নাও সেই মহারাজায় উঠিলাম। নীচে একটা হোল্ডে লইয়া গিয়া আমাদিগকে পুরিল। সেই ঘরের মেঝেয় তক্তাই

গায়ে একটা শিকল লম্বাভাবে আটকান আছে, তাহাতে দেড় দুই হাত অন্তর এক একটা হাতকড়ি লাগান। আমাদিগের সাতজনকে বসাইয়া সেই হাতকড়িতে এক এক হাত আটকাইয়া দিল, তাহার পর দরজায় শাস্ত্রী খাড়া করিয়া চাবি দিয়া সকলে চলিয়া গেল। এখন এই প্রথম বম্ কেশের আন্দামান-যাত্রী সাতজনের নাম বলি, কুল শীল তো জগদ্বিদিত। চেনা বামুনের পৈতার দরকার কি?—

১। শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।
২। শ্রীউল্লাসকর দত্ত।
৩। শ্রীহেমচন্দ্র দাস।
৪। শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।
৫। শ্রীইন্দুভূষণ রায়।
৬। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার।
৭। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যাহাদের দরজা বন্ধ করিয়া সরিয়া যাওয়া, তাঁহাদের নরক গুলজার আর কি! মেঝের সেই হাতকড়ি লাগান দশায় উপু হইয়া বসিয়া একপাশে কাৎ হইয়া কেহ গান ধরিল, কেহ গল্পের কলরোল তুলিল এবং কেহ কেহ বা রঙ্গরসিকতায় ও অট্টহাস্যে জাহাজ কাঁপাইয়া তুলিল। সে কি কলরব! কি হল্লা!! কিন্তু তাহার ফল হইল ভাল; জাহাজের কাপ্তান ও প্রহরী পুলিশ অফিসারদের ধড়ে এতক্ষণে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। আমাদিগের আনন্দ কলরব শুনিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কাক মারিতে কামান দাগা হইয়াছে। বোমার আসামী পোর্ট ব্লেয়ারে লইয়া যাইতে হইবে শুনিয়া বোধ হয় তাহাদের দুর্ভাবনায় কয়েক রাত্রি নিদ্রা হয় নাই; বোধ হয় ভাবিয়াছিল, এ রকম অসমসাহসিক জীবগুলা আসিলেই হয়তো মদমত্ত হস্তিযূথের মত জাহাজ "তছনছ" করিয়া দিবে। জাহাজ ছাড়িবামাত্র তাহারা আসিয়া আমাদের হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। উপেন ও সুধীর সরকার অসুস্থ থাকায় আমাদিগের পরের জাহাজে পোর্টব্লেয়ারে যায়; জাহাজের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের সম্বন্ধে উপেনকে বলিয়াছিল, "প্রথমে আমরা তাদের বেঁধে রাখি, তারপর দেখলুম সব খুব আমুদে লোক (a merry party); তখন খুলে দিই।"

হাতকড়ি খুলিয়াদিবা-মাত্র কম্বল পাতিয়া ঢালা বিছানা করিয়া আসর জমকাইয়া বসা গেল। সে দলে হেম দা' আর উল্লাস দা' মস্ত গাইয়ে, তাহার উপর

উল্লাস দা' নানারকম সঙ দিতে বঙ্গরসিকতা করিতে অদ্বিতীয়, হেমদাও বড় একটা কম যান না। এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্, যেখানে এই দুই জন থাকে, তাহার ত্রিসীমায় শোক দুঃখ থাকিতে পারে না। গানের পর গান চলিতে লাগিল, এতদিনের আটকানো কথা গুলা তুবড়ি বাজীর মত অবিশ্রান্ত অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্ম্ম বুঝে না,—তাই মানুষের সঙ্গে কথা বলিয়া যে এত স্বস্তি,—এত আরাম, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আরও কত কিই যে জানিতাম না, এই টানাপোড়েনের দীর্ঘ কয়টি বৎসরে কত কিই যে শিখিলাম! আমাদিগের অধিকাংশের সংসার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের সহায় সেই শাখামৃগদের হইতে খুব যে বেশী তাহা নহে। অবশ্য হেমদা' বাদে, কারণ সে সংসারে স্ত্রীপুত্র লইয়া সরকারী চাকরী সম্পর্কে পুলিশ ঘাটিয়া জীবনে অনেক "ঠেকে শিখিয়া" মানুষ হইয়াছিল।

এইরূপে গল্প গুজব গান বা তামাসায় অকূলে অনির্দ্দিষ্ট জীবনপথে যাত্রা করা গেল। কি যে কালাপানি, সেখানে কি খাইতে—কি করিতে হইবে, তাহার নাম গন্ধ জানা নাই। সেই ঘরেই নর্দ্দমার পাশে একটা বালতী ছিল, তাহাই শৌচাগার, প্রকৃতির তাড়নায় সেখানে কেহ বসিলে আর সকলকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে হয়। 'লজ্জা মান ভয় তিন থাকিতে নয়', তাহার সাধনা এইখান হইতে আরম্ভ। জাহাজের গায়ে মোটা কাঁচ আঁটা একটা ঘুলঘুলি ছিল, তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিলে, মা ধরিত্রীর নাড়ীর টানে নীচে পড়িবার আগে নিমেষের জন্য সমুদ্রের নীল বীচিবিক্ষুব্ধ পাগলা প্রাণটা দেখা যায়। একে ত'ো যাহা সুন্দর, তাহা কত টানে; তাহার উপর সে সুন্দর যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে সে কি যাদুই যে জানে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। কোজাগরী মাধুরীময়ী নিশা একটি রাত্রির জন্য আসে, তাই, সে চাঁদে মানুষের অন্তরে অন্তরে চাঁদে চাঁদময় করিয়া দিয়া যায়। নিত্যকার হইলে বুঝি কেহ ফিরিয়াও দেখিত না। কুচকুচে কালো অমাবস্যার জন্য তা হতোস্মি করিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া যাইত। সেই টলটলে সীমাহারা নীলের একটি মুহূর্ত্তের দর্শনে—অবগুণ্ঠিতার আধ-ঢাকা সুষমায় আমাদের মন টানিয়াছিল, তাই থাকিয়া থাকিয়া বিভূতি, ইন্দু, আমি উল্লাসদা' বেড়ি লইয়াও এক একটা লাফ দিয়া সেই দেখিবার-নয় ধন দেখিয়া লইতেছিলাম।

বেলা ছুইটার সময়ে দরজা খুলিয়া জগন্নাথ-যাত্রীর মত পোটলা পুঁটলি হাতে খামা-বগলে জন কয়েক লোক ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার কি রে, বাপু।

শুনিলাম, ইহারা সব ভাণ্ডারী অর্থাৎ ভঁাড়ারী ; ছোলা-ভাজা চিঁড়া নুন লঙ্কা আর চিনি বিতরণ করিতে আসিয়াছে। চিঁড়া খাইতে হইবে! দফা ঠাণ্ডা আর কি!! চক্ষু স্থির!!! জিজ্ঞাসা করা গেল, "ক'টা বেজেছে গো?" উত্তর দিল, "বেলা দু'টা।" আমরা তো অবাক্! দু'টা! সকাল নয়টা নয়? গল্পের নেশায় চুর মাতাল আমাদের কাল জ্ঞান আদৌ ছিল না; ঘণ্টাগুলা রোগা সিড়িঙ্গে হইয়া কোথা দিয়া যে চক্ষের অলক্ষ্যে সুড় সুড় করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেহই টের পাই নাই। তাহার পর ক্রমাগত সেই "চিঁড়া নাও" "ছোলা নাও" রব। ভালরে ভাল! আমিরা কি ঘোড়া, না চোগোপ্পা ভোজপুরী দারোয়ান, যে ছোলা চিঁড়া চিবাইব? "চিঁড়ে টিঁরে অচল, বাপু; দু'টি ভাত দিতে পার?" তাহারা বলিল, "ভাত মুসলমানে রাঁধে, মুসলমানে খায়'; ঠুন্‌কো জাতের ভয়ে তটস্থ হিন্দু ছোলা খাইয়া ধর্ম্ম রাখে। হা মাতঃ অন্নপূর্ণে! এই ঘোর দুর্দ্দিনে তোমার নেড়ে মূর্ত্তি, মা?" আমাদের মধ্যে একজন উদ্ধত ইয়ং বেঙ্গল চক্ষু পাকাইয়া বদ্ধমুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিল, "জাত আমাদের মারে কে? ধর্ম্ম আমাদের লোহার গড়া। নি এস চাচার ভাত, শ্রীদুর্গা বলে তাই খাব।" শিখ হিন্দু পুলিশরা তো বেজায় খাপ্পা, বলে, 'জাত দেবে বাবু!' আচ্ছা, আমরা রেঁধে দি।" আমরা তখন ভাতমুখো বাঙ্গালী,—বনবরাহের গোঁ! ভাত পাইলেই হইল, বলিলাম, "তথাস্তু"। তাহার পর কে যে দিল, অন্তর্যামীই জানেন; আমরা (সেই) সকালে চিঁড়া ও বিকালে দিব্য কুমড়ার তরকারী দিয়া ভাত সেবা করিলাম। অবিনাশের গলায় tubercular glands থাকিয়াছিল; আমরা তাহার নাম দিয়া ছিলাম "অবির গ্যাজ"। সে ডাক্তারের কাছে দুধ পাইল।

তাহার পর ডেকে উঠার পালা। সরু খাড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়া ডেকে হাওয়া খাইতে উঠিলাম, বেড়ি লইয়া সে উঠা এক কর্ম্মভোগ আর কি। কিন্তু উপরে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা অনুপম—বর্ণনার অতীত। চারিদিকে কোথায়ও কূল নাই, শুধু ঢেউভাঙা নীলজল, আর তাই ছুঁইয়া "চুম্বননত" নীলাম্বর খানি। আহা উপরে সে যে কি শান্ত মধুর উধাও অনন্ত, নীচে সে কি নয়নরঞ্জন নীল নর্ত্তিত নবঘন বিথার! সে—

"মহা গভীর নীরপুর পাপধূতভূতলম্।
ধ্বনৎসমস্তপাতকারিদারিতাপদাচলম্॥
জগল্লয়ে মহাভয়ে"

সে নর্মদার মত সাগর ছবি বড় শরণপ্রদ—বড় ভাবমাখা। আমরা সে ঘরে সাতটি, আর আমাদের পাশের ঘরে সাত জন হতভাগী মেয়ে কয়েদী দ্বীপান্তরের সাজা মাথায় করিয়া আমাদেরই মত বুঝি আরও অধিক অকূলে ভাসিয়াছে! আন্দামান কেমন এই ব্যাপারটা জানিবার জন্ত তখন বড় ব্যাকুলতা। সিপাই শাস্ত্রীরা আন্দামান নিকোবার পুলিশের লোক, তাহারা কিছু কিছু বিবরণ বলিল।

পররই সকালে সেই নীলিম প্রসারের বুকে কালো রেখায় কূল দেখা গেল। বেলা এগারটার সময়ে আমাদিগকে ডেকে লইয়া গেল। তখন অকূলের অনন্ত বুক গুটাইয়া আসিয়াছে, দু'ধারে সারি সারি প্রকৃতির কানন-সুলভ স্বপ্নছবি। বনকুন্তলা গিরিজটাময়ী সে মাটির কি রূপ। এত সুন্দরে কি এমন শৃঙ্খলকঠিন বন্ধন সম্ভবে। এই অনুপমাই কি সেই মানুষধরা কাল ব্যাধের ফাঁদ আন্দামান॥ দেখিয়া বিশ্বাস করিতে প্রাণ চাহে না। তবু তো এ সংসারে এমনই কত রূপসীর রূপের ফাঁদে কত মৃত্যু কত পাপ লুকাইয়া রহিয়াছে! পঙ্কে কমল ফুটাইয়া কমলের মৃণালে বিষধরের বেড় দিয়াই গ্রে লীলাময়ের লীলা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অকূলের পরিচয়।

আন্দামান ও নিকোবার বঙ্গোপসাগরের বুকে কতকগুলি দ্বীপ,—এক ছড়া ছেঁড়া মালার মত লম্বাভাবে সারি সারি পড়িয়া আছে। হুগলীর মোহনা হইতে ৫৯০ মাইল দূরে এই দ্বীপমালার অবস্থা। ভারত মহাদেশের যে কোনটুকু আন্দামানের সব চেয়ে কাছে, তাহা ব্রহ্মদেশের নেগ্রেস্ অন্তরীপ, আন্দামান হইতে মাত্র ১৬০ মাইল ব্যবধান। এই ১৬০ মাইল জলের মধ্যে আবার দুই দল (group) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম পেপারিস্ আর কোকো, ঠিক মাঝ পথে পেপারিস এবং আন্দমানের কোল ঘেঁসিয়া কোকো। কোকো আবার দুইটি, বড় কোকো আর ছোট কোকো।

আন্দামান প্রধানতঃ চারিটি দ্বীপ, তাহারা উত্তর দক্ষিণে সারি বাঁধিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের দিক দিয়া যাইতে হইলে, প্রথমে

উত্তর আন্দামান (North Andaman), মাঝে মধ্য আন্দামান (Middle Andaman) এবং শেষে দক্ষিণ আন্দামান (South Andaman) পাওয়া যায়। মানচিত্রে দেখিতে তিনটিই ঘেঁসাঘেঁসি ডিম্বাকার, আর দক্ষিণ আন্দামানের আরও দক্ষিণে একটি মটরের দানার মত ছোট রটল্যাণ্ড দ্বীপ। এই চারিটির আশে পাশে সরিষার দানার মত ছড়ান অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান দুই চারিটির নাম করিলেই চলিবে। উত্তর এবং মধ্য আন্দামানের পশ্চিম কোণে ইণ্টারভিউ দ্বীপ, তদ্ব্যতীত মধ্য এবং দক্ষিণ আন্দামানের পাশে পূর্ব্ব দিকে হ্যাভেলক্‌ ও আরকিপেলেগো দ্বীপ।

উত্তর আন্দামান ৫১ মাইল লম্বা, মধ্য আন্দামান ৫৯ মাইল, দক্ষিণ আন্দামান ৪৯ মাইল, এবং রটল্যাণ্ড মাত্র ১১ মাইল। এই চারিটি দ্বীপের নাম বড় বা গ্রেট আন্দামান। এই দ্বীপপুঞ্জের ২৮ মাইল দক্ষিণে ছোট আন্দামান (Little Andaman) অবস্থিত; তাহা দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল ও প্রস্থে ১৭ মাইল মাত্র।

দ্বীপগুলিময় বন আর পাহাড়। এ ভূমি যেমন পাষাণী, তেমনি রূপসী; আপনার ভাবে আপনি পাগল, নীল সিন্ধুর বুকে বনকুন্তলে অর্দ্ধখানি অঙ্গ ঢাকিয়া বড় প্রেমে রূপসী ডুবিয়া ভাসিতেছে। কবে যে সুন্দরী স্নান করিতে নামিয়া ছিল, সে সুখের জলকেলি আজও ফুরাইল না। গিরিবালার কক্ষের কলসি বুঝি কালো ঢেউয়ে নীল অকূলের বুকে ভাসিয়া গিয়াছে, স্নানরতা বনরাণীর সে দিকে লক্ষ্য নাই। এই গিরিজটার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ উত্তর আন্দামানে, স্যাডল্‌ মাউণ্টেন্‌ Saddle Mountain, উচ্চতা ৩০০০ ফিট।

ষড় ঋতুর খেলা এখানে বড় বিচিত্র। বর্ষা তো এক রকম লাগিয়াই আছে বলিতে পারা যায়। আর আছে গ্রীষ্ম। বাকি ঋতুগুলি এই দুইটির আগে পাছে কবে যে অতর্কিত-পদে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া যায়, তাহা সকল সময়ে ধরিতে পারা যায় না। কেবল গ্রীষ্মকাল ও শীতের নাতি শীতোষ্ণ মাস কয়টি ছাড়া আর প্রায় সব ঋতু গুলিই বর্ষায় অল্প বিস্তর ভিজা; কখন বা পূর্ণ ঘনঘটাময়ী, আবার কখনও বা হাসি ও অশ্রুর সুখ-অভিমানে অভিমানিনী। এইরূপে আগে বর্ষা ছিল বৎসরের আটমাসব্যাপী, এখন বনজঙ্গল কতক কতক পরিষ্কার হওয়ায় কিছু কম। মোটের উপর ঋতুর কোন স্থিরতা নাই; ছয়টি ঋতু ছুটাছুটি করিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া অতর্কিতে লুকোচুরি খেলিয়া যায়।

সমুদ্রের কালো জল চারিদিক হইতে এই বনভূমির পাষাণবন্ধুর অঙ্গখানি ঘিরিয়া কত দিক দিয়াই যে ছোট ছোট প্রণালী (খাড়ি) হইয়া ভিতরে আসিয়াছে, তাহার হিসাব কিতাব নাই। এই খাড়ি গুলিতে ভাটায় পাঁক পচে, তাই এ দেশে বড় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। ম্যালেরিয়ার বাহন মশার তো এখানে অগণ্য অক্ষৌহিণী সেনা আছে। মাকড়সার মত খুব বড় বড় অদ্ভুত আকৃতির মশাও আছে, তাহারা লম্বা লম্বা পা গুলার উপর বসিয়া, ক্রমাগত দোলে, এত দ্রুত দোলে যে মশাটাকে দেখা দুষ্কর। বনের মাঝে সকালে সন্ধ্যায় মশা, আর ক্ষুদে ক্ষুদে মাছির জ্বালায় দাঁড়ান যায় না, একেবারে সপ্তরথীর ট্যাক্‌টিক্সে অভিমন্যু বধ করিতে যায়। তাহার উপর আবার জোঁক। গাছের ডালে পাতায় ঘাসে কচু বনে,—ছোট ছোট ছিনে জোঁক কোথায় নাই। রৌদ্রের তাপে তাহারা লুকাইয়া থাকে, এক পসলা বৃষ্টি যদি দৈবাৎ পড়িল তো আর রক্ষা নাই। সে অবস্থায় মানুষের গন্ধ বা সাড়া পাইলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসে, উপর হইতে টুপ টাপ করিয়া মাথায় পড়ে। তেঁতুলে বিছা এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইলে প্রায় এক হাত অবধি লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা হয়; দংশনে পক্ষাঘাত অবধি হইতে দেখা গিয়াছে। সাপের বিষ এখানে মারাত্মক নহে। গোখুরা প্রায় নাই। এক প্রকার খুব ছোট সাপ ছিল, তাহার নাম ভাইপার (Viper)। তাহার বিষে মৃত্যু অনিবার্য্য। এখন কোথায়ও কোথায়ও গভীর বনে আছে। এটি প্রধানতঃ কীট পতঙ্গের দেশ।

বন্য পাখী এখানে প্রায় ছিল না। যাহা ছিল, তাহা আবার নিকটে ভারতের উপকূলে পাওয়া যায় না, আন্দামানের Artamus ও Oriolus ব্রহ্মবর্ত্তী জাভায় দেখা যায়। এখানকার শ্রাইক (Shrike) পাখীও চীন দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে পাওয়া যায়। পায়রা মাছরাঙ্গা ও কাঠঠোক্‌রা কিছু কিছু ছিল। এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর গভর্ণমেণ্ট বাহির হইতে খাঁচা শালিক কাক চড়ুই ময়না টিয়া পায়রা চিল শাঙ্ক বক প্রভৃতি আনিয়া ছাড়িয়া দেন, এখন তাহারা সংখ্যায় বাড়িতেছে। ময়ূরও আনা হইয়াছে। এক রকম বাদুড়ও (Small frugitorous bat) পূর্ব্ব হইতেই আছে।

বন্য পশুর মধ্যে ছিল শূকর, বন বিড়াল এবং পিঠে এক সার বড় বড় রোঁয়াওয়ালা একরকম ইন্দুর। এখন গৃহপালিত গো মহিষ ছাগল ইত্যাদি এবং বন্য হরিণ শৃগাল কুক্কুর আনিয়া বসবাস করান হইয়াছে, তাহারা চির জন্মের জন্য দ্বীপান্তরিত। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আদৌ নাই। নানাশ্রেণী

সামুদ্রিক জীবের যে কত বৈচিত্র, কত জাতি, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? শঙ্খ, সিপি (mother of pearl), গুগলি, শামুক ও কচ্ছপের ইন্দ্রধনুজিনি রূপ দেখিলে পাগল হইতে হয়; কত যে অদ্ভুত আকার, কত যে বর্ণ-বৈচিত্র, তাহা আর কি বলিব! ঘোড়া মাছ আছে, তাহার মুখ ঠিক ঘোড়ার মত। প্রকৃতির এ কি পরিহাস, কে জানে। দীর্ঘচঞ্চু কাক মাছ, মকরের মত "বদমাইস" মাছ, নরমুণ্ডের মত গোল ব্ল্যাডার Bladder মাছ, এক টুকরা স্বচ্ছ বরফের মত জেলি Jelley মাছ—কত নাম করিব? হাঙ্গর নক্র অপর্য্যাপ্ত। শঙ্কর মৎস্যও প্রচুর, তাহার লেজে সুন্দর চাবুক হয়; লেজের এক ঝাপটায় পায়ের মাংস কাটিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে; ব্ল্যাডার ফিস্ ভয় পাইলে ফুলিয়া কাটা নরমুণ্ডের মত হইয়া ফুৎকারে মুখ দিয়া জল ছড়ায় আর ড্যাব ড্যাব করিয়া চাহিয়া থাকে। এক রকম মাছ আছে, তাহা ভয় পাইলে খানিকটা কালি ঢালিয়া জলটা ঘোলা করিয়া দিয়া পলায়।

এখানকার উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য বেশি নয়। পোর্ট ব্লেয়ার ও নিকোবার নারিকেল প্রধান স্থান, বনের শাল, গর্জ্জন, পাডক, (Padouk), কোকো প্রভৃতি মূল্যবান্ কাঠ আর নারিকেলই এ দেশের ব্যবসার আসল পণ্য। এ বনভূমির সামান্য অংশেই লোক জনের বসতি ও চাষ আবাদ হয়; সেই টুকুর নাম পোর্ট ব্লেয়ার, মধ্য ও উত্তর আন্দামানে বসতি করিবার ছোট ছোট আয়োজন হইতেছে। এই বিশাল দ্বীপমালার বাকি সমস্ত ভাগই গভীর ও প্রায় দুর্ভেদ্য বনপ্রদেশ; সরকারী জঙ্গল বিভাগ—Forest Department এই সমস্ত বন মাপিয়া তাহার নক্সা তৈয়ার করিয়াছেন; প্রত্যেক মাইলে কয়টি গাছ আছে, কোথায় পানীয় জলের কুণ্ড বা নির্ঝর পাওয়া যায় এ সব সেই নক্সাগুলিতে আছে।

আর এক প্রকার সরকারী একচেটে ব্যবসা (monopoly) আছে। সে পণ্যের নাম Edible bird's nest; কালো কালো ছোট Swift পাখী মুখের লালা দিয়া এক রকম সাদা বাসা তৈয়ারী করে, এই বাসা ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ। Edible bird's nest সাদা মোমের মত জিনিস, খাইতে কোন আস্বাদ নাই, দুগ্ধের সহিত খাইতে হয়। রেঙ্গুন ও চীন দেশে ইহার বিশেষ প্রচলন।

পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথম বন্দী-উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াসের ইতিহাস সিপাহী যুদ্ধের সময়ের কথা। তাহার পূর্ব্বের সব অস্পষ্ট ইতিবৃত্ত।

আরব ভ্রমণকারী, মারকোপোলো ও নিকোলো কন্টি প্রভৃতির লেখায়

আন্দামানের নাম পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ রেগুলেশন অনুসারে প্রথম নিজামৎ আদালতকে সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরের সাজা দেবার ক্ষমতা দিয়াছিল। তখন সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ, মলাক্কা, টেনাসেরিম প্রভৃতি ছিল দ্বীপান্তরের দ্বীপ। ১৭৮৮—৮৯ খৃষ্টাব্দে আন্দামানে দ্বীপান্তরের উপনিবেশ করিবার প্রথম চেষ্টা, এঞ্জিনিয়ার কোল্‌ব্রুক ও কাপ্তান ব্লেয়ার এই চেষ্টার উদ্যোগী। দক্ষিণ:আন্দামানের চাথাম দ্বীপে আর উত্তর আন্দামানের কর্ণওয়ালিস্ বন্দরে দুইবার দ্বীপান্তরের আড্ডা করা হয়, এবং দুইবারই তুলিয়া দিতে হয়, কারণ তখন এ সব অস্বাস্থ্যকর জায়গায় মানুষ বাঁচিত না; মিউটিনির পর ডাক্তার মাউআট (Dr F Mouat) আবার আসিয়া চাথামে কয়েদী রাখিবার ব্যবস্থা দেন। ১৮৫৮ সালের রাজবিদ্রোহী কয়েদী লইয়াই এই নূতন নগর পত্তন আরম্ভ হইল। সাধারণ কয়েদী এখানে ১৮৬৩ সালে আসিতে আরম্ভ করে। ১৮৭০ সালে কর্ণেল হেনরি ম্যান্ বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া খাড়ি বুজাইয়া আন্দামানের স্বাস্থ্য চলনসই করেন। এখানে প্রায় ১৩০০ কয়েদী এবং ৭০০ হইতে ৮০০ অবধি স্ত্রী কয়েদী থাকে। স্বাধীন লোকের (free population) সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

এ দেশের আদিম নিবাসীরা অসভ্য, উলঙ্গ, বুনো, তাহাদের নাম জারয়া-ওয়ালা। তাহারা অব্যর্থ তীরন্দাজ; মানুষ দেখলেই তীরে বিঁধিয়া মারিয়া ফেলে। মলয় দেশের সেমাং জাতের মত জারয়া জাতির মানুষগুলি ছোট ছোট, বর্ণ কালো, কাণ বেশ সুগঠন ও ছোট, চুল পোপা পোপা, কোঁকড়ান ও খুব ছোট। এক রকম দীর্ঘাকৃতি লম্বা চুলওয়ালা জারয়া নাকি রাটল্যাণ্ড ও ইণ্টারভিউ দ্বীপের মধ্যে আছে। এরা সম্ভবতঃ অন্য জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফল। সাধারণ জারয়া মাথায় প্রায় ৪॥০ ফিট উচ্চ, উলঙ্গ, উদ্ভিধারী, বিরলশ্মশ্রু, সাদা ও লাল মাটি দিয়া ইহারা সারা গায়ে চিত্র বিচিত্র করে। ইহাদের আহার মাছ কচ্ছপ মধু ও বন্য ফল। এরা বীরের জাত, ছয় ফিট লম্বা শক্ত কাঠের ধনুকে তীর একবার যোজনা করিলে আর রক্ষা নাই; বনের পশুর মত এমন অলক্ষ্যে এত নিঃশব্দে আসে যে তাহাদের দেখা যায় না, অথচ তাহারা দূর হইতে দেখিয়াই অব্যর্থ সন্ধানে তীর মারে। ইংরাজ শক্তির সহিত ইহাদের আজও সন্ধি হয় নাই; রাইফেল তোপের ভয়ে এরা দূরে দূরে বনের মধ্যে থাকে, কখন কখন বনের ধারে আসিয়া মানুষ দুই একটা মারিবার পর তাড়া খাইয়া চলিয়া যায়। এরা একপত্নীক, সন্তরণপটু, সংখ্যায় বোধ হয় ৮০০০।১০০০০ হাজার হইবে।

পোর্ট ব্লেয়ারের পত্তনের পাঁচ বছর পরে এক দল বুনো ইংরাজের কাছে পোষ মানে। ইহাদের নাম এখন আর জারয়া নহে, ইহাদের জংলী বলে। আসল জারয়া ইহাদের দেখিলেও প্রাণে মারিতে ছাড়ে না। সরকার বাহাদুর ইহাদের জন্য কতকগুলি ব্যারাক তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন, বনে বনে ঘুরিয়া মধু, কচ্ছপের হাড়, শাঁখ, কড়ি, ঝিনুক (mother of pearl) এমনি বনজাত সামুদ্রিক কত জিনিস লইয়া ইহারা এই জংলী ব্যারাকে আসিয়া থাকে। জংলী ব্যারাকের মুন্সী সেই সব জিনিস লইয়া তাহার বদলে তামাক চা চিনি কাঁচের মালা এই রকম যে যাহা চায়, দেয়; আর তাহাদের আনা জিনিষগুলি বিক্রয়ের জন্য গুদামে রাখে এবং রসের Show room এ পাঠায়। এই খানে ইহারা আট দশ দিন থাকিয়া শ্রান্ত হইলে আবার বন ঘুরিতে বাহির হয়। ইহাদের পুরুষরা একটা তিন চার ইঞ্চি কাপড়ের লেংটি পরে, মেয়েরা গাছের পাতা পরে, কোন কোন গাছের তলতা বা ঘাসের বিনানীর এক রকম ঝালরও কথন কথন পরে। এটা ক্রমিক সভ্যতার লক্ষণ। এই জংলী ব্যারাকে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখিয়াছি, কাহারও বাপ ছিল উড়ে, কাহারও বা সাহেব। একটি মেয়ে, সম্ভবতঃ কোন শ্বেতাঙ্গের ঔরসজাত হইবে সে এত সুন্দরী যে জংলী বলিয়া বোধ হয় না। সে প্রায়ই সভ্যতার ছাই পাঁশ কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া পালায়, আর মনের সুখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। মুক্ত আকাশের পাখীর স্বভাব তাহার আর গেল না।

ইহাদের ভাষা দুর্বোধ্য, একটু আনুনাসিক, শব্দ-বহুল মোটেই নহে। গলার স্বর খুব ক্ষীণ, যেন সাহেবদের যাহা অভ্যাস করিয়া মিহি করিতে হয়, ইহাদের তাহা স্বভাবদত্ত।

জংলীব্যারাক সোর পেট (Shore point) ষ্টেসনের কাছে, জংলি হাঁসপাতাল হদ্দুর (Haddo Station) কাছে। আজ অবধি দুইজন জংলী মেয়ে ইংরাজি শিখিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাদের একজন জংলী হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ (matron) এবং অপর জন চীফ কমিসনারের স্ত্রীর সহচরী।

ক্রমশঃ।

বিশ্বমানবের একতা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ বা খ্রীষ্টান; কেহ দ্বিজ, কেহ শূদ্র; কেহ গোরা, কেহ কালা; কেহ মুসলমান, কেহ বা কাফের; মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক বা কল্পিত ভেদের আর অন্ত নাই। সব মানুষই যে মানুষ এ গোড়ার কথাটা মোটা মোটা অভিমানের চাপে মারা পড়িতে বসিয়াছে। যে অপাংক্তেয়, সেও যে মানুষ, কৃষ্ণচর্ম্ম নিগ্রোও যে ভগবানের প্রতিচ্ছবি, এ কথা ব্রাহ্মণ বা ইউরোপীয়ের কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে যেন একটু কষ্ট হয়।

এক দেশবাসীর মধ্যেই যখন শত ভেদ, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা আরও কত বেশী। আমার দেশ, আমার ধর্ম্ম, আমার সমাজ, আমার আচার, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে যে এক একটা শক্ত গাঁট বাঁধিয়া প্রকাণ্ড পুঁটুলি বানাইয়া মাথায় বহিয়া মরিতেছি, তাহার সহিত তোমার পুঁটুলিটির একদিন না একদিন ধাক্কা লাগিবেই লাগিবে। আর কাহার দোষে তাহা ঘটিল তাহা মুখোমুখি করিয়া যখন মীমাংসা হইবে না, তখন হাতাহাতি ত বাধিবেই। দোষটা যে পুঁটুলি বাঁধার, তাহা তুমিও সহজে স্বীকার করিবে না, আমিও না।

আশার কথা এই যে মানুষ যে কত বড়, তা সে নিজেও জানে না। তাই এত পুঁটুলি বাঁধিয়াও সে স্বস্তি পায় না, নিজের বাঁধনই তার হাড়ে বিঁধিতে থাকে, নিজের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠে। তার অন্তরাত্মা যে মুক্তির প্রয়াসী—মিলনের প্রয়াসী।

তাই মানুষ যত দিনের, হয় ত তাহার দেশ ও জাতির গণ্ডী ভাঙ্গিবার প্রয়াসও তত দিনের। ইউরোপে এই সে দিন সব বড় বড় পুঁটুলির ধাক্কাধাক্কিতে একটা রক্তারক্তি হইয়া গেল, আজও তাহার জের চলিতেছে—তাই স্বভাবতঃই মানুষের মনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ তাই বহু স্বার্থ সমন্বয় করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক সম্মিলনের (League of Nations) সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কিন্তু এ চেষ্টা নূতন নহে। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম মুহূর্ত্তেই ইউরোপে এ কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু সারাজগৎকে একসূত্রে গাঁথিবার কল্পনা ফ্রান্সে জাতি (nation) গঠন করিয়াই তখনকার মত নিবৃত্ত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতেও এ কল্পনার ধারা ছুটিয়াছে। জাতিধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্মকে অতীতের সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত ও ভেদবুদ্ধিজনক বলিয়া সাধারণের চক্ষে হেয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা এই ভাবের ভাবুকদের মনে খুবই প্রবল। ঐ যে বিজয়দৃপ্ত সেনাপতি সগর্ব্বে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া অরিব্যূহ ভেদ করিয়া ছুটিতেছে, ও স্বজাতির মূঢ় অহঙ্কারের প্রচণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। ঐ যে স্বদেশের সীমারেখা লইয়া ধরিত্রীর বক্ষে দাগ কাটাকাটি, ঐ যে পরের পকেট মারিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার চেষ্টা, ঐ যে বর্ণ-বৈষম্য ও আচার বৈষম্য লইয়া পণ্ডিতী কোলাহল, এ শুধু সঙ্কীর্ণতার ও অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র। অজ্ঞান দূর কর, হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দাও; আজ যে প্রাচীর অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা ধূলিকণাবৎ প্রতীয়মান হইবে।

ইহাই সে যুগের রাষ্ট্রবিরোধী বিশ্বমানব উপাসকদিগের মূল কথা। সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) ও বহিঃশাসন-বিরোধী পূর্ণস্বাতন্ত্র্যবাদী (Anarchist) দিগের সহিত মিলিয়া ইহারা ইউরোপের ভাবজগতে বেশ একটা প্রবল ধারা বহাইয়াছিলেন।

ভাবটা যে মহান্, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ ব্যবস্থা করিতে পারিলে, বর্ত্তমান দুঃখ কষ্ট যে অনেকটা কমিয়া যায়, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ব্যবস্থাটা কার্য্যে পরিণত করিবে কে? সাধারণ মানুষের কাছে ভাব জগৎটা চিরদিনই একটু অস্পষ্ট, সত্য বলিয়া কোনও ভাবকে ভাসা ভাসা রকমে ধরিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা টিকে না। প্রাণ রাখিতে রাখিতেই যাহার প্রাণান্ত, সত্য তাহার কাছে খুব স্থূল ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না হইলে সে তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারে না। পুরাতন সংস্কারগুলা আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে; কাজের সময় সেই গুলাই ফুটিয়া পড়ে, অশরীরী ভাবগুলা ভাব জগতেই থাকিয়া যায়; না হয় নিতান্ত পঙ্গুর মত চুপ করিয়া স্থূল জগতের কার্য্যকলাপ দেখিতে থাকে, কাজ কর্ম্মের ঠেলাঠেলির মধ্যে নামিয়া আসিতে তাহাদের সাহসে কুলায় না।

আরও একটা কথা এই যে, একটা বিশুদ্ধ ভাব কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ হইবার পথে, সাথের সাথী আরও পাঁচটা ভাবের সহিত মিশিয়া যায়; সেগুলার সহিত

তাহার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ মিল নাই বলিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া সে যখন পৌছায়, তখন আর অবিমিশ্র থাকে না। সহায় ভাবিয়া যাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, তাহারাই শেষে তাহাকে অর্দ্ধেক পথে ছাড়িয়া পালায়।

সমাজতন্ত্র (Socialism) ও শাসন-বিরোধী তন্ত্রের (Anarchism) পাল্লায় পড়িয়া সার্ব্বজনীন একত্ব (Internationalism) ভাবটারও ঐ দশা ঘটিয়াছে। যাঁহারা আপন আপনি রাষ্ট্রীয় পতাকা ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া বিশ্ব-প্রেমিক সাজিয়াছিলেন, ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইতে না হইতে তাঁহারা ছিন্ন পতাকা উঠাইয়া লইয়া, কোমর বাঁধিয়া আপন আপন রাষ্ট্রের জন্য লড়িতে লাগিয়া গেলেন। যে জর্ম্মনীতে সোসিয়ালিজমের উৎপত্তি ও পুষ্টি, সেই জর্ম্মনীর সমাজ-তান্ত্রিকেরাই বিশ্বপ্রেমের বোঝা সকলের আগে নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রুশিয়ার আন্তর্জাতিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা আর একটু দৃঢ় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু সেখানেও শ্রমজীবীদের সমগ্র চেষ্টা, আপনার গণ্ডা ষোল আনা বুঝিয়া পাওয়াতেই পর্য্যবসিত। রুশিয়ায় বিপ্লবের ফলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবন যে অনেকটা বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে, পূর্ব্বের মত অতটা উৎকট স্বার্থগন্ধদুষ্ট থাকিবে না, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যে আন্তর্জাতিক সম্মিলন সাধিত হইবে না, তাহা বুঝিতে বড় অধিক দূরদৃষ্টির আবশ্যকতা নাই।

আর এরূপ ত হইবারই কথা। এক জাতীয়ত্বের (Internationalism) সহিত সমাজতন্ত্রের (Socialism) খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও চলে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার জীবন অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় জীবনের পুষ্টির জন্য পরিশ্রম করানই সমাজতন্ত্রের মূল কথা। আন্তর্জাতিক প্রেমের পুষ্টি ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। রাষ্ট্রীয় জীবন বিশুদ্ধ ও পরজাতি-বিদ্বেষহীন হইয়া দাঁড়াইলে, সর্ব্বরাষ্ট্র-মিলনের পথ সুগম হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু ইহা সমাজ-তন্ত্রের গৌণ ফল মাত্র।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় জীবন কতকটা পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু দুঃখের দিনের অর্জ্জিত জ্ঞান সুখের দিনে মনে থাকে না। বিপদের সময় যাঁহারা চিঁ চিঁ করে, বিপদ কাটিয়া গেলে তাহারাও ভ্রূকুটি করিতে ছাড়ে না। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ হয়ত কতকটা সুবন্দোবস্তের ভিতর আসিবে; কিন্তু মানুষের ভিতরে পরিবর্ত্তন না হইলে, শুধু বাহিরের বন্দোবস্তে স্থায়ী সুফলের আশা করা দুরাশা মাত্র। প্রাণ যাহা চায় না, শুধু গায়ের জোরে তাহা গড়িয়া তোলা

চলে না। অন্তরের প্রেরণাই বাহিরে ফুটিয়া উঠে। মানুষের প্রাণে যতদিন না মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিবে ততদিন শুধু আইন কানুনের পেষণে তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে নিস্তেজ করিবার চেষ্টা বিফলই হইতে থাকিবে।

তাহা হইলে প্রশ্ন এই—বিশ্বমানবের একত্ববোধ সাধারণ মানুষের মনে কি করিয়া ফুটাইবে? কর্ম্মজগতে একত্ববোধ ব্যক্ত করিতে না পারিলে, যাহাতে তাহার আর স্বস্তি না থাকে, এমন ব্যবস্থা কি করিয়া করিবে?

পারিবারিক একত্ব বুঝিতে তাহার কষ্ট হয় না। কেন না, সেটুকু না বুঝিলে মানুষের জীবনযাত্রাই চলে না। গোষ্ঠী সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথা খাটে; গোষ্ঠীর অনুগত না হইলে তাহার আত্মরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি ঠিক সেরূপ কারণে গড়িয়া উঠে নাই। রাষ্ট্র না থাকিলেও আমাদের জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে না, সেই জন্য রাষ্ট্রগঠন যতটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা-পরম্পরার ফল, ততটা মানুষের মনের আভ্যন্তরীণ প্রেরণার ফল নহে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। একই ধর্ম্মানুরক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমাজ একই ভূখণ্ডে হয়ত আবহমান কাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা এইরূপ কোনও বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার আবশ্যকতা না হইলে, সাধারণতঃ তাহারা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় না। রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে তুলিতেই স্বদেশ-প্রীতির আবির্ভাব হয়, দেবতা আসিয়া মন্দির অধিকার করেন। ঐ স্বদেশপ্রীতি লইয়াই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, ঐ একত্ববোধই রাষ্ট্রের আত্মা। যেখানে উহার সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় নাই, সেখানে রাষ্ট্র শুধু যন্ত্রমাত্রে পরিণত হয়। শিবের অভাবে সতীদেহের মত তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেও বিলম্ব হয় না। (ভারতবর্ষ কি তাহাই হইয়াছিল?)

যা'ক সে কথা। একটা রাষ্ট্র গড়িবার পথেই যখন এত বাধা, তখন সর্ব্বরাষ্ট্র সম্মিলন ঘটিবে কিসে? শুধু প্রাণের দায়ে বা ইন্দ্রিয়সুখের প্রেরণায় মানুষ ত তাহা গড়িয়া তুলিবে না। একত্ব বোধ না থাকিলেও মানবের দিন যে একরূপ কাটিয়া যায়। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের পক্ষে সার্ব্বজনীন মিলনের একান্ত আবশ্যকতা কি?

রাষ্ট্র গড়িবার কতকগুলা ভৌগোলিক কারণও থাকে। পর্ব্বত সমুদ্র বা নদী দিয়া প্রকৃতি যে দেশকে অপর সমস্ত দেশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে সে দেশবাসীদের মনে একাত্মভাব সহজেই গজাইয়া উঠে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী লইয়া যেখানে কথা, সেখানে ত আর এ সুবিধা নাই। রেল, তার, দ্রুতগামী পোত

জগৎকে অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত ভৌগোলিক বাধা আজও অতিক্রান্ত হয় নাই।

কিন্তু প্রকৃতির মনের এক কোণে যেন বিশ্বমানবের সম্মিলন ঘটাইবার ইচ্ছা লুকাইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। সেই ইচ্ছাই আজ ভাবুকের মনে বিশ্বমানবের একত্ববোধ ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিতেছে। কি কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক্।

প্রথমত সেই সনাতন পন্থা, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। কিন্তু বীরের সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, পৃথিবীর আয়তন সে পরিমাণে ত আর বৃদ্ধি পায় নাই। সে কালের রাজাদের মত দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার পথে আজ কাল বাধাবিঘ্ন অনেক জন্মিয়াছে। আজকাল কোনও রাষ্ট্রশক্তিই এত প্রবল নয় যে, সম্মিলিত অপর-সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। যে কয়টা বিরাট সাম্রাজ্য মিলিয়া আজ পৃথিবীকে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া বসিয়াছে, তাহাদের যে কাহারও অপর সকলকে উদরসাৎ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

শুধু তাই নয়। ক্ষুদ্র, বৃহৎ অনেক জাতিরই মনে আজকাল স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আর কোনও বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, আপনাদের হারাইয়া ফেলিতে চাহে না। সাম্রাজ্যগুলিকে অন্ততঃ মৌখিক হিসাবেও স্বনির্দ্ধারণের ধারা (Principle of self-determination) মানিয়া লইতে হইয়াছে। সেই সমস্ত বিরাট সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলির সংঘর্ষে যে মানবজাতির একীকরণের পন্থা আবিষ্কৃত হইবে, তাহার সম্ভাবনা বড় অল্প।

আশার কথা শুধু একটা। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এমন এক এক দল ভাবুক উঠিয়াছেন, যাহারা রাষ্ট্রশক্তিকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া অপর রাষ্ট্রের সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহেন। এসিয়া ও আমেরিকায়ও তাহাদের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। সকল দেশেই রাষ্ট্রপরিচালনশক্তি তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িতে পারে; এবং তাহাদের প্রভাবে রাষ্ট্রসম্মিলন সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু সে মিলনের প্রকৃতি কিরূপ দাড়াইবে? এবং তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনাই বা কি?

বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কাও

কি দূরীভূত হইবে? আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ যেরূপ শিথিল, তাহাতে স্বার্থসংঘর্ষে বিগত যুদ্ধের মত উপদ্রব যে একেবারেই তিরোহিত হইবে, একথাও কি জোর করিয়া বলা যায়? সুবিধার উপরই যখন এ সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত, তখন যতক্ষণ সকলের সমান সুবিধা, ততক্ষণই ইহার জীবন। শুধু তাই নয়। বিচিত্রতাই সমাজের উন্নতির কারণ। শাসন কেন্দ্রীভূত হইলে, বৈচিত্র নষ্ট হইয়া মানব-সমাজকে জড়যন্ত্রমাত্র করিয়া তুলিবে। তখন আবার সে বিশ্বরাষ্ট্রকে নূতন করিয়া না ভাঙ্গিয়া গড়িলে, সব উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু কোন্ শক্তি আবাব সে সমাজের জীর্ণ দেহ সংস্কার করিয়া নূতন করিয়া গড়িবে? বর্ত্তমান কালে নেশন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এক ভূখণ্ডবাসী ব্যক্তি-বর্গের সমষ্টিমাত্র নহে। সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা, সাধনা, ভাব ও আদর্শ জাতীয় আত্মারূপে ব্যষ্টির ঘটে ঘটে বিরাজিত। যতদিন সেই জাতীয় আত্মা সজীব, ততদিন সে জাতির বিনাশ নাই। কিন্তু বিশ্বমানবসমাজে কোথায় সেই আত্মা, যাহার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া সমাজ আবার নূতনরূপ গ্রহণ করিতে পারিবে?

এই প্রশ্নের মীমাংসা কামনায় মহাত্মা কোমত আপনার "পজিটিভ" ধর্ম্ম-প্রচার করেন। বিশ্বমানবের সেবাই ইহার মূল কথা। পরিবার, জাতি বা রাষ্ট্রের স্বার্থ যেখানে বিশ্বমানবের মঙ্গলের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে, সেখানে বিশ্ব-হিতে সমুদায় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না। জড়বিজ্ঞানও বর্জ্জনীয়। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের ইউরোপীয় ভাবের সহিত বর্ত্তমান ভাবের তুলনা করিলেই কোমতের এই বিশ্বমানবধর্ম্ম যে কতটা কাজ করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় দণ্ডনীতি পূর্ব্বে যতটা কঠোর ছিল, আজ আর ততটা নাই, দাস ব্যবসায় ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভও বিশেষ গৌরবের কথা নহে—এ বিশ্বাস অনেকের মনে জাগিয়াছে। মানুষ যে শুধু মানুষ বলিয়াই প্রেমাস্পদ, এ কথা অন্ততঃ মুখেও লোকে বলিতে শিখিয়াছে।

কিন্তু দুই চারিজন সদাশয় ব্যক্তির মনে এ ভাব পরিস্ফুট হইলেও, জনসাধারণ মধ্যে ইহার আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। মানুষে মানুষে সমস্ত বিরোধের মূল যে অহঙ্কার, তাহা খর্ব্ব বা বিশুদ্ধ করিতে এ ধর্ম্ম কৃতকার্য্য হয় নাই। জ্ঞান ও প্রেমের বিস্তার করিয়া মানবের একীকরণ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; কিন্তু জ্ঞান ও প্রেম অপেক্ষা সাধারণ মানুষের মনে অহঙ্কার যে অনেক বেশী প্রবল। স্বাধীনতা ও

সাম্যবাদ প্রচারের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে বটে ; কিন্তু ঐ গুলিই কি গোড়ার কথা ? মানুষের অহঙ্কার কি মাথা নোয়াইয়াছে ? আর তাহা যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভ্রাতৃত্বপ্রচার বিড়ম্বনা মাত্র। অহঙ্কার মানুষকে পৃথক করিয়াই রাখে , তাহাই যদি মানুষের চরম তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে, কেন মানুষ তাহাকে খর্ব্ব করিয়া প্রেমের সাধনা করিতে ছুটিবে ?

এ প্রশ্নের একই মীমাংসা সম্ভবপর। মানুষ আপনাকে যতটা ছোট বা খণ্ডীকৃত করিয়া ভাবে, বস্তুতঃ সে তাহা নহে। স্বেচ্ছামত অহংকারকে ফাঁপাইয়া, ফুলাইয়া বড় করিয়া তোলাই স্বাধীনতা নহে , আর যন্ত্রের মত শাসন-কৌশলে মানুষের সহিত মানুষের আটা-আঁটি করিয়া দিলেই ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইবে না।

মানুষ যত দিন না আপনার স্বরূপ বুঝিয়া আপনার আত্মার সহিত সার্ব্বজনীন আত্মার অভেদ উপলব্ধি করিবে, ততদিন তাহার শান্তি নাই। তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত জাতিই সেই বিরাট আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের খণ্ড খণ্ড বিকাশ মাত্র। জীবে জীবে যিনি 'অহং' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও অহং সত্তার অতীত, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মানব জীবন গড়িতে পারিলেই নিজের ও সমাজের পূর্ণ পরিণতি সম্ভবপর। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে মানব-সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহার আর বিনাশ নাই।

জগতে যত আধারে ভাগবতী শক্তি প্রকাশিত হইতেছে, মানুষই তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আধার। পূর্ণভাবে সেই শক্তি আপনার মধ্যে বিকশিত করিয়া, জগতে ভাগবত রাজ্যস্থাপনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেই মানুষে মানুষে ভেদ ও বিরোধ তিরোহিত হইতে পারে , ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা তখনই সম্ভবপর। বিশ্বরাষ্ট্র গড়িবার ঐ একমাত্র পন্থা।

গান।

[শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

গায়ক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ।

তা'রি সে যে গো মহাদান।
যা'রি পুণ্য-মধুর আলোকে
এসিয়া বিভোরে গাহি গান।
সে যে অমৃত-মধুর পরশে
আমার এ হৃদি-কানন-পুষ্প
ফুটায়ে তুলেছে হরষে।
তারি মধুভাবে তৃষিত পরাণ
প্রেমামৃত-মধু করে পান।
সে যে গীত গাথা নবছন্দে
সবারে ডাকিয়া জাগায়ে দিয়েছে,
জগৎ আকুল গন্ধে।
সে যে হৃদয়ের ছবি স্বদেশের রবি
জীবনের সাধ অভিমান।

* ইনি পণ্ডিত যাদবেশ্বর, তর্করত্নের আপনার জন। কাশীধামে রবীন্দ্রের অভ্যর্থনায় এই গান রচনা করেন।

প্রত্যক্ষ পথ।

[শ্রীমতী সত্যবালা দাসী।]

গতানুগতিকের জীবনধারা হইতে এমন অকুণ্ঠিত পার্থক্য লইয়া নূতন অবতীর্ণ এ যখন এত সত্য, তখন এমনই থাক্, আমার বাঙ্গালীর জগতের সকলেরই ভাগ্য-সূত্র যে এক তৃতীয় পুরুষের করস্থ, এ মানিবই মানিব।—সংশয়ের তিলমাত্র স্থান নাই। সেই পুরুষোত্তম জগন্নাথ চিরসুন্দর: তিনি আকর্ষণ করিতেছেন,—আপনার কোলেরই দিকে। আমাদিগকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের ঐ সুশীতল পীবর বক্ষেই চাপিয়া ধরিবেন। এ বিকর্ষণ নহে,—দূরে ঠেলিতেছেন না। এতো ধাক্কা নয়, এ যে টান,—এ যে কোলে লওয়া।

বাঙ্গালী জাগিয়াছে।—পথ নাকি এখনও পায় নাই! আদর্শ এখনও গড়িয়া উঠে নাই। না, এ কথা কখনও সত্য নহে। আদর্শ গড়িয়া আছে সেই দিন হইতে যেদিন হইতে বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি—বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র ভাব, স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার। চৈতন্যের অগ্রজ বৈষ্ণব কবিগণ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেরই মানস-সরসে সেই আদর্শরূপী পরমেশ্বরের ধ্যানমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। আমরা তাহাকে কবিত্ব বলিয়া সৌখীনতার চক্ষে দেখিয়াছি, টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি সমাজ প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে।—সেখানে কখনও গা ঠেকে না, চোখও পড়ে মাত্র। সে স্থানটা আমাদের জীবনের প্রয়োজনের নহে, শোভার।

এরকমটি হইয়া আসিয়াছে বিশ্বে আমাদের প্রাণবস্তুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার সময় আসে নাই বলিয়া। বাঙ্গালীর সত্যমূর্ত্তি এতদিন বাঙ্গালীর মধ্যে স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, সে ভগবানেরই ইচ্ছা, আর সে ইচ্ছা যতদিন না চাহিবে—প্রকাশিত হইয়াও উঠিবে না। আমরা কর্ম্মের দিক দিয়া শত চেষ্টা করিয়াও পারিব না।

নিয়মও তাই। যতদিন না সমস্ত প্রতিবন্ধক মহামায়ার কৃপায় সরিয়া গিয়া মানবের মুক্তির সময় আসে,—ততদিন পর্য্যন্ত আত্মা কি প্রকাশ পান? মানবের সমষ্টি মূর্ত্তিই Nation এখানেও ঐ একই নিয়ম। আমাদের National soul আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি নাই এতদিন, সে অযথা নহে। ঠিকটা পাইব বলিয়াই আমরা ছাঁকা ভুল গুলিই লইয়া আসিয়াছি। বিদেশী পণ্ডিতের উপ-

দেশের পাঠশালার পাশের পড়ার পণ্ডশ্রম কসরৎ করিয়া রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রনীতি বলিয়া চীৎকার করিয়াছি। আমাদের লইয়া প্রকৃত যে নীতি তাহার দিকে তাকাই নাই।

আজ বাহিরের জগতের অসহ্য চাপে আমাদের সবটা নাকি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে,—শিল্পী কৃষি শ্রমজীবী প্রভৃতি করিয়া একে একে এক একটা অঙ্গ নিষ্পেষিত হইতে হইতে অবশেষে—জাতির মর্ম্মস্থান—জাতীয়ভাবের কেন্দ্র, শিক্ষিত সম্প্রদায়টাও survival of the fittestএর প্রেরিত অনুপযুক্ততার ষ্টীম রোলারে ভাঙ্গা গুঁড়া হইয়া যাইতে বসিয়াছে, তাই বড় দেখিতে আজ আমরা মনে করিতেছি আমাদের বুঝি ঘুম ভাঙ্গিল।—সত্যই ঘুম হয়ত ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু উঠিয়া বসিব যে সে ক্ষমতা কই? যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির ব্যবহারে সে কার্য্যটা হয়,—সেগুলা যখন যাইতে বসিয়াছিল তখন আমরা মুখ বুজিয়া ছিলাম। এখনও আমাদের মুখ বুঁজিয়াই থাকিতে হইবে। দশটাকা পরিবার কাপড়ের জোড়ার জন্য গুণিয়া দিই, আর সারা মাসের উপার্জ্জনে কোন প্রকারে যেন ভাতই পাই,—আমাদের মুখ বুঁজিয়াই থাকিতে হইবে। রাজশক্তি সমাজশক্তি প্রজাশক্তি সর্ব্বাঙ্গে কষাঘাত করিতে থাকুক—মুখ বুঁজিয়াই থাকিতে হইবে। সব ঘা কটাই যখন এ শরীরে সহিয়াছে, আজ এমনই কি ঘা পাইব যে সহিবে না। যদিই বা মরি, তা বলিয়া কি অসভ্যের মত আর্ত্তনাদ করিতে হইবে?

আজ যতটুকু লইয়া বর্ত্তমান জাতি—ততটুকু লইয়া স্পষ্ট এবং সত্য কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়। মনের ভাব যাহাই হউক,—বলিবার এ ভিন্ন কিছুই নাই। তবে প্রাণে যে টুকু বুঝিতেছি সে স্বতন্ত্র। সে এ পৃথিবীর বার্ত্তা নয়,—স্বর্গের স্বপ্নচিত্র। সে আর মানবের কথা নহে,—দেবতার কল্পনা বিলাস।

—দেশ কি সে কথা শুনিবে? সত্তর বৎসরের ইতিহাসে উৎসাহ করিবার কিছুই ত পাই না। বঙ্কিম অরণ্যে রোদন করিয়া মাতৃবন্দনার গাম্ভীর্য্যই যেন ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ মহান্ দৃঢ়তার সহিত দেশের শক্র দেশাচারকে তৎকৃত সমস্ত অমঙ্গলের সহিত আসামীর কাঠগড়ায় টানিয়া আনিয়া দেশের লোকমতের কাছে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা পাইয়া পাইয়া যেন শান্তির অন্বেষণেই মুখ ফিরাইয়াছেন। মহাত্যাগী কর্ম্মী অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন আজ দেবতার মন্দিরে ধ্যানস্থ। জ্ঞানের প্রদীপ অনেক মনস্বীর জলিয়া জলিয়া নিবিয়া গেল,—যে তিমির সেই তিমির।

তাই বলিবার ও করিবার প্রবৃত্তি আজ দৃষ্টিহারা। অন্তর্য্যামী বলিতেছেন

জাতির ভাগ্য দেবতা এ জাতিকে জাগাইবার একটা তৃতীয় পথ রচিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেই পদার্পণ করিয়া ধূলিরাশি ঝড়ের মুখে উড়াইয়া অভিযানে বাহির হইতে হইবে।—সেই ঝটিকার উদ্দাত বেগ যতদিন না হৃদয়ে জমা হয়, ততদিন হৃদয় লইয়াই ভাঙ্গাগড়া চলুক। আপন আপন হৃদ্‌পিণ্ড চিরিয়া আপনিই অনুরাগের হৃদয়রাগ কত ঘন হইয়া উঠিল তাহাই নিরীক্ষণ করিতে থাকি। মানস শতদলকে প্রখর সূর্য্যতাপে মেলিয়া ধরিয়া পূর্ণরূপে ফুটাইবার প্রয়াস পাই। ততদিন স্তম্ভিত হইয়া থাকি।

যাহাই হউক, নিরাশার যত কথাই বলি আমার গোপন বিশ্বাস সত্য হইবেই। ওগো, আজ তাকে লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। বিজয় সজ্জায় সাজাইয়া তাহাকে একদিন প্রকাশ্যে মেলিয়া ধরিবই। আমার গোপন ধন সবার চিরন্তনরূপে দেখা দিবেনই।

—আজিও তিনি চিরন্তন সনাতন। সে ভাবঘন মূর্ত্তি—স্বার্থে—সংস্কারে—কুহকে ধূম্রাবরিত—মেঘের আবরণে বিমল চন্দ্রের মত আপন অমৃত কিরণের অস্ফুট আভাসে আজিও হাসিতেছেন। প্রকাশ হইবেন সেই দিন যে দিন চিত্তের জড়তাময়ী হৃদয়স্তম্ভ ভেদ হইবে। সে দিন বাঙ্গালীর অন্তরপুরুষ নৃসিংহগর্জ্জনে হুকারিয়া উঠিবেন। দৈত্যের নির্ম্মম দম্ভের স্ফীতোদর নখাঘাতে বিদীর্ণ হইবে। আজি সে জগৎজয়ীর মুখসে আবৃত মুখ। কাল দক্ষিণ পবনে সে মুখস খুলিয়া পড়িয়া যাইবে,—দেখিবে সে কীটানুকীট, ক্ষমতাহীন। শিবের সে অশিবরূপ তাও চাই, ওগো তাও চাই।

অঙ্গের পর অঙ্গ খসিয়া গিয়াছে। মর্ম্ম ধসিতেছে।—বাঙ্গালীর মৃত্যুর আর্ত্তনাদ আজিও যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া বীরজাতির বুদ্ধিরাজ্যে বিপ্লব ঘটাইবার আশার ছলনা অন্তর্হিত নহে।—পথনির্দ্দেশক দেবতা হইতে অন্তরালরূপী ধবনিকাখানি পদাঘাতে ফেলিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মণ্যশক্তির তপঃপ্রবৃত্তি উদ্বেলিত হইয়াছে।—ভবিষ্যৎ আশাময়। জাতীয় দেহের অঙ্গে অঙ্গে জীবনাবেগ উল্লসিয়া উঠিবেই। মরণকে জয় করিতে হইবে না। শীতের জীর্ণ পত্রের মত নব যুগের নব বসন্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে বনভূমির মৃত্তিকা অঙ্গে সংলিপ্ত হইয়া যাইবে।

বাঙ্গালীর কবি বিশ্বকবির কথায় ফাগুনকে বনে বনে আবাহন করিতেছেন, —সে গান, বঙ্গলক্ষ্মীর রাজসভারই মহিমাগীতি হউক। বাঙ্গালীর যোগী মহা ঐক্যের মধ্যে সমস্ত জাতিটাকে একটি হৃদয়ের মত তপোবনে আকর্ষণ করিতে সমাধিমগ্ন, সে বঙ্গলক্ষ্মীর বিজয় যাত্রারই মহাহোম। বাঙ্গালীর সন্ন্যাসী বেদান্তের

পাঞ্চজন্য হুঙ্কারে, অস্বাভাবিক সংসারযাত্রার বাহিরে আসিয়া সেবা অধ্যয়নব্রতে স্বাভাবিক বলিষ্ঠ আত্মসত্তা উপলব্ধির উপযোগী প্রতিষ্ঠান রচিয়া গেলেন সেও জাতীয় প্রকৃতি স্বাভাবিক করিবার কর্ম্মশালা—বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ স্বতঃ প্রণোদিত, পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চারিত বিষ জীর্ণ করিয়া রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ব্যাকুলতার অভিব্যক্তির আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—এ সেই জাতীয় আদর্শ পরমেশ্বরভাবেরই মঙ্গল প্রেরণা।

—যে পরমেশ্বর ভাবসমুদ্রের তরঙ্গরূপে এই সকল আজ উঠিতেছে, তাহাই আমাদের National Soul—আত্মাই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, এই এক একটী জীবনধারার মধ্য দিয়া বিরাট অখণ্ড ভাবমূর্ত্তিতে।

এই অখণ্ড প্রকাশ যত শীঘ্র হইয়া উঠিবে আমাদের মুক্তি আমাদের স্বাধীনতা ততই নিকটবর্ত্তী। এই ভাবপ্রবণ জাতি এক নূতন উপায়ে আপনার দুঃখের অবসান করিবে, সে উপায় সংগ্রামের মধ্য দিয়া নয়, সংগ্রাম বিফল করিবার মধ্য দিয়া। বাঙ্গালীর আপন সত্তা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই ভাগ্যপ্রতাড়িত পৃথিবী ঝাঁট দেওয়া যত জঞ্জালরাশি আজ তাহার বক্ষে স্তূপীকৃত। জ্বাল,—হৃদয়ে হৃদয়ে আগুন জ্বালো—তারপর দেখিবে সেই যজ্ঞানল হইতে অগ্নিশুদ্ধ আদর্শ-দেবতা বাহিরে আসিয়াছেন।

সেই দেবতার স্পর্শে নব অভ্যুত্থিত জাতি,—শক্তিতে দুর্জ্জয়, প্রেমে বিজয়ী হইবে। ইহাই প্রত্যক্ষ পথ।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

লীলা।

চন্দননগর হইতে প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস্ কর্ত্তৃক নূতন যুগের যে নব মন্ত্র বহন করিয়া ধারাবাহিক পুস্তকগুলি পরে পরে বাহির হইতেছে, লীলা তাহার অন্যতম। লীলার লেখককে আমরা চিনি — সে কত বিপদে বিপর্য্যয়ে কষ্টে তপস্যায় হাসিখেলায় বুঝি কত যুগ যুগান্ত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া আমাদেরই সঙ্গী। তবু সে লীলায় আত্মগোপন করিয়াছে। কারণ লীলা যে ভগবানের, গান যে বাঁশীর নয়,—বংশীধারীর। প্রবর্ত্তকের লেখক স্বয়ং জগচ্ছক্তি—"লীলা"রও তাই। নব যুগের এ যে যোনিপীঠ, এখানকার সাধকরা যে অনামা।

লীলার প্রথম কথা অখণ্ড ভগবানের স্বরূপ কথন—এমন করিয়া তাঁর পূর্ণ চরিত্র হিন্দু ছাড়া আর কেহ কখন বলে নাই। মুসলমান ও খৃষ্টানের সয়তান আছে, বুদ্ধের মার আছে, এমনি সকল পন্থার যোগবিঘ্নকারী অশিব শক্তি আছে, নাই কেবল হিন্দুর। এমন শিবা অশিবা রূপ এমন ভগবান ও সয়তান তাহাও আমাদের একাধারে অসিধরা বরাভয়করা জগজ্জননী মা। জগতের নিখিল পাপ যে ভগবানের বিশ্বনিয়ন্ত্রণেরই ইঙ্গিত তাঁরই প্রেমের খেলা— এমন দুঃসাহসের কথা হিন্দু ছাড়া আর কে বলিবে বল তো?—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

হিন্দু শাস্ত্রে এও আছে,—আবার আছে শুন :—

"যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিত-চিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥"

ভগবানে ডুবিয়া শিবজ্ঞান লইয়া যোগ বা ভোগ যাহা কর তাহাতেই ভূমানন্দ। লীলার এই কথা। তপোভূমি ভারতে শক্তি হ্রাস করিয়া ভগবান্ জগতে আসুর

বৃত্তির আনন্দ ভোগ করেন, আবার যুগাবসানে সংহৃত শক্তি সম্প্রসারিত করিয়া প্রেমশক্তি আনন্দের নব লীলার মহানাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

'তাই আজ ভারতের মরা প্রাণে পুলক জাগিয়াছে'—আজ ভারতের জাগরণ অমোঘ সত্য। 'ভারতবর্ষের কিছু নাই, সে স্বীয় তপোবলে সমস্তই সৃষ্টি করিয়া লইবে।' 'ভারতের সাধনা দেশগত নহে, জাতিগত নহে—এ সাধনা বিশ্বমানব জাতির কল্যাণ বিধানের জন্য।'

"সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, আবার সত্য; এমনি মুহুর্মুহু পুনরাবর্ত্তন; কলি যুগই প্রকৃষ্ট সাধনার যুগ, কেননা ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের জন্য ভগবান্ এই যুগেই মানুষকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন।" সত্য যুগ দেবতার জাগিবার যুগ। হে বঙ্গবাসী! তোমরা যুগসন্ধিক্ষণে, স্বর্গরাজ্যের দুয়ারে জন্মিয়াছ। বড় ভাগ্যে এ জন্মলাভ, দেখিও যেন ব্যর্থ না হয়।

অন্তর হইতে নূতন করিয়া সমাজ রাজনীতি অর্থ সম্পদ প্রভৃতি সকল অঙ্গ গড়িতে হইবে। এ পুরাতনের বনিয়াদে চুণকাম নহে, এ যে নবসৃষ্টি। আধ্যাত্মযোগ ইহার পন্থা। সব তাঁর লীলা, আমার কিছুই নাই। তাই প্রথম মন্ত্র আত্মসমর্পণ। অহঙ্কার ছাড়িয়া বিশ্ব-বঁধুর লীলার সাথী হও—চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দেখ না তিনি তোমার দৈন্য অশুদ্ধি আপনি কেমন তিল তিল করিয়া বিমল করিয়া আনিতেছেন। তাই সাক্ষী হইয়া দর্শনই অধ্যাত্ম যোগের দ্বিতীয় মন্ত্র। যদি কলুষে কলুষে চিত্ত সমল হইয়া যায়, যোগাসন ছাড়িও না, আপনার ভার আপনি লইও না। বীর সাধক হও, তাঁহার কাজ তাঁহাকে করিতে দাও।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

তাই এ যোগে সাধন ভজন নাই, আছে সব দেওয়া আর চুপ করা। বড় কঠিন যোগ—এর চেয়ে অহঙ্কারের সাধন সহজ। "প্রতি আঘাতে মনে হইবে এইবার বুঝি বিনষ্ট হইলাম, তখন মনে রাখিও, -"মা শুচঃ মা শুচঃ"।"

এই সাধন যদি পার, সমতা আসিবে। তখন বুদ্ধির উপরে বিজ্ঞানে পরম সত্তায় দেবজীবন লাভ করিবে। তৃতীয় মন্ত্র সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন। তিনিই আধার, তিনিই আধেয়—মায়া নাই, লীলা আছে। সর্ব্বকর্ম্ম ও ফলাকাঙ্ক্ষা সমর্পণে জীবাধারের পরিশুদ্ধি—ক্রমশ তচ্চিত্ত তদ্গত দশা; তাহার পর তোমাদের আধারে আধারে পরম জনের লীলা। প্রবর্ত্তকের "লীলা"র এই সাধনের যে কত স্তরের কত কথা আছে তাহা তত্ত্বপিপাসু পড়িয়া দেখিলে বুঝিবেন।

"Know thou the lightning that illumines not, slays"

সাধককবীর পল রিশারের এই অমোঘ বাণী কত সত্য তাহা "গীতা" পড়িয়া বুঝা যায়। আত্মসমর্পণে বিচারশক্তি reason ও স্বাধীন ইচ্ছা will নষ্ট হইবে, এ ত্রিগুণমুগ্ধ পাশ্চাত্যের কথা। যে জ্ঞানে যে জ্যোতিতে প্রকাশ সামর্থ্য নাই, তাহা প্রাণঘাতী; বহির্মুখ জ্ঞান তাহাই। জ্ঞানের উপর শিবজ্ঞান intuition আছে সাধনেও আত্মসমর্পণে তাহা জাগে।

নতুন রূপ-কথা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "নতুন রূপকথা" প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউসের আর একখানি রত্ন। এখানির বাঁধাই বড় সুন্দর, বড় মনোজ্ঞ হয়েছে, মেয়ে শুধু গুণে পার হয় না, রূপও চাই, সুরেশের মানস-কন্যা রূপসী বটে। প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউসের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক, এরা সাহিত্যের মিষ্টান্নবাজারে ভীমনাগ হ'য়ে আমাদের এতদিনের বাসাবাসে শুস-রস জিহ্বায় রস আনুন, স্বাদ জাগান, এই প্রার্থনা।

এ রূপকথার আখ্যানভাগ বেশি নয়, কিন্তু যে ভাব বা ideaটিকে রূপ দেবার জন্যে এই গল্পের অবতারণা, সেই ভাবটি বড় মূর্ত্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আখ্যানভাগটুকু এই, —— রাজার নাম জীবন গুপ্ত,—রাজা তাঁর ধনধান্যে পুণ্যে ভরা সুখের রামরাজ্য। রাজা বসন্তোৎসবে যাবেন,- এ উৎসব বনের মধ্যে মধু ঋতুর সেই হরিত অন্তঃপুরে হয়। রাজা ভোরে বসন্ত এসেছে—"আমের মুকুলের গন্ধ ছোটার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছির দলের ব্যস্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠলো, ঘন পাতার আড়াল থেকে সন্তান কোকিল ডেকে উঠলো, বুলবুল লতার গায়ে দোল খেতে খেতে পিউ পিউ ক'রে গলা সাধতে লাগল, দোয়েল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে নতুন গোল ওঠা ছোকরার মত শিষ দিতে লাগল, শালিখেরা পর্য্যন্ত হলদে ঠোঁট দিয়ে তাদের গিরিমাটির গা ঠোকরাতে ঠোকরাতে মহা আনন্দে তাদের বেসুরো গলায় কিচিরমিচির করতে লাগলো।"

বসন্তোৎসব যাত্রায় রাজ-মিছিল পথে থেমে গেল, সিংহদ্বার দিয়ে এক সুন্দর তেজস্বী সন্ন্যাসী প্রবেশ করে রাজাকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। ইনি মায়াবাদী—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এঁর মূল মন্ত্র। রাজা সন্ন্যাসীকে রাজ-প্রাসাদে দু'দশ দিন অপেক্ষা করে থাকতে বলে বসন্তোৎসবে গেলেন। তাঁর অবর্ত্তমানে

চতুর মন্ত্রী সন্ন্যাসীকে অনাহারে মৃতকল্প করে রাখলো, অপরাধ—সন্ন্যাসী বলেছিল, "আমি সন্ন্যাসী, আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।"

বসন্তোৎসব থেকে ফিরে এসে, রাজা তো সন্ন্যাসীর দুর্দ্দশা দেখে রেগে খুন! আদেশ হ'ল, "রাজ গোশালায় শ্রেষ্ঠ যে গাভী তিনটি রয়েছে, সেই গাভী তিনটি সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত হোক্।" রাজসভায় সন্ন্যাসী ও মন্ত্রীর বিচার ও তর্ক হ'ল, মন্ত্রী মাথা ভরা পাকা চুল হেলিয়ে বল্লেন, "মহাত্মন্ আমি দার্শনিক নহি, সুতরাং যা আমি দর্শন করি তা'কে অদৃশ্য বলে মানতে পারি নে।" বিচারের শেষে সন্ন্যাসী উঠে বল্লেন, "বল একবার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" সমস্ত রাজসভা অভিভূত হয়ে তাই বলল। রাজা আদেশ দিলেন "শিপ্রানদীতীরে সন্ন্যাসীর মঠ হউক, আর ইঁহার পারিতোষিক পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা।"

মঠ হ'লো; ফলে রাজ্যে মায়াবাদ প্রচার হয়ে সবার প্রাণ নিস্তেজ হয়ে পড়লো, জগৎ মিথ্যা বলে দেশে কৃষি বাণিজ্য সাহিত্য শিক্ষা সব শুকিয়ে অমৃত-হীন হ'য়ে গেল। গুপ্তচর মুখে জম্বুদ্বীপের শত্রু রাজা হূনেশ্বর শাকদ্বীপের দুর্ভিক্ষ দুর্দ্দশা অসাড়তার সংবাদ পেয়ে এসে পুরী ও দেশ আক্রমণ করলেন। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; সুতরাং একজনও অসি ধারণ করলো না, রাজ্য শত্রু করগত হ'ল। গুপ্তচর মুখে সন্ন্যাসীর সর্ব্বনাশা মন্ত্রের কথা শুনে হূনেশ্বর সন্ন্যাসীকে ডাকিয়ে বহুমূল্য মণিহার গলায় পরিয়ে দিলেন, বল্লেন, "মহাত্মন্, আমার পিতৃ-পিতামহরা সাতপুরুষ ধরে অস্ত্র দিয়ে যা' করতে পারেন নি, আপনি এক পুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন।" তার পর সেনাপতির ওপর হুকুম হ'ল, "এক মাসের মধ্যে সন্ন্যাসীকে রাজ্যত্যাগ করতে হবে, তার পর এ রাজ্যে এলে তাঁর প্রাণদণ্ড।" এইটুকু নূতন রূপকথার আখ্যানভাগ।

বইখানির ভাষায় বর্ণনাচাতুরী খুব আছে। প্রমথ বাবু ভূমিকায় সত্যই বলেছেন, "সুরেশচন্দ্র সেই সব শব্দ বেশি ব্যবহার করেন, যা' শুনলে আমাদের চখের সুমুখে ছবি ফুটে ওঠে। * * * তাঁর রচনার ভিতর কথা সব ভিড় করে আসে, পরস্পর ঠেলাঠেলি গায়ে গায়ে ঘে ষাঘে ষি করে বসে যায়।"

সুরেশচন্দ্র যে মূল কথাটি বলতে চান, তা' যে এ যুগের বোধন মন্ত্র, এ নবীন রাঙা উষার আগমনী গীতি। লেখক লীলার ঠাকুরের পূজারী, ব্যক্ত তাঁর বৈকুণ্ঠ, তুরীয় তাঁর—মৃদুলকামতরঙ্গমোহন নীলাম্বুধি।

বইখানির মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'একটি রূপক গল্প"। বলবার কথা ঐ একই,—মায়াবাদের যূপকাঠে প্রাণের মনের ও হৃদয়ের নিদারুণ আত্মঘাত। বুড়ো

গৃধ্র এখানে মায়াবাদী, আর ছোট দোয়েল পাখী ঠাকুরের খেলা ঘরের ক্রীড়া-পাগল শিশু। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই তত্ত্ব শিখিয়ে গৃধ্র কেবল দোয়েল নয় তা'র সন্তান সন্ততি পুত্রপৌত্র সকলের জীবনের আনন্দ হরণ করে নিল। শুষ্ক জ্ঞানীর উপদেশ এমনই শ্মশান চুল্লাই বটে,—তাই যখন প্রেমাবতার যীশু বেথ্‌লেহেমে ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীরা (wisemen) তাঁহাকে জেরুজালেমে খুঁজেছিল। পাণ্ডিত্যব্যবসায়ীর এ দুর্গতি চিরদিন—ক্ষীরোদসমুদ্রের কূলে বসে তা'রা পুষ্টি ও তৃষ্ণার জলের জন্য আকাশপানে চেয়ে থাকে।

সধবার একাদশী।

রায় দীনবন্ধু মিত্রের সেই অনুপম প্রহসন—কর মজুমদার এণ্ড কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত "বিশ্বকালীন গ্রন্থরাজী" সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। সুন্দর আর্ট পেপারে, পরিষ্কার ছাপা। মূল্য—১।০ টাকা।

পিতার লেখা পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদন করিয়াছেন। পরিশিষ্টে মুদ্রিত তাঁর "সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" বড় উপভোগ্য। গ্রন্থশেষে ৺ ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের "নিমচাঁদ চরিত্র"ও তেমনি সরস ও নিপুণ। এ অংশটুকু ১৮৭২ খ্রীঃ ২রা আগষ্টের এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত। গ্রন্থখানির ভূমিকা অপূর্ব্ব চরিত্রশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

নারায়ণের সাজি।

James Cousinএর অরবিন্দ প্রসঙ্গ।

[২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২- এর সংখ্যার "The Far East" হইতে]

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে New Ways in English Literature শীর্ষক আমার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মান্দ্রাজে প্রকাশিত হয়। নূতন বই প্রকাশিত হইলে যেমন সকল সংবাদপত্রে সমালোচনার জন্য পাঠান হইয়া থাকে, তেমনি আমার বই খানি ফরাসী ভারতের পণ্ডিচারী সহরের "আর্য্য"কাগজে সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়। (অরবিন্দের) সমালোচনা তাঁহার আর্য্যে সেই সময়েই বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং আজও চলিতেছে। আজ অবধি এই

অপূর্ব্ব সমালোচনার যতখানি ক্রমশঃ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমার সমালোচিত বইএর কয়েক গুণ বড়। ইহার আলোচিত জ্ঞানের তুঙ্গ শিখর অনেক উচ্চে। ভবিষ্যতের কবিতা—"The Future Poetry" শীর্ষক এই সমালোচনা আলোচিত পুস্তকের সকল দীনতা ভরিয়া দিয়াছে; আমার পুস্তকে যাহার মাত্র সূচনা হইয়াছিল, এই সমালোচনায় তাহা সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যে গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার যে গভীরতার মাত্র উপর স্তরটি দিয়া আমার লেখা লীলাপঙ্কে উড়িয়া গিয়াছিল, সে অতলেরও এই আলোচনা তল পাইয়াছে; অরবিন্দের লেখা আমার অনুমানগুলিকে সত্যে পরিণত করিয়াছে, আমার ইঙ্গিতের সব পথটুকু পায়ে মাড়াইয়া সে তীর্থযাত্রাখানি সম্পন্ন করিয়াছে। যাহা এক সময়ে অন্য একখানি গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতে এক দিন একখানি স্বাধীন গ্রন্থে পরিণত হইবে। সে ভবিষ্যৎ গ্রন্থখানি ভাষাসম্পদে ইংরাজি গদ্য সাহিত্যের চূড়ামণিগণের সমতুল্য, কিন্তু তাহার এই অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি বা এই ভাগবত জ্ঞান সচরাচর ইংরাজি সমালোচনা সাহিত্যে কোথায়ও আমি আজও পাই নাই।

আমার এ কথাগুলি স্বার্থসম্বন্ধদুষ্ট নহে; কারণ অরবিন্দের লেখায় আমার বইখানির নামোল্লেখ মাত্র প্রথম অনুচ্ছেদেই (paragraph) শেষ হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বইখানি এই শুক্তির বুকে ভবিষ্যৎ মুক্তার জননীরূপী বালুর কণাটুকু, এ রুদ্ধ উৎসের মুখে যেন আবরণের উপলটুকু,—এ যে সেই তুচ্ছ বস্তু যাহা পরম ধনের দুয়ার খুলিয়া দেয়। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতের প্রতিভার গুপ্ত মন্দিরখানি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছে। যে নবসৃষ্টির প্রতিভা ও তত্ত্বমর্ম্মোদ্ঘাটিনী কল্পনা শক্তি অতীত যুগে দর্শনের মূল তত্ত্বকথায় অপূর্ব্ব মহাভাষ্যের রচনা করিয়াছে, এবং কেবল ভারতের নহে, পরন্তু চীন জাপানেরও নানামুখী সভ্যতা, সাধনা, সাহিত্য ও কলার সৃষ্টি করিয়াছে, এই ঘটনায় আমি সেই শক্তির প্রকট খেলা দেখিয়াছি। আর ইহাতে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের সেই অনন্ত প্রসার ও বিভূতির আংশিক সাক্ষাৎ পাইয়াছি, যে বিভূতি, সম্পদ ও বিস্তৃতি ইংরাজি সাহিত্যে পড়িতে গিয়া এই প্রতিভার ঋষিপ্রেরণা জগতের মনোরাজ্যের এক একচ্ছত্র ভাগবত সাম্রাজ্য রচিয়া দিবে। প্রাচ্যের সাধনায় প্রতীচ্যের জয় যে অনিবার্য্য তাহা রবীন্দ্রের যশে, সরোজিনীর মধুময় ভাব প্রচারে (Lyrical influence), গত বৎসরে তরুণ কবি হরীন্দ্রের (Harindra Nath Chattopadhyaya) ইংরাজী কবিতার শ্রেষ্ঠ ভাবগিরিশিরে এমন সহজ নিত্য বিচরণে সূচিত করিয়াছে।

"আর্য্যে" আমার পুস্তকের এই অনুপম সমালোচকও এই বিশ্বসাহিত্যিক মণ্ডলের ঋষি। গীতিকবিতায় রবীন্দ্র প্রভৃতির সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার সমগ্র প্রতিভায় তিনি ইঁহাদের সকলের বহু উচ্চে আসীন কারণ কবিপ্রতিভার সহিত তাঁহার আরও আছে বিরাট (cyclopaedic) সাহিত্য ও দর্শন জ্ঞান, জীবন্ত ভাস্বর ভাষা এবং পারমার্থিক শিবদৃষ্টি। এই শেষোক্ত গুণে জগতের মন্ত্রদ্রষ্টাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান।

যাঁহার কথা বলিতেছি সেই অরবিন্দ ঘোষ জন্মে বাঙ্গালী, যৌবনের পাঠ্যজীবনে Stephen Philips-এর সহচর এবং অধুনা পণ্ডিচারীতে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত। যে ঘটনায় তাঁহার দেশত্যাগ, তাহা সৌভাগ্যক্রমে আজ অতীত ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠা বই আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রধানতঃ সাধনার জন্য অন্তরে দেবতার ডাকই তাঁহাকে দেশত্যাগ করাইয়াছে। এইটিই তো হিন্দুর চিরন্তন রীতি। তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, কিন্তু সে সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্ লোকে বলেন যে অসাধারণ গুণে গুণী এই মহাজনের চক্ষে অন্তর্জগৎ নিত্য দীপ্যমান, তাঁহার চরিত্রে অপূর্ব্ব সমতা ও মাধুরীর সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, এবং নিজের সাধনলব্ধ শিবজ্ঞান তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে সকলকে দিতে সদা উন্মুখ।

দর্শনের যে মূলতত্ত্বগুলির দিকে ইউরোপীয় দর্শন বহু আয়াসে শনৈঃ শনৈঃ যাইতেছে, অরবিন্দের "আর্য্য" পত্রিকায় সে গুলির পূর্ণ নির্দ্দেশ আমরা পাই। সাপেক্ষিক জগতের যে তত্ত্ব ইন্‌ষ্টিন্ (Ainstein) আবিষ্কার করিবার পর দুই দশ দিনের সখের মজলিসে নাড়াচাড়া পাইয়া বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল, ভারতের এই মন্ত্রদ্রষ্টা দার্শনিক কবির কাছে সে তত্ত্ব জীবনের রস স্বরূপ; শুধু বিচারের বস্তু নহে,—পরন্তু জ্ঞানের ধন, শুধু মন্তব্যের বস্তু নহে—কিন্তু জীবনে রূপান্তরিত করিবার সামগ্রী। ঘোষ মহাশয়ের কাছে সাপেক্ষ জগৎ এত সত্য বলিয়া সে জগতের ভিত্তিস্বরূপ সেই নিরপেক্ষ, নিত্যসম্পদ এত অধিক জীবন্ত সত্য।

তাঁহার চক্ষে ভগবান্ একটি মতবাদ মাত্র নহেন, তিনি সজীব ও আত্মময় অপরোক্ষানুভূতির যত উপায় ও পন্থার কথাই তাঁহার লেখায় আপূর্য্যমান সমুদ্রবৎ রহিয়াছে। * * *

* * * * তাঁহার কবিতায় আছে,—"সব সঙ্গীত যে তার হাসির ধ্বনি, সব রূপমাধুরী যে তার মত্ত আনন্দের স্মিত হাসি। আমাদের জীবন তার হৃদয়-

স্পন্দন, আমাদের সুখতরঙ্গ রাধাকৃষ্ণের রাস-মিলন, আমাদের প্রেম তার চুম্বন।"* এই কবি পুরাতন তত্ত্বগুলিকে সম্প্রদায়ের অন্তঃপুর হইতে আনিয়া ইংরাজী সাহিত্যের জীবনপথে আজ রাখিয়া দিয়াছেন।

* * *

পারস্যের বাহাই ধর্ম্মে নারীর স্থান।

[১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২০সালেরে সংখ্যার "The Far East হইতে"]

বাহাউল্লা (Baha'ullah) বলেন, "পরিবারের ছেলে ও মেয়ে একই শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে। কারণ শিক্ষার একতায় একপ্রাণতা আসে।"

"কি ধাতব, কি উদ্ভিদ, কি পশু জগতে নারী ও পুরুষ জীবন. ধারণের সকল উপকরণ সমভাবে ভোগ করিতেছে। মানব জগতে কেন তাহার বিপরীত হইবে? ভগবানের চক্ষে তাহারা সমান, কারণ তিনি তুল্য করিয়াই দু'জনকে গড়িয়াছেন। জীবনের হাত হইতে সকল অমৃত ফলগুলি লইতে নারী কেন পাইবে না? যে যত সমগ্র অখণ্ড মানবজাতির সেবা করে সে ততই ভগবানের সন্নিহিত, কারণ পুরুষ বা নারী বলিয়া তাঁহার কাছে কোন পক্ষপাতিতা নাই।

"নারী ও পুরুষ পৃথ্বীর দুইটি পাখা, সুতরাং সেই যুগল ডানায় যদি একই ইচ্ছার প্রেরণা পায়, তবেই তাহা মানব জাতিকে উন্নতির স্বর্গ-পথে লইয়া যাইতে পারে।

"শিশুর শিক্ষা বাধ্যতামূলক হউক। যদি কোন পরিবারের অর্থের অনটন ঘটে, তাহা হইলে যাহা আছে তাহা দিয়া মেয়েকেই আগে শিক্ষা দিয়া গড়িতে হইবে, কারণ মেয়ের মধ্যেই শিশুর মা সুপ্ত আছে। দৈব ঘটনায় শিশু যদি পিতৃ-মাতৃহীন হয়, তাহা হইলে সমাজ তাহার শিক্ষার ভার স্বয়ং লইবেন।

"পূর্ব্বে নারীর শিক্ষা অনাবশ্যক ছিল, কারণ নারী ছিল পরিবারের দাসী। কিন্তু যথার্থতঃ নারীর শিক্ষা পুরুষের অপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়। মা যদি অজ্ঞান হয়, আর পিতা হয় জ্ঞানের আধার, তাহা হইলে শিশুর শিক্ষা অঙ্গহীন

* All music is only the sound of His laughter,
All beauty the smile of His passionate bliss.
Our lives are His heart-beats, our rapture the bridal
Of Radha and Krishna, our love is Their kiss.

হইবে, কারণ মায়ের দুধের সহিত শিশুর জ্ঞানের আরম্ভ। মায়ের বুকে ঐ শিশু যে ভবিষ্যৎ বৃক্ষের কোমল তনু বা কাণ্ডটি।

"মায়ের শিক্ষা সর্বাঙ্গ সুন্দর হইলে শিশুর জীবনপথ সবল হইবে, আর তাহা অসম্পূর্ণ হইলে সে কোমল জীবনে অঙ্কিত অসম্পূর্ণ শিক্ষার সে বিকৃত চিহ্ন আর ইহ জীবনে মুছিবে না। এই জন্য এ কথা বার বার এত পরিষ্কার করিয়া বলা আছে যে পরিবারের কন্যা অশিক্ষিতা ও বিকৃত গঠনে গঠিতা হইলে, মা হইয়া বসিবার সময়ে সে কন্যা অনেক সন্ততির অজ্ঞান, অধঃ, অগঠন ও হীনতার কারণ হইবে।

"অগ্রসর হইয়া জগতে নীতির প্রচার করাই আজ নারীর অতিবড় কর্ত্তব্য, অধিকন্তু বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষার বল যে তাহাদের আছে এবং তাহারা যে জীবনের সকল পথে পুরুষের সমতুল্য, ইহা নারীদিগকেই জগতে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। বাহাই নারী যে নৈতিক জীবনে, সকল গুণগ্রামে শুদ্ধতায় ও পুণ্যে পুরুষের নিকৃষ্ট নহে, ইহা নারীরই সর্ব্বাগ্রে দেখান দরকার।

"নারীর ইচ্ছা শক্তি পুরুষের শক্তির তুলনায় অনেক বড়। নৈতিক বিবেক ও অপরোক্ষানুভূতিতেও নারী শ্রেষ্ঠ।

"জ্ঞানে ও ধর্ম্মে তোমার সহধর্ম্মিণীই খুঁজিয়া লইও। সে যেন পূর্ণভাব পথের পথিক হয়। তোমার জীবনের সকল গুলি ধারা সে যেন বোধে এবং আপনার বুকে খুঁজিয়া পায়। তাহার জীবনকে যেন দয়া সহানুভূতি প্রসন্নতা ও তুষ্টি উজ্জ্বল করিয়া রাখে। তুমিও তাহার জীবনে সুখ আনিতে উৎসর্গিত-জীবন হইবে এবং ভগবৎ প্রেমে তাহার প্রণয়ী হইবে। স্ত্রীপুরুষের বন্ধনে ভগবান যে মহামিলন যে সামঞ্জস্য নিহিত রাখিয়াছেন, সৃষ্টির কোন স্তরে তাহার বড় সামঞ্জস্য মানবের কল্পনারও অতীত। ভগবান্ তোমাদের যদি সন্তান দেন তাহাদেরও এ আনন্দ পুরীর মধুগর্ভ পুষ্প করিয়া ফুটাইয়া তুলিও।

ব্যবসার মূল নীতি।

. "Keep accurate and conscientious accounts, conduct business economically, do not loaf, do not steal; maintain strict discipline at work."

সোভিয়েট তন্ত্রের কথা আমাদের কথা নয়, এটা য়ুরোপের একটা কালাপাহাড়ী কাণ্ড,—পুরাণ যা কিছু খুব খানিকটা ভাঙ্গিয়া নূতন কিছু টেঁকসই জিনিস খুব

খানিকটা গড়িবার ইচ্ছার এদেব জন্ম। এক গুলির আড্ডায় একজন ইট-পাওয়া মানী লোক বলিয়াছিল,"আর ভাবনা নাই, এবার যা কল বেরিয়েছে। এ ধার দিয়ে গাছ কতক আখ আর ওধার দিয়ে একটা আস্ত বাছুর পুরে দাও, আর হুড়-হুড় করে থালা থালা সন্দেশ বেরিয়ে আসবে।"—এই সোভিয়েটও কতকটা সেই গন্ধে জগৎ উদ্ধার কখন হয় নাই, হইবেও না। ইহারা নূতন একটি যন্ত্র গড়িয়া রকম জিনিস। যন্ত্র মানুষকে সেই যন্ত্রের মাপে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়। আত্মার সন্ধান ইহারা তেমন রাখে না, অথচ সেই অন্তর্নিহিত আত্মাই পরশমণি। কিন্তু উপরের কথা কয়টি তাহাদের কাছ হইতে বাঙ্গালীর শিখিবার আছে। বাঙ্গালীর গোঁ এখন মুদীর দোকানমুখো, বাণিজ্যে যে লক্ষ্মীর বাস সেই চঞ্চলা লক্ষ্মীর উপাসনায় তরুণ বাঙ্গালা এখন উন্মুখ। যদি ঐ পাঁচটি মন্ত্রে বাঙ্গালী অবিলম্বে সিদ্ধ না হয়; তাহা হইলে যে ছোট বড় দল বাঁধিয়া বাঙ্গালী এখন যে যে ব্যবসায়ে নামিয়াছে ও নামিতেছে, তা'র অনেকগুলি অচিরে মরিতে বসিবে। প্রথমতঃ হিসাব রাখিতে হইবে একেবারে নিভূ'ল ও ধম্মত. খাঁটি; খুব নিরীহ তুচ্ছ মিথ্যাচার গুলি একবার অভ্যাস আরম্ভ হইলে তাহা যে কোথায় গিয়া অস্তিমে দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন।

যেমন ব্যবসা করিতে বসিয়া দিনে, দু'ধার দোকানের বা কারবারের খাতিরে ট্রামে উঠিলে, হয়তো একবার গেলে নিজের কাজে, কিন্তু হিসাবে লিখিবার বেলায় তিনটা ট্রাম ভাড়াই দোকানের নামে লিখিলে। অফিসের এনভেলাপ পোষ্টকার্ড, তাহাই হয়ত আপন ঘরের কাজে চলিতেছে। যে খরচ দোকানের নামে দেখান যায় না, তাহা বাজে খরচ বলিয়া দোকানের খাতায়ই দেখান হইলো। এই অভ্যাসগুলি "little rift within the lute that slowly widening makes the music mute."

দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ে যাহা কিছুই করা যায় মিতব্যয়ী হইয়া করা উচিত। কোথায়ও কারবারের কাজে যাইব, মটর ট্যাক্সি বা গাড়ী করিয়া গেলাম, অথচ ট্রামে হইলেও চলিত। ব্যবসা যতক্ষণ না দাঁড়ায়, পায়ে হাঁটিয়া কাজ করা উচিত। একটু মাল তুলিতে মুটে ডাকা, দুইটা চিঠি রোজ ডাকে দিতে দরোয়ান রাখা, এই অভ্যাসগুলি ছোট হইলেও অন্তিমে অল্প মূলধনের ব্যবসায়ের মৃত্যুর কারণ হয়।

তৃতীয়তঃ কখন বেকার বসিয়া থাকিও না; এই নিয়ম বড়ই দরকার। বাঙ্গালী বড় সৌখিন ও আরামপ্রয়াসী, একবার বিশ্রাম করিতে শিখিলে বসিতে গিয়া শুইয়া পড়িলে ব্রহ্মানন্দ পায়। আলস্য আমাদের পক্ষে জলের বায়ার মত,

নিম্ন ভূমি পাইলে আর রক্ষা নাই, গড়াইয়া গিয়া কখন যে সব ডুবাইয়া রাখিবে তাহা ধরা যায় না।

চুরি করিও না; ইহার দৃষ্টান্ত আর প্রথমটির দৃষ্টান্ত প্রায় এক। খাঁটি সততাই ব্যবসার প্রাণ, ছিচকে হউক বড় হউক—চোর কখন ব্যবসায়ী হইতে পারে না। যদি বা লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কেহ কখন বড় লোক হয়, তাহা বৈশ্যধর্ম্ম নয়, তাহা জুয়াচুরি। ব্যবসার বাজারে পরস্বাপহারী অনেক আছে, খাঁটি ব্যবসায়ী আছে দুই চার জন।

আর পঞ্চম মন্ত্র এই, যে, বাঁধাধরা নিয়মগুলির পালনে শৈথিল্য করিবে না। যার যেটি কাজ, যে বিধি ব্যবস্থা কারবারের সুবিধা নিমিত্ত, সেগুলি মরণ পণ করিয়া অনলসভাবে পালন করিতে হয়। নিয়মের বাঁধন কাঁচা কাজের বেড়া, বাণিজ্যের আত্মরক্ষার দৃঢ় দুর্গ। নিয়মের বন্ধনী শিথিল হইলে ব্যবসা বাঁচে না, লক্ষ্মীর ঘরে অলক্ষ্মীর বাথান হয়।

* উপরি উক্ত পংক্তি কয়টি প্রতি ব্যবসায়ী স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করাইয়া শিয়রে ও কর্ম্মস্থলে চক্ষের সম্মুখে টাঙ্গাইয়া রাখিবেন।

নারায়ণের হরকরা

বঙ্গদেশে জলকষ্ট

"যশোহরে" প্রকাশ—পাঁচবেড়িয়া, মানিকপোল, মঙ্গলকোট, হদ, বিনোদপুর ও পাঁজিয়া গ্রামে বড় জলকষ্ট, অধিকাংশ স্থানে পুষ্করিণী নাই, দুই এক স্থানে যে জলাশয় আছে, তাহা পঙ্কে শৈবালে দুষ্ট। ফলে ম্যালেরিয়া কলেরা আমাশয় ও জ্বরে গ্রামবাসীরা প্রায় উৎসন্ন হইতে চলিল। মঙ্গলকোটে ৫ হাজার লোকের বসতি, কিন্তু পেয় জলের উপযুক্ত পুষ্করিণী একটিও নাই।" কি ভীষণ তামসিক জড়তায় এ দেশের মনুষ্যত্ব পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, ইহার অপেক্ষা তাহার আর কি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইতে পারে? গ্রামবাসীরা একজোট হইয়া সপ্তাহে এক দিন করিয়া পরিশ্রম করিলে যে অচিরে প্রকাণ্ড দীর্ঘী খনন করিতে পারে। এ সেই দেশ যেখানে মানুষ নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘরে বসিয়া মরিবে, কিন্তু প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কুটাটি তুলিয়া স্থানান্তরে রাখিবে না। তবু আমরা আক্ষেপ করি আমরা "নিষ্কবাস

ভূমে পরবাসী” হইয়া আছি ; নিজের গ্রামের প্রতি যাহাদের এইরূপ মমতা, এত বড় দেশের দুঃখ তাহারা কি বুঝিবে ?

“কল্যাণী” নড়াইলের অবস্থার কথায় বলিতেছেন, “উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে অনেক বোনা জমির অবস্থাও শোচনীয়। আকাশে জল নাই—চাষার বুক শুকাইয়েছে।”

ফরিদপুরে পাংশা, বাগনারা, সমসপুর, জিওলগাড়া, চড়পড়া প্রভৃতি গ্রামের ঠিক ঐরূপ মর্ম্মন্তুদ চিত্র সহযোগী বাহিত দিতেছেন। “বৃষ্টি মাত্র নাই। প্রচণ্ড আতপ তাপে কূপ ও ডোবা গর্ত্তগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। এ দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত দরিদ্র ধনী সমান কথা। যে একটু শিক্ষা ও কর্ম্মস্পৃহা আমাদের আছে, তাহা বক্তৃতা ও মালা গুডানয় নিঃশেষ হয়। মানুষের মধ্যে প্রাণ ও ওজঃ মরিয়া গিয়াছে, কারণ তিলক, কণ্ঠি, গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, পূজা পার্ব্বণ সত্ত্বেও এ দেশ আত্মধনে বঞ্চিত—agodless country ; পরমার্থ সম্পদ বিনা চরিত্র ও মনোবল হয় না ,—মানুষ আর দেশে নাই, তাই বলি নূতন করিয়া মানুষ গড়িতে হইবে। সমাজের লোহার শিকল বাহিয়া বহিয়া, অপধর্ম্মের আচার আড়ম্বরের ভণ্ডামী করিয়া করিয়া সব মনুষ্যত্বটুকুই গেল ,—দেশ কবে বুঝিবে যে, কপটতা পশুধর্ম্মী—তাহা আপন দেহ খানিই চাটিয়া চুটিয়া পবিচ্ছন্ন করিতে ব্যস্ত, অন্তরশুদ্ধির কথা পশু আদৌ জানে না ?

শিক্ষার কথা।

২৩শে বৈশাখের বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশ ;—

“বরিশালে নারী শিক্ষার দুর্গতি ;—বরিশাল জিলায় গ্রামে ও সহরে বালকদের শিক্ষার জন্য ন্যূনকল্পে ৪০টা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বরিশাল সহরে জিলাস্কুল, বি, এম স্কুল, আসমতালী খাঁ স্কুল, টাউন স্কুল এবং কালীশচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল এই কয়েকটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দুঃখের বিষয় এই জিলার কোনস্থলে এ যাবৎ বালিকাদের শিক্ষার্থ একটীও উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নাই।

বরিশাল জিলার শিক্ষার অবস্থা দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট বলিতে পারা যায় যে, বরিশালের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ কথঞ্চিৎ উৎসাহী হইলে এই নগরে এক্ষণে একটী উৎকৃষ্ট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় চলিতে পারে।

বরিশাল সহরে এক্ষণে যে বালিকা বিদ্যালয় আছে, উহাতে ২৫০ জন বালিকা পাঠ করিতেছে, এই বিদ্যালয়ে এখন চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হয়। আর তিনটী ক্লাস খুলিলেই এই বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। এই বিদ্যালয়ের বাটী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ বাটীতে অধুনা যে দুই খানি ঘর আছে, উহা বর্দ্ধিত করিলেই অল্প ব্যয়ে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত এককালীন ১০ হাজার টাকার দরকার। জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্ট এই অর্থ অনায়াসে দিতে পারেন।"

ঐ ছোট মেয়েদের কোলে ভবিষ্যতের বাঙ্গালী জাতির একদিন জন্ম হইবে, এবং ঐ গৌরীরূপের মাতৃদুগ্ধের সহিত নব যুগভাব জাতির অস্থিমজ্জাগত হইবে। আমরা বহুসংখ্যক নিষ্কাম মাতৃহিতব্রতী তরুণ দেবতা চাই, তাঁহারা জনে জনে গিয়া গ্রামে গ্রামে বসিয়া এই ক্ষুদে ক্ষুদে মায়েদের শিক্ষার মধুচক্র রচনা করুন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত কাজ থাকিতেও ছেলেরা কাজ কাজ করিয়া পাগল হয়। যাহারা খুব জাঁক জমকের ও চটকদার কাজ চায়, একদিনে জগৎ জোড়া নাম চায়, হৈ হৈ রৈ রৈ রব চায়, তাহারা নিষ্কাম দেশপ্রেমিক কর্ম্মী নহে, তাহারা উৎকট ভোগী।

রাজবন্দীর মুক্তি।

আমরা আসিয়া অবধি সুরেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশনেতাগণের সাহায্যে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দিগণের মুক্তির জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকবার প্রার্থনা জানাই। গভর্ণমেণ্ট আশা দিয়াছিলেন ৬ মাসের মধ্যে সকলে মুক্ত হইবে। সেই আশ্বাসবাণী এতদিনে সত্য হইতে চলিল। আন্দামান হইতে অধ্যাপক পরমানন্দ, লাল সিং, বিরণ সিং প্রভৃতি ১৫ জন লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রাজবন্দী মুক্ত হইয়াছেন। এখন সত্যরঞ্জন, সানুকূল, ফণীন্দ্র, নরেন্দ্র প্রভৃতি ১৩ জন বাঙ্গালা মুক্ত হইলেই হয়। দশ জনের অচিরে মুক্ত হইবার আশা আছে। সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, সুরেন্দ্র রায়, খগেন্দ্রনাথ, নিখিল রঞ্জন গুহ রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র, বামন যোশী প্রভৃতি যে নয় জন রাজবন্দী এক বা দেড় বৎসর হইল আন্দামান হইতে বদলী হইয়া ভারতের নানা জেলে প্রেরিত হন তাঁহারা এখনও কারাগারে। গভর্ণমেণ্ট সম্রাটের ঘোষণানুযায়ী সকলকে মুক্ত করুন। কেহ যাহাতে রাজনীতিক বিদ্রোহের পথে আর না যায়, সে ভার আমরা সানন্দে মাথায় লইব।

পাবনায় সৎসঙ্গীর মধুচক্র।

এটি ভারতের সমন্বয়ের যুগ ; শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের প্রাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ও প্রতীচ্যের দেওয়া কর্ম্মপ্রেরণা সবগুলি মিলিয়া এযুগে এক আধারে রূপ লইবে। অতগুলি যুগের ভাবনদীর সঙ্গমতীর্থ এই পুণ্যক্ষণে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের জীবন শুধু নিজের নয়, এই মহামিলনের দেবতার পায়ে যে সব জীবনই অঞ্জলি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এ যুগে যে নিজের জন্য বাঁচিবে, সে সবার অধিক বঞ্চিত হইবে ; যে পরের জন্য সব দিবে, সেই প্রাণ ভরিয়া সব পাইবে। এমন দেওয়া ও পাওয়া ত্যাগ ও ভোগের মধুময় গঙ্গা-যমনা-সঙ্গম আর কখন হয় নাই। এ তীর্থে মরিয়াও সুখ, বাঁচিয়া তো সম্পদের, বিভূতির শেষ নাই।

ইউরোপ ভোগভূমি, তাই সে দেশের লোক ঐহিক সুখের কামুক ও কর্ম্মী। এসিয়া তপোভূমি, তাহার মধ্যে ভারত যোগভূমি, তাই এদেশের লোক ইহামূত্র বিমুখ উদাসী ভগবৎ প্রেমিক। ইউরোপের সুখকামী সভ্যতা স্বার্থের – মানুষের ঐহিক দাবী দাওয়ার উপর গড়া. তাহার ফলে ওসব দেশে এত অশান্তি অসুখ, এত ধনের বৈষম্য, স্বার্থের বিরোধ, এত লোভ কাম দম্ভ প্রভৃতি রিপুর উন্মাদ নৃত্য। তাই সে দেশে সমাজের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় সোশিয়ালিষ্ট কমিউনিষ্টরা জন্মিয়া বলিতেছে—"সব ভাঙ্গিয়া মাটিসই করিয়া দাও, নারী-পুরুষকে সমান কর, কাহারও আপনার বলিবার কিছু রাখিও না।" আমাদের সেই বনমুখো সন্ন্যাসের ফলে ভারতের শোচনীয় দশাও চক্ষে দেখিতেছি। আমরা ভগবানের লীলারূপ এই মর্ত্ত সংসার ফেলিয়া দিয়া ভগবানকে খুঁজিয়াছিলাম, তাই ভগবান্‌ও পাই নাই, আপনার যাহা কিছু তাহাও সব হারাইয়াছি। তবে সত্য কোথায় ? পূর্ণ সত্য এই দুইএতেই আছে। ইউরোপের বাণী আর এসিয়ার জীবনের বাণী, দুইই আংশিক সত্য, কিন্তু এই দুইএর মিলনই পূর্ণ সত্য।

> সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
> বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।

এই পূর্ণ সত্য ভারত জানিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ইহা একবার কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলিয়া গিয়াছেন ; কখন অহিংসায়, কখন ত্যাগমন্ত্রে, কখন বা নদে টলমল প্রেমের বানে আংশিক ভাবে এই সত্যের সাধনা হইতে হইতে যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়া আজ ভারতের সাধনা বুঝি পূর্ণ হইতে চলিল, তাই আজ পূর্ণ

ভোগের মণিরত্নভূষা ভারতের সন্ন্যাসের আসনে বসিবে, আদর্শ পূর্ণরূপে ষোলকলায় জগৎপ্লাবী মধুজ্যোৎস্নায় অপূর্ব্ব কোজাগরী পূর্ণিমার রচনা করিবে।

এই প্রয়াস তাহারই সূচনা। এই কর্ম্মীর দল দশের সেবার বৈরাগীর ঝোলা কাঁধে লইয়া ক্ষেত্র রচনার জন্য বাহির হইয়াছেন। স্বদেশবাসী ইহাঁদের বাণী একবার অবহিত হইয়া শোন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—এ যে সেই কথা, সেই যোগ, সেই কর্ম্মে প্রেমে জ্ঞানে তপঃক্ষেত্রের রচনার প্রয়াস। ইহাঁরা ব্যবসা করিবেন, দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীর অর্থ শোষণ করিয়া দশ বিশ জন অংশীদারের ধন বৃদ্ধির জন্য নয়, কৃষক শ্রমজীবী ও অংশীদার এই তিনের সমান সুখের জন্য। এ ব্যবসায়ে দালাল নাই, সুদখোর মহাজন নাই, স্বার্থের চাকুরীজীবী নাই, সব আনন্দময়ের সন্তানের দল, সব দিয়া সব লুটিয়া লইতে ইহাঁরা বাহির হইয়াছেন। যে ঢালিয়া দিতে জানে, তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়, পাওয়া ও দেওয়া কোন সুখই সেখানে ফুরাইতে জানে না।

ইংরাজী আদর্শে ব্যবসা Capitalismএর বিষতরু; ইহার ফলে চতুর ব্যবসায়ী দালাল সুদখোর মহাজন ও চাকুরীজীবী জুটিয়া লক্ষ জনের অর্থ ছলে বলে শোষণ করিয়া আপন আপন বিলাস বিভব বাড়ায়। সে আদর্শ প্রতীচ্যেই মরিতে বসিয়াছে, এখানে তাহার নকল করা বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে দেশের অন্ন সমস্যা ঘুচিবে না,—ধনবৈষম্য আরও শোচনীয় হইয়া অন্নাভাব ঘটাইবে। ফলে বল্‌সেভিজমের বিদ্রোহ এ সোনার দেশেও আসিবে। এই কর্ম্মীদল তাই কৃষক ও শ্রমজীবীকে পেট ভরিয়া খাইতে দিয়া সুখে সচ্ছন্দে রাখিয়া তাহাদেরই বিক্রেতা হইয়াপণ্য বিক্রয় করিবেন, ছোট ছোট শিল্পের (Cottage industry) মধ্য দিয়া এই বৈশ্য ধর্ম্মের মধুচক্র গড়িয়া উঠিবে। এই হইল ইহাঁদের সেবার দিক, কর্ম্মের চক্র।

আর এক দিক আছে। তাহা করিতে পারিলে আরও মহান্, এ পতিত জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য আরও বল ও মুক্তিপ্রদ। ঐ যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কর্ম্ম ও জ্ঞান, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়ের যুগমন্ত্র বলিয়াছি, ঐ সমন্বয়-ধর্ম্মের সকল দিক সকল অঙ্গগুলি ছবির মত স্পষ্ট করিয়া জগতের সম্মুখে ধরা,—এই ইহাঁদের দ্বিতীয় কথা। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন,—ভারতকে জগতের ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া দিতে হইবে। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক বৈষ্ণব যুগের ভাবসম্পদ ইউরোপকে দিয়া নিজেদের পূর্ণভাবে পাইবার সময় আসিয়াছে। ইউরোপও আজ লইবার জন্য উন্মুখ, প্রাচ্যের ভাবে তাহারা

আজ অনেকটা অনুপ্রাণিত। এই কর্ম্মীদল এক চিত্রালয় গড়িবেন, একজন ভাবুক তপস্বী প্রতিভাশালী চিত্রকরকে রথী করিয়া ইহাঁরা বৌদ্ধ জাতকাদি হইতে, বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ হইতে এবং তন্ত্রের গোপন সাধনতত্ত্ব ও তত্ত্বানুগোপযোগী রূপগুলি চিত্রে film এ ফুটাইয়া জগতে প্রচার করিবেন।

তপোবন রচিয়া এই তত্ত্বের সাধনার দিকও ইহাঁদের আছে। নবযুগের নবমন্ত্রকে রূপ দিতে হইলে, শুধু ভাব প্রচারে হইবে না; ঋষি চাই, সেই মন্ত্রের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা নরকলেবরধারী বিগ্রহ চাই। তপোবনে তাহাই গড়িবার কথা। এত দিনের পরাধীনতায় আমারা সবার অধিক হারাইয়াছি চরিত্র-বল; সংযম ত্যাগ নিষ্ঠা প্রেম ও কর্ম্মৈষণা একাধারে এদেশে মিলে না। তাই তো আমাদের এত দুঃখ; যাহা গড়িতে যাই আত্মকলহে, প্রতারণায়, স্বার্থান্বেষণে তাহা দুই দিনে ধূলা হইয়া ধূলায় মিশিয়া যায়। এক রকম একতা আছে, যাহা স্বার্থের একতা,—ক্ষুধার তাড়নায় একতা। একদল নেকড়ে বাঘ এই একতার বশে দলে দলে শিকার ধরিতে ছোটে; আক্রমণও একযোগে করে, কিন্তু পাইলে কাড়া কাড়ি করিয়া যে যত পায়, খায়। আর এক একতা আছে—প্রেমের অভিন্ন-হৃদয়তার একতা; তাহা পশুতে সম্ভব নয়,—দেবতায় সম্ভব। মানুষের মধ্যে পশুকে জয় করিয়া দেবতা জাগাইতে পারিলে, এই পথে সব দিয়া সব পাইবার একতা সম্ভবে। তপোবন রচিয়া রচিয়া পরম ধন বিলাইয়া ইহাঁরা দেবতা গড়িবেন।

এই বঙ্গের নূতন নিঃস্বার্থ ব্যবসায়ের মধুচক্রে, এই অনুপম ভাব-গঙ্গার আনয়নে এবং এই দেবজাতি গঠনে বঙ্গবাসী সহায় হউন। যাঁহার বিশ্বাস নাই, এই সৎসঙ্গীর দলে তাঁহাদের আনন্দালয়ে দুই দিন বসিলে, সব সংশয় দূর হইবে। এরূপ একটি যজ্ঞের উদ্‌যাপনে অর্থবল লোকবল চরিত্রবল ও জ্ঞানবল কত যে চাই, তাহার পরিমাণ হয় না। সব মহাপ্রাণ প্রেমের গড়া হৃদয়গুলি একত্র না হইলে, সে মধুচক্র গড়িয়া উঠিবে না

* * * * * * গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

সামাজিকত্ব ও জীবত্ব।

[শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শিশুরাই যেমন মাতার শোণিত পান করিয়া পুষ্ট হয়, তুমিও তেমনি আমার এই দেহ রস পান করিয়া পুষ্ট হইতে চাহ। আমার এই দেহও তোমার দেহ-রস পান করিয়া পুষ্ট হইতে চাহে। এই জন্যই আমরা এক হইয়াও, অভিন্ন হইয়াও, মূলতঃ অভেদ হইয়াও, পরস্পরের বিরোধী, পরস্পরের শত্রু।

এই শত্রুতা স্বাভাবিক বলিয়াই তোমার-আমার মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য্য এই সংগ্রামে যাহার জয়, তাহার স্থিতি, যাহার পরাজয়, তাহারই লোপ। এই সংগ্রামের পারিভাষিক নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, ইহা হইতেই অভি-ব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ। ইহারই লৌকিক নাম—"ঈর্ষা, ঘৃণা, কপটতা, ক্রোধ, হিংসা, রক্তপাত।" আবার "ইহা হইতেই স্নেহ, মায়া, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম।"

ঈর্ষা প্রভৃতি হইতে কেমন করিয়া স্নেহ প্রভৃতির উদ্ভব হইল, তাহা ভাবিতেছ? জগতের যে যে খণ্ড বা অংশ আমার পুষ্টি ও স্থিতি বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে, তাহাকে আমি সহায় ভাবিতে, আপনার ভাবিতে শিখি—স্বভাবতঃই শিখি। আর যাহা আমার পুষ্টি ও স্থিতির বিরোধী বা আমার পুষ্টি বা স্থিতির একান্ত উপাদান, তাহার প্রতি ঈর্ষা প্রভৃতি ভাবের সৃষ্টিও তেমনি অনিবার্য্য।

দল বা সমাজ আমার পুষ্টি ও স্থিতির সহায়ক, কাজেই তাহার প্রতি আমার স্নেহ, মায়া প্রভৃতি ভাব জন্মান সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই জন্যই তাহার দাবী আমি মান্য করি। কারণ তাহার দাবী পূরণে আমার দাবীই পূর্ণ হয়, তাহার স্থিতি ও পুষ্টিতেই আমার স্থিতি ও পুষ্টি ঘটে। সমাজকে আমি এই জন্যই ত্যাগ করিতে পারি না। সমাজ আমার আত্মীয়েরও আত্মীয়, পরম আত্মীয়।

অবশ্য সমাজের সহিত আমার এই যে সম্বন্ধ, তাহা স্বার্থঘটিত। কাজেই

সমাজ-ধর্ম—অর্থাৎ যাহা সমাজকে রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে সাহায্য করে, তাহাও স্বার্থঘটিত হইতে বাধ্য।

ব্যক্তি বিশেষ লইয়া যখন সমাজ নয়, ব্যক্তি সমষ্টিকে লইয়া সমাজ, তখন সমাজ-ধর্ম্মের মূল "ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে নহে, মনুষ্য-সমাজের স্বার্থে (ই) ইহার প্রতিষ্ঠা।" সুতরাং যাহা সমাজ-ধর্ম্ম, তাহা ব্যক্তিদেরও ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য।

আবার "যাহা সমাজের স্বার্থের বিরোধী ও প্রতিকূল, যাহাতে সমাজের গ্রন্থিগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাকেই অধর্ম্ম বলে। যাহা সমাজের পক্ষে, তাহা ব্যক্তির পক্ষেও অধর্ম্ম।

অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বার্থমূলক। অথবা কেবল স্বার্থমূলকই বা বলি কেন, পরার্থেই যখন স্বার্থ সংগুপ্ত, তখন উহাকে স্বার্থ-পরার্থমূলক বলাই অধিকতর সমীচীন।

স্বার্থ-পরার্থের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাই কর্ত্তব্য-নীতি। এই জন্যই কেবল-স্বার্থমূলক যাহা, তাহাই অকর্ত্তব্য সুতরাং অধর্ম্ম। এইদিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতেই হয়—"প্রবৃত্তির নাম অধর্ম্ম ও নিবৃত্তির নাম ধর্ম্ম।" সকল সমাজের নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিও ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকেন।

কিন্তু স্বার্থ-পরার্থের সামঞ্জস্য বিধান কর্ত্তব্য হইলেও "স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুইটার বিরোধ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। অথবা যে দিন হইতে এই বিরোধের আরম্ভ, মনুষ্যের সমাজেরও আরম্ভ সেই দিনে। এই বিরোধের ধারাবাহিক প্রবাহকেই সমাজের জীবন বলিলে বলা চলে। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে, ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের যে সনাতন বিরোধ দেখা যায়, তাহাও মোটের উপর ইহাই।

"বলা বাহুল্য, স্বার্থ-পরার্থের এই ঝগড়া মানুষ ভিন্ন অন্য জীবে বড় লক্ষিত হয় না। ইতর জীবের জীবন স্বার্থময়, পরার্থপ্রবৃত্তি যদি কোথাও দেখা যায়, সেখানে পর অর্থে নিজের সন্তান, অথবা সহচর বা সহচরী।" অথবা "ইতর-জীবে স্বার্থে পরার্থে বিরোধ নাই।" তাহাদের মধ্যে "যাহারা দল বাঁধিয়া বা সমাজ বাঁধিয়া থাকে", তাহারা তাহা স্বভাবিক সংস্কার-বশেই করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের নিজের বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে তাহা খাটে না। মানুষ কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের অধীন নয়, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে সে সংস্কারকে ছাড়াইয়া অনেক দূর

অগ্রসর হইতে পারে। আর পারে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে স্বার্থে পরার্থে বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু "যে সব মানুষের অবস্থা এখনও ইতরজীবের সদৃশ, তাহাদের মধ্যেও তেমনি এই বিরোধের প্রখরতা দেখা যায় না।" অথচ "এই বিরোধের সূত্রপাতেই" (মনুষ্য) "সমাজের সৃষ্টি, এই বিরোধের স্থায়িত্বেই সমাজের জীবন, এই বিরোধের বর্ণনাই সমাজের ইতিহাস। এবং যাহাকে সভ্যতা বলে, তাহাও এই বিরোধের পরিণতি ও আনুষঙ্গিক ফল।"

স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে আর একটি ভাব আছে, যাহাকে স্বার্থ-নিবৃত্তি বলা চলে। নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের ঝোঁক অনেকটা এই দিকেই। স্বার্থের সঙ্কোচ সাধনই স্বার্থ-নিবৃত্তি। দণ্ডনীতিরও উদ্দেশ্য এই মুখে। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থান্বেষী, স্বার্থের বশেই সে পরের অহিত করিতে ছুটে। তাহার অহিত-সাধন-প্রবৃত্তি দমন করাই যাবতীয় লৌকিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রের লক্ষ্য। স্বার্থ-নিবৃত্তি ও পরার্থ-প্রবৃত্তির মধ্যে মাত্র এক পদ ব্যবধান। কিন্তু তথাপি স্বার্থ-নিবৃত্তি হইলেই যে পরার্থ প্রবৃত্তি জাগরিত হইবেই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। অথচ জীবন রক্ষার পক্ষে ইহার উপযোগিতা নিতান্ত কম নয়। বিরোধ যে এই জন্যই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—"এই বিরোধের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাতে জীবন। স্বার্থ কিছু বজায় রাখিতে হইবে, প্রকৃতির নিয়ম এই, নতুবা জীবন টিকে না। পরার্থের জন্য স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমাজ চলিবে না, সমাজের মঙ্গল হইবে না, আর সমাজের মঙ্গল না হইলে সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নাই। স্বার্থ-সাধন ব্যক্তি জীবন রক্ষার উপযোগী, পরার্থসাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক। মানুষ দুর্ব্বল জীব, সমাজে না থাকিলে উৎকট জীবনসংগ্রামে তাহার কল্যাণ নাই, তাই যেমন করিয়াই হউক, নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াইতে হইবে, নিজের মুখের গ্রাস সময়ে সময়ে পরের মুখে না দিলে চলিবে না। ব্যাখ্যাটা নিতান্ত ইউটিলিটি (হিতবাদ বা প্রয়োজনবাদ) মতানুযায়ী হইল। কিন্তু অভিব্যক্তির প্রণালী সর্ব্বত্রই এইরূপ, ভালর মূলে মন্দ। তাহাতে পরিতাপ করিয়া বিশেষ কিছু ফল নাই।"

ফল থাকুক আর নাই থাকুক, এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা নিজের স্বার্থটাকেই সব চেয়ে বড় করিয়া দেখে এবং কাপুরুষের মত সমাজের কর্ত্তব্য গুলিকে অকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াও সমাজের আশ্রয় লইতে একটুও

সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করে না। ইহারাই ভাক্ত বৈরাগী বা তথাকথিত সন্ন্যাসী। তাহারা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝে, তাহা সমাজ-ধর্ম্মের বিরোধী, এই জন্যই তাহারা সমাজের হেয়, সমাজের শত্রু। তাহাদের বুলি—

"দারা সুত পরিবার কে বা কার কে তোমার, কেহ সঙ্গে আসে নাই, কেহ সঙ্গে যাইবেও না, কেবল চক্রান্ত করিয়া তাহারা তোমাকে সংসার-কারাগারে মোহের শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যদি বুদ্ধি থাকে ও কল্যাণ-চাও, সত্বর শিকল কাটিয়া আপনার পথ দেখ।"

সংসারে প্রবেশ করিবার সময়, দারাকে দারাত্ব, সুতকে সুতত্ব ও পরিবারকে পরিবারত্ব দিবার সময় তাহাদের এই বুলি স্মরণ না থাকিলেও, "সংসারের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুই একটা লাঠির ঘা পাইবা মাত্র ভাগ্যহীন দারাসুতকে অন্যের করুণায় ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে" তাহাদের মনে একটুও দ্বিধা জন্মে না।

এইরূপ তথাকথিত বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর সংখ্যা এক ভারতবর্ষেই, কম হইলেও, অন্ততঃ কয়েক লক্ষ তো হইবেই। তাহারা সংসারের বাঁধন কাটিয়াছে বটে, সমাজ-ধর্ম্মের প্রতি খোর বিতৃষ্ণা দেখাইয়াছে সত্য, কিন্তু সংসারের বা সমাজ-জীবনের সুখটুকু ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা "কাঞ্চনের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতবর্জ্জিত না হইলেও ললাটের স্বেদপাতনাদি কাঞ্চন-লাভের লৌকিক উপায়ে একেবারে আস্থাশূন্য এবং দার-গ্রহণাদি ব্যাপারে ও কৃত্রিম সামাজিক প্রথার বিরক্ত ও সহজ স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী, সে কথা নাই বা তুলিলাম।"

অবশ্য ব্যতিক্রমস্থল যে একেবারে না আছে তা নয়। "গৃহাশ্রমত্যাগী কৃত্রিমতাশূন্য বিরক্ত পুরুষ সর্ব্বতোভাবে মহাশয় ব্যক্তি।" তাঁহার নিরীহতা ও নির্দ্দোষ স্বভাবের নিন্দা করিয়া ফল নাই। সংসারের সহিত সংগ্রামে তিনি অশক্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছেন বটে, তবে সেই সঙ্গে সংসারের সুখটুকু পাইবার লোভও তো ছাড়িয়াছেন। বন্য বৃক্ষের গলিত পত্র ও পতিত ফলই তাঁহার আহার্য্য, লোকালয়ের বাহিরে ভীষণ অরণ্যে পশুদের মধ্যে তাঁহার আবাস। তিনি যখন সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পলাতক বলিয়া তিরস্কার করিতে যাওয়া ভদ্রতা নহে।

ভদ্রতা হউক আর নাই হউক, সমাজ তো তাঁহাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সমাজের নুন তো খাইয়াছেন, তবে তিনি কোন্ যুক্তি

বলে—কোন্ ধর্ম্মের প্ররোচনায় "নিমকহারামি করিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করেন ?

সংসারের বাঁধান বড় শক্ত, সমাজের বিধান বড়ই কঠোর, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সংসার ও সমাজ যে অনেক সময়েই অযথা অত্যাচার করিয়া থাকে, ইহাও অস্বীকার করার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সে বাঁধন, সে অত্যাচার কি মাতার স্নেহ-বাঁধনের মত, মাতার স্নেহ-উৎসারিত অত্যাচারের মত নয় ? সত্য বটে, "জীবের সাধারণ প্রবৃত্তিগুলি তাহার পূর্ব্বগত পুরুষপরম্পরা হইতে আগত হইয়া তাহার অস্থিমজ্জায় নিহিত ও শোণিতে প্রবাহিত থাকিয়া তাহাকে সামাজিক বন্ধন হইতে প্রতিক্ষণ ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে," কিন্তু তথাপি সমাজের সন্তান হইয়া সমাজকে পদাঘাত করিয়া পলাইতে যাওয়া মনুষ্যোচিত নহে।

বলিতে পার—"সংসারে এমন কি আছে যে তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে (সংসারে ও সমাজে) থাকিতে(ই) হইবে ?" কিন্তু ইহার উত্তর দান কঠিন হইলেও, একেবারে অসম্ভব নয়। পরার্থসাধনে স্বার্থসিদ্ধিই হয়। ইহা খুব সত্য কথা হইলেও তোমাকে বলিতে চাই সংসারী জীব তুমি পরার্থসাধন করিতে স্বভাবতঃই বাধ্য। নিজের স্বার্থের জন্য না হইলেও বাধ্য। তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। "কর্ত্তব্য সম্পাদন কর কর্ত্তব্য পালনই তোমার প্রকৃতিগত হউক, কর্ত্তব্য পালন বিনা তোমার যেন শান্তি না জন্মে। কেন করিব, জিজ্ঞাসা করিও না, যুক্তিতর্ক অন্বেষণ করিও না, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না।" স্বর্গের লোভ তোমাকে দেখাইতে চাই না, তাহা ধ্রুব নহে অথবা ধ্রুব হইলেও তাহা দ্বারা তোমাকে ভুলাইতে চাহি না। কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ কর, করিতে পারিলেই তোমার মনুষ্যত্ব, কেবল এইটুকু বলিতে চাহি। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রও ঠিক এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। গীতায় এই কথা খুবই স্পষ্ট। রামায়ণ এই কথারই একটা জীবন্ত চিত্র।

সুতরাং যখন "সমাজ মধ্যে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও সমাজের অনুগ্রহেই পালিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছ", তখন "সমাজ যদি কিছু অত্যাচার করে, তাহা তুমি সহ্য করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। পুত্র যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও জন্মদাতা ও বাল্যে পালনকর্ত্তা পিতার অত্যাচার সহিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তুমিও সেইরূপ তোমার নিরাশ্রয় অবস্থার আশ্রয় তোমার মনুষ্যত্বের রক্ষক সেই সমাজের নিকট সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকিতে বাধ্য। সমাজের হস্তে যে ভীতিজনক দণ্ড উদ্যত দেখিয়া ভয় পাইতেছ", তাহা স্নেহময় পিতা অথবা

হিতৈষী শিক্ষকের করধৃত শাসনদণ্ডের তুল্য হইতে পারে, তাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সুবুদ্ধি দ্বারা চালিত ও প্রযুক্ত হয় না। অথবা মানবীয় অপূর্ণতা যেমন সর্ব্বত্র, তেমনি এ স্থলেও বিদ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া সেই শাসনদণ্ডের অবাধ্য অথবা তাহা হইতে দূরে থাকিবার তোমার কোন অধিকার নাই। জননী প্রকৃতির যেমন এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে অভয়, সমাজেরও সেইরূপ ভীম ও কান্ত উভয় মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তোমার চক্ষু অন্ধ বিকৃত, তাই একটা (মাত্র) মূর্ত্তি দেখিতেছ, অন্য মূর্ত্তি দেখিতেছ না। তুমি সমাজের নুন খাইয়াছ, এখন নিমকহারামি করিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিও না।"

সুখের অন্বেষী হইও না। দুঃখের পরিহার করিও না। সংসারে কিসে সুখ কিসে দুঃখ, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিবার উপায় নাই। মনে রাখিও, দুঃখ সহা দুর্ব্বলতার লক্ষণ নহে। মনে রাখিও—"যে জ্ঞানী, যে ধার্ম্মিক, তাহার দুঃখভোগশক্তি অধিক, তাহার দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠ পাথরের আবার দুঃখ কি? উন্নত কে? না, যার দুঃখ-ভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর, নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখও অধিক। ফিজিদ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে বাঁধিয়া খায়, বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে, কার দুঃখ অধিক?"

সুতরাং দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই পরিহার করিও না। মনে রাখিও, সংসারে থাকিয়া সমাজের যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়া যদি মরিয়াও যাও তাহা হইলেও তোমার জীবন নিষ্ফল যাইবে না। "পল্লীবাসী কৃষক খায়, খেলায়, আপনার ক্ষেতটুকু চাষ করিয়া ফসল তোলে ও কিছুকাল আপন পুত্রকলত্রের ভার বহিয়া মরিয়া যায়। তাহার জীবনের ইতিবৃত্ত কেবল খানিকটা খাওয়া দাওয়া খানিকটা হাসিকান্না ও খানিকটা বিবাদ বিসংবাদ মাত্রেই পর্য্যবসিত। তাহার মৃত্যুর চারিদিন পরে তাহার নাম কাহারও স্মরণে থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনকে নিষ্ফল মনে করা চলিবে না। সে যে কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, সে যথাশক্তি তাহার সাধনাতে নিরত আছে। ত্রৈলোক্যে যেমন প্রত্যেক পরমাণুর স্থান আছে, এবং কোনটিই অযথাস্থানে সন্নিবেশিত নাই; তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে তাহারও আসন নিরূপিত রহিয়াছে, সেই আসন হইতে

তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবন মনুষ্যের জাতীয় জীবনের অন্তর্গত, সেই ক্ষুদ্র জীবনটুকু গণনায় না ধরিলে জাতীয় জীবনের ঠিকে ভুল হয়।"

"সত্য বটে সংসারে থাকিলে সমাজের বর্তমান অবস্থায় অপরের সহিত বিবাদ করিতে হয়, চিরকাল প্রহার সহা চলে না, দুই একটা প্রহার দিতেও হয়। প্রহার দেওয়া স্থূলতঃ নিন্দনীয় কাজ। স্থূলতঃ নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র নিন্দনীয় নহে। এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে, এই উক্তি অতি উন্নত ধর্ম্মবৃত্তির পরিচায়ক। কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে। সমাজের বর্তমান অবস্থায় সর্ব্বত্র এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্য-সমাজের স্থিতির ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সমাজের বর্তমান অবস্থায় উহা সর্ব্বত্র ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

"বর্তমান অবস্থায় জীবনের নাম বিরোধ এবং সেই বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়ায় অধর্ম্ম নাই। এই বিরোধে মনুষ্য প্রকৃতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলেও উহা এড়াইতে পারিবে না। জীবন রক্ষার জন্য এক কণিকা তণ্ডুল উদরসাৎ করিতে গেলে আর একজন ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তিকে ঐ তণ্ডুলকণা হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। কেন না প্রকৃতির বিধানে তণ্ডুল-কণার সংখ্যা পরিমিত। যত মানুষ বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সকলকে বাঁচাইবার মত তণ্ডুলকণা বিদ্যমান নাই। কাজেই বর্তমান অবস্থায় জীবন বিরোধ মাত্র। ঘা দিতে হইবে বলিয়া ঘা সহিতে কাতর হইলে চলিবে না, পদস্খলন হইবে বলিয়া পা ফেলিতে দ্বিধা বোধ করিলে চলিবে না। নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে জীবন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

"সংসারের শোণিতকর্দ্দমময় পিচ্ছিলক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মনুষ্যের গৌরব, এবং এই জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যের এমন অবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইবে, যখন সে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্তব্যসাধনই তাহার জীবনের স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে., তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, সেই দুঃখের স্বীকারই জীবের উন্নতির ও অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবে, দুঃখ-ভোগশক্তিই মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব বলিয়া মানিয়া লইবে, এবং আপনার

প্রতি, পুত্র-কলত্রের প্রতি, স্বজন-বান্ধবের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, বিশ্বের প্রতি, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই এমন এক পরম প্রীতি, এমন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করিবে, জড়োচিত শান্তি সেই আনন্দের নিকট ম্লান হইয়া প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।"

"ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থে এই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদের শ্রেষ্ঠ-কাব্যে কবিকুলগুরু এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের মহামহিম আদর্শ অঙ্কিত করিয়া আমাদের গন্তব্যপথ দেখাইয়াছেন। সে পথ আমরা অনুসরণ না করি, সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।"

তবে কি কেবল দুঃখকেই বরণ করিব? সুখের অন্বেষণ করিব না? কিন্তু হায়! সুখের অন্বেষণই যে আমার প্রকৃতি। আমার জীবনরক্ষার জন্যই তো আমি দুঃখকে পরিহার করিতে ও সুখকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য। এই জীবন-দ্বন্দ্বের সংগ্রামে আমি কেমন করিয়া সুখেপ্সাকে বিসর্জ্জন দিব?

ঠিক কথা। কিন্তু সুখ কোথায়? সুখ কাহাকে বলিতেছ? নিজের জীবন রক্ষায়? তাহা কি রক্ষা পায়? তোমার জীব-প্রকৃতি তোমাকে যে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে সে সুখের সন্ধান মিলে কি? "এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বকোলাহল মধ্যে প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য দেখিতেছ? ব্যক্তি জীবনের রক্ষণ প্রয়াস? বাতুলের কথা। জীবন-রক্ষার উৎকট প্রয়াসে জীবগুলী ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে, কিন্তু জীবন-রক্ষা ত হয় না। সুখান্বেষণে প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবমাত্রই ছুটিতেছে, আপন জীবনরক্ষার জন্য ছুটিতেছে, পরের জীবনে দয়া করিবার তাহার অবসর নাই। কিন্তু সেই আপন জীবনই কি রক্ষা পায়? উত্তরে বলিব, পায় না। অভিব্যক্তি? উন্নতি? কাহার? উত্তরে বলিব, ব্যক্তির নহে, জাতির। জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিজীবনের জীবন-ব্যাপী প্রয়াসের চরমফল মৃত্যু, মৃত্যুর চরমফল জাতি-জীবনের অভ্যুদয়। ব্যক্তি যায়, জাতি থাকে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য জাতীয় অভিব্যক্তি, জাতীয় উন্নতি। ব্যক্তির জীবন তাহার নিকট মূল্যহীন। ব্যক্তির জীবন খেলার পুতুল, ক্রীড়নক। ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতি আপন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিয়া লয়। সে উদ্দেশ্য ব্যক্তির নাশ, জাতির বিকাশ।"

"প্রকৃতির নিকট ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন, জাতির অভ্যুদয় তাহার উদ্দেশ্য। তবে জাতির অভ্যুদয়সাধনের জন্য ব্যক্তিমাত্রকে কিছুদিন বাঁচাইয়া রাখিয়া খাটাইয়া লইতে হয়, তাই প্রকৃতির প্ররোচনায় ব্যক্তিমাত্রই জীবন ব্যাপিয়া

খাটিতেছে। সে মনে করে, আমি আপন জীবনের উৎকর্ষের জন্য এত প্রয়াস, এত যত্ন করিতেছি। কিন্তু হায়, সে জানে না, কি বিষম প্রতারণায় সে প্রতারিত। জীবপ্রকৃতির তাড়নায় (সে) কার্য করে, তাহাতেই তাহার সুখলাভ। তাহাতেই তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য রক্ষিত হয়, প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার যতদিন বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, ততদিন তাহার জীবন রক্ষিত হয়। কিছুকাল তাহার জীবন পুষ্টি পায়। সে জানে না, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে জীবিত রহিয়াছে। ক্ষুধার উত্তেজনায় ব্যাঘ্র ছাগ-শিশুর উপর লম্ফ দিয়া পড়ে, স্বভাবের উত্তেজনায়, প্রকৃতির তাড়নায় সে এমন করে, এমন না করিয়া তাহার উপায় নাই। সে প্রকৃতির দাস, প্রকৃতি কর্তৃক সে অন্ধভাবে ছাগহত্যায় নিয়োজিত। সে ক্রীড়নক তাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার নিজের জীবন এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া (তাহাকে) রক্ষা করিতে হইবে। কেননা প্রকৃতির একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে যতদিন তাহার সন্তান না জন্মে, ততদিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার বংশরক্ষার ও জাতিরক্ষার জন্য তাহার কিছুদিন বাঁচা আবশ্যক। যতদিন সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে ক্ষুধার উত্তেজনায় ছাগশিশু হত্যা করিয়া নিজজীবন রক্ষা করিতে থাকে। আবার আততায়ী যখন ব্যাঘ্র শিশুকে আক্রমণ করে, তখন কুপিতা ব্যাঘ্রী তাহার উপর লাফ দেয়, তখন নিজের জীবনের জন্য তাহার মমতা থাকে না। এখানে ব্যাঘ্রীও সেইরূপ স্বাধীনতা বর্জিত ক্রীড়নক মাত্র। প্রকৃতি তাহাকে সন্তানের জীবনের জন্য আত্মজীবনে মমত্বহীন করে, সে স্বার্থান্বেষণে অবসর পায় না। ইহাতেই তাহার সুখ, শিশুর জীবন রাখিবার জন্য আপন জীবনদান করিতে তাহার সুখ। প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাকে এইরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন। সে প্রকৃতির অনুজ্ঞা পালনে বাধ্য।'

"মনুষ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা। জীবমধ্যে মনুষ্যের স্থান সকলের উপরে, কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা বোধ করি সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। এই অবস্থার শোচনীয়তাতেই তাহার মনুষ্যত্ব। ইতরজীব জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে, কিন্তু ইতর জীব বোধ করি জানে না, তাহার সমস্ত চেষ্টার পরিণতি মৃত্যু। মনুষ্যও তাহার মতই জীবন যুদ্ধে নিরত; কিন্তু মনুষ্য জানে যে, মরণ অবশ্যম্ভাবী। ইতরজীব প্রবৃত্তির বশে কাজ করে, কিন্তু সেই কাজের ফল কি হইবে না হইবে, তাহা সে জানে না ও ভাবে না তাহার জন্য সে

দায়িত্বশূন্য। মনুষ্য ও প্রবৃত্তির বশে কাজ করে, কিন্তু সে আপন কার্য্যের ফল আপন চোখে দেখিতে পায়, এবং সময়ে সময়ে সেই ভবিষ্যৎ ফল পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া বিচার শক্তি দ্বারা প্রবৃত্তির মুখ ফিরাইয়া লয়। ইতর জীবে পথ একটা, মানুষের পথ অনেকগুলি। আপনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দূ দর্শিতার সাহায্যে প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া মানুষকে আপনার পথ পছন্দ কর লইতে হয়। সেই দায়িত্ব তাহার স্কন্ধের উপর। মনুষ্য জীব বটে, কিন্তু স জীবী, বিচারপরায়ণ, দায়িত্বপূর্ণ জীব।"

তা ছাড়া শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বল হওয়ায় মানুষ নিজের সেই দুর্ব্বলতা পরিহার করিবার জন্য দল বাঁধে, সমাজ গড়ে। সমাজগঠনপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির গুণে তাহা বিকশিত হয়। "অন্যান্য কোন কোন জীবের মধ্যেও সমাজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়, কিন্তু অন্যত্র যাহার অঙ্কুর, মনুষ্যে তাহা পল্লবিত বৃক্ষ। মুখ্যতর সমাজ বাঁধিয়া মানুষ জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার জীবত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু এই সামাজিকত্বের উৎপত্তির সহিত তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের আরম্ভ।"

(ক্রমশঃ)।

আগামী সংখ্যা নারায়ণ মিত্রা বিশারদের ভক্তি অনঙ্গানন্দের পবিত্র ও দীপাঙ্করের কথা প্রকাশিত হইবে।

মীরা রিশার

মীরা ফরাসী রমণী, জন্ম ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ। ফ্রান্সে উঁহার পিতা ব্যাঙ্কার ছিলেন, এখনও মাতা জীবিতা। মীরার মধ্যে অরবিন্দের সাধনা মূর্ত্তিমতী হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধরিয়াছে। ভারতের সেবায় ইনি নিবেদিতজীবন। ভারতের নারীশক্তির উদ্বোধনের আশায় ইনি কয়েকটি মেয়েকে জ্ঞান ও সিদ্ধি দিয়া গড়িতে সংকল্প করিয়াছেন। উপযুক্ত আধার ও অর্থ হইলেই কাজ আরম্ভ হইবে।

নারায়ণ—আষাঢ়, ১৩২৭ সাল।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৭ সাল

প্রৌঢ়ে কবি।

[শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।]

আবার কেন গো তোমারে হেরিয়া,
সে পূত প্রেমের নির্ঝর বহে।
হয়েছিল লুপ্ত বহুদিন যাহা,
নীরস এ শুষ্ক মানস দহে ?
কূলে কূলে কূলে বিটপ শ্যামলে,
তেমতি সুরের প্রবাহ ঝরে।
আনন্দ-লহরী ফুলিয়া ফুলিয়া,
ছুটিয়া চলে এ মানস-সরে।
পূত সুরভি সমীরে মিশিয়া,
আমোদিত করে কানন অঙ্গ ;
কপোত কপোতী কূজিয়ে কূজিয়ে,
নিভৃতে দেখায় প্রণয়-রঙ্গ।
যদিও হে দেবি দাঁড়াইয়া দূরে,
রহিয়াছি চেয়ে উদাস মনে ;
(তবু) চির-অনুগত সেবক এ হিয়া
ছুটিয়া লুটিয়া পড়ে চরণে।
(আর) থেকনা থেকনা অমন করিয়ে,
চাহ এ নয়নে শপথ মোর ;

এখনও কি লাজ তেমতি আঁখিতে,
ওগো শৈশবের মানস চোর ?
শৈশব যৌবন গিয়াছে চলিয়ে
যায় নি চলে সে প্রেমের বাগু ;
সকলি ফেলেছি ঝাড়িয়ে মুছিয়ে
পাষাণে তেমতি রয়েছে দাগ।
কত না কেঁদেছি কত সে ভেবেছি,
নিভৃত কাননে শয়ন পাতি ;
(ওগো) তোমার কামনা তোমার সাধনা,
(মোর) ছিল যে দিবস নিশাব সাথী।
স্বপ্নে জাগরণে তোমারি ধেয়ানে,
(দেখি) মগন চিব এ পরাণ খানি ;
সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
পূজিতা আমার হৃদয়-বাণী।
মনে মনে ধ্রুব কেটে গেছে নেশা
(সে) চারু যৌবনের প্রেমের ঘোর,
(ওরে) নির্ম্মলাকাশ ধৌত জ্যোছনা
(সদা) আপনা আলোকে আপনি ভোব।
(তাই) ভেঙ্গে দিতে ভুল বহুদিন পরে
বুঝি বুঝি ওগো মহিমময়ী ?
(এলে) ভুবন-বিজয়ী সেই রূপ নিয়ে
(আজি) করিতে পরখ আবার অয়ি।

মায়ের শৃঙ্খল।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

To hate a man is to betray humanity—পল রিশারের এ কথা আজ ঋষির জাতিকে বুঝাইতে হয়, ইহার অধিক লজ্জার কথা আর কি আছে? একটিও মানুষকে ঘৃণা করার তুল্য মানবদ্রোহিতা আর নাই। আমাদের সমাজ-বিধি ঘৃণার উপর এই নরদ্রোহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ইতিহাসে চাঁদ ক্রমাগত ডুবিয়াছে আর উঠিয়াছে,—আলোর যুগ আর আঁধারের যুগ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখ না,—আগে বেদ ও উপনিষদ, তাহার পর সংহিতা; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এবং তাহার পর সে অখণ্ড বোধের পরা ভূমি হইতে বিচ্যুতি—ভেদক্লিষ্ট সমাজের প্রথম বীজ বপন। যতদিন 'সত্য সুন্দরের' সৃষ্টি ছিল, ততদিন ভেদ ছিল একত্বের সেই সুখময় কোলের ছেলে, অন্তরের ভগবৎ-প্রেরণার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের গড়া ভেদ;—তাহাতে কাহাকেও ব্যথা দিয়া খর্ব্ব আত্মঘাতী করিত না, নানা বৈচিত্রের রসে "একং সৎ"কে বহুধা লীলার তরঙ্গে অকূল সাগরের নীল লহরী-উৎসবে চিরমধুর দেখাইত। যে দিন "সত্য-সুন্দরের" সৃষ্টির মধ্যে মানুষের বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামিয়া ভেদ রচনা করিতে বসিল, সেই দিন সংহিতার জন্ম। সেই দিন যে ভেদ মানুষ গড়িতে বসিল, তাহা বড় ছোটর দোকানদারী, অধিকারি-ভেদের মুখোস পরা ঘৃণার ব্যবসা।

সংহিতার যুগে মানুষ নিজে ভগবান্ হইয়া বসিল। "কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা আমি গুণ আর কর্ম্মের ভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি" এই ভাগবত বাণী ভুলিয়া মানুষ নিজে জন্মগত চাতুর্ব্বর্ণ্য গড়িতে বসিল। ভগবানের সৃষ্টিতে রাবণের কুলেও বিভীষণ জন্মায়, ধীবর-কন্যার পুত্রকে বেদব্যাসের মেধায় অলঙ্কৃত করিয়া সূত্র রচনায় প্রবৃত্ত করায়। 'সত্য-সুন্দরে'র রাজ্যে ভাল আর মন্দের যুগল রূপ, কালো কানুর অঙ্গে স্বর্ণলতা শ্রীরাধার মত এ উহার জড়াইয়া আছে, জগৎ কবির রচনায় সমস্ত পঙ্কটুকু ভরিয়া কেবলই বাও। কমলের হাট! সেখানে ভালর আশীর্ব্বাদে ও পুণ্য স্পর্শে মন্দও বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক, অসতের কালো নিকষ মণিতে সতের কষিত কাঞ্চন-শোভা। কারণ, সে ভাল মন্দে মানুষের বুদ্ধির অহঙ্কারের অভিশাপ নাই, তাহা অন্তরের ঠাকুরের নিবিড় ছোঁয়ায় ফোটা ফুল।

—ভগবানের দানে ধনাঢ্য হইয়া যে দিন পুরুষ আত্মবিস্মৃত হইল সেই দিন হইতে পাপ দীনতা অক্ষমতার কালী দিয়া গণ্ডী কাটিয়া কাটিয়া আনন্দের ভরা

হাটকে বেদনার আস্বাদে ভরিয়া তুলিল। জগতের বা সমস্ত মানব জাতির মুক্তি ভুলিয়া আমরা যে দিন আত্মমুক্তি সার করিলাম, দশের কল্যাণকে ছোট করিয়া আপন কল্যাণ সবার আগে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলাম এবং মূর্ত্ত লীলাদেবতার এই নিত্যমিলনকে তুচ্ছ ভাবিয়া, "ওগো মায়ার অতীত, ওগো পরপারের ঠাকুর।" বলিয়া পাগল হইলাম, সেই দিন হইতে এই ভেদক্লিষ্ট সমাজের ও নারী-শক্তির অপমানের সূত্রপাত।

ওগো আমার দেশের দেবতারা। মনে পড়ে কি, কবে তুমি এমন নির্দ্দয় মোক্ষপিশাচে পরিণত হইয়াছ?—যে দিন মায়ের কোলে জন্মিয়া জগচ্ছক্তির অপরাজেয়া প্রতিমা সেই মাকে "নারী নরকস্য দ্বারং" বলিয়া অপমান করিয়াছিলে। সেই পবিত্র মাতৃদেহে পদাঘাত করিবার পর হইতে তোমার মনুষ্যত্ব যে মায়ের ব্যথায়—পুত্রকৃত মায়ের সে বস্ত্রহরণের লজ্জায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। দ্রৌপদীর শুধু গায়ের বসন দুঃশাসন হরণ করিয়াছিল, তুমি যে জননীর চরিত্রে কালী লেপিয়া দিয়াছ, তাঁহার মান সম্ভ্রম সকল গৌরব হরিয়া লইয়াছ। উপনিষদের বুদ্ধের শঙ্করের শ্রীচৈতন্য ও খৃষ্টের আলোক যুগগুলিতে ভগবান্ বার বার আসিয়া তাহাদেরও নারী পুরুষের এক আসন দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আর যেমনি যেমনি ভগবানের নরদেহধারী জ্যোতিঃ সরিয়া গিয়াছে, অমনি ক্ষুদ্রপ্রাণ আমরা নারীকে নিজের মোক্ষ কামনায় ঠেলিয়া সে আসনের নীচে ফেলিয়া দিয়াছি। যে মায়ের আমরা সন্তান, যে সহধর্ম্মিণীর আমরা একাঙ্গ, তাহারাই আমাদের ভগবানের পূজার বিঘ্ন! তাহা তো হইবেই। আত্মপাপে অন্ধ জনেই পরের পাপকে এত বড় এত জঘন্য করিয়া দেখিতে পারে। শক্তিমদে অন্ধ পুরুষই নারীকে এত দানা—এত পিশাচী জ্ঞান করিতে পারে। তাই শ্রীহীন আমরা আজ মোক্ষ-পিশাচ।

পাপ আজ আমাদের চক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য হিমাচল; পাপকে এত বড় করিয়া দেখিতে গিয়াই তো এ জাতির পাপ আর ঘুচিল না। সত্যবীর পল বলিয়াছেন—"There are some who lose their soul in their anxiety to save it"—অনেক লোক আছে, তাহারা আত্মাকে বাঁচাইতে গিয়া আত্মনাশ করিয়া বসে, শুচিতার লালসায় ও বন্ধনে ঘোর অশুচি ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তাই আমরা আজ আত্মহীন—শব। "How many sins are virtue guilty !" আত্মঘাতী পুণ্যের নামই পাপ, পতিত-পাবনে বিশ্বাস নাই তাই পাপ এত বড় হইয়া পুণ্যকেও আড়াল করিয়া রাখে। পাপকে ভয় করিও না, পুণ্যের লালসাকে—প্রাণের দর্পকে ভয় করিতে শিখ। মাংসভারবাহী কষাই তোমাকে ছুঁইয়া ফেলিয়া তোমার

মলার পিণ্ড দেহটা মলিন করিয়া দিবে—এই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আছ, তাই তো "সর্ব্বং খল্বিদং" পরম দেবতাকে পাইলে না। অনন্তের বঁধুকে নিত্যমিলনে তুমিই চাও? তবে তার রূপকে এত ঘৃণা কর কেন?, তোমাকে আমাকে পাইবার ব্যাকুলতায়ই তো প্রেমলীলায় সে এত দেহ ধরিয়াছে। পাপের কৃমি সে হইয়াছে এই ভাবিয়া, যে একবার দেখিবে তোমার প্রেম কত বিশাল, সে কত ছোট হইলেও তুমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে পার।

নীতির কীট হইও না, তাহা হইলে পতিতপাবনকে ভুলিয়া পতিত তরাইতে ভগবানের আসনে তুমি গিয়া বসিবে।—"Moralist – one who has a high sense of other people's moral duty",—পরের পাপকে যে বড় করিয়া দেখে, সেই কি নীতির পাগল moralist নয়? শিশু পড়িয়া যায়—হোঁচট খাইয়া ব্যথা পায় বলিয়াই তো চুম্বন-রতা সান্ত্বনাময়ী মায়ের ছবি আমরা বার বার দেখিতে পাই। পাপকে ঘৃণা করিও না, তাহা হইলে জগন্মাতার বুকে টানিবার প্রেম-কাতুর বাহু দুটিকে ঘৃণা করা হইবে। অন্তর দেউলের দেবতার প্রেরণায় কি নারী কি পুরুষ দু'জনেই পড়ে, পড়িয়াছে বলিয়া তুমি অভিশাপ দিও না, তাহাতে পাপীর কিছু হইবে না, তোমারই আত্মঘাত ও পাপস্পর্শ ঘটিবে। বিল্বমঙ্গলের মত গলিত শব বুকে ধরিয়া সর্পের রজ্জু বাহিয়া আমরা সকলেই গণিকার গৃহে লীলা-সুন্দরকে খুঁজিতেছি। তাহা কি দেখিতেছ না? পাপ ও পুণ্যের শোভাযাত্রায় এ যে জগৎ-স্বামীর সেখানে আমাদের নবপরিণীতা বধূরাণী হইয়া ঘর করিতে যাওয়া—

এই শোভাযাত্রা বধূ কার ঘরে যায়?—
দাসীরে লইতে শেষে
আসিছ কি বরবেশে,
মোরে কি তোমার ঘর করিতে পাঠায়?

তমোগুণ ও রজোগুণের যেমন টান আছে, সত্ত্বগুণেরও তেমনি প্রবল জগৎ ভুলাইয়া দেওয়া সর্ব্বনাশা টান আছে। নিরবচ্ছিন্ন বহির্মুখ ভোগ-জীবনের পর সাধক বা প্রবর্ত্তক হইয়া মানুষ যখন প্রথম অমৃতের অন্তরতমের আস্বাদ বা সঙ্গসুখ পায়, তখন তাহার মনে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে হু হু করিয়া বৈরাগ্য-অগ্নি জ্বলিয়া ওঠে। সেই অবস্থায় সত্ত্বের টানে মানুষ অমৃত-লোলুপ হইয়া জগৎকে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়। তমঃ ও রজোগুণের রাজ্য অবিদ্যা মায়া, সত্ত্বের রাজ্য বিদ্যা মায়া, কিন্তু দুইই মায়া, মায়া বিস্মৃতি আনে, অজ্ঞানের অপূর্ণ পরিচয়ের ধর্ম্মই

তাই। তমোর গুণ মোহ, রজোর গুণ প্রবৃত্তি বা অনুরাগ, আর সত্ত্বের গুণ প্রকাশ; যতক্ষণ বিরাট সমতার মধ্যে এই তিন গুণ জয় হয় নাই, ততক্ষণ সত্ত্বও প্রকাশের লালসা জাগাইয়া বন্ধন ঘটায়। একটু হইলে মনে হয়, "আরও কেন হইল না; এই তো সেই সুখদ শান্তিময় ধন, জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই ডুবিয়া যাই।" এই অবস্থায় মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সয়তান এবং বুদ্ধের মার গজাইয়াছে,— ভগবানের সঙ্গে আধ চেনাচিনির এইটি ঘোর। তখন মনে হইতেছে,—মন্দটা সে আদৌ নয়, শুধু ভালটাই সে। ভারত কিন্তু ইহার উপরের ভূমিকার কথা বলে,—

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেবচ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি॥"

"প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ—যেটিই হউক, চিত্তে জাগিলে, তাহা দূরে ফেলিতে প্রাণ চাহে না, এবং সরিয়া গেলে, আবার তাহা ফিরিয়া পাইবারও আকাঙ্ক্ষা করে না" —ইহারই নাম নিস্ত্রৈগুণ্যদশা। তখনই শুভ ও অশুভের মধ্যে অখণ্ডতার পূর্ণরূপে জগতের ঠাকুরকে পাইয়া সাধক সমতা লাভ করে নিশ্চিন্ত হইয়া লীলায় থাকে। এই গুহানিহিত তত্ত্ব বড় দুর্লভ, যুগে যুগে হারাইয়া যায়, আবার ভগবান নরদেহ ধরিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া দিয়া যান। দশটি কেন অনন্ত অবতারের মধ্য দিয়া এত লক্ষ শতাব্দী ফুটি ফুটি করিয়া এ সহস্রার কমল বুঝি এতদিনে বিকশিত হইতে চলিল।

খণ্ডজ্ঞানে মানব-চৈতন্য যখন ভগবানের শুভের মঙ্গলের দিককে জড়াইয়া ধরে এবং তাঁর বেদনায় বাহু দুইটীর মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গনব্যাকুলতা প্রত্যাখ্যান করে, সেই যুগে সমাজও ভেদক্লিষ্ট এবং মোক্ষপাগল হইয়া পড়ে। তখনই নীতি-বাদের জন্ম, তখনই পুণ্যলোভীর এই উদ্যতদণ্ড ক্রোধ ও অভিশাপ সমাজ নিয়মের মধ্যে কশাঘাতরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই যুগে কুম্ভিপাক, রৌরব, অবীচি প্রভৃতি নরকের স্রষ্টা কালান্তক যমোপম ন্যায়ভুক্ দণ্ডধারী ভগবানের কল্পনা। এই সব হইল মানুষের ভগবান, কারণ তখন ভগবানের মানুষ হারাইয়া গিয়াছে, ভগবানকে চিনিবে কে?

হিন্দুকে আজ আবার সত্যসংকল্প হইয়া জাগিয়া নিস্ত্রৈগুণ্যের সমতায় দৃঢ় হইতে হইবে, ভগবানের মানুষ হইয়া তাঁর পূর্ণ রূপটি ধরিতে হইবে—জীব যে শিব হইয়াই শিবস্বরূপকে পায়। যতদিন-মানুষ সমাজকে গড়িয়াছে, কালের ইঙ্গিতে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত বিকশিত হইতে হইতে সেই গতির ইতিহাসরূপে কত কত সংহিতার রচনা করিয়া গিয়াছে, ততদিন তবু সমাজদেহে প্রাণ ছিল। মনু বশিষ্ঠ

কশ্যপ গর্গ গৌতম উশনা হইতে পরাশর অবধি উনবিংশ সংহিতা রচিয়া রচিয়া এই বেগবতী সমাজগঙ্গা শেষে স্রোতোহীন শৈবালদলবদ্ধ পল্বলে পরিণত হইল। আর গতি রহিল না: ঋষিপ্রেরণাহীন দেশ সমাজকে গড়িতে রূপান্তরিত করিতে পূর্ণ হইতে পূর্ণতরতায় লইতে ভুলিয়া পুরাতন সমাজের দ্বারা নিজে গঠিত হইতে বসিল। সেই দিন হইতে নিজের বিকাশের উপযোগী যন্ত্র না গড়িয়া পুরাতন যন্ত্রের উপযোগী ও অনুযায়ী করিয়া মানুষ নিজেকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহিল; সেই দিন হইতে জড়যন্ত্র হইল প্রভু, চেতন মানুষ হইল জড় বা দাস।

আজ ঋষিপ্রেরণা আসিয়াছে, আবার মানুষ জাগিতেছে। আজ জীবনের সকল দিকের মুক্তির দিন। আজ আপনার পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দাও, মায়েরও সর্ব্বাঙ্গের একটি শৃঙ্খলও রাখিও না। এই মুক্তির কেবল কামনাটুকুর জন্যই চাই তরুময় জীবন, অপার সাহস, নবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও বিশাল জ্ঞান। এতদিনের বন্ধনে দীন চিত্ত দুর্ব্বল দেহ ক্ষীণ প্রতিভা পূর্ণ মুক্তির দীপ্ত আলোক সহিতে পারিবে না। তাই চাই ভাগবত ভাব সমস্ত দেশ ভরিয়া খেলুক। সেই ধ্রুব দৃষ্টির মধ্যে কেহ পথ হারাইবে না, নবযুগের নবমন্ত্রে পুরাতন নবজন্ম লভিবে, আবার অখণ্ডের কোলে নব বৈচিত্র্যের লীলা-নাট্য বচিবে।

পুরাতনের কোলে নূতন—মায়ের কোলে ছেলে এই তো সৃষ্টি। নবীন যে জগতের মনের কথার ফুটস্বরূপ, তাই সে নিতুই নব নব ভাবশিশুর প্রসবিনী জননী। রূপ পরিগ্রহ যদি ফুরাইয়া যায়—এ রসবসন্ত যদি থমকিয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবানের সৃষ্টি যে শীঘ্রই ছন্দহারা ও মূক হইয়া পড়ে। এ জগন্নাট্যে গতিই যে লয়মঙ্গল নৃত্যময়তা—নব সৃষ্টিই যে ভগবানের বৈকুণ্ঠ। যাহা পুরাতন—বাঙ্গলার এতদিনকার সেই ধনই শক্তি, সেই আদ্যাশক্তির কোলে নূতনের খোকা চাই। মা আমার জগৎ-প্রসবিনী হউক; বঙ্গের শ্যামবসনা নদী-হারমেখলা এই চিরবসন্তশ্রী মায়ের কোলেই শুধু আমাদের নহে, জগতের নব ভাবশিশু বিরাজ করুক। তাহা করিতে হইলে পুরাতনের শ্মশানঘাটে শব আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, নূতনের দোহাই দিয়া নকল করিয়া আত্মঘাতী হইলেও চলিবে না, ভারতের ঋষিপদপূত গঙ্গাজলসিক্ত কুশাসনটি বিছাইয়া দিয়া নব সৃষ্টির অসীম সাহসে যুগদেবতাকে বরণ করিতে হইবে।

ভারত যে যে যুগে কিছু গড়িয়াছে সেই সেই যুগে দেখিও এ দেশ অকুতোভয় বীরের দেশ। নব রচনা বা যুগসৃষ্টি পুরাতনের ভাঙ্গা ইমারতের চুণকাম নহে, তাহা বসন্তের মধুস্পর্শে জীবনের নব হিল্লোল, বিষ্ণু তাহার রচয়িতা। এক

নবীন রচনায় যুগের কি নারী কি পুরুষ দু'জনকেই যুগশঙ্খনাদের ডাকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, "বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়া বিশাল জ্ঞান" পাইতে হইবে, তবেই তো জগৎ সমস্যার সমাধান হইয়া "বিশাল সভ্যতা" গড়িয়া উঠিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুইটি মহা সভ্যতা এই কয় যুগ মুখোমুখী হইয়া ওতঃপ্রোতভাবে মিশিল, এই বিরাট শিবইঙ্গিত কি কিছুই নহে? প্রতীচ্যের এই কর্ম্মসাধনা ও মুমুক্ষুত্ব আর প্রাচ্যের সেই ঋষিদৃষ্টি ও সংযম এবার যে ভাবের অনির্ব্বচনীয় নূতন সভ্যতা রচিয়া দিবে।

তাই বলিতেছি ভারতের ও বঙ্গের কি নারী কি পুরুষ দু'জনেই এই যুগ-মন্ত্রের অধিকারী। যুগলের তপস্যাই সৃষ্টির দ্যোতক। মায়ের শৃঙ্খল মোচন কর; সর্ব্ববিধ মুক্তির মধ্যে দেশে সীতার তুল্য সতী, রাজপুত রমণীর তুল্য বীরাঙ্গনা, মৈত্রেয়ীর তুল্য ঋষি মা গড়িয়া উঠুক। বন্ধনে জীবন পঙ্গু হইয়া যায়, ইহা যদি জাতির জীবনে রাজনীতিতে সত্য হয়, পুরুষের কর্ম্মজীবনে সত্য হয়, তবে নারীর জীবনে সত্য হইবে না কেন? সত্য কথা বলিতে এত ভয় কেন?—"শক্তি মরে ভীতির কবলে, পাছে লোকে কিছু বলে!" সতীত্বধন প্রাণের জিনিস, বাঁধিয়া নরকের ভয় দেখাইয়া জ্ঞানে জীবনে মুক্তিহত বঞ্চিত করিয়া গড়িবার জিনিস নহে। বঙ্গদেশ, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ছাড়া আজও আর্য্যনারী সর্ব্বত্র অবাধমুক্ত, কিন্তু নিখিল ভারতের নারীশক্তিই জ্ঞানপঙ্গু ও পরমার্থরসবঞ্চিত। জ্ঞান না থাকিলে মুক্তি ব্যর্থ হয়, আর ধর্ম্মজীবন না থাকিলে জ্ঞান এবং মুক্তি দুইই জীবনকে লালসার খরগতিতে পঙ্কিল করে।

নীরব উৎসব।

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী বসু।]

নীরব প্রকৃতি-রাণী নীরব এ গৃহখানি
মাধবী চাঁদিনী ও গো বড় যে নীরব ;
তটিনী রূপাব হার— নিশি ভরি অভিসার
আকাশে তারার কাঁপা চুপি চুপি সব।
বহিছে নীরবে বায় ফুলের বুকের তায়
সুরভি সে মনকথা গোপন গরব ;—
যেন গো কাহার লাগি জগতে লুকায়ে জাগি
রচিছে গো প্রকৃতির নীরব উৎসব।

ইউরোপে সমাজবিপ্লব।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

ইউরোপে যুদ্ধ ত প্রায় শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু অন্তর্বিপ্লবের বহ্নি নিবিয়াও নিবিতেছে না। কত মহারাজাধিরাজের সিংহাসন ধূলায় লুটাইয়া পড়িল, কত সমৃদ্ধিশালী নগর জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল, ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রক্তের সমুদ্র বহিয়া গেল ; কিন্তু ইউরোপের উন্মত্ত জনসংঘ এখনও ক্ষান্ত হইতে চাহে না। সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারা কি আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চায়, আর কেন চায়, তাহা না বুঝিতে পারিলে তাহাদের অন্তরের এই তীব্র জ্বালার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর সে জন্য দুই একটা গোড়ার কথার আলোচনার আবশ্যক।

মোটামুটি ধরিতে গেলে ইউরোপীয় সমাজ এখনও চার শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম যাজক সম্প্রদায়। ২য়, অভিজাতবর্গ-বেষ্টিত রাজশক্তি। ৩য়, অর্থসম্পদশালী বৈশ্যসমাজ, ৪র্থ কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়।

এমন এক দিন ছিল যখন যাজক সম্প্রদায়ই ছিলেন সমাজের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। মানুষ যে ইহকালে দুঃখকষ্ট ভুগিয়া মরিয়াই সব জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়াইবে, সে সুবিধাও তাহার ছিল না, কেন না স্বর্গদ্বারের চাবিকাটিটি পাদরি

সাহেবের হাতে। তাঁহাকে প্রণামী না দিলে স্বর্গের হিরণ্ময় দ্বার তখন খুলিত না! প্রভু যীশুর সুপারিশ ভিন্ন যেমন ভগবানের কাছে পৌঁছান অসম্ভব, পাদরী সাহেবের ছাড়পত্র ভিন্ন সেইরূপ যীশুর নিকট পৌঁচানও অসম্ভব। আর এ ব্যবস্থা শুধু জনসাধারণের জন্যই নহে, প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির জন্যও বটে। যাজক সম্প্রদায়ের ক্রোধদৃষ্টিতে পড়িয়া সেকালে অনেক রাজা মহারাজকেও কাঁদিয়া মাটী ভিজাইতে হইয়াছে।

কিন্তু যাজকদিগের আর সে প্রবল প্রতাপ নাই। পরকালের কথা ভাবিবার ভার যাজকদিগের উপর চাপাইয়া দিয়া মানুষ চিরকাল নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। মার্টিন লুথার যেমন বাইবেলের আপনার বুদ্ধিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া পোপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, অপরেও সেইরূপ আপনাপন বুদ্ধিমত ব্যাখ্যা করিয়া লুথারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। বুদ্ধি ত আর কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়! অনেক রাজাও স্ব স্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে পোপবিরোধী সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। ফলতঃ ধর্ম্মের ব্যবসায়ে অনেক অংশীদার জুটিল। পোপ যাঁহার ভবপারের কাণ্ডারী হইতে সম্মত না হইলেন, তিনি আর এক মাঝির নৌকায় গিয়া চড়িলেন। ভবপারের খেয়াঘাটে অনেক মাঝিই পাড়ি জমাইল। ফলে সর্ব্বত্র যাজকসম্প্রদায়ের সে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আর রহিল না; যে যে দেশে রহিল, সেখানে তাঁহাদের রাজশক্তির আনুগত্য স্বীকার করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইল। জনসাধারণকে শাসন ও শোষণ করিবার ভার সম্মিলিত রাজশক্তি ও যাজকশক্তির উপর আসিয়া পড়িল।

কিন্তু রাজকার্য্য চালাইতে গেলে অর্থবল ও লোকবল একান্তই প্রয়োজনীয়। অভিজাতবর্গপুষ্ট রাজশক্তিকে আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হয়। সে বিপুল ব্যয়ভার বহন করিবে কে? যাহাদের গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া এই শ্বেত হস্তীর খোরাক যোগাইতে হয়, তাহারা যতদিন দুর্ব্বল ছিল, ততদিন চুপ করিয়াই থাকিত; কিন্তু ক্রমে বল সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও মুখ ফুটিল। তাহারা রাজার আয়ব্যয়ের হিসাব চাহিয়া বসিল। রাজা অবশ্য একেবারেই এ অপমানটা হজম করিয়া লইলেন না। প্রজাশক্তির সহিত নানাস্থানে নানা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কোথাও বা প্রজা ও অভিজাতবর্গের প্রতিনিধিদের উপর আয়ব্যয়ের হিসাব দেখিবার ভার অর্পিত করিয়া, রাজায় প্রজায় একটা রফা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। আর যেখানে অত্যাচারের মাত্রা অধিক, সেখানে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রাজশক্তি বিনষ্ট হইয়া, প্রজাশক্তির প্রতিনিধিদের উপর শাসন

ক্ষমতা আসিয়া পড়িল। একদিনে এ মীমাংসা হয় নাই, এবং ইউরোপের সমস্ত-দেশে একই সময়ে বা একই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে নাই। তবে ফল প্রায় সর্ব্বত্র একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে যে শাসনশক্তি রাজা, অভিজাতবর্গ (nobles) ও যাজক-সম্প্রদায়ের হস্তে বিন্যস্ত ছিল, এখন ধনী ও মধ্যবিত্ত বৈশ্যশ্রেণী (Bourgeois) তাহাতে বেশ খানিকটা ভাগ বসাইল। বস্তুতঃ যে দেশে শিক্ষাপ্রভাবে, যুদ্ধবিগ্রহে বা অর্থাভাবে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, সেখানে বৈশ্য-শক্তিই প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদেরই অর্থে যাজক-সম্প্রদায় পুষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনকার্য্য পরিচালনের ব্যয় তাহাদেরই অর্থে নির্ব্বাহিত; সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় যে তাহাদেরই শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

বাস্তবিকই ধরিতে গেলে, ইউরোপের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সৈন্যবল সমস্তই বৈশ্য-শক্তির পদানত হইয়া রহিয়াছে। বৈশ্যের ব্যবসায় প্রসারের জন্য যেখানে নূতন ক্ষেত্র আবশ্যক, সেইখানেই ইউরোপের রাজশক্তি নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনে চেষ্টিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াও এই বৈশ্যশক্তির উদর পূর্ণ হয় না; আর তাহা লইয়াই ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঝগড়া, লাঠালাঠি ও রক্তারক্তি। এ বিষয়ে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রে বিশেষ প্রভেদ নাই। সর্ব্বত্রই বৈশ্যশক্তি প্রবল।

কিন্তু যাহারা অর্থবলে বলীয়ান্, তাহাদের অর্থ আসিল কোথা হইতে? আর সমাজের অধিকাংশ অর্থই বা উহাদেরই হাতে আসিয়া পড়িল কেন? কথাটা বুঝিতে হইলে, ধনবিজ্ঞানের দুই একটা মোটা কথার আলোচনা আবশ্যক। কৃষক চাস করিয়া শস্য উৎপাদন করিল। রাজকর, জমীদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ দিয়া যাহা বাকি রহিল, তাহাতে তাহার দিন চলা দায়। সে দিন রাত খাটিয়া মরে, অথচ তাহার পেটে অন্ন নাই, আর খাজনা বলিয়া জমিদার যাহা আদায় করিলেন, তাহাতে বিনা পরিশ্রমে তাঁহার গোলগাল দেহ খানি দিন দিন আরও নধর হইয়া উঠিতে লাগিল। কলকারখানার মজুরদের দেখ। যাহাদের অর্থে কল প্রস্তুত, তাহারা ঘরে বসিয়া বৎসরে শতকরা শতাধিক টাকা সুদ পাইল। যাহারা উৎপন্ন দ্রব্য এদিক ওদিক লইয়া গিয়া বিক্রয় করিল, তাহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থে ব্যাঙ্ক ভরিয়া উঠিল, আর যাহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করিল, তাহাদের কোমরে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই, রোগে চিকিৎসা নাই, পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা

নাই। যাহারা খাটে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, আর যাহারা খাটায়, তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র! অর্থের এ ভাগাভাগির গোড়ায় একটা মস্ত গলদ্ রহিয়া গিয়াছে।

পরিশ্রমের দ্বারা যে যাহা সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাই তাহার সম্পত্তি। জমি ত প্রকৃতির দান; উহা ত কেহ সৃষ্টি করে নাই। তবে জমি জমিদারের হইল কেন? একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, উহার মূলে একটা প্রকাণ্ড জবরদস্তি আছে। ইংলণ্ড যখন নরম্যানদিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইল, তখন উইলিয়ম আপনার অনুচরবর্গের মধ্যে সমস্ত জমি ভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারাই জমির সত্বাধিকারী; আর যাহারা বন কাটিয়া জমি কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিল, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ফসল উৎপাদন করিল, তাহারা দীনাতিদীন "রায়ত" মাত্র। জমিদারের অংশ প্রথমে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তাহাদের প্রাপ্য। পরিশ্রম করিবার বেলা "রায়ত", আর ভোগ করিবার বেলা জমিদার; কেননা লাঠির চোটে জমিদার আপনার সত্ব পাকা করিয়া লইয়াছেন! যে সকল দেশে জমি জনকয়েকের একচেটিয়া সম্পত্তি, সেখানে ঐ একই প্রণালীদ্বারা ঐ স্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে।

আরও একটা কথা। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির খাজনা আপনা হইতে বাড়িয়া যায়। জমিদারের প্রাপ্য অর্থ যে পরিমাণে বাড়িয়া যায়, রায়তের অংশ সেই পরিমাণেই কমে। ফলে, যাহারা ধনবান্, তাহাদের ধনের পরিমাণ বাড়িতেই থাকে, আর যাহারা দরিদ্র শ্রমজীবী, তাহাদের প্রাণধারণ করিবার উপযোগী অর্থও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে।

তারপর কলকারখানার কথা। কলকারখানা হইতে যত আয়, তাহা হইতে সামান্য অংশমাত্র শ্রমজীবী ও তত্ত্বাবধারকদিগকে দেওয়া হয়। অধিকাংশ অর্থ ই অংশীদারদের হস্তগত হয়। অথচ ন্যায়তঃ ধরিতে গেলে, টাকার সুদ ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের প্রাপ্য নহে। লভ্যাংশ হিসাবে তাহারা তাহাদের মূলধনের শতগুণ ফিরাইয়া পাইলেও কলকারখানা তাহাদেরই সম্পত্তি রহিয়া যায়; আর যাহাদের পরিশ্রমের ফলে তাহারা দিন দিন ধনী হইয়া উঠে তাহারা "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া পেট চাপড়াইতে থাকে।

বস্তুতঃ সমগ্র ইউরোপ এই অর্থ বৈষম্যের ফলে ধনী ও নির্ধনের ভীষণ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। একদিকে শ্রমজীবীর দল ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদের প্রাপ্য অংশ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে ধনী সম্প্রদায়ও

আপনাদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া শ্রমজীবীদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিতে সচেষ্ট। একদিকে Trade union অপরদিকে Trust ও Combine। শ্রমজীবীর দল বলিতেছে যে, জমি ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি না, হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হওয়া উচিত, আর অর্থসম্পদ যাহাদের সৃষ্ট, তাহারা পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে তাহার অংশ পাইতে অধিকারী। তাহাদের সে অংশ হইতে বঞ্চিত করা চুরি করা মাত্র।

কিন্তু চোর ত ধর্ম্মের কাহিনী কোনও দিন শুনে নাই। আজ সে কি অনুতপ্ত হইয়া আপনার ভাণ্ডার খালি করিয়া দিতে যাইবে?

তবে প্রতীকার কি? একদল বলিতেছেন, পার্লামেণ্ট বা জাতীয় পঞ্চায়েতে যদি শ্রমজীবীর প্রতিনিধি-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে, তাহারা নিজেই বিধি ব্যবস্থা করিয়া, ইহার প্রতীকার করিয়া লইতে পারিবে। সেইজন্য ইউরোপে প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রমজীবী সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হইয়া, আপনাদের রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আর একদল ইহাতে সন্তুষ্ট নহে। তাহারা পার্লামেণ্টের নামে হাসিয়া উঠে। তাহারা বলে যে, সমাজান্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘর্ষ হইতে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির (Stateএর) উৎপত্তি। স্বার্থের ন্যায়সঙ্গত সামঞ্জস্য করিতে পারিলে Stateএর উৎপত্তিই হইত না। যে সমস্ত শ্রেণী প্রবল, তাহারা অস্ত্র ও অর্থবলে অপর শ্রেণী সমূহকে বাধ্য করিয়া হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই Stateএর কার্য্য। সৈন্য, পুলিশ বা অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারী এই কাজ করিতেই নিযুক্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, শ্রেণী-বিভাগই উঠাইয়া দিতে হয়। আর শ্রেণী-বিভাগ উঠিয়া গেলে Stateও উঠিয়া যায়। সমাজে যতদিন Stateএর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাহা ধর্ম্মনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিৎ Engelsও ঐ কথাই বলেন :—

"Since the state arose out of the need of keeping in check the antagonisms of classes, since at the same time it arose as a result of the collisions of those classes, it is, as a general rule, the state of the most powerful and economically predominant class, which by means of state also becomes the predominant class politically, thereby attaining new means for the oppression and exploitation of the oppressed class."

ভাল কথা; যেখানে শ্রেণী বিশেষের প্রতিনিধি লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত, অথবা যেখানে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক, সেখানে না হয় ধনাঢ্য শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত দেশে আপামর সাধারণ সকলেই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে সমান অধিকারী, সেখানে শ্রমজীবীর দল পার্লামেণ্টে হীনপ্রভ হইয়া থাকিবে কেন? রাষ্ট্রীয় শক্তি আপনাদের ইচ্ছামত চালাইয়া তাহারা আপনাদের দুরবস্থার প্রতীকার করিয়া লইতে পারিবে না কেন? অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা তাহারাই ত অধিক-সংখ্যক।

এ কথার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, যাহারা অর্থবলে বলীয়ান্, তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া এত সহজ কথা নহে; তাহারা দুর্য্যোধনের মত পণ করিয়া বসিয়াছে যে, "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী"। আর ন্যায় যুদ্ধে হারিলেও তাহারা অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে। Engels বলেন:—"In a democratic republic wealth uses its power indirectly, but so much the more effectively, first by means of direct bribery of officials (as in America), secondly by means of an alliance between the Government and the Stock Exchange, (as in France and America)

ঘুষের জোরে হয় না, এমন কাজ খুবই কম। বাস্তবিকই যাহারা ফ্রান্স বা আমেরিকার রাষ্ট্রনীতির সূক্ষ্মতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহাদের একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র ইউরোপে আজ শ্রমজীবীর দল সেইজন্য প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের উপরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ প্রচার করিতেছে।

তবে কি এই বর্ত্তমান অর্থ সমস্যার কোন মীমাংসাই নাই? শ্রমজীবীদের মধ্যে একদল বলেন—"থাকিবে না কেন? এ সমাজ বৃক্ষের সমস্ত রস যে সব আগাছায় শুষিয়া খাইতেছে, সেগুলিকে কাটিয়া ফেল, গাছ আবার ফলে ফুলে শোভা পাইবে।" কবিতার ভাষা হইতে গদ্যে অনুবাদ করিলে, এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যাহারা ভূসম্পত্তি ও অর্থ হইতে বঞ্চিত (proletariat) তাহাদের জোর করিয়া ধনাঢ্যদিগের হাত হইতে রাষ্ট্রশক্তি কাড়িয়া লইতে হইবে এবং সেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিয়া জগতে সাম্যমূলক নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। রুসিয়ায় বলসেভিক সম্প্রদায় ঐ কার্য্যই করিতেছে, এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ভাবের ভাবুকের

সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এই নবোত্থিত গণশক্তির ভয়ে ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রগুলিই আজকাল কম্পমান, সুতরাং এই সমাজের আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালী বিচার করিয়া দেখা অসামঞ্জিক হইবে না।

রাষ্ট্রপরিচালন-শক্তি ইহারা করায়ত্ত করিতে চাহে কেন? শ্রেণীবিশেষের শক্তি খর্ব্ব করাই যখন ইহারা রাষ্ট্রগঠনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, তখন ইহারা কাহার শক্তি খর্ব্ব করিতে চায়? যাহারা অর্থবলে এতদিন সমাজের উপর অযথা কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতে পাইয়া যাহারা এতদিন শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে শাসন ও শোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শক্তিহীন করাই এই শাসন ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম উদ্দেশ্য।

সেই জন্যই দেখিতে পাই যে, রুসিয়ার ধনাঢ্য শ্রেণী (bourgeois) শ্রমজীবিসঙ্ঘে (Soviet) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। প্রতি-দ্বন্দ্বীদিগের ক্ষমতা নষ্ট না করিলে, নূতন ভিত্তির উপর সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না; আর সেই গঠনই ইহাদের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু নূতন সমাজ ত আর একদিনে গড়িয়া উঠে না। রাষ্ট্র-পরিচালন জন্য যে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, শ্রমজীবীদের মধ্যে তাহা নাই; কেন না এতদিন তাহারা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অতীতের সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আদর্শ সমাজ গড়িয়া তুলিতে বহু বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা এখন হইতেই সচেষ্ট। বর্ত্তমান কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিগণের হস্তে দিয়াই নিশ্চিন্ত; কিন্তু শ্রমজীবিসঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী সেরূপ নহে। সঙ্ঘে যে ব্যবস্থা প্রণীত হয় তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিবার ভার সঙ্ঘের সভ্যদিগের উপরই ন্যস্ত। ব্যবস্থার ত্রুটি গুলি তাহাতে সহজেই তাহাদের চক্ষে পড়ে, এবং তাহারা শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনে পারদর্শী হইয়া উঠে। অন্যান্য দেশে আর একটা গোলযোগের কথা এই যে একবার কেহ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইলে দুই তিন বৎসরের জন্য তিনি আপনার ইচ্ছানুরূপে কাজ করিতে পারেন। ফলে তিনি নামে প্রতিনিধি হইলেও কার্য্যকালে প্রভু হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু শ্রমজীবী সংঘের প্রতিনিধিদিগের সেরূপ হইবার উপায় নাই। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন তিন মাস অন্তর হইয়া থাকে এবং সংঘ ইচ্ছা করিলে যে কোন প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীকে যে কোন মূহূর্ত্তে কর্ম্মচ্যুত

করিতে পারে। সকলেই পরিশ্রম করিতে বাধ্য। সকলের উৎপন্ন খাদ্য বা পণ্য সাধারণ ভাণ্ডারে রক্ষিত হয় এবং আপনাপন পরিশ্রম অনুযায়ী প্রত্যেকে সেখান হইতে ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইয়া থাকে। পরিশ্রম যে না করিবে সে আহারও পাইবে না। এই সমস্ত নূতন প্রণালী আমাদের পুরাতন সংস্কার ও অভ্যাসের বিরোধী বলিয়া এগুলিকে যথাযথ ভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের প্রয়োজন।

কিন্তু চরম আদর্শ ইহা নহে। শ্রমজীবিসংঘ (Soviet) আশা করেন যে, এই শিক্ষা ও সংযমের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শক্তির (Stateএর) আবশ্যকতা চলিয়া যাইবে। ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রমশঃ এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে যে, মানুষকে আর জোর করিয়া কাজ করাইতে হইবে না। আর পাওনাগণ্ডার হিসাব লইয়া এত মারামারিও অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি তখন পরিশ্রমের অনুযায়ী ভাগাভাগি না করিয়া এই নিয়ম করিলেই চলিবে যে, প্রত্যেকে আপনার শক্তিমত কাজ করিলেই তাঁহার সমস্ত অভাব সাধারণ ভাণ্ডার হইতে পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। এই আদর্শ অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া Marx বলেন :—

"In the highest phase of communist society after the disappearance of the enslavement of man caused by his subjection to the principle of division of labour, when together with this, the opposition between brain and manual labour will have disappeared; when labour will have ceased to be a mere means of supporting life, and will itself have become one of the first necessities of life, when with the all-round development of the individual, the productive forces, too, will have grown to maturity, and all the forces of social wealth will be pouring in an uninterrupted torrent—only then will it be possible to pass beyond the narrow horizon of bourgeois laws, and only then will society be able to inscribe on its banner; "From each according to his ability, to each according to his needs."

এ সত্যযুগের চিত্র দেখিয়া মন স্বভাবতঃই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু মনের এক কোণে এ সন্দেহও রহিয়া যায় যে, আইন, কানুন বিধি ব্যবস্থা গড়িয়া সেই বন্ধনের নাগপাশে মানুষকে খুব জোরে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেই

কি মানুষ শিষ্ট, শান্ত, ভদ্র হইয়া উঠিবে? আমরা বাহিরের বিধিব্যবস্থা ততটুকুই স্বেচ্ছায় মানিয়া লই, যতটুকু আমাদের ভিতরেরই প্রতিচ্ছায়া। অন্তরেরই রূপ দিয়া আমরা বাহিরকে গড়িয়া তুলি; অন্তরের আনন্দ হইতেই সৃষ্টির অভিব্যক্তি। মানুষের ভিতর যদি প্রেম স্ফূর্ত্ত না হয়, তাহা হইলে বাহিরের দ্রব্যসম্ভারের প্রাচুর্য্যই কি তাহাকে স্বার্থান্বেষণ বা পরস্বাপহরণ হইতে বিরত করিয়া রাখিবে?

আমাদের. দেশের একান্নবর্ত্তী পরিবার কতকটা Communist আদর্শে গঠিত। ভাইয়ে ভাইয়ে যতটুকু প্রেম, ততটুকুই এ আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয়। দ্রব্যসম্ভারের প্রাচুর্য্যের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করে না। অন্তরে প্রেম থাকিলে, মানুষ আধপেটা খাইয়াও ভাইকে খাওয়ায়; আর তাহা না থাকিলে ত্রিতল প্রাসাদের এককোণেও দরিদ্র ভাইয়েব স্থান হয় না। আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থার জোরে কি মানুষ প্রেমিক হইয়া উঠিবে? অহংকার হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার নিকট কি অহংকার মাথা নোয়াইবে?

যন্ত্র-বিজ্ঞান, কল কারখানা ও বিধি ব্যবস্থার উপর ইউরোপের অগাধ বিশ্বাস; তাই সে আজ কলে ফেলিয়া মানুষকে নিঃস্বার্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের যিনি অন্তরাত্মা, নরের হৃদয়ে যিনি নারায়ণ তিনি এই কলে আসিয়া ধরা দিবেন কি? যাঁহাকে লইয়া মানুষের একত্ব, জীবের মধ্যে সেই শিবকে সাদরে অভ্যর্থনা না করিলে, এ মহাযজ্ঞ হয় ত বা পণ্ডই হইয়া যাইবে!

অপেক্ষায়।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।]

প্রিয়তম পুন আসিবে বলিয়া কুটীরে মোর
অঙ্গ ভরিয়া রচেছি মাঙ্গলিক,
সেই আশে আজো বেঁচে আছি স'য়ে এ ব্যথা ঘোর
কখন আসে সে কিছুরি নাহি তো ঠিক।
চাহি দিবা নিশি দৃষ্টির শেষ অবধি পথ
রচিয়া তোরণ অপলক চাহনিতে
সাজায়ে রেখেছি দ্বারে ভাব মম মানস-রথ
আশা—আশঙ্কা তুরঙ্গ দুইটিতে।
হৃদয় বেদীতে আল্‌পনা রচে মোতির হার
লোচনে যুগল প্রদীপ রেখেছি জ্বালি,
চামর দুলাবে নিবিড় এ মোর কেশের ভার
নিঃশ্বাস দিবে ধূপ সৌরভ ঢালি।
কপোলে গলিত অবোধ অবাধ নয়নজল
অভিষেকে দিবে অজস্র বসুধারা,
অধর যুগল চূতপল্লব জীবন দল
বেদিকার পাশে নিরত রহিবে তারা।
প্রসাধন মম চির বসন্ত রাজিবে সেজে
যৌবন-বন মুকুলিবে সে পরশে,
যত দুখ দেছে তত সুখ দিতে আসিবে সে যে,
তাই আছি তার পথটি চাহিয়া বসে।

দ্বীপান্তরের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

সেটেলমেণ্টের পরিচয়।

জেলের একটা মোটামুটি স্বরূপ জ্ঞান হইয়াছে। এখন জেলের বাহিরের ব্যবস্থাটা একবার বর্ণনা করা দরকার। এখানে মহারাজা জাহাজই কয়েদী আনে, প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কলিকাতায় যায়, এই চল্লিশ দিনের মধ্যে দুইবার রেঙ্গুন ও একবার মাদ্রাজ হইয়া আসে। ধরা যাউক একটা কলিকাতা চালানে ১০০ জন কয়েদী লইয়া আসিল, এটা বাঙ্গালী পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী উড়িয়া ও আসামীর চালান। আমাদের সময়ে তখন সাধারণ কয়েদীর চালান আসিলে প্রথম তাহাদিগকে হোপটাউনের কাছে, প্লেগ-ক্যাম্পে (Quarrantine Campএ) নামান হইত। এই ক্যাম্প মাউণ্ট হ্যারিয়েটের ঠিক নীচে, এক জন কয়েদী কম্পাউণ্ডার ও একজন কয়েদী জমাদারের অধীন, যখন এখানে নূতন চালান থাকে, তখন অন্য কয়েদী আসা নিষেধ। পোর্ট ব্লেয়ারে কোন প্লেগ বা এইরূপ সংক্রামক ব্যারাম না আসে, সেই জন্য এইরূপে দুই সপ্তাহ আটক রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কয়েদীরা এখানে এই কয়দিন যেমন আসিত, তেমনি বেড়ি পায়ে পড়িয়া থাকিত, ও মাঝে মাঝে ঘাস কাটা রাস্তা সাফ করা,—এমনি কিছু কিছু সামান্য কাজ করিত।

ষোল দিনের দিন এই চালান প্লেগ ক্যাম্প হইতে জেলে আসিবার নিয়ম। জেলে আসা সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিছানা পত্তরের মোট ঘাড়ে কুব্জপৃষ্ঠ সারি সারি ঝমর ঝম্ ঝমর ঝম্ মল বাজাইয়া ভয়ে জুল জুল করিয়া চাহিতে চাহিতে এই নূতন দল আসে। আগে পিছনে আশে পাশে লাল পাগড়ি ওয়াডারের দল "এই ইধর্", "সিধা চলো", "বৈঠ যাও", "সরকার!" এমান নানা রবে সেই নবাগত ভয়বিব্রত গরুর পালকে তাড়াইয়া আনে। এত বড় কেল্লার মত বাড়ী; কালো উর্দ্দিপরা পেটি অফিসার জমাদার টিণ্ডালের লগুড়হস্ত লালপাগড়ি মূর্ত্তি;

আর ওয়াডারদিগের ভীম চিৎকারে বেচারীদের অন্তরাত্মা প্রায় খাঁচা ছাড়া হইবার দাখিল আর কি। তাহার পর বেড়ি কাটা ও কাপড় ছাড়াব ধুম, এবং পর দিবস মারে সাহেবের ডাক্তারী হিসাবে পরীক্ষার পর ব্যারী সাহেবের কাজ দেওয়া (কামান বাঁটুনা)। সে কামান না কামান একেবারে তোপ। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি বোঁচা নাক আর রক্ত বর্ণ মুখে সেই খোঁচা খোঁচা দুর্দ্ধার গোঁফের ঝোড়া লইয়া একটা মোটা চার ইঞ্চি বর্ম্মা চুরুট মুখে লাঠি বগলে এই জেলখানার যমরাজ সেই সারি বাঁধা fileএর সামনে দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে থাকেন, আর টিকিটে লিখিতে লিখিতে বলিতে বলিতে যান, 'ছে মহিনা কোঠলি বন্ধ্, দো পাউণ্ড ছিল্‌কাকুটো", "এক সাল জেল বন্ধ্, হাঁত কলু পিযো"; "দো সাল্ জেল বন্ধ্,ছে মাহিনা কোঠলি, বন্ধ্,সাব্বল চালাও"; "ছে মহিনা জেল বন্ধ্, তিন পাউণ্ড রস্‌সি বাটো"; "ছে মাহিনা জেল বন্ধ্, পানিওয়ালা তিন নম্বর" ইত্যাদি। যাহারা কলু পাইল, তাহাদেব সে রাত্র দুশ্চিন্তায় নিদ্রা হইবে না; যাহারা পানি-ওয়ালা কি ঝাড়ুওয়ালা হইল বা রসি পাইল তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর যাহারা ছিলকা কুটিবার কাজে বাহাল হইল, তাহারা বুঝিল না যে তাহারা বাঁচিল কি মরিল, কারণ ছিলকা কলু হইতে ভাল বটে, তবু বড় শক্ত কাজ।

এই রকমে সুখে দুঃখে ৬ মাস বা একবৎসর যাহার যে সাজা কাটিয়া একদিন ইহারা জেল হইতে ছাড়পত্র লইয়া রেহাই পাইয়া বাহির হয়। তখন আব ইহারা সে ভয়ত্রস্ত আনাড়ি সবল মানুষ নাই, অনেক সহিয়া ঠকিয়া ঠকাইয়া ওস্তাদ পুরাণ কয়েদীর (Jail bird) হাতে শিক্ষা লাভ করিয়া ঠিক শঠচূড়ামণি না হই-লেও সেই পথে বেশ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। যে দিন ইহাদের রেহাই হইবে তাহার পূর্ব্ব দিন এবার্ডিন ষ্টেসনে টেলিফোন পাইয়া সেখান হইতে একজন টিণ্ডাল ও চার পাঁচ জন পেটি অফিসার চালান লইতে জেলের ফটকে আসিয়া হাজির হয়। কয়েদীরা দেশ হইতে ধুতি কুর্ত্তা ও পাগড়ি পরিয়া আসে, জাঙ্গিয়া কুর্ত্তা ও টুপী পরিয়া জেলে ঢোকে, আবার রেহাই হইবার সময়ে সে পোষাক ছাড়িয়া পুরাণ স্যুট সেই হাঁটুর উপর অবধি পাড়িদার ধুতি কুর্ত্তা ও পাগড়ি পরিয়া পুনর্মূষিক হয়। জেলের চিফ ওভারসিয়ার ব্যারি সাহেব ও গেটকিপার (gate keeper) স্নার বিছানা,বাসন,কাপড় এই ষাট সত্তর বা আশী জনকে সেই বাহিরের টিণ্ডালের হাতে সঁপিয়া দেন। তাহারা ইহাদিগকে "জোড়া জোড়া হো যাও", "খাড়া হো যাও" ইত্যাদি রবে আবার সচকিত করিয়া মোট ঘাড়ে টাপু বা ষ্টেসনে লইয়া চলে। টাপুতে পূর্ব্বদিনই উপরওয়ালার হুকুম আসিয়া থাকে, মুন্সীও জমাদার

সেই অর্ডার অনুযায়ী এই আসামী জনকে ভাগ করিয়া দশ জন বার জন করিয়া এক এক টাপুতে পাঠায়।

পোর্ট ব্লেয়ার তখন চারটা জেলায় বিভক্ত ছিল,—রস জেলা, পূর্ব্ব জেলা (Eastern District), পশ্চিম জেলা (Western District), এবং জেল ডিস্ট্রিক্ট। রসদ্বীপ রাজধানী বলিয়া নিজেই এক জেলা। পূর্ব্ব জেলায় এই কয়টি টাপু বা ষ্টেসন আছে,—এবার্ডিন, ফিনিক্স বে, মিডল পয়েণ্ট, নেভি বে, পাহাড় গাঁও, ও হ্যাডো। এবার্ডিনের বিশেষ কাজ রাস্তাঘাট তৈয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম, নারিকেল ফাইল, জেটিতে মাল বোঝাই, পাথর ভাঙ্গা, ও ঝাড়ু। ফিনিক্স বেতে প্রকাণ্ড সরকারী কারখানা, সে কারখানায় লোহা পিতল ঝিনুক কচ্ছপের হাড় ও কাঠের জিনিষ তৈয়ার হয়, তিন চার শ' লোক খাটে। তা' ছাড়া টাপুর সাধারণ কাজ যেমন ঝাড়ু, রাস্তা তৈয়ারী,পাথর ভাঙ্গা, জল বহা, নারিকেল ফাইল এসব তো আছেই। মিডিল পয়েণ্টের কয়েদীর রাখা নাম, ছোলদারী; এখানকার লোক সাধারণ টাপুর কাজ ছাড়া হয়ড় বা Haddo বাগানে ও সেখান কার ইঞ্জিনিয়ারিং গুদামেও কাজ করিতে যায়। নেভি বে টাপুতে বেশ বড় শাক-সবজি ও ফলের বাগান আছে, সমুদ্রের বাঁধ মেরামতের কাজও আছে। পাহাড় গাঁও হইতে ঐ বাগানে জন খাটিতে আসে, বাঁধেও যায়, জঙ্গলে বেত বাঁশ কাটিতেও যায়। হয়ড়তে বাগান, ইঞ্জিনিয়ারিং গুদাম ও বড় হাঁসপাতাল আছে।

পশ্চিম জেলায় এই কয়টি টাপু,—চ্যাথাম্,শোর পয়েণ্ট,জংলিব্যারাক,ডাণ্ডাস্পয়েণ্ট, ভাইপার, উইম্বার্লিগঞ্জ, কালাটাং এবং বারাটাং,* চ্যাথামে প্রসিদ্ধ কাঠের কারখানা (Saw mill), এখানে সমস্ত আন্দামান ফরেষ্ট বা বনবিভাগের কাঠ মেসিনে কাটিয়া তক্তা, ব্যাটাম, কড়ি ও বরগা তৈয়ার হয়। সোরপেট বা শোর পয়েণ্টে মাছের ফাইল নারকেল ফাইল (gang) ও এঞ্জিনিয়ারিং গুদাম আছে, বাকি সাধারণ কাজ তো আছেই। জংলিব্যারাকের কথা এদেশের বুনোদের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ডাণ্ডাসপেট (Dundas point) ইটের পাঁজা ও কারখানার (Brick kiln) জন্য বিখ্যাত, এখানে কয়েক শত লোক খাটে; টাপুর সাধারণ কাজ খুব কম। ভাইপার পশ্চিম জেলার রাজধানী, এখানে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের আদালত ও বাংলা আছে। এখানকার প্রধান কাজ শাকসবজির

* Chatham, Shore Point, Dandas Point. Viper, Wimberleygunj and Kalatang.

বাগান, জেটি কাইল, খেলিবার মাঠের (Lawn) কার্য, বেত ও বাঁশ কাটা, ঝাড়ু কাইল ও হাঁসপাতাল। উইম্বার্লি গঞ্জে দইবর ও চেলা কাইল আছে; এই স্থান হইতে ঠিক বন বিভাগের আরম্ভ, শোর পয়েন্ট অবধি তার জের যায়। কালাটাং ঘোর জঙ্গলের মধ্যে, এখানে বিখ্যাত যমরাজ তুল্য মিণ্টো সাহেবের (Mr. Minto, Manager) চা বাগিচা, এ স্থান বড় ভয়ের জিনিস,চা বাগিচায় বড় শক্ত কাজ। বারাটাং ঘোর বিজন বনে অবস্থিত, বনবিভাগের একটা বড় আড্ডা।

এক একটি টাপু বা ষ্টেসন মানে ৬।৭টি ব্যারাকের জমায়েৎ। প্রত্যেক টাপু এক এক জন কয়েদী জমাদার ও কয়েদী মুন্সীর অধীনে পরিচালিত, কয়েদী উন্নতি করিতে করিতে দশ বার বছরে গিয়া জমাদার হয়,* তখন লাল পরতলা (Badge) ও পিতলের জমাদার লেখা তকমা পায়। এই তকমা আঁটা তিন ইঞ্চি মাপের পরতলা পৈতার মত গলায় ঝুলান থাকে, জমাদার মাসে আট টাকা মাহিনা ও দৈনিক সিধা (ration) পায়। তাহার নীচে টিণ্ডাল (tindal), তার পরতলা আধা কালো আধা লাল ও টিণ্ডাল লেখা তকমা আটা। এক একজন জমাদারের নীচে, টাপুতে চার পাঁচ জন টিণ্ডাল থাকে। তাহার নীচে আবার পেটি অফিসার (Petty officer), এদের পরতালা কালো, তকমা নাই। প্রতিটাপুতে বিশ পঁচিশ জন পেটি অফিসার থাকে।

এক এক ব্যারাকে ষাট সত্তর জন কয়েদী থাকে, ব্যারাকগুলি কাঠের তক্তার তৈয়ারী, ছাতে টাইল। কাঠের উঁচু মঞ্চের উপর তক্তা আঁটিয়া ফ্লোর বা মেঝে; দেওয়াল বা ভীত নাই, তাহার পরিবর্ত্তে চারিদিক কাঠের ব্যাটামের জাফরী ঘেরা। ঘরে পাশাপাশি চট বিছাইয়া কম্বলের শয্যা রচনা করিয়া তিন সারি লোক শোয়। পাশে পাইখানা। প্রতি ব্যারাকে দুইটি আলো থাকে, চারজন পেটি অফিসার ও একজন জমাদার বা কখন কখন টিণ্ডাল বা পেটী অফিসার পাহারা দেয়। প্রত্যেকের পালা তিন ঘণ্টা। সন্ধ্যার নামে মাত্র ব্যারাক বন্ধ হয়, ঠিক বন্ধ হইবার সময় রাত ৮টার তোপ পড়িবার পর। তাহার পর আর কেহ বাহিরে যাইতে পারে না। একবার ঠিক সন্ধ্যার সময় আর একবার রাত্রি ৮টায় যে যাহার বিছানায় বসিয়া গুনতি দিতে হয়।

সকালে উঠিয়া আবার সেই গুনতি বা গোণার পালা, আগে আগে জবাবদার ও পিছনে যত পেটি অফিসারেরা "আপনা আপনা বিস্তারামে বইঠ যাও" এই হাঁক মারিয়া সবাইকে বসাইয়া ভেড়া গণা করিয়া গুণিয়া গেল। তাহার পর সব বাহির হইয়া শৌচক্রিয়া ও মুখ হাত ধোয়া সারিয়া লইতে হয়। এক

একটা কাঠের ডোল vat বা পিপা আছে, তাহাতে সমস্ত দিন খাটিয়া পাণিওয়ালারা মিষ্ট জল ভরিয়া রাখে। মিষ্ট মানে কেহ যেন কেওড়া দেওয়া চিনির সরবৎ মনে না করেন, এটা নোনা জলের দেশ, মিষ্ট বা মিঠা পাণি মানেই পানীয় জল। সকলকে লোহার বাটি লইয়া এই পাণিওয়ালার কাছে যাইতে হয়, সে ছোট টিনের মগে করিয়া জল দেয়, তাহাতে মুখ হাত ধুইতে হয়।

তাহার পর ফাইল হইয়া আবার জোড়া জোড়া বসিবার পালা। সেলি লিখিয়া ছিলেন "প্রেমের তত্ত্ব"—love's philosophy, তাহাতে কবি বলিয়াছেন এজগতে সব যুগল, একা কেহ নাই। পোর্ট ব্লেয়ারের পেটি অফিসার টিণ্ডেলরা এ প্রেমের দর্শন শুঁতার বলে প্রমাণ করিতে সদা ব্যস্ত, "জোড়া জোড়া হো যাও" এ রব দিবারাত্র উঠিতে বসিতে যখন তখন শুনিতে হয়। বিদ্রোহী হইয়াছ কি লাঠির খোঁচা পেটে পিঠে যেখানে হউক এক জায়গায় খাইয়াছ। ইঁহাদের অঙ্কশাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান যে মানুষ যুগলে যুগলে না বসিলে গুনিয়া উঠিতে পারে না। "রাম দো তিন" বলে বেশ গণিয়া যাইতেছে, যেই দেখিল দশ জোড়ার পরে এক হত ভাগ্য একা বসিয়াছে, অমনি সব গোলোযোগ হইয়া গেল। তার পর সেই দুরদৃষ্ট পাতকীর উপর মুষ্টিযোগ লাঠৌষধি প্রয়োগ করিয়া একজন দাড়ীওয়ালার সহিত তাহার ক্ষণিক উদ্বাহবন্ধন ঘটাইয়া, তবে আবার গুনিবার পালা।

সকালের এই ফাইলে সব কয়টি ব্যারাক বা বিভাগের কয়েদী সারে সারে জমায়েত হয়। তাহার পর "সব ঠিক" রিপোর্ট পাইলে, জমাদার ও মুন্সী টাপুর কাজ অনুসারে ফাইল ভাগ করে। এক দিক হইতে দশ কি পনর জনকে উঠাইয়া জমাদার আর একদিকে বসাইয়া এঞ্জিনিয়ারের ফোরম্যানের সোপরুদ্দ করিয়া দেয়, মুন্সী অমনি তাহা লিখিয়া লয়, এই হইল P W D ফাইল। তাহার পর ৩০ জনকে লইয়া জমাদার বাগানের জবাবদারের হাতে সমর্পণ করে, অমনি কাগজ কলমধারী চিত্রগুপ্ত তাহা নথীগত করে। এই হইল বাগান ফাইল। এবম্প্রকার কর্ম্মটার নাম ফাইল বাঁটা বা ভাগ করা। তাহার পর যে যার দল লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া দশটা অবধি আপন মনোমত কাজে এক এক জনকে লাগাইয়া রাখিল। দশটার পর হাঁক ডাক করিয়া গণিয়া গাথিয়া আবার টাপুতে আগমন ও জমাদারের কাছে গুন্তি দেওয়া। তাহার পর স্নান আহার ও একটা অবধি বিশ্রাম। একটার পর আবার ফাইল, যে যার পেটি অফিসার বা টিণ্ডালের কাছে দল বাঁধা ও কাজে যাত্রা। বিকাল ৪৫, টার

সময় ছুটি। ৫ টার আহারের জন্ত থালা বাটী পাতিয়া সারে সারে বসিয়া খাওয়া, আহার ও সন্ধ্যা অবধি টাপুর কাছে ঘুরা ফিরা গল্প গুজব করা!

দশটার খাওয়ার পর ও এখন বৈকালেখ্যাবাক বন্ধ হওয়া অবধি গাঁজাখোরের লুকাইয়া দু'টা দম দিবার অবসর, জুয়াড়ির জুয়ার মাহেন্দ্র ক্ষণ, অর্থোপার্জ্জকের মাছ ধরিয়া বনে পান তুলিয়া কত ছুতা নাতায় দু'পয়সা করিবার সুবিধা, এবং জমাদার মুন্সী টিণ্ডাল মেট (রেসনের গুদামের মালিক বা রসদার) হেড্ ভাণ্ডারী প্রভৃতি প্রত্যেকের চাটুকারের দলের সমাবেশ, এবং স্ব স্ব পালকের তেলা পায়ে তেল ডলা। এ সব কথা দুই বৎসর পর আমাদের জেল হইতে বাহির হইবার সময়ে আরও বিশদ করিয়া বলিব।

রবিবারে কাজ কর্ম্ম নাই, সকালে টাপুর চতুর্দ্দিকের ঘাস আবর্জ্জনা পরিষ্কার মাত্র দুই এক ঘণ্টা করিতে হয়। সমস্ত দিন শুইয়া বসিয়া থাকিতে পার, বা জমাদার কি টিণ্ডালকে বা তোমার ব্যারাকের জবাবদারকে দু'চার আনার বা মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া অন্ত টাপুতে বন্ধুসম্মিলনের আশায় পগার ডিঙ্গাইতে পার। এই তো গেল মোটামুটি বাহিরের জীবন।

সামাজিকত্ব ও জীবত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]

সমাজের বিকাশ পক্ষে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি খুব বেশী কার্য্যকরী হইয়াছে বলিয়া, সমাজ এক অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু উহা কৃত্রিম হইলেও, উহার সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মানুষ উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছে এই জন্যই সে সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থের সহিত সর্ব্বদা এক নহে। মানুষ জীব হইয়াছে কোন্ এক অজ্ঞাতকালে. সেই অজ্ঞাত-কালের তুলনায় তাহার সমাজ জীবন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে অতি অল্পদিন হইল। এই অল্পদিনের মধ্যে—তাহার জীব-জীবনের তুলনায় এই অল্পদিনের মধ্যে—তাহার সমাজজীবন যে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষ হইয়া উঠিবে এবং ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ অভিন্ন হইয়া যাইবে, এইরূপ আশা করাই অন্যায়। "কোটি-পুরুষ পরম্পরায় বিকাশ-প্রাপ্ত জীব-সাধারণ জৈবপ্রবৃত্তিসমূহের" সহিত তাহার

সমাজ-জীবনের নিবৃত্তিমূলক ভাবগুলির নিখুঁত সংযোগ ঘটাইতে কিছু সময় লাগিবে বৈ কি? যতদিন না সেই নিখুঁত সংযোগ সাধিত হইবে—যতদিন মানুষের সমাজ-জীবন অসম্পূর্ণ থাকিবে, ততদিন সমাজ-জীবনের সহিত তাহার ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্বও অনিবার্য্য। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য, মানুষের পূর্ণত্ব পাইবার জন্য ব্যক্তির অভিব্যক্তি যেমন আবশ্যক, সামাজিকত্বের অভিব্যক্তিও তেমনি আবশ্যক। এই ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকত্বে যে দ্বন্দ্ব, তাহার জয় শেষ পর্য্যন্ত যাহাই হউক, মানুষ এই উভয় দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া "স্ফূর্ত্তি লাভ করুক, পুষ্টি লাভ করুক, অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হউক।" মনুষ্য-প্রকৃতির ইহাই বিধান, শুধু মনুষ্যপ্রকৃতি কেন, জীবপ্রকৃতিরও এই বিধান।

মানুষের সামাজিকত্বের বা সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তিতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন আজও আপনার "হাত খেলাইবার তেমন অবসর পায় নাই।" এই জন্যই মানুষের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বোধ হইতেই তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপ-পুণ্য-বোধের অভিব্যক্তি।

যতদিন না মানুষের সামাজিকত্ব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আমলে আসিতেছে, ততদিন তাহার ব্যক্তিত্বের ও সামাজিকত্বের বিরোধ একেবারে দূর হইতেছে না। অথচ একের উপর অপরের অস্তিত্ব, পুষ্টি ও শক্তি নির্ভর করিতেছে। সেই জন্যই "যে সমাজে ব্যক্তি যত উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজ সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। জীবে জীবে যেমন দ্বন্দ্ব, মনুষ্যে মনুষ্যেও তেমনি দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিগত পুষ্টি। আবার সমাজের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের সহব্যাপী। ভিতরে যেমন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাহিরে তেমনি দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, সমাজে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। কোন্ সমাজ দুর্ব্বল? যাহার মধ্যে ব্যক্তির প্রভাব অধিক, সামাজিকত্ব যেখানে জমে নাই। কোন্ সমাজ সবল? যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমবেত সমাজ-শক্তির করায়ত্ত। কাহার পরাজয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের প্রতিকূল, যেখানে ব্যক্তি-জীবন আপনাকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কাহার জয়? যেখানে ব্যক্তি-জীবন সমাজ-জীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে, যেখানে নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত রাখে।"

এই জন্যই "যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম, তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি

উপদেশ দেয়।—সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, মনুষ্য যাহা স্বভাবের নিকট পাইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করে; সে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। তাহার নির্দ্দেশে অন্তঃশরীর স্বাস্থ্যলাভ করিবে, জীবন বললাভ করিবে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রকৃতি তোমার প্রতি নিষ্ঠুর, কিন্তু তিনি তোমার যশঃশরীরে দয়ালু। প্রকৃতি তোমার যশঃশরীর রক্ষা করিবেন। তুমি তাঁহার আদেশ পালন কর।"

তাঁহার আদেশ পালন করিলে মানুষ সুখ কেন আনন্দও পাইবে। মানুষের দুই প্রবৃত্তি—জৈব প্রবৃত্তি ও মানবিক প্রবৃত্তি। জৈব প্রবৃত্তির আদেশ পালনে রত থাকিয়া মানুষ-রূপী জীবেরও সুখ ছিল—যেমন অপর অপর ইতর জন্তুরও আছে; "কিন্তু মানবিক প্রবৃত্তির আদেশ পালনেই কি সুখ জন্মিবে না? এই মানবিক প্রবৃত্তি পরার্থমুখী, এই প্রবৃত্তির আদেশে পরার্থপালনেই মানব সুখ পাইবে। মনুষ্য সুখান্বেষী রহুক, ক্ষতি নাই, এতদিন স্বার্থ সাধনে তাহার সুখ ছিল, এখন পরার্থসাধনেই তাহার আনন্দ জন্মিবে।"

"এমন দিন কি মনুষ্যের অদৃষ্টে আসিবে না, যখন জীবধর্ম্ম ও মানব-ধর্ম্ম পরস্পর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, উভয়ে যখন মিশিয়া এক হইয়া যাইবে? স্বার্থসাধনে যখন পরার্থে ব্যাঘাত পড়িবে না, পরার্থসাধনে যখন স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে। মানুষ (তখন) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পরসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। ব্যাঘ্রী যেমন স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশু সন্তানের প্রাণের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখলাভ করে, মানুষও তখন কেবল আপন শিশুর জন্য নহে, আপন পিতা বা ভ্রাতা বা বান্ধবের জন্য নহে, দূরস্থিত অপরিচিত মনুষ্যের হিতের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিবে। পরই তখন আপন হইবে, আত্মপর তখন বিভেদ থাকিবে না। সন্তান পিতামাতার অঙ্গীভূত, ফল যেমন বৃক্ষের অঙ্গীভূত। সন্তান পিতামাতার পক্ষে পর নহে, শাখাও যেমন বৃক্ষের অনাত্মীয় নহে।"—"শাখা যেমন গাছের অবয়ব, পত্র পুষ্প যেমন গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বীজ ও তজ্জাত বৃক্ষ আপাততঃ স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত হইলেও, সেই একই সম্বন্ধে পিতৃবৃক্ষের অংশীভূত। আবার এক প্রোটোপ্লাজম্ হইতে যখন জীবমাত্রের উদ্ভব স্বীকার করিতে হয়, তখন প্রাণিমাত্রকেই এক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। আমার, তোমার, তাঁহার, সকলেরই শরীর সেই এক পিতৃশরীর হইতে উদ্ভূত

অভিব্যক্ত।” সুতরাং “মনুষ্যসমাজে ছোট বড় যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকলেই এক প্রকাণ্ড মানব জাতিরূপ মহা অশ্বত্থের শাখাভূত অঙ্গমাত্র। আপনার পর কোন বিভেদ নাই। পরার্থে ও স্বার্থে বিভেদ নাই। স্বার্থ পরার্থের অনুকূল, পরার্থ স্বার্থকে জাগ্রত করে। স্বার্থান্বেষণে সুখ, পরার্থান্বেষণে কেনই বা সুখ না হইবে?”

বাস্তবিক, “ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু (তো) একটা ত্যাগ স্বীকার, বহির্জগতের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আপন অস্তিত্বলোপের অঙ্গীকার। কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকার একটা অস্থায়ী সন্ধি-বন্ধন মাত্র। আমি পরাস্ত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িলাম মাত্র, কিন্তু যাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম, যাহাদের জন্ম দিয়া গেলাম, তাহারা আমা অপেক্ষাও যোগ্যতর, তাহারা বীরের মত লড়াই চালাইবে। জীবের ঝাড় রক্তবীজের ঝাড়; রক্তবীজ মরিয়াও মরে না, তাহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে উত্থিত হয়, একজন যায়, দশজনকে রাখিয়া যায়, দশজন যায়, শতজনকে রাখিয়া যায়, শতজনের স্থল সহস্রজনে পূর্ণ হয়। সংগ্রামের ভীষণতা বাড়ে মাত্র, জীবনযুদ্ধ যুগের পর যুগ ধরিয়া ভীষণতর হয়, জীব নূতন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হয়। সমস্ত জড়-জগৎ জীবনকে বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, জীবন লুপ্ত হইতে চায় না, ব্যক্তিজীবন লুপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু জাতীয় জীবন লুপ্ত হইতে চাহে না। ব্যক্তিজীবন জাতীয় জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্যু অঙ্গীকার করে। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু জাতি বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্তিজীবনের সহিত জাতীয়-জীবনের কাজেই বিরোধ, বংশরক্ষার জন্য ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু-অঙ্গীকার, পুত্রের অভ্যুদয়ের জন্য পিতার মৃত্যু স্বীকার, সুতরাং পিতা-পুত্রে বিরোধ।” কিন্তু সে বিরোধ আপাতঃ বিরোধ, কারণ মৃত্যু তো দেহ-পরিবর্ত্তন মাত্র, এক আন্তর আমির এক দেহ হইতে বহু দেহের মধ্যে আবেশ মাত্র, সুতরাং মৃত্যুও মৃত্যু নয়। মৃত্যুর আবরণ দিয়া ব্যক্তি জাতিরূপে প্রকাশ পায়, আপনার আমিত্বের প্রসার ঘটায়। সুতরাং সমাজ-রক্ষার জন্য নিজের স্বাধীনতাকে, স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করিতে সঙ্কুচিত হওয়া, ভয় পাওয়া ভুল। ধর্ম্মপালন কোন কালেই ব্যর্থ যায় না। তাহা জয়যুক্ত হয়ই। তবে সে জয় দেখা তোমার আমার এই দেহ-কালের মধ্যে না হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয় হয়ই।

মৃত্যু যেমন একটা ত্যাগ, এই বিশ্বসৃষ্টিও সেইরূপ একটা ত্যাগের ফল। আন্তর-আমি যিনি ব্রহ্ম যিনি, সেই তিনি নিজের ঈশিত্ব ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিশ্বরূপে ভূতরূপে, জীবরূপে কল্পনা করিয়া লীলাপর হইয়াছেন। তাঁহার এই লীলাতেও তাঁহার জ্ঞানময়ত্বের ত্যাগ দেদীপ্যমান্। জীবরূপী ব্রহ্ম যদি বুঝিতে পারে, সে ব্রহ্ম, তাহা হইলে তাহার কি আর মূঢ়ভাবে লীলা করা চলে? জগৎটাই যখন ত্যাগের কাণ্ড, তখন আর ত্যাগাত্মক ধর্ম্মপালন করিতে সঙ্কোচ করা কাহারও সাজে কি?

"ঈশোপনিষৎ এই কথাই বলিয়াছেন—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'- এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের ঈশিত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, ঈশ্বররূপী আমিই (আন্তর আমিই) আপনাকে প্রসারণ করিয়া —বিলাইয়া দিয়া সেই সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি আত্মত্যাগ দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই আমার ভোগের বিষয় হইয়াছে। মূলে ত্যাগ না থাকিলে ভোগ ঘটিত না। অতএব 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই ইহা ভোগ্যরূপে কল্পিত হইয়াছে - ত্যাগই এখানে ভোগ—অন্যরূপ ভোগ জগৎ ব্যাপারের প্রতিকূল। অন্যরূপে ভোগ করিতে গেলে, জগৎ ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'—এ সমস্তই যখন আমার—অন্যের ইহাতে কোন অধিকারই নাই—কেন না অন্য কেহ বিদ্যমান নাই, তখন ইহাতে গৃধ্নুতার—লোভের—প্রয়োজন কি? নিজের ধনে কে নিজে লোভ করে? অতএব লোভ করিও না—ত্যাগ কর। এই ত্যাগই কর্ম্ম—এতদ্ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। 'কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াই পৃথিবীতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে—ভাক্ত বৈরাগ্য দ্বারা সমস্ত জগৎকে হেয় জ্ঞান করিয়া, আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম কর ও শতায়ুঃ হইতেই ইচ্ছা কর—'এবং ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে',—এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, যাহাতে জীবকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যেহেতু তুমি জীব—তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। ত্যাগরূপ কর্ম্ম কর—তাহাতে তোমার উপরে আর নূতন কর্ম্মের প্রলেপ পড়িবে না। এই কর্ম্মেরই নামান্তর ধর্ম্ম।"

ত্যাগেরই অপর নাম যজ্ঞ, যজ্ঞই নিত্যকর্ত্তব্য। "যজ্ঞ শব্দটি কেবল বেদপন্থী সমাজের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ ছিল না। উহা ব্যাপক অর্থে

প্রবুদ্ধ হইত। যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য্য ত্যাগ, এই কথাটি স্মরণ রাখিলেই বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্ঞের মহিমা বুঝিতে পারা যাইবে। জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য-সাধন যজ্ঞ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ কল্পনা জ্ঞানান্ধ প্রবৃত্তিপ্রবণ মনুষ্যের সহজ ধর্ম্ম। মানুষ সহজে ত্যাগ করিতে চায় না, ভোগ করিতে চায়। ঈশোপনিষৎ দেখাইয়াছেন, এই ধারণা ভ্রান্ত। ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় (স্বরূপ) এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল। জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক, ত্যাগই ভোগ। জীব জগতের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই জগৎ ভোগের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই অধীনতা একরূপ ঋণ-স্বীকার। জীব জগতের নিকট (ও সমাজের নিকট) নানা ঋণে আবদ্ধ। বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র এই ঋণের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—মনুষ্যের নিকট ঋণ, ভূতগণের নিকট ঋণ, পিতৃগণের নিকট ঋণ, দেবগণের নিকট ঋণ, এবং সর্ব্বশেষে ঋষিগণের নিকট ঋণ; এই পঞ্চবিধ ঋণ লইয়া মনুষ্যকে জীবরূপে সংসার যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়। এই পঞ্চঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের পক্ষে নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাহাকে জগতের নিকট (তথা সমাজের নিকট) আপনার ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

"বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারই একটা যজ্ঞ—পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন। প্রজাপতি স্বয়ং এই যজ্ঞের যজমান; দেবগণ এই যজ্ঞের ঋত্বিক্। আবার যিনি যজমান, যাঁহার হিতার্থ এই যজ্ঞ, সেই বিরাট্-পুরুষরূপী প্রজাপতিই এই যজ্ঞের পশু। যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেবতা। ত্যাগের উদ্দেশ্যেই ত্যাগ—এই ত্যাগের অন্য কোন কামনা হইতে পারে না। 'যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ'—দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই,—ত্যাগ স্বীকার দ্বারাই,—(কর্ত্তব্য পালন দ্বারাই)—যজ্ঞরূপী দেবতার যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহগণ—ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ—মানবসমাজ গঠনকালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"

গীতায় শ্রীভগবানের সেই উক্তি স্মরণ কর—প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলিতেছেন—তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যে যজ্ঞের (কর্ত্তব্যজ্ঞানের, ত্যাগশক্তির) সৃষ্টি করিলাম, তাহা দ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর, উহা তোমাদের

অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর, আর দেবগণও এই যজ্ঞের দ্বারা (নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন দ্বারা) তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পরের সংবর্দ্ধনা করিয়া তোমরা সকলে পরম মঙ্গল লাভ কর। যজ্ঞের অবশিষ্ট বা হুতাবশেষ যাঁহারা ভোজন করেন,—পঞ্চ মহা-যজ্ঞ পালন করিয়া ত্যাগের পর যাহা পড়িয়া থাকিবে, তাহাতেই যাঁহারা সন্তুষ্ট হন, তাঁহারাই সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন। আর যাহারা কেবল নিজের জন্য পাক করিবে, পরকে যাহারা অন্নভাগ দিতে চাহিবে না, তাহারা যাহা খাইবে, তাহা অন্ন নহে—পাপ। মনে রাখিও—অক্ষর ব্রহ্ম প্রজাপতি হইতেই কর্ম্ম,—কর্ত্তব্য কর্ম্ম - যজ্ঞ,—উদ্ভূত হইয়াছে, আর সেই ব্রহ্ম বা প্রজাপতি সেই কর্ম্মের মধ্যে, সেই নিত্যসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং কর্ম্ম করিতে থাক—আসক্তি ত্যাগ কর—নির্লোভ হও - আর—

যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যাহা যজ্ঞ বা ত্যাগ করিবে, যাহা দান করিবে, যাহা তপস্যা করিবে, সে সমস্তই (অর্থাৎ যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্যই) আমাতে অর্পণ করিয়া কর; আমার জন্য কর। তাহা হইলে শুভাশুভ ফলের জন্য দায়ী হইবে না, কর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না; অন্তিমে পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া আমাতেই আবার মিশিয়া যাইতে পারিবে। সুতরাং

সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তিজীবনে আপাততঃ বিরোধ দেখিয়া ভীত হইও না, সমাজ-জীবনের পুষ্টির জন্য ত্যাগ কর —আত্মবলিদান দাও —দিয়া ব্যক্তি জীবনকে ধন্য কর। *

* ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন শুক্রবার শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লোকান্তর ঘটে। সেই দিন হইতে গণনা করিয়া যে দিন তাঁহার শ্রাদ্ধবাসর বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেই দিন অর্থাৎ ১৬ই জুন সোমবার রাজসাহী জেলে বিনাবিচারে আবদ্ধ বন্দীরা অনশন থাকিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়, প্রবন্ধটি প্রধানতঃ তাঁহার কর্ম্মকথা প্রবন্ধটিকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত হয়। উদ্ধৃত অংশগুলি সমস্তই তাঁহার রচনা। বাকি অংশের (ভাল নহে) ভাষামাত্র (তাহাও বোধ হয় সর্ব্বত্র নয়) সঙ্কলনকর্ত্তার। এই সংযোজক সূত্রগুলি সঙ্কলনকর্ত্তা রামেন্দ্র বাবুর গ্রন্থপাঠ করিয়াই পাইয়াছেন, তাহাতে তাহার নিজের বলিয়া দাবী করিবার কোন অংশ আছে কিনা সন্দেহ। বিন্যাসদোষে যদি বিষয়ে জটিলতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ রামেন্দ্রবাবুর নয়, সঙ্কলনকর্ত্তার। সে জন্য তিনি পাঠকদিগের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি ও তুমি।

[শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

১

আমি সুদূর শ্রান্ত পথের পথিক
তুমি চির নিরমল বারি,
আমি পিপাসিত চিতে তোমারি অমৃতে
সদা ভরি' লব হেম ঝারি।
আমি ধরা মাঝে যেন রহিব আঁধার
তুমি ফুটিবে নবীন রবি,
আমি চক্ষু মেলিয়া হেথায় সেথায়
শুধু হেরিব গো প্রেম-ছবি।
আমি তোমার আলোকে ঢেলে দিব প্রাণ
তুমি আমাতে বিকাশ র'বে,
আমি কাঁদিব গাহিব নয়নের জলে
তব মহিমান্বিত ভবে।

২

আমি নিদ্রায় যবে রহিব মগন
তুমি হ'বে প্রভাতের পাথী,
আমি স্বপনে যদি গো থাকি অচেতন
তুমি খুলে দিও জ্ঞান-আঁখি।
আমি কর্ম্মক্ষেত্রে কৃষাণ-সমান,
তুমি দিবে শুধু বীজ আনি;
আমি রৌদ্রতপ্ত ধূসর ধূলায়
যাব সবলে লাঙ্গল টানি'!
আমি শ্রান্তি সাগরে হ'তে পরপার
যাব অপারে তরণী বাহি',
তুমি দিয়ে যেয়ো শুধু ধৈরয-বারি
আমি ল'ব তাহে অবগাহি!

৩

আমি অন্ধ আতুর হতাশের মত,
তুমি লয়ে যাবে হাত ধরি' ;
আমি লুটিব পড়িব চরণের তলে
তব অপার করুণা স্মরি।
তুমি ফুলের মাঝারে ফুটাবে পরাগ,
কালো ভ্রমরে দিয়েছ পাখা ;
আমি লুব্ধ অলির ফুল-বধূ-বুকে
প্রেমে হেরিব মাধুরী মাখা।
তুমি দিয়েছ নয়ন দেখাইতে রূপ
কত রচিতে নূতন মায়া,
আমি কায়াব মাঝারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া
সদা পূজিব সে স্নেহ-ছায়া।

৪

তুমি আছ বুকে সদা আশার অতীত,
আমি আশায় অসাধ্য বাঁধি ;
তুমি অবাধে লুকায়ে থেকো যথা তথা
আমি জাগায়ে রাখিব আঁখি !
চির বিরাগীর মত র'য়ো উদাসীন
আমি অনুরাগে ল'ব খুঁজি,
মোর ইহ পরকাল সার্থক করা
সেই সাধনার ধনে বুঝি।
তুমি দূরে দূরে থাকি' রেখো জিজ্ঞাসা,
আমি কয়ে যাবো মন খুলে ;
তুমি কাছে এলে চির আপন হইয়া
আমি সব যে গো যাবো ভুলে !

অনন্তানন্দের পত্র।

ভায়া, সারা ভারতটা'ত টো টো করে ঘুরে এলুম, দেখলুম সর্ব্বত্রই সমাজের ঐ এক দশা। বুড়ো কর্ত্তারা প্রাণপণে মড়া আগলে বসে আছেন, আর শাস্ত্র বচন আউড়ে প্রতিপন্ন করছেন যে এটা যখন তাঁদের প্রপিতামহদের মড়া তখন সযত্নে রক্ষা করতেই হবে। দুর্গন্ধে যখন দেশ বিদেশ ভরে উঠছে তখন কর্ত্তারা চারদিকে একটু করে গঙ্গাজল ছিটাচ্ছেন আর যে সব কুকুর শেয়াল মড়াটার উপর টাঁক করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বাপান্ত করছেন।

জন কয়েক ছেলে ছোকরা একবার মড়াটাকে টেনে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার ব্যবস্থা করেছিল; কর্ত্তারা যে রকম হাঁ হাঁ হাঁ করে উঠলেন তাতে তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পেলে না। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ রাগ করে মেম বিয়ে কোরে সাহেব সাজলে; কেউ কেউ কিন্তু আবার হাত দেড়েক লম্বা টিকি গজিয়ে বুড়োদের দলে ফিরে এসে ঘোরতর সাত্ত্বিক সেজে ঝাড়, ফুঁক, তুকতাকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যোগ দিলে।

এদিকে দুর্গন্ধে ত রাস্তা চলা দায়। কিন্তু বুড়ো কর্ত্তারা আর ততোধিক ক্ষুদে কর্ত্তারা নাকে, কাণে তুলো গুঁজে এমান নিরেট হয়ে বসে আছেন যে পচও তাঁদের চোখে পড়ছে না, আর গন্ধও তাঁদের নাকে ঢোকবার জো নেই; মড়ার অষ্ট বন্ধন একটু খানি ঢিলে হ'লেই নাকি পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন এই, মড়ার সদ্গতি হবে কি কোরে? মড়া বল্লেই যে কর্ত্তারা চটে উঠেন।

মড়ার লক্ষণই এই যে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে নিজেকে পরিবর্ত্তন করতে পারে না; কোন জিনিস আত্মসাৎ করে নিজেকে পুষ্ট কর্‌বারও তার শক্তি নেই; আত্মরক্ষা করতেও সে অসমর্থ। সে শুধু যেমন ছিল তেমনি পড়ে থাকতে জানে।

সনাতন সমাজ বলে যিনি আড়ষ্ট হয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে পড়ে আছেন, এই আজ হাজার বছর ধরে তিনি আত্মরক্ষার খাতিরেও আর স্বেচ্ছায় নিজেকে পরিবর্ত্তন করতে পারেন নি। মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে যাঁরা সমাজকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই স্বতন্ত্র

সমাজ গড়ে তা' করতে হয়েছে। নানক, কবীর, নিত্যানন্দ সকলেরই ঐ এক অবস্থা। সমাজ রক্ষণ আর পরিবর্ত্তনের ভার যাঁদের উপর, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এ সব নূতন সম্প্রদায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। অথচ সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুসলমানেরা গ্রাস করতে লাগ্‌ল, তাদের রক্ষা কর্‌বারও কোন চেষ্টা করেন নি। মুসলমান যখন বাড়ীর ভিতর এসে পড়্‌ল, তখন কর্ত্তারা অন্দর মহলে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে ব্যবস্থা দিলেন যে, মুসলমানকে ছুঁলে জাত যাবে। কিন্তু ক্রমাগত পিছে হটা আর পালান ভিন্ন যাঁরা আত্ম-রক্ষার অন্য উপায় খুঁজে না পান, পৃথিবীতে তাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। যে শিখজাতি না জন্মালে পঞ্জাবে হিন্দুর নাম লোপ পেয়ে যেত, হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা তাঁদের হাত থেকেও জল খেতে সঙ্কুচিত। পাছে জাতটি মারা যায়!

আমাদের বাংলা দেশেই দেখ না, আদিশূর, বল্লালসেন আর রঘুনন্দন সমাজকে যে ছাঁচে ঢেলে গেলেন, আমাদের টোলের পণ্ডিত মশায়েরা প্রাণপণে সেই ছাঁচখানি আঁকাড় পড়ে আছেন। একটু উনিশ বিশ হলেই তাঁদের সনাতন ধর্ম্মের প্রাণটুকু ফুস করে বেরিয়ে যাবে! অথচ যে যুগে সমাজে বাস্তবিকই প্রাণ ছিল সে যুগে লোকে সমাজে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন করতে অত আঁত্‌কে উঠ্‌ত না। শুধু অতীতের দিকে চেয়েই দিন কাটাত না।

ধর্ম্ম জিনিসটা সনাতন বলে কি সমাজের গড়নটাকেও সনাতন হতে হবে? সমাজের পরিবর্ত্তন যদি এত মহাপাতক ত উনিশ জন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উনিশ খানা ধর্ম্মসংহিতা লিখ্‌তে গেছলেন কেন, আর রঘুনন্দনেরই নূতন করে স্মৃতি লেখবার কি দরকার ছিল?

বর্ণাশ্রমের উপর যে সমাজ-প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী স্বধর্ম্ম পালন করাতে করাতে মানুষের মধ্যে শেষে পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব ফোটান। সকলের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তুলে, মানুষকে তাঁর লীলাক্ষেত্রে পরিণত কোরে, মানুষ জন্ম সার্থক করানো। জন্মের গুণে যাঁরা ব্রাহ্মণ, আর জন্মের দোষে যাঁরা শূদ্র—তাঁদের সকলকে পৃথক পৃথক গণ্ডির মধ্যে পুরে রেখে আজ কি উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে?

ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল বলে পরশুরাম নূতন ব্রাহ্মণ সমাজের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পুরাতন ক্ষত্রিয় বংশ যখন নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়েছিল, তখন বশিষ্ঠ ঋষি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করে সমাজ রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সমাজের আদর্শটা বেশ পরিস্ফুট ছিল আর ধর্ম্ম-জিনিষটা সমাজবন্ধনের চাপে মারা যায় নি বলেই এটা সম্ভব হয়ে ছিল। গাছে যতদিন প্রাণশক্তি থাকে ততদিনই তা'তে নব বসন্তে নূতন নূতন ফল, ফুল, পাতা গজায়; মরা গাছটা শুধু ভূতের ভয় দেখাবার জন্ম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

আমাদের সমাজও আজ বহুকাল ধরে তেমনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার বৎসর আগে যারা শূদ্র ছিল, আজও তারা শূদ্রই রয়ে গেছে। স্বামী রামদাস নির্ব্বাপিত প্রায় ক্ষাত্রতেজে ফুৎকার দিয়ে যা একটু আগুন জালিয়ে ছিলেন, তা' এক ঝটকাতেই নিবে গেল। বৈশ্যরাও যে দেশ বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করবেন, পণ্ডিত মশায়েরা সমুদ্র যাত্রা বারণ করে দিয়ে তার পথও রুদ্ধ করেছেন। আর তারা নিজে, গুরুগিরির ব্যবসা করে দুপয়সা সংগ্রহ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। দলাদলি আর জাত মারামারি কোরে তাঁদের আর ব্রহ্ম চিন্তার বড় বেশী অবসর থাকে না।

বাঁধনের উপর বাধন চড়িয়ে অতীতের গঠনটীকে পুরামাত্রায় বজায় রাখ্‌তে পারলেই কি সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? মানুষের মধ্যে যদি তার অন্তরাত্মাই প্রবুদ্ধ হয়ে না উঠল তা' হলে কতকগুলা ছাই ভস্ম, অর্থহীন আচারের বাঁধনে তাকে বেঁধে রেখে কি শুভফল ফলবে? মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের ভিতরে থেকে যতক্ষণ মানুষের উন্নতি ততক্ষণই সমাজের সার্থকতা। আর তাই যদি না হয় ত বৃথা মরা সমাজের গোলামি করে কি হবে?

মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের। যাঁরা সমাজকে বহু শৃঙ্খলে বেঁধে মানুষের অন্তরস্থ ভগবানকে খর্ব্ব করেন তাঁরা মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভগবানকে ভুলে যাঁরা সমাজকেই বড় ক'রে তোলেন—তাঁদের শুধু অপদেবতারই পূজা করা হয়। সেটা কৃত্রিমতার লক্ষণ, ধর্ম্মের বিকৃতি। দাসত্ব যদি করতেই হয়, ত সমাজের নয়, ভগবানের দাসত্ব করাই ভাল। তা'তে মাধুর্য্য আছে, উন্নতিও আছে, আর অবাধ, আনন্দময় স্বাধীনতাই তা'র চরম পরিণতি।

কতকটা স্মৃতি আর কতকটা দেশাচার মিলে যে সামাজিক ব্যবস্থা হয়েছে, তার মূলে মানুষের বুদ্ধি আর খেয়াল। সুতরাং সেই সেই ব্যবস্থা গুলো সাময়িক ও অস্থায়ী। তা'দের টেনে টেনে লম্বা করে চার যুগ জুড়ে রাখ্‌লে চলবে কেন?

ভগবানের পথ, প্রকৃত জীবনের পথ—দেখিয়ে দেন শ্রুতি। সেই সনাতন আর অপৌরুষেয় শ্রুতিকে অপসারিত করে যাঁরা সামাজিক ব্যবস্থাকেই জীবনের

নিয়ন্তা করে ফেলেন, কোন একটা সাময়িক শাস্ত্রকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে স্থির করেন, তাঁদের জড় হয়ে যেতে বড় বেশী বিলম্ব হয় না।

আর হয়েছেও তাই। আমাদের অবনতির প্রধান কারণ এই যে, আমরা মানুষকে ছোট করে সমাজকে বড় করে রেখেছি, দেবতার মন্দিরটাকে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধাতে বাঁধাতে পূজার আয়োজন করতে ভুলে গেছি। দেবতাও কোন্ অবসরে মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন; আর সেই মার্বেল পাথর গুলো খসে গিয়ে আমাদের বুকের উপর চেপে পড়ে আছে।

একদল বলছেন যে বিলাতী সিমেণ্ট দিয়ে বাহির থেকে একটু জীর্ণসংস্কার করে দিলেই মন্দিরের কাজ চলে যাবে। আমাদের এ কালের সমাজ সংস্কারকেরা আজ ২৫।৩০ বৎসর ধরে সেই চেষ্টাই করছেন। তা' সে বিষয় নিয়ে তাঁরা আমাদের স্মৃতি-পঞ্চাননদের সঙ্গে বিচার করতে থাকুন; আমার কিন্তু মনে হয় মন্দিরের ভিতরে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে পূজার ব্যবস্থা না করতে পারলে, চামচিকের দল ভিতরেই বাসা করে থাকবে। আর তা' হলে মন্দিরে ভক্তসমাগমও হবে না, বাহিরের জীর্ণসংস্কার করবার লোকও পাওয়া যাবে না।

শুধু বাহিরের বাঁধন দিয়ে যাঁরা সমাজকে এক করতে গেছেন, তাঁরা কোন কালেই একটা বিরাট, প্রাণহীন, জড়তা ছাড়া আর কিছুই গড়ে তুলতে পারেন নি। সেখানে শেষে ঐক্যও থাকে না, আর অবাধ উন্নতির জন্ম যে স্বাধীনতার দরকার তাও নষ্ট হয়।

যাঁকে আশ্রয় করে পূর্ণ স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, সব মানুষই যাঁর কোলে এক, যাঁকে জগতে অভিব্যক্ত করবার জন্যই সমাজের সৃষ্টি, সেই ভগবানকে ছেড়ে দিলে সব যজ্ঞের আয়োজনই পণ্ড হবে। আদর্শ সমাজ মানুষের অন্তরস্থিত সেই ভগবানেরই বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, ঐক্য এই রথেরই চারটী চাকা।

আমাদের রথখানি যে চাকা ভেঙ্গে, রাস্তা জুড়ে, অচল হয়ে পড়ে আছে, তার কারণ এখানি সমাজের ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর অহংকারের বাহন মাত্র। কর্ত্তাদের এমন জ্ঞান নাই যে লোককে বুঝান, এমন শক্তি নাই যে তাদের চালান, এমন প্রেম নাই যে তাদের আপনার করে লন। যাদের "পেরিয়া" বলে, 'নমঃশূদ্র' বলে, কর্ত্তারা আপনাদের শ্রীঅঙ্গের এক শত হাতের মধ্যে ঘেঁসতে দেন না। তাদের উপর গোলামীর ছাপ মানুষ মেরেছে না ভগবান মেরেছেন?

আর এই দুষ্কর্মটুকু কোরে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে সেটুকু চাপা দেবার দুশ্চেষ্টা কেন?

ভয় পেওনা, ভায়া, এই বুড়ো বয়সে গোলদিঘির ধারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সমাজ সংস্কার ক'রবার দুরভিসন্ধি আমার এতটুকুও নেই। ভগবানের নাম কোরে মানুষ মানুষের উপর চিরদিনই অত্যাচার কোরে আস্‌ছে; তা আমি বেশ জানি। ভগবান এতদিন তা দেখে হাস্‌তেন কি কাঁদতেন তা' জানিনে।. কিন্তু এবার মনে হচ্ছে ক্রোধাগ্নি তাঁর চোখের কোণে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-শিখার মত ধ্বক্ ধ্বক্ কোরে জ্বলে উঠছে। মানুষের মনে সে আগুন একদিন লাগ্‌বেই লাগ্‌বে। কত Vested interests, কত গুরুঠাকুরের পুঁটলি, কত বুজরুকির ঝুলি, কত ওস্তাদের কত একচেটে সত্ব যে সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাই ভেবে এখন থেকেই শিউরে উঠছি। আর মনে হচ্ছে আমাদের ঘরের কর্তাদেরও বলি—"ওগো, দিন থাক্‌তে তোমরাও আপনার ঘর সামলাও। যিনি দর্পহারী, তিনি হয়ত তোমাদেরও খাতির করবেন না। রঘুনন্দনধৃত শাস্ত্র বচন তিনি হয়ত অকাট্য প্রমাণ বলে গ্রাহ্য নাও করতে পারেন।"

তোমার কি মনে হয়? তুমি ত 'নারায়ণ' সেবার ভার নিয়েছ; বলতে পার তিনি কি ক্ষীর সমুদ্রে পড়ে পড়ে এখনও ঘুমুচ্ছেন, না গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একবার এদিকে আস্‌বার উদ্যোগ করছেন? যদি আসেন ত দোহাই তোমার, বলে দিও যেন গদাটা আন্‌তে না ভোলেন।

ইতি তোমার—

অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী।

পথের মোড়ে।

[শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত।]

স্বায়ত্বশাসনের সবুজ নিশান আজ ভারতবাসী দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন বলে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। এই যুগসন্ধির সময় নিজেদের খাঁটি অবস্থাটা একবার বিচার করে দেখা নেহাৎ দরকার। অবস্থা না বুঝে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'লে সুব্যবস্থা হবে কিনা, তাতে প্রায় সকলেরই দারুণ সন্দেহ আছে।

Self-determination বলে বাইরে আমরা যতই চেঁচাই না কেন, ভিতরে যে এখনও পুরোমাত্রায় আমরা Other determination—বজায় রেখেছি ব'ললে ঠিক বলা হয় না—বাহাল রাখবার জন্যে প্রাণপণ করছি, তা স্বীকার করতেই হবে। এ বিষয়ে মানুষ কি করে যে এত inconsistent হয়, তা' মনস্তত্ববিৎ হয়ত বলতে পারেন! প্রথমেই আমাদের মনের ও মুখের এই অনৈক্যটাকে দূর করতে হবে।

আমাদের মনের উপর একটা মরচে পড়ে গেছে। মরচেটাকে দূর করতে না পারলে খাঁটি দৃষ্টিশক্তিটুকু ফিরে পাওয়া যাবে না। মনের উপর গাঢ় একটা মরচে থাকার দরুণ জ্ঞানের দিব্য আলোক প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে। আর সেই জন্যেই দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আমরা মানুষের মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা ক'রতে শিখিনি, শিখেছি শুধু তার বাহ্য আবরণটাকে পুজো করতে। তাই আজ আমরা "জাতিভেদের" আসল মর্ম্ম ভুলে গিয়ে আজকালকার মনগড়া "জাতিভেদের" সৃষ্টি করে জাতকে শুধু বধ করতে বসেছি। মুসলমান কিম্বা চাঁড়াল ঘরে উঠলেই জল "মারা যাবে", তাদের স্পর্শ করলেই অপবিত্র হতে হবে, তাদের ছায়া মাড়ালেও "পাপ" হবে—এই রকম যাদের ধারণা, তাদের মানুষ ব'লে কি করে পরিচয় দিতে পারি! হয়ত সেই মুসলমান কিম্বা চাঁড়াল আমার চেয়ে মানুষ হিসেবে ঢের উচ্চে। হয়ত আমি ব্যাভিচারী, লম্পট,—আর সে দেবতুল্য। কিন্তু আমাদের হিন্দুদের মাপ কাঠিতে যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ, আর সে মুসলমান কিম্বা চাঁড়াল—সেই হেতু আমার আসন অনেক উচ্চে,—তা আমি যতই লম্পট হই না কেন!।

এই রকম বাহ্যিক মাপকাঠিতে বিচার করা মানে মনুষ্যত্বকে অপমান করা। আমরা শাঁস ফেলে দিয়ে খোসা নিয়ে মারামারি করছি। কিন্তু এইটুকু মনে রাখতেই হবে যে উপরে একজন জাগ্রত ভগবান আছেন, যাঁর মাপকাটি মানুষের

বাইরের চামড়া নয় কিন্তু অন্তর যাচাই করে নেয়,—যিনি মানুষের এ অপমান কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না, কেননা সে যে ভগবানেরই লীলার অপমান।

রবীন্দ্রনাথের—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

—এই কথাটি কতখানি সত্যি, তা সেই জানে যে দেশের জন্যে এতটুকু চিন্তা করে।

মনের এই গলদ অপসারিত করতে হলে চাই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান এলেই সঙ্গে সঙ্গে উদার দৃষ্টি আসবে। আর সেই উদারতা এলেই দেখবে, মনের মরচে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার মত, আপনা থেকেই অন্তর্হিত হবে। তখন সেই বিকৃতজ্ঞানের পরিবর্ত্তে দেখবে উদার ও সার্ব্বজনীন একটা বিচিত্র জ্ঞান ও প্রেম আপনার হৃত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তখন আপন-পর বলে একটা বিভেদ থাকবে না, চাঁড়াল মুসলমান হিন্দুতে একটা মনগড়া অনৈক্য দেখতে পাবে না,—দেখবে বিশ্বময় সকলেই তোমার ভাইবোন পরিজন, আর তখন পুজো করতে শিখবে মানুষের মহত্ত্বকে, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে। এই ত গেল তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য। এক কথায় —

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

দেখা যায়, সমগ্রবিশ্বে চিরকালই নারী, পুরুষের জন্যে, আত্মোৎসর্গ করে আসছেন—এমন কি, তাঁদের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে বসে আছেন। সেই সুযোগে পুরুষ তাঁদের খেলার জিনিষ ভাবে দেখেন এবং এমন কি তাঁদের শুধু সাংসারিক কাজের যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন। ভারতের আজ সেই অবস্থা। যে দিন ভারত, নারীর নারীত্বকে চরণে দলিত করে, মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করে, নারীকে কেবল বিলাসের নর্ম্মসহচরীরূপে দেখতে শিখেছে, সেইদিন থেকে তার পতন আরম্ভ হয়েছে।

একটা অঙ্গকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখলে অন্য অঙ্গের কি সহজভাবে চলাফেরা করবার শক্তি থাকে, না, তাতে অঙ্গ উন্নতি লাভ করতে পারে! এই সহজ সরল সত্যটি আমরা বুঝতে না পারলে দেশের উন্নতির আশা নেই। মুখে খুব বড়াই করি যে আমরা নারীকে জননী ভাবে দেখি, দাসী ভাবে নয়।

কিন্তু ঠিক কাজেও কি তাই? জিজ্ঞেস্ করতে ইচ্ছে হয় যে তাদের এই মানসিক ক্ষতি, তাদের এই দৈহিক অবনতি, তাদের এই প্রনষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্যে কে দায়ী?

Mrs N. C. Sen বিলেতের East India Assóciationএ "ভারতে নারীর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"Our men themselves have not got much footing in their country's affair yet, but a beginning is about to be made. We rejoice in it and want to take a share in it. Most of the educated women do feel for their land just as deeply as our men do. They want to serve their mother country, to live for her, to die for her."

তবে আশার কথা এই যে ক্রমেই "অচলায়তন" ভেঙ্গে যাচ্ছে। রুদ্ধ যবনিকা অন্তর্হিত হচ্ছে; নারী আজ ললাটে উন্মুক্ত আলোক ও বাতাসের স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করছেন—বিশ্বের আহ্বান আজ তাঁদের কর্ণে পৌঁছেচে। আজ নারী সম্প্রদায় সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য উন্মুখ।

আজ জাতির নব জাগরণের দিন এসেছে। আজ নারীকে পুরুষের পদতল থেকে উঠে এসে পুরুষের পাশে স্থান নিতে হবে। দেশের প্রত্যেক মেয়ের কাণে এই আশার বাণী শোনাতে হবে, তাঁদের প্রাণে নবীন ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, তাঁদের নব জাগরণের আনন্দে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে চাই দেশময় শিক্ষার বিস্তার,—চাই আমার, তোমার, সকলের সমবেত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা।

দিন ছিল যখন পল্লীতে কেন্দ্র করে আমাদের অতীত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তখন পল্লীই আমাদের সুখ শান্তি ও স্বাস্থ্যের আনন্দ-নিকেতন বলে গণ্য হোতো। কিন্তু আজ পল্লী ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত, ঈর্ষ্যাকুটিলতার নিশ্বাসে বিষময়, বনজঙ্গল ও পচাডোবার বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। যাঁরা দু'পয়সা রোজগার করতে শেখেন তাঁরাই গ্রামের স্নিগ্ধ বুকটুকু থেকে সহরের মৌতো-গোরী আড্ডায় সরে পড়তে পারলেই বাঁচেন। কাজেই অবশিষ্ট যাঁরা আছেন তাঁরা আমাদেরই বে-চারা, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, ম্যালেরিয়ার কঙ্কালসার ভাই বোন! তাঁরা বেশী জ্বরের সময় লেপমুড়ি দিয়ে মরণ কামনা করেন, আবার জ্বর একটু কমলেই সাংসারিক কাজ যন্ত্রের মত করে যান। তাঁদের পেটে অন্ন নেই,

শরীরে বল নেই, মনে স্ফূর্তি নেই—যেন একটা moving machine—একটা চলন্ত কঙ্কাল !!

উটজ-শিল্প প্রভৃতির প্রবর্তন করে, গ্রামগুলিকে যতদূর সম্ভব self-sufficient করে, যৌথ ঋণদান প্রথার দ্বারা মহাজনদের কবল থেকে কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে রক্ষা করে, তাদের হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে, এই সব নিরানন্দ ভাইবোনদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে, এই গ্রামগুলিকে আবার আবাসযোগ্য করে তোলাই আজ সব চেয়ে বড় কাজ।

১৯১৮ সালের বাংলা দেশের Sanitary commissionerএর রিপোর্ট দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে আমাদের জাত ধ্বংসোন্মুখ। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হাজার করা জন্মের হার ৩৫·৯ এবং মৃত্যু হার ২৬·২। আলোচ্য বর্ষে জন্মের হার ৩১·৯ এবং মৃত্যুর হার ৩৮·১। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ক্রমেই জন্মের হার কমে যাচ্ছে এবং মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে। রিপোর্টে দেখা যায় যে—"As many as 142, or more than a third of the total number of rural areas in this Presidency returned a death-rate of over 44 per mille during the year against only 9 and 7 during the two preceding years."

আলোচ্য বর্ষে জরে ১,৩৫৭,৯০৮ অর্থাৎ হাজার করা ৩০জন এবং কলেরায় ৮২৩৭৯ জন মারা গেছে। এ বছর ১,৪৮৯,১৩৫ জন শিশু জন্মেছে এবং ৩৩১,৬৪৯ জন মারা গেছে, অর্থাৎ শতকরা ২২·৮জন শিশু অনেকটা আমাদের দোষেই অকালে মারা গেছে। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট এ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—"As a result of inadequate nourishment and clothing the vitality of the population generally was lowered and this contributed to the abnormally large death-rate from fever (including influenza) The general unhealthiness of the year coupled with the unsatisfactory economic conditions prevailing will, it is feared, cause a further reduction in the birth rate in this Presidency during 1919."

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলতে চাই "বাঙ্গালী, আগে বাঁচ।"

দেশের দুর্ভাগ্য, তাই এখনও দেশে এমন একখানা খবরের কাগজ বের হলো না, যা দেশের অসংহত ও বিক্ষিপ্ত লোকমতকে সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে,

তার সামনে একটা constructive scheme খাড়া করে দেয়। অথচ দেখি যে কাগজেরা নিজের মতটাকে জাহির করবার জন্যে অপর দলকে অযথা অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে "দেশের কাজ" করেন বলে বাহাদুরি নিয়ে থাকেন, কিন্তু দেশের প্রাণের কথা, অন্তরের ব্যথাটা বুঝতে চেষ্টা করেন না। কথাটা বড় দুঃখেই বলছি, কেউ অপরাধ নেবেন না। আমার কথাটা হয় ত অনেকেরই মতের সঙ্গে মিলবে না, কিন্তু আমি যা' বললাম, তা' হয় ত অনেকেরই মনের কথা।

আমরা পরস্পরের উপর ভিত্তিহীন মিথ্যার আরোপ ক'রে, পরস্পরকে "দেশের শত্রু" বলে প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। যদি দেশের জন্যে বাস্তবিকই একটু কাঁদি, এ সব মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া দরকার হয় না,—দরকার হয় তখনই যখন কিছু না করেই বাহাদুরি নিতে চাই,—"ক্ষণিক নেতা" সেজে করতালি পাবার লোভ যখন বেশী। অসত্যের আশ্রয় নিয়ে, সরল-বিশ্বাসী সাধারণের চোখে, আমরা "বড়"কে উঁচু থেকে টেনে নিচে নামিয়ে দিয়ে, নিজেদের "বড়" বলে জাহির করি। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ্য সকলেরই এক—দেশমাতৃকার সেবা। তবে পন্থা বিভিন্ন হতে পারে। তাই বলে কি এই রকম অসত্যের মারফতে নিজেদের অসারত্ব প্রতিপন্ন করা উচিত? একই বিচিত্র লীলা বিভিন্ন ভূমিকা হিসাবে বিভিন্ন জীবের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ সার্থকতার পথে নীত হচ্ছে। দেশ একজনের নয়—দেশ আমাদের সকলেরই। গণতন্ত্রের অর্থ 'নেতৃতন্ত্র' নয়!

অন্ততঃ বাংলা দেশ—যেখানে চরম Extremism আমরা করে দেখেছি—সেখানেও একটা Constructionএর ভাব এখন দেখব' আশা ছিল। কিন্তু সেখানেও আমরা এবিষয়ে বোধ হয় সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা নিজের নিজের দল দিয়ে কি করে কাউন্সিল "capture" কর্‌তে হবে, সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত আছি; অথচ Electorateকে শিক্ষিত করে তোলা যা না হ'লে আর একটা নূতন রকমের বুরোক্র্যাশীর সৃষ্টি হবে—তার ধার ধারতে রাজি নই।

জীবনটাকে আজ "নেতি নেতি" বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। জীবনের নিখিল রস এবং পরিপূর্ণ মাধুর্য্যকে অখণ্ডভাবে উপভোগ করতে হবে। আমাদের মন্ত্রই হবে—"আনন্দং"। জীবনটাকে সমগ্রভাবে উপভোগ করতে হ'লে, 'জগৎ মিথ্যা', এই ধারণাটাকে দূর করে দিতে হবে। 'জগৎ মিথ্যা' আওড়াতে আওড়াতে আমরাও যে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা হ'য়ে গেছি। 'ব্রহ্ম সত্য', এ কথা

কেউই অস্বীকার করবে না; কিন্তু জগৎও ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ তারই শক্তির লীলায়িত-তরঙ্গ বলে পুরোপুরি সত্যিকার জিনিষ। ‘জগৎ মিথ্যা টাকে আমরা সজোরে আঁকড়ে ধরেছি; অথচ “ব্রহ্ম সত্যেষই” Logical conclusion—প্রত্যেক নরই যে “নারায়ণ”—এই তথ্যটিকে চোখ ঠার দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি। এই জায়গায়ই Slave-psychology বেশ ফুটে উঠেছে।

ভারতের আদর্শে চিরকালই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের স্বাদেশিকতা Aggressive militarism জানে না। বিশ্বতোমুখী প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত ও পূত করেই, ভারতের স্বাদেশিকতা আপনাকে সত্য, সুন্দর ও সার্থক করে তুলবে। এই বিরাট ও সুমহান্ আদর্শ সেই দিনই সত্য হয়ে উঠবে, যে দিন আমাদের স্বদেশ-প্রেম একটা বিচিত্র ভাগবত-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের দরবারে সেই হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পন্থা আমরা প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করেছি বলে, সেই দিনই স্বীকার করব। সেই ধ্যানীবুদ্ধদের অসম্পূর্ণ আশাকে, সফলতার পথে নিয়ে যাবার জন্যেই, আজ আর একজন ‘সাধকের’ কাতর আহ্বান বাংলার তরুণ প্রাণের দ্বারে এসে পৌঁছেচে। সে ব্যাকুল আহ্বান কি আজ বাইরের কল-কোলাহলে চাপা পড়বে? দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মা কি সেই অশরীরী অবস্থাতেও শান্তি পাচ্ছেন? তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধের অবদান—

“ধর্ম্ম যেথা সেদিকে থাক্, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্।
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্, আবার তোরা মানুষ হ’।”—

কি আমরা দেবাশীষের মত মস্তকে গ্রহণ করেছি? “আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই,—সুমুখে গড়ে উঠছে।”—সবুজপ্রাণের এই চিরসুন্দর creedটি কেবলই কি একটা মধুর কল্পনায় পর্য্যবসিত থাকবে?

এই যুগসন্ধির পবিত্র মুহূর্ত্তে আমরা দেশের তরুণ ও সবুজ প্রাণের উপাসকদের দেশের কাজে আহ্বান করছি। আমরা জানি, কর্ম্মীর প্রতি কর্ত্তব্যের এই যে উদাত্ত আহ্বান, তা’ আজ ব্যর্থ হবে না; অন্তত বাংলার তরুণের প্রাণে। বাংলার তরুণ প্রাণ আজ অন্তর্মুখ হয়ে তপঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে—সে যে আজ “পূর্ণযোগের” অধিকারী। আমাদের এই অভিশপ্ত দেশকে জাগাতে হ’লে এই রকম নবীনমন্ত্রে দীক্ষিত একদল পুরুষ ও নারীর একান্ত প্রয়োজন। জানিনা ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন কিনা। তবে এটুকু ঠিক, দেশ জাগবেই। শুধু একটা ‘চিরন্তন অবিমিশ্র-পতন’ বলে কোনো জিনিষ থাক্‌লে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির

গূঢ় রহস্যই যে ব্যর্থ হয়ে যায়! আমরা চাই ব্যষ্টি হিসাবে 'মানুষ' হতে। ব্যষ্টির উন্নতি ছাড়া জাতীয় উন্নতি কি করে সম্ভবপর হয়?

আজ এই নবীন দীক্ষার শুভ মুহূর্ত্তে একথা ভাব্‌লে চল্‌বে না যে,একলা আমি কি কর্‌ব। একা আমি দশজনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, সংসারে তাঁদের স্থান নির্দ্দেশ করে দিতে পারি; সেই দশ জন আবার একশ' জনকে পার্‌বেন। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে একজন হলেও, সে ঠিক একলা নয়। তার পেছনে, তারই মত অসংখ্য লোক রয়েছে, যারা সুবিধা, সুযোগ ও উপযুক্ত দীক্ষা পেলে "এক-আমি"কে অল্পকালের ভিতরে "বহু-আমি'তে রূপান্তরিত করতে পার্‌বে বলে আমার বিশ্বাস। মনোরাজ্য জয়ের এই জায়গায়ই বিশেষত্ব।

কুসংস্কার ও অনুদারতা ঝেড়ে ফেলে, মনুষ্যত্বকে মাথায় রেখে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী হাতে নিয়ে এস আজ বাংলার ভবিষ্যৎ, দেশের গৌরব, তরুণ-সম্প্রদায়,—এস, আজ আমরা এই বিরাট ও মহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার জন্যে এই নতুন পথ বেছে নিই:—আমাদের দেশ-জননীর মুখ আবার আনন্দ-হাস্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক।

গোষ্ঠপানে।

[শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম্ এ]

বদন-বিভা মদনমোহে, নীরদ-নীল কায়,
বসন নব বিজলী-প্রভ ঝলকে সদা তা'র।
গুঞ্জা-ফুলে মঞ্জু-ভূষা শ্রবণে সুশোভন,
ময়ূর-পাখা-খচিত চূড়া মুকুট বিমোহন,
—বিকাশে কত বালক-শশী বাঁকা সে মনোহর।
উরসে বন-মালিকা রাজে, বিষাণ বেণু কর।
ওদন দধি পাচনী-সহ—সুষমা-শুভ-চিন্,
কোমল-তম চরণযুগ ব্রজের রজোলীন।
নন্দ-রাজ নন্দন সে গোষ্ঠপানে যায়,
সঙ্গে শত বৎস-ধেনু পুচ্ছ তুলি ধায়! *

* শ্রীমদ্ভাগবতানুসরণে।

দেশের কথা।

১। "অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ব্যবস্থা"।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার।]

অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু অবস্থা-ভেদ হ'লেই বুদ্ধির যে লোপ হয়, তার ব্যবস্থা কি ?

যাঁহারা বলেন—"একতাই বল" তাঁহাদের ধারণা কতকটা ভ্রান্ত ! আত্মরক্ষার জন্ত একতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল, এটা পুরাণো কথা। স্থান কাল পাত্র বিশেষে একতা মানুষের বিরোধেরও কারণ হয় ; একতা জড়তার নামান্তর মাত্র হয়। এ কথা ব্যক্তির জীবনে যেমন, একটা জাতির জীবনেও তেমনই খাটে।

যে জাতি কালবশে জড়তার অবসাদে আচ্ছন্ন, বাইরের আঘাতে সে আর্ত্তনাদ করে ওঠে ; প্রস্তরখণ্ড প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হয়ে যেমন চুরমার হয়ে যায়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে যেমন নূতন শক্তি জেলে দেয়, জাতির জড়তা তেমনই করে চূর্ণ হয়ে যায়,—নূতন শক্তির জাগরণ হয়। নবযুগ আসে কূটস্থ প্রাণ নিয়ে, আশার তীব্র আলো নিয়ে।

জলের স্বাভাবিক গুণ প্রতিবিন্দুটি প্রতিবিন্দুটির সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে থাকা। বরফ যখন জল হয়ে যায়, গুরুভাব দ্রব্য পতন মাত্রই জলরাশি বিভক্ত হ'য়ে, সেই গুরুভার দ্রব্যকে নিজের বিশাল আয়তনের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। একতার নামে জড়তা যতই জমাট্ বাঁধ্‌বে, গুরু ভারের আঘাত ততই প্রচণ্ড হবে। প্রাচীন মহাভারতীয় সমাজ 'ভাঙ্‌বে' বলে যারা আস্‌ছে, তাদের ঐ বিশাল বারি তরঙ্গে ডুবিয়ে দিতে হবে।

বিজাতীয় সভ্যতা তার অর্থনীতির, রাজনীতির সমস্যা নিয়ে যখন দেশীয় সভ্যতার মাথায় "বাড়ি" দিয়েছে, তখনই দেশীয় সভ্যতাবলম্বীদের নানাপ্রকার বুদ্ধিবিপর্য্যয় প্রকাশ পেয়েছে। সোজা কথাটা বুঝতে হবে যে, যখন আমরা ঘরে বাইরে আক্রান্ত হ'য়েছি, তখন "এক জায়গায় জড়" হয়ে নিশ্চিন্তে পুড়ে মরবার আকাঙ্ক্ষা না করে, তফাৎ থাকাই মঙ্গল। সমস্ত দেশটা আজ সঙ্কুচিত হয়ে কয়েকটা বড় বড় সহরে পরিণত হয়েছে। সহরের কারাগার হ'তে মুক্ত হ'য়ে, মানুষকে আজ দেশে ফির্‌তে হবে, বিদেশে ঘুর্‌তে হবে।

তফাতে গেলে আজ আমরা পরস্পরকে ভাই বলে, মিত্র বলে, স্বদেশী বলে

শ্রদ্ধা করব, চিন্‌তে পারব। তফাতে থাকলে আমরা মরব, কিন্তু বাঁচব। আমাদের জাতিটাকে বাঁচাতে আমাদের মর্‌তে হবে, সবাই "একত্র জড়" হ'লে মহামারীতে আমরা মর্‌ব।

জাপানে কি হয়েছে, আমেরিকায় কি হচ্ছে—ঠিক এ সব চিন্তার আমরা বাঁচব না - আমরা বাঁচব সহজ উপায়ে—ঐ জলরাশির মত তফাৎ হয়ে—গুরুভারটাকে যাতে করে সহজে ডুবিয়ে দিতে পারি, সেই উপায় উদ্ভাবনই আমাদের প্রকৃষ্ট চিন্তা!

বৃহৎ জাতি যখন আয়তনে শীতের মত সঙ্কুচিত না হয়ে বৃহত্তর হয়, তখন ছোট বড় সব জাতিই শঙ্কিত হয়ে পড়ে; তাই রুষজাতি সঙ্কীর্ণ চীনজাতি অপেক্ষা সংখ্যায় না হ'লেও আয়তনে দীর্ঘ হ'য়ে ছোট বড় পৃথিবীর সকল জাতির ত্রাস লাগিয়ে দিয়েছে। নবীন সাম্রাজ্যবাসী জাপান কাঁচ পোকার মত চীনের তেলাপোকাকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ব্রিটীশজাতি আয়তনে প্রসারিত হয়ে যে একতা গড়ে তুলেছে, তাতে জড়তার লেশমাত্র নেই তাই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য অধিকার করে বসেছে।

ঘরে আগুন লাগ্‌লে ধনসম্পত্তি আঁকড়ে ধরে না থেকে, স্থান ত্যাগ করাই বিধি; পল্লীতে মহামারী দেখা গেলে, পল্লীত্যাগ করাই ব্যবস্থা, দেশ বিদেশীর কড়া শাসন, বিচার, বাণিজ্যের ও শিক্ষাদীক্ষার অধীন হ'লে যখন প্রতিকারের কোন সদুপায় থাকে না, তখন দেশত্যাগ করাই নিরুপায়ের সুবুদ্ধির কার্য্য।

কতকগুলো গাছ জড়াজড়ি করে জন্মায়,--বাড়ে কম, মরে খুব শীঘ্র—স্থানান্তরে তারা অনেকটা আলো হাওয়ার মধ্যে জন্মায়—বেশী বাড়ে,—দীর্ঘকাল বাঁচে। পৃথিবীর লোকসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভারতের জঙ্গল থেকে কতক তুলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রোপণ কর্‌তে হবে, কতক পল্লীবাসে ফিরতে হবে।

দেশের আজ যে একতা চাই, তা দশে মিলে একতা নয়,—একের "একত্ব"।

ভারতকে আজ সসাগরা পৃথিবীতে প্রসারতা খুঁজে নিতে হবে। জাতীয় জীবনের সকল শক্তি সঞ্চয় করতে হবে; "আকাশ, বাতাস তন্ন তন্ন" করে খুঁজতে হবে - সামাজিক, নৈতিক, পারমার্থিক, ঐহিক - সর্ব্ববিধ দাসত্বের শৃঙ্খলে ফেলে মনুষ্যত্বের গৌরব-মুকুট মাথায় তুলে নিতে হবে। বিদেশে গিয়ে দেশকে জগতের চোখে বড় করে তুল্‌তে হবে।

এ মহাজাতিকে মহামারীর হাত হ'তে রক্ষা করতে এবার পল্লীবাসে যেতে

হবে; নিরন্ন কৃষকের অন্নের সংস্থান করে দিতে হবে; দেশের গোধন রক্ষা করতে হবে—শ্মশানে গোচারণ ভূমি করতে হবে; দেশকে আবার 'সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা' করতে হবে; যে যত অর্থের সংস্থান করেছ, তাই নিয়ে পল্লীতে ফিরে চল—আজ সেখানে আগে চাই অর্থ, সচ্ছলতা তো আর নাই! সচ্ছলতার বিনিময়ে আমরা অর্থ পেয়েছি, আজ অর্থের বিনিময়ে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে চাই।

যারা বিদেশে যাবে, তাদের মনে রাখতে হবে, জগতের চোখে বড় হ'তে হ'লে ভারতবাসীকে বাঙ্গালীকে জগতের সভায় যোগ দিতে হবে। বাঙ্গালী সিংহল-বিজয় ও যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপনের ইতিহাস নিশ্চয়ই বিস্মৃত হয় নাই। তফাৎ হ'লে আমরা বেশী শক্তি সঞ্চয় করব। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজাম উল্‌মুলক্ স্তূপের আয়তন বৃদ্ধির জন্য তাঁর শক্তি ক্ষয় না করে স্থানান্তরে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনে নিয়োগ করেন, আজ জগতের মধ্যে যখন সমস্ত মুসলমান রাজ্য বিজয়-গর্ব্বোন্মত্ত ইংরাজের পানে চেয়ে চমকিত ও রোষকষায়িত দৃষ্টিতে দেখছে, তখন সেই বর্দ্ধমান শক্তি স্বাধীন আরব ও পারস্য অপেক্ষা ক্ষমতায় ও প্রতিপত্তিতে যে ইংরেজের দৃষ্টিতে বড়, এ কথা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

স্বকার্য্য পালনের জন্য আমাদের দেশ-দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পূর্ব্বে আমাদের সর্ব্বপ্রথম চিন্তা হ'ক—মানুষকে প্রকৃতিস্থ করা। জীবনটাকে ইটকাঠের মন্দিরের মধ্যে পাষাণ-প্রতিমা করে তুলতে, তার সমস্ত রং একেবারে একরঙ্গা করে ফেলতে আজ যে মানুষ বসেছে, তাকে ভগ্নমন্দির ছেড়ে প্রকৃতির কোলে ফিরতে হবে। মানুষ যে প্রকৃতির অংশ; অপ্রকৃতিস্থ হ'লে তার মঙ্গল সাধিত হয় না। যখন জাতির সকল শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায়, বহিঃসভ্যতার বিজয়-শৃঙ্খলে যখন সে বাঁধা পড়ে, তখন তার অবস্থা বন্দীর মত বিভ্রান্ত। আজ তার মুক্তির দিনের ডাক পৌঁছেচে। আজ তার হিতচিন্তার অবসর এসেছে। আজ সকল দেশের বলসেবীরা বলছে—idle rich ও idle poor নিষ্কর্ম্মা ধনী ও নির্ধনের পৃথিবীতে বাস করা চল্‌বে না; আজ যারা সর্ব্বদেশে দেশের শাসন, বিচার ও বাণিজ্য নিয়ে দেশ শোষণ করছে তারা চিন্তা করুক যে, তারা দশের অন্নবস্ত্র নিয়ে একা ভোগ করছে,—আর দেশের এক জনের অন্নবস্ত্র দশের ভাগ্যে পড়ছে; তাই এত কাড়াকাড়ি, জড়াজড়ি পড়ে গেছে। আমাদের দেশে এই আর্থিক অবস্থা সঙ্কট করে তুলেছে যে

মাড়োয়াড়ী ও অন্য বণিকেরা, তাদেরও কোন শাসন নেই—রাজশক্তি প্রবল অত্যাচারীর শাসন না করে অর্থনীতিবিদের মুখোস পরে বলেন যে, "Every thing must be regulated by the laws of demand and supply!" বিচারকের সাম্নে এক চোর দাঁড়িয়ে যদি বলে,—"হুজুর, অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা লালনপালন করতে হয়, তাই মাড়োয়াড়ীর টাকার তোড়াটা কেড়ে নিয়েছি,—" বিচারক কি তখন "Laws of demand and supply"এর দোহাই দিয়ে তাঁর বিচার কার্য্য সংক্ষেপ করবেন? শাসক ও বিচারকের বণিক সাজা শোভা পায় না। Idle rich ও idle poorএর মত অযোগ্য শাসক ও বিচারককেও সরে দাঁড়াতে হবে; তারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে মণ্টেগুর মত ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতের প্রজার সত্ব ফিরিয়ে দিতে অন্ততঃ মুখেও আজ চেয়েছেন।

আজ ধনী তার অর্থ নিয়ে এস, নিধন তার সামর্থ্য নিয়ে এস—এ নবজাগরিত জাতিকে সঞ্জীবিত করে তোল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে অমৃতময় বাণী অর্জ্জুনকে শ্রবণ করিয়েছেন, আজ নবনারায়ণের সেই উদ্বোধন সঙ্গীত আমরা গাইতে গাইতে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানুষের কর্ম্মজীবনে তার সঙ্গী হ'য়ে পথ নির্দ্দেশ করব—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

২। "জগৎ-জোড়া দুর্ভিক্ষ।"

বাঙ্গালীর জ্ঞান-পিপাসা কমছে,—বাড়ছে অর্থ-পিপাসা।

দুর্ভিক্ষ তো অভাব নিয়ে; অভাব নানা জাতির নানা ব্যক্তির নানা প্রকার,—কারো অন্নবস্ত্রাভাব, কারো অস্ত্রশস্ত্রাদির অভাব, কারো যুদ্ধ জাহাজের অভাব, কারো বিলাসিতার সামগ্রীর অভাব।—নানা অভাব নিয়ে আজ রব উঠেছে—"জগৎ-জোড়া দুর্ভিক্ষ!"

পাশ্চাত্য civilisationএর কেন্দ্র সহর আর কল-কারখানা; আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা তদনুযায়ী আদর্শে অভিনব আকারে রূপান্তরিত হবে।

পল্লীবাস হ'তে বাঙ্গালী প্রয়োজনমত সহরে আস্ত, আজ বাঙ্গালী সহরবাসী প্রয়োজনমত পল্লীতে যায় আসে।

পল্লীবাসের উপযোগী শিক্ষা আমরা পাই না; আমাদের সাহিত্য সহরের মাঝখানে কারখানা করে গড়া হচ্ছে, ব্যবসার বিজ্ঞাপন না থাকলে সাহিত্য

চলে না; পল্লীর কুটীরে সাহিত্যের কুসুম ফুটলেও তার সৌরভ বড় সহরে পৌঁছে না। কৃষি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে শিক্ষা পেলে আমাদের যে উন্নতি আশু হ'বে, শত বৎসর সাহিত্য সহবের মাঝে গড়তে গেলেও তা না হ'তে পারে; কারণ, অর্থ ও সচ্ছলতা না থাক্‌লে জাতীয় জীবনে আনন্দের ধারা বয় না।

Literary education পেয়ে উপার্জ্জন-বিদ্যা শেখা যায় না। উপার্জ্জন করবার আগে উপার্জ্জন কেমন করে করতে হয়, শেখা দরকার; জীবনের মূল্যবান্ সময় আমাদের নষ্ট হয় স্কুল কলেজে দু'পাতা ইংরেজি শিখ্‌তে—তারপর সারাজীবন অর্থের ও সচ্ছলতার অভাবে সাহিত্য-সেবায় বড় একটা প্রাণের যোগ থাকে না। কৃষিবাণিজ্য শিখে যে আনন্দ পেয়েছে, লোকসান তার কাছে "একটা বড় শিক্ষা"। জয়ের আনন্দ, পরাজয়ের ব্যথায় গৌরব দুটোই আমরা মুক্ত কর্ম্ম জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছি।

দেশে প্রকৃত জ্ঞানের পিপাসা আর থাক্‌ছে না, আছে শুধু অর্থের পিপাসা। স্বাধীন চিন্তা দু'একটা জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, "চন্দ্রসূর্য্যো" দেশের সকলকে বিস্মিত করে দিচ্ছে, আর সকলে ছুট্‌ছে অন্নচিন্তা, অর্থচিন্তা নিয়ে,—উন্মার মত, ধুমকেতুর মত! আজ দেশের গরীব বারো আনার বেশী লোকের অন্নচিন্তা, প্রায় চার আনা ধনী লোকের অর্থচিন্তা। বিদেশী বণিকের পুতুল হ'য়ে যে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি, তাতে সর্ব্বত্র rich richer, poor poorer এই মর্ম্মান্তিক কাতরোক্তি উঠ্‌ছে। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সব আলমারীর শোভা বর্দ্ধন করছে। আমরা আজ দেশে যে নীতি চাই তা' ঐ বৈদেশিক রাজনীতি আর ব্যবসায় নীতি; তাই দেখ্‌ছি, Economic tranquility (caste ?) চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন সংঘর্ষ ও বিপ্লব বেধেছে; তার দর্শক ও ফলভোক্তা আমরা সকলেই, আর ব্যবসায়-নীতিক্ষেত্রে অন্নের উৎপাদন (Production) কম, (কারণ দেশজাত শিল্পের অভাবে extensive agriculture, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে intensive agricultureএর সর্ব্বত্র অভাব, আর গরীব ও দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা—Poor famine-stricken peasantry), রপ্তানি বেশী (Export of foodstuffs, including all raw materials) আর বেশী বিলাস সামগ্রীর আমদানী। (Import of manufactured goods), রক্তদান ও বিষপান পূর্ণমাত্রায় চল্‌ছে! এ জাতির জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পৌঁছিতে আর কত বাকী?

বাঙ্গলা দেশে দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ প্রতিমুহূর্ত্তে চলছে। স্কুল কলেজে বাণিজ্য-শিক্ষার commercial education অভাবে বাঙ্গালী যে শিক্ষার্জ্জন করছে তা জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্য নয়, শিক্ষার মোহ ছাড়তে পারছে না, এই! গরীবের ছেলে জজীয়তীর স্বপ্ন ছেড়ে কবে দু'পয়সা উপার্জ্জন করতে শিখবে। আর এই মোহে যারা আচ্ছন্ন করে রাখছেন তারা পিতামাতাই হ'ন, আর রাজপুরুষই হ'ন, তাঁদের দ্বারা দেশের যৌবন চুরী হচ্ছে, জাতির অমূল্য জীবন চুরী হচ্ছে। তারা বৃষকেতুর দলকে খুন ক'রছে—কোন্ উচ্চ আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্য?

আর কোন্ সভ্যদেশে বাঙ্গলার মত শিশুবধ হ'চ্ছে? চাষার বুকের রক্ত নিংড়ে আমার সোনার কেল্লার ইট গড়ছি, তার রক্তের তেজটা বজায় রাখ্ছি কি? যে দেশে চাষী এক বেলা অন্ন পায় না, মায়ের মাতৃস্তন্যে দুধ থাকে না—সে দেশে শিশুমৃত্যুর হার কমাবার জন্য একটু তাজা গরুর দুধের ব্যবস্থা করেছি কি? না, তখন চৌরঙ্গীর প্রাসাদে চাষীর পয়সায় ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়া খেয়ে "পাখীর ডাকে" ঘুমিয়ে পড়েছি? অথবা দেশ-ভক্তির শুধু ক'টা বক্তৃতা দিয়েছি, ক'খানা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ লিখেছি? National Congress কি Moderate Conferenceএ ক'বার যোগ দিয়েছি?

এই Soul killing Nationality, এমন Democracy আমরা চাই না; আমাদের ধর্ম্মজীবন, সামাজিক জীবন, পল্লীজীবন আবার আমাদের ফিরিয়ে দাও; —আমরা Congress করব না, সংবাদ পত্র ছাপাব না, আমরা আবার চাষা ভূষো হ'ব, আর হরিনামের ছাপ গায়ে মাখব। Democracyর মন্ত্রগুরু রাজা এস, ধনী এস, আমাদের সাজিয়ে দাও—হাতে বাঁশী দিয়ে, কাঁধে লাঙ্গল দিয়ে আবার কৃষ্ণ বলরাম, শ্রীদাম সুদাম সাজাও, মাঠে ধান দাও, গরু দাও, আবার হাজার রাখাল সাজিয়ে দাও—শোন ধনী, আমার কাতর মিনতি; অকেজো শিক্ষার মন্দিরগুলোর, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ করে দাও; মুক্ত করে দাও তোমার অর্থ ভাণ্ডার, মুক্ত করে দাও তোমার প্রাণের সদর দরজা—আমরা আবার মানুষ হব, মনুষ্যত্বের শিক্ষাদাতা তোমাদের পূজা করব; এ "তপঃশান্ত ভারতের" কোলে "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের রক্তপাতের সূচনা হ'তে দিও না, তোমাদের "সোনার কেল্লা রূপোর পাহাড়ে" ঘিরে রেখো না। যদি রাখ, আজ মৃত্যুবাণে অস্থির জাতি আমরা বন্দেমাতরং মন্ত্র নিয়ে রক্তপাত করব না বটে, কিন্তু—মরব! মরবার পর এ প্রাচীন আর্য্যজাতি রুষজাতির চেয়েও বড় প্রতিশোধ নেবে—ধনী তোমরা, সব নিজের হাতে গড়া কেল্লায় বন্দী হবে,—জীবন্তে সমাধি হবে।

তোমাদের মাঠে তখন ইংরেজের কল, চীনের মানুষ, কি নিগ্রো সব ফসল করতে আসবে কি? রাখালের বাঁশী থেমে গেলে "বেলজিয়মের দক্ষিণ হাওয়া" কি বসন্ত গান গাইতে আসবে? তৃপ্তি হবে কি?

আজ "জগৎ-জোড়া দুর্ভিক্ষ" কিসের? অন্নের নয়, বস্ত্রের; বস্ত্রের নয়, অন্নের; অন্নের নয়, স্বাস্থ্যের; স্বাস্থ্যের নয়, বিদ্যার; বিদ্যার নয়, বুদ্ধির! এ দুর্ভিক্ষ সভ্যতার, বিজ্ঞানের নয়, এ দুর্ভিক্ষ শান্তির, যুদ্ধের নয়; এ দুর্ভিক্ষ আদর্শের, দুর্গতির নয়!

এ দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়? জগৎ-জোড়া নিঃস্বার্থ মহাপ্রাণ কর্ম্মী চাই; কর্ম্মীর বিক্ষিপ্ত কর্ম্মের সূত্র ধরিয়ে দিতে কবিশেখর চাই—"নর নারায়ণ" কৃষ্ণার্জ্জুন চাই—"দুর্ভিক্ষ-কাতর প্রজাকে" আজ ভগবদ্গীতার অমৃতধারা দেবে কে?—কোথায়, কোন্ কুরুক্ষেত্রে।

ভাঙ্গা বীণার গান।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

ভাঙ্গা বীণা গাহে কেন গান?
সে তারের সপ্তসুর
কেন হর্ষ ভরপুর.
মরা নদী কুলে কুলে ডাকিয়াছে বান্?
মৃদু কুল কুল স্বরে
নদীতে সলিল পরে
তটিনী কি গীতি গাহে উদার মহান্!
ভাঙ্গা হিয়া গাহে কেন গান?
অসীমে সসীমে মিশে হায়!
শত হৃদয়ের আশা
শত পরাণের ভাষা
পাষাণ ভাঙ্গিয়া হের কোথা যেতে চায়

কোটী নয়নের জল,
কোটী ভগ্ন মর্ম্মস্থল
দ্রব হয়ে মরি মরি! মিলে মিশে যায়।
অসীমে সসীম হিয়া
দিয়াছে রে উদাসিয়া,
সসীম হবে তাই আপনা হারায়,
সাগরে পড়িতে ওই ধায়।
অতৃপ্ত সে অনন্ত পিয়াসা,
কোটী লক্ষ্য এক হ'য়ে,
কোটী প্রাণী স্রোতে লয়ে,
উধাও কোথায় ধায় এ বিরাট আশা।
দারুণ নিদাঘ পরে
মেদিনী আঁধার করে,
আসিয়াছে দেবকৃপা মঙ্গল বরষা!
আজি মহা ঝঞ্ঝা ঝড়ে,
ক্ষুদ্র হিয়া নাহি ডরে,
এ ঝড় পেয়েছে তারা ভুলিতে নিরাশা
দাও, প্রভো, দাও তবে আজ,
স্রোতে ভরি ক্ষীণপ্রাণ,
তব শক্তি কর দান,
প্রতি বক্ষে তব গাথা হউক বিরাজ।
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে
আবার আপন বেশে
দল এ অধর্ম্ম প্রভো, নাশ এই লাজ।
কে সাধিবে দেবব্রত?
হীন পুত্র, শত শত
দাও দয়া করে তারে আপনার সাজ
এস প্রভো, এস তবে আজ।

"সাধন সমরে"।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার, বি-এ।]

ভাই শিক্ষিত বাঙালী! আলেয়ার আলো দেখেছ কি? পল্লীবাসী হ'লে দেখ্‌তে—পথের শেষ নাই, আলেয়ার আলো কাছে আসে, দূরে সরে যায়! সহরবাসী তুমি, তোমার কাজের শেষ নাই, রূপেয়ার রূপ তেমনই তোমাকে মুগ্ধ করেছে। কিসের উত্তেজনায় নিশ্চিন্তে প্রাণ উৎসর্গ করেছ?

উত্তেজনার দিন আর নাই—আজ আমরা আকাশ-বাণী শুন্‌তে পেয়েছি! হিমালয়ের অভ্রভেদী শীর্ষ যেমন প্রভাত-সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিটুকু সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করে, দেশের চিন্তাবীর যাঁরা, তাঁরাই তেমনি নব যুগের বাণী—জাতীয়-জীবন-প্রভাতের রক্তিমাভাটুকু হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করেন।

সকল উত্তেজনাই ক্ষণস্থায়ী—ইতিহাসে এর প্রচুর সাক্ষ্য আছে, আমাদের "স্বদেশী"ও তাই। তবে স্বদেশীর উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল, তা ধূলিসাৎ হ'ক, কিন্তু সেটা রণোন্মাদনার মত কাজ করেছে। বর্দ্ধমান-বন্যায় ও পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়ে ঐ স্বদেশী যুগের উন্মাদনাই দেশকে মৃত্যুপথের যাত্রী হ'তে দেয়নি।

কিন্তু বঙ্গদেশে এই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, দুর্ভিক্ষ প্রতি বৎসর "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" আন্‌ছে, এতে শুধু উত্তেজনার বক্তৃতা ও প্রবন্ধ কি কাজ করবে? কাজ অনেক আছে, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ আরম্ভ করা চাই।

স্বদেশীর প্রাণটা ছিল উত্তেজনাময়। আমাদের উৎসবে ও প্রতিমা-পূজায় শক্তির সাধনা আর হচ্চে না, হচ্চে স্পষ্ট ক্ষণিক উত্তেজনা। বাঙালী চরিত্র ধূলিসাৎ হয়েছে ঐ উত্তেজনায়—হাউইএর মত ছুটে গেছি আজ তাই আমরা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছি।

বিখ্যাত চরিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঙালী চরিত্রাঙ্কনে শ্রেষ্ঠ উপকরণ উত্তেজনাটুকু বাদ দিলে বাঙালী চরিত্রে যা থাকে সেটুকু ঠিক লঙ্কার ঝাল্ বাদ দিলে রান্নার যা গুণ তাই—ঝালে বেশ মুখরোচক হয়ে চলে যায়—বাঙালী তেমনই চলনসই। আজ এই বাঙালীর চিত্র চরিত্র।

বাঙালীর নূতন চরিত্র গড়তে বাংলার মা মাতৃত্বের গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, আমরা সাড়ে চার কোটি হিন্দু মুসলমান নূতন কর্ম্মে ব্রতী হব। আমাদের বিলাস-লালসা জলে ভস্মসাৎ হয়ে যাক্, দারিদ্র্য ও শত অক্ষমতার পঙ্কাক্ত

সমাজের অঙ্গ হ'তে দূর করতে আমাদের প্রাণ উৎসাহে ভরে যাক্। একদিন এই মাতৃশক্তির চরণে জগতের সকল শক্তি নির্ব্বাক বিস্ময়ে সসম্ভ্রমে অবনত হবে।

উত্তেজনার "ক্লিওপেট্রা" চাই না আমরা, আমরা চাই শক্তির জননী জগদ্ধাত্রী।

আবশ্যক হ'লে মহাত্মা গান্ধীর উত্তেজনাকেও টেলিগ্রাফের তারের পথে বাংলায় প্রবেশ করলেও হৃদয়ের পথে প্রবেশ করতে দেব না, সসম্মানে ফিরিয়ে দেব—কংগ্রেস্ কনফারেন্সের আগ্নেয়-গিরি শুধু উত্তেজনার উৎপাত যেন আর বাংলার মাটীতে না আনে! নূতন চিন্তার সূচনা হয়েছে—এবার রন্ধন কার্য্যে বাংলার মা লক্ষ্মীরা "হাতাবেড়ি" নিয়ে আস্‌ছেন—কিন্তু মা, সাবধান, কাঙাল ছেলেকে ঠকাতে যেন ঝাল্‌মশলা দিও না;—জোয়ারের পর ভাটা পড়েছিল, আবার জোয়ার এসেছে যদি, তবে তীরে পড়ে আছে যত নৌকাগুলো সব ভাসিয়ে নিয়ে আবার চল্‌তে হবে—সব জল ঢেলে দিয়ে পূর্ণানন্দ পেতে এবারকার লক্ষ্য—সাগর।

নূতন চিন্তার ভিত্তি পাত্‌তে "উত্তেজনার ইঁট" আর নূতন করে সাজিও না মা—যা ভেঙে গেছে তা ফেলে দাও; আমরা মাথায় করে মাটী কেটে দেব; নূতন ইঁট্ গড়ে স্বহস্তে তোমারই মন্দির রচনা কর;—এবারকার মাতৃ মন্দির মুক্ত আকাশ-তলে, বনান্তরালে সে আনন্দ মঠ নয়!—আজ আমরা "বন্দে মাতরম্" গান গাইব না—"আয় মা সাধন-সমরে" গাইব—এ গান আর থাম্‌বে না, চাষী মাঠ হ'তে রাম প্রসাদী সুরে ভক্তের ঐ গান প্রাণ খুলে গাইবে যদি একবার জান্‌তে পারে "মা এসেছে—সত্য সত্য এসেছে—আর যাবে না"। তার চোখের জলে মা'র বুক ভিজে যাবে, লাঙ্গলের ফলাটা মা'র বুকে যে দাগ্ কাট্‌বে, সেখানে "আবাদ করে সোনা ফলিয়ে" তখনও গাইবে—"দেখি মা হারে কি পুত্র হারে—আয় মা সাধন-সমরে।"

নব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

[শ্রীসত্যবালা দেবী।]

ওগো নূতনের উপাসক। এই অমৃতের সংস্পর্শপূত অমর-জীবনের জন্যই যাহারা নব্যতন্ত্রের জাহ্নবী প্রপাতের মর্ত্ত্যে অবতারণা করিবার ভগীরথের তপস্যা করিতেছ! আমার বাণী স্পর্শ করুক তোমাদের সঙ্কল্পকে? আশার পুলক-হিল্লোল বহিয়া যাক্। আমরা ভ্রান্ত নহি। অবশ্যম্ভাবী আগামী দিনের যে নবারুণ রাগচ্ছটা রঙ ধরাইয়া আমাদের হৃদয়পট রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে,—সে জাগ্রতে দেখা। স্বপ্ন নয়।

দিন আসিবেই, যে দিনে তোমরা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সে দিন আলোক প্লাবনে চতুর্দ্দিক ভরিয়া যাইবে। জীবনের গতি সংগ্রাম-হীন হইবে, মুক্ত হইবে। কেহ কাহাকেও দাবিবে না চাপিবে না। সর্ব্বত্র মানব পরস্পরকে সার্থক করিয়া সার্থকতার মহাসমুদ্রমধ্যে ডুবিয়া থাকিবে। ইহাই নব্যতন্ত্রের মর্ত্ত্য,—ইহাই নূতনের স্বর্গসৃষ্টি! ইহার আয়োজন আজ পৃথিবী ব্যাপিয়া। মহামানবের অখণ্ড আত্মা খণ্ডতার মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার নিভৃত প্রাণে যে আদর্শ অস্ফুট অরুণাভাষের মত ক্ষীণ জ্যোতিঃলেখা জাগাইয়াছে সে এই ভারতের নব্যতন্ত্রের মধ্যেই আপনার পরিপূর্ণ-স্বরূপ দেখিতে পাইবে। এই নব্যতন্ত্রেরই পূর্ণ বিকশিত মূর্ত্তি জগতের নব অভ্যুদিত ভবিষ্যসভ্যতার উৎসবমেলার ভারতের বাণী। এ সত্য জয়লাভ করিবেই। প্রতিষ্ঠিত হইবেই। আজ তাই চতুর্দ্দিকের অবরোধ ও অচলায়তন সমাজের মধ্যেও সংশয় আপনা হইতে আবির্ভূত। পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ, নারী, কেহই আর বুকে হাত দিয়া বলিতে গেলে এ কথা বলিতে পারিবে না, যে আজও সে সেই সনাতন নিষ্ঠার উপাসক।

যাহারা অহংকার করে তর্ক করে করুক, তাহার প্রত্যুত্তর আমি করিতে চাই না। আমার আবেদন জাতির হৃদয়ের কাছে। বুদ্ধিমান অভিসন্ধিসর্ব্বস্বের রসনাকে দূর হইতেই নমস্কার করিতেছি। তাঁহাদের সংস্রবের সকল সম্ভাবনা-কেই বর্জ্জন করিতেছি। আমি যে দেখিতে পাইতেছি কাল নূতনের সহায়। নূতনের অভিযানের পথ ঐ যে আপনা হইতেই সুগঠিত হইয়া উঠিতেছে! কি অপূর্ব্বজীবন প্রকাশের গভীর ও নিগূঢ় মর্ম্মপ্রেরণা অতীতের সমস্ত সংস্কার

জাল মুক্ত করিয়া স্পষ্ট ইচ্ছাশক্তিরূপে জাতির ভবিষ্যৎ ভরসা যুবকগণের জীবনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। এ জাহ্নবী জলতরঙ্গ রোধ করিবে কে? সুস্থির পুরাতনের বহু মতের ঐরাবত ভাসিয়া যাইবেই। মমতায় মহাপ্রাণতায় যে সমস্ত হৃদয় দেশের মানুষের মধ্যে আদর্শ বলিলেই হয় তাঁহাদের মধ্যে এ কি এ নূতন চিন্তার প্রবাহ। এ যেন সত্যই সেই দ্বাপরের বাঁশরী স্বরে যমুনার উজান প্রবাহ! সে সব দেবভাবে পরিপূর্ণ প্রাণগুলি কি অকৃত্রিম পার্থক্য সুস্পষ্ট আহ্বানধ্বনির মত আপন আপন মধ্যে ধ্বনিত হইতে শুনিতে পাইতেছে। অতীতের বিশ্বাসের ধারা বর্ত্তমানের বিকাশের প্রবাহ সমস্তই তাহাদের কাছে অসম্পূর্ণ।—সে অপূর্ণতার মধ্যে আপনাকে মিলান আত্মবিলাসের নামান্তর মাত্র। স্থির বুঝিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিয়াই তাহারা আপনাকে গঠন করিতে চাহিতেছে। ভারতবর্ষের বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা এখনও দেশের সকল দুর্গতির মাথার উপরে সগর্ব্বে উড্ডীয়মান, সেখানেও একটা সান্ত্বনা মিলে। তাহাদের আপাতঃ দৃষ্টি সেই দিকেই নিপতিত, তাই পুরাতনের গর্ব্ব এখনও ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হয় নাই। সংসারে দেবত্ব পশুত্বে সংঘাত বাঁধিলে দেবত্ব করুণামিশ্রিত উপেক্ষায় পশুত্বকে ক্ষমা করে—তাহার বলহীনতা জানে বলিয়াই তাহাকে আস্ফালন করিতে দেয়—ইহাই না পশুত্বের বলদৃপ্ত দম্ভ প্রকাশের কারণ? তাই না দেবভূমি ভারতে পশুজীবনের এত প্রাধান্য? সংসারে দেবত্বের দৃশ্য এত বিরল? গ্লানি অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিলে অধর্ম্মের বিনাশ হইবেই হইবে; তখন দেবত্ব সরিয়া দাঁড়াইবে না। নূতনের নবযুগের নিমন্ত্রণে যুগধর্ম্ম স্থাপনার্থ সে অভিযানে আসিবেই।

রণবাদ্যই ত বাজিয়াছে। ধর্ম্মের অধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা আর অস্বীকার করা চলে না। দুন্দুভি নিনাদ সে বার্ত্তা গোপন রাখিতে দিতেছে কই? যুদ্ধ অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের। অধর্ম্মের অস্ত্র—অন্যায়, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও ভয়। ধর্ম্মের অস্ত্র—ন্যায়, পরহিত, উদারতা ও সাহস। এ যুদ্ধ অন্তঃস্থলে—রণক্ষেত্র হৃদয়ে। মানুষ এখন হইতে ইহাতে ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকিবে। দেশ দেশে ঘরে ঘরে সমাজে হইতেছেও ত।

নূতন রূপে মানবস্বভাবকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া সত্যমঙ্গল পথে তাহাদের সমগ্র জীবনকে ভগবান পরিচালিত করিবেনই। কত উন্নত মানব আত্মা অতৃপ্তির অনল শ্বাসে চ্যুত উল্কার মত তাহারই সন্ধানে বিশ্বভুবন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। কত সম্প্রদায় কত মত আবির্ভূত হইতেছে।

কত সন্ন্যাসী বৈরাগ্যের পতাকা নিয়ে মহাভাব সিন্ধুর সন্ধান দেখাইয়া সেই সব প্রজ্বলিত হৃদয় গুলিকে তৃপ্ত হইতে দিয়া নূতনের দাবানল হইতে সংসারকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু চিরদিন এমন করিয়া সংসার বাঁচিবে না। সেইখানেই এইবার যুগপরিবর্তনের আভাষ জাগিয়াছে। এবার মানব সংস্কার মূল হইতেই কাঁপিয়া বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষেই কি দেখিতেছি? আজিকার ভারত অভিনব পন্থা ধরে নাই কি? নব্যতন্ত্রের কাছে পুরাতনের জবরদস্তি সত্যই কি অমোঘ অপ্রতিহত? নূতনের মধ্যে, সহস্র যুগ যুগান্তের নিশ্চতত্ব, গতানুগতিকের উপর কোটী অযুতমানবের অনন্তনির্ভর, এ সমস্তের প্রভাবই শ্লথ হইয়া আসে নাই কি? যাহার ভূত বলিয়া কল্পিত পদার্থটার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস একবার চলিয়া যায় তাহার কাছে পথে ঘাটে লোকের সাতঙ্ক আড়ষ্ট ভাব কৌতুক ব্যাপার মাত্র। দেশের মধ্যে জাতিনাশ সমাজচ্যুতি নরক প্রভৃতির ভয় সম্বন্ধে এমনি ভাব আজ আসে নাই কি? রাত্রির চক্ষের পাতায় ঘনায়মান ঘুম পরিপূর্ণ বিশ্রামের মধ্য দিয়া অপসারিত হইয়া গেলে প্রভাতে যেমন স্বচ্ছ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়া আসে, তেমনি অতীতের ইতিহাসে শ্রুত হাজার হাজার বছরের ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়া এমন একটা কিছু আজ ফিরিয়া আসিতেছে, যেটা ছিলনা, বহুকাল গিয়াছিল। এটা যদি ভ্রমের যুগের অবসানে স্বপ্নদৃষ্টির পরিবর্তনে সত্যদৃষ্টির সঞ্চার বলা যায়, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে সত্যের যুগাবির্ভাব সন্নিকট।

ভারতের মর্ম্মস্থান ধর্ম্ম। ধর্ম্মের নামে যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহার উপরই নূতনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আজ পতিত, এত অস্বাভাবিক নহে, অমঙ্গলের সূচনাও নহে। মর্ম্মকেই ত আপনার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে, প্রাণ ত সেই খানেই; মর্ম্মের চিকিৎসাই গোড়াকার চিকিৎসা। সেথাকার রোগের মূল বিদূরিত হইলে রোগ আর কোথা হইতে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে এমন করিয়া পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিবে? এ সন্দেহ ত ধর্ম্মকে সন্দেহ নহে,—এ সন্দেহ ধর্ম্মের নামে যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাকে। সে যদি যথার্থই সত্যের আশ্রয় স্থল তবে আবার তাহার ভয় কিসের! সে প্রসন্ন সস্নেহ দৃষ্টি নূতনের তরুণ মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া আপনার অপর্য্যাপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়া দাঁড়াক। উভয়ে মেলামেশা হইয়া পরস্পর বুঝা পড়া চুকিলে নূতনের কোলাহল আসিবেই আসিবে, নূতনের প্রাণে যে নূতন ক্ষুধা জাগিয়াছে। তাহার আশঙ্কা হইয়াছে সে বুঝি দেশের মধ্যে আশ্রয়হীন। সে একটা শক্তির কেন্দ্রস্থল দেখিতে চায়, যেখানে সমস্ত

হৃদয়াবেগ জমা করিয়া তাহাকে বলবান বেগবান করিয়া তুলিবে। পুরাতন আপনার মধ্যে সেই কেন্দ্র দেখাইয়া দিক্ না। সে এতদিন মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, মানুষ ঘুমাইতেছিল, তাই তাহার সে ব্যবহার এতদিন সাজিয়াছে। আজ যখন মানুষ জাগিয়া উঠিল, তখন তাহাকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় কি?

আর পুরাতনের এমনই বা কি শক্তির সে জীবনের পথিক মানুষ তাহার তর্জ্জনীর শাসনে স্থির থাকিবে? মানুষ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, সত্য মিথ্যা বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন বিনাসর্ত্তে তাহার সহিত বিলি ব্যবস্থা চলে কি? সে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে? সে কি খুঁজিতেছে না আপনা হইতে যদি যাওয়া যায়, পাইবার চেষ্টা কি সে করিতেছে না? সেটা সত্য সেটা ত কাহারও চাবির মধ্যে নাই যে তাহার চোখের সম্মুখে এমন সত্যই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না? যিনি দিবার তিনি ত মানুষই নন, যে, মানুষের সম্প্রদায় বিশেষের সম্মতির অপেক্ষায় তাহা গুটাইয়া লইয়া বসিয়া থাকিবেন।

বস্তুতঃ এ পৃথিবী কি? ব্রহ্মের অংশভাগ। উচ্ছ্বসিত আনন্দ সমুদ্রতরঙ্গের আলোড়নে বুদ্বুদ প্রকাশ হইতেছে। ব্রহ্মের মানস চৈতন্যের অংশে প্রস্ফুটিত সেই বিশ্বই না মানব? ব্রহ্ম ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি? ব্রহ্মের আনন্দ হইতে যাহার উদ্ভব তাহার মধ্যে মালিন্য অনাচার কোথায়? সুতরাং এই যে ভুল এই যে ভ্রান্তি,—কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,—ইহাদেরই শাসনে বন্ধন ক্রন্দন জ্বালা যন্ত্রণা। এ সবই নিমেষের একটা দৃষ্টিতে অন্তর্হিত হইতে পারে, যখন সে দৃষ্টি সত্য দৃষ্টি। কেবল মার্গের পরিবর্ত্তন। পুরাতনের অনুশীলন-শাসিত বর্ত্তমান শাসন বা মার্গের পথিক, তাহার হৃদয়ের অন্তরে ভগবানই তাহাকে বামরূপ দেখাইতেছেন। না, না, না, শঙ্কাকম্পিত বক্ষে মুখভঙ্গী করিয়া বিধি নিষেধ সংশয় সন্দেহের বিরাট প্রাচীর মধ্যে সে সেই জন্যই ত লুকাইতেছে। সে ত পলাইবেই। সে ত চক্ষু বুঁজিবেই, সে যে দেখিতেছে কেবল কালীর বামকর। চক্ষুর সম্মুখে তার ঝলসিছে উন্মুক্ত খর্পর।—আর? রুধিরাপ্লুত বদ্ধভ্রূকুটী প্রকটিতদন্ত ছিন্ন নৃমুণ্ড! রুদ্রের প্রলয় তাণ্ডবের বিভীষিকা,—ধ্বংসের গর্জ্জিত অট্টহাস্য।

সে ধর্ম্ম কেমন যাহা পৃথিবীর সম্বন্ধে জীবনের সম্বন্ধে মানুষের স্বাভাবিক বোধ-শক্তিকে ভুলাইয়া দিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়া দেয়? সে ধর্ম্ম নূতন জানে না, জানিতে চাহেও না। সে তাহাকেই জানিবে মানিবে বিশ্বাস করিবে যে

স্বভাবের নিবিড় ইচ্ছাশক্তিটুকু বিশ্বের অন্তান্তর ভাগে পরিস্ফুটমান কল্যাণবর্ণে স্নাত হইয়া আপনার সার্থকতার স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখনই না সে দেবতা? এ দেবত্বে মানুষেরই চিরন্তন অধিকার, ইহার মধ্যেই যে মানুষের সম্পূর্ণতা।

তিনিই দেবত্বের বিকাশে এই সিদ্ধরূপ ফুটাইয়া মানুষকে তাঁহার সহিত চিরমিলনে আহ্বান করিতেছেন,—তাই ত এই আত্মার ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিতেছে তাঁহারই কণ্ঠস্বর। কত কাছে তিনি, কত সহজে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিবার এই নূতনের পথ। এখানে সব অনুকূল, এ যে দক্ষিণ মার্গ! তখন কত আশা কত ভরসা জীবের, সে যখন সত্য দৃষ্টির সহায়ে এই পথ দেখিতে পায়! অনিশ্চিত তখন তাহার কাছে নিশ্চিত—সে তখন আপনার সম্পূর্ণ পাওয়া চেতনা ভরিয়া পাইয়া কাহাকে বলে বুঝিয়াছে। সে তখন ভরাট!

কিন্তু এই বাম মার্গ কেন? ইহাও ভগবানেরই ত?

জীবের সহিত নিত্য সংযোগ একটু তিনি স্থগিত রাখিতে যবনিকাখানি টানিয়া দিয়া একান্তে গিয়াছেন ভগবান ত। গিয়াছেন বলিয়াই ত আমরা আমরা হইয়াছি। হারাইয়া পাইতে চাহিয়া তবে আবার পাইতেছি। ক্ষণিক বিচ্ছেদে চিরমিলনের মধুর স্বাদ নিত্য নূতনরূপে দেখা দিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাস অনায়াস-লভ্য, কেহ জলে চুবাইয়া না ধরিলে নিশ্বাসের মধ্যে যে তৃপ্তি যে স্বস্তি তাহা ত উপলব্ধি হয় না। এত নিবিড়রূপে পাওয়া এত দিনরাত পাওয়া জিনিষটা যেন না পাওয়ারই মত চিরদিন ভোগ করিতে থাকি!

তাই ত বলিতেছি এই আপাততঃ জীব, হইয়া বসা স্বাভাবিক, এই বামমার্গ কেবল বুঝাইবার জন্য। সমষ্টির জীবনবিকাশ এমন মিথ্যায় এই যে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমৃতের সহিত তাহার চির মিলন সংযোগ সূত্র বহিয়া জাহ্নবী স্রোত প্রত্যেক ব্যষ্টিকে পরিপূর্ণ করিয়া সত্যের সহিত জগতের চির মিলন ঘটাইবে বলিয়া এই ভ্রমের সৃষ্টি। জগত জগতই আছে। জীবন জীবনই আছে। থাকিবেও। ভগবান হারাইয়াছি বুঝিলে ভগবান বিহীন অবস্থাটা আমরা বুঝিয়া লইব। ভিতরে ভাগবত শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই বোধ শক্তি বিকাশেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। এই বিকাশের মধ্যে জগৎ বধূয়ার পূর্ব্বরাগ ফুটিয়া উঠিবে। তার পর মধ্যজগৎ মধ্যে অনন্ত স্রষ্টার অভিসারের কত খেলা, ভঙ্গিমা, সে আর এখন বুঝাইব কি? মানুষকে কোন্ স্বর্গে তুলিয়া দিয়া কি মধুর বসন্তের জগৎব্যাপী উৎসবের দিন আগাইয়া আসিতেছে সে ত শেষেই দেখিব, এই জন্মেই দেখিব। ভগবান পাওয়ার পর, জগতের সহিত

তাঁহার চিরমিলন ঘটিবার পর, আমি বুঝিব জগতও বুঝিবে, সুখে কত সুখ, প্রেমে কত প্রেম, ভোগে কত ভোগ। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এ সকল কি? ইহাদের কেনই বা পাই? পাইয়াই বা কি পাই? আজ ইহাদেরই জন্য কাড়াকাড়ি দাপাদাপি দাবাদাবি এত ধস্তাধস্তি, তবুও ইহারা মানুষের কাছে আকাশ কুসুম! মরুভূমির মরিচিকা। কিন্তু সে দিন ইহার জন্য জগতে আর কোনও চাঞ্চল্যই থাকিবে না। মানুষের ভিতর শান্ত সমাহিত, বাহির স্থির গম্ভীর, চতুর্দ্দিক তবুও ইহাদেরই দ্বারা পুষ্পসম্ভারাকীর্ণ বনান্তের মত সুশোভিত।

এই জগৎব্যাপীর পরিপূর্ণ বোধকে অস্পষ্ট করিয়া দিতেছে যাহা কিছু তাহাই মিথ্যা। এই মিথ্যাকে জড়াইয়া চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চাহিতেছে যাহা কিছু তাহাই পাপ।—এই সমস্ত মিথ্যা ও পাপের মূল কে? সে মূল আমাদের নিজেদের মধ্যেই অবস্থিত। সে এই বর্ত্তমানের অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহারই তাড়নায় সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্র আমির মধ্যেই আমাদের সত্তা পর্য্যবসিত। আমি আমি করিয়া মানুষ উন্মত্ত অথচ সে জানে না এই আমির কি স্বরূপ;—ইহাই ত তাহার বন্ধন। যত দিন সে আমি আমি করিবে, কিন্তু আমি কে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাহিবে না, তত দিনই সে বদ্ধ। আর এই দেখিতে চাওয়াই মুমুক্ষুত্ব। দেখিতে চাওয়াই মুক্তি। বদ্ধ আমির খোরাক যোগাইতেই বিশ্বে কোলাহল সংঘাত ফুটিয়া উঠে। এই বদ্ধ আমিই বুভুক্ষিত প্রবঞ্চিত ক্ষুব্ধ। মুমুক্ষু আমি নিতে চায় না, দিতেই চায়। আপনাকে দেখে না, পরকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। মুক্ত আমির কাছে আপন পর সবই সমান।

মুমুক্ষু ভিন্ন নব্যতন্ত্রে দীক্ষা লইতে কেহ অধিকারী নহে। মুক্তই নব্যতন্ত্রের প্রকৃত সাধক, কারণ নব্যতন্ত্রের তপস্যাই যে সমষ্টির মধ্যে ভাগবতরূপের বিকাশ সঙ্ঘটন। এ সাধনলীলা কেবল জীবের ইচ্ছায় আরম্ভ হয় নাই, ইহার মধ্যে ভাগবত ইচ্ছারও যোগ আছে। ভগবানই আজ মানবস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া পৃথিবীতে সত্যের যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে চান।

কে আছ ভগবানের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইবে? কে ভয়সংশয়কুণ্ঠা-জড়িত জীবনের এই প্রতিদিনের হীনতা হেয়তা হইতে নিজেকে উপরে তুলিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ বিশ্বের ভার বহন করিতে চাও, উদ্বুদ্ধ হইয়া থাক। নূতনের জাহ্নবী প্রপাত-তরঙ্গে সে জীবনীর ভগবান মানুষের বুক ভরিয়া দিতেছেন; তাহার পরিপূর্ণ

অনুভূতি ও অখণ্ড আরও আপনার করিয়া লও; মানব মাত্রেই করিয়া লও, পুরুষ লও, নারী লও, দীন লও, হীন লও। অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, কেহই আজ পিছনে পড়িয়া থাকিবে, তাহার যে সম্ভাবনা নাই। আজ সকলেই ভগবানের, আজ সকলের মধ্যেই ভাগবত মহিমা বিবোধিত হৌক।"

মিলিয়ে নাও।

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।]

তুমি আঘাতের পর আঘাত দিয়ে,
এই যন্ত্রটিরে মিলিয়ে নাও।
মিলিয়ে নাও, ও যন্ত্রী,
তোমার আপন সুরে মিলিয়ে নাও।
দল যদি তার ছিঁড়েই থাকে,
সেথা দাও গো বাঁধন শক্ত পাকে,
দলের ছিন্ন হৃদয় বিদ্ধ করে'
দু'টি মুখ জুড়ে' মিলিয়ে নাও।
তার পুলকের তানে প্রাণ মেতেছে
পেয়েছে তোমার পরশন,
তোমার করুণ আঘাতে উছসি উঠিবে
করিবে গো সুর বরষণ,
সে সুর আঁধারের মাঝে মরে গুমরিয়া,
দাও গো তাহারে মুক্ত করিয়া,
তোমার প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সে যে
বাজিবে গো তারে মিলিয়ে নাও।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

নারীর উক্তি।

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী প্রণীত। মূল্য এক টাকা। আজ স্ত্রীশিক্ষা-সঙ্কট ও নারী সমস্যার দিনে এ পুস্তকখানি পড়িবার জিনিস। লেখিকা হিন্দুসমাজের নারীর আসন কোথায়, তাহা নিরপেক্ষ সংযমের সহিত দেখাইয়াছেন। নারীসমস্যার ঠিক সমাধান না করিলেও সে সুস্পষ্ট ভাবে পথটুকু উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। এই জাগিবার যুগে যে সমস্ত দেশভক্ত রূপটুকু গড়িতে আসিয়াছেন, সেই যুগশিল্পী ও ভাবুক লেখকদের এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। অনেক কথা, যাহা মনে স্বভাবতঃ আসে না, তাহা উদয় হইবে, যে মন শুধু কর্ম্মোন্মুখ, তাহাকে ভাবিতে শিখাইবে।

কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া বইখানির সঙ্গে একটু পরিচয় দিই। "সীতা সাবিত্রীর কথা তুলিবেন না। সে রামও নাই, সে অশ্বপতিও নাই। তাঁহারা চিরকালই আমাদের চিত্তাকাশে তারার ন্যায় জাজ্বল্য করিবেন, কিন্তু তারার আলোয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। অপর পশ্চিম সমুদ্রপারে নানাপ্রকার নবনারীদলের বিদ্রোহ রণযাত্রার রক্তবর্ণ মশালের আলো। এই তারা ও মশালের আলোর মাঝামাঝি স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থিরজ্যোতি সন্ধ্যা প্রদীপটি কে জ্বালিয়া দিবে?" "আমরা দৈনিক জীবনের সহযাত্রী চাই, কোন একজন বিশেষ দেবী বা মানবী নহে, কিন্তু বহুকালের বহুলোকের সাম্মিলিত আত্মপ্রকাশ—এখনকার আদর্শ বঙ্গ রমণীর সুস্পষ্ট ধ্যানমূর্ত্তি।" লেখিকা চাহেন, নবীনের বুকে সীতা সাবিত্রীর নবসৃষ্টি, তাই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের- "শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়, স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য্য যাঁদের অসীম, কর্ম্ম যাঁদের নাম, ধর্ম্ম যাঁদের রক্ষক, মন যাঁদের সবল, বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অশ্রান্ত, যাঁরা আত্মসুখে উদাসীন, পর দুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট।"

গ্রন্থকর্ত্রী "পুরুষালী মেয়ে না মেয়েলি" পুরুষের বিরোধী। তাঁহার মতে নারীর "শিক্ষাদীক্ষা যাহাতে সেই সীমাকে অতিক্রম না করে, ও একটি সহজ শ্রীর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে, তাহাই বাঞ্ছনীয়।" পুরাতন ও নূতনের সংঘর্ষের কথায় ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন, "এ যেন ধীরগামী বৃদ্ধের সহিত চঞ্চল বালকের

বিচরণ। বৃদ্ধ শান্ত দান্ত সমাহিতচিত্তে, নতনেত্রে, অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমভাবে চলিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যতের ছবি মনোমধ্যে বায়োস্কোপের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া যাইতেছে, বর্ত্তমানের সহিত যোগসূত্র স্বরূপ বালকটির লীলাখেলা দেখিয়া মাঝে মাঝে হাসিতেছেন, কখনো কখনো তাহার সকল চতুর প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, আবার মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন। * * অথচ দুই জনেরই পরস্পরকে নহিলে চলে না। এই জুড়িই জীবন-শকটের বাহন, তাই আমাদের এমন অপূর্ব্ব তরঙ্গায়িত গতি।"

* "পড়ে এই কলির ফেরে সবি যে যে ভেঙে চুরে ভেসে যায়।" এই ভাঙনের দিনে উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে, আমরা মেয়েরা যদি একটু মাথা ঠাণ্ডাভাবে হাল ধরিতে না পারি, তা' হ'লে সংসার তরী যে কোন্ রসাতলে তলাইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। * * পরদেশী সঁইয়ার গলায় মাল্যদান যখন কপালে লেখাই আছে, তখন নিজে জাতিভ্রষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জাতে তুলিয়া লওয়া যায়, ইহাই সমস্যা।"

"বর্ত্তমান স্ত্রী শিক্ষা" ছাড়া এ বইখানিতে আরও কয়েকটি অধ্যায় আছে, যথা,—সমালোচকের পত্র, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা এবং গ্রীস ও রোম। "পাটেল বিল" অধ্যায় বড় সুপাঠ্য; একটু নমুনা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না,—

"আমার বোধ হয় বিবাহ-সম্বন্ধকে তিন দিক থেকে মিলিয়ে দেখলে তবে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয়,—ধর্ম্মের দিক, সমাজের দিক এবং আইনের দিক। তার উপর একটা কবিত্বের দিক আছে, * * সেকালে স্বয়ম্বরা হ'তো শুনেছি, কিন্তু এখন ত কবিত্ব বিত্তরাহুগ্রস্ত এবং রুচিও শুচিবায়ুগ্রস্ত।

"যেখানে ইংরাজের প্রবেশ নিষেধ, যেখানে আমার আত্মীয়তা, যেখানে আমার কুটুম্বিতা, যেখানে আমার 'শত সহস্র মঙ্গল বন্ধন ও সুখদুঃখ জড়িত; সেখানকার সকলে যদি আমাদের (পাটেল পন্থার) নবদম্পতীকে আদর করে' ঘরে তুলে না নেয়, হাসিমুখে বরণ না করে,—তাহ'লে কি শুষ্ক বিলের খড়খড়ানিতে বিশেষ কোন সান্ত্বনা হবে?" "বিবাহের ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয় হওয়া চাই * * তবেই এই বিল সার্থক হবে। অবশ্য প্রথম থেকেই সে আশা করা যায় না।"

' শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যে পরিমাণ নিয়ম আবশ্যক, তা' কেউ ভেঙে দিতে বলছে না। বলছি শুধু "জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, আচারে বিচারে বাধার" লৌহ-কারাগার মুক্ত করে, হিন্দুসমাজকে তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ফিরিয়ে দিতে, তাকে

পৈতৃক সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে, অহল্যা পাষাণীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু কোথায় সে দূর্ব্বাদলশ্যাম মোক্ষদ শ্রীরাম?

"অদূর ভবিষ্যতে ভারতলক্ষ্মীর যে শতদলপদ্মাসীনা মহিমময়ী মূর্ত্তি কল্পনা-চক্ষে দেখতে পাই, এই নব-বিবাহ পদ্ধতি তার একটি দলমাত্র। কিন্তু একটি একটি করেই দল খুলবে, দুইটি তিনটি করেই ক্রমে শত পূর্ণ হবে; তাই একটির "পথ চাওয়াতেই আনন্দ"।

"বাইরের চাপে বিদেশের শিক্ষায় আমাদের কতকগুলো বাধা ভেঙেছে, কতক পরিমাণ চৈতন্যও জন্মেছে,—এক হবার, স্বাধীন হবার, উন্নত হবার দিকে একটু তাড়না ও প্রেরণা এসেছে। বাকিটা কি নিজের ভিতর থেকে হবে না? হিন্দু সমাজ কি বুঝবে না যে, ভেদের কাল গিয়েছে, সাম্যের দিন এসেছে: কেউ আর অধীন থাকতে চায় না। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন রাজার কাছ থেকে স্বরাজ চাচ্ছি, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও,—যে এতদিন মূক ছিল, সে ভাষা শিখেছে; যে বধির ছিল, শুনতে পাচ্ছে; যে অন্ধ ছিল সে আলো দেখেছে; যে পায়ের তলায় ছিল, সে উঠে বসতে চাচ্ছে। •

"কেবল বহিষ্করণ, কেবল তিরস্করণ, কেবল জাতিপাত ও দলাদলি করে ভাল লোক, শিক্ষিত লোক, কৃতী লোককে বর্জ্জন ক'রতে থাকলে, ক'দিন হিন্দু সমাজ টিঁকবে, কা'কে নিয়ে দশ জনের মধ্যে এক জন হবে? * * অনেক ব্রাহ্মণ যেখানে বিদ্যাবিনয়শূন্য, অনেক ক্ষত্রিয় যেখানে বলবীর্য্যহীন, অনেক বৈশ্য যেখানে বাণিজ্য-ব্যবসানভিজ্ঞ, এবং অনেক শূদ্র যেখানে উচ্চতর কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়,—সে অবস্থায় আর প্রাচীন ব্যবধানকে ঠেকো দিয়ে রাখবার কি কোন আবশ্যকতা বা অর্থ আছে?

আমাদের যুবকবৃন্দই আমাদের ভবিষ্যতের প্রধান আশা, বল ও ভরসা। তাঁরা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে—"Standing with reluctant feet"; * * চারিদিকে বাধা, চারিদিকে নিষেধ। * * কিন্তু এই বিঘ্ন অতিক্রম করেই চলতে হবে,—এই তাঁদের অদৃষ্টলিপি, এই তাঁদের সাধনা।"

উত্তর বেদ ও পরম পদ।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বিবৃত। ঢাকা, বাঙ্গলা বাজার প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী হইতে শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে শিখিয়া আমাদের সমাজ

দিন দিন যেরূপ হীনবল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে এ শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এতদিন বৈরাগ্যের নাম করিয়া সমগ্র দেশ যে নির্জীবতার সাধনা করিয়া আসিতেছিল, তাহার ফল কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সাধু, বৈরাগী, ফকির সকলেই এতদিন ভবনদীর কূলে ভেলা ভাসাইয়া, শীর্ণ, ক্লিষ্ট, নিরানন্দময় জীবকে ভবপারে পৌঁছাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন, জগৎ যে ব্রহ্মেরই প্রকাশ সংসার যে আনন্দময়েরই লীলাক্ষেত্র এ সরল সত্য আমরা কূটতর্কজালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। সাধনা যেরূপ, সিদ্ধিও তদনুযায়ী হইয়াছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বসিয়া আমরা আজ লক্ষ্মীছাড়া। জগতকে তর্কের চোটে মিথ্যা বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধনা। পুস্তক খানিতে সেই আদর্শ পরিস্ফুট দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন;—"অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়া ঈপ্সিত গুণগুলি ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আকর্ষণ করিতে থাক। ইহাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং প্রকৃত সাধনা"। কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ অন্তরে ফুটিয়া উঠিলে, আর টানাটানির আবশ্যকতা থাকে কি? জীব ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র হইয়া উঠিলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যই কি জীবের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে না?

নারায়ণের সাজি।

আমেরিকায় শিক্ষার ব্যবস্থা।

আমেরিকার অনেক ষ্টেটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হইয়াছে। জন্মমাত্রই প্রত্যেক বালক-বালিকার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ যত্ন লওয়া সেখানে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণে তাঁহারা কখন পরাঙ্মুখ হন না। প্রায় সকল ষ্টেটেই 'শ্রমবিভাগের' (Labour Department) অধীনে এক একটি করিয়া "শিশুবিভাগ" (Children's Bureau) আছে। রাজ্যের শিশুসন্তানদিগের ভাবী মঙ্গলানুষ্ঠান সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য। জন্মমাত্রই তাহারা প্রতি শিশুর একটি জন্মবিবরণ সংগ্রহ

করে এবং তাহার জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। যে পর্য্যন্ত সে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ না করে, সে পর্য্যন্ত এই 'শিশুবিভাগ' তাহার প্রতি সস্নেহ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। ভবিষ্যৎ জীবনে সে যাহাতে সুস্থ ও সবলকায় হইয়া রাজ্যের একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসীরূপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, তাহাকে সেইরূপভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এই বিভাগ তাহার জনক-জননীকে যথেষ্ট সাহায্য করে। যাহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভগ্ন না হইয়া পড়ে, যাহাতে তাহার কোনরূপ সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে তাহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। যাহাতে শিশুগণ উপযুক্ত পরিমাণে আহার, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ, এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক পাইতে পারে, সে বিষয়ে তাহারা পিতামাতাকে অনেক পরিমাণে সহায়তা করে। "কুমার-কানন" শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিশুদের শিক্ষার বন্দোবস্ত এবং তাহাদের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়াকৌতুকের আয়োজনও তাহারাই করিয়া থাকে। জননীগণ যাহাতে শিশুপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানাপ্রকার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এমন কি, অনেক সময় রুগ্ন শিশুদিগের চিকিৎসা বিষয়েও তাহারা যথেষ্ট সহায়তা করে।

তারপর শিশু যখন বিদ্যালয়ে গমনের উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হয়, তখন কর্তৃপক্ষ তাহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তাহাকে সরকারী অবৈতনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা হয়। কোন কোন রাজ্যে কাগজ, কলম, কালী এবং পুস্তক পর্য্যন্ত বিনামূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়; এমন কি যে শিশু গৃহে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় না, তাহার খাদ্যেরও সংস্থান করা হয়। দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনসাধারণও এ বিষয়ে শাসন-কর্তৃপক্ষের সহায়তা করিতে ত্রুটি করেন না। বিকলাঙ্গ শিশুদিগের (Defectives) উপযুক্ত চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-রত ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বিশেষ একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের অন্যান্য জনহিতকর সমিতির (organisation) সঙ্গে একযোগে ছাত্রগণের চরিত্রগত উন্নতি সাধনের নানারূপ কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন করেন। রাজপথে,

এবং ধূম্র মদ্যাদি পান-শালায় (smoking and drinking saloons) ছাত্রগণের যাতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সরকার হইতে আইনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একদল পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। যখন কেহ পথে কোনরূপ অমিতাচার প্রদর্শন করে, তখন পরিদর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া যুবকদের বিচারালয়ে (Juvenile Court) বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করেন। পুত্র ভ্রান্তমতি ও বিপথগামী হইলে পিতা যেরূপ কঠোর অথচ কোমল ভাবে তাহার চরিত্র সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেন, বিচারকগণও তাহার চরিত্র সংশোধনের জন্য সেইরূপ সদয়ভাবে নানা উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা কখনও কোমল-মতি ছাত্রগণের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করেন না।

গণতন্ত্রের দেশে ধনী নির্ধনে কোনও প্রভেদ নাই; সকলেরই সম অধিকার। তাই আমেরিকায় ধনি-সম্প্রদায়ের সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য সরকার পক্ষ স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। ইংলণ্ডে পাবলিক স্কুল (Public School) যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমেরিকায় "পাব্লিক স্কুল" তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলি উচ্চবংশসম্ভূত এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈটন (Eton), রাগবী (Rugby), হ্যারো (Harrow) প্রভৃতি ইংলণ্ডের স্বনাম-বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলিতে (Public Schools) ধনশালী উচ্চবংশের সন্তান ব্যতীত অপর কেহ প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না।

আমেরিকায় স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের আত্ম-নির্ভরশীল ছাত্র-দিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন ছাত্র বৎসরে ছয় মাস কাল কোনও শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, এবং সেই স্বোপার্জ্জিত অর্থসাহায্যে বৎসরের অবশিষ্ট ছয়মাস অধ্যয়ন কার্য্যে রত থাকে। কখনও বা তাহারা কারখানায় কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। কখনও বা তাহারা আহার সময়ে পরিচারকের কার্য্য করিয়া, কখনও বা বিদ্যালয়ের গৃহাদি সম্মার্জ্জন করিয়া, কখনও বা ক্রীড়াক্ষেত্রে বাহকের কার্য্য করিয়া, কখনও বা উদ্যানে মালীর কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এবং সেই অর্থদ্বারা তাহাদের অধ্যয়নাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশে এরূপ হীন কার্য্য করিতে গেলে ছাত্রকে তাহার সহাধ্যায়ী ও শিক্ষকবর্গের চক্ষে হেয় হইতে হয়। কিন্তু আমেরিকায় এরূপ পরিচারকের কার্য্য করিলেও ছাত্র-সমাজ তাহার প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করে না।

সে দেশে মানুষের সম্মান কেবল তাহার ব্যক্তিগত গুণের উপরই নির্ভর করে; বংশ-গৌরব তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

আমেরিকার বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই সাধারণ তন্ত্রের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। ছাত্রগণ তাহাদের মধ্যে আত্মশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ই একটি ছোটখাট সাধারণতন্ত্র-মূলক রাজ্যবিশেষ; প্রত্যেক বৎসর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রগণ তাহাদের মধ্য হইতে কার্য্যনির্ব্বাচক সমিতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে। তাহারা ছাত্রশাসনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরিচালন করে। কাহারও অন্যায় আচরণ বা চরিত্র-দোষের কথা সর্ব্ব প্রথম এই সমিতির নিকট বিজ্ঞাপিত হয়। তাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবগত করায়, এবং আবশ্যক হইলে যথোচিত শাস্তি বিধানের জন্য অনুরোধ করে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে তাহাদের অনুরোধ রক্ষা নাও করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাহাদের অনুরোধানুসারেই শাস্তি বিধান করা হয়।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে হেড্‌মাষ্টারই সর্ব্বেসর্ব্বা। অবশ্য অনেক হেড্‌মাষ্টার তাঁহাদের অধীনস্থ শিক্ষকের পরামর্শ কোন কোন বিষয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকদের পরামর্শ না লইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় কার্য্য করিবারও তাঁহার অধিকার রহিয়াছে। শিক্ষকদের এরূপ কোনও অধিকার নাই যে তাঁহারা বিদ্যালয় ব্যাপারে আইন অনুসারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। শিক্ষকগণ শিক্ষাদান করিবেন, অথচ বিদ্যালয় পরিচালন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ইহা এই দেশের জলবায়ুতেই সাজে। কিন্তু গণতন্ত্রমূলক দেশের প্রথা অন্যরূপ।

লঙ্কা কি ম্যালেরিয়ার ঔষধ?

মার্চ্চ মাসের সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ পত্রিকা তাহাই বলেন;—"কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, কিন্তু ইহা সকল যায়গায় পাওয়া যায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাল লঙ্কায় শতকরা ৯৬ জন লোক একদিনে রোগমুক্ত হইয়াছে। এক জনের তিন বৎসরের পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরও একদিনে সারিয়াছিল।

"ইহার ব্যবহার শিখিতে হইলে রোগের মোটামুটি তিনটি অবস্থা ভেদ বুঝিতে হয়;—(১) কম্প বা শীতবোধ, (২) ইহার পরের অবস্থা তাপ বৃদ্ধি,

মাথাধরা ও সর্ব্বাঙ্গের অস্থিতে ব্যথা; (৩) ইহার পর এই অবস্থা কাটিয়া গিয়া খুব ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ে। অবস্থা ও লোকবিশেষে এই জ্বরের দ্বিতীয় দফা প্রকোপ বা আক্রমণ এক, দুই, তিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পর হয়। ঠিক কবে কোন্ সময়ে শীতবোধ আরম্ভ হইবে তাহা জানা থাকিলে লঙ্কার প্রয়োগ অব্যর্থ ফলপ্রদ হয়।

প্রয়োগ বিধি ঃ—পাঁচ ছয়টি পাকা লঙ্কা মিহি করিয়া জল দিয়া বাটিয়া লও। ছয় ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া এক টুকরা পরিষ্কার কাপড়ে এই লঙ্কা বাটাটুকু প্রলেপের মত বিছাইয়া রোগীর তর্জ্জনী বা বুড়া আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলে বাঁধিয়া দিতে হইবে; শীতবোধ বা কম্প আরম্ভ হইবার দুই ঘণ্টা আগে বাঁধা চাই। জ্বালার বশে রোগী খুলিয়া ফেলিতে চাহিলেও ৩।৪ ঘণ্টা এই পটি খুলিতে নাই। একবার প্রলেপেই জ্বর ত্যাগ হইবে। খুলিয়া ফেলিবার পর আঙ্গুলে একটু ঘৃত মাখাইয়া দিলে বা আঙ্গুল শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলেই জ্বালার উপশম হইবে।

২০০ ডাইলিউশনের চায়না (China 200th dilution) ম্যালেরিয়ার বড় উপকারী,—বিশেষতঃ যে জ্বর একদিন অন্তর আসে। কিন্তু ঘাম দিয়া জ্বরের সম্পূর্ণ উপশম হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে চায়না খাইতে হয়। যে দিন জ্বর আসিবার পালা নাই সেই দিন সকালে খালিপেটে এ ঔষধ সেবন করা ভাল। ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পর অবধি কিছু আহার করিতে নাই। একবারের বেশী ঔষধ খাইবে না, একবার সেবনেই ফল দিবে। যদি কোন ক্রমে জ্বর আবার হয়, তাহা হইলে জ্বর ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পরে আর একবার দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরের পূর্ব্বে বা জ্বরকালীন কোন ক্রমে সেবনীয় নহে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। এক ড্রাম ঔষধে ৫০ জন রোগী আরোগ্য হয়। ইহাতে এত স্বল্প পরিমাণ কুইনাইন আছে যে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না; কিন্তু তথাপি ইহা এমন অব্যর্থ ফলপ্রদ।"

ভগবান্ স্বরূপ দরবারি, এম্ এ বি এস্‌সি এল্ এল্ বি, উকিল,
হাইকোর্ট, আগ্রা।

আমাদের দরিদ্র দেশে স্বেচ্ছা-সেবকেরা এই দুইটি ঔষধ প্রচার করুন। কিন্তু এটি সাময়িক প্রতিষেধক উপায় মাত্র। দেশে যদি ম্যালেরিয়ার বাহন মশা থাকে, রোগীকে যতবার নীরোগ করা যাইবে, ততবার পুনঃ পুনঃ শরীরে নূতন বিষ

সঞ্চারিত হইয়া তাহার রুগ্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল। কি কি উপায়ে গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার বীজহীন করা যায়, তাহা তালিকার মত মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে হাজার হাজার সংখ্যায় বিতরিত হওয়া দরকার। উপায়ের জ্ঞান অস্থিমজ্জাগত হইলে চেষ্টা আপনি আসিবে।

বিনা তারের খবর।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের গোলমালে বিনাতারে খবর পাঠাইবার যন্ত্রগুলি সরকারী লোক ভিন্ন আর কেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পাইবে না—এই একটি কথা ছাড়া এ কলের ভালমন্দ আর কোনো কথা এতদিন বিশেষ কিছু শোনা যায় নাই। কিন্তু আবিষ্কর্ত্তার সাধনা আইনের কড়া শাসন মানিতে জানে না। যুদ্ধের মতই জোরে তাঁহাদেরও চিন্তা ও অনুসন্ধানের বীজ ক্রমাগত চলিয়াছিল ঐ যুদ্ধেরই সঙ্গে সমানে—সত্যের—তথ্যের সন্ধানে। সাধনা তাঁহাদের সার্থক হইয়াছে,—নূতন প্রণালীতে পুরাতন কলের আশ্চর্য্য রকম সংস্কার সাধিত হইয়াছে। কলের মধ্যে এখন একই যন্ত্র (oscillation valve) শব্দের তরঙ্গে ইচ্ছামত হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া কথাটাকে বুঝিতে ধরিতে দিবে। মানুষের কথাও বিনাতারে পাঠাইবার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। এখন সাত সমুদ্রের এপার হইতে ওপার—ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায়—আকাশের নীলিমায় গা ভাসাইয়া স্তরের পর স্তরে বায়ু কাটাইয়া উড্ডীন এক এরোপ্লেন হইতে আর এক উড়োকলে বিনাতারেই কথার আদান প্রদান চলিবে। Wireless telephonyর এ উন্নতির কথা অবাক হইয়া শুনিতে হয়। বিনাতারে খবর পাঠাইতে এখন আর দূরত্বের হিসাবে মাঝে মাঝে যন্ত্র বসাইবার প্রয়োজন হইবে না। একই যন্ত্রের সাহায্যে কথা গন্তব্যের সীমানায় গিয়া পঁহুছিতে পারিবে। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় অনেক কম খরচে এখন ব্যবসায়ের খবর পাঠান চলিবে। সাধারণ তারের খবর পাঠাইবার ব্যয়ের তুলনায় বিনাতারের খবরে ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। প্রতি কথায় ৪ পেনী। গত ১লা মার্চ্চ সোমবার কারনারভনের মারকনি ষ্টেসন ও নিউ জার্সির বেলমারের মধ্যে এইরূপ খবর পাঠাইবার জন্য একটী সংবাদ প্রেরণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। চূড়ান্ত বেগবান্ যন্ত্র দুই ভাগে বসানো হইয়াছে, যেন একই সময়ে দুই দিকেরই সংবাদের আদান প্রদান চলিতে পারে। (Nature.)

৩। ছবিতে পরিমিতি।

Picture palaceএ "মন্তে ক্রিস্তো," "লে মিজরাব" প্রভৃতি বইএর লম্বা লম্বা

"ফিল্‌ম্‌"তৈরি করিয়া ঘটনার পর ঘটনাগুলিকে সত্যের মত জলন্ত ও চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ভাবে দেখানো হইয়াছে শুনিয়াছি। বিলাতের কোন কোন বিদ্যালয়ে অধুনা অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষাও এই বায়াস্‌কোপের ছবির সাহায্যে দেওয়া হইতেছে। অঙ্কের আর্য্যাগুলি (formula) ছবিতে ভাসিয়া ঘুরিয়া সেই ধরা হিসাবের উপর প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেখাইলে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে বিষয়ের জ্ঞান ও ধারণা বেশ গভীর ভাবে বসিবে—না বুঝিয়া বৃথা মুখস্থ করিয়া মরিতে হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বৃত্তের পরিধির পরিমাণ নির্ণয় ও পরিধির সহিত ব্যাসের অনুপাত নির্দ্দেশের উল্লেখ করিতেছি। ব্যাসের পরিমাণের ৩২/৭ হইতেছে পরিধির মাপ। এ কথা বুঝাইতে প্রথমতঃ পর্দ্দার উপর বৃত্তের ছায়াটি ফেলা হইল—তাহার পর সমান্তরাল ভাবে একটী ব্যাসার্দ্ধ অঙ্কিত করিয়া—রেখাটাকে সীমান্ত পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়া ব্যাসে পরিণত করা গেল। এখন এই ব্যাসের সহিত সমকোণ করিয়া আর একটী ব্যাস রেখা টানিয়া দেখানো হইল; তাহার পর ব্যাস রেখার নিম্নে পরিধিকে ভাঙ্গিয়া একটী সমান্তরাল সরল রেখায় টানিয়া দিতেই— ব্যাসরেখা নিজ সীমান্তে ঘুরিয়া উঠিয়া পরিধির সরল রেখার বরাবর তিন বার সমানে সোজা ঘুরিয়া গেলে দেখা গেল সমস্ত পরিধি রেখার অন্তে খানিকটা বাকী রহিয়া গিয়াছে, এই বাকী অংশটুকু দ্বিতীয়বার অঙ্কিত ব্যাসের সোজাসুজি নিজ দেহটাকে টানিয়া ঘুরাইয়া মাপিয়া দেখাইয়া দিল যে উহা ব্যাসের সাত ভাগের এক ভাগ। এই রকমে পাই চিহ্নের "ইকোয়েশনে" দুই দিকের যোগ বিয়োগে লোপ করিয়া বৃত্তের কালী নির্ণয় প্রণালীও ছবিতে সুন্দর ভাবে দেখানো হইতেছে। শিক্ষার জন্য ছাত্রের বোধ হয় কালে আর বই পড়িতে হইবে না। বিলাতে Cinema commission চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদান সম্বন্ধে দোষগুণের বিচার করিয়া বিচক্ষণ ভাবে এ প্রণালীর আলোচনা করিতেছেন। National Council of public morals কর্তৃক ১৯১৬ সনে এই অনুসন্ধানের জন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছিল—সম্প্রতি কাউন্সিল কমিটীর পুনরধিবেশনের আদেশ দিয়াছেন। কমিটির প্রথম বাঁরের বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে, চল-চিত্র শিক্ষাকে বিচিত্র ও সহজ করিতে পারিবে, অধিকন্তু চিত্র-দর্শনে মনেরও বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না। (Times Educational Supplement)

৪। শিশুদের স্কুল।

বিলাতের মা বাপ এইবার ছেলে মেয়ে পালন করিবার দায় এড়াইলেন।

London County Council সম্প্রতি ছয়টী শিশু পালন ও শিক্ষার বিদ্যালয় এবং একটী ঐরূপ শিক্ষা-দান শ্রেণী বসাইবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা এখানে শিক্ষা পাইবে। Board of Education ভাবিয়া চিন্তিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই ছয়টী স্কুলের তিনটী প্রাথমিক স্কুলের শিশুশ্রেণীর সহিত সংযুক্তভাবে আর তিনটী আলাদা ঘরে স্বতন্ত্র আকারে বসাইয়া পরখ করিয়া দেখা যাক—অনুষ্ঠান টিকে কিনা। এই অনুষ্ঠানের মোটামুটি ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ১৯২২০ পাউণ্ড বা এখনকার দাম অনুসারে—১৯২২০০৲ টাকা। ৭১ জন ছাত্রের একটা স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড়ে ব্যয় পড়িবে বাৎসরিক ৯ পাউণ্ড ১০ শিলিং বা ১৯৭৲ টাকা; ইহা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বিদ্যালয়ে। আর পৃথক বিদ্যালয় গুলিতে ব্যয়ের পরিমাণ ছাত্র প্রতি ১ পাউণ্ড বা ১৲ টাকা বেশী পড়িবে। সার উইলিয়াম ম্যাদারের নেতৃত্বাধীনে দক্ষিণ পূর্ব্ব লণ্ডনের রোমানো রোড নার্সারী ইনফ্যান্ট। এই ১বৎসরে শিশু শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সুফল পাইয়াছে। চরিত্র গড়িয়া দেওয়া, ছেলেকে ছোটটী থাকিতে মানুষ করিয়া তোলাই এ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আসল উদ্দেশ্য। ইহারা ছেলেকে শুধু সদভ্যাস, বা নীতি জ্ঞান শিখাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন না, শিশুকে স্বাধীন ভাবে তাহার ইচ্ছামত ভাবিবার কর্ত্তৃত্বেরও যথেষ্ট সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া হয়। আপনার মনোমত শিক্ষার পথ খেয়ালের ভিতর দিয়া বাছিয়া বুঝিয়া লইতে পারিলে শিশুর চিত্ত স্বতঃই নত্যকার সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে। London Nursery School fund এই স্কুলের খরচ যোগাইতেছেন। এই শ্রেণীর আরও নূতন স্কুল বসাইবার জন্য এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা সাধারণের কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছেন। মিসেস্ হুইড, ২০ নং প্রিন্সেস্ স্কোয়ার ডব্লিউ, লণ্ডন—এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইতে হয়।

(Times Educational Supplement)

ক্লার্ক নিরীক্ষণাগার।

দূর আকাশের যত কিছু অপূর্ব্ব অজানা খবর আজ মর্ত্ত্যের মানুষের গোচর হইতে চলিল। আমেরিকা মহাদেশের কালিফর্নিয়ার অন্তর্গত Los anglesএ একটি খ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিরীক্ষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। জন সাধারণের যে কেহ প্রতি সপ্তাহে পাঁচরাত্রি এখানে আসিয়া বিনা ব্যয়ে আকাশের গ্রহ তারা প্রভৃতির গোষ্ঠী গোত্রের খোঁজ খবর লইতে—তাহাদের স্থিতি আকৃতি ইত্যাদি দেখিতে শুনিতে পাইবেন। এই নিরীক্ষণাগারের নাম—ক্লার্ক অব্জার্-

ভেটরী (Clark Observatory), ইহাব সর্ব্বোচ্চ চূড়া ৬০ ফিট উঁচু। বাড়ীটি তিন তলা। নীচেব তলায় বিজ্ঞানবিৎদিগের লওয়া গ্রহ উপগ্রহের ফোটোগ্রাফ সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। "দোতলায়" পুস্তকাগার। সকলের উপর তলায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত আছে। একটা তামার আবরণ যন্ত্রগুলির উপরে আচ্ছাদনের কাজ করে। মোট ৫টী দূরবীণ আছে, তার ৪টী ছোট, ১টী বড়—৬ ডিগ্রি রিফ্র্যাক্শনের।

তিনটি ফিল্‌ড্‌ গ্ল্যাস (এক রকমের দূরবীন—এ যন্ত্রে একই সময়ে দুই চোখেই দেখিবার বস্তু নজরে পড়ে), তিনটী ষ্টেরিঅপ্‌টিকল্‌ বা ডবল ম্যাজিক লণ্ঠন (ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলে একটির উপর ফুটিয়া উঠা ছবি আস্তে আস্তে ক্ষয় পাইয়া আর একটির উপর প্রতিফলিত ছবিটার মধ্যে ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়), একটি চলন্ত ছবি দেখাইবার যন্ত্র,—এ ছাড়া সেখানকার বিজ্ঞান-শিল্পীদের মৌলিক সন্ধানের প্রয়োজনে তাঁহাদের নিজেদেরই উদ্ভাবিত ও তৈয়ার ছোট বড় অনেক প্রকারের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কল-কব্জায় উপব তলাটী ভরপুর।

তারায় ভরা আকাশের মানচিত্রের আদর্শ একটা চমৎকার জিনিষ। বিজ্ঞান ঘরের কর্ত্তা Dr. Baumgardt অনেক মাথা খাটাইয়া, ছবির পর ছবি লইয়া লইয়া শেষকালে এই মানচিত্র তৈয়ারী করিতে পারিয়াছেন। আপাতত, আকাশের এক দিকের খানিকটা মাপিয়া দেখিয়া তাঁবার দেশেব আকার ও অবস্থা কেমন—তারই ১৪"×১৭" মাপের একটা খসড়া খাড়া করা হইয়াছে। এই রকম ১৫০ খানা ম্যাপে সমস্ত আকাশের তারার মানচিত্র খুব শীঘ্রই তৈয়ারী করা হইবে। ম্যাপে কাল জমির উপর তারা গুলিকে উজ্জ্বল ধারির মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া আঁকা হইয়াছে। ছায়াপথের মানচিত্রখানি আর একটি অবাক কাণ্ড। তারার ফাঁকে ফাঁকে ২ফিট চওড়া ছায়াপথ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

উপর-দুনিয়ার ছোট বড় দেশ গুলিকে বিজলী বাতির শিখায় শিখায় জ্বালাইয়া সেখানকার রঙের আভাস দেখান হয়। তাঁহারা চাঁদের উপর সাদা আলোর ছায়া ফেলেন,—সূর্য্যকে দেখান পীত রঙের আলোতে,—নেবুলাস্‌, সপ্তর্ষি মণ্ডল প্রভৃতি মোলায়েম নীল জ্যোতিঃরেখায় ফুটাইয়া তোলা হয়।

মেজের উপর মঞ্চ জুড়িয়া ছবিতে আদর্শে সৌরজগৎ গড়িয়া গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির স্থিতি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং সপ্তাহে তাহাদিগের স্থিতি পরিবর্ত্তন পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া বুঝাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে।

(Graphic)

আশ্চর্য্য লেখা।

একবার প্রদর্শনীতে একখানি পোষ্টকার্ডে ১০০।১২৫ ছত্র হাতের লেখা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সুইজারলণ্ডের মাসাল মোভেলা সো দ্যো ফোঁদ পোষ্টকার্ডে হাতের লেখার যে অপূর্ব্ব কারু দেখাইয়াছেন—তাহা কল্পনারও অতীত। তিনি একখানি সাধারণ পোষ্টকার্ডে ১২৫০০ অক্ষরে ২৩১৫৪টি শব্দ ৩৫৫ লাইনে লিখিয়াছেন। কার্ডখানিতে আরব্য উপন্যাসের গল্প লেখা হইয়াছে। ছাপার ৮২এর ১৪ খানি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা হাতের হরফে তুলিয়া ফোঁদ শিল্পকলায় চূড়ান্ত বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। "গ্রাফিক" কাগজে এই পোষ্টকার্ড হইতে তাহার এক কোণমাত্র ৪৫টা লাইন লিথো করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যই—"আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন।"

(Graphic)

নারায়ণের হরকরা।

যন্ত্র নির্জীব—বোর্ড সমিতি বা বিধি নিষেধ পায়ের শিকল, পশুশক্তিকে বাঁধিবার জিনিস। বাঁধিয়া পাপের উচ্ছেদ হয় না, অতি সামান্য পরিমাণে নিবারণ হয় মাত্র। মানুষের প্রাণটাই বড়, মানুষে যতই দেবতার অভিব্যক্তি হইবে দেশের দৈন্য দুঃখ ততই দূর হইবার উপায় হইবে। আমাদের মিউনিসিপালিটি আছে, ম্যালেরিয়া যায় না; দেশভরা অবৈতনিক হাঁসপাতাল আছে, তবু রোগের রকমারির আর অন্ত নাই; সমাজ আছে, তাহাতে দুর্ব্বল দীন পতিতের দলন হয়; পূর্ত্তবিভাগ আছে, তাই বান আসিয়া মাঠের ধান নষ্ট করে, হাজা সুখার সময় মানুষ নির্ম্মল জলটুকু পিয়িয়া তৃষ্ণা দূর করিতে পায় না। মহাপ্রাণ মানুষ আনিয়া এইগুলি তাহাদের হাতে দাও, দেখিও সর্ব্বত্র স্বর্গ রচনার সূত্রপাত হইবে।

কল গড়িয়া সে প্রাণহীন উদ্যোগের ব্যর্থতার করুণ চিত্র কয়েকটি দেখুন :—

৬ই জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনীতে প্রকাশ :—

রেল ও খাল।

সাতক্ষীরার ন্যায় সুবিস্তৃত মহকুমায়, অদ্যাপি রেলওয়ে না হওয়ায় আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে। নবগঠিত জেলাবোর্ড আমাদিগকে এ সম্বন্ধে আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হয় নাই।

নৌখালি বা নবকালী নামক যে মজা খালটি বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের আকর হইয়াছে, উহার জীর্ণ সংস্কার সাধিত না হইলে, উহার উভয় তীরস্থ গ্রামগুলি অচিরে জনশূন্য হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠের যশোহরে প্রকাশ :—

সমস্ত নিম্ন বাঙ্গলার মধ্য দিয়া গড়াই, মধুমতী, পদ্মা, গঙ্গা, ইত্যাদি বড় বড় নদীর দুই পার্শ্বস্থ যে সমস্ত নিম্ন সমতল ভূমি, যাহার উপযুক্ত জল নিকাশের পথ বা খাল না থাকায় "চিরস্থায়ী বিলে" পরিণত আছে, (যথা যশোহর জেলায় শ্রীপুর থানার মাগুরার বিল, মাদিয়ার বিল, নটাভাঙ্গার বিল, তেবিল, ভগরামপুরের বিল ইত্যাদি) ঐ সমস্ত বিলের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিতে বৎসর বৎসর বহু ধান্য পাট ইত্যাদি জন্মে। কোথায় বা স্থানীয় লোক আংশিক খাল কাটায়, তদ্দারা কতকটা জল বাহির হয় বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ঐ সমস্ত বেগবতী নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধিতে উক্ত অসম্পূর্ণ খাল দ্বারা জল হঠাৎ আসিয়া অথবা খালের কাঁচা বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল আসিয়া অপরিপক্ক অবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকার শস্য দুই এক দিনের মধ্যে নষ্ট হয়। প্রায় প্রতি বৎসর অনেক স্থানে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া পরিশ্রমলব্ধ কৃষকজীবনের একমাত্র উপায় মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট হয়। যে দেশের প্রায় বার আনা লোক অৰ্দ্ধভুক্ত অবস্থায় জীবন ধারণ করে, তথায় এরূপ ক্ষতি অসহনীয়, অনন্যোপায় হইয়া হতভাগ্য কৃষকগণ অবনতমস্তকে সমস্ত সহ্য করিতে বাধ্য হয়। কোন ভদ্রলোক পাইলে তাহার নিকট প্রতীকারের পথ অনুসন্ধান করে, এমত অবস্থায় তাহারা প্রত্যেক বৎসর কিছু কিছু ট্যাক্স দিলে যদি ঐ সমস্ত খাল বিলের উদ্ধার হয় এবং সুবন্দবস্ত হয়, তাহাও তাহারা আনন্দের সহিত দিতে প্রস্তুত।

৫ই জ্যৈষ্ঠের বীরভূমবাসী বলেন :—

বীরভূম জেলায় নান্নুর থানার অধীন বড়া একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। অন্যান্য লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। গ্রামে পানীয় জলের একান্ত অভাব। পানার্থ ও স্নানার্থ যে সকল পুষ্করিণী আছে, চৈত্র বৈশাখ মাসেই প্রায় তাহা শুকাইয়া যায়। তাহার উপর এ বৎসর বর্ষা কম হওয়ায়, চৈত্র মাস হইতেই পানীয় জলের পুষ্করিণীগুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে কোন কূপাদি নাই। ইহাতে জলকষ্ট যে কিরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। দুই একটি পুষ্করিণীতে যে সামান্য জল আছে, জলাভাব বশতঃ লোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই জল বাধ্য হইয়া পান করিতেছে, কিন্তু এ প্রকার কর্দ্দমাক্ত ময়লা জল পানে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

৫ই জ্যৈষ্ঠের কল্যাণী বলিতেছেন :—

আজ যে, চাউলের দাম ৮৲ টাকার নীচে নামে না,—১১৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে; একবেলা আহার করে বার আনা লোক অখাদ্য খাইয়া মরিতেছে, অর্দ্ধেকের বেশী আজ কেন হুজুক করিয়া, হল্লা করিয়া, কর্ম্মকর্ত্তার হাত চাপিয়া ধর না? লুচি-পলোয়ার রসটা কিছুদিন আস্বাদন না করিলে ব্রাহ্মণত্ব খসিয়া যাইবে না। ঐ টাকায় দশগুণ বেশী স্বল্পেতুষ্ট দরিদ্র লোকের একদিন

খুন-জ্বাতের ব্যবস্থা হয়। ছি—ছি—এই বুদ্ধি লইয়া, বামুণ সাজিয়া, সমাজের মাথায় থাকিতে চাও।

৭ই জ্যৈষ্ঠের খুলনায়ও সেই দৈন্যের আর একটি ছবি দেখুন :—

বালাম চাউলের দর ১১৷৹ টাকা হইয়াছে। খুলনা কো-অপারেটিভ ষ্টোর মেম্বরদের সুবিধার জন্যই সস্তার সময় চাউল খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সাধারণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দর বাড়াইয়া লাভবান্ হইতে চলিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহারা মেম্বরদিগের খরিদ দরের উপর সামান্য লাভ রাখিয়া যদি চাউল প্রভৃতি বিক্রয় না করেন, তবে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনও বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। কো-অপারেটিভ ষ্টোর কোম্পানীর লাভের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। মেম্বরগণের সাহায্যার জন্যই হহার জন্ম। ষ্টোরের কর্ত্তৃত্ব কয়েকজন ডিরেক্টরের হস্তে ন্যস্ত—তাঁহারা মেম্বরগণের হিত চিন্তা করিয়া কার্য্য না করিলে, ডিরেক্টর থাকিবার অনুপযুক্তই প্রতিপন্ন হইবেন। ষ্টোর অর্থ মেম্বরগণের ভাণ্ডার,—ইহা কি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? তবে কেন তাঁহারা ৬৷৹ টাকা দরে চাউল খরিদ করিয়া প্রথমতঃ ৭॥৹ টাকা দরে এবং এখন ৮৷৹ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছেন? আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

আমাদের দেশে যাহা কিছু লোকহিতের জন্য পুণ্য অনুষ্ঠান হয়, তাহার মূলে কোন না কোন মহাপ্রাণ মানুষই তো দেখিতে পাই। চরিত্রধনই পরম-সম্পদ, বুকের মধ্যে পাতা সেই ভগবানের কলটুকু যদি ঠিক ঠিক চলে, সব দীনতা যে ভরিয়া উঠে।

৫ই জ্যৈষ্ঠের কল্যাণী বলেন :—

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজব্যয়ে নিজগ্রামে সাধারণের অত্যাবশ্যকীয় একটি রাস্তা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সংস্কার অভাবে রাস্তাটীর অবস্থা বড় খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবিকা সঙ্কটের দিনেও তিনি উক্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য আর্থিক সাহায্য করিয়া গ্রামবাসীর মহোপকার সাধন করিয়াছেন। মধুবাবুর এরূপ দেশানুরাগ অনুকরণীয়।

দলের কথা। মহাত্মা গান্ধী এক খালিফেৎ সম্বন্ধীয় ঘোষণা পত্রে নাকি বলিয়াছেন, "যেখানে কোন সঙ্ঘবদ্ধ দল নাই, সেখানে আপনি দায়িত্ব লইয়া কেহ কাজ করে না। দলের জন্য অন্তর্ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মের জননী।" কথাটি সত্যের একদিক মাত্র,—পূর্ণ সত্য নহে। এ সমস্যার মীমাংসা জ্যৈষ্ঠের নারায়ণে "অরবিন্দের পত্রে" আছে,—"ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি—সঙ্ঘ চাই। মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের effective গতি নাই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয়, রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ।" তবেই দেখ, শুধু দল হইলেই হইবে না;

মৃত একাও মৃত, দল বাঁধিয়াও মৃত। আত্মপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘ চাই, মহাপ্রাণ মানুষ যতক্ষণ দলে থাকে, দল ততক্ষণই প্রাণময় ও কর্ম্মচক্র গড়িবার শক্তিতে শক্তিময় —creative।

গো-রক্ষার কথা।—মাদ্রাজের সালেম সহরে গত ২৯শে এপ্রেল মিঃ কে, টি, পালের সভাপতিত্বে গোরক্ষা সমিতি বসিয়াছিল। এদেশের গোজাতির অবস্থা পরিদর্শনের জন্য এই সভা হইতে গবরমেণ্টকে এক কমিশন নিয়োগ করিতে বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গোহত্যা নিষেধের, এবং গোচারণভূমি ও উৎকৃষ্ট বৃষরক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাবও এই সভায় সমর্থিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের বা ভারতের গোধন রক্ষা ও তাহার বৃদ্ধি সভা সমিতি দিয়া যাহা হইবার তাহা হউক। কিন্তু দশ বার শত শিক্ষিত যুবককে কিছু কিছু মূলধন লইয়া দুধ ঘিএর ব্যবসায়ে নামিতে হইবে, পাটনা ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে বড় বড় গরু আনাইয়া গো-পালন cattle breadingএর জন্য আবাদ বা farms করিতে হইবে। ঘৃত দুগ্ধ দেশে এত অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন করা দরকার, যেন রপ্তানি হইয়াও প্রচুর থাকিয়া যায়। তাহাতে দেশের ধন ও অন্ন দুইই বৃদ্ধি হইবে। তরুণ বাঙ্গলা জাগো, কর্ম্মনিষ্ঠ হও, আত্মপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ গড়িব ভাই, আগে তোমরা বাঁচিয়া উঠ। সংসার ত্যাগ করিও না; মা বোনকে অনাথ করিয়া দেশের কাজে নামিও না, এমন কাজ কর, যাহাতে পরিবারের অন্নসংস্থান ও দেশব্রত—একসঙ্গে চূড়ান্তরূপে হয়।

গোঁড়ামী—কালিকটের টিয়া নামক অস্পৃশ্য হিন্দুগণ ঢাক ঢোল বাজাইয়া এক মসজিদের পথ দিয়া তাহাদের আরাধ্য দেবতাকে মণ্ডপে লইয়া যাইতেছিল। মপলা মুসলমানগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া টিয়াদের মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ৬ জন মুসলমান ধৃত হইয়াছে।

এ ত তবু ভাল। কিছুকাল আগে উচ্চকুলের বাঙ্গালীর নমঃশূদ্র দলনের যে পিশাচ চিত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাও তো এই দেশের সমাজের ছবি। ধর্ম্মে যেমন দেবতা আছে, তেমনি পশুও আছে। সমাজের ও ধর্ম্মের পশুবল না ভাঙ্গিলে ঐক্য আসিবে না। মক্কামুখো মুসলমান ও আর্য্যামীর কূপের ভেক হিন্দু দেশকে ভালবাসিতে পারে না। অত সঙ্কীর্ণ মনে কি প্রেমের স্থান হয়?

সম্প্রতি নাসিকে মরাঠা ছাত্রাবাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকালে কোলাপুরের মহারাজ জাতিভেদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি জাতিগত বর্ণভেদ তুলিয়া দিতে চাহেন এবং বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক শিক্ষাকে উচ্চ স্থান দেন।

বরিশালে নাকি যোগী জাতির দুই ভিন্ন শাখাভুক্ত বর ও কন্যার বিবাহ হইয়াছে। আন্তর্গণিক বিবাহের ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই শতধা ছিন্ন হিন্দু সমাজ একপ্রাণ হউক, হিন্দু হিন্দুকে সকল প্রকারে কোল দিতে অকুণ্ঠিত হউক।

যশোহরে প্রকাশ—

শনিবার বেলা ১ ঘটিকার সময় যশোহর বার লাইব্রেরী গৃহে যশোহরে কালেজ স্থাপন বিষয়ে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ২৭শে মে তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে নলডাঙ্গা রাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে যশোহর টাউনহলে একটি জনসাধারণ সভার অধিবেশন হইবে, যশোহরের সদর মফস্বলের ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইতেছে, আমরা আশা করি, জেলাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই সভায় যোগদান করিবেন। এবং যাহাতে যশোহর জেলার এই অভাব দূরীভূত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

১লা জ্যৈষ্ঠের যশোহরে প্রকাশ—

গত ২৬শে এপ্রিল মাগুরার সুযোগ্য জনপ্রিয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনাদিনাথ সেন বি, এল মহাশয় বিনোদপুর "কাত্যায়নী বালিকা বিদ্যালয়ের" নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, সভাপতি মহাশয় বলেন যে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার না হইলে, সমাজের বা জাতির উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। অনাদি বাবু বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ২৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে খুলনায় প্রকাশ যে—

সাতক্ষীরা সবডিবিশনের অধীন আখড়াখোলা মধ্য ইংরাজী স্কুলটি খুলনা জেলার মধ্যে প্রাইমিয়ার স্কুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জানি না, কি সাংঘাতিক দোষে বা ত্রুটিতে এরূপ স্কুল সদাশয় সরকার বাহাদুরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। দশ বারটি গ্রামের মধ্যে এই মাত্র একটি মধ্য ইংরাজী স্কুল উপযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ কর্ত্তৃক অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত এবং গত বৎসরে একটি ও তৎপূর্ব্ব বৎসরে দুইটি বালক এখান হইতে খুব সম্মানের সহিত বৃত্তি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে অচিরে সাহায্য না পাইলে ১০০।১৫০ ছেলের বিদ্যাশিক্ষার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া যাইবে।

মুকুন্দপুর পাঠশালা।

সাতক্ষীরার অন্তর্গত মুকুন্দপুর গ্রামে কয়েকটি ছাত্র-সমবায়ে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়া প্রায় বৎসরাধিক কাল সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। স্কুলটিতে বর্ত্তমানে ৩৩ জন বালক ও ১০।১২ জন বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে এবং দুই জন উপযুক্ত শিক্ষক স্কুলে কার্য্য করিতেছেন। অনেক দরিদ্রবালককে বর্ত্তমানে স্কুলে ভর্ত্তি করা যাইতেছে না, কারণ আর একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিলে, তবে ৫০।৬০টি বালককে উপযুক্ত ভাবে

শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ পুনঃ পুনঃ দরখাস্ত করিয়াও স্থানীয় সবইনেস্পেক্টর বাবুকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করাইতে পারিলেন না। দেশের লোকের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি তাঁহারা সাড়া না দেন—পক্ষান্তরে শীতল জল ঢালিতে থাকেন, তবে সরকারের শুভ উদ্দেশ্য কিরূপে সংসাধিত হইবে।

মুলতান মিউনিসিপালিটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাস করাইয়া লইয়াছেন। আগামী বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে। এ আইন সর্ব্বত্র বিধিবদ্ধ হয় না কেন? লাহোরে অনেক বিদ্যার্থীর ভিড় হয় বলিয়া, লাহোরের বাহিরে আরো কয়েকটি কলেজ গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই স্থাপন করিবেন। আপাততঃ মুলতান ও লুধিয়ানাতে দুইটি কলেজ স্থাপিত হইল।

সোলাপুরের রাজা বার্ষিক এক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রায়পুর কলেজকে দান করিয়াছেন। ইহা হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে স্বর্ণ ও হীরকের পদক দেওয়া হইবে।

দিল্লীর পণ্ডিত দীননাথের বিধবা পত্নী তাঁহার লক্ষাধিক টাকার অস্থাবর সম্পত্তি কন্যা পাঠশালার উন্নতিকল্পে, পুস্তকালয় স্থাপন ও পানীয় জলের ব্যবস্থাকল্পে দান করিয়াছেন।

যন্ত্রাদির সাহায্যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা মহানগরীতে একটি বিদ্যালয় শীঘ্রই স্থাপিত হইবে।

সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের শ্রীযুক্ত আড়ৎ উপাধ্যায় গণিতে অপূর্ব্ব মেধাবিৎ ছাত্র। সম্প্রতি ইণ্টারমিডিয়েট হইতে একেবারে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির এম্ এ ক্লাসে অধ্যয়নের আদেশ পাইয়াছেন। মৌলিক গবেষণায় ইঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ১৯১৯ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের দানের পরিমাণ এক লক্ষ নয় হাজার চার শত চার টাকা আট আনা তিন পাই। তাহার মধ্যে এক লক্ষ টাকা একা সিন্ধিয়ার দান।

রামগোপাল ঘোষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রিয়নাথ কর।]

জ্ঞানান্বেষণ বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রভৃতি।

রামগোপাল যে বৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, সেই বৎসর জানুয়ারী মাসে "সম্বাদ প্রভাকর" ও "রিফরমার" (Refomer) এবং মে মাসে "ইনকোয়ারার" (Inquirer) ও "জ্ঞানান্বেষণের" আবির্ভাব হয়। চারিখানিই সাপ্তাহিক পত্র। তখন সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স (License) লইতে হইত। সেই বৎসর ১১ই জানুয়ারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নামে "সম্বাদ প্রভাকর" ও ২৫শে তারিখে ভোলানাথ সেনের নামে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সম্পাদিত "রিফরমার" পত্রের লাইসেন্স বাহির হয়। ইহার পর ১০ই মে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে "ইন্‌কোয়ারার" এবং সেই মাসেই ৩১শে তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামে "জ্ঞানান্বেষণে"র লাইসেন্স বাহির হয়। "রিফারমার" ও "ইনকোয়ারার" এই দুইখানি সংবাদ পত্র ইংরাজীতে এবং "সম্বাদ প্রভাকর" ও "জ্ঞানান্বেষণ" বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইত।

এই সময় বাঙ্গালা ভাষায় "ভাস্কর" "রসরাজ" "পাষণ্ডপীড়ন" প্রভৃতি পত্র প্রচারিত হইত। এই সাময়িক পত্রগুলি তদানীন্তন সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত, সে ভাষা তখন আদৌ পরিণতিলাভ করে নাই, তদ্ব্যতীত তখন রুচিও প্রীতিকর ছিল না। কটু ও শ্লেষ উক্তি তখন ভাষার উপর একাধিপত্য করিতে ছিল। আদি, ও বীভৎসরস ভাষার মজ্জাগত ছিল। ইহা বঙ্গ ভাষার বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগ। নূতন শিক্ষিত দলটি তখন সুমার্জ্জিত ইংরাজী ভাষা সম্যক শিক্ষা করিয়া ইংরাজের ন্যায় ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে তদানীন্তন সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু সাধারণের মধ্যে দেশের কথা জ্ঞাপন করিয়া লোক অভিমত সৃজন করিতে হইলে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই নিমিত্ত ডিরোজিওর ছাত্রেরা "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রখানি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন।

আরও এই নূতন দলটি বঙ্গভাষাকে উন্নত ও শিক্ষিত চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির উপযুক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজে সফলকাম হইতে পারেন নাই। যাহা তাঁহারা নিজে পারেন নাই, তাহা সখন অন্যে

করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উহার সমধিক আদর করিয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উদ্ধৃত করিলাম, "অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন (রামতনু) লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন, 'রামতনু, রামতনু বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ ? এই দেখ", এই বলিয়া 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠ করিতে দিলেন। বোধ হয়, যে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহারা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়া অচিরে সাপ্তাহিক পত্রখানিকে দ্বিভাষিক পত্রে পরিবর্ত্তন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "জ্ঞানান্বেষণে"র একটি ইংরাজী বিজ্ঞাপনে লিখিত হয় যে, গ্রাহকদিগের আনুকূল্যেই তাঁহারা এতদিন পত্রখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া চালাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপীয়ানদিগের বাঙ্গালা ভাষায় তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকায় তাঁহারা ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই ইহা প্রকাশ করিবেন। তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকই ইহা পাঠ করিতে সক্ষম হইবেন। সেই সপ্তাহ হইতেই পত্রখানি বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় গণ্যমান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ব্যক্তি হিন্দুর পূজা পার্ব্বণের ছুটির সংখ্যা বাড়াইবার জন্য আবেদন করিলে "জ্ঞানান্বেষণ" ইহার বিশেষরূপে সমর্থন করেন। তাঁহারা লিখেন যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কয়েকজন ডাইরেক্টার ও চেম্বার অফ কমর্স্রের ১৫ জন মেম্বরের সুবিধা-অসুবিধা অপেক্ষা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারা বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের নিকট নিঃসন্দেহে আবেদনটির সফলতা আশা করা যাইতে পারে। আর সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুরা যে একমত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, একতার উপরই প্রধানতঃ জাতীয় শক্তি নির্ভর করে। দলাদলি কুসংস্কার ও গোঁড়ামী ত্যাগ না করিলে বড় হওয়া যায় না। আর একটি প্রবন্ধে তাঁহারা কলিকাতার চড়কপূজা ও বাণ ফোঁড়ায় তখন যে নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ইহা কোন বিশিষ্ট জাতীয় ঘটনার অধঃপতিত অবশেষ বটে, তবে এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন অভিমত প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন।

"জ্ঞানান্বেষণে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তদানীন্তন সময়ে অপঘাত মৃত্যুতে পুলিশ তদন্তের একটি পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন তাঁহাদের ছাপাখানার একজন প্রেসম্যান বেলা পাঁচটার সময় হঠাৎ পড়িয়া মারা যায়।

পুলিশে খবর দেওয়া সত্বেও ছাপাখানার একজন কর্মচারীকে সারারাত্রি লাস আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ভয় পাছে লাসটিকে সাপে খায়। তাহার পর দিন সকালে ৯॥• সময় থানাদার আসিয়া বলে যে,লাস ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হউক বা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে লাসটি দেওয়া হউক। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ষ্টীল অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া উহা দেখিতে পারেন নাই। এইরূপ নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লেখা হইত। তদ্ব্যতীত জ্ঞানোপার্জ্জনী সভায় যে সকল প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দেওয়া হইত, তাহা এই পত্রের ইংরাজী অংশে মুদ্রিত হইত। সিভিস (Civis) নাম স্বাক্ষরিত করিয়া রাম-গোপাল "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রে রাজনৈতিক ও দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিতেন। যে সকল শিল্পজাত বস্তু এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে নীত হইত, তাহাদের উপর শুল্ক ধার্য্য ছিল তিনি এই শুল্ক রহিত করিবার জন্য "জ্ঞানান্বেষণে"পুনঃ পুনঃ লিখেন এবং বহুযুক্তিপূর্ণ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে ভারতবর্ষে যেখানে অধিকাংশ দেশবাসী অত্যন্ত গরীব, সেখানে শিল্পজাত বস্তুর উপর শুল্কধার্য্য করিয়া এ সকল বস্তুর মূল্য বর্দ্ধিত করা সমীচীন নহে। শুল্কের দ্বারা বিক্রেয় বস্তুর প্রকৃত ও সরলগতি বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে শিল্পের ক্ষতি হয়। ব্যবসায়ী শুল্কের হার তাহার পণ্যের উপর চাপাইয়া ক্রেতার নিকট হইতে শুল্কের পরিমাণ দাম আদায় করিয়া লয়। দেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বস্তুর অবাধ প্রচলনে দেশের মঙ্গল সাধন হয় এবং এই সূত্রে শুল্কের অপ্রয়োজনীয়তা তিনি প্রমাণ করেন। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট এই শুল্ক রহিত করিয়া দেন। এই বিষয়ে Civis লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর যাবৎ তারকনাথ ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন। তারকনাথ হেয়ারের প্রিয় ছাত্র। হেয়ারের তৈলমূর্ত্তির সহিত তাঁহার একখানি ছবি আছে। "সুরধুনী কাব্যে" দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন :—

"দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি,
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক রবি।"

তারকনাথ হুগলীতে ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবার পর, কে পত্রের সম্পাদক হইবেন, এই বিষয় লইয়া রামগোপাল চিন্তিত হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতা হইতে গোবিন্দ চন্দ্রকে লিখিতেছেন "রসিক (কৃষ্ণ মল্লিক) কলিকাতায় আসিতেছে, রামতনু (লাহিড়ী) বাড়ী

যাইতেছে। 'জ্ঞানান্বেষণের প্রধান সম্পাদক তারক (নাথ ঘোষ) সৌভাগ্য বশতঃ হুগলীর ডেপুটি কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি কে এখন কাগজ চালাইবে।' তারকনাথ সে সময় 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রধান সম্পাদক থাকিলেও রসিককৃষ্ণও সে সময়ে উহার সম্পাদক বলিয়া পরিচিত হইতেন। মধুসূদন দাস নামক এক ব্যক্তি জুয়াচুরির অভিযোগে কলিকাতার দায়রায় সোপরদ্দ হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর "সমাচার দর্পণ" লিখেন যে এই মকদ্দমায় "জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক রসিককৃষ্ণ জুরির পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার প্রতি শপথ গ্রহণ করিবার যখন আদেশ হয়, সে সময়ঃতিনি সর্ব্বপ্রকার শপথেই আপত্তি করেন ও বলেন যে তিনি কোন প্রকার শপথই বুঝেন না ও তাঁহার কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই। জজ অগত্যা রসিককৃষ্ণের স্থানে অন্য এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া "বেঙ্গল হরকরা" পত্র প্রতিবাদ করেন যে "জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক" যে কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া শপথ করিতে অস্বীকার করেন এবং পণ্ডিত কথিত সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে রাজী হন নাই, কারণ তিনি উহা বুঝেন না। ইহা হইতে জানা যায় যে, তদানীন্তন সময়ের দুইখানি সংবাদপত্র রসিক কৃষ্ণকে 'জ্ঞানান্বেষণে'র সম্পাদক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা রামগোপালের পত্রে লিখিত "প্রধান সম্পাদক, তারক" ইহার অর্থ-উপলব্ধি হয়। তারকনাথের পর রসিককৃষ্ণ সম্পূর্ণ সম্পাদক হন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুলাই তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে লিখেন, "আগামী সপ্তাহ হইতে "জ্ঞানান্বেষণ" দক্ষিণা বাবুর হস্তে যাইবে। পত্র সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। "জ্ঞানান্বেষণে" লিখিবার জন্য তোমাকে ইহাই আমার শেষ অনুরোধ, সুতরাং এবারে কিছু ভাল প্রবন্ধ পাঠাইও। হুগলীতে মার্টিনের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিয়া একটি ছোট প্রবন্ধ রচনা করিতে পার।" সম্ভবতঃ ৯ই জুলাই বা তাহার দুই চারি দিন পর পর্য্যন্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার সম্পাদকতা করেন। এ সম্পাদকটীও ডেপুটি কালেক্টারের পদলাভ করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলে পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের সহকারিতায় ২৪শে নভেম্বর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পত্রের সম্পাদকতা করেন। ইনিও কর্ত্তব্য ব্যপদেশে পত্রের সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে রামগোপালের উপর 'জ্ঞানান্বেষণের' সম্পাদকতার ভার আসিয়া পড়ে।

কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন যে রামগোপাল সাহিত্যিক যশের অভিলাষী

ছিলেন না। তাঁহার সাহিত্যিক গ্রন্থাদি আমরা কিছু দেখিতে পাই নাই। সওদাগর আফিসের ঘুর্ণাবর্ত্তের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা ও অন্যান্য নানা কার্য্যে তাঁহার প্রবন্ধ রচনা করিবার অবসর ছিল না। তিনি পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া ২৪শে নভেম্বর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রকে লিখেন, "পত্র সম্পাদন করিবার অবসর আমার অল্প, তাহাপেক্ষা আমার এ বিষয়ে ক্ষমতা আরও অল্প; সুতরাং পত্র সম্পাদন করা আমার বিশেষ বিরক্তিকর।" সুতরাং তাঁহার সম্পাদকত্বে 'জ্ঞানান্বেষণের' পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের বন্যা প্রবাহিত হয় নাই। সাপ্তাহিক পত্রখানির মাসিক মূল্য ১৲ ও বার্ষিক মূল্য ১০৲ ধার্য্য ছিল, সে কারণ তখনকার সময়ে উহা উচ্চ মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির পাঠকও অধিক ছিল না; সেই জন্য পত্রের গ্রাহকসংখ্যা অল্পই ছিল। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের "ইংলিশম্যান" পত্রে 'জ্ঞানান্বেষণের' গ্রাহকসংখ্যা উনপঞ্চাশৎ মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এত অল্প কাটতিতে কাগজ চালাইয়া খরচ বাদে লাভ হইত না, বরং কিছু লোকসান হইত। ২০শে নভেম্বর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল তাঁহার দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন যে 'জ্ঞানান্বেষণের পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত তারাচাঁদ, কালাচাঁদ, প্যারী, রামতনু, রামচন্দ্র এবং হরমোহন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও হরমোহনের কথা হইতে তিনি বুঝেন যে, একার্য্যে লোকসান হইতেছিল, তাঁহারা কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রামগোপালকে এ বিষয় জানান নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে সভা সমবেত হইবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা উচিত ছিল।

পর বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি 'জ্ঞানান্বেষণের' প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটার (Bengal Spectator) বা বঙ্গদর্শক নামক আর একখানি দ্বিভাষিক পত্র প্রচার করেন। এক বৎসর যাবৎ উহা মাসিক প্রকাশিত হইবার পর উহা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু নয় মাস মাত্র সাপ্তাহিক পত্ররূপে বাহির হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়।

"জ্ঞানান্বেষণ" পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"জ্ঞানান্বেষণ" পত্র পুনঃ প্রকাশ। গত রবিবাসরীয় 'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পত্রে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইল, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র আগামী জ্যৈষ্ঠমাসাবধি

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হইবেক, কিন্তু তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় কিম্বা কেবল শেষোক্ত ভাষায় হইবেক তাহা বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হয় নাই।".

'জ্ঞানান্বেষণের' পুনঃপ্রচার আমরা অবগত নহি, তবে এ পত্রের যে সে সময় প্রয়োজন ছিল, এই চেষ্টাই তাহার প্রমাণ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী "দর্পণ" নামক বাঙ্গলা সংবাদ পত্রখানির প্রচার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্রিয় গোবিন্দচন্দ্রকে আর একখানি বাঙ্গলা ও ইংরাজী দ্বিভাষী মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার নিমিত্ত রামগোপালের সহিত তারা চাঁদ প্যারীমোহন ও কৃষ্ণমোহনের যে পরামর্শ হয় তাহা জ্ঞাপন করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত মুদ্রিত পত্রাবলী হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। 'দর্পনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পনা করিয়া তাঁহারা স্থির করেন যে দুইখানি পত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিবার জন্য একটি বুদ্ধিমান যুবকের সমস্ত সময় ব্যয়িত হইবে, সুতরাং মাসিক একশত মুদ্রার কম এরূপ ব্যক্তি পাওয়া যাইবে না। মাসিক পত্রিকা খানি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মত প্রকাশ করিবে; শিক্ষিতদিগের অনুসন্ধিৎসা জাগাইবে, তাঁহাদের (Circulating) লাইব্রেরী, জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা প্রভৃতির ন্যায় মরণোন্মুখ অনুষ্ঠান গুলিকে পুনর্জীবন দান করিবে সুপ্ত দেশবাসীকে জাগরিত করিয়া স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। আর "দর্পণ" সাধারণ বাঙ্গালীর জন্য লিখিত হইবে। উহার ভাষা সরল হইবে, উহাতে কোন বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা থাকিবে না, কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় থাকিবে না, গোঁড়ার দলের বদ্ধমূল সংস্কার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইবে, বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের কৌতুহল উদ্দীপক সংবাদ সন্নিবদ্ধ হইবে; এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহাদের শিক্ষার বিষয় গুলি বিস্তৃত করিয়া তাঁহাদের বদ্ধমূল সংস্কার দূর করিয়া, জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে দেশবাসীর চিত্ত প্রদীপ্ত হইবে। মৃত "দর্পণ" ইহার আদর্শ হইবে। দুইখানি পত্রের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। মাসিক পত্রখানি মাসের ১লা বাহির হইবার, ও কৃষ্ণমোহন, তারাচাঁদ ও প্যারীচরণের ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবার কথা ছিল। প্রত্যেক সংখ্যায় উঁহারা প্রত্যেকে একটি করিয়া প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারাচাঁদ সাধারণ সমস্ত প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিবেন, রামগোপাল নামে মাত্র সম্পাদক হইবেন, আর কখন কখন তাহাতে লিখিবেন। সাহিত্যের অংশ অল্প হইলেও ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিতে

হইবে। তবে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে রসিক কৃষ্ণের আসিবার কথা ছিল, তিনি আসিলেই তাঁহাকে উহা ছাড়িয়া দিবেন। তিনি আরও লিখেন যে আর কেহ রাজি না হওয়ায় তাঁহাকেই অগত্যা প্রস্তাবিত পত্রের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যত অল্প সময়ের জন্যই হউক তাঁহাদের মধ্যে যে একটা আলোচনা ও আন্দোলন হয়, তাহা তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত পত্রখানি বন্ধ হইয়া যাইলে বড় লজ্জার কথা হইবে, তবে তিনি আশা করেন যে ইত্যবসরে রসিকের মনে একটা দৃঢ়তা আসিতে পারে। ভগবান্ তাহাই করুন বলিয়া তিনি এ বিষয় শেষ করেন।

শিক্ষায় উৎসাহদান ও মেডিক্যাল কলেজ।

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি শুধু নিজের শিক্ষা ও অনুশীলনে সমস্ত অবসরটুকু ব্যয় করিতেন না, দেশের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয় সে বিষয়ে নানারূপে সাহায্য করিতেন ও ছাত্রদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন। অশিক্ষিতদিগের পরিবর্ত্তে শিক্ষিতদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার জন্য (পরে লর্ড) সার হেনরি হার্ডিঞ্জ (Sir Henry Hardinge) যে রেজোলিউসন প্রচার করেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতবাসী যত প্রকার দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করেন, শিক্ষাই সে সকলের প্রতীকারের অব্যর্থ উপায়। উচ্চ শিক্ষা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন একত্র থাকিতে পারে না।

"Education is the great and unfailing remedy for all the evils and disadvantages which the people of this land suffer.

"Political social and moral degradation is inconsistent with an enlightened education."

যৌবনের প্রথম হইতেই তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। (Marshman) মার্শম্যান লিখিত নূতন ভারতবর্ষের ইতিহাস যখন প্রচারিত হয়, সে সময় যাহাতে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কৌতূহল জন্মে, তদুদ্দেশ্যে তিনি একশ'খানি পুস্তক কিনিয়া কলিকাতা সমাজের উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন।

একবার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে দুটি ছাত্রকে একটি

সোণার ও একটি রূপার মেডেল দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও (পরে মাইকেল) মধুসূদন দত্ত তখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। এই প্রস্তাবে তদানীন্তন সময়ের বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের দেশীয় ভাবের প্রতি বিরোধের আভাস দিবার জন্য আমরা ভূদেব জীবনী হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম:—"যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্রবর্গ বাঙ্গালী প্রদত্ত পুরস্কারের প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গল দল" যাহা কিছু ইয়োরোপীয়, তন্মাত্রেরই পোষকতা করিতেন; দেশীয় সকল বিষয়ই যেন তাঁহাদের ঘৃণার বস্তু ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রই পরীক্ষা দিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিল, মধুসূদন দত্তও সেই মতে মত দিলেন। ভূদেব বাবু কিন্তু উক্ত পরীক্ষা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং স্বদেশবাসীর সম্মানেই তাঁহাদের সম্মান ইহা বুঝাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সহপাঠী সকল ছাত্রকেই এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করেন। মধুসূদন দত্ত এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সোণার, ও ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রূপার মেডেল পারিতোষিক পান। মধুসূদন-লিখিত ইংরাজী পারিতোষিক প্রবন্ধটি যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল জীবনীতে মুদ্রিত হইয়াছে। হিন্দু কলেজের পারিতোষিক বিতরণে রামগোপাল প্রতি বৎসর সোণার ও রূপার পদক প্রদান করিতেন। একবার কোন বিশেষ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য তিনি একটি ছাত্রকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck) কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন। এম, জে, ব্রেমলি (Bramley) ১২০০৲ মুদ্রা বেতনে ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এচ্ এচ্ গুডীভ ৬০০ মুদ্রা বেতনে তাহার সহকারী নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সামরিক ও অসামরিক দুটি বিভাগেই নিযুক্ত করিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত, উহাদিগকে শরীর ও অস্ত্র বিদ্যা, চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হইত। রোগী দেখিবার জন্য ছাত্রদিগকে জেনারল (General) ও দেশীয়দিগের (Native) হাঁসপাতাল, কোম্পানী (Company) হাঁসপাতাল ও নিঃস্বদিগের ডিস্পেন্সারি (Dispensary for the Poor) এবং চক্ষু পরীক্ষাগারে (Eye Infirmary) উপস্থিত হইতে হইত। সেই বৎসর আগষ্ট মাস হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই নাম বদলাইয়া

প্রিন্সিপ্যাল হয়। অ্যাসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেডিসিনের অধ্যাপক হন ও ডব্লিউ বি, ওশানসি (W. B O'Shangnassy) মেটরিয়া মেডিকার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডাক্তার ওশানসি পরে ভারতবর্ষের বৈদ্যুতিক বার্তাবহের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

মেডিক্যাল কলেজ হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে চরক ও সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রাসায় আবিসেন্নার ক্লাসে দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত, এতদ্ব্যতীত মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন হিন্দিতে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপে দেশের মধ্যে তখন অল্প বিস্তর তিন প্রকার চিকিৎসা বিদ্যারই মরা স্রোত বহিতেছিল। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সহিত এ তিনটিই বন্ধ হইয়া যায়। নূতন যে ইংরাজী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল তাহা পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে বিদ্যালয় হইল বটে কিন্তু "মড়া কাটিতে" কেহ রাজী হয় না। সংস্কৃত কালেজে যখন চিকিৎসা শাস্ত্রের শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইল তখন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত নামক তথাকার এক অধ্যাপক মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ইনিই ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করেন।

মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হইবার পর রামগোপাল আফিস হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহই তথায় গমন করিতেন। এইস্থানে ডাক্তার গুডিভ (Goodeve) ওশানসি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Apothecary General ডাক্তার জে গ্র্যাণ্টের (Grant) সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হয়। ডাক্তার ওশানসি তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে রামগোপাল সাধারণের ও দেশের উপকারিতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও অতিক্রম করিবেন।

চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই রামগোপাল ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করেন ও কলেজ পুস্তকাগারে কতকগুলি মূল্যবান ডাক্তারী পুস্তক উপহার দেন। নব প্রবর্ত্তিত ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র যাহাতে ভারতবাসী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। সেই সূত্রে তাঁহার দানের উল্লেখ করিয়া শিক্ষা পরিষদ্ (Council of Education) বড়লাটের প্রাপ্তি স্বীকার জ্ঞাপন করেন। ইহার উত্তরে রামগোপাল একখানি বিনয়নম্র পত্রে লিখেন যে স্বদেশবাসীর

শিক্ষা বিষয়ক সাধু উদ্দেশ্যে তিনি সময়ে সময়ে যে সংকীর্ণ ও দীন প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার তুলনায় শিক্ষাপরিষদের পত্রে তাঁহাকে যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি দীনতাই অনুভব করেন, কারণ সে প্রশংসা তাঁহার নিজের গুণের অপেক্ষা গভর্মেণ্ট ও শিক্ষাপরিষদের কল্যাণকর ও মহৎ ইচ্ছারই ফল। যাহা হউক, যে পত্রের তখন তিনি উপযুক্ত উত্তর প্রদানে অক্ষম ছিলেন, তাহাই, তাঁহাকে পরিষদের মহৎ উদ্দেশ্যের আনুকূল্য করিবার প্রেরণার মধ্যে পরিগণিত হইবে—আর যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে এমন দিন আসিতে পারে যখন এরূপ প্রশংসা তিনি তাঁহার উপযুক্ত পারিতোষিকের মধ্যে গণ্য করিবার দাবী করিতে পারিবেন। এই পত্রখানি আমরা হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল (J Kear) কার লিখিত "A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency" নামক পুস্তক হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

"Permit me to express my very grateful sense of encouraging notice taken by the Govt of my conduct in reference to the education of my countrymen. When I think of the isolated and poor exertions I have sometimes made in that good cause and consider on the other hand, the distinction that has been conferred upon me by the approbation conveyed in your letter, I feel humiliated, knowing that it results less from any merit of mine than the kindly and fostering disposition thus generally evinced by the Govt and the Council of Education.

"In conclusion, I venture to express a hope that in the letter to which I am thus inadequately replying, I may find an additional motive to do all the little I can to futher the great objects of your Council, and that, if my life be spared, a day may come when I may claim such commendation as a deserving reward"

তাঁহার বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র, এ বয়সেও তাঁহার যৌবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা গৌরবের আত্মতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া, সৌজন্যের সুন্দর নম্রতার তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।—তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার শেষ পত্রে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ২৫,০০০ মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত পাঁচটি ছাত্র প্রথমে মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হন :—উমাচরণ দত্ত, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দেব, নবীনচন্দ্র মিত্র এবং শ্যামাচরণ দত্ত। ইঁহারা সকলেই সব-অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদলাভ করেন। ইঁহাদের সময় মেডিক্যাল কলেজে সাড়ে তিন বৎসর পড়িতে হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার সময় বাড়াইয়া পাঁচ বৎসর করা হয়, ইহার ৪৫ বৎসর পরে বিলাতেও চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সময় পাঁচ বৎসর নিরূপিত হয়। এই সকল ছাত্রদিগের মধ্যে দ্বারকানাথ গুপ্ত কিয়ৎকাল রামগোপালের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। রামগোপাল যখন গোন্দলপাড়ার বাগান বাটীতে বাস করেন, সেই সময় নবীনচন্দ্র মিত্র তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। নবীনচন্দ্র কলিকাতার ঠনঠনিয়া পল্লীতে তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন। ইনি কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের একজন বন্ধু ছিলেন; নবীনচন্দ্রের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত দানশীল রাজা তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি ইহাতে বিরক্ত হন। তখন তিনি বহরমপুরে কোম্পানীর চাকুরী করিতেন। এই ঘটনার পর তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া মুরশিদাবাদ ত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করেন। সে সময়ে সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন। নবীনচন্দ্র সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন ও তাঁহার প্রভূত পসার ও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের সাধারণ কাউন্সিল এবং মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিল প্রস্তাব করেন যে একটি অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি ছাত্রকে বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করা হউক, কিন্তু তখন উহা গৃহীত হয় নাই। সাত বৎসর পরে এই প্রস্তাব পুনর্ব্বার উত্থাপিত হয়। সে সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় বার বিলাত যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি বিলাতে শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি ছাত্রের খরচ বহন করিবেন বলিয়া আপনা হইতে প্রতিশ্রুত হন। ডাক্তার গুডিভও আর একটি ছাত্রের খরচ দিতে রাজী হন ও স্বয়ং তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর একটি ছাত্রের নিমিত্ত সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগৃহীত হয়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব নাজিম এই উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ ও রামগোপাল যথাসাধ্য চাঁদা দেন।

ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী এবং দ্বারকানাথ বসু এই চারিজন ডাক্তার গুডিভের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। ভোলানাথ বারাকপুরে

স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন লর্ড অকল্যাণ্ড (Lord Aucklan.l) তাঁহার শিক্ষার ভার বহন করিতেন। গোপাল চন্দ্র ও দ্বারকানাথ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি একণে স্কটস চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে পড়িতেন। সূর্য্যকুমার কুমিল্লাবাসী ছিলেন। ইনি বিলাত হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে চাকুরী লাভ করেন এবং সে চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বিলাতে গিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নব প্রবর্ত্তিত আই, এম, এস (I. M. S.) প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পরে ডাক্তার সূর্য্য গুডিভ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বিদেশ যাত্রায় পাছে এই সকল ছাত্রেরা বিচলিত হন, সেইজন্য রামগোপাল নিজ ব্যয়ে তাঁহাদের আমোদের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং সারারাত্রি তাঁহাদের সহিত ষ্টিমারে যাপন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন এবং প্রাতে কালাপাণি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসেন। তখন সহজে বিলাত যাইতে কেহ রাজী হইত না, তখন ভারতবাসীর সমাজের চক্ষে পুণ্য৷ ধবিত্রীর স্থান বিশেষ অপবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল। ভারতের প্রান্ত-দেশ তখন হিন্দু ধর্ম্মের অপরিত্যজ্য দিগ্বলয়রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। আজ স্বাধীন জাতির সহিত মেলামেশা, তাহাদের নানা গুণের পরিচয় লাভ করা জাতীয় পরিপুষ্টির একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন তাহাদের সঙ্গ নিতান্তই পরিবর্জ্জনীয় ছিল। তখন উন্নতমনা দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও বিলাত যাত্রার জন্য যথেষ্ট সামাজিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তখন তাই বিলাত যাওয়া ও সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া একটা দৃঢ় চরিত্রের বিষয় ছিল। যাঁহারা দেশের মঙ্গল বুঝিতেন তাঁহারাই, শুধু এ সব কার্য্যে উৎসাহ দিতেন।

অংশীদার কেলসেল এণ্ড ঘোষ।

রামগোপাল যখন কেলসেলের মুচ্ছুদ্দি, সেই সময় (Owen potter) পটার নামক এক ব্যক্তিকে কেলসেল অংশীদার রূপে গ্রহণ করেন। ইনি দুই বৎসর যাবৎ এই অংশীদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার পর উভয়ের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় পটার পৃথক কুঠী খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টি, এস এবং ডবলিউ, এস, কেলসেলরা রামগোপালকে অংশীদার গ্রহণ করিয়া "কেলসেল এণ্ড ঘোষ" নাম দিয়া কুঠী চালাইতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বিলাতী কুঠিয়াল বাঙ্গালীকে অংশীদার করেন নাই। মেসার্স-

কার, টেগোর কোম্পানীর (Car Tagore Coy.) কুঠীতে বাঙ্গালী ছিল বটে কিন্তু তাহা ভিন্ন কারণে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন কোম্পানীর ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার স্বত্ব শেষ হয়, সেই বৎসরই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কার নামক এক ইংরাজকে অংশীদার লইয়া কুঠি খুলেন। এ স্থলে একজন বাঙ্গালী কার্য্য চালাইবার জন্য একজন ইংরাজকে অংশীদার লইয়া কুঠী খুলিয়া ছিলেন। কেলসেল এণ্ড ঘোষের সৃষ্টি ইহার বিপরীত কারণে ঘটিয়াছিল। কলিকাতার ৪৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও পরে ১৫ নং লালবাজার ষ্ট্রীটে কেলসেল এণ্ড ঘোষের আফিস ছিল। এই বাটিতে পরে মেসার্স বেলি বাদার্সের গুদাম ছিল, উহা আগুন লাগিয়া ভস্মসাৎ হইবার পর সে স্থানে এখন বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই সময়কার ৭১টি ইংরাজ সদাগর ও এজেন্টের কুঠীর মধ্যে উপরে উল্লিখিত বাঙ্গালী সম্পর্কিত দুইটি কুটি ভিন্ন, রামনারায়ণ রায় কোম্পানী নামক একটী বাঙ্গালী ও রস্তমজি কাওয়াসজি নামক একটি পার্সী সদাগরের দেশী কুঠী ছিল। রামগোপালের সৎসাহস অবিরত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মদক্ষতায়, তিনি অচিরে শ্রেষ্ঠ সদাগরদিগের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি সাহেব কর্ম্মচারী না রাখিলে, অনেক সময় দেশীয় কুঠির কার্য্য সুচারু রূপে পরিচালিত হয় না, আবার সাহেব কর্ম্মচারী রাখিলে, অধিকাংশ স্থলেই দেশীয় স্বত্বাধিকারীকে বিলাতী কর্ম্মচারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার অভিমত অনুসারে চালিত হইয়া অবশেষে কর্ম্মচারী মাত্রে পরিণত হইতে হয়। বিদেশীয় কর্ম্মচারীই প্রভু হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু রামগোপাল যখন কেলসেল এণ্ড ঘোষের অংশীদার তখন তিনিই আফিসের নিয়ামক ও পরিচালক ছিলেন। তিনি আফিসের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজ সহকারীদিগের কার্য্য বিধিবদ্ধ রূপে পরিচালন করিতেন, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে সদাগর আফিসের ছোট বড় সমস্ত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন হইত এবং তিনিই ইংরাজ কেরাণীর লিখিত হিসাব চিঠি-পত্রাদি সংশোধিত করিয়া দিয়া, কি প্রয়োজন ও প্রত্যেক বিভাগে কি করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। কর্ম্মে শৃঙ্খলা ছিল বলিয়া ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কুঠির গুদাম সর্ব্বদাই প্রায় ন্যূনাধিক ৬০ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের নানাবিধ ধাতু ও বস্ত্রাদিতে পূর্ণ থাকিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের "কলিকাতা রিভিউ" (Calcatta Review) হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"In consequence of good connection made in England, the firm did business to a large extent and very successfully The godowns always contained metals and piece-goods worth no less than Sixty Lakhs of Rupees The real working man of the house was Ram Gopal Ghose and it was then something novel to see a native of Bengal occupying a high position in the firm, ordering his English assistants to carry out his directions in the different Stages of a ramified business in a large counting house It was, we repeat, a sight to see a Hindu Correcting drafts of letters prepared by English assistants and giving those assistants clear directions as to what they were required to do in the correspondence and other departments"

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই আগষ্ট কেলসেল বিলাত যান, সুতরাং সমস্ত ভারই তাঁহার উপর অর্পিত হয়। জোসেফের আফিস যখন চালাইয়াছিলেন, তখন যে আফিসের তিনি অল্প অংশীদার ও যেখানে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা যে সুচারুরূপে পরিচালিত করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পর চারি বৎসর তিনি কেলসেলের অংশীদার ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন চাকুরী করেন সেই সময়ের একখানি (মুদ্রিত) পত্রে তিনি লিখেন যে বিলাতী কুঠীয়ালদিগের সহিত ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং দুই তিন বৎসর তাঁহার আর সেইরূপ হারে চলিলে তিনি চাকুরী ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা চালাইবেন। স্বাধীন পরিচালনা একটি বিশেষ সম্মানের কার্য্য এরূপ ব্যবসার কথা মনে হইলে তাঁহাকে আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিবার জন্য কেলসেলের অংশীদারী ত্যাগ করেন। চৌদ্দ বৎসর তিনি কেলসেলদিগের সহিত ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন ফারখৎনামা সহি করেন তখন সকলেরই চক্ষে জল আসিয়াছিল। কেলসেল রামগোপালের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বন্ধুত্বের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার অঙ্গুলিতে একটি হীরার আংটি পরাইয়া দেন। অন্যান্য উপহারের মধ্যে কেলসেল ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়ে তাঁহাকে একটি অশ্ব প্রদান করেন। এই সমস্ত উপহারও তাঁহার অংশের আড়াই লক্ষ মুদ্রা লইয়া সিক্ত চক্ষে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যবসার আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি কেলসেলের কুঠী ত্যাগ করেন।

কেলসেলের কুঠী হইতে ভিন্ন হইবার পর তিনি নূতন কুঠী খুলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কর্ণভন কোম্পানীর সহিত কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই কুঠীর অ্যাণ্ডারসন সাহেব ইঁহার পুরাতন বন্ধু, তিনি তখন বিলাতে, তাঁহারই মধ্যস্থতায় বিলাতী কুঠীয়ালদিগের সহিত চিঠি পত্রাদি চলিতে লাগিল। তিন মাসের মধ্যে নূতন আফিস খুলিবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠিল না; অ্যাণ্ডারসনের নিকট যে কাগজ পত্রাদি ছিল, তাহা কার্য্যোপযোগী করিতে বিলম্ব ঘটিল। এইরূপে প্রায় একবৎসর তাঁহাকে উৎসুক হইয়া যাপন করিতে হয়। নিত্যই মনে হইত অতি সত্বরই কার্য্য আরম্ভ হইবে, কিন্তু নিত্যই সে সত্বরের সীমা ব্যর্থ বিলম্বের দিগন্তরালে পিছাইয়া যাইত। বিলাতী ডাক পৌছিতে ও উত্তর আসিতে প্রায় তিন মাস লাগিত, সুতরাং তিন চারিবার খবরাদি পাঠাইতে হইলে একবৎসর কাটিয়া যাইত।

এই সময়ে তিনি ল্যাণ্ডর (Landour) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসেন। তখন ভ্রমণ করা অতি দুঃসাহসিক কার্য্য ছিল। আজ উড়ো জাহাজের দিনে সে সময়ের রেলপথ পাকা রাস্তা খালাদি প্রভৃতির অভাবে পথের দুর্গমতা অনুমেয় নয়। কিন্তু তখন তিনি এতদূর বেড়াইতে পারিয়াছিলেন বাঙ্গালা শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমেরই চক্ষে দেখিতেন, রাজনারায়ণ বসু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা সেজন্য তাঁহাকে বীর বলিয়া ভাবিতেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান গুলিতে ভ্রমণ করিয়া কোন্ কোন্ বস্তু সেই সেই স্থানে উৎপন্ন হয় ও তাহা প্রয়োজনোপযোগী স্থানে কিরূপে আসিতে পারে সে বিষয়ে বিধিমত পর্য্যবেক্ষণ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তিনি যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখনও অ্যাণ্ডারসন তাঁহার সদাগরী আফিসের কার্য্যাদির কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নানা কারণে অ্যাণ্ডারসনের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, রামগোপালের মনে আফিস খুলিবার আশা ততই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। নূতন সদাগরী আফিসের প্রবর্ত্তন করা, এখনকার ন্যায় তখনও অনায়াস সাধ্য ছিল না, বিশেষতঃ যদি সে ব্যক্তি কোন বিলাতী কুঠীর অংশীদার হইতেন তাহা হইলে উহা একেবারেই অসম্ভব ছিল। বাঙ্গালার বিস্তৃত ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের মধ্যেও অধুনা মাড়ওয়ারীদিগের মধ্যে ব্যবসায় যে সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়,

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তাহা বিরল ছিল। সেই জন্য তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন যে হয়ত তাঁহার পৃথক আফিস খোলার কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে, সে কারণ এই সময়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য্যাদি তাঁহাকে গুপ্তভাবে করিতে হইতেছিল। তাঁহার আশা যখন সময়ের দীর্ঘতায় আশু সফলতা হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, সেই সময় তিনি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার বাসনা করেন। অ্যাণ্ডারসন এ ইচ্ছার পোষকতা করিয়াছিলেন বটে, তথাপি সাহেব বলিয়াছিলেন যে যে বিষয়ে তিনি আশা দিয়াছেন তাহার কার্য্য আরম্ভ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। রামগোপাল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বশতঃ ব্যবসা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু আইন সম্বন্ধ তাঁহার আদৌ তাহা হয় নাই। তাহা তিনি নিজে বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য পরিচিত ও অভ্যস্থ কার্য্য ত্যাগ করিয়া, অজ্ঞাত ও নূতন বিষয়ে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হন। ব্যবসায়ে তাঁহার একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা ছিল। একদিন, তখনও তিনি হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন নাই, রসিক কৃষ্ণ, কৃষ্ণ মোহন, তারাচাঁদ, রামতনু, প্রেমচাঁদ বড়াল প্রভৃতি কয়জন যুবক সকালবেলা বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুদীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন। এমন সময় প্রসঙ্গ ক্রমে ভবিষ্যৎ জীবনে কে কি স্থান অধিকার করিবেন সে সম্বন্ধে কথা উঠে, উত্তরে কেহ অধ্যাপক কেহ ডেপুটি কালেক্টার, কেহ বা সুপ্রিম কোর্টের জজ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রামগোপাল বলেন "আমি ব্যবসা করিব, একান্ত তাহা না হয় এই মুদীর ন্যায় একখান দোকান করিয়া, দাঁড়ি পাল্লা ধরিয়া জিনিষ পত্র বিক্রয় করিব—স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিয়া জীবন যাপন করিব।" যাহা হউক, তিনি ব্যারিষ্টার হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। বুঝি উন্নতিশীল বাঙ্গালীর ব্যবসা বিষয়ে সফলতা দেখাইবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে পুনরায় সদাগরের আফিস খুলিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন।
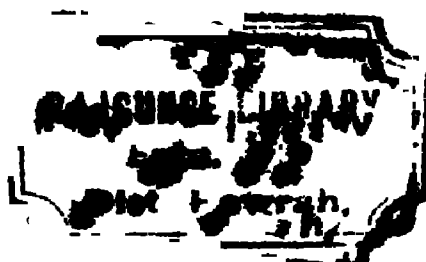
নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল।

পাগলের খেয়াল।

(গান)

[শ্রীনলিনী কান্ত সরকার।]

আমায় পাগল বলে উড়িয়ে দিস্‌নে,
আমার পাগ্‌লামিটে বুঝে' নে ভাই।
আমি বলেছি যা', বল্‌ছি যা' রে,
কর্‌ব রে তা' করেও রে তাই।
কত কাঁটা খোঁচে ভয় দেখালে,
আমি নির্ভয়ে তবু চলেছি পথ,
কত বাঘ ভাল্লুক চোখ্‌ রাঙালে
ফিরাইনি রে এ মনোরথ,
গিয়ে পৌঁছিলাম আনন্দ তীরে,
আমি সেখান্‌ থেকে এনেছি রে,
একগাছি খুব সূক্ষ্ম সূতো
আয় তোরা কে দেখবি আয়।

এই ....তে বেচ্ছামিতে

বাঁধব আমি ঐরাবতে,

এই স্থতোতে পাহাড় বেঁধে,

ভাসিয়ে দিব দরিয়ায়।

এই স্থতো ধরে ধরে আমি

উঠ্‌বো রে ভাই নীলাকাশে,

ঐ যে সেথায় ছড়িয়ে আছে

তারাগুলো চারি পাশে;

সেই তারাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে,

এই স্থতোতে গেঁথে দিয়ে,

আমার বিশ্বমাতার গলায় মালা

পরিয়ে দেওয়া চাইই চাই।

বাঙ্গলার প্রাণ।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

ভারত দেশ নয়, ভারত যে মহাদেশ—continent ; তাই ভারতবাসী অর্থে একটি বিশেষ ধারায় গড়া জাতি নয়, একটি ব্যাপক আদর্শের প্রেমে বাঁধা কতকগুলি জাতির একান্নবর্ত্তী পরিবারের (a family of nations) নাম ভারতবাসী। বিলাতী nation শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়তার একটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের জীবনকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহার মোহে ভগবানের রচনার বৈশিষ্ট্যটুকু হারাইয়া না যায়।

ইউরোপে ইংরাজ আছে, জার্ম্মাণ আছে, রুশীয়, ইটালীয়, স্পানিয়ার্ড গ্রীক রোমান আদি কত জাতি আপন আপন বিচিত্র প্রাণ ও ঐশ্বর্য্য সার্থক করিয়া পাশাপাশি বসবাস করিতেছে ; তাহাদের সকলের জীবনের সাতরঙা রঙে ইউরোপের জ্যোৎস্নাধবল সভ্যতার কিরণ মহাদেশটিকে মণ্ডলমণ্ডপ সূর্য্যে পরিণত করিয়াছে, সেখানে ইউরোপের সভ্যতার খাতিরে ইংরাজ বা ফরাসী নিজের অনুপম জীবন ভাঙ্গিয়া বিকলাঙ্গ করে নাই, ইংরাজের কর্ম্ম, জার্ম্মানের দর্শন, ফ্রান্সের কবিত্ব ও আদর্শানুরাগ, গ্রীসের কলা, কৃষিজীবন রুসের মাটির শক্তি ও শূদ্রত্ব এমনি কত রত্নসম্ভার আসিয়া ইউরোপের মনুষ্যত্বের সৃষ্টি করিয়াছে ; সে গরিমা বলিয়া শেষ করিবার নহে। ইউরোপের ধারা বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা এই শতভাবনদীপুষ্টা কূলহারা মহানা—জাতি মণ্ডলীর সেই ব্রহ্মপুত্র-ভাগিরথী-সঙ্গম।

তাই বলি পরস্পরের বৈশিষ্ট্যটুকু ভাঙ্গিয়া ভারতের জাতীয় ধারা বা nationalityর সৃষ্টি করিতে গেলে ভারতের বুকে বসন্ত আসিবে না, কারণ শুধু গোলাপ বা পদ্মের বসন্ত বলিয়া কোন বসন্তই নাই। যত বড় দীপই হউক সে একটি দীপে কিছুতেই জীবন-দেবতার আরাত্রিক হয় না, পঞ্চপ্রদীপ চাই ; কিন্তু সে পঞ্চপ্রদীপ একই তৈলের একই আধারের পাঁচমুখী জ্যোতি। ভারতের ধারায় সোমনাথ, হলদীঘাটের রাজপুত যাহা দিয়াছে, আসাম তাহা দেয় নাই, মহারাষ্ট্রের রামদাস, তুকা, শিবাজী যাহা দিয়াছে, সে মারুতী উৎসবের প্রাণ পঞ্চনদ রচিতে পারে নাই ; 'অযোনিসম্ভব অকালমূরৎ এক সৎ কর্ত্তার পুরুষের' প্রলয়ভৈরবে জাগিয়া শিখের জীবন যে স্বর্ণচূড় অমৃতসায়র খনন করিয়াছে, চৈতন্য শ্রীপীঠ

অন্নদামঙ্গল ও ধুমঘাটের গঙ্গার মাটী এ প্রেমে গড়া আপাদকবরী শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গলা তাহা পাবে নাই। পারিলে যে তাহার জীবনের সপ্তস্বরা মূক হইয়া যাইত, ঐটুকু হারাইয়া জগতের বিশ্বরচনাও তাল ও ছন্দহারা হইয়া বেসুরা বাজিত।

এক জন জার্ম্মানকে এক জন ইংরাজ বা রুশীয় হইতে ভিন্ন করিয়া বাছিয়া লওয়া তবু কঠিন, কিন্তু এক জন পাঞ্জাবীকে এক জন উড়িয়া বা মহারাষ্ট্রী হইতে বাছিয়া লওয়া শিশুরও অসাধ্য নয়। আকৃতি প্রকৃতি ভাষা ভাব পরিধেয় অনুষ্ঠান উৎসব বর্ণমালা—কোন্ দিক দিয়া বাঙ্গালী হইতে মাদ্রাজী বা নেপালী ভিন্ন নহে? এমন যে মুসলমান যাহারা ধর্ম্মে ও ভ্রাতৃভাবের একপ্রাণতায় এত এক, তাহারাও ভারতের বিভিন্ন জাতির (nation) এ জাতিপ্রেরণার ছাপ এড়াইতে পারে নাই। মায়ের কোল, জন্মদায়িনীর স্তন্যধারা ও স্নেহস্পর্শ অত কোমল হইলেও শিশুকে যে মায়ের ছেলে করিয়া গড়িয়া লয়, ভাবজীবন্ত মাটির দেওয়া চিন্ময় রূপটি কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া সে মাকে ভুলিয়া পর হইয়া যাইবে?

নারায়ণে যে বিশ্বমানবের কথা বলি তাহা বাঙ্গলাকে হারাইয়া নয়, বাঙ্গলাকে চাহিয়া অন্তর দিয়া পাইয়া লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়ায় রাখিয়া পরাণের যেখানে পরাণ সেখানে থুইয়া। বাঙ্গালী যত আপনাকে ফিরিয়া পাইবে, তত সে জগতের এক জন হইবে। নূতনের বসন্তে পুরাতনকে সে যত রূপ দিবে, জগতের স্বয়ম্বর সভায় শতটি চক্ষু ততই সে মুগ্ধা মাল্যকরা হৈমবতীকে মুগ্ধ হইয়া দেখিবে। মায়ের এ বাসরসাজ যে বৈকুণ্ঠের দেবতার হাতের দান,—বঙ্গজননীর মাথায় তুষার মুকুট, মায়ের কটিতে গঙ্গার মেখলা শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া ধানের গাছে বুনা হরিত সাটী ও রাতুল পদযুগ ঘিরিয়া নীল সিন্ধুর নুপুরসিঞ্জিত ত ঘুচিবার নয়। বঙ্গের যেমন এই বাহিরের রূপ আছে, অন্তরও যে তার নারিকেল ছায়ার ঘোরে ছায়াচ্ছন্ন, তুলসি চন্দন গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত, সতীপীঠের গোপন সঙ্কীর্ত্তনে কীর্ত্তনমুখর। কায়া যার এমন, মন তার কেমন তা' তো তোমরা জান? সে "যক্ষের ধন নন্দ-গোপাল" বঙ্গের ভাব পরশমণি হারাইয়া এ কায়া কি থাকিতে পারে? না এ কায়ার আর কোনও প্রাণ সম্ভবে?

তাই বলি ওগো বাঙ্গালী, তুমি যাহাই হইবার সাধ রাখ না কেন, বাঙ্গালী হইতে প্রাণান্তেও ভুলিও না। বিশ্বের হাটে তোমার মাথার পসরায় যেন অত দামী গোলকুণ্ডার হীরাও না থাকে, বাঙ্গলার মাঠের মলয়-দোদুল সোণার ভরা

সে পণ্যের পসরা জগতকবির যে হাটে নামাও, সেখানে যেন নবদ্বীপ, তাম্রলিপ্তি রচিয়া উঠে; তবেই না তোমার বিশ্বের গানে বাঙ্গলার আমের গন্ধ, দামোদরের ভরা ভাদরের গৈরিকদ্রব বান ভরিয়া উঠিবে।

তুমি জগতের নব জীবন-মুরলী এবার অধর যুগে ধরিয়া বাজাইবে তা' জানি, শুধু সে তিন সপ্তকের সকল মূর্চ্ছনা ভরিয়াই যেন অনন্ত নীল মণ্ডলের কাণে কাণে বাঙ্গলার এত যুগের বলি বলি করা মনঃকথা বলিয়া যায়। নূতন দীপকে বলুক, ড্রাম্‌ ক্ল্যারিয়নেটের সহিত মৃদঙ্গ করতাল বীণা পাখোয়াজের মিলন সঙ্গতে বলুক, পাশ্চাত্য নটীর বিলাসমদির রণনৃত্য বলুক, কিন্তু সব ডুবাইয়া নব চৈতন্য-লীলার পাবন কীর্ত্তনে যেন জগতের আকাশ বাতাস ভরিয়া কাঁপিয়া যায়; পাশ্চাত্যের কর্ম্মে ও প্রাচ্যের জ্ঞানে যেন বাঙ্গলার তুরীয়-চোঁয়া প্রেম ত্রিবেণী সঙ্গমের তারণ তীর্থ গড়িয়া তোলে।

জয় জগন্নাথ। ওগো এ লীলার ঢকা, সব অন্তর দিয়ে চেনা ওগো অচিন ধন। তুমি নাম জান তো ধাম জান না, এমনি করেই তো তোমার গোপন পরকীয়া সম্বন্ধ পাতনের ব্যবসা। আবিরাবির্ম্ম এধি'—প্রলয়পয়োধিজলের এ নব-উত্থিত নব সৃজন সার্থক হোক। এস পাঁচ কোটী বঙ্গবাসি, সকলে মিলে সেই মাধবী ধবল পাঞ্চজন্য শঙ্খখানি এ যুগেও একবার তুলে ধর মুখমারুতে ভরে নি, বাজবে ভাল। সেই আগুনের বক্ষরাগে জ্বেলে তুরীয় দীপক গাও দেখি ভাই, জগত আর একবার বাঙ্গলার মেঠো সুরে টলে যাক।

সংসার ও ভগবান।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

কবি যখন গরম গরম চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিতে করিতে লিখিয়া ফেলিলেন—God's in His heaven, all's right with the world, তখন নিশ্চয়ই দৈনিক সংবাদ পত্রখানার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। বিজলী-শোভিত নৃত্যগীতমুখরিত লর্ডলেডীর প্রাসাদের পার্শ্বেই যে কত দীন হীন দরিদ্রকে শীত, রোগ ও অনাহারের তাড়নায় ভগবানের এ সুখের সংসার হইতে তাড়াতাড়ি নোটিশ দিয়া ছুটিয়া পড়িতে হইতেছে, সে তালিকাটী চক্ষের সম্মুখে

পড়িলে কবি-হৃদয়েও একটা সন্দেহ উঠিতে পারিত, যে, জগতের কোথাও বুঝিবা একটা গোলমাল রহিয়া গিয়াছে; স্বর্গের ভগবান স্বর্গে থাকিয়া এ মর্ত্ত্যলোক পরিচালনের একটা সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যাহারা এই সংসার চক্রের চাপে পড়িয়া দলিত, মথিত, পিষ্ট হইয়া যাইতেছে, ক্ষীরসমুদ্রশায়ী সুপ্ত ভগবানের অস্তিত্ব তাহাদের হৃদয়ে যে কতখানি শান্তির ধারা ঢালিয়া দিতেছে তাহা আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ক্ষীর সমুদ্রের এক বিন্দু ক্ষীরও যাহাদের অদৃষ্টে জুটিল না, ভগবানের ভাণ্ডারে ক্ষীরের পরিমাণ কত সে হিসাব তাহারা না হয় নাই লইল।

ইউরোপ তাই মোটামুটি ঠিক করিয়া বসিয়াছে যে, সংসারের কাজে আর ভগবানকে লইয়া টানাটানি করিয়া কাজ নাই। যে ভগবান অব্যবহার্য্য, সংসারের কোনও কাজেই যাহার একটু সাহায্য পাইবার আশা নাই, তাঁহার থাকা না থাকায় লাভ ক্ষতিই বা কি? সংসারের এ বোঝা যখন আমাদের নিজের বলেই বহিতে হইবে, তখন ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া না থাকিয়া নিজের কাঁধে যাহাতে একটু বল সঞ্চার হয় সেই চেষ্টা করাই ভাল। সে কালের ভগবান এক আধ বার একটু আধটু miracle দেখাইয়া তবু তাপিত প্রাণে আশার-বারি সিঞ্চন করিতেন; একালে যখন তিনি সেটুকুও করিতে কুণ্ঠিত, তখন দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিজের কাজে লাগিয়া যাওয়াই ভাল। ভগবানকে ছাড়িয়া সংসার করা চলে, কিন্তু সংসার ছাড়িয়া ভগবানের আশায় বসিয়া থাকা চলে কি? পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা।

ধার্ম্মিক পুরুষেরা হয়ত একথার উত্তরে বলিবেন—তা' চলে বৈ কি। পেটের জ্বালা বড় হইলেও প্রাণের জ্বালাও ত নেহাৎ ছোট নয়। এই যে তোমার এত সাধের সংসার, যাহা না হইলে তোমার চলে না,—ইহারও ত যেদিকে চাও, শুধু একটা মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। আজ যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তরুণীর বিলোল কটাক্ষ তোমার শিরায় শিরায় তড়িৎ প্রবাহ ছুটাইতেছে, প্রাণে কত কবিতার উৎস খুলিয়া দিতেছে, কাল হয় ত তাহা রোগে শোকে দীপ্তিহীন হইবে; আজ যে ফুটন্ত মল্লিকার মত সুকুমার শিশুকে কোলে লইয়া তোমার বুক পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে, আজ যাহার অর্দ্ধস্ফুট কাকলী তোমার কাণে মধু ঢালিয়া দিতেছে—কাল হয় ত তাহার প্রাণহীন দেহ গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে। তুমি যাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছ, হাতে ধরিয়া ক, খ, শিখাইয়াছ সে হয়ত বিলাতী বিদ্যার বুকনী শিখিয়া মুখ বাঁকাইয়া তোমাকে বলিবে—

old fool! সংসার কি সত্যই এত মিঠা যে ইহা আঁকড়াইয়া পড়িয়া না থাকিলে চলিবে না? আর ঐশ্বর্য্য!—হায় রে, তুমি ত তুমি! কোথায় গেল রাবণ রাজার সোণার লঙ্কা—যদুপতেঃ কঃ গতা মথুরাপুরী, ইত্যাদি।

বিষম সমস্যা। শ্যামের মন রাখিতে গেলে কুল থাকে না, আর কুলের মানের দিকে চাহিতে গেলে শ্যামের বাঁশী শোনা চলে না। এ দোটানায় পড়িয়া ব্রজের কুলবালারা দাঁড়ায় কোথায়?

চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি সংসারে ও ভগবানে নাকি সনাতন বিরোধ, যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি, যাঁহা কাম তাঁহা রাম নেহি। মানুষ কি সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই ভগবানকে খোঁজে, না ভগবানের সঙ্গে তাহার আরও কিছু অন্তরের টান আছে?

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ কিসের টানে ছুটিয়া বেড়াইত জানি না; হয় ত শুধু পেটের জ্বালায়। কিন্তু বহু দিন হইতেই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ ভিন্ন আরও কিছুর টান যে সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়া আসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পেট ভরিলেও তাহার মনটা ভরে না। অরণ্য কাটিয়া সে যে নগর বসাইয়াছে, পর্ণকুটীর ছাড়িয়া সে যে সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছে, বল্কল ছাড়িয়া সে যে বেনারসী সিল্ক ধরিয়াছে, ভেলা ছাড়িয়া সে যে আকাশপোতে দিগ্‌বিদিকে ছুটিতেছে, নভোমণ্ডলের তারাগণনা শেষ করিয়া সে যে আজ মঙ্গলগ্রহের ঘরের সংবাদ লইতে সচেষ্ট, সে যে আজ আপনার সভ্যতা, নীতি, সাহিত্য, ললিত শিল্প বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত সেটা নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই নহে।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষাও এমনি ভাবে জড়িত, যে মানুষ কোন্ কাজটা যে কাহার টানে করিয়া বসে তাহা সে সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। প্রাণের বেগ সামলাইতে না সামলাইতেই তাহাকে মনের বেগ সামলাইতে হয়, আর মনের টানে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইবার সময় কোথা হইতে এক একটা তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে যে কোন অজানা কূলের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার হিসাব বেচারা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দিতে পারে নাই।

সে কূলের সন্ধান পাইতে মানুষের অনেক দিন লাগিয়াছে। কোন্ নির্ভীক কর্ণধার প্রথমে সে পারের সংবাদ আনিয়া দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার নামধামের উল্লেখ নাই। কিন্তু সংসার সমুদ্রের যে একটা কূল কিনারা আছে, সংসারের ওপারে যে একটা জুড়াইবার স্থান আছে, একথা ব্যাধিজরামৃত্যুপ্রপীড়িত

মানুষের বিশ্বাস করিতে বিলম্ব হয় নাই। যাহারা পরধামের সংবাদ আনিয়া হাজির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গন্তব্যস্থানের পথনির্দ্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহার অস্তিত্ব লইয়া কোনও মারাত্মক মতভেদ দেখা গেল না। অন্ততঃ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা যে সেখানে নাই, একথা সকলেই তারস্বরে প্রচার করিলেন। সাধারণ লোকে মোটামুটী কথাটা একরূপ মানিয়া লইলেও দুই একজন বুদ্ধিজীবী পুরুষ (যাঁহারা একালে জন্মিলে নিশ্চয় উকীল হইতেন) ব্যাপারটাকে জেরা না করিয়া ছাড়েন নাই। মনের পরপারে যদি এমন একটা কিছু থাকে

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তাহা হইলে তাহা আসিল কোথা হইতে, তাহার সহিত এ সংসারের সম্বন্ধ কি,তাহার জ্ঞান যদি অনুভূতিলব্ধ, ত তাহার সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতে এত নানা কথা কয় কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। যাহা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় তাহাকে বুদ্ধির রাজ্যে টানিয়া আনিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধের মধ্যে ফেলিয়া সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা হইল। কিন্তু "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব।" সুতরাং সাংখ্যকারের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সে পণ্ডিতি বিচারের নিবৃত্তি হয় নাই তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

বিচার ত চলিতে লাগিল; কিন্তু দুই একজন ওস্তাদ গোড়া হইতেই বাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন—'ও সব বাজে কথা। স্বর্গ, অপবর্গ, আত্মা, পরলোক, এ সব গাঁজাখোরের খেয়াল। বেশ করিয়া খাও দাও। একবার মরিয়া গেলে, ন্যাংড়া আমও মিলিবে না, বাগবাজারের রসগোল্লাও মিলিবে না, সুতরাং 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।'

কিন্তু হায়! ন্যাংড়া আমের অপ্রাচুর্য্য বশতঃই হোক, অথবা সে কালেও দুর্ভিক্ষের অভাব ছিল না বলিয়াই হোক, লোকে প্রাণ ভরিয়া কথাটায় সায় দিতে পারিল না। শুধু সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাদের শান্তি মিলিল না। জগতটা যে বেশ সুবিধার জায়গা নয় একথা সকলেই মোটামুটী একরূপ মানিয়া লইল। সাংখ্যকার কপিল ত ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার *জন্য* প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পুরুষকে কৈবল্য সাধনের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মহলেই তাঁহার ব্যবস্থা আদৃত

হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জনসাধারণ তখনও সংসারের টান একেবারে কাটাইতে পারে নাই। তাহার পর রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ তরুণী ভার্য্যা, নবজাত শিশু, অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সংসারের দুঃখনাশের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যে চারটী আর্য্যসত্য প্রচার করিলেন তাহার সার কথা এই :—"এই দুঃখময় সংসারের বাসনা হইতেই উৎপত্তি, বাসনাকে নাশ করিলেই সংসারের নিবৃত্তি। যত শীঘ্র পার বাসনাকে সমূলে বিনাশ করিয়া এ দু স্থান হইতে সরিয়া পড়।" দুই একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'প্রভো। সংসার ছাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইব কোথায়? নির্ব্বাণ লাভ করিয়া আমরা পাইব কি?' বুদ্ধদেব বলিলেন—"বাপু, ওসব কথায় কাজ নাই; বুদ্ধি দ্বারা সে কথা বুঝা যায় না। সংসার নিবৃত্তিই পরম লাভ বলিয়া ধরিয়া রাখ।"

লোকে কি বুঝিল তাহা তাহারাই জানে; কিন্তু সেই দিন হইতে আমাদের দেশে বৈরাগ্যের একটা মহাধুম পড়িয়া গেল। দীন দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই সুর ধরিলেন—

মন, চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।

বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা বলেন যে সিদ্ধার্থ যে দিন বুদ্ধত্ব লাভ করেন সে দিন দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলেন, দেবকন্যারাও পুষ্পবৃষ্টি করিতে ভুলেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর যে বৈদিক দেবতাদের নির্ব্বাণের পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, কিন্তু দেবলোকের সে নির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা মর্ত্তাধামেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কৃষক লাঙ্গল ছাড়িল, নাপিত ক্ষুর ছাড়িল, যোদ্ধা অস্ত্র ছাড়িল, রাজাও অভিধর্ম্ম পিটক পাঠ করিতে বসিয়া গেলেন। বৈরাগ্য স্রোত ক্রমে অন্দর মহলেও প্রবেশ করিল। মেয়েরাও হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া ভিক্ষুণী সাজিয়া বিহার আশ্রয় করিলেন। মেয়েদের মধ্যেও যখন সংসার ত্যাগের লক্ষণ দেখা দেয় তখন বুঝিতে হইবে যে সমাজের হাড়ে হাড়ে বৈরাগ্য ঢুকিয়াছে, জাতিটা যথার্থই নির্ব্বাণের পথের যাত্রী হইয়াছে।

বুদ্ধদেব ত মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন, কিন্তু জরা, মৃত্যু, ব্যাধি ত ঘুচিল না। একজনের নির্ব্বাণে সংসারও লুপ্ত হইল না। নির্ব্বাণ লাভই

যদি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, তাহাত কৈ বুদ্ধের আবির্ভাবে সফল হইল না। ধর্ম্মের প্রথম উৎসাহটা একটু কমিয়া গেলে দেখা গেল যে, মানুষের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ সমান ভাবেই রহিয়াছে, সংসারচক্র বুদ্ধদেবের খাতিরে আপনার গতি তিল পরিমাণও পরিবর্ত্তন করে নাই, অধিকন্তু সংসারকে আপনার মনোগত করিয়া গড়িয়া লইবার শক্তি মানুষের যেন কতকটা কমিয়া গিয়াছে। হাসি যেন কতকটা ম্লান, কান্নার মধ্যেও যেন তীব্রতা নাই। যাঁহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, মায়ামোহ কাটাইয়া নির্ব্বাণের লোভে বিহার আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই ভিক্ষুভিক্ষুণীরাও দিন কত পরে সংসারের পরপারে যাইবার যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। প্রকৃতির প্রতিশোধ!

বুদ্ধের ত তিরোভাব হইল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপটা সমাজের মন হইতে সহজে মুছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরসন করিয়া সমাজে যিনি বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রখ্যাত সেই শঙ্করের ধর্ম্মের অন্ততঃ বার আনা বৌদ্ধধর্ম্মেরই রূপান্তর। মতবাদের যা' কিছু পরিবর্ত্তন তা শুধু পণ্ডিতদেরই উপভোগ্য, সমাজ সম্বন্ধে যা' কিছু ব্যবস্থা তাহাতে বুদ্ধ আর শঙ্করে বড় বেশী প্রভেদ নাই। বিহারের পরিবর্ত্তে মঠ, ভিক্ষুর পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী আর শূন্যবাদের পরিবর্ত্তে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বসাইয়া দিলে বাহির হইতে উভয় ধর্ম্মকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না। শঙ্করকে বিজ্ঞানভিক্ষু যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া উপহাস করিয়াছেন তাহা একেবারে অমূলক নহে। কোন কোন বিষয়ে শঙ্কর আবার বুদ্ধেরও উপরে যান। বুদ্ধ তবু নারীকে ভিক্ষুণী হইবার অধিকারটুকু দিয়াছিলেন, শঙ্কর একেবারে সাফ্ বলিলেন—"উহারা 'নরকস্য দ্বারং'।" তাহাদের রক্তমাংসবসাদিবিকারসম্ভূত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একেবারে মুক্তির সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নারীর দশ ক্রোশের মধ্যে পরব্রহ্মের ভিড়িবার জো নাই।

দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বুদ্ধের সহিত শঙ্করের প্রধান পার্থক্য এই, যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ-তত্ত্ব একান্ত বাক্যমনের অগোচর; তাহার সম্বন্ধে অস্তি বা নাস্তি কোন কথাই জোর করিয়া বলা যায় না; শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম অভাবাত্মক নহে, তাহা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। শঙ্কর জীবকে একেবারে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখেন নাই, দাঁড়াইবার একটা আশ্রয় দিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম; কেবল মায়ার ফাঁদে পা দিয়াই আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে; আপনার নিত্যমুক্ত স্বভাব

ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে। আপনার স্বরূপ জানিতে পারিলেই তাহার ভববন্ধন হইতে মুক্তি। সংসারের পরমার্থতঃ কোনই সার্থকতা নাই., সংসারের যা' কিছু কর্ম্ম তা' শুধু অজ্ঞানেরই ফল।. মুক্ত পুরুষের ভিক্ষাটন ভিন্ন কোন কর্ম্মই নাই।

হায় রে নলিনীদলগতজলমিব চপল মানবের জীবন! তোমার সবটাই যখন ভ্রম তখন আর এ পাপের বোঝা বহিয়া মরা কেন? কৌপীন কম্বল সম্বল করিয়া তাই মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর দল জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ভুল এই কথা দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। বৈদিক কাল হইতে যে কর্ম্মবাদী গৃহস্থের দল কোনও রূপে এতদিন টিকিয়া ছিলেন তাঁহারাও এইবার শঙ্করের চাপে পড়িয়া মারা পড়িলেন। মণ্ডন মিশ্রকে যে দিন শঙ্করাচার্য্য একরূপ জোর করিয়াই উভয়ভারতীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গৃহ ছাড়া করিলেন, সে দিন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন কে জানে?

পুরাকালের ভাগবত সম্প্রদায়ও মুখে মায়াবাদ অস্বীকার করিলেও বুদ্ধ ও শঙ্করের প্রভাব হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিই সেই পুরাতন ভাগবত সম্প্রদায়ের বংশধর। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচার লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ প্রচলিত আছে; কিন্তু কর্ম্মের সাধনা কোথাও নাই। শঙ্করের মতবাদে যেরূপ জ্ঞানের প্রাধান্য, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সেইরূপ ভক্তির প্রাদুর্ভাব। তবে শঙ্কর যেমন ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে একান্ত বিপরীতধর্ম্মাপন্ন বলিয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া খাড়া করিয়াছেন, ইঁহারা সেরূপ করেন নাই। সংসারকে একেবারে কাটিয়া ছাঁটিয়া মিথ্যার ভস্মস্তূপে ফেলিয়া দিতে ইঁহারা স্বীকৃত নহেন। ইঁহাদের মতে সংসার অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানেরই বিকাশ; বটে বটে সেই অনন্তরসাধার ভগবানেরই স্ফূর্ত্তি, কিন্তু জীবের মধ্যে তিনি যে মূর্ত্ত তাহা শুধু আপনার লীলামাধুরী আস্বাদন করিবার জন্যই। সংসার মায়া নয়, মিথ্যা নয়; ভগবানের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু সে লীলা প্রধানতঃ প্রেমেরই লীলা; কর্ম্মের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই। লীলাময়ের নিত্যলীলার রসসম্ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য, উহাই সৃষ্টির লক্ষ্য।

শঙ্করের মতে যেমন চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম, জ্ঞানের পর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই; বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে সেইরূপ যা' কিছু কর্ম্মের ব্যবস্থা তা' ভগবৎ প্রেম-স্ফুরণের জন্য। সৃষ্টির অন্য কোনও লক্ষ্য নাই। জগতের দিক হইতে ভগবানের

দিকে যাওয়াই জীবের গতি ও পরিণতি; ভগবানকে পাইয়া জগতের দিকে ফিরিবার কোনও সার্থকতা নাই। সংসার হইতে নির্গমনের জন্যই সংসার সৃষ্টি। এ বিষয়ে কার্য্যতঃ শঙ্করপন্থীদিগের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে লয় তাঁহারা কামনা করেন না, সংসারের বাহিরে গিয়া ভগবৎসাজুয্যলাভই তাঁহাদের মতে বাঞ্ছনীয়। সংসারভোগ শুধু বদ্ধ অবস্থাতেই সম্ভব, মুক্তপুরুষের সংসার ভোগ নাই।

ভগবদ্জ্ঞান ও ভগবদ্প্রেম লাভ করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতিলাভই যে জীবের উদ্দেশ্য, ত্যাগই যে তাহার একমাত্র পন্থা, এ কথা প্রায় সকল দেশের সাধুসমাজেই প্রচলিত। আমাদের দেশে যেখানে সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্ত্তারই মত অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে সেইখানেই যখন এই কথা তখন সাদিবাদী খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় সমাজে যে এই ভাব আরও প্রবল হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? আমাদের তবু জন্ম জন্ম এই সংসারে আসিতে হয়, তাঁহাদের শুধু এক জন্ম লইয়াই সংসারের সহিত সম্বন্ধ। কিয়ামতের দিন যাহার আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না সে সংসারের জন্য বেশী ভাবিয়াই বা ফল কি? ভক্ত খ্রীষ্টান বা মুসলমানের চক্ষে এ সংসার শুধু কয়েদখানা, না হয় পরীক্ষার স্থল। কেন যে ভগবান মানুষকে এই সংসারের কারাগারে পাঠাইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন, তবে এখানের যা কিছু দুঃখকষ্ট, অবিচার অত্যাচার পরলোকে ভগবৎসন্নিধানে তাহার লেশমাত্র থাকিবে না। তাহাদের যা' কিছু আশা তা' মৃত্যুর পরপারে।

সংসার ও ভগবান সম্বন্ধে তবে কি ইহাই চরমসিদ্ধান্ত? সংসার অতিক্রম না করিলে কি পূর্ণশান্তির সম্ভাবনা নাই? জগত কি বাস্তবিকই এমনি উপাদানে গঠিত যে দুঃখ, অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা ইহার সহিত চিরদিনই জড়িত হইয়া থাকিবে? জীবন কি দুঃখেরই নামান্তর? অতীতের দিকে চাহিয়া যদি একথার উত্তর দিতে হয় ত বলিতে হয়—হাঁ, তা' বৈকি। দেশে বিদেশে যে সমস্ত ভগবৎ-জ্ঞানদীপ্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন সকলেই ত বলিয়াছেন প্রকৃতি ভগবানকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে; এ মায়ার রাজ্যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির পূর্ণপ্রকাশ অসম্ভব। সংসারকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ভগবৎসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা কেহই ত দেখান নাই। অনেকেই বলিয়াছেন—"এ সংসার কুকুরের ল্যাজের মত বাঁকা; এখনি টানিয়া সোজা কর, পরক্ষণেই আবার বাঁকিয়া যাইবে।" তাঁহারা যে অবিরত কর্ম্মের প্রেরণা দিয়াছেন তাহা সংসারকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য নহে, জীবেরই চিত্তশুদ্ধির জন্য।

মহাপুরুষদের কথা শিরোধার্য্য ; কিন্তু মানুষ আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারবিমুখ হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রকৃতি স্বয়ং তাহার অন্তরে যে গূঢ়তম প্রেরণা দিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহারই বলে সে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহির্জগৎ জয় করিতে ছুটিয়াছে। পাশ কাটাইয়া, প্রকৃতির পরপারে গিয়া শান্তিলাভ করিতে সে যেন মনে মনে সঙ্কুচিত, প্রকৃতির নিকট সে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না।

বর্ত্তমান ইউরোপ এ ধারণার বশেই চলিয়াছে। অতিপ্রাকৃতে তাহার বড় একটা বিশ্বাস নাই। আপনার মধ্যে যে শক্তি পরিস্ফুট তাহারই বলে সে বহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়া জগতে শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে চায়। ইউরোপে মানুষ আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া জগৎকে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেছে। ইহাই সেখানকার বর্ত্তমান চিন্তাধারা। আমাদের দেশে যাহারা ইউরোপীয় চাকচিক্যে মুগ্ধ, আমাদের বর্ত্তমান শক্তিহীনতায় যাহাদের হৃদয় ব্যথিত, তাঁহাদের অনেকেই বলিতেছেন— এস, আমরাও ইউরোপের অনুসরণ করি। সংসার বিলুপ্ত হইবার ত কোনও সম্ভাবনা দেখি না; তখন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়া থাকায় ফল কি?

কোন্ কথাটা তবে সত্য? ইহ ও অমুত্রের মধ্যে কি মিলনের কোনও সম্ভাবনা নাই? একদিকে যেমন অতীত যুগের আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুধু গায়ের জোরে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, অপর দিকে প্রকৃতি জয়ের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত যে গূঢ়তম প্রেরণা—তাহাও ত ভগবদ্দত্ত, তাহাকেই বা বুদ্ধির কৌশলে ভ্রমাত্মক বলিয়া উড়াইয়া দিব কেন?

ঠিক কথা। মহাপুরুষদের অপরোক্ষ অনুভূতি লব্ধ সমস্ত সত্য মানিয়া লইলাম, কিন্তু জগতের সহিত সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সম্বন্ধ লইয়া তাঁহারা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেগুলি ত বুদ্ধির মীমাংসা মাত্র। অনুভূত তত্ত্বকে তাঁহারা আপনি আপন বুদ্ধির ছাঁচে ঢালাই করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। কে বলিবে সে বুদ্ধির গঠনটুকুর মধ্যে অসত্যের বীজ নিহিত নাই? সমাধি অবস্থায় সকলে একই সত্য উপলব্ধি করিয়া তাহা প্রকাশের সময় আপনাপন সংস্কার ও বুদ্ধির অনুযায়ী প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ স্থাপিত হইত না।

আরও এক কথা। অনুভূতিরও ত তারতম্য আছে। অনন্তকে উপলব্ধি করিয়া কেহই শেষ করিয়া দেন নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলিতেন "ভগবানের

ইতি করিতে নাই,” “এখনকার উপলব্ধি বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে”, তা’ অতি খাঁটি কথা বলিয়াই মনে হয়। যাঁহার অনুভূতি যত গভীর, সত্য তাঁহার নিকট ততই পূর্ণভাবে প্রকাশিত। অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ সত্য বুদ্ধির বিচারের বিষয় নহে, গভীরতার তারতম্য লইয়া অনুভূতির পূর্ণতা বা আংশিকতা স্থির করিতে হয়। যাঁহারা মানসিক বৃত্তিবিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হন তাঁহারা আংশিক ভাবেই ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জ্ঞানীর নিকট তাই ভগবানের চিৎস্বরূপই প্রকাশিত; ভক্ত তাই ভগবানের আনন্দময়রূপ উপলব্ধি করিয়াই কৃতার্থ। কিন্তু তা’ বলিয়া ভগবানের স্বরূপ যে জ্ঞান ও আনন্দেই পর্য্যবসিত এ কথা বলা চলে না। জ্ঞানমার্গের সাধকেরা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় প্রকৃতির কোনও কার্য্য দেখিতে পান না বলিয়া প্রকৃতিকে পরমার্থতঃ অসত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থার মধ্যেও যদি প্রকৃতির বীজ গূঢ়ভাবে নিহিত না থাকিত তাহা হইলে সাধককে আর অবস্থান্তরে ফিরিয়া আসিতে হইত না। ব্রহ্ম আর প্রকৃতি সমাধির অবস্থায় অভেদরূপ এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে। জ্ঞান বিচারে ‘নেতি’ ‘নেতি’ করিতে করিতে ভগবৎ উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইবার সময় সাধকদিগকে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া যাইতে হয়, সেই জন্যই তাঁহারা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের উপর আবরণ স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিতে যাহা আবরণস্বরূপ, ভগবানের কাছে যে তাহা আবরণ একথা মনে করিবার কারণ নাই। প্রকৃতি যে মায়া মাত্র বা পরমার্থতঃ অসত্য, উপরোক্ত অনুভূতির দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না।

আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধিই যে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা চরম উপলব্ধি তাহাও মনে হয় না। গীতায় যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যিনি নির্গুণ ও গুণভোক্তৃ, যিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, নির্গুণ ব্রহ্ম ও গুণময়ী প্রকৃতির বিপরীত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য তাঁহাতেই সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা আপনার শক্তিতে ভগবানকে ধরিতে না গিয়া ভগবানের কাছে ধরা দেন, যাঁহারা আপনার বুদ্ধি বলে ভগবানকে বুঝিতে না গিয়া বুদ্ধিকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করেন, যাঁহারা চিত্তবৃত্তির উচ্ছেদ বা নিরোধ না করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহার নিকট উৎসর্গ করেন—তাঁহাদের নিকট প্রকৃতি শুধু মায়া বা আবরণ রূপে প্রকটিত না হইয়া ভগবৎশক্তি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান ও সংসারে তখন আর বিরোধ থাকে না। ভগবান তখন আর প্রকৃতির পরপারে

আত্মগোপন না করিয়া প্রকৃতির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হন। জীবকে তখন তিনি আপনার জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির লীলাকেন্দ্রে পরিণত করিয়া আপনার সংসার আপনিই চালান। দুর্ব্বলতা, নিরানন্দ, ও অজ্ঞানের তখনই উপশম। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির তখনই পূর্ণ মিলন। স্বর্গের দেবতা তখন নরলোকে মূর্ত্ত বলিয়াই মানুষ বলিতে পারে —"God is in this world, all is therefore right with it" মর্ত্তে এই অমর ধাম প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধনা।

অনন্তানন্দের পত্র।

দেখ ভায়া, যে দেশে ধর্ম্ম বল্‌লেই লোকে গেরুয়া কাপড় আর নাকটিপাটেপি বুঝে সে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাওয়াও এক বিড়ম্বনা। তুমি বলবে এক, লোকে বুঝবে আর; তুমি গড়তে যাবে শিব, গড়ে উঠবে বানর। শুনবে একটা মজার গল্প?—সে আজ অনেক দিনের কথা। রাজপুতানায় সেবার বড় দুর্ভিক্ষ। তাই বাঙ্গলাদেশ থেকে দু'জন সন্ন্যাসী গিয়ে কিষণগড়ে সাহায্য-কেন্দ্র খুলেছিলেন। অনেকগুলি অনাথ ছেলেপিলে আর নিরাশ্রয় বুড়ো তাঁদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। অর্থসাহায্য তখনও বেশী পাওয়া যায় নি; সুতরাং ভিক্ষা শিক্ষা করে সন্ন্যাসীরা যা কিছু পান, তাই বহস্তে পাক করে বেচারাদের খেতে দেন। এমন সময় সেখানকার এক নামজাদা পণ্ডিত সন্ন্যাসীদের কাছে এসে উপস্থিত। খুব শাস্ত্রীয় রকমে প্রণাম করে তিনি নিবেদন করলেন—"মহারাজ, আপনারা যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন তখন আপনাদের আবার এ কর্ম্মপ্রবৃত্তি কেন? এ সব ত সংসারীর কাজ।" যে রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে পণ্ডিতজী প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলেন তা'তে সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি বয়সে ছোট তিনি খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা সত্ত্বেও ফিক্ করে হেসে ফেলে উত্তর দিলেন—"কি করি পণ্ডিতজী, আমাদের ত ইচ্ছা বনে গিয়ে জপ তপ করি; কিন্তু সংসারীর কাজ সংসারীরা করে না, তাই আমাদের আসতে হয়েছে।" পণ্ডিতজীর কিন্তু শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে কথাটা বেশ খাপ খেল না। তিনি সন্ন্যাসীদের পরকালের জন্য মহাচিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"কিন্তু, মহারাজ, শাস্ত্রে যে বলে কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবার পর ফের কর্ম্ম করলে নিরয়গামী হতে হয়।" সন্ন্যাসী হয়ে ত আর শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করা চলে না, অথচ, সন্ন্যাসী হলে কি হয়, কলকাতার ছেলে ত বটে। আমাদের ছোট সন্ন্যাসী মহারাজ তাই উত্তর দিলেন—"তা হবে বৈকি, পণ্ডিতজী। শাস্ত্র ত আর মিথ্যা হবার নয়। আপনাদের যখন সাহায্য করতে এসেছি, তখন নরকে যাওয়া ভিন্ন আর গতি কি? দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের দুটো খেতে দিয়েছি বলে ভগবান যদি নরকেরই ব্যবস্থা করেন, ত যাওয়াই যাবে।"

পণ্ডিতজী কিন্তু কলিকালে শাস্ত্রের অপমান দেখে ক্ষুণ্ণমনে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলেন।

আর একবার ঘুরতে ঘুরতে আমার এক ভবঘুরে বন্ধুর সঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত। বাংলায় তখন স্বদেশীর খুব ধুম লেগে গেছে। সন্ন্যাসীর কাছে অনেক লোকের সমাগম হয় দেখে আমার বন্ধুটী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সবিনয় বল্লেন—"মহারাজ, দেশী কাপড় চোপড় ব্যবহার করার দিকে এ সমস্ত লোককে যদি একটু দৃষ্টি রাখতে বলেন ত সমাজের অনেক মঙ্গল হয়।" সন্ন্যাসীটী পরম বিজ্ঞভাবে মুখখানি খুব গম্ভীর করে বল্লেন—"ও সমস্ত অনিত্য বস্তুর দিকে এদের প্রেরণা দিয়ে কি লাভ?" বন্ধুটী অদূরে পুরী, জেলাপি, রাবড়ী প্রভৃতি ভূরিভোজনের ব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন—"মহারাজ, দেশের সব ব্যবসা বাণিজ্যই যদি বিদেশীর ঠেলায় মাটী হয়, তা' হলে কিছু দিন পরে লোকে আর আপনাদের ও রকম তোফা সেবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারবে না।" বলা বাহুল্য, যুক্তিটা ঠিক শাস্ত্রীয় না হলেও সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণে লেগেছিল।

সেই যে কবে শঙ্করাচার্য্য বলে গেছলেন যে জ্ঞান আর কর্ম্মের সমন্বয় হবার জো নেই, সেই জের আজ পর্য্যন্ত চলছে। যুক্তির কসরতে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে জগতটা একদম্ বন্ধ্যাপুত্রের মত সাফ্ মিথ্যা। যেহেতু ব্রহ্মই সত্য, আর একমাত্র সত্য, সেহেতু জগতটা মিথ্যা হতে বাধ্য। পণ্ডিত সমাজে এ রকম অপমানিত হবার পর জগতটার উচিত ছিল, শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ ক'রে একেবারে দেখতে দেখতে চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া, অন্ততঃ লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকা! কিন্তু বেহায়া জগতটার মধ্যে সে রকম শুভবুদ্ধি কিছুই দেখা গেল না। সে চিরদিন অনন্ত মহাকাশ জুড়ে আপনার

উন্মত্ত আনন্দে যে রকম নেচে আস্‌ছিল, তেমনিই নাচতে লাগ্‌ল। পণ্ডিতদের রাশি রাশি পুঁথির দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। পণ্ডিতেরা তখন চোটে গিয়ে ব্যবস্থা দিলেন—'এ সংসার যখন আমাদের শাস্ত্র মানে না, তখন এর আর মুখদর্শন করা হবে না, চল সবাই মিলে বনে যাই।"

কিন্তু হায় রে। বনে গিয়েও কি সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বৈরাগ্য চর্চ্চা করে জুড়োবার জো আছে? প্রথমতঃ দিনের বেলা দু'টো বাঁধা ভাত পাওয়া মুস্কিল, দ্বিতীয়তঃ রাত্রে মশা কামড়ায়। আর তাও যদি বা বরদাস্ত হয়—ত ঐ যে মিথ্যা আকাশে মিথ্যা চাঁদ মিথ্যা হাসি ছড়াচ্ছে, গাছে গাছে ঐ যে মিথ্যা ফুল ফুটে গায়ে গায়ে ঢলাঢলি করে পড়ছে, পাখীগুলা জোড়ায় জোড়ায় গাছে গাছে যে রকম ডাকাডাকি, মাতামাতি করছে তা'তে কঠোর বৈরাগ্য সাধনার যে ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে, সেটা ত আর মিথ্যা নয়? পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা বড় পণ্ডিত, তাঁরা তাই বন থেকে পালিয়ে পাহাড় পর্ব্বতে গুহার মধ্যে ঢুকে, নাকে কাণে তুলো গুঁজে একেবারে সমাধিস্থ হবার জোগাড় করলেন। এখনও যদি নর্ম্মদার তীরে ঘুরতে যাও ত তাঁদের দু'দশ জন বংশধরের সঙ্গে যে দেখা সাক্ষাৎ না হয় তা নয়। তারা ত সমাধিস্থ হলেন, ভাবলেন প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়ে ব্রহ্মপুরুষকে নিয়ে দিন কাটাবেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ছেড়ে তাঁদের যদি বা চলে, ব্রহ্মপুরুষের যে চলে না। জগৎ সৃষ্টি যে তাঁর নিত্যকর্ম্ম। 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি।'

আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের যে বিরোধ বাধিয়ে বসে আছেন তার মূল কথাটা এই, যে, ব্রহ্মই নিত্য আর সংসার অনিত্য, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কর্ম্ম খসে পড়বেই। কিন্তু যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হো'ন না কেন, তাঁকে সকাল সন্ধ্যা দু'টো ডাল ভাত না হয় 'শুখা চপাটী' খেতেই হবে। তিনি কর্ম্ম ছাড়লে হবে কি, কর্ম্ম ত তাঁকে ছাড়ে না। আর কাজ যখন বাস্তবিক খসে পড়ে না, তখন স্বীকার করতেই হবে, যে যেখান থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি সেই ভগবানের মধ্যেই কর্ম্মের বীজ নিহিত। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" 'যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী' তাঁকে না ছাড়লে কর্ম্মও ছাড়া যায় না। জ্ঞানের পর যখন জীব মুক্ত হয় তখন তার স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের কর্ম্মও ঘুচে যায়, কিন্তু ভগবানের শক্তিই তখন তাকে আশ্রয় কোরে কর্ম্মরূপে বাহিরে ফুটে উঠে। তখনই যথার্থ কর্ম্মের আরম্ভ। অজ্ঞানের কর্ম্ম, বদ্ধ দশার কর্ম্ম—সে ত শুধু অন্ধকারে হাতড়ান। যে প্রবৃত্তির দাস, সে আবার কর্ম্ম করবে কি?

এই ভাবটাই তন্ত্রের ভুক্তিমুক্তিবাদে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সাধুরা এখনও মায়াবাদের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সাধক-সমাজে শঙ্করমতের প্রতিষ্ঠা কখনও ভাল করে হয় নি। এমন শস্যশ্যামলা সোণার দেশে প্রকৃতির পূজা না হওয়াই অস্বাভাবিক। ভগবান যে শুধু নির্গুণ আর নিরাকার একথা স্বীকার করতে বাঙ্গালীর প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম যখন অনেক দিন ধরে বেদান্তের টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা করে মহাপ্রভুকে বুঝিয়ে দিলেন যে ব্রহ্ম নিরাকার, তখন শ্রীচৈতন্য শুধু জগতের দিকে দেখিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ব্রহ্ম যদি নিরাকার, তবে এ সব আকার কার?" অমূর্ত্তই যে রূপের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠে অনন্তভাবে আপনার লীলাকেন্দ্র গড়ে তুলছেন—এইটাই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। রূপকে সে বাদ দিতে চায় না, ছেঁটে ফেলতে চায় না; প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়তেও তার প্রবৃত্তি নাই। সবটাকেই সে ভগবানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

নিত্যানন্দের পর থেকে বাংলায় শাক্ত আর বৈষ্ণব সাধনপ্রণালী সম্মিলিত করে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তাদের সকলেরই মধ্যে জ্ঞান, প্রেম আর কর্ম্মের বেশ একটা সমন্বয়চেষ্টা দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে কিন্তু সাধন প্রণালীগুলি মেলাবার তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। আমার এক বন্ধু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন—"দেখ, দক্ষিণীরা যেমন তরকারী রাঁধবার সময় আলু, পটোল, বেগুন সব আলাদা আলাদা রাঁধে, এক সঙ্গে মিশিয়ে একটা তরকারী করতে পারে না, ওদের সাধন প্রণালীও সেই রকম। এক একটী পন্থা যেন এক একটী air-tight compartment। ওদের দ্বারা ধর্ম্মের সমন্বয় হবে না।"

কথাটা ভেবে দেখবার যোগ্য বটে।

প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের, সংসারের সঙ্গে ভগবানের, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে বিচার অনেক দিন থেকেই চল্‌ছে। সাংখ্যকার দুটোকে নিত্য বলে স্বীকার করলেও দুটোকে কেটে ছেঁটে আলাদা করে দেবার ব্যবস্থাই দিয়ে গেছেন; শঙ্করের বেদান্ত প্রকৃতিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতেই ব্যস্ত। বাংলায় তন্ত্রই শুধু উভয়ের মৌলিক একত্ব স্বীকার করে সংসারের মধ্যে ভগবানের প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাংলার সাধকেরা প্রকৃতিকে পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন বলেই ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখতে পান নি। তাঁদের চেষ্টাতেই

বাংলায় অর্দ্ধনারীশ্বর পূজা প্রচলিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাংলায় এসেছিলেন, তখন বোধ হয় একাই এসেছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁর পাশে শ্রীরাধাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তবে ঘরে তুলে নিয়েছে। শুধু পাশে দাঁড় করিয়েছে বল্লে ভুল হবে; বাংলার কবি অরূপকে রূপের কাছে নত করে, কৃষ্ণকে রাধার পায়ে ধরিয়ে তবে ছেড়েছে। শিব ত বাংলায় এসে একেবারে মহাকালীর পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে অতটা করা চলে না, কেন না তাঁর হাতে পড়ে জানকীকে অনেক লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়েছে। বাংলায় তাই আজ পর্য্যন্ত রামের পূজা জমে উঠ্‌ল না। রামকে বাঙ্গালী ভক্তি করলে, প্রণাম করলে, কিন্তু প্রাণ ভরে ভালবাসতে পারলে না।

সে দিন বাংলার একজন প্রসিদ্ধ জননায়কের সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন যে আজকাল ছেলেদের মধ্যে গোড়ার কথা নিয়ে টানা হেঁচড়া চল্‌ছে (Principles are in the melting pot)। মায়াবাদ সত্য কি মিথ্যা, এটা এখন আর শুধু পণ্ডিতি তর্কমাত্র নয়, এ সম্বন্ধে একটা স্থির বিশ্বাস না হলে কাজকর্ম্মের গোড়া পত্তনই হ'য়ে উঠ্‌ছে না। দেশের এবং দশের কাজের প্রণালী নিয়ে তাই ছেলেদের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে। সংসারটা ধরবে কি ছাড়বে, আর ধরতে হলে কেমন করে ধরবে এ সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত না হ'লে, অন্য দেশের ছেলেদের কথা বলতে পারি না, বাংলার ভাল ভাল ছেলেরা কর্ম্মক্ষেত্রে ষোল আনা প্রাণ দিয়ে নাম্‌তে পারবে না। তারা চিরদিনই idealistic.

বাঙ্গালীর ছেলেরা এই গোড়ার কথাটা ভাল করে বুঝ্‌লে তবে তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মের ভিত্তি পাকা হবে। প্রকৃতিকে ছেঁটে ফেলে নির্ব্বাণের দিকে ছুটে গেলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করা হবে। আমাদের মুক্ত হ'তে হবে, স্বরাট হ'তে হবে—প্রকৃতির দাসত্ব করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে রফা করে নয়, প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে নয়—সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির অধীশ্বর হয়ে, সংসারে থাক্‌তে হবে সংসারের প্রভু হ'য়ে। অন্তরের সেই মুক্তি তখন আমাদের বাহিরের সকল কাজে ফুটে উঠবে। কর্ম্ম তখন হবে শুধু আনন্দের অভিব্যক্তি। জগতের কোন খণ্ডশক্তিই সে ভগবৎপ্রেরণাকে বাধা দিতে পারবে না। তখন যা গড়বে, তা আর ভাঙ্গবে না।

এটা কিছু নূতন কথা নয়। বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকৃতি ঘোষণা করে দিয়েছেন :—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে সমে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

শিশুর জন্য এ সাধনা নয়, পরাশ্রিত দুর্ব্বলের জন্যও নয়। একবার দেখ দেখি, ভায়া, বাঙ্গালীর ছেলে এ বীর সাধনে অগ্রসর হবে কি না?

আমি ত অনেক দিন ধরেই বসে আছি। এবার ইচ্ছা শেষটা দেখে যাব।

ইতি। তোমার
শ্রীঅনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী।

অভাগা।

(শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।)

কোথা তুচ্ছ ধরিত্রীর কোণে
ক্ষীণ প্রাণ নিত্য দিন গণে,
কবে তার আসিবে মরণ;
ওরে অন্ধ, ওরে দীন হীন।
তোর যে ফুরাবে না'ক দিন,
তোর যে রে যাবে না জীবন
ঢালিতে শুধুই অশ্রুজল
এ ভবে কি এসেছিস্ বল?
ঘরে বসে দুঃখে আত্মহারা,
আপনি খুঁজে নে নিজস্থান,
সাহসে বাঁধিয়া ক্ষুদ্র প্রাণ,
মুছে ফেল নয়নের ধারা।
ওই দেখ কোটী কোটী কর,
কর্ম্ম করি হয় অগ্রসর
হাসি মুখে মরণের পানে,
একেলা বিভোলা গৃহমাঝে,
তোর কিরে দিন গণা সাজে?
ওঠ জাগ মরণের গানে।

ওই কে থাকিয়া দূর দেশে
অদৃশ্য অলক্ষ্যতম বেশে
বাজাতেছে পবিত্র বিষাণ,
কায় যেন বনফুল হার,
শোভা পায় গলদেশে তা'র
সুধাগন্ধে বায়ু বহমান।
অধর সংলগ্ন কার বাঁশী,
বুঝি সে অধরে আছে হাসি,
সুধীরে মল্লারে গাহে গান।
তোর প্রাণে পশেনি সে স্বর
হয়নিক হিয়া ভরপুর,
উদাসীন হয়নি পরাণ ?
আয় মুক্ত ! আয় বদ্ধ প্রাণ,
অবসাদ হোক অবসান,
রাঙ্গা রবি উদিত গগনে
সে কণক কর মাখি গায়
আয় জীব হেথা চলে আয়,
পশিতে আপন নিকেতনে।

দ্বীপান্তরের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেলুলারে—প্রথম জীবন।

আমাদের জাহাজ আসিয়া বন্দরে দাঁড়াইল। ইহার উত্তরে রস্ (Ross) দ্বীপ, দক্ষিণে এবার্ডিন জেটি ও বিরাট দুর্গের মত সেলুলার জেল, পূর্ব্বে মাউণ্ট হ্যারিয়েট পাহাড়ের কান্ত শ্যামশোভা, আর পশ্চিমে সমুদ্রের অকূলরূপ।

আমাদের এ অকূলের তরী কোথায় ভিড়িল কে জানে? সকল কূল হারাইয়া এমনি করিয়াই কি আমরা কূল পাইব? কূল পাই আর না পাই এদেশে প্রকৃতির বড় মোহিনী সাজ। বন্দর বক্ষ হইতে রসের বড় বাহার, পাহাড়ের গায়ে স্তরে বিস্তরে যেন কত অযত্নবিন্যস্ত সাদা সাদা রাঙ্গা রাঙ্গা ধাড়ী ঘর গুলির সঙ্গে গাছপালার সবুজের জড়াজড়ি মাখামাখি। দূর হইতে কেহ কখন সিলং সহর যদি দেখিয়া থাকেন, তবে বুঝিবেন এও কতকটা সেই রকম। পার্থক্যের মধ্যে এই গিরিছবির চারিদিকে তরল নীলরঙের ছড়াছড়ি—তরঙ্গপাগল সাগরের অনাবৃত উচ্ছ্বসিত বুকখানার দোল। রসের জল ছুঁইয়া কালো জেঠী, নীচে হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকের পর থাকে বাড়ীগুলি গাছ পালার সহিত কোলাকুলি করিয়া বসিয়া আছে, সবার উপর চিফ্ কমিশনার সাহেবের আবাস, ছাদ তাহার রাঙ্গা টাইলের। সেখানে একটী নিশান ওড়ে, চিফ্ অনুপস্থিত থাকিলে সে ইউনিয়ান্ জ্যাক্ নামাইয়া রাখা হয়। রসের পশ্চিম কোণে প্রায় সমুদ্রের কোলের মাঝে গোরা ব্যারাক বা ইউরোপীয় পল্টনের ছাউনী। কোন জাহাজ বন্দরে আসিতেছে সংবাদ আসিলে এই কোণে যে একটী উচুঁ খাম্বা আছে তাহার মাথায় লাল নিশান উড়ান হয়। বড় দিনে, রাজার জন্মদিনে বা ঐরূপ কোন রাজকীয় উৎসবে (State occasion) এ খাম্বা রঙ বেরঙের নিশানের মালা পরিয়া দাঁড়ায়।

দক্ষিণ আন্দামানে সর্ব্বাপেক্ষা তুঙ্গ শৃঙ্গটির নাম মাউণ্ট হ্যারিয়েট, এইটি হইল এখানকার শিমলা পাহাড় বা গ্রীষ্মাবাস। এই পাহাড়ের মাথার উপর অনেকগুলি বাঙ্গলা আছে, অসুস্থ হইলে বা বড় গরমের দিনে চিফ কমিশনার ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা এখানে আসিয়া দু'চার সপ্তাহ থাকিয়া যান। মণিপুর যুদ্ধের শাস্তি প্রাপ্ত কয়েদীরা রাজবন্দীরূপে তখন (State prisoner) এইখানে আছে, সরকার হইতে তাহারা থাকিবার বাড়ী ও কিছু জমিজমা পাইয়াছে এবং প্রতিমাসে মাসহারা ও দৈনিক সিধা (ration) পায়। (পরে শান্তি উৎসবে ও রাজঘোষণার ফলে ইহাদের মুক্তি হয়।) মাউণ্ট হ্যারিয়েট বনে বনময়, যেন এক বিশালদেহ ভল্লুক—লোমশ ভল্লুক থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতেছে। বনের কোথাও কালো গাঢ় নীল, কোথায়ও নিম বাঁশ তেঁতুলের ফিকা হরিতের জাল বুনানি এবং কোথায়ও কোথায়ও তামাটে পাতার রাঙ্গা। পাহাড়ের বুক কাটিয়া একটি রজতের ধারা স্রোতস্বিনী হইয়া নামিয়া গিরিরাজের পাদদেশ বেড়িয়া বড়িয়া সমুদ্রের সন্ধানে গিয়াছে; এ সাগর বুকে হারান বনটুকুর মধ্যে এই

বনচারিণী অমন করিয়া আকুল ব্যাকুল সোহাগে কাহার কাণে কাণে কি বলিতে চায় কে জানে ?

একটি ষ্টীম্ লঞ্চ্ আমাদের জন্য এক গাধা বোটকে (lighter) নাকে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া জাহাজে আসিয়া লাগিল। বড় ডাক্তার (Senior Medical officer), জেলার প্রভৃতি কত কর্ম্মচারী আসিল গেল, চারিদিকে মটর বোট, পানসী, গাধাবোট, ষ্টীম্ লঞ্চের একটা ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। এই ব্যস্ততার অবসরে একবার সেলুলার জেলের একটা মোটামুটি ধারণা করাইয়া দিই, নহিলে আনাড়ি পাঠককে লইয়া সে গোলক ধাঁধায় ঢুকিলে তাঁহার ব্যূহ-প্রবিষ্ট অভিমন্যুর দশা ঘটিবে।

জেলের রূপটা কতকটা এই রকম :—মানচিত্রের মাঝখানে একটী বিন্দু, সেটী একটী তিনতলা গুম্বজ বা মিনার, তাহাকে সেণ্ট্রাল টাওয়ার বলে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে যদি একটি বৃত্ত বা মণ্ডল আঁকা যায়, তাহা হইলে সেইটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বলা যাইতে পারে। কেন্দ্রস্থ সেই গুম্বজ হইতে সাতটি ঋজুরেখা বা ব্যাসার্দ্ধ সাতদিকে গিয়া মণ্ডলটীকে ছুঁইয়াছে,—এই সপ্ত রেখাই সাতটি মহল বা block, ইহারই নাম সেলুলার জেল। গুম্বজটি যেমন তিনতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলটি তিনতলা। প্রত্যেক তলে এক লাইনে পাশা পাশি বিশ ত্রিশটি করিয়া কুঠরী, কুঠুরিতে একটি করিয়া লোহার গরাদে আঁটা দরজা আছে, কবাট বা বন্ধ door leaf নাই, পিছনে সাড়ে চার হাত উচ্চে যে ছোট জানালাটী আছে তাহাও দুই ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক গরাদে আঁটা। ঘরে আসবাবের মধ্যে দেড় হাত চওড়া এক এক খানি নীচু তক্তপোস, আর ঘরের কোণে এক এক খানি আলকাতরা মাখা মাটির ভাঁড়। এই খাটে ঘুম হয় খুব সজাগ, কারণ একটু অনবধানে পাশ ফিরিলেই ধপাস্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া গিয়া অকস্মাৎ ভূমিশয্যা। আর ঐ আলকাতরা মাখা ভাঁড়টি জীবের বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান আনিবার অপূর্ব্ব যন্ত্র, কারণ ঐটিই রাত্রের শৌচাগার, আর চুরাশী রকম আসনের অনেকগুলি এই ভাঁড়টির সাহায্যে অভ্যাস হইয়া যায়। এগুলি জেল বন্ধ হইবার কিছু আগে বৈকালে ঘরে দিয়া যায়, আর সকালে মেথর সরাইয়া লয়।

আগেই বলিয়াছি কুঠুরীগুলি এক সারে, আর তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটি তিন চার হাত চওড়া বারাণ্ডা চলিয়া গিয়াছে। বারাণ্ডাটিও গরাদে ঘেরা, মাঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা,

এ দরজা খুলিবার নয়, খিলানে আঁটা। সব দালান গুলির মুখ মাঝের গুম্বজ বা গুমটিতে গিয়া যুক্ত হইয়াছে, এইখানে lineএ বা corridorএ প্রবেশ করিবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কুঠরীগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায়, তালা দিবার স্থান বাহিরে দেয়ালের গায়ে, ভিতর হইতে তালা বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্লক ত্রিতল; উপর তল উপর লাইন বা Upper Corridor, মাঝের তল বীচ লাইন বা Middle Corridor এবং নীচের তল নীচে লাইন বা Lower Corridor। রাত্রে প্রতি লাইনে চার জন করিয়া ওয়ার্ডার থাকে, ইহারা প্রহরী, প্রতি তিন ঘণ্টা এক জন করিয়া হরি্কেন লণ্ঠন হাতে লাইনের এমোড় ওমোড় ঘুরিতে থাকে এবং কুঠরীর দ্বিপদ পশুটা কি করিতেছে তাহা দেখিয়া যায়। সমস্ত জেলে সাতটি ব্লকের একুশটি লাইনে একুশ জন ওয়াডার পাহারায় এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের পালা ফুরাইলে অন্যকে জাগাইয়া দেয়; এইরূপে পালাক্রমে ৮৪ জনে মিলিয়া জেলে দুঃসাধ্য সাধনে নিশিভোর করে। গুমটিতে একজন পুলিশ সিপাহী লণ্ঠন হাতে অবিশ্রান্ত উপগ্রহের মত উপর নীচে ঘুরিতে থাকে, এক এক ব্লকের কাছে আসে আর সেই লাইনের ওয়ার্ডার হাঁকিয়া রিপোর্ট দেয়, "বিশ তালা বন্দ চার ওয়াডার সব ঠিক হায়।" এই পুলিশে ও লাইনের ওয়ার্ডারে ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ, কারণ ওয়ার্ডার বসিয়াছিল বা বাতি মাটিতে রাখিয়াছিল বলিয়া পুলিশ সান্ত্রী নালিশ করিলে ওয়ার্ডারকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। সেই ভয়ে তটস্থ ওয়ার্ডার বেচারী সিপাহী সাহেবের মন হরণ করিবার আশায় যে ছলা কলা হাব ভাব ও চাতুরী কৌশলের শরণ লয়, তাহার অর্দ্ধেক মুনিমনহারী মেনকা রম্ভারা জানিতেন কিনা কে জানে, জানিলে ঋষির কুল উজাড় হইতেন সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক ব্লকের সামনে খুব বড় উঠান আছে, তাহার মাঝে একটি করিয়া দিনে কাজ করিবার কারখানা, একপাশে জলের একহাত চওড়া, দশ বার হাত লম্বা চৌবাচ্চা বা হৌদি আর টিনের (Corrugated iron) পাইখানা। জেলের বাহিরে বাগানে সমুদ্রের ধারে এক পাম্প আছে, তার কিছু দূরে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা; পাম্পে সমুদ্রের জল তুলিয়া চৌবাচ্চায় ভরে, সেই জল নলযোগে সাতটি নম্বরের চৌবাচ্চায় যায়। এই জলে স্নান করা কাপড় কাচা চলে। খাবার জলের কল গুমটির কাছে আছে, প্রত্যেক নম্বরের পানিওয়ালা সেই কলের জল টিনে বা বালতিতে ভরিয়া রাখে। সমুদ্রের লবণজল ছাড়া ভাল জলের নাম "মিঠাপানি"।

পুলিশ সিপাহী ঘেরাও হইয়া আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া গাধাবোটে বসিলাম। তাহার পর ষ্টিম্ লঞ্চ আমাদিগকে এবার্ডিন জেটির দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ঘাট হইতে আমরা বেড়ি টানিতে টানিতে কুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ উটের সারির মত খাড়া চড়াই ভাঙিয়া সেলুলারের প্রকাণ্ড ফটকে আসিয়া ধন্না দিলাম। ফটকের দুইধারে আপিস ও গুদাম, ভিতর ফটক বাহির ফটক পার হইয়া ঢুকিতে দ্বারী (gate keeper) গুণতি করিয়া খাতায় আমাদিগকে জমা করিয়া লইল, সেই জমার খরচ লিখিল কিন্তু বার বৎসর পর। আমাদের একেবারে রাম বনবাসের দাখিল, লাভের মধ্যে ভাত রাঁধিয়া দিবার পতিবৎসলা সীতাদেবী ছিলেন না। আর অমন সুবোধ সুশীল ফলধারী লক্ষণ-ভাইই বা কোথায়? পক্ব কদলি আহরণ করিয়া আনিবার বানরযূথও নাই। তাহার পর রামচন্দ্রের ছিল বেকার দেশান্তর Simple deportation, আমাদের জন্য ব্যবস্থা হইল হাড় খাওয়া মাস খাওয়া চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজান—Hard labour; সুতরাং বনবাসের ওজনের হিসাবে আমরা অনেক বড় অবতার! এ কথা যাঁহারা না মানেন, তাঁহাদের বেশি নহে এক সপ্তাহ ব্যারি সাহেবের রাজ্যে ঘানি টানিয়া ছিলকা পিটিয়া আসিতে জোড়হস্তে আমাদের অনুরোধ, এক সপ্তাহেই বেশ টের পাইবেন; দুই বৎসর বাস করিলে আক্কেল দাঁত উঠিতে আরম্ভ করিবে; আর যদি দশ বৎসর থাকিতে পারেন তাহা হইলে গাধা পিটাইয়া যে সত্য সত্যই মানুষ করা যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ আর আদৌ থাকিবে না। অন্তত আমি দ্বীপান্তরবাসের মত এমন সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়ী আর কিছুই দেখি নাই। সত্য সত্যই, ইহার তুল্য কঠিন পরীক্ষাই যে ভগবানের শরণমঙ্গল রূপ।

গেট পার হইয়া আমরা বাগানের ধারে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলাম, আর সেইখানে ব্যারি (Mr. D Barry) সাহেবের ভাল করিয়া প্রথম দেখা পাওয়া গেল। কালাপাণিতে কয়েদীরা ইহাকে যে রকম ভয় করিত, ছাগলে বাঘকে তাহার অর্দ্ধেক ভয় করে কিনা সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে। ব্যারি সাহেব মোটা মানুষ, পেটটি তাঁহার ghee-fed মাড়োয়াড়ির ভুঁড়িকে লজ্জা দেয়; নাকবোঁচা ও রাঙ্গা, চক্ষু গোল গোল, খোঁচা খোঁচা গোঁফে কতকটা রক্তলোলুপ বাঘের ভাব আছে। তিনি আসিয়া এক লম্বা বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই রকম—"এই যে পাঁচিল দেখচো এ এত নীচু কেন জান? কারণ এখান থেকে পালান এক রকম অসম্ভব। চারিদিকে এক হাজার মাইল সমুদ্র, বনে কেবল শুয়োর আর বনবেড়াল ছাড়া কোন জানোয়ারই নেই বটে,

কিন্তু জংলী আছে, তাদের নাম জর্‌য়াওয়ালা; তারা মানুষ দেখবামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে চোখা চোখা তীর দিয়ে সাফ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আমায় দেখতে পাচ্ছ? আমার নাম ডি ব্যারি; সোজা ভালমানুষের কাছে আমি তার পরম হিতকারী, ব্যাঁকার কাছে আমি চতুর্গুণ ব্যাঁকা। আমার যদি অবাধ্য হও তা'হলে ভগবান তোমাদের সহায় হউন, আমি তো হব না সেটা একরকম স্থির; আর এই পোর্ট ব্লেয়ারের তিন মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না। এই সব লালপাগড়ি দেখচো, এরা ওয়ার্ডার, কালো উর্দ্দিধারী ওরা পেটি অফিসার (petty officer); এরা যা বলবে তা শুনবে, এরা কোন কষ্ট দিলে আমায় জানাবে, আমি ওদের সাজা দেব।"

তাহার পর আমাদের বেড়ি কাটা হইল, সকলের জন্য জাঙ্গিয়া (half pant), কুর্ত্তা (পিরাণ) ও সাদা কাপড়ের টুপি আনিল। এ আন্দামানী পালায় আবার নূতন করিয়া সেই বেশে সঙ সাজা দরকার, তাহাই হইল; সেই হাঁটু অবধি জাঙ্গিয়া হাতকাটা কুর্ত্তা আর খোট্টাই টুপিতে রূপ খুলিল, সর্ব্বাপেক্ষা রোগা সড়্‌কে তালপাতার সেপাই আমার বেশি। লজ্জায় মনে হইতে লাগিল, "মা ধরিত্রী, তুমি কি সেই ত্রেতাযুগের অভ্যাস ভুলে গিয়েছ? আর একবার দ্বিধা হও মা, আমাদের এ দগ্ধ মুখ একটু লুকাই। আমি জনকনন্দিনী সীতা নই বটে, কিন্তু আমার লজ্জা যে প্রায় শ্রীরামজীবনের মত তেমনি প্রাণান্তক।" মা ত দ্বিধা হইলেন না, আমরা তদবস্থায়ই স্নান করিতে গেলাম; বাকি লজ্জাটুকু যাহা ছিল সেখানে গিয়া তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইল। স্নান করিতে যে কৌপীন বা ল্যাঙ্গোট দিল তাহাতে লজ্জা নিবারণ কোন রকমেই হয় না। কাপড় ছাড়িতে গিয়া আমাদের দশা হইল কৌরব সভায় অপমানিতা দ্রৌপদীর মত, বুঝিলাম "পড়েছি মগের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।" কি করা যায়? মাথা হেঁট করিয়া কোন রকমে স্নানপর্ব্ব সারিতে হইল; বুঝিলাম এখানে ভদ্রলোক বলিয়া কোন বস্তু নাই, মানুষও বুঝি নাই; আছে কেবল কয়েদী। প্রত্যেককে এক একটি মরচে ধরা লাল লোহার থালা ও বাটি দিল. তাহাতে আবার তেলমাখা, থালা তো সাফ হইলই না, উপরন্তু তেল আর রং মিশিয়া একটা পুরু লাল কাই হাত দু'টাকে বড় প্রেমে আঁকড়িয়া ধরিল। সে বন্ধন আর ছাড়ে না। যাহা হোক হাত ঘাসে মুছিয়া কোন রকমে ভাত খাইতে বসিলাম। খাইতে দিল টিনের কৌটায় (ডাব্‌ব্‌) করিয়া এক কৌটা ভাত, অড়হরের ডাল আর দুইখানা রুটি। চার দিন খোট্টাই ধরণে চিঁড়া

ও ছোলা সেবা করিবার পর সে যে কি অমৃত বোধ হইল তাহা বলিয়া বুঝান দুষ্কর।

খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে আমাদের পাঁচ নম্বর ব্লকে লইয়া গিয়া মাঝে তিন চার কুঠুরি বাদ দিয়া এক এক জনকে বন্ধ করিল। আমরা রহিলাম উপরতলায় Upper Corridorএ, আমাদের জন্য সে নম্বরটি একেবারে খালি করা হইয়াছিল, যাহাতে সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে এ নবাগতদের কোন সম্পর্কই না থাকে। জেলের ওয়ার্ডার দিগের পাহারা প্রত্যহ বদলী হয়, আজ যে পয়লা নম্বর উপর লাইনে পাহারা দিতেছিল, সে হয়ত কাল দুই নম্বর কি পাঁচ নম্বর মাঝের লাইনে দিবে। আমাদের জন্য যে যাব জন ওয়ার্ডার পাঁচ নম্বরে আসিল, তাহারা একেবারে সেইখানে আটক পড়িল, পাণিওয়ালা, মেথর কেহই সে নম্বর হইতে বাহিরে পা বাড়াইতে পাইত না। ওয়ার্ডার পেটি অফিসার দেওয়া হইয়াছিল বাছিয়া বাছিয়া সব পাঠান আর একজন বর্ম্মী (Burmese)। তাহারা আমাদের ঘরে পুরিয়া তালা দিল, এবং আমরাও দিব্য আরামে শুইয়া কড়িকাঠ গণনায় মনোনিবেশ করিলাম।

পাঁচ নম্বরে এক এক corridorএ ২৬টা করিয়া cell, সুতরাং তিনটি তলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮টি সেল্ বা কুঠুরি। জেলের সব মহল গুলিতে সেলের সংখ্যার অনুপাত এই রকম,—

ব্লক নম্বর	প্রতি লাইনে সেলের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১	৩৫	১০৫
২	৩৫	১০৫
৩	৫২	১৫৬
৪	২২	৬৬
৫	২৬	৭৮
৬	২০	৬০
৭	৪০	১২০

সমস্ত জেলে মোট কুঠুরির সংখ্যা ৬৯০, এ জেলে কয়েদী থাকিবার ব্যারাক নাই, সব গুলিই cell; তাই জেলের নাম সেলুলার জেল।

জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান মারে (Captain Murray) বেলা একটা কি দুইটার সময় আসিয়া একবার বন্ধ দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে একচোখ দেখিয়া গেলেন। মানুষটি গোঁপ দাড়ী কামান, বেঁটে, নীলচক্ষু, মনে হইল বড় চতুর। মাঝে একবার কামার আসিয়া আমাদিগের গলায় এক একটি

গো-ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিয়া গেল। অন্যান্য জেলে কয়েদী প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদের এক একটি নম্বর হয়, এখানেও তাই। একটি কাঠের দুই ইঞ্চি চওড়া তিন ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি মোটা তক্তিতে প্রত্যেক কয়েদীর নম্বর, দফা (Section), সাজার তারিখ ও সাজার বৎসরের সংখ্যা লেখা থাকে। তিন রকম তক্তি আছে, সিধা বা সোজা তক্তি, গোল তক্তি ও তিনকোণা তক্তি। ৩০২ দফার খুনী আসামী এখানে চারকোণা সিধা তক্তি পায়; ডাকাত বদমায়েস রাজবিদ্রোহী বা দুর্দ্দান্ত খুনে গোল ডিম্বাকার তক্তি পায়; আর যাহারা পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পালায় তাহারা সে কুকর্ম্মের পর ধরা পড়িলে তিনকোণা তক্তি পায়। গলায় একটা লোহার রিং পরাইয়া তাহাতে তক্তি টাঙান থাকে; মান্দ্রাজ জেলে টিনের মেডালের মত নম্বর বুকের উপরে কুর্ত্তার গায়ে আঁটা থাকে, পোর্ট ব্লেয়ারে কিন্তু এই গো-ঘণ্টার দুর্ভোগের ব্যবস্থা। বেলা চারটার সময়ে তালা খুলিয়া আমাদিগকে উঠানে লইয়া গেল, সেখানে শৌচ স্নান সারিয়া আমরা থালা বাটি সাজাইয়া দিয়া ঘরে গিয়া বন্ধ হইলাম। তাহার পর রাঁধুনীর (ভাণ্ডারী) দল আসিয়া পাতে পাতে ভাত, ডাল, রুটি দিয়া গেল, আমরাও বাহির হইয়া খাইতে বসিলাম। অন্য কয়েদীরা কাজ কর্ম্ম সারিয়া স্নান করিয়া নিজেরা সার বাঁধিয়া বসে, ভাত লয়; আমাদের কিন্তু সে স্বাধীনতা ছিল না। তখন প্রথম বম্ কেস্, আমরাই প্রথম এনার্কিষ্টের দল, এক পাল নূতন বুনো বাঘের মত ভয়ের জিনিস; তাই আমাদের লইয়া এত আট ঘাট বাঁধা, এত তালা চাবি আইন কানুনের পালা। আমরাও তখন তটস্থ, সদা প্রাণ বাঁচাইতে যে কি পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত তা' কে বোঝে? সে সময়ে আন্দামানে জেল কর্ম্মচারীদিগের ও আমাদিগের এই উভয় পক্ষের অবস্থা অতি অপূর্ব্ব! তাঁহারা আমাদিগকে ভয় ও উৎকণ্ঠার চক্ষে দেখেন, আমরাও সেখানকার রাজকুলকে 'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং' ভাবিয়া ঠিক সেই চক্ষে দেখি। আবার জেলকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সে ভয়ের ভাব গোপন করিয়া মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে সদা ব্যতিব্যস্ত; তাই মুখে এত ধমক চমক—বাহিরে এত বেপরোয়া devil-me-care ভাব। আমরাও পেট্রিয়টের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে ঠিক অমনি উন্মুখ, তাই সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে সাহেবের কাছে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিতে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতাম। জেলার হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট খাট পেয়াদাটি অবধি আমাদিগকে কথায় কথায় আইন শুনায়, চোখ রাঙায় এবং অনবিস্তর তাড়া করিয়া আসে,—সেটা কিন্তু নিতান্তই প্রাণের দায়ে; কারণ তাহারা ভাবে, "বেটারা যে দুর্দ্দান্ত ও পাজী, যদি কোন অনর্থ ঘটাইয়া বসে।" আমরাও ক্ষণে চক্ষু রক্তবর্ণ

করি, আবার পরক্ষণেই আইনের উদ্যতদণ্ড রুদ্র রূপের তাড়নায় নিতান্ত নিরীহ ভাব ধরি; সে সকলও একান্তই গত্যন্তর অভাবে, কি জানি এ মগের মুলুকে প্রাণ বাঁচাইতেই যেরূপ প্রাণান্ত, তাহাতে কর্তব্য স্থির করা এক রকম অসম্ভব।

পর দিন প্রাতে বাহির হইয়া মুখ হাত ধুইয়া প্রথম গঞ্জির দর্শন লাভ ঘটিল। গঞ্জি বা কাঞ্জি মানে জলে চাউল গলাইয়া ফেনে ভাতে—এ এক প্রকার rice porridge। নারিকেল মালার আধখানায় বেতের হাতল লাগাইয়া হাতা তৈয়ার হয়, তাহার নাম ডাব্বু। এই ডাব্বুর এক এক ডাব্বু গঞ্জি সকলকে দিয়া গেল। তাহাতে না আছে লবণ, না আছে কোন আস্বাদ। প্রত্যেক কয়েদীর জন্ত নিত্য ১ ড্রাম লবণ বরাদ্দ আছে, তাহা ডালে ও তরকারীতে দেওয়া হয়, গঞ্জির জন্ত লবণের বরাদ্দ নাই। বিস্বাদ হইলেও তাহাই অগত্যা পরম ধৈর্য্যের সহিত গিলিতে হইল। আলিপুর জেলে ইহার নাম লপ্সি, কিন্তু তাহাতে আস্বাদ আছে; কারণ তাহা কখন গুড় দিয়া এবং কখন বা ডালের সহিত খিচুড়ির মত তৈয়ার করা হয়। আমাদিগকে সাত দিন কোয়ারাণ্টাইনে বন্ধ রাখা হয়। তাহার পর হাঁসপাতালে নূতন চালানের ডাক্তারী হিসাবে পরীক্ষার পালা—medical inspection আসিল; এই খানেই প্রথম ভাগ্যনির্ণয়। মারে সাহেব পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকের টিকিটে (Jail History Sheet) লিখিয়া দিলেন, কে কে কঠিন বা হালকা কাজের লায়েক বা উপযোগী। ডাক্তার সাহেবের 'Good Physique, fit for hard labour" বা "Poor Physique, fit for light labour" এই সব মন্তব্য দেখিয়া পরে জেলার ব্যারী সাহেব কাহার কি কাজ তাহা ধার্য্য করিয়া দেন। পরীক্ষা ও কাজ ধার্য্য না হওয়া অবধি সাত আট দিন আমরা নারিকেল কাতার দড়ি পাকাইয়াছিলাম।

জেলখানার একদল কয়েদী নারিকেল ছোবড়া জলে ভিজাইয়া কুটিয়া তাহা হইতে আঁশ বাহির করে, এই আঁশ বা তার হইতে অন্ত light labourএর দলকে দড়ি পাকাইতে হয়।

আঁশ দিয়া তিন পাউণ্ড রসি বা দড়ি পাকাইয়া দিতে হইবে, এই গেল রসিওয়ালার কাজ।

দড়ি পাকান নারিকেলের খোসা পেটান এ সব কাজ আমরা তো কখন করি নাই, আমাদের ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও যে কেহ কখন ইহার নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই সে কথা একরকম নির্ভয়ে একবুক গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলা যায়। প্রথম দিনটা সবাইকে দড়ি পাকাইতে হইল। আমাদের প্রত্যেকের ঘরের বন্ধ দরজায়

কাছে এক এক অাঁটি ছিলকা বা নারিকেল ছোবড়ার তার ফেলিয়া দিয়া গেল, বলিয়া গেল, "হসৃসি বাটো" অর্থাৎ কি না 'যা-পায় তাই খায়' সেইরূপ শান্ত ছেলের মত দড়ি পাকাও। সে গুলাকে খুলিয়া লইয়া তো নাড়িয়া চাড়িয়া যে যাহার মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। ইহার দড়ি। তাও কি হয়? সেই যে চার জন ওয়ার্ডার ছিল তাহারা প্রাইভেট টিউটার হইয়া আসিল শিখাইতে। অল্প অল্প তার লইয়া দুই হাতে মাটিতে ঘসিয়া পলিতা পাকাইতে দেখাইয়া দিল। পলিতা যখন স্তূপাকারে জমা হইয়া উঠিল, তখন সেই গাদা পাশে রাখিয়া দু'হাতে দু'খানা পলিতা ধরিয়া তাহার এক কোণ পায়ের বুড়া আঙ্গুলে মাটিতে চাপিয়া হাতের ঘর্ষণে পাক দিতে হয়, পলিতা পাকাইয়া দড়ি হইয়া ফুরাইয়া আসিলে আবার নূতন পলিতা তাহার মুখে জুড়িয়া—দে পাক দে পাক। যতই দড়ি লম্বা হইয়া চলে তাহাকে পিছনে টানিয়া ফেলিয়া শেষ মুখটা পায়ের তলায় রাখিয়া আবার পলিতা জুড়িয়া পাকাইয়া যাওয়া, এই হইল ব্যাপারখানা। বলিয়া তো একরকম বুঝাইলাম, করা যে প্রথম প্রথম কি পর্য্যন্ত অসাধ্যসাধন তাহা কেবল ভুক্তভোগীই জানে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চচ্চড় করে, আমাদেরও সেই দশা। দড়ি ছ্যাকড়া গাড়ীর বেতো ঘোড়ার পায়ের মত কোথায়ও মোটা কোথায়ও সরু আর শোঁয়া পোকার মত লোমশ এক অদ্ভুত শ্রী ধারণ করিতে লাগিল। সে দড়ি দেখিয়া সরকার বাহাদুর দূরে থাক আমরাই হাসিয়া খুন আর কি।

পরে দেখিয়াছি অভ্যাস একবার হইয়া গেলে হাত কলের মত চলে, আর সর্ সর্ সর্ সর্ করিয়া পাতলা মোলায়েম দড়ি বাহির হইয়া পিছনে গাদা হইতে থাকে। অভ্যাসে যে কাজ এত সুখকর ও সহজ, অনভ্যাসে তাহারি দুঃখ বিরক্তি যে কি রকম তা, বলিয়া বুঝান দুষ্কর। সে দিন কাহারও দড়ি হইল দশ হাত, কাহারও বা পাঁচ হাত, কাহার বা আধ পোয়া; কেবল উপেন গৃহিনীদের বেণীর মত একটি দেড় দু' হাতের মোটা বিউনি পাকাইয়াছিল। সে দিন উপেনের উপর আর কেহ যায় নাই, কারীগরীর এমন সহজাত জ্ঞান সচরাচর দেখা যায় না। আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি দড়ি পাকাইয়াছিলাম বলিয়া কি না উপেন বলিল, "তবে তুমি ঘরে লুকিয়ে পাকাতে।" যেন আমি—ঘোষবংশ মহাবংশের এহেন আমি একটা ডোম টোম আর কি। কথাটার ভঙ্গি দেখিয়া বড় চটিয়া গিয়াছিলাম। কি করি শ্রীঘর যে। দাঁত বাহির করিয়া সে কিল চুরি করিতেই হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঁচ নম্বরে খোয়েদাদী আমল।

আমরা দশ জনে প্রায় ছয় মাস পাঁচ নম্বরে একত্র থাকি। সাত দিন কোয়ারাণ্টাইনে বন্ধ থাকিবার পর আমাদের সহিত একদল মাদ্রাজীকে আনিয়া বন্ধ করা হয়। ইহারা ছয় মাস জেল-বন্ধ ছিল, ইহারাও অন্যত্র গতাগতি-রহিত-দশায় আমাদেরই সহিত পাঁচ নম্বরে থাকিয়া দড়ি তৈয়ার করিত। তাহার মধ্যে নাগাপ্পা ও চিনাপ্পা আমাদিগের বিশেষ বন্ধু ছিল; নাগাপ্পা ছিল জাতিতে ও পেশায় নরসুন্দর, চিনাপ্পা এই মাদ্রাজী দলে বয়সে কনিষ্ঠ ও বড় সৎস্বভাবের ছেলে ছিল। তাহাকে আমরা সকলে বড় ভাল বাসিতাম। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের দড়ি পাকান-রূপ দুঃসাধ্যসাধনটা সহজ করিয়া দিত। চিনাপ্পা এখন টিকিট পাইয়া স্বাধীন ও উপার্জ্জনক্ষম (Self-Supporter) হইয়াছে,—সেলুলার জেলের দেশী ডাক্তারের (Hospital Assistant) বাড়ীতে চাকুরী করে। নাগাপ্পা আর ইহ জগতে নাই।

এই মাদ্রাজী দল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে settlementএ যাইতে না যাইতে আর এক দল ১২১ দফার বর্ম্মী চালান আসিয়া পড়ে। ১২১ দফার (section) অপরাধ রাজদ্রোহ, বর্ম্মাদের মৌলবী বা পুরোহিতের নাম ফুঙ্গী; ব্রহ্মদেশে এই ফুঙ্গীরা এক একটা জাল রাজা খাড়া করিয়া লোক ক্ষেপাইয়া পুলিশ থানার উপর আক্রমণ করাইয়া থাকে। এই বর্ম্মাদলকে আমাদের অসূর্য্যম্পশ্য সঙ্গী করিয়া পাঁচ নম্বরে রাখা হইল। আমাদিগের অদৃষ্টে সেই প্রথম দাড়িগোঁফহীন উল্কিপরা কটা কটা বর্ম্মা দর্শন। তাহাদের মধ্যে এক আধ জন হিন্দি জানিত; এবার দড়ি পাকানয় আমরাই গুরু, ইহারা চেলা। ইহাদের অনেকে ছিলকা কুটিত। আমরা এই দড়ি ও ছিলকা শাস্ত্রে অজ্ঞ আনাড়ির দলকে পাইয়া এক চোট মোড়লীর ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া লইলাম। অনন্যোপায় সহজে কৃতজ্ঞ তাহারাও আমাদিগের পরম ভক্ত হইয়া পড়িল। মাদ্রাজীদের "আইয়া স্বামী" "ইঙ্গে য়া" কণ্ডু কণ্ডু পো" প্রভৃতি শ্রুতিমধুর বড় বড় শব্দ এক রকম সহিয়া গিয়াছিল, এখন আবার বর্ম্মাদের এই অভিনব আনুনাসিক ভাষায় তো আমরা অবাক্। তাহাদের দুই চারটা যাহা না হইলে চলে না, এমন আটপৌরে বুলি মুখস্থ করিয়া ব্রহ্ম ভাষায় Jack হইতে আমাদের আবার কিছু সময় লাগিল।

এই রকমে প্রায় ছয় মাস কাটিবার পর ক্যাপ্টেন মারে দুই বৎসরের ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। শুনিলাম, তিনি তাঁহার গৃহলক্ষ্মীশূন্য আলয়ের জন্য

একটি লক্ষীর সন্ধানে স্বদেশে যাইতেছেন। তিনি থাকিতে আমাদের অনেক সুখ ছিল, ছিলকার অধিক শক্ত কাজ কখন পাই নাই, তিনি হাসিয়া মিষ্টালাপ করিলে এই নিঃসহায় স্বজনহীন জীবন কতকটা বহনীয় হইত, ব্যারি সাহেবের দাপট তাঁহার শাসনে প্রায় মৌখিক ধমক মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। তবে দুঃখ যাহা হইয়াছিল তাহা নিতান্তই অদৃষ্ট বশে, তাহার জন্ম কোন ব্যক্তি বিশেষ দায়ী না হইয়া অধুনাতন জেলবিধিই প্রকৃতপক্ষে দায়ী, আর দায়ী পোড়া বিধি। জেলার সাহেবের হুকুম ছিল, গোলাওয়ালা কয়েদীরা পরস্পর আলাপ না করে। সেই জন্ম উঠিতে বসিতে খাইতে পরিতে আমাদিগকে যথাসাধ্য পৃথক রাখা হইত। পাঁচ নম্বররূপ একটা সঙ্কীর্ণ বটপত্রের উপর দশ জনকে একত্র রাখিয়া আবার পৃথক রাখা যে কি পর্য্যন্ত অসাধ্যসাধন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে এ দুঃসাধ্যসাধক এক পেটি অফিসার জুটিয়া ছিল,সে জাতিতে পাঠান, নাম খোয়েদাদ্ খাঁ। আমরা দশ জনেই হিন্দু, হিন্দু পেটি অফিসার ও ওয়ার্ডার সহানুভূতি দেখাইতে পারে, এই ভয়ে আমাদের সব কয়টি ভাগ্যবিধাতা পেটি অফিসার ও ওয়ার্ডার ছিল হিন্দুস্থানী, মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমান এবং পাঠান। পাঠান মানে সহজ কথায় মেওয়াবেচা কাবুলীওয়ালা। পোর্ট ব্লেয়ারে ইহারা যমের দোসর; ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। নিজেরা যেমন অলস কর্ম্মভীরু ও কলুষিতচরিত্র, তেমনি পরকে খাটাইতে ওস্তাদ ও দুর্দ্দান্ত।

পাঠানের মধ্যে আবার পাঠানের রাজা খোয়েদাদ খাঁ, চেহারাটি বড় হৃদ্‌-রোগজনক ;—বেঁটে, লোমশ, ঘাড়ে গর্দ্দানে, কালো চাঁপ দাড়ী, বড় বড় বাঁকা দাঁত, ভ্রূ জোড়া, উচ্চ নাশা, মেজাজ তিরিখ্‌খি, হাতে লগুড়। এত গুণ দিয়াও বিধি ক্ষান্ত হয়েন নাই; খোয়েদাদ আবার অসম্ভব রকম কানুনী অর্থাৎ বিধি নিষেধের পক্ষপাতী! তাহার রাজ্যে জোড়া বিনা একা চলিবার উপায় একেবারেই নাই, জোড়া ছাড়িয়া অনবধানতায় এক পা পিছাইলেই তীব্রদৃষ্টি খাঁ সাহেব উদ্যত-লগুড়, তখন কাজেই দন্ত বাহির করিয়া বিনয়নম্র সোহাগে "হাঁ জী, জমাদারজী কসুর হো গিয়া" বলিয়া যথাসাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত সেই ক্ষণিক পরিণয়ের সাথীটিকে আঁকড়িয়া ধরা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিত না। অন্ত নম্বরে জেলে জেলার বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিলে এবং সান্ধ্য প্যারেডের সময়ে জোড়া হইতে হয়, খোয়েদাদের মগের মুলুক পাঁচ নম্বরে কিন্তু "Nothing in this world is single" শেলির এই যে বেদবাক্য তাহা সদা প্রত্যক্ষ হইত।

শুধু জোড়া জোড়ার বিধি হইলে ত বাঁচিতাম, উপসর্গ শুধু ঐখানে শেষ হয়

নাই। সারে সারে জোড়া জোড়া গিয়া "খাড়া হো যাও" রবে শ্রীরাধার মত থমকিয়া দাঁড়াইতে হইবে, "কাপড়া উতারো" রবে কাপড় ছাড়িয়া লেংটি পরিতে হইবে, "পাণি লেও" রবে বাটীতে করিয়া ঝপঝপ মাথায় জল দিতে হইবে। এই ত গেল স্নান পর্ব্ব। শৌচ পর্ব্বও তদ্বৎ, সারবন্দী দশায় জোড়া জোড়া পাইখানামুখো হইয়া বসা, আর হুকুমে হুকুমে এক একবার আট জন দশ জন করিয়া যাওয়া; যতক্ষণ না আদেশ হয় ততক্ষণ সংযম অভ্যাস করা। আবার সব চেয়ে ফ্যাসাদ সান্ধ্য প্যারেডে। প্রথম তো জোড়া জোড়া বসা, প্রতি দুই জোড়া গোলাওয়ালার মাঝে দু'তিন জোড়া বর্ম্মা বা মাদ্রাজী জোড়ার আড়াল চাই, যাহার সহিত জোড়া বাঁধিব সেও মাদ্রাজী বা বর্ম্মা হওয়া চাই। আমরা এই নিয়মে একবার বসিতে পাইলে নববধূর মত লাজরুদ্ধ অনুচ্চ স্বরে খাঁ সাহেবের দৃষ্টি এড়াইয়া গল্প করিতাম, সুখের মধ্যে কোন আফিসার উপস্থিত না থাকিলে খাঁ সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না।

ব্যারি সাহেব আফিস হইতে জেলের দিকে যাত্রা করিবামাত্র সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া যাইত, কয়েদীরা সকলে সন্ত্রস্ত সচকিত অবস্থায় যে যাহার স্থানে নিতান্ত সুবোধ সুশীল সাজিয়া বসিত, ওয়ার্ডার বা পেটি অফিসারও কাঠের মত নিশ্চল-ভাবে খাড়া থাকিয়া সেলামের জন্য হাত তৈয়ার রাখিত। ব্যারি সাহেব জেল বন্ধ করিতে আসিয়া গুমটিতে (Central Tower) একবার ঘুরিতেন, যখন যে নম্বরের সামনে আসা অমনি সরকার' রব, আর কয়েদীর পাল স্প্রীংএর পুতুলের মত এক সঙ্গে তড়াক্ করিয়া খাড়া হইয়া উঠা, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডার পেটি অফি-সারের মিলিটারী দস্তুরে সেলাম। যদি সকলে ঠিক একসঙ্গে উঠিয়া থাকে তাহা হইলে তো সে দিনকার মত রক্ষা, "বৈঠ যাও" হুকুম পাইয়া সকলে নিরাপদে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু যদি একজন কি দুজন একটু দেরি করিয়া উঠিল তবে আর রক্ষা নাই, "সরকার," "বৈঠ যাও", আবার "সরকার" "বৈঠ যাও" এমনি মুহুর্মুহু উত্থান ও পতন, কেবল মূর্চ্ছা হইতে বাকি আর কি! আমরা কুম্ভকর্ণ বা মহিষাসুরের গর্জ্জন কখন শুনি নাই, কিন্তু তাহা যেমনি হউক ব্যারি-সাহেবের ক্রুদ্ধ চিৎকারের কাছে তাহা কপোত কপোতীর কূজন মাত্র; এ বিষয়ে যাহার সন্দেহ আছে তাঁহাকে কেবল এইটুকু বলিবার আছে যে অন্ততঃ পলিটিক্যাল ডাকাতি করিয়া ব্যারি সাহেব সবল সুস্থ থাকিতে থাকিতে একবার পোর্ট ব্লেয়ার গিয়া সে জীমূতনাদ শুনিয়া আসা উচিত ছিল, এখন আর তাহা হয় না। সে রবের বিষয় আর কি বলিব ঋষির কথায় শুধু বলিতে হয়—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবৎ কশ্চিদেনং শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেবং বেদ নচৈব কশ্চিৎ॥

যদি কেহ ভাবেন আমি ব্যারি সাহেবের নিন্দা করিতেছি তাহা হইলে বড় ভুল বুঝিবেন। সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দ্দান্ত খুনী ডাকাত জুয়াড়ী বদমায়েস লম্পটের জমায়েৎ ভারতের শত শত জেলে হয়। আবার তাহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া অতি দুর্দ্ধর্ষ অপরাধীর দল আসে পোর্ট ব্লেয়ারে এরূপ কুকুরের শাসনের জন্য ব্যারি সাহেবরূপ মুগুর যে আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলে রাখিয়া কয়েদীকে-যদি বর্ত্তমান কারাপদ্ধতির হিসাবে শুধু ভয় আর শাসনের চাপে ভাল রাখিতে হয়, তবে ব্যারি সাহেব বিনা গতি নাই। কিন্তু আমাদের কয়েকটি গরীবের পক্ষে ব্যারি সাহেবের মুষ্টিযোগ প্রয়োগটা অন্ততঃ আমাদের মতে তো লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

ব্যারি তবু তো পদে আছে, সে মুষ্টি যোগের উপর আবার খোয়েদাদী বজ্র যোগ। প্রাণান্ত আর কি? যখন তালাসী বা কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া দেখার সময় হয়, তখন তিন বার 'ঠন্ ঠন্ ঠন্" "ঠন্ ঠন্ ঠন্" করিয়া ঘণ্টা পড়ে, অন্য নম্বরে কয়েদীরা তৎক্ষণাৎ "খাড়া হো যাও" রবে দাঁড়াইয়া কাপড় খুলিয়া রাখিয়া তালাসি (search) দেয়, আবার "উঠায় লেও" রবে কাপড় তুলিয়া লইয়া পরিয়া "বৈঠ যাও" হুকুম পাইলে বসিয়া যায়। কিন্তু এ অবস্থায় কানুনী খোয়েদাদের ব্যবস্থা ইহার উপর আরও সাড়ে ছাপ্পান্ন রকম। প্রথমে "খাড়া হো যাও", তাহার পর "সিধা এক লাইনসে খাড়া হো যাও", তাহার পর "কাপড়া উতারো", তাহার পর "হাত মে বাখো", তাহার পর "কদম উঠাও", তাহার পর "রাখ দেও"। প্রথম হুকুমে আমরা দাঁড়াইলাম; দ্বিতীয় হুকুমে এ উহার দিকে দেখিতে দেখিতে ঘেঁসাঘেঁসী এক লাইন হইলাম; তৃতীয় হুকুমে কুর্ত্তা ও টুপি খুলিলাম; চতুর্থ হুকুমে তাহা এক হাতে ধরিয়া সম্মুখে হাত লম্বা করিয়া দিলাম, পঞ্চম হুকুমে এক পা তুলিয়া নৃত্যকুশলা বাইওয়ালীর ঢঙে দাঁড়াইলাম, এবং ষষ্ঠ হুকুমে এক পা আগাইয়া গিয়া মাটিতে কাপড় রাখিয়া দিলাম। যদি ঠিক হইল তাহা হইলে খাঁ সাহেব ভাঁঙা বাঁকা দাঁতে দাড়ীর জঙ্গলমহাল আলোকিত করিয়া মহোৎসাহে বলিলেন, "সাবাস্ বাহাদুর!" আমরাও প্রাণের দায়ে তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য যে যাহার দু'পাটি দাঁত বাহির

করিয়া পুলক হাস্তে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলাম। এমনি সাড়ে ছাপায় হুকুমের পর বসিয়া পড়িয়া তিসরা ঘণ্টী বা তৃতীয় ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, এই ঘণ্টা বাজিলে যে যাহার গোয়ালে গিয়া উঠিব, তাহা হইলে ব্যাঘ্রের মত খাঁ সাহেবের সম্মুখস্থ হইতে প্রাণ রক্ষা হয় আর কি।

দড়ি পাকাইলে খাঁ সাহেবের মন পাওয়া দায়, হাতে তুলিয়া হয় তো বলিলেন, "মোটা হায়। সরম লাগতা নেহি?" ছিলকা হাতে লইয়া দাঁত খিঁচাইয়া হয় তো টিপ্পনি হইল, "এই বাঙ্গালী কচড়া হায় (অর্থাৎ নোংরা ভুসা ভরা), গিলা শুখাও (জল শুখাও)।" খাঁ সাহেবের মন পাইবার জন্ত আমরা না করিতাম এমন কর্ম্ম নাই। খোয়দাদ ব্যারী সাহেবকে যমের অধিক ভয় করিত, ব্যারি সাহেব জেলের দিকে আসিতে আরম্ভ করিলে সে কি বিড় বিড় করিয়া "বিসমিল্লা" নাম জপ করিতে লাগিয়া যাইত। কয়েদীদিগের মধ্যে মোল্লা ও নমাজী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। আমরা প্রাণপণে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতাম, মুসলমান হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জানাইতাম, খোয়দাদের উচ্চ হৃদয় ও মানুষ চরাইবার ক্ষমতার তারিফ করিতাম, আর শুনিতে শুনিতে আনন্দে খাঁ সাহেবের প্রায় দশাপ্রাপ্তি ঘটিত। আমি ও অবিনাশ convalescent gangএ ছিলাম, এই কনভ্যালেসেণ্ট দলে নাম লিখা হইলে মাথা পিছু ১২ আউন্স দুধ পাওয়া যায়। আমি আমার দুধ লুকাইয়া মাঝে মাঝে খাঁ সাহেবকে দিতাম, খাঁ সাহেব তাহা দুই একবার আমতা আমতা করিয়া লইতেন এবং পরম পরিতোষ পূর্ব্বক পান করিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে দন্ত বাহির করিয়া বলিতেন, "ইন্না বিসমিল্লা। খোদানে কেয়া আজব চিজ বনায়া হ্যায়।" বলা বাহুল্য এই দুধটুকু আমার ঘুষ, এই উষ্ট্রভোজী কাবুলী দুর্ব্বাসার ক্রোধশান্তির কামনায় অর্ঘ্য।

ব্যারী সাহেব যেমন দুর্দ্দান্ত ছিলেন তেমনি আমাদিগের উপর কৃপাপরবশও ছিলেন। নিত্য সকালে জেলে রোঁদে ঘুরবার সময় একবার এবং বৈকালে জেল বন্ধের (Lock up time) সময়েও একবার হেলিতে দুলিতে বম্মাচুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে লাঠি বগলে আসিয়া জনে জনের সহিত গল্প গুজব করিয়া যাইতেন। তিনিও বুঝিতেন এবং আমরাও বুঝিতাম যে এই মেহেরবাণীর ফলে আমাদের উপর পেটি অফিসার ও ওয়ার্ডার দলেরও কতকটা নেক নজর পড়িত। সাহেব গল্প করিয়া সমানে সমানে ইয়ারকি দিয়া যায়, তবে বাবুজীরা এক একটা কেও কেটা হবে, এই খাতির বা prestige থাকায় আমাদিগের

উপর কদর্য্য অপমানকর গালি ও প্রহারটা তেমন হয় নাই। সেটা সাধারণ কয়েদীর একচেটে নিত্যকার অধিকার ছিল। আমরা দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে কাহিল হইতাম মাত্র, জেলার ও 'সুপার্ডেণ্ট' সাহেবের সহিত "পাণিকা মাফিক" হরদম ইংরাজি বলার সম্রমে তাহাদিগের শ্রদ্ধাবনত লগুড়ের আস্বাদন আমাদিগকে সচরাচর বড় একটা করিতে হয় নাই।

ব্যারি সাহেবের মেয়ের নাম ক্যাথলিন, স্ত্রী জন্ম খোঁড়া, একটা পা স্বভাবতঃ কিছু ছোট। সেলুলার চিড়িয়াখানার এই আজগুবি নূতন চিঁড়িয়া গুলিকে দেখাইবার জন্য সাহেব মাঝে মাঝে সস্ত্রীক সকন্যা আসিতেন, আর আমরা সেই খালি পায়ে জাঙ্গিয়াকুর্ত্তাটুপীধরা দশায় গলায় কাঠের গো ঘণ্টা দোলাইয়া অপূর্ব্ব সঙরূপে মেম সাহেবদের কাছে স্মিতহাস্যে দাঁড়াইতাম। সাহেব বোধ হয় অকপটে ভাবিতেন সত্য সত্যই বড় কৃপা করিতেছেন, আমরা মরমে মরিয়া যে দুঃসহ লজ্জার কশাঘাত নীরবে নির্ব্বিবাদে সহিয়া দর্শন দিতাম, তাহা বুঝিতাম কেবল ভুক্তভোগী আমরাই। ব্যারী সাহেবকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম সাহেব কৃপা করিতেছেন করুন, অরসিকে রসের নিবেদনে আর ফল কি?

কি যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে
দংশেনি যারে।

এই সময়ে সেলুলার জেলে কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইবার মুন্সী ছিল গোলাম রসুল। এই ভবচিঁড়িয়াখানায় সে আর একটি অপূর্ব্ব চীজ্। কালো, রোগা, কদাকার, দীর্ঘদন্ত, অত্যাচারী ও সাহেবের শ্রীচরণের আজ্ঞাবহ ছুঁচ বিশেষ। সে তখন ওয়ার্ডার হইয়া জেল মুন্সীর কাজ করিতেছে। সে পারতপক্ষে স্নান রূপ কুকার্য্যটা করিত না, তাই গন্ধের জ্বালায় তাহার কাছে দাঁড়ান দুষ্কর হইত। গোলাম রসুল যখন প্রথম জেলে আসে, তখন তাহার এই স্নানের অনভ্যাসের জন্য বড় সাহেব একদিন হুকুম দেন যে তিন চার জন মেথর তাহাকে ধরিয়া স্নান করাইবে। হুকুম হইলে আর রক্ষা আছে? কয়েক জনে ধরিয়া তাহাকে হৌদি বা চৌবাচ্চার উপর ফেলিয়া নারিকেল ছোবড়া দিয়া রগড়াইয়া নাকি প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া স্নান করাইয়াছিল। কয়েদিদের মধ্যে এইটি একটি চিরদিন বিদ্রূপের বিষয় হইয়া আছে। গোলাম

রসুল দাঁত খিঁচাইতে অদ্বিতীয়; উপেনকে একদিন দড়ি খারাপ হইবার জন্য দাঁত খিঁচাইয়া ধমক দেয়; সে রাগ উপেনের আজও যায় নাই। অবশ্য ঠিক, তখন যে ভাবটার উদয় হইয়াছিল, তাহা রাগ, আর ভয়ের অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন যোগ। এই গোলাম রসুল অসংখ্য লোককে শাস্তি দেওয়াইয়াছে; তাহার হাতে বেত বেড়ি হাতকড়ি খাইয়া নাস্তানাবুদ হইয়াছে, এমন বহুতর লোক আজ আন্দামানে টাপুতে টাপুতে ওত পাতিয়া আছে; আশা এই যে একবার কোন অপরাধে গোলাম রসুল বরখাস্ত হইয়া জেলের বাহির হইলেই তাহারা তাহাকে দেখিয়া লইবে! কিন্তু ব্যারী সাহেবের প্রিয়তম চেড়ীদিগের অন্যতম রসুল বড় ধূর্ত্ত, তাই সে জেল হইতে বাহির হয় নাই। জেলেই ওয়ার্ডার হইতে ক্রমশঃ পেটি অফিসার, টিণ্ডাল ও পরে বর্ত্তমানে জমাদার হইয়া সে আজও নির্ব্বিবাদে মোড়ল-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

খোয়দাদ, গোলাম রসুল ও ব্যারী সাহেব এই ত্র্যহস্পর্শে আমরা ননদিনী শাশুড়ী ও রক্তচক্ষু পতিদেবতা-তাড়িত বধূর মত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম! এইরূপে পাঁচ নম্বরে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর মারে সাহেবের কৃপায় কাটিল মন্দ নহে। হেমদা' ইন্দু প্রভৃতি কয়েক জনকে ইতিমধ্যে একবার কাস্তে হাতে পাঁচ নম্বর 'ওয়ার্ডের মাঠে ঘাস কাটিতেও দেওয়া হয়। বোধ হয়, বাবু যাত্রা নির্ব্বাহকারী নিরীহ পাঠক ভাবিতেছেন,—"ঘাস-কাটা! ভদ্র সন্তানের—!" আসলে কিন্তু এই উল্টারাজার দেশে ঘাসকাটা, ঝাড়ুদারী, এমন কি, মেথরের কাজ পাইলে লোকে বর্ত্তিয়া যায়। কলু টানিবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছত্রীকে মেথর হইবার আবেদন জানাইতে আমরা দেখিয়াছি। এই সব কাজের লোক যখন তখন যেখানে সেখানে ইচ্ছামত ঘুরিতে পায়, কাজও হালকা, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যটুকু করিয়া লইতে পারিলেই সমস্ত দিন ছুটি। সুতরাং বোমার আসামীর হাতে কাস্তে দিয়া উঠানে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়ায় মারে সাহেব সত্যই কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন, হুকুম ছিল, যখন রৌদ্র বা বর্ষা থাকিবে না, তখন ঘাস কাটিতে হইবে। রৌদ্র বা বর্ষার সময় উঠানের মাঝে কাঠের কারখানার বারাণ্ডায় পায়ের উপর পা দিয়া দিব্য আরাম ভোগ করা আর কি! যদি বা কখন একটা মেঘের চাপ দশ পনর মিনিটের জন্য সূর্য্যদেবের উপর আসিয়া পড়িল, তবেই ঘাস কাটিবার পালা, নহিলে নয় রৌদ্র, নয় বর্ষা তো লাগিয়াই আছে।

দুঃখ-দহন।

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।]

আজ জলেছে আগুন দেহমনে তোর
শিরা উপশিরা ময়,
ওরে ভীরু ওরে অসাড় পাষাণ
ওরে অক্ষম ওরে হতমান,
কার মুখ চেয়ে আছিস্ এখনো
কাহারে করিস্ ভয়?
পলে পলে এই তুচ্ছ মরণে
কেন তোর পরাজয়?

স্নেহের কাঙাল দয়ার ভিখারী
লজ্জা করে না তোর
করুণা জাগাতে নিশিদিন মান
নয়নে অশ্রু লোর?
হৃদয়ে এখনো রেখেছিস্ আশা,
বিফল জীবন তবু ভালবাসা।
বুকভরা প্রেম যদি আছে তবে
কেন সংশয় ঘোর,
যারা করে হেলা লাজ দিতে তারে
নাহিক মনের জোর?

অগ্নিময়ের সন্তান তোর
তুহিন শীতল প্রাণ,
জড় হয়ে তুই অনড় রহিবি
সহি শত অপমান।

চিতার আগুন ছাই হয়ে যাবে,
তারি মাঝে তোর দেহ লয় পাবে,
অমৃত যে টুকু তাও কি হারাবি
সে যে অমৃতের দান
লাঞ্ছিত পদ-দলিত জীবনে
সত্যের নাহি মান ?

বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষুক তুই
ছি ছি মরে যাই লাজে,
পরে পাবে সুখ তোরে দয়া করে
এই বড় বুকে বাজে।
কি যে গরীয়ান্ তোর সেই দাতা।
কি যে তোর আজ অবনত মাথা!
শূন্য চেতন ওরে অভাজন
এসেছিস্ কোন কাজে ?
কলের পুঁতুল প্রাণহীন হয়ে
রহিবি জগত মাঝে ?

ঝুলি ভরি তুলি তণ্ডুল কণা
গণ্ডূষ জলপানে,
বাড়ে শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
ব্যর্থতা ব্যথা হানে ;
এত বড় তুই এত হীন কেন,
এমন উদার কেন দীন হেন ?
আপনা ভুলিয়া এমনি করিয়া
চলিবি পাতাল পানে !
স্থূল যেন এক অচল পঙ্গু
অধোগতি শুধু জানে।

উন্নত শির আয়ত বক্ষ
তেজোময় আঁখিপাতে,
মনের শত্রু-আগুলিয়া ধর
জীবনের দিনে রাতে ;
ঝঞ্ঝা বাদল অশনি আঘাত
মহারণে সহি ঘাত প্রতিঘাত,
হৃদয়ের বল অটুট রাখিয়া
দেবতা আশীষ মাথে,
তুলে ধর আজ বিজয় নিশান
বজ্র কঠোর হাতে।

পথময় তোর কণ্টক আছে
দলে চল্ অবহেলে,
চলে চল্ তুই বুকের পাষাণ
দুই হাতে ফেলি ঠেলে ;
পর্ব্বত ভাঙ্গি' পড়ুক মাথায়
মরি যদি তা'তে কিবা আসে যায়,
নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিব
একবার বেঁচে গেলে ;
মায়া মরীচিকা সম্মুখে তোর
আগে চল্ পিছে ফেলে।

দুই চোখে দেখ্ মরুর চিত্র
নাহি ছায়া তরু জল,
তপ্ত বালুকা ছড়ায় আগুন
বায়ু শ্বসে হলাহল,
মৃতের আর্ত্তধ্বনি শোন কাণে
ভরে গেল ধরা দুঃখের দানে
ভীষণ দৃশ্য শ্মশানে মশানে
নাচিছে প্রেতের দল,

দুর্ব্বল হত   বীর পদ ভরে
ধরিত্রী টলমল্।

এরই মাঝে তুই জনম লভিয়া
বেঁচে ওঠ ওরে মরা,
জীবন মৃত্যু এ মহা আহবে
জেগে ওঠ ওরে জরা,
আজিকে অগ্নি মন্ত্রের বাণী
বাঁচায়ে তুলিবে যত মৃত প্রাণী,
অসাড় জাগিবে অভয় মরে
মরণ বিজয় করা,
নূতন জীবনে চাহিয়া দেখিবে
হাসিছে তরুণী ধরা।

প্রেমে কত প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীশিববাণী দেবী।]

তারকদের গ্রামখানি বর্দ্ধমান জেলায়। বাড়ীর পাশে ঝোপ ঝোপ কলাগাছ; পথে কত ডোবা, পুষ্করিণি আমবন, পথের ধারে বেড়ার তলায় তলায় কচু কালকাসন্দা দোপাটি লজ্জাবতীর ভিড়করা ঘাসবন। সদ্গোপ কৈবর্ত্ত গয়লাদের খড়ে ও হোগলায় ছাওয়া মেটে ঘরগুলি নিকান পোছান দিব্য ঝরঝরে। পদ্মদিঘীর তীরে বাবা মদনমোহনের মন্দির, দেয়াল তার ফাটা, মাথায় অশ্বথ গাছ।

এইখানে গ্রামের শান্ত নীড়ে শস্পরচিত কোলটুকুতে তারক তাহার জীবন স্বপ্ন—শৈশবকাল খেলা ধুলায় কাটিয়াছে। তখন তরী ডুরে সাড়ী পরা এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে, ডানপিটে তারকের খেলার সাথী। তারকরা ব্রাহ্মণ, আর তরীরা বদ্যি। অতটুকু বয়সে মায়ের কোল ছাড়িতে না ছাড়িতে তার খেলার

পুতুলঘর ভাঙিতে না ভাঙিতে, কবে যে তরী হতভাগীর কপাল পুড়িয়াছিল, স্বামী যে কি ধন, তাহা শিখিবার জ্ঞান না হইতেই—পুণ্যলোভী বাপের গৌরী-দানের ফলে মেয়ের সীঁথার সিঁদুর হাতের শাঁখা ঘুচিয়াছিল, তাহা না তরী, না তারক, দুই জনের কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যে দিন তাহা বুঝিল, দু'জনে এক সঙ্গেই বুঝিল; এ উহার মুখ চাহিয়া অন্তর দেখিয়া বড় সুখের বিনিময়ে বুঝিল।

তাহার পর তারক গ্রামছাড়া হইয়া কলিকাতায় তেড়ি কাটিয়া, নোট মুখস্ত করিয়া, অকর্ম্মণ্য বাবু-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আসিল; আর শৈশবের পুতুলখেলা সারিয়া, কৈশোরের সেই সাথীটির অনাবিল সঙ্গসুখটুকুও হারাইয়া, বনের মেয়ে বনেই বাড়িতে লাগিল। ছেলেবেলা তরী লুকাইয়া তারকের মার কাছে আসিয়া জোর করিয়া তারকের পাতে মাছ খাইয়া যাইত, এখন সে স্বপাক হবিষ্যান্ন খায়। আগে এতটুকু দুধের মেয়ে বলিয়া মা অনেক কাঁদিয়া কাটিয়াও প্রাণে ধরিয়া তাহার হাতের চুড়ি নাকের নোলক খুলিয়া লইতে পারেন নাই,এখন সে নিরাভরণা বিষাদ-প্রতিমার সর্ব্ব অঙ্গ প্রকৃতিরাণীর দেওয়া গহনায় ভরা।

তারক মুক্ত কর্ম্মবহুল পুরুষ-জীবনে সব ভুলিতে পারিয়াছিল; তরীর বঞ্চিত সঙ্কীর্ণ নারী-জীবনে ভুলিবার বড় কিছু ছিল না। ভগবান মন গড়িয়াছেন, আর মানুষে সমাজ গড়িয়াছে; সবার পরিত্যক্ত এমন যে বৈধব্যের শ্মশান, সেখানেও মধুঋতুর স্পর্শ সকল কিছু ছুঁইয়া সবুজ করিয়া দেয়, একি বিড়ম্বনা।

তারকের মা তরীর রূপ দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইত; তরীর মা ছলছল চোখে অঞ্চলে সইএর চক্ষু মুছাইয়া বলিত,—"ছি বোন্! করবি কি বল্? ওর পোড়া অদেষ্ট, আর এই কসাই সমাজ। নে ভাই, আমায় আর কাঁদাস্ নে।" তাহার পর দুঃখিনী পোড়াকপালী মেয়েটা রান্নাঘরের ভিজে দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়াছে দেখিয়া দুই সই বসিয়া বসিয়া মনের সুখে কাঁদিত।

যে বৎসর তারক ঢাকা কলেজ হইতে বি এ পাশ দিয়া গ্রামে আসিল, তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে কলেরায় তরীর মা মরিয়াছে; এখন সে ভাই হরিপদর সংসারে বিনা মাহিনার দাসী। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ঘর নিকায়, বাসন মাজে, জল আনে, রাঁধে, দাদার ও বৌএর প্রাণ-পাত করিয়া সেবা করে, আর দিনান্তে একবার দু'টি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খায়। তবু পোড়ারমুখীর রূপ আর ঘোচে না; এত অবহেলায় দুঃখেও ছিন্নকন্থা পরা দেহে "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।" যেখানে যাহা আদৌ দরকার নাই,

সেইখানে কি ছাই তাহাই এমনতর অপর্য্যাপ্ত ঢালিয়া দিতে হয়! এ জগলীলায় রঙ্গরাজের রঙ তামাসাই কি এমনি।। পাঁক, শ্যাওলা, কাঁটা আর সাপের রাজ্য, তাহার মাঝে রূপের খনি মধুসুগন্ধভরা কমলের সৃষ্টি; নীল জলের অতল তলে যেখানে কেউ দেখিবে না, সেইখানে কিনা মুক্তা ও প্রবালের রাশি; কালো কয়লার বুকে হীরা! জগতের ঠাকুর অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়; তাহার লীলাও আবার তেমনি।

তখন গ্রামে জায়গায় জায়গায় আখ মাড়াই হইতেছে। দ্বিপ্রহর বেলা; গ্রামখানি আলস্যে শ্রান্ত, আধ ঘুমে নিশুতি বিজন। পাঁজর-কণ্ঠা-বাহির-করা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হাভাতের মত হরিপদর ইটজিরজিরে পাকা বাড়ী খানিতে বোধ হইতেছে যেন কেহ কোথায়ও নাই। তারক আজ প্রাতে আসিয়াছে, বাড়ীতে দু'মুঠো ভাত কোন রকমে মুখে গুঁজিয়া বড় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়াছে। ইচ্ছা গ্রামখানি একবার ঘুরিয়া দেখিবে, আর যে কি ইচ্ছা, সে বলিয়া কাজ নাই। অনেক দিন পর আজ তাহার মনে পড়িয়াছে। হরিপদর বাড়ীতে অন্দরের উঠান বাহিয়া এক পাশের ঘরটিতে উঠিতে হয়, সেইটিই বৈঠকখানা; নামিতে উঠিতে গলা খাকারী দিয়া না আসিলে যাহলে, মেয়েরা পলাইয়া লুকাইবার সময় পায় না। হরিপদর বিবাহে তো তারক আসেই নাই, আজ সাত বৎসর পর গ্রামে তাহার এই প্রথম আসা। বাল্যের পুরাতন বড় পরিচিত, তবু আজিকার এই নূতন পাতা অজানা সংসারে সে কাহাকে ডাকিবে? বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্যাওলা-পড়া দেওয়াল ধরিয়া সে এক আধবার কাঁপা চাপা গলায় ডাকিল,—"হরিপদদা' বাড়ী আছ?" হরিপদ তখন জমিদার শশীবাবুর কুমারদের আড্ডার তাস খেলিতে ব্যস্ত, ঘরে বৌ খোকাকে লইয়া মাদুর পাতিয়া ঘুমে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতেও তারক ফিরিতে পারিল না। বাল্যের সুখস্মৃতি অনেক দিনের পর আজ এই ইটবাহিরকরা জীর্ণ ঘর খানি হইতে স্নিগ্ধ অনাহৃত পুষ্পগন্ধের মত তাহার মন প্রাণ আকুল করিয়া লইতেছিল। কলিকাতার ফুলবাবুর বিলাস-মন্থর নিরর্থক তামস জীবন, তাহার পর এ যেন প্রথম সচন্দনবিগ্রহে উজ্জ্বল পবিত্র দেউলখানিতে পদক্ষেপ; কত-কাল রৌদ্র সাহয়া ধূলা আবর্জ্জনা ঠেলিয়া এ যেন ঈপ্সিত গঙ্গায় শীতল স্নিগ্ধ অবগাহন। হউক ভাঙ্গা জরাজীর্ণ, হউক বনে বনময় সবার পরিত্যক্ত, তবু এ গ্রামের কোন ঠাণ্ডা ভরাট শান্তির ভাবে কেমন নিথর ও মনজুড়ান, তাহার উপর

আবার সেই নিষ্কলঙ্ক সুখের স্মৃতি এমন মধুকেও মধুর করিয়াছে। এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তারক দেখিল, একটি মেয়ে সেই বাড়ীতে আসিতেছে। নিরাভরণা মেয়েটির মাথায় কাপড় নাই, ভিজে এলো চুল, সর্ব্বাঙ্গভরা তরতরে যৌবন আর রূপের নদী, অসঙ্কোচ দীর্ঘ কালো চোখে বড় সাহস ততোধিক কৌতূহল। তাহার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিতে চাহিতে কাছে আসিয়া তরীর পা আর চলিল না, মুখ গণ্ড সব রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ উদ্ভিন্ন হইয়া কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। তারকের মন বসন্তের অলির মত গুঞ্জরিয়া কেবলই বলিতে লাগিল,—"সেই এই হ'য়েছে!" এদিক ওদিক দেখিয়া সহসা নত হইয়া ঢিপ করিয়া তারকের পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া দুই হাতে পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া তরী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।· তারকও পলাইল।

তারক বার্ডসাই খাইত, পায়রার খোপের মত সোজা তেড়ি কাটিত, গিলে কোঁচান মিহি ধুতি চাদর পিরাণ পাম্প-সুতে পাতলা কালো দেহখানিকে বড় যত্নে কতো বাবু করিয়া সাজাইয়া তুলিতেছিল। আজ সব ভুলিয়া, বাড়ী গিয়া, উঠানে মায়ের কাছে বসিল। মা মাদুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া মুখে গুল দিয়া সুপারি কাটিতে বসিয়াছিলেন; ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন,—"গাঁ ঘুরতে গেলি, এত শিগ্‌গির এলি যে? কান্তপিসির ওখানে গিছিল? আর হরিপদদের ওখানে—?" ছেলে হেঁট মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, কোন উত্তর করিল না। তারকের মা দুর্গামণি বড় বুদ্ধিমতী; ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"আহা তোর সেই খেলার সাথী তরী—এখন আর ওকে চোক মেলে দেখা যায় না। পোড়া বিধি বড় পাষাণ রে, এমন মেয়ের কপালে এত দুঃখুও লেখে! কিছু বুঝলে না দেখলে না, এই বয়েসে অমন সোণার পিরতিমে যোগিনী সাজলে। হাঁ রে তারক, বিদ্দেসাগর না কে নাকি বিধি দিয়েছে, বিধবার বে হয়? সিদিনকে চন্দনার মিত্তিরদের বিধবা মেয়ে জগদম্বার বে হ'লো। ওহ্‌! মা গো মা! সে কি ঘোঁট পাকান, সারা গাঁটা ভরে কি কোঁদল! নিন্দের কাণ পাতবার জো নেই, মাগী মিন্‌সেদের না খেয়ে দেয়ে কেবল ঐ কথা ঐ কুচ্ছো। বাপরে বাপ, পরের দুঃখে কোথায় সহায় হবে, না এত ঝাঁটা নাতিও মাত্তে পারে। ধন্যি তোদের সমাজ। তোরা ছাই পাঁশ কি লেকা পড়া শিখিস রে? এই ঘোঁট পাকানর একটা ছিন্নে কত্তে পারিস্‌ নে?"

আমাদের হিন্দু সমাজে মেয়েরাই আচার নিষ্ঠার রক্ষী; কিন্তু প্রেম ও স্নেহ বাঁকা মনকেও সরল করে; বুদ্ধি দিয়া অনেক বিচার করিয়া যাহা বুঝিতে হয়,

প্রেমে সে জানি সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত। দুর্গামণি সইএর মেয়ে তরীকে আপন পেটের মেয়ের মত ভালবাসিয়াছিল, তাই তাহার দুঃখ সে যেমন বুঝিত, আর কেহ তেমন বুঝিত না। তরীর কিন্তু কোন দুঃখ নাই; পিঞ্জরের পাখী তাহার সেই লোহা-ঘেরা বাধনটুকুকে ভালবাসিয়া ফেলে, পাখীটাকে বাহির করিয়া পিঞ্জরার দ্বার বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, সে ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া সেই বন্ধ দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়। অবাধ অনন্ত নীল মুক্তি তাহার কাছে ভয়ের সামগ্রী; বন্ধনটা বেশ পরিচিত—সহজ, তাই শান্তিময়। তরী দিবারাত্র মনের সুখে খাটিত, খোকা কোলে পায়ের উপর পা দিয়া বৌদির ঝাঁঝাল তর্জ্জন গর্জ্জন হাসি মুখে সহিত, থপথপে মোটা সাদাসিধা ভোলানাথ গোছের দাদাটিকে প্রাণ দিয়া যত্ন করিত; কিন্তু নিজের জীবনে যাহা নাই তাহার দুঃখ বুঝিত না। স্নেহময়ী দুর্গামণি কিছু বলিলে, তাঁহার ব্যর্থ যৌবনের দুঃখে কাঁদিলে, সে লজ্জা পাইত; তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িত। তাহার বউদিদি কেষ্টকালী বড় সেয়ানা মেয়ে, সেই গৌর গোলগাল বর্ত্তুলের মত দেহটি আর চঞ্চল তীব্র চক্ষু দুইটি ভরিয়া তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি নাচিয়া ফিরিত। ভালমানুষ হরিপদকে সে চিনিত, তাই ঠাকুরঝিকে শাসন করিবার লোভ সে কর্ত্তা বাড়ী থাকিলে সংযত রাখিত, গলায় মধু ঢালিয়া ডাকিত, "ঠাকুরঝি, খোকার দুধটা দিয়ে যাও না, ভাই।" স্বামীর কাছে দাঁড়াইয়া রান্না ঘরের দিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে বা বলিত, 'আহা! ঠাকুরঝিই যেন খোকার পেটের মা হয়ে বসেছে গো, কি যত্নটাই না করে।" স্বামী কিন্তু না থাকিলে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিত,—"ওমা! থালা রাখবার ছিরি দেখ? বাসন কোসনগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গলে।" আর কোন ছুতা না পাইলে বলিত,—"ভাই বাপু বোনের কথায় অজ্ঞান। আমি না উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। পানে চুনে মিশ গেল, নরজের বোঁটা বরজে রইল। ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু, এ সব মেয়ের হাতে পায়ে কথা কয়। সোয়ামী তো জন্মে এস্তক খেয়েছে, এখন আমাদের খেলেই হয় আর কি।"

তরী রান্না ঘরে বসিয়া ভাতৃবধূর এই গঞ্জনা কটূক্তির সহিত ভাইএর আদরের ভাত খাইত, আহারান্তে সব গুছাইয়া রান্না ঘরে শিকল দিয়া আসিয়া খোকাকে লইয়া হাসিমুখে বলিত,—"বৌদি' তুমি একটু ঘুমোও, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে আনি।" বউদিদি তেলে জলে পুষ্ট নধর দেহখানি মাদুরে ঢালিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিত, "তবু যা হোক, আমার দরদ দুঃখু মনে পড়লো। আমি বলি আজ আর হাত আজাড় হবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তরী ছেলেবেলা হইতে হরিপদর কাছে বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিল, বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃতের আপনাভোলা কান্ত ভাবের মাধুর্য্য তাহার সহজে প্রেমপ্রবণ চিত্তকে আরও কোমল আরও প্রেমোন্মুখ করিয়াছিল, যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শোধনে এ প্রেম ভগবানে আপনা আপনি অর্পিত হইয়া যায়, তাহা সে সংসারের দুঃখ কষ্টে এই সবেমাত্র শিখিতেছিল। শেখা সম্পূর্ণ না হইতেই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতির সুখাবেশ লইয়া তারক অতর্কিতে তাহার মনোজগতে আসিয়া দাড়াইল। বসন্তের সমাগমে লতার অঙ্গে রস, ফুলের বুকে ফুটিবার আকুলি ব্যাকুলি আপনি আসে, শীতের সংযমে যোগিনী বনবাণী মাথা না তুয়া শাখা কিশলয় দোলাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কোন মতেই হরিত যৌবনজোয়ার রুধিতে পারে না। তরী অধীর হইয়া ভয়ে বিস্ময়ে কণ্টকিত শরীরে ভাবিতেছিল, "হে ঠাকুর! এ আমার কি হ'লো? ওগো, রক্ষা কর।" তারককে দূর হইতে, শুধু একবারটি দেখিলেই অমৃত-সিঞ্চনে তাহার সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া যায়, আরও একটু কাছে পাইলে জ্ঞান থাকে না, ভয়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। সে প্রাণপণে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইত, পারতপক্ষে তারককে দেখা দিত না।

তারক গ্রামে বসিয়া বসিয়া কয়েক দিন গালে হাত দিয়া কি ভাবিল। সেই কৈশোরের নিষ্পাপ খেলাধূলাটুকু সারিয়া কলিকাতা যাওয়া অবধি সে আর কখন পরের জন্য এমন করিয়া ভাবে নাই। বাসনা আর নিঃস্বার্থ দয়ার আজ এ কি সংগ্রাম। নীরব তারকের বুকের মধ্যে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নামাখা নিশায় কালবৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল। কালো মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে কামনার রক্ত বিদ্যুজ্জিহ্বা আর গর্জ্জন, আবার সেই তাল তাল কালোর ধারে ধারে করুণার চাঁদিনীর আঁকা শাদা জলজ্বলে জরির পাড়। হরিপদদা'র সহিত একদিন তাহার এ সম্বন্ধে আলাপ হইল, সব কথা শুনিয়া শিহরিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়া হরিপদ বলিল,— "আরে সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়? বিধবার বিয়ে। আমাদের তরীর— আরে ছ্যাঃ!"

তা। যার মনে জ্ঞানে কখন স্বামিগ্রহণ হয় নি সে যে কুমারী। তুমি হিন্দু, ধর্ম্ম আচরণ কর, লোকে যা' খুসি বলুক না।

হরি। আমায় যে একঘরে করবে?

তা। তা' কি করে করবে, এ যে হিন্দু সমাজে চলে গেছে।

হরি। কৈ আর চলেছে, সে তো দুই একটা। আর তাদেরও কি কম লাঞ্ছনাটা হয়?

তা। দু' একটার বেশী যে হয় না, সে তো তোমার আমারই দোষ। লাঞ্ছনার ভয় কর, তুমি পুরুষ বাচ্চা নও?

হরিপদ ধমক খাইয়া আর বাঙনিষ্পত্তি করিল না, নীরবে বসিয়া ভুড ভুড ভুড ভুড় করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

তারক যাহাকে তরীর বর ঠিক করিল, সে [illegible] রামকমল সেন, সবে বি এ পাশ দিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। ঘরে খুড়ার দাদা নাই, সেই কর্ত্তা, তাহারা বেশ বড় লোক, সুন্দরবনে তালুক আছে। ঘটনা শুনিয়া সবাই পুলকিত হইল, কিন্তু ভয় হইল ততোধিক। কথাটা রটিল, গ্রামে আগুন লাগিয়া গেল আর কি। ভবতারণ স্মৃতিতীর্থ ক্রুদ্ধ দেহখানি লম্বা লাঠি ঠক ঠক করিতে করিতে চটি পায়ে আসিয়া তারককে বলিলেন, "কি হে ছোকরা, এর পর গোল্লায় গেছ? নিজে নরকস্থ হবে, গ্রামশুদ্ধ নরকস্থ করবার চেষ্টা পাচ্ছ, তোমাকে চটি পেটা করে আক্কেল দেয় এ রকম কেউ এখানে নেই?" ভবের গেঁটে বাতের কারণে স্বভাবতই কাঁপিত, এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তারক সংযত হইয়া থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু জুতা পেটার কথায় ইংরাজি পোড়ো ইয়ং বেঙ্গল তাহা সহ্য করিতে পারিল না, নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "অপধর্ম্মের রক্ষক জুতো হাতে বামুন ছাড়া আর কে হবে?"

ভব। (চিৎকার করিয়া) বেহায়া বেল্লিক পাজী, নিজে ম্লেচ্ছ হয়ে হিন্দুর জাত ধর্ম্ম নষ্ট করতে এসেছ? তোমায় আমরা দেখে নেব। আর হরিপদর হুঁকো নাপিত বন্ধ না করাই তো আমার নাম ভবতারণ স্মৃতিতীর্থ নয়।

মেয়েদের হাসি টিটকারী গঞ্জনায় তরীর সংসারে টেকা দায় হইল। যে বৌদিদির বাক্যবাণ সে আশীর্ব্বচনের মত নির্ব্বিরোধে গ্রহণ করিত, আজ ধৈর্য্য হারাইয়া তাহা বিষবোধ হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিয়া সে তারকের মায়ের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া বড় কান্নাই কাঁদিল। তারামণি অনেক বুঝাইলেন, শেষে তারককে ডাকিয়া দিয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন, বলিয়া গেলেন, "বাবা! আমি তো আর পারি নে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে গেছে। তোর ও খেলার সাথী, তুই যা' হয় কর।" তরী আজ মরিয়া হইয়া আসিয়াছিল, তারকের সকল কথায় কেবল অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। শেষে সে দুঃখ সহিতে না পারিয়া তারক চলিয়া যায় দেখিয়া সে মাথার

কাপড় ফেলিয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া উৰ্দ্ধমুখে মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারক বলিল "তরি। লক্ষ্মী দিদি আমার—।' তরী বাধা দিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোন রকমে বলিল,—"তুমি কলকেতায় চলে যাও, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, যাও।" সে দৃষ্টিতে দুই জনের কাছে দুই জনের মন ধরা পড়িয়া গেল, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বলিতে আর বাকি রহিল না।

এ কথায় তারকের মনের কোথায় ঝন্ করিয়া যেন একটা শিরা ছিঁড়িয়া গেল। যাহার সুখের জন্ম সে সব করিতে পারে, তাহার হিত করিতে গিয়া সেই কিনা এমন মর্ম্মন্তুদ দুঃখের মূল হইল। তারক শেষরাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিল। রেলওয়ে ষ্টেসন সেখান হইতে দশ মাইল দূর, পথের মধ্যে পাঁচাল পাড়ার বিল আর আম বন, কাছেই কেশার মাঠ। অত সকালে বিলে বুনো রেলে হাঁস আর চকাচকি ডাকিতেছে। যাহাকে সুখী করিতে এত উদ্বেগ, এত কঠিন আত্মঘাতের কল্পনা, আপনার কলিজা, টানিয়া ছিঁড়িয়া পরকে দিবার চেষ্টা, তাহাকে না জানি কত কালের জন্ম ছাড়িয়া যাইতেছে। তবু তারকের বুকের মধ্যে একটা শীতল সর্ব্বসন্তাপহারী পিও মন প্রাণ জুড়াইয়া বিরাজ করিতে ছিল। এ বিরহেও সুখ, বুঝি মিলনের অধিক সুখ; কারণ সে আর পর হইয়া যাইবে না। আর সেই দৃষ্টি—অশ্রু সজল মনকাড়া বুকের গোপন ভাষাভরা ভাবস্তব্ধ প্রেমকরুণ সেই দৃষ্টি। মুখের কথায় আর মানুষ ইহার অধিক কি বলে। তরীর অত প্রেমের ধারা এক নিমেষে তারকের চিত্ত ধুইয়া বিমল করিয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে এত পাইয়াছে, যে আর চাহিবার কিছু নাই; সমাজের নিয়মে তরী চিরদিনই তাহার পর, কখন আপনার হইবার নয়। কিন্তু দেহ কতটুকু? মন যে ভূমা, সেই ভূমা মহান্ অনন্তের কোলে যে চিরমিলন হইয়া গিয়াছে।

সুখে মাতাল তারক উষার আধআলো আধছায়ার ঘোর বনের কোল দিয়া টলিতে টলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ একটা ইট আসিয়া তাহার মাথায় প্রচণ্ডবেগে লাগিল, চক্ষে আগুনের হল্কা জ্বলিয়া জ্ঞান হরিয়া লইল। যখন জ্ঞান হইল, তখন সে মাটিতে সেই উষার ভিজা ঘাসে পড়িয়া আছে, আর তাহার সর্ব্বাঙ্গে অবিশ্রাম কয়েকটা লাঠির ঘার পড়িতেছে। যে জ্ঞান এক মিনিটের জন্ম হইয়া ছিল, তাহা নির্দ্দয় প্রহারে তখনি আবার গেল। দুই ঘণ্টার পর আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন সে সেইখানে রক্তে ভিজিয়া তেমনি পড়িয়া

আছে, খেড়োর রামকমল ঝুঁকিয়া তাহার মুখ দেখিতেছে। রামকমল বলিল,—"দাদা, একি? তোমার এ দশা কে কর্‌লে?" তারক হাসিল, বড় সুখে হাসি পাইয়াছিল, বলিল,—"ভাই, আমার বড আত্মজনে করেছে।" উঠিতে গিয়া তারক পড়িয়া গেল। রামকমল ডুলি আনাইল, তারকের কাকুতি মিনতিতে তাহাকে আর খেড়োতে লইয়া গেল না, কোলে করিয়া রেল পথে কলিকাতায় লইয়া আসিল। রামকমল অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বলিয়াছিল,—"দাদা, তোমার এ দশায় মা ছাড়া আর কার কাছে নিয়ে যাব, কে সেবা কর্‌বে?" তারক উত্তরে বলিয়াছিল,—"ভাই, সেবা আমার শ্রীহরি কর্‌বেন, আমি এ যাত্রা মর্‌ছি নে। তুমি একবার প্রকৃত সুহৃদের কাজ কর, আমায় কলকেতায় পৌঁছে দাও।"

রাম। তারা শুনলে কি ভাব্‌বে?

তা। তারাই আমায় কলকেতায় যেতে বলেছে, তবীর কাজেই যাচ্ছি।

রাম আর কিছু বলিল না, তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল, এবং দুই মাস থাকিয়া নানা চিকিৎসা করাইয়া তারককে সুস্থ করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু,—

আমি এখানে আছি, কারণ গ্রামে এ পোড়াকপালীর ঠাঁই নেই। লোকে যা' বলে, তা' আমি নই এ কথা তো তোমাকে ব'ল্‌তে হবে না; সেই সাহসে পত্র লিখলাম। তোমার ছেলেবেলার খেলার সাথী তবী আজ অনাথিনী, কিছু টাকা পাঠাও এই ভিক্ষা, পরের কাছে অনেক চেষ্টা ক'রেও চাইতে পারি নি। নরহরির ঘাট, তুলসী বৈষ্ণবীর বাড়ী, এই ঠিকানায় পাঠালেই পাব। ইতি প্রণতা তবী।

পত্র পড়িয়া তারক অশ্রু রুধিতে পারিল না, ব্যাগে কাপড় চোপড় দু'চার খানা গুছাইয়া লইতে জলভরা চক্ষে দেখিয়া লওয়া কঠিন হইল; বড় কষ্টে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ব্যাগটা হাতে বাহির হইয়া পড়িল। তারক এখনও ফুল বাবুটি, পাম্প সু, ব্যাকা তেড়ি, এসেন্স, ছড়ি, ঘড়ি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। এত তাড়াতাড়িতে এত বেদনা-

কম্পিত দশায় যাই যাই করিয়াও এত দিনের অভ্যাসে হাত পা আপন মনে চুল সই করিয়া চাদর কাপড় গুছাইয়া পরিয়া লইল।

তারক নবদ্বীপে কখনও যায় নাই, শুধু নবদ্বীপ কেন স্বগ্রাম ছাড়া সহুরে কূপমণ্ডুক সে বাঙ্গলার মাটি কোথায়ও মাড়ায় নাই। তাহার উপর তুলসীর সেই ভিজা গোবরনিকান ঘুঁটের ধুঁয়ায় ভরা ঘর; অত সকালে তখন তরী স্নান করিয়া আসিয়া সিক্ত বস্ত্রে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গোবিন্দ প্রণাম করিতেছিল; মাথা তুলিয়া তারককে দেখিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া জড়সড় ভাবে পলাইল। তুলসী আথা ধরাইয়া উঠান নিকাইতেছিল, সে গোবর মাখা হাতে কোমর বাঁধিয়া তেমনি প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; হতভম্ব তারককে উস্‌খুস্ করিতে দেখিয়া বলিল,—"তুমি কে গা? মেয়ে লোকের বাড়ী ধড়মড় করে ঢুকে পড়?" ততক্ষণে কাপড় ছাড়িয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তরী আসিয়া তারকের পায়ের ধূলা লইল, দাওয়ায় আসন বিছাইয়া দিতে দিতে অধোমুখে বলিল,—"ও ভাই আমার দেশের লোক, তুমি চট্ করে রান্না চড়িয়ে দাও গে, তিন জনের চাল নিও।" মুচকী হাসিয়া তুলসী চলিয়া গেল, তরী মরমে মরিয়া এতটুকু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারক ঊর্দ্ধনেত্রে বিহ্বলভাবে এত দিনের কামনার বস্তু দেখিতেছিল, বলিল,—"তরি! তুমি এখানে এমন দশায়?"

তরী পদনখে মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি তো টাকা চেয়েছিলুম।"

তা। টাকা এনেছি।

সে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দিল, তরী খুলিয়া তাহার দুইখানি লইয়া বাকি মাটিতে তারকের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিল, সসঙ্কোচে বলিল,—"আমার এতেই হবে।"

তা। সে কি?

"তুমি সন্ধ্যের গাড়ীতে যাবে তো? যাই, তোমার জল খাবার আনিগে" বলিয়া আস্তে ব্যস্তে তরী চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে আঁচলে মেঝে মুছিয়া জল ছড়া দিয়া তরী এক খানি রেকাবীতে মুড়কি ও বাতাসা দিয়া গেল। তারক হাত পা ধুইয়া সেই গরীবের তুচ্ছ জল খাবার কতক খাইল, রোজ সন্দেশ রসগোল্লায় তৃপ্ত রসনা আধপথে জবাব দিয়া বসিল, গুড়ের মুড়কি তাহার অচল। দ্বিপ্রহরে সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি, থোড়ের ডালনা ও বড়ি ভাজা দিয়া বুকড়ি চালের মোটা মোটা ভাত, তারক আনমনে আধপেটা খাইল। আজ তাহার মধ্যে

দুইটা মনের ঠেলাঠেলি বাধিয়াছে। একটি মন এ কুঁড়ে ঘরে অর্দ্ধাশনে এত দুঃখেও বড় তৃপ্ত, বুঝি সংসারের বাজার সুখেও উদাসীন, আর একটি মন সে জমজমে আনন্দের মেলায়, কিছু বলিতে পারিতেছে না, কেবল পেছু পেছু খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ফিরিতেছে।

সন্ধ্যার সময় তুলসী হাটে গেলে, তরী আসিয়া তারকের শুইবার ঘরের দরজায় বসিল। তারক এতক্ষণ মনের কথা বলিতে না পাইয়া কণ্টকশয্যায় ছিল, এখন এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "তুমি আমার কাছে চল। এখানে এই দুঃখে তোমায় কি করে রেখে যাব?" তরী কিছু বলিল না, শুধু শান্ত মুগ্ধ চক্ষে বড় তিরস্কারের করুণ দৃষ্টি লইয়া চাহিল। তারক তাহাও সহিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল। সমাজ যাহাকে এমন ভয়ানক বাজে কলঙ্ক দিয়াছে, তাহার সমাজের কাছে কি বাধ্যবাধকতা আছে? অনেকক্ষণ তরী কিছু বলিতে পারিল না। শেষে ভাবিল, এখনি তুলসী আসিয়া পড়িবে, হয়তো উত্তর না পাইলে তারক আজ যাইবে না। তরী লজ্জার মাথা খাইয়া হেঁটমুখে বলিল,—"ছি! তোমার মুখে এই কথা! ওরা মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েছে, তাই সত্যি ক'রবো? তাদের মুখের চুণ কালী তোমার মুখে—"

তারক স্তব্ধ হইয়া রহিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া এ উহার দিকে চাহিতে পারিল না। শেষে তারক জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিল?"

তরী। গুরুজনের কথা, কি করে এ পোড়া মুখে বলবো? একদিন রাত্রিরে ঘুম ভেঙে দেখি বাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেছে। গাঁয়ের বগলা পিসি আর বৌদি' দাদাকে বল্লে, "ও চিঠি তরীর।" সবাই শুনলে আমি রাত্তিরে একবস্ত্রে চলে এসেছি। বড় পোড়া কপাল, মরতে গিয়েও মরণ হ'লো না।

তা। কেন, যার চিঠি তার নাম বল্লেই পারতে।

তরী দাঁতে জিব কাটিল, বলিল, "ছি। তাও কি হয়। সে এয়স্ত্রী, দাদার সংসার পুড়ে ঝুড়ে ছাই হয়ে যেতো। আমার আর জীবনে কি বাকি আছে, বল? দুঃখ কষ্ট মাথা পেতে নিতেই তো বিধবার জীবন।

তা। গঙ্গায় ডুবতে গেলে কেন?

তরী। তখন কিসের জন্যে আর বাঁচবো?

তা। এখন কেন বেঁচে আছ?

তরী। দেবতা ছুঁয়ে দিয়ে গেছে,—তার পর থেকে বুকটা ভয়ে রয়েছে। তুমিও যেও, গয়ায় রামশিলায় থাকেন, গেরস্তনোক।

তারক মনে মনে বড় রাগিয়াছিল, প্রেমের প্রথম রূপ বাসনাত্মক; সে দরিদ্রের মনের বৃন্দাবন বুঝে না; বাঘের মত লোলুপ হইয়া আহারের জন্ত ঘোরে; কেবলি আত্ম উদর পূর্ত্তির লালসায় গ্রাস করিতে চায়। যে লোভী, সে না পাইলেই হিংস্র পশু হয়। ক্রোধ-বিকৃতকণ্ঠে তারক বলিল,—"সে সাধু, ভাল বাসার সে কি জানে?"

তরী। ছিঃ! সাধু নিন্দে করতে নেই। ভালবাসা আমরাই শিখি নিক, বাবাই ঠিক প্রেম জানেন। তিনি বলেন,—"প্রেম কি গলি বড়ি শাখরি" (সরু বা সঙ্কীর্ণ), সব না ছেড়ে একেবারে আপনা ভুলতে না পারলে সেখানে যাওয়া যায় না।

তা। বিধবার কি বিয়ে হয় না? বিদ্যাসাগর—

তরী। বিধবার হয় জানি, কিন্তু বামুন বদ্দি। ছিঃ! আমি তোমার শ্রদ্ধা করি, ওগো আমায় অমন তর কথা সব বোলো না।

আরক্ত মুখ ঢাকিবার জন্ত তরী মাটিতে সেইখানে লুটাইয়া পড়িল। তারক তখন নির্ম্মম, সে বলিল,—"কেন? তোমার আমার ভালবাসা পাপ নয়, মনে জানে তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।" তরী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল! জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কষ্টে বলিল, "সমাজের মুখ দেখবে না, আমায় এমন দুঃখ লজ্জা দেবে? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও।"

তার। (উচ্চৈঃস্বরে) সমাজ। মানুষের গড়া শেকল, অবিচার অনাচার! ভগবান তোমার জন্তে আমায় গড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তুমিও তাই।

তরী। সমাজের মুখের চুণ কালী নিজের মুখে মাখবে, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা হেঁট করো না, চির দিনটা মনে হবে—

তারক ধূল্যবলুণ্ঠিতা তরীর সে অশ্রুসিক্তা দশা আর দেখিতে পারিল না, কাছে গিয়া হাত ধরিল। তাড়িতস্পৃষ্টার মত তরী উঠিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তেকে অশ্রু মুছিয়া বিবর্ণা অবলা ভিক্ষাকাতরা তরী কোমর বাঁধিয়া দৃপ্তা রণচণ্ডী হইয়া দাঁড়াইল; ঘৃণার বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"ছিঃ। তুমি না পুরুষ। দেহটা কি এতই বড়? এই তোমার ভালবাসা? যার বড় সুখ আর কিছু নেই, মানুষকে যা' দিতে পারলে মন ভরে উঠে, নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির বোধ হারিয়ে যায়, যাও সেই বস্তু বাবার কাছে শিখে এস। যাও, এখান থেকে যাও গো যাও; ওমা গাঁয়ে

আমায় যা' বলেছে, তুমি আমায় তাই ভাব, নইলে এমন করে কি নিতে আস্‌তে পার্‌তে ?"

তারক কশাহত পশুর মত পলাইল। তরীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া ব্যর্থ লালসার ক্রোধ তাহাকে ত্রিতাপের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। সে ডুবিতে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুঁড়ে ঘরখানা পোস্তার ধারে। সামনে তরঙ্গে গঙ্গা,—বাঙ্গলার সেই সাগরসঙ্গমোন্মাদিনী হিন্দুর মনপ্রাণহরা ত্রিতাপহারিণী গঙ্গা। আর কূল হইতে একটু দূরে পথের ওপারে রাঙা খুড়োর ভোগলার ঘর। রাঙা খুড়ো পাকা আমটী, যৌবনে তাহার মত দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা এ অঞ্চলে ছিল না, এখন খুড়া কেবল সিদ্ধিখোর। একদিন খুড়ার দৌরাত্ম্যে পোস্তার মানুষ বিব্রত সশঙ্কিত ছিল, ত্রিসন্ধ্যা গোপনে ঘরে দ্বার দিয়া তাহাকে গালি না পাড়িয়া কেহ অন্ন জল গ্রহণ করিত না।

তাহার পর একদিন সাদাপাগড়ি পরা একজন পশ্চিমা লোক খুড়ার দাওয়ায় আসিয়া বসে। খুড়া নাকি নেসার ঝোঁকে সে লোকটাকে লাঠি দিয়া মারিয়া পাট করিয়া শোয়াইয়া ফেলে। মারিতে মারিতে নেশা ছুটিয়া গিয়া নিরস্ত হইয়া খুড়া দেখে লোকটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তাহার শান্ত স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটি ভরিয়া অপার প্রেম। লোকটি কাহার নাম করিতেই খুড়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মত কাঁদিয়াছিল। সেই হইতে খুড়া নীরব নিতান্ত নিরীহ মূক হইয়া বসিয়াছে।

সেই হইতে লোকে দেখিয়া আসিতেছে দাওয়ায় যেখানে এই অচিন্ত্য কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সেই খানে দিনের পর দিন খুড়া উপু হইয়া বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় করিয়া তামাক টানে। যখন তামাক টানে না, তখন চুপচাপ একমনে বসিয়া মুখ নাড়ে, যেন ছাগলে চক্ষু মুদিয়া জাবর কাটিতেছে। খুড়া বড় স্বল্পভাষী, নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে এক কথায় জবাব দেয়। ব্রাহ্মণ দেখিলে খুড়া প্রণাম করে না, রক্তচক্ষে মারমুখী হইয়া কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে।

পাড়ার বামা আসিয়া নিত্য খুড়ার রান্নাঘর দাওয়া তুলসীতলা নিকাইয়া দু' সন্ধ্যা দু'টি রাঁধিয়া দিয়া যায়। বামা এ পাড়ার ছেলে বুড়া সকলের চিনি মাসি; বড় বদরাগী ও কুঁদুলে; মুড়ো ঝাঁটা হাতে তাড়া করিয়া গেলে এমন জোয়ান পুরুষ বাচ্চা এ অঞ্চলে নাই, যাহার মনে মনে পগার ডিঙাইবার একটা অদম্য ইচ্ছা না হয়। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, তাই বামার নাম চিনিমাসি।

বামা নাকি খুড়ার অতীত জীবনের অনেক কথা জানে, কিন্তু সে বড় চাপা মেয়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শণের নুড়ি চুল এলাইয়া হাত ঘুরাইয়া ছানা-বড়ার মত চক্ষু পাকাইয়া মেছনীর ভাষায় চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়া ছাড়ে। সকাল সন্ধ্যা একবার করিয়া আসরে না নামিলে বামার চলে না, তাই সে সদাই কলহের ছুতা খুঁজিয়া ফেরে। আর কিছু না পাইলে রাস্তার মানুষ ডাকিয়া দাওয়া হইতে রণরঙ্গিণী বেশে আরম্ভ করিয়া দেয়, "ওরে, ও চোকখাকীর পুতরা! তোদের কি মাগ ছেলে নেই, আমারি আস্তাকুড় দিয়ে জুতোপরে ঐ গে খড়র মড়র করে যাবি আসবি, আর আমি মাগী বুড়ী হাবড়ী ছুটে ছুটে কে এল গে তাই দেখতে দোর খুলে দিতে আসবো। না?—" ইত্যাদি। যাহার কপালে এ মধুসম্ভাষণ ঘটে, সে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে সরিয়া পড়ে, পালটা জবাব বড় একটা দেয় না। কারণ বামা প্রায় জগদ্বিদিতা।

খুড়াও বড় একটা বাদ যান না। বামা রান্না করে, খুড়ার তামাক সাজে, সন্ধ্যা কালে তুলসী তলায় ও ঘরে সন্ধ্যা দেয়, আর কাজ কর্ম্ম না থাকিলে দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া মনের সুখে নিরীহ খুড়ার বিষ ঝাড়িয়া দিয়া যায়। সহিষ্ণুতার অবতার খুড়া নীরবে নির্ব্বিবাদে জড়ের মত বসিয়া সে অনর্গল আশীর্ব্বচন শোনে, বামা বড় বাড়াবাড়ি করিলে অগত্যা মরা ছাগলের মত চক্ষু ফিরাইয়া এমন চাহনীতে বামার দিকে চায়, যে বামা তাহা সহিতে না পারিয়া তড় তড় করিয়া পলাইয়া গিয়া বাঁচে। খুড়ার সহিত বামার কি যে ঝগড়া, পাড়ার লোকে তাহা বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ঝগড়ার মধ্যে কেবল ঐ এক কথা,—"বলছি চ' বাপু, তিথি ধম্ম করে আসবি, তাকেও একবার চোখের দেখা দিয়ে আসবি, না ঐখেনে দিবে নেই, রাত্তির নেই, উপু হয়ে বসে আছেন। এমন নোড়ে ভোলাও সাত জন্মে দেখিনি, ষাঁড়ের নাদ গো, ষাঁড়ের নাদ, ন দেবায় ন ধম্মায়।"

সে দিন কাকজ্যোৎস্না রাত। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে স্নিগ্ধ আলোর ঝিলি মিলি জাহ্নবী চাঁদে চাঁদময়। ঘাট বাট ভরিয়া ফুটফুটে আলো, সুখতন্দ্রা নিশার

হাসিতে বুঝি আজ বান ডাকিয়াছে। বামা অাঁচল বিছাইয়া রান্না ঘরের দাওয়ায় এত বড় হাঁ করিয়া ঘড় ঘড় ঘড ঘড রবে নাব ডাকাইতেছিল; বাহিরেব দাওয়ায় রাঙা খুড়া যথাবিধি অচল অটল স্থাণুবৎ বসিয়াছিল। তখন গভীর রাত্রি, সব নীরব বিজন, কেবল দূরে গঙ্গার বুকে কোন্ হিন্দুস্থানী মাঝি গান ধরিয়াছিল।

"বংশী চোরায়ে রাধা প্যারী
কোই দেখো লোগা বংশী চোরায়ে—
কোন্ বাঁশকে তেরো বঁশরী
কোন্ সখী চোরাই ?
বন্শী চোরায়ে মনহারী।"

কার বাঁশী চুরি গিয়াছে, তাই তার জীবনের গান আজ মূক; সেই খেদে তার এত ক্রন্দন। খুড়ারও অন্তর বাহির আজ কত কাল মূক, তারও বাঁশী যৌবনের প্রথম ফাগুনে চুরি গিয়াছিল। খুড়া নিঃশব্দে উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সেই ঝুরি নামা বুড়া বটগাছের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটা মিট মিটে আলোর সামনে বাবা বসিয়া গঞ্জিকার সেবা করিতেছিল, বাবার লোল চর্ম্ম-খানি কণ্ঠা ও গণ্ডের অস্থির উপর ঝিলমিল করিতেছে, মুখখানি রূপী বাঁদরের মত। হাসিলে দুই চক্ষুর কোণ হইতে ধনুকের মত কত রেখাই যে চোখের দুই কোণ অবধি জাগিয়া উঠে, সমস্ত মুখখানা রেখায় রেখায় ভাঙ্গিয়া গঙ্গার ঢেউকাঁপা বুকের মত দেখায়। খুড়া পায়ের ধূলা লইয়া বসিলে, বাবা সহাস্যে বলিল,—"কেয়া বেটা বঁশরী মিলা?" খুড়াও হাসিল। খুড়ার এ হাসি এই বাবা ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না। সে হিন্দিতে বলিতে লাগিল, বাঁশী যার চুরি যায়, ওগো ছেলে, সেই বাঁশী বাজায় ভাল। উঃপ হ'লো যমুনা তীর, উঁহা বসে নন্দদুলাল, তোমার বাঁশরী পা'য়া গেছে।"

খুড়া মাথা নাড়িল। গুরুস্থবেশী এ অপূর্ব্ব সাধু তাহার চামচিকার ডানার মত অস্থি-চর্ম্মসার হাত দিয়া খুড়ার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—"হাঁ হাঁ, বাঁশরী মিল গিয়া,- দুখ যমুনা তট, ত্যাগ বৃন্দাবন, বাহিরের যে জন বন্শী চুরি করে-ছিল, অন্তরে সে জন ফিরিয়ে দিয়েছে। যাও, এবার বাজবে ভাল।" চড় খাইয়া খুড়ার এক অদ্ভুত ভাবান্তর হইল, সে উঠিয়া টলিতে টলিতে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। যেন কানা, হাঁতড়াইয়া হাঁতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া যাইতে হয়; যেন

মাতাল; পা এখানে পড়িতে ওখানে পড়ে। তখনও গায়ক নৌকার ছইএর উপর চিৎ হইয়া গাহিতেছিল।

"লাল বরণকে চুড়িয়া শোভে
নীল বরণ্‌কে সাড়ী,
ওহি সখি বন্‌শী চোরাই।"

ঘাটে কে মেয়ে বসিয়া ছিল, উঠিয়া খুড়ার পায়ের উপব উপুড় হইয়া পড়িল। খুড়া টলিতে টলিতে তাহার মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিল। পায়ের উপর তেমনি পড়িয়া থাকিয়া সেই মেয়ে বলিতে লাগিল,—"আমায় বড় কলঙ্ক দিয়ে গাঁয়ের লোকে ভিটে ছাড়িয়েছিল। তোমার তরী কি মন্দ হ'তে পারে? তোমায় ভাল বাসতুম, তাই যে আমার মস্ত রক্ষাকবচ ছিল। আজ আমার বলতে লজ্জা নেই, আজ যে আমার সাধ আকাঙ্ক্ষা অত ভালবাসা আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি অবধি কৃষ্ণে অর্পিত হয়ে গেছ। তুমি টাকা পাঠাতে, নবদ্বীপে বসে তাই খেতুম, আর সমাজ ও আত্মজন মিলে আমাকে যে দুঃসহ মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছিল, সেই কলঙ্কে সত্যিকার দুখী মেয়ে যারা সেখানে আসতো, তাদের সেবা করতুম। আমায় দেখে আমার বুকের দানটা পেয়ে সবার পায়েঠেলা সেই দীন দুঃখী মেয়েগুলো শুধরে যেত, আমার কথায় কত জন যে ভাল হয়েছে, তার হিসেব কিতেব নেই। কিন্তু নিজে সুখ সোয়াস্তি পাই নি; এক ভয় ছিল তুমি—" বড় বাধ বাঁধ করিয়া অনেক কষ্টে তরী কথা শেষ করিল,—'তুমি আমার কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করেছিলে।"

আজ তারকের সেই সব কথা তুলসী বৈষ্ণবীর ঘরের সেই নিষ্কাম সতীরূপ মনে পড়িতেছিল। সে তরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "সে দোষ আমার বুঝেছি, তরি; তুমি গুণে আমার অনেক বড়।"

তখন তরী মাথা তুলিল, তাহার সে অনিন্দ্য রূপ এত দুঃখেও তেমনি আছে; কেবল এক মাথা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যেন সে কালো কুন্তল তরঙ্গে কে চুণ ঢালিয়া দিয়াছে। বিধবা তরীর বেশ-সধবার, হাতে শাঁখা, মাথার রক্ত অলক্তকে সিন্দুররেখা। মাথা তুলিয়া সে হাসিল, বলিল,—"আমি যে তোমায় বলেই তা' পেরেছিলুম, তোমার বড় কি আমি হ'তে পারি। বাবা এখানে এয়েছেন? না?" খুড়া অঙ্গুলি দিয়া অদূরে বট গাছ দেখাইয়া দিল। তরী সেই দিক উদ্দেশ করিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বার বার প্রণাম

করিল, বলিল,—"নবদ্বীপে আমার সব দুঃখ জ্বালার ভার তুলে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিয়ে তোমার কাছে এসে আছেন। অমন শিবের মত মানুষ কি আর হয়? আমরা কি ভাগ্যি করেছিলুম বল দেখি যে এমন মানুষের সঙ্গ পেলুম?"

সে নিশা যে কোথা দিয়া কাটিল, সেইখানে তেমনি উপবিষ্ট দু'জনের একজনও বুঝিতে পারিল না। সকালে তরী যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে নবদ্বীপের উদ্দেশে চলিয়া গেল, যাইবার সময় পায়ের ধুলা লইয়া চক্ষের পাতাভরা অশ্রু চাপিয়া কাঁপা গলায় বলিয়া গেল,—"আমায় না পেয়ে তবু তুমি সুখে ছিলে, কিন্তু পরে সমাজের হাতে আমার লাঞ্ছনার বাজ তোমার বুকে যে কি রকম বেজেছিল তা' আমার বুঝতে বাকি ছিল না। তাই যখন শুনলুম তুমি পোড়া বিধির ওপর রেগে এমন সোণার বাটীতে কি ছাই পাঁশ তুলে খাচ্ছ, তখন তোমায় ছুঁতে পারি নি, কেবলাগত পড়ে পড়ে কেঁদেছি। বাবা আমার কান্না দেখে এলেন, তখন সাহস হ'লো, বুঝতে পারলুম, এ হতভাগীর চোখের জলে তোমার পাপ ধুয়ে গেছে। মন আর দেহটা আসবার জন্যে কাঁদতো, কিন্তু কে যেন শক্ত করে চুলের মুঠি ধরেছিল,—আসতে দেয়নি, তখন এমন করে বুঝিনি যে, এ সাধ আশা কি অবধি এছে গেলে তোমায় কত বড় পাওয়ার মধ্যে পাব।"

খুড়া এক বুক ঝড় লইয়া তরীর মুখের পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল। তরী বড় আনন্দে অবলীলাক্রমে নবদ্বীপের পথে চলিয়া গেল, তাহার মনে হইতেছিল, আর না দেখা হইলেও চলিবে, এ মিলন ভাঙ্গিবে না। বিধবা তরীর সীঁথির সিন্দুর তখন সতীর পুণ্যে জ্বল জ্বল করিতেছিল।

খুড়া বাড়ী ফিরিয়া সংসারের কাজে ব্যস্ত বামার কাছে আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সে আনন্দময় মূর্ত্তিখানা নিস্পন্দ ভাবে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বামা হাতের ঝাটাগাছটা ফেলিয়া দিল, খুড়ার কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বরে অপার স্নেহ ঢালিয়া বলিল,—"আহা! এসেছিল?" সে কথায় খুড়ার দুই চক্ষু বহিয়া ধারা নামিল। বামা সেইখানে মায়ের মত তাঁহার মাথা কোলে লইয়া বসিল; এত বড় বঁড়লে মেয়ের কণ্ঠ চেষ্টা করিয়াও কথা বাহির হইল না।

বাঙ্গালীর দিবার ধন।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

কেমন ভাবে ও আদর্শে রঙিয়া গেলে বাঙ্গলার পূরা মানুষটি হওয়া যায়, এই হইল এখনকার বড় সমস্যা। আমাদের ছিল মন্দ মন্দ তরঙ্গ ভঙ্গে নীল অকূলের মধুর ধ্যানস্তিমিত রূপ; তাহার পর পশ্চিমের পাগল ভবের তুফান আসিয়া সে শান্ত সাগরে উন্মাদ চঞ্চল গতি জাগাইল। তাই আজ জাতির বুকে বাঁচিয়া সার্থক হইবার এত আকুলি ব্যাকুলি। কিন্তু এই অন্তর্মুখ দেবাদিদেবের যোগভঙ্গে তাঁহার তৃতীয় নেত্রজ অগ্নিতে এ অকাল বসন্ত হিল্লোলের দেবতাটি বুঝি পুড়িয়া মরিবে, তাহার পর নবসৃষ্টি লীলায় ঠাকুর মাতিবেন।

কর্ম্মপ্রেরণার মাতাল ইউরোপের স্পর্শে অধীর হইয়া যাঁহারা অকালে বসন্তের রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সে বিড়ম্বনার ফলে জাতির বুকে চেতনা আসিয়াছে, সে সাজান বাগান ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে; বাঙ্গালী বুঝিয়াছে মনে প্রাণে জ্ঞানে বাঙ্গালী হইয়াই তাহাকে বড় হইতে হইবে। নকল করিয়া আমরা নেপোলিয়ন বিসমার্ক বা টলষ্টয় হইতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে মায়ের ছেলে বলিয়া গর্ব্ব করিবার কিছুই আমাদের থাকিবে না। সেটি হইবে ময়ূর-পক্ষীয় সঙ দেওয়া, তাহার ফল সঙের মিছিলে বাহবা কুড়ান, ঠিক ঠিক হুবহু নকল করিয়া আসলের ভ্রম ঘটাইয়া মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করা। লোকে তাহা দেখিয়া তারিফ করিবে বটে, ইউরোপকে ডাকিয়া হাঁকিয়া বলিবে বটে, "গোরা সাহেব! তোমরা না ভাব আমরা অমনটি কোন মতেই হইতে পারি না", কিন্তু সকলেই মনে প্রাণে বুঝিবে, এটি পরের ধার করা মহত্ব। সে সঙের পায়ে মাথা তো কাহারও লুটাইয়া পড়িবে না, প্রাণের ভক্তি প্রেমে সে চরণ দুইটি চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিতে তো কাহারও প্রাণ চাহিবে না। যাহারা ইংরাজি সভ্যতার আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে নাই, এমন নিরক্ষর চাষী বাঙ্গলা সে বস্তু তো আদৌ চিনিতেই পারিবে না কারণ গঙ্গাভাগীরথী পদ্মার দেশের তো কিছুই তাহাতে নাই।

ইংরাজের যা গুণ, তাহা রজোগুণের প্রায় পূর্ণাবতার ভোগবীর ইংরাজকেই সাজে ভাল। সে সব গুণসম্পদে এক জন ইংরাজ গুণী হইলে, জগৎ তাহাকে শ্রদ্ধায় পূজা করে, কারণ সে জিনিসটি যে তাহার জাতির ধারার পূর্ণ আদর্শ, সে

যে খাঁটি আসল বস্তু, নকল মোটেই নহে। নকল হাজার ভাল হইলেও এ বিশ্বের হাটে আসলের দরে তাহা কখনও বিকায় না, কারণ, বাজারে পাকা জহরী অনেক আছে। ইউরোপের নকলনবিশকে ইউরোপেও শ্রদ্ধা করে না, কারণ ইউরোপ জীবন্তজাতি বলিয়া চিরদিনই নবীনের ও সত্যের পূজারি।

মানুষের প্রাণটুকু যদি ঠিক থাকে, তাহার বুকের দেউল হইতে যদি তাহার জাতির অন্তর্দেবতার বিগ্রহ উঠিয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার বেশভূষায় আচার ব্যবহারে পরের অনুকরণ তবু সহ্য হয়। দৃষ্টান্ত সে কালের শ্রীমধুসূদন, একালের আচার্য্য জগদীশ ও প্রফুল্ল চন্দ্র। তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা সকলই প্রতীচ্য গুরুর পদতলে হইলেও প্রাণটুকু শ্যামসজল তালতুলসীশ্রীমন্দির-ভরা বাঙ্গলার প্রেমে ভর ভরে, তাই তাঁহারা দুই হাতে মায়ের সেবায় রত। কিন্তু ভগবানের দানে যিনি বড়, তাঁহার যাহা সাজে, ছোটর তাহা আদৌ সাজে না, তাহার পক্ষে পরের ভাল কুড়াইতে গিয়া আত্মহারা হইয়া নিজের ভালটুকু হারাইয়া ফেলিবার ভয় আছে। একরতি ত্যাগ বা তপস্যা নাই দশের হিতের বৈরাগীর ঝোলা কখনও কাঁধে উঠে নাই, তাহার মাথায় বাঁকা পায়রার খোপের তেড়ি ও পাশ্চাত্যের ঝাঁঝাল মদের মাতলামী ও ঢলাঢলি, সে যে বড় পাপ।

আমরা ঢাল তলোয়ার ধরিয়া ইংরাজকে তাড়াইয়া দিলেই সব হইবে, এইটি হইল রাগের ও অন্ধ বিদ্বেষের কথা, অন্তরের মণিকোঠায় বসিয়া জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া তত্ত্বদর্শনের কথা নহে। যদি বল বিদ্বেষে কি কাজ হয় না?' হইবে না কেন? হয়, তবে সেটা তোমার আমার বাহাদুরী নয়, সংসারের শত শত ভালমন্দ, পাপপুণ্য, অনাচার, অবিচারের মধ্যে যে এক সর্ব্বগ শিবভাব মালায় জরির সূতার মত জ্বলিতেছে, তাহারি বশে তোমার আমার রাগে দ্বেষেও কল্যাণ প্রসব করে। তাহা বলিয়া ছোট আদর্শকে কি ছোট বলিব না? সেই রাজা রামমোহন হইতে আজ অবধি কত গায়কের দল আসিল গেল, কত নিতুই নব পালা গাহিয়া নিশি ভোর করিল। তাহারা তো সব বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যেটি অবিচ্ছেদ ধারায় তাহাদের গানে পালায় রসে রাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম time spirit বা যুগধর্ম্ম। এক হিসাবে মানুষ কিছুই নহে,—ছোট ছোট পিঁপড়ার সার মাত্র, এই যুগমন্ত্রই সব। যখন যুগ পাল্টাইবার সন্ধিক্ষণ আসে, তখন তুমি আমি যাহাই করি না কেন, সে ভাল হউক মন্দ হউক, পাপ হউক দ্বেষ হউক, এই জাগ্রত যুগ-পুরুষ তাহা হইতে নিরত কল্যাণ গড়িয়া লন; সবই ঘাত প্রতিঘাতে অমোঘ অব্যর্থ লক্ষ্যে তাঁহার মূর্ত্ত রূপই

গড়িয়া তোলে। তাহা বলিয়া কি পাপ পাপ নহে; বেষ প্রেমের চেয়ে বড় ?

এই যে ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে কত সোণার দেশ নরকঙ্কালে ভরিয়া শ্মশান করিয়া দিল, সেই এতবড় পাপ, এতবড় জিঘাংসারও পরিণাম হইতে দেখ সুধাভাণ্ডকরা লক্ষ্মী উঠিতেছেন। আজ সমস্ত ইংলণ্ড ইটালী ফ্রান্স জার্ম্মানী রুষ আমেরিকাময় কেমন এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কত ছোট ছোট জাতির জীবনে বসন্ত দেখা দিয়াছে, জগন্ময়ী একচ্ছত্রা স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের শুভ ইচ্ছার বশে পশ্চিমে আজ কত মহাপ্রাণ জন্মিয়াছেন। বিষও যে উঠে নাই, তাহা নহে ; Militant Bolshevism—ধনী নির্ধনের কলহ, স্ত্রীলোকের ভয়াবহ পরধর্ম্ম আশ্রয় করিবার প্রয়াস, বিবাহের পবিত্র মন্ত্রের উপর অশ্রদ্ধা, এমনই কত গরলই যে এই সাগর-মন্থন বলে উঠিয়াছে তাহার হিসাব করা কঠিন। তবে ভাবনা নাই, কারণ সে বিষ আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ নাম ধরিবার বল রাখে এমন মহাশক্তির শান্তরূপও আসিবেন, নহিলে সৃষ্টি যে ছারখারে যাইবে, যুগদেবতার জীবন ব্যর্থ হইবে। তাহা কি কখন ইতিহাসে হইয়াছে ?

ইউরোপের ইহারা সবাই ভাঙিতে পাগল, গড়িবার শক্তি তো কেহ ধরে না। জগতের দিকে চাহিয়া আজ মনে হইতেছে যেন ঠাকুরের দেউল খালি পড়িয়া আছে, তাহার জীর্ণ দেয়ালে অশ্বত্থ গাছ, কার্ণিশে ঘুলঘুলিতে আলিশায় বাদুড় চামচিকার বাথান, মন্দিরে বিগ্রহ নাই, অনেক দিনের পূজার শুষ্ক নৈবেদ্য বেলপাতা পড়িয়া আছে। আর ইহারা করিতেছে কি জান ? প্রতিদিন ঊষা ও সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরে জুটিয়া প্রাণপণে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতেছে, শাঁক ফুঁকিয়া চামর দোলাইয়া তারস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছে; ইচ্ছা, লোকে ভাবুক এখানে ঠাকুর আছে। দেবতা নাই বুঝিলে, যদি লোকে নির্ভরসা হইয়া যায়, হাল ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের কিন্তু চক্ষু আছে, তাহারা দেখিতেছে, বাঙ্গলার তথা সমস্ত জগতের মাঠ ঘাট আমবন নদীতট বাজার নগর ভরিয়া ঠাকুরের জলজলে আবির্ভাব আসিতেছে। বিগ্রহ এখন চিন্ময়, পূজা এখন দেশজোড়া। উহারা চার যন্ত্র গড়িয়া দেয়াল ঘিরিয়া তাহার মধ্যে সত্যধনকে বাঁধিবে; ফলে মানুষ গড়িবে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্থার ধর্ম্মের জন্ম দিবে, কিন্তু বাহিরের যন্ত্রে যে অন্তরের ধন বাঁধা পড়ে না, তাহা ইহাদিগকে বুঝাইবে কে ?

শূন্য মন্দিরে ভূয়া ঠাকুরের পূজায় আজ দেশে কাণ পাতিবার উপায় নাই।

তাই তাহাতে ভাবের গঙ্গা নামিয়া আসে না, দেশের চেতনার সাড়া জাগায় না। যে আদর্শগুলি আজ 'আমায় নাও" "আমায় নাও" বলিয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সে গুলিকে এখানে বাহির না করিয়া প্যারী কি বার্লিনের রাজ পথে বাহির করিলে কেহ কি চিনিতে পারে যে, এগুলি সেই তুষারধবল হিমাচলঘেরা তমালতালী বনরাজিনীলা বেলামগ্না দেশের জিনিস। তাহাতে আমের মুকুলের গন্ধ নাই, তাহাতে গায়ত্রীর ভূমার অবাঙ্মনসগোচর নিবিড়তা নাই, তাহাতে যমুনা নর্ম্মদার 'সে জল নীলে অপরূপ সৌধছবি'র মত স্বপ্ন স্বপ্নের মধুগন্ধ নাই। তাই সে গুলি লইয়া ইংরাজি শেখা সেই ভাবের ভাবুক ইঙ্গ-বঙ্গই মাতে, মাঠের চাষী, দোকানের মুদী, বনের আহিরখন্দ সাঁওতাল মাতে না।

যদি বল, ইউরোপের ভাল যাহা, তাহা এমনি করিয়া হজম করিয়া লইব। তা তর্কচঞ্চু জিহ্বাসিদ্ধ তোমরা তাবস্বরে তাড়া করিয়া আসিলে আর কি করিব, নির্ব্বিরোধী আমরা চুপ করিয়া থাকিব। তবে যদি বলিতে দাও, তাহা হইলে বলাই একান্ত দরকার যে হজম করিতে গিয়া নিজে না হজম হইয়া যাও। জীবন্ত রজোবীর জ্ঞানগম্ভীর কর্ম্মী উহারা এ জগতে জগন্ময়ীর তকমা পাইয়া অবধি এ যাবৎ অনেক লোককে হজম করিয়াছে। আর তোমরা সে অভ্যাস সে aggressive দিগ্বিজয়ী গর্ব্ব ও পৌরুষ বহুকাল খোয়াইয়া বসিয়া বসিয়া হজম করিতে আজ নিতান্ত অনভ্যস্ত, এত দিন গ্রীক মোগল পাঠান ফরাসী ওলন্দাজ ইংরাজ প্রভৃতি অনেক মনুষ্যভোজীর কাছে উদরস্থ হওয়াটাই মুখস্থ করিতেছিলে। তাই ভয় নাই বটে, কিন্তু ভরসাও নিতান্ত অল্প, এখনই তো প্রায় হজম হইবার দাখিল। আর হাজার অনুকরণ কর, তোমরা হবে নকল, তার পাশ্চাত্য থাকিবে আসল। নকলই যদি করিতে হয়, তবে নকল ময়ূরপুচ্ছ রাজ্য না হইয়া আসল প্যাখম তোলা ময়ূরের রাজ্যই থাক না? নকলের অপেক্ষা আসল যে চিরদিনই ভাল, ইহার বড় সত্য তো আর নাই।

অধিকন্তু নকল করা আর হজম করার আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমরা যাহা উদরস্থ করিব, অস্থি মাংসে মেদ মজ্জায় রসে রক্তে মজিয়া তাহা এই ধুতি চাদর পরা তেলে জলে বাঙ্গালীই তো গড়িয়া তুলিবে, নূতন আসিয়া জ্যোতির ঝলকে পুরাতনের বিগ্রহেই মিশিয়া যাইবে তো। ইউরোপের শত শত বৎসরের সঞ্চিত প্রেরণার যে অভিব্যক্তি, তাহা স্বভাবতঃ রাজস, আমাদের সহস্র সহস্র বর্ষের হিমাচল-পাদচুম্বিতা জীবন গঙ্গার পূর্ণ কলগতি তেমনি

স্বভাবতঃ রাজস-সাত্ত্বিক। উহাদের যাহা ভাল, তাহা আমাদিগের ভাল কেমন করিয়া হইবে? বৃহৎ উদ্ভিদ ধর্ম্মে তাল তমাল এক বটে, কিন্তু তাল তমালের তেমনি পিয়াল বকুল কদম্ব কুমুদের মোহনীয় বৈচিত্র রসেই তো এমন মধুর কাননশ্রী। একের কোলে বহু—পুরাতনের শ্রীঅঙ্গে নবীনের যৌবনজোয়ার, এই তো fulfilment of the past in the new; আপনাকে হারাইয়া রূপান্তর নহে, আপনাকে আরও প্রাণ ভরিয়া কুড়াইয়া পাইয়াই তো নূতনের বরণ। তাই বলি আগে হিন্দুকুলচূড়ামণি হও, তাহার পর যত পার হজম করিও। তবেই তাহা সত্য নিজস্ব ধন হইয়া যাইবে, তোমার গঙ্গাতুলসী-মঙ্গল সেই ঋক্‌ময় জীবনকে নূতন সম্পদে মহিমাময় ও ভরাট করিয়া তুলিবে। লক্ষ্মণের গণ্ডী আঁকা আছে, তাহার বাহিরে যাইও না, দশস্কন্ধ হরিয়া লইবে; অবশেষে ছাড়াইতে গিয়া লঙ্কাকাণ্ড হইবে আর কি। হিন্দুর চন্দনচর্চ্চিত চীনজাপান শ্যাম সিংহল গ্রাসী ঋষিজীবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া পর হইয়া উপদেশ দিও না, সে চৌমাথার পাহারাওয়ালার গায়ে পড়া কথা কেহ শুনিবে না।

নব মন্ত্র তো আসিয়াছে, বোধন তো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ভুল ভ্রান্তি কর্ম্ম অকর্ম্ম সুপথ কুপথ সবই সেই পূজার উপকরণ; পূজা হইবেই, কেহ তাহা রুধিতে পারিবে না। আজ সমস্ত ইউরোপও এই যজ্ঞের হোতা, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে একই নহবত, একই মন্ত্রধ্বনি। এখন বল দেখি, এ নবীনের যুগমন্ত্র কি? কোন্ আদর্শ সবার বড়? কোন্ নামে এ জাতির জন্য সর্ব্ব-পাবন তারক গুণ আছে? সেই মন্ত্র যাহা বর্ত্তমান হইতে যোজন পথ অগ্রগামী হইয়া চলিতেছে; শঙ্খহস্তে ভগীরথের মত এমনি অগ্রবর্ত্তী আকর্ষণশক্তি-ভরা আদর্শ পাইলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত বাঁচাইবার পতিত-পাবনী জীবন গঙ্গা বহিয়া আসে। এ আদর্শ far in advance of time—তাই তাহাতে এঞ্জিনের মত টান, মদের মত নেশা, মন্ত্রের মত মরা বাঁচাইবার বল আছে। কালের আগে যায়, ভবিষ্যতের বিরাট ঋদ্ধি বুকে ধরিয়া চলে বলিয়া সে আদর্শে প্রথম প্রথম লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, ছোট দীন প্রাণ ভয়ে সন্দেহে পিছাইয়া পড়ে; এমনি কি ধীর মতিমানেরও বড় দুঃসাধ্যসাধন বলিয়া বোধ হয়। তা' কঠিন বৈকি,' কঠিন দুর্গম বলিয়াই তো এটি পঞ্চ পাণ্ডবের স্বর্গের আরোহণ পথ। ইহা মন্ত্রের সাধনস্বরূপ জীবনব্রত, তাই বড় দুঃখেই পাইতে হয়, পাইলে দুঃখ থাকে না, দুঃখের আত্যন্তিক ক্ষয় হয়। জনক, শ্রীরামচন্দ্র, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ এদেশের রাজা; গুরুগোবিন্দ, বিবেকানন্দ

ও তপস্বী গান্ধি এ দেশের বীর ; নিবেদিতা, মাতাজী, ঈশ্বরচন্দ্র এদেশের শিক্ষক, ভারতে কর্ম্মের যে পথ দেখ এইরূপ তপস্বীই পাইবে। সত্ত্বের উপর এদেশের রজঃ প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগ ও তপস্তার অখণ্ড ঠাকুর আসিয়া এদেশে রাজবেশে স্বর্ণাসনে বসিয়া ভোগ গ্রহণ করেন। ভোগ ও ত্যাগের চূড়ান্ত সমন্বয় হয় কেবল এই দেশে। একবার তাহা হইয়াছিল, আবার আরও পূর্ণভাবে হইবে। আজ অবধি যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্বর্ণযুগের অগ্রদূত। যীশু আসিবেন, তাঁহার আসন তৈয়ারী করিবার জন্ত আসিলেন এক উলঙ্গ যোগী—জন্ দি ব্যাপটিষ্ট। তিনি বলিলেন, আমি নবযুগের বাণী—A voice in the wilderness, "বলিতে আসিয়াছি স্বর্গ রাজ্য সন্নিহিত, উঠ, জাগ, দেবতাকে দুয়ার খুলিয়া দাও।"

স্বর্গরাজ্য যে আসিতেছে তাহার সাড়া ইউরোপ আমেরিকা চীন ভারত সর্ব্বত্র পড়িয়াছে। ১৯১৭ সালের বাঙ্গলার সভাপতির সম্ভাষণে কবি দেশ-সেবক চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, দৈন্য, অপার শক্তির অভিমান-জনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, স্পষ্ট চক্ষে দেখিতেছি, এই পবিত্র ভস্মসমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলন মন্দির রচনা করিতেছে। সকল প্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্ম এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশ সাধন করে, এবং সেই বিনাশের মুখে পরানুরক্তি জাগাইয়া দেয়। এই পরানুরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব।"

তাঁর দর্শন সত্য, সে পরানুরক্তি জাগিয়াছে, ইউরোপের কর্ম্মযোগী ও জ্ঞান-বীরদিগের হৃদয়ে। সর্ব্বত্র তাহাই হয়। একটি জাতির মধ্যে নবযুগের প্রেরণা বুকে লইয়া নবমন্ত্র যখন প্রবেশ করে, তখন তাহা খুব বড় বিমল প্রাণগুলি বাছিয়া লইয়া তাহার রসে শক্তিতে বিদ্যুন্ময় হইতে থাকে। ভাবের পারিজাত ফুটাইয়া প্রথম নন্দন-কানন রচনা নরদেবতার হৃদয়-বৈকুণ্ঠেই হয়। ভাব ধরিবার ও নূতনের তন্বয়ী দামিনী বুকের হার করিবার ধৈর্য্য ও বল কয়জনের থাকে ? অফুরন্ত ধাবায় পাইয়া অকাতরে দিবার বুকটা যে কূলহারা সাগরের মত বড় হওয়া চাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, ত্যাগ ও তপস্তার আবশ্যক কি ? যদি আনন্দের ভোগই জীবনের সার হয়, তবে কেবল সুখান্বেষণেই সবার বড় সার্থকতা হইবে

না কেন? কিন্তু তাহা হয় না; সমস্ত মানব ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইউরোপের খণ্ডজীবনে এই সাধনারই চূড়ান্ত পরিণতি তো হইতেছিল। কিন্তু নিজের স্বার্থ সুখ সুবিধা দাবী দাওয়ার অজুহাতে এ সংসার ভোগ করিতে গিয়া ইউরোপ আনন্দ পাইয়াছে কি? তুমি বলিবে, ঐহিক সুখ পাইয়াছে, আমিও স্বীকার করি পাইয়াছে, কিন্তু বড় কম। ইউরোপ যত প্রাণান্তক পরিশ্রম করিয়াছে, যত 'টানাপোড়েন' সহিয়াছে, আজ অবধি যত কাঁচা মাথা অকাতরে দিয়া আসিয়াছে, যে পর্বতপ্রমাণ রাশীকৃত উপকরণ মাল মসলা যন্ত্রপাতি জুটাইয়াছে, তাহার তুলনায় সুখ বিন্দু বিন্দু মাত্র পাইয়াছে। এত মারামারি, যুদ্ধ অভিযান ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে যেখানে এক ফোটা সুখ জুটিয়াছে, দুঃখ সেখানে স্তুপাকার হইয়া উঠিয়াছে। ফলে সমস্ত ইউরোপের বুকখানা জুড়িয়া আজ অশান্তি রোষ ব্যর্থতার হাহাকার দৈন্য বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের কলকারখানাভরা বৈশ্যবৃত্তি Industrialism দেখ,—দশজনে মিলিয়া লক্ষ জনের ধন চুরি করিয়া খাইবার এমন সুগম পথ আর নাই। তাহাদের সাম্রাজ্য-গৌরব Imperialism দেখ—ইংলণ্ড জার্মানী ফ্রান্স ইটালী সসাগরা জগৎ জয় করিয়া জাতীয় যশের কি সুন্দর মধুচক্র গড়িয়াছে; কিন্তু তাহার ফলে কত দুর্বল জাতি গৃহহারা ও বঞ্চিত; এক দিকে যশের জাতি-গরিমার হিমাচল, আর এক দিকে চক্ষের জলের অপার সাগর। তাহাদের সমাজে মাটির মেয়ের পূজা Chivalry দেখ, সেই নিছক ভোগের গড়া ঐহিক সম্বন্ধের অনিবার্য্য ফলে সুখ সুবিধা সব লইয়া স্ত্রীপুরুষে আজ কি বীভৎস কাড়াকাড়ি চলিতেছে। ওরা মূর্ত্ত ভোগের মৃন্ময়ীকে লইয়াই থাকে, ত্যাগের দেবী চিন্ময়ীকে চিনি চিনি করিয়াও চেনে না; সংযমীই যে জীবন্ত মাধুরীপ্রতিমা নারীকে একান্তভাবে বুক ভরিয়া পায়, কামুক নিরর্থক বাসনার দাহে সে সিন্ধুকে যে বিন্দু করিয়াই শুধু বঞ্চিত হয়, ভোগভূমির সাধক ইউরোপ এ তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিল না। ইউরোপের ধর্ম্ম Christianity তাহাও দেখ,—অন্তর্দেবতাকে ভুলিয়া বাহিরের স্বর্গের ঠাকুর সেই ঐহিকের নিয়ন্তার পূজা পাশ্চাত্য শুধু গিরজায় বসিয়া করিতেছে, যীশুর কথা—"আমার মধ্যে ভগবান, ভগবানের মধ্যে জগৎ", প্রেমের এই অনুপম অদ্বৈততত্ত্ব ভোগভূমির সন্তান ইউরোপ শুনিয়াও ধরিতে পারে নাই, ফলে তাই পাপ পাপ করিয়া কেবল কাঁদা, কেবল অনুতাপ, শুধু সয়তান আর অনন্ত নরক। ইউরোপের স্বার্থের গড়া বালির ঘরে তাই আজ এত ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাই সেখানে এত

নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বস্তুতান্ত্রিক ইউটিলিটেরিয়ানের ছড়াছড়ি। ও দেশে ঋষি ছিল না, ছিল শুধু পুরোহিত আর সন্দেহবাদীর দল। রাজনীতি ও সমাজ-নীতিতেও গণতান্ত্রিক, বিপ্লবপন্থী, বৈরাগ্যবাদী সমাজপন্থীর মত কত ধ্বংসপাগল কালাপাহাড়ের দল আসিয়াছে, কেবল দুই হাতে ভাঙ্গিতে, আর সেই পুরাতন বহির্মুখী যন্ত্র ফেলিয়া নূতন অথচ ঠিক তেমনি আর একটি বাহিরের যন্ত্র গড়িতে। উহারা ভাবিত বাহিরে সমাজে শাসনতন্ত্রে এমন একটা চুড়ান্ত রকমের কল গড়িয়া তুলিবে, যাহার চাকা ঘুরাইলেই অনায়াসে যত সুখ সুবিধা যশ সম্পদ শান্তি আর ন্যায়ের বিধান প্রসূত হইতে থাকিবে। এই অন্তর্বিমুখ বহির্বাদীরা বুঝিতে পারে না যে সুখশান্তি ধর্মের ধন; সে কল বাহিরে কিছুতেই হইতে পারে না, মানুষের বুকের মাঝে জগৎপতি সে কল আপনি পাতিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপেও আজ সুবাতাস বহিয়াছে; সেখানে জ্ঞানে প্রেমে তত্ত্বে যাহারা সকলের বড়, তাঁহারা আজ প্রায় বুঝিয়াছেন যে অন্তঃপ্রেরণাই বাহিরে আসিয়া মূর্ত্ত ও সার্থক হয়, হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ বসিলে বাহিরে ভূস্বর্গ সেই অন্ত সৌরভেই আপনি গড়িয়া উঠে।

জগতের কাছে ভারতের যে বাণী রূপ ধরিবে, বাঙ্গলার চিত্তকমলে সে তত্ত্বময়ী কমলাসনা আজ বিগ্রহময়ী। নবজাগরণের এই নব মন্ত্র বলিতেছে, "হে মানব-সমাজ! অন্তরে ফিরে এস। মর্ম্মের মণিকোঠায় তোমার অন্তর্ধনকে খুঁজে পেলেই বাহিরের এই মাটির গড়া (soulless) আদর্শ চিন্ময় দেউলে পরিণত হবে।" আমাদের কাজ বাহিরে নহে, নিজের মধ্যে, আবার শুধু অন্তরেই নয়, বাহিরেও বটে। আগে আত্মজয়ী হও, রিপুর তুল্য ক্ষেপা ভূত প্রেতগুলাকে বাঁধ, তাহা হইলে তুমি পশুত্ব হইতে মানবত্বের মধ্য দিয়া, দেবত্বের কোঠায় উঠিয়া যাইবে। তাহা হইলে অত্যাচার অবিচার অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া আনন্দের খনি এ জগৎকে নরকে পরিণত করিবার আর থাকিবে কে? তবেই দেখ, অন্তর্জয়ের পরই ভোগজীবনে স্বর্গের রচনা, তাই ভারতে ত্যাগ ও তপস্যার দেবতাই ঐহিকের মণিময় স্বর্ণাসনে বসিবার অধিকারী।

এসিয়া ও ইউরোপের সাধনার অনুপম সামঞ্জস্যের এ অপূর্ব্ব তত্ত্ব জগৎকে শিখাইবার অধিকারী কে? গুরুই বা কি? নীতিধর্ম্মের 'ছেঁদো' কথায় শুধু ethicsএ চলিবে না। নীতিকথা বা copy book maxims মানুষ শুনিবে আর ভুলিয়া যাইবে, তাহাতে কাহারও প্রাণ ছুঁইবে না, চেতনাও আনিবে না। মিথ্যা স্বার্থের অন্বেষণে যে 'হবহু' সদ্য লাভ বহিয়াছে, অতি বড় লোভী বা কামুককে

তাহার বিপরীত কথা বুঝাইবার উপায় কি? উপায় আছে,—তিনটি। "পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়া চুরি করা কহে" বোধোদয় হইতে এই পাঠ দিয়া আসিয়া তো দেখিলে, কথায় চিঁড়া ভিজে না। অন্ধের কথায় অন্ধ সুপথ ধরে না, আর হাওয়ার প্রতিকূলে গুণ টানিয়া জাতির জীবননৌকা কূল পায় না। যাহা কথায় বুঝাইতে পারিবে না নিজের ও দেশের জীবনে তাহা সফল করিয়া বুঝাও, সত্য মূর্ত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হইলে "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" অন্ধকারে দাঁড়াইয়া "এই দিকে এস" "ঐদিকে যাও" বলিয়া ব্যর্থ চিৎকার করিলে অব্যবস্থিতচিত্ত লোক আরও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়। সত্যের বিগ্রহময় নরকলেবরধারী ভাস্বররূপে জ্যোতির মশাল হাতে করিয়া দাঁড়াও, পথ আপনি সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। প্রথম কথা এই।

দ্বিতীয় কথা—যাহা নিজের জীবনে তুমি সফল করিবে তাহা পরের জীবনে ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া সাধনের সহায়ে ফুটাইয়া তোল। নিজে করিয়া দেখাও, আর দশকে দিয়া করাইয়া লও। তাহাদের অশৈশব জীবনের ছোট ছোট খুঁটি নাটি কাজ কর্ম্ম চলা ফিরাকেই সাধনায় রূপান্তরিত করিয়া সমস্ত জীবনযজ্ঞটুকু সত্যের সহিত নিত্যযোগে যুক্ত কর। তাহা হইলে যাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছ, সে বুঝিতে পারিবে না, তোমার সহিত হাসিতে খেলিতে আনন্দের হাটে আনন্দ করিতে করিতে কবে কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে স্বর্গের স্বর্ণময় সিংহদ্বারে গিয়া পহুছিবে। ফাঁকা উপদেশের বিড়ম্বনায় তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত অধীর হইতে হইবে না, তোমার ইচ্ছা তাহার জীবনে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত নীরব সফলতায় সফল হইয়া উঠিবে।

তৃতীয় কথা নিত্য নৈমিত্তিক আটপৌরে জীবনকে পাশ কাটাইয়া দূরে ফেলিয়া পোষাকী একটা কিছু গড়িতে যাইও না। মানুষের ভুল ভ্রান্তি দৈন্য বেদনা জীবত্ব শিবত্ব সবটুকু অখণ্ড সত্যের মধ্যে বরণ করিয়া লও। মানুষ সুখকামী—ভগবানের অমোঘ বিধানে প্রবৃত্তির আগুনে পুড়িয়া মরিবার পতঙ্গ; তাহাকে নিবৃত্তি বা ইহবিমুখ আত্মঘাতের কষ্টকল্পনায় না ফেলিয়া নিত্যসুখের পথ দেখাও; বিন্দু সুখের কাঙাল সে সুখসিন্ধুর মহাসঙ্গম পথ বুঝিতে পারিলে ঐ প্রবৃত্তির ছয়ঘোড়ার জুড়ি গাড়িতে চড়িয়াই কর্ম্মকোলাহলের ঘর্ঘর পথে সত্য নগরে পৌঁছিবে। গির্জ্জায় চক্ষু মুদিয়া ধর্ম্ম, জীবনের অঙ্গন হইতে বহুদূরে বনে শিকলি-বাবার তপঃক্লিষ্ট কাষ্ঠমৌনই সত্যপথ, এরূপ আত্মঘাতীর ব্যবসা কয়জনকে শিখাইতে পারিবে বল দেখি, নীতির দোহাই দিয়া মনগড়া পুণ্যের

নামে কাঁচি হাতে ছাঁটিয়া ছাঁটিয়া জীবন তরুটি ন্যাড়ামুড়া-অমন শ্রীহীন করিয়া ফল কি? জীবনের সবটুকু ভগবদ্‌মুখী করিয়া দাও না। ভগবানের লীলার রসে বঞ্চিত ওগো অরসিক পূজারী। কসাইএর মত নির্ম্মম হস্তে ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ইটের দেউলে কাহার পূজা করিতেছ? প্রকৃতির স্বভাব-তীর্থে জীবনের শ্রীমন্দিরে যে কলপুষ্পে ভরা কত নির্ম্মাল্য কত নৈবেদ্য সাজান রহিয়াছে, পূজা যে অহরহঃ চলিতেছে। বিশ্ব পূজার সহজ আরাত্রিক কেন নষ্ট কর?

তবেই দেখ আগে বুঝাইতে হইবে সব সুখ সব আনন্দ শান্তি আমাদের অন্তর হইতে আসে, তার চাবিকাটি বুকের মাঝে আছে। নিজে তপস্যার ও প্রেমের অবতার হইয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, কামুক ফোঁটা ফোঁটা সুখ পায়, আর সংযমী সুখের অপার সাগরে ঝাঁপ দেয়। পরমার্থবীর সংযমের বল লইয়া যদি ভোগে থাকে, তাহা হইলে না পাওয়ার দুঃখ তাহার তেলা গায়ে জলের মত ঝরিয়া পড়ে, কারণ তাহার চাকাই নাই, আর পাওয়ার সুখ চতুর্গুণ করিয়া বুক ভরিয়া পায়, কারণ কামুকের মাটির নারী দু'দিনেই বিস্বাদ হইয়া পড়ে, কিন্তু সংযমীর মৃণ্ময়ীও বাদ যায় না, বৈশীর ভাগ চিন্ময়ী শ্রীরাধারূপ পাইয়া আনন্দ তাহার ফুরাইতে চায় না। তাহার জগৎ আর তত্ত্ব ভোগ আর ভগবান এক হইয়া যায়।

এ ধর্ম্ম নিবৃত্তি ধর্ম্ম নয়, এতদিন ত্যাগ-পোঁত্তলিকতে পাইয়া এ সোণার দেশকে শ্মশান করিয়া দিয়াছে। বুদ্ধ শঙ্কর নাগু সব সন্ন্যাসের উপর জোর দিয়া গিয়াছেন। সে মন্ত্র এ যুগের জীবনগঙ্গা নয়। সেই কথা শিখাইতে কর্ম্মবীর শুদ্ধ রজের পূর্ণ অবতার ইংরাজ আসিয়াছিল। আমাদের পরমার্থ উহাদের কর্ম্মের মুকুট পরিলে তবে তার সত্য সফল হয়, এ যুগের পূর্ণ মানুষ সেই যে প্রেমে গোরা, জ্ঞানে শুকদেব, ত্যাগে বুদ্ধ ও কর্ম্মে ইংরাজ। ইংরাজ আমাদের মনুষ্যত্ব দিবে, আমরা তাহাদের দেবত্ব দিব, কেহ কাহারও বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া পরস্পরের কাছে যাহা লইবার তাহা লইব, তখনই দুয়ের মিলন—The East and the West will not meet in vain। এই জন্য দু'টি মহাজাতি এ উহার এত কাছাকাছি মুখোমুখী হইয়াছে, মিলনের সাহানা যে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপের বড় বড় প্রাণ আর ভারতের বড় বড় প্রাণ সে মহামিলনের উৎসবের সাড়া মনে প্রাণে পাইয়াছে।

এ আদর্শ ঠিক শ্রীগৌরাঙ্গের মত "নদে টলমল করা" প্রেম বুকে করিয়া আসিবে, নহিলে এত জাত এত ছোট ছোট ধর্ম্মের আঁক জোঁক কাটা গণ্ডী

ঘুচিবে কে? এ অখণ্ড বানডাকা বন্যার মত সর্ব্বগ্রাসী মিলনের তত্ত্ব আনিবে, জগতের সব সভ্যতা সব ধর্ম্মের সামঞ্জস্য a Synthesis হইবে তাহার প্রাণ তবে তো ব্যবধান ঘুচিবে, তবে তো জগৎজোড়া একচ্ছত্রী মহামণ্ডলের সৃষ্টি হইবে।

কিন্তু জগতের আদর্শ জগতকে দিতে গেলে নিজের জীবন আগে ভরিয়া ওঠা চাই। যাহার নিজস্ব পরম ধন নাই, সে জগতকে দিবে কি? বাঙ্গালীকে সাহিত্যে কলায় বাণিজ্যে রাজনীতিতে ধর্ম্মে সমাজে সকল দিক দিয়া মনে জ্ঞানে প্রাণে বাঙ্গালী হইতে হইবে। এত বড় প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গের বাঙ্গলা ছাড়া তো আর কাহারও বুকে নাই। এ কয়েক শতাব্দির পর আজ পূজার বোধন যে বাঙ্গলার বেদীতে, মঙ্গল ঘট শস্যশ্যামলার দ্বারে রাখা হইয়াছে। "The Bengali spirit means more than the union of delicacy, grace and strength; it has lyrical mystic impulse, it has the passion for clerity and concreteness as in our literature, and so in our art we see these tendencies emerging— an emotion of beauty a nameless sweetness and spirituality pervading the clear line and form." অর্থাৎ বাঙ্গলার যুগমন্ত্র অর্থে শুধু কমনীয়তা লাবণী আর শক্তি নয়, ইহার বুকে মাধুরীঢালা ভাবময়ী প্রেরণা আছে; ইহার মাঝে স্বচ্ছ ঋজু গতির জন্য কত আকুলি ব্যাকুলি আছে এবং আমাদের সাহিত্যে ও কলায় তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে —তাহার সরল রূপটুকু ভরিয়া সহজ শ্রীছাঁদে মাখা আছে লাবণীর সোহাগ, নামধাম হারা বলিবার নয় এমন এক মধু এমন এক অপূর্ব্ব পরমার্থভাব। এইটি যদি মায়ের সাতকোটী ছেলে ফুটাইতে পারি তাহা হইলে কালই জগৎময় সাড়া পড়িবে, সেই সাড়াই হইবে নব আদর্শ। বাঙ্গলার বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গলার রবি বাংলার জগদীশ প্রফুল্ল বাঙ্গলার অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন কাহাকে ইউরোপ বুকের মাঝে আসন পাতিয়া দেয় নাই? এ ধন যে আমরা দিতে জীবন ধরিয়াছি; তাহাদের যে না লইয়া গতি নাই। তাই বলি বাঙ্গালী জাগ, আপন ধনে ধনী হও, তোমার বাণী "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশি" এই ধ্বংসের যুগে জগতের ব্যথাভরা বুক আকুল করুক।

পল্লীমার মাঠের পথে

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

এ পথ হয়েছে শেষ
কোথায় হা’রে।
বুঝি ওই আলভাঙা
মাঠের পারে।
এ পথে শেফালী ছাওয়া
রাখালের গান গাওয়া
অপরাজিতার লতা
ঘেরা দু’ধারে,
জোনাকীতে আলো করা
ঘোরা আঁধারে।
এ পথে মধুর হতে
কি মধুরতা,
মুখরিত কাকলীর
ললিত কথা।
এখানে গাছের শাখে
পিক-পিকবধূ ডাকে,
মুখোমুখী পাশাপাশী
কত একতা।
বনের পাখীরো প্রাণে
প্রেম মমতা।
এ পথে শারদ লক্ষ্মী
ছুটিয়া আসে,
মাঠে ছড়াইয়া চারু
হরিত বাসে ;

শিশির মুকুতা মালে,
কদম কিরীট ভালে,
গায়ের সুবাস ঢালি
কেতকীপাশে,
উড়ায়ে চাচর কেশ
মেঘে আকাশে।
ঐ পথে পল্লীবধু
বরষা শেষে
সরসী সোপানে আসে
মোহন বেশে,
পথ চাওয়া দু'টি আঁখি
চকিতে পথেতে রাখি,
লুকায় শেফালি মালা
আকুল কেশে,
জলকে যাইতে মৃদু
মধুর হেসে।
মোরে দাও ছেড়ে দাও ওই
জ্যোছনা ভরা
নিশি লক্ষ্মীপূর্ণিমায়,
উজল ধরা,
এই চাঁদিনার সনে
মিশাইয়া দেহ মনে,
তোমাদের ঘর ছেড়ে
সীমায় গড়া,
ছুটে যাই চলে যাই
দেব না ধরা।
দাও ছেড়ে দাও ওই
উদাস মাঠে,
পল্লীমায় পাখী ডাকা
শীতল বাটে ;

ভুলি ভূত ভবিষ্যৎ
নিন্দা স্তুতি মতামত,
পথে মোর ঘর কিম্বা
রাজার পাটে,
একদিন যাই চ'লে
উদার মাঠে।
একদিন শুধু মোরে
ডেক না পাছে
ভুলে যাও একজন
আছে না আছে,
একটি মাধবী নিশি
অতীতে যাক রে মিশি,
অশ্রান্ত আলোক ঢালি
আমার কাছে।
একদিন কেউ মোরে
ডেক না পাছে।
ঐ ডাকে কুসুরাণী
নীরব ভাষে,
চাঁদ তারা ডাকে মোরে
তাদের পাশে,
ডাকে মাঠ সোণাভরা
করবী শেফালী পরা,
ডাকে নিশি মনোহরা
কার সকাশে?
একদিন রাখ মোরে,
এই উল্লাসে।

ধর্ম্মের বাধা।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

আমাদের দেশে এখনো এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বলেন, দেশ হতে ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা চলে গিয়ে, এই সব দুর্দ্দশা হয়েছে। আমাদের যে-কোনো রকমের দুঃখ দৈন্যের মূলে হচ্ছে এই আধ্যাত্মিকতার অভাব। কি রাজনৈতিক কি সামাজিক, কি আর্থিক, সব অভাবের নিরাকরণ হবে, আবার লোকে'আধ্যাত্মিক হ'য়ে উঠ্‌বে।

এ কথার—এ কাঁদুনীর মূল্য কত তা জানিনি। আধ্যাত্মিক কথাটা খুব ব্যাপকার্থ; যদি এর মানে হয় মনের শক্তি—মনের তেজ,—মনের শিক্ষা, তা হলে কথাই নেই, আর যদি তা না হয়ে এর মানে হয় পরকালীন কিছু, যোগযাগ পূজা অর্চ্চনা কত ব্যাপার, তা' হলে কিছু বলিবার আছে।

এদের অভিযোগ আমরা বড় ভোগাসক্ত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অতি বিষয়মুখী হয়ে পড়েছি। উপনিষদের কথা ভুলে বলা হয়—সে কালে লোকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতো, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" হতে পারে প্রাচীনরা তাই কর্‌তেন ও করতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু বাস্তবিক বল্‌তে গেলে আমরা কি এত বেশী ভোগ কর্‌ছি যে ত্যাগের দ্বারা তা' কর্‌তে হবে? আছে কি যে ত্যাগ কর্‌বো? ভোগের যোগাড়ও নেই, শক্তিও নেই। সে ক্ষেত্রে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" শুনলে হাসিই পায়।

আমরা পেট ভ'রে খেতে পাই না; দরকার মত পরতে পাই না, রোগে ভুগ্‌লে চিকিৎসা করাতে পাই না; রোগে তো সারা বছর শতকরা ৮০ জন ভুগছেই। এর পর মড়কের নিত্য উৎসব। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাতো দূরের কথা, জীব হিসেবে বাঁচাই কঠিন হয়েছে। এর উপরও লোকে যদি বলে ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, তা' হলে কি ঠাট্টা করা হচ্চে বুঝব না?

এ কথা ইয়ুরোপ আমেরিকার লোকদের বেলায় খাটে। যারা সভ্যতাকে ভোগ বিলাস বলেই জেনেছে; জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে দেশের লোকরা ম্যামনকে (ধনের যক্ষ) যোড়শোপচারে পূজা কর্‌তে জেনেছে; 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে' যাদের ভোগ-পিপাসার নিবৃত্তি নেই; সূচ্যগ্র ভূমির জন্যে যারা সমস্ত ধরা তলটাকে নররক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারে, তাদের এখন শোনানো দরকার

হয়েছে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। সে দিন মার্কিনের এক সংবাদ পত্রে একজন রহস্য করে বলেছে—"A civilisation that has advanced from head-hunting and persecution to rent-gouging and profiteering has still some distance to travel"—Brooklyn Eagle। কথাটি মর্ম্মে মর্ম্মে সত্যি। পশ্চিমের অনেক গুণী জ্ঞানী ভাবুকের তন্দ্রা ভেঙ্গেছে; তাঁরা সভ্যতাদেবীর রাক্ষসীর ছদ্মবেশ খুলে যেতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছেন। তাঁরা বলতে চান—বিশ্বমানব এত দিন ভুল করে ভুল পথে চলেছিল—উন্নতির এ পথ নয়। এতো সভ্যতা নয়, আদিম পশুমানবের আদিম বর্ব্বরতাই এতদিন বাহারে পোষাক পরে মুখে পাউডার মেখে ঠোঁটে আলতা দিয়ে মন ভুলিয়ে আসছিল। এ ঢাকের গয়নাপরা রং-ধরানো মাটীর পুতুলের ভিতর সেই 'খ্যাড়'।

তাঁরা তাই এখন নূতন পথে ফেরবার জন্যে ডাক ছেড়েছেন। সে ডাক লোকে শুনবে এবং শুনে ঠিক পথে ফিরবে। শতদোষ সত্ত্বেও পশ্চিমের সভ্যতার ভিত্তিটা মনে হয় ঠিক। তারা জড়ের পাকা ভিত্তির উপর উন্নতির ইমারৎ তুলেছে। পশু দেবতার বাহন,, আমাদের শাস্ত্র-কল্পনায় তাই বলে। এ কথা ঠিক। মানুষের আদিম বা মূল প্রকৃতি জড়ের জগতে তার পশুত্ব, এই পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রতিষ্ঠা। সোজা কথায়, মানুষের এখনো পনেরো আনা জীবত্ব animality। জীবের জীবধর্ম্ম, পালনের যে প্রাথমিক দরকার গুলি, সে গুলিকে ছেঁটে ফেলে বা অস্বীকার করে দিলে চলবে না। সে গুলিকে পুরামাত্রায় বজায় রেখে, পুষ্ট করে, তবে তার ওপর মানুষের দেবাংশকে বসাতে হবে। আধ্যাত্মিকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা আধিভৌতিকে করতে হবে।

ইয়ুরোপ আধিভৌতিককে মেনে নিয়ে তার উত্তম মত গোড়া পত্তন করে এখন আধ্যাত্মিকের প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজছে। তাদের ভিত্তি ঠিক আছে বলে উপরের গঠনটার পুনঃসংস্কার শীগ্‌গির করতে পারবে। চারদিক দিয়ে সে লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। হেকেলের জড়বাদ আর এখন তেমন করে ওদেশের পণ্ডিতদের মোহাচ্ছন্ন করতে পারছে না,—বার্গসোঁর প্রাণবাদও তৃপ্তি দিতে পারছে না; অয়কেনের অধ্যাত্মবাদ মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই নয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আমরা - আধ্যাত্মিক জাত যারা—তারা এতদিন জড়ের বিদ্যা বলে উপহাস করে এসেছিলাম; সদর্পে বলতাম যতই কেন প্রকৃতি জয় করে এই বিজ্ঞান আস্ফালন করুক না, অতীন্দ্রিয় বা অধ্যাত্ম রাজ্যে এর মাথা

গলাবার শক্তি নেই। কিন্তু আমাদের সে দর্পও ঠাণ্ডা হতে চলেছে। Physics এখন Metaphysics এর বর্ডারল্যাণ্ডও পার হতে চললো। জড় আর জড় নয়, সে শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতি সে পুরুষেরই মুখোস্‌পরা মায়ারূপ। আমরা বলতাম, জীবাত্মা, জন্মান্তর, পরকাল এ সব ব্যাপার পরাবিদ্যারই আয়ত্তাধীন, জড়-বিজ্ঞান এ সবের ঘুণাক্ষর জানতে পারবে না। তাও টিঁকলো না। বিলাতের ও মার্কিনের প্রেততত্ত্ব সভার কাণ্ডকারখানার সঙ্গে যাঁরা পরিচয় রাখেন, তাঁরা জানেন, এই জড়বিজ্ঞানই তার পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, Induction, Deduction দিয়ে—যোগযাগ সাহায্যে নয় এই সব গূঢ় তত্ত্বের আভাষ পেয়েছে। আজ পশ্চিম জগতের ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকরা এই জড়-বিজ্ঞানের পন্থা ধরে জীবাত্মার দেহান্ত অবস্থা, অমরত্ব, পরলোক প্রায় প্রমাণ করতে পেরেছেন। এই হোলো Psychical society র ত্রিশ বৎসর ব্যাপী প্রাণপণ গবেষণার ফল। আজ যদি Lord Raleigh, Prof Crookes, Russel Wallace, J. J Thomson, William James, Prof. Richet, Lombroso প্রভৃতি মহাবৈজ্ঞানিকরা সদর্পে বলেন—বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবাদের তত্ত্ব ধরতে পেরেছে, দেহান্তে আত্মা সজ্ঞানে থাকে তার অটুট প্রমাণ আমরা পেয়েছি, এস দেখে যাও,—তা হলে কে এমন অসাবধানী আছে হঠাৎ তাদের অবিশ্বাস করবে?

তাই বলি প্রাচীন আর্য্য জাতিরা যে পথে চলে সত্যকে জেনেছিলেন, পাশ্চাত্য জাতিরা উল্টা পথে চলে সেই সত্যকেই জেনেছেন। জ্ঞাতব্য ও জ্ঞান একই। জ্ঞান লাভের পন্থাই জাতির প্রকৃতিভেদে আলাদা। পাশ্চাত্য জাতির স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে তাদের পক্ষে ঐ পদ্ধতিটা যেন সোজা, সরল, স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় সাধনা ও প্রকৃতি অনুসারে আমাদের পথ আমাদের পক্ষে সোজা।

তবে প্রাচীন হিন্দুজাতি আর আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি দু' জাতিই, সাধনার পথে ভুল করে বসেছে। উভয়েরই সিদ্ধি একমুখো হয়ে গিয়েছে, আমরা দেহকে অস্বীকার করে আত্মাকে চেয়েছিলাম, ফলে আমরা ইহকাল হারিয়েছি, এঁরা আত্মাকে না মেনে দেহকে, অধ্যাত্ম না মেনে জড়কে ধরেছিলেন, ফলে ইহকাল যদিও ভালই ভোগ করছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ হারিয়ে ভোগসর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছেন। দু' জাতই নিজ নিজ ভুল বুঝতে পেরেছে।

আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম—অন্ততঃ মানতে চাইনি যে মানুষের আধি-ভৌতিকটা সব আগে ও সবার ভিত্তি; এই আধিভৌতিককে অবলম্বন করে

আধ্যাত্মিক থাকে ও আছে। ফলে আমরা এখন প্রায় দু'কূল হারিয়ে বসছি। আর ওরা—ওরা তো আধিভৌতিকের ভিত্তি বেশ মজবুৎ করে নিয়েছে, আর হারাবার ভয় রাখে না। নানা রকমে ঠেকে শিখে, চোখে দেখে ভুল করে করে ওরা বুঝেছে আধিভৌতিকই সব নয়, ইহকাল, দেহ, দেহের ভোগ, এই-ই মানবজীবনের সার নয়। ইন্দ্রিয়ের উপরেও অতীন্দ্রিয় আছে—এ জীবনের পর অনন্ত জীবন আছে, যার সাধনা ও সার্থকতা ভোগের ভিতর দিয়ে নয়, ত্যাগের ভিতর দিয়ে।

কাজেই এরা এখন 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' করুক। ভোগের যে বাড়াবাড়ী হয়েছে তা' একটু কমাক্। দেহের সেবা ছেড়ে আসল দেহীর সেবা করুক। এক কথায় আধিভৌতিকের সিঁড়ি দিয়ে আধ্যাত্মিকের শিখরে উঠুক।

আমাদের তা' নয়। আমাদের আবার গোড়া পত্তন করতে হবে অর্থাৎ ভোগকে বরণ করতে হবে; জড়কে মানতে হবে এখন আমাদের ইহকাল-সর্ব্বস্ব হতে হবে। এখন চাই শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডী আসন পেতে জড়শক্তির সাধনা; সমস্ত জাতটাকে এখন পঞ্চমকার পুরো দমে সাধনা করতে হবে, তার সুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তি জেগে উঠুক, উঠে তার ষটচক্র ভেদ করে শীর্ষের আজ্ঞা চক্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। এখন চাই অর্থ, স্বাস্থ্য, সামর্থ, জ্ঞান; দারিদ্র্য, রোগ, দুর্ব্বলতা, অনশন, ভয় এই পাঁচটী চক্রকে ভেদ করে কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে উঠুক; উঠে, জড় প্রকৃতি। জড়শক্তিগুলাকে হুকুমে চাকরের মত খাটিয়ে নিক্; তখন নির্ব্বিকল্প হলে চলবে। এখন, শুধুই বিকল্প, আর কিছু না। এখন শুধু পশুত্বের উদ্বোধন। Herbert Spencer-এর সেই উক্তি মনে করুন, "The first requisite for a nation to be great and strong is to be a race of healthy animals.

যারা অত্যন্ত শক্তিমদমত্ত তাদের একটু বৈষ্ণবী সাধনা করা দরকার। যারা অবস্থার প্রতিকূলতায়, অন্ন-ব্রহ্মের শাপে মরার বাড়া হয়ে পড়ে আছে, তাদের এ সাধনা নয়, এতো জড় সমাধি। সমস্ত জাতটা পড়ে আছে শবের মত; অসাড় তার স্নায়ুযন্ত্র, শত অভাবে অসুবিধাতেও সাড় নাই তাদের বুকে—এখন উলঙ্গিনী রনরঙ্গিণী নৃত্যপরা আত্মাশক্তির পদস্পর্শ দরকার।

কোথা হতে এ আত্মাশক্তি আসবে? নিজের ভিতর হতে। এখানেই যে কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখে ল্যাজ পুরে সে শক্তি ঘুমিয়ে আছেন। ভাতে, জলে, ওষুধে, পথ্যে, জ্ঞানে, শিক্ষায় তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে।

হ্যাঁ—আমাদের এখন চাই পেটে ভাত, মনে জ্ঞান, রোগে ওষুধ—তবেই এ নির্জ্জীব দেহে একটু বল সঞ্চার হবে। ভোগ-ভোগ—ভোগ। এখন সাধনা হবে ভোগ, কামনা হবে ভোগ, স্বপ্ন হবে ভোগ। বিষয়ের ভোগ। 'তক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' নয়, 'সঞ্চয়েন ভুঞ্জীথাঃ'।

কে দেবে? নিজেই নিজেকে দেবে। ভিক্ষের ভাতে পেট ভরে না। ভরবেও না—নিজে সংগ্রহ করতে হবে।

পড়ে আছে ওই এখনো সুজলা শস্যশ্যামলা সীমাহীন ধানের ক্ষেত; নরুন দিয়ে যার গা আঁচড়ালে সোণা ফলে, সে দেশের ক্ষেতের ছেলে আমরা কার কাছে হাত পাত্‌তে যাব? কত দিন সদর দেউড়ীতে 'হা পিত্যেশ' করে হাত পেতে, চাকর দরোয়ানের বেত খাবো?

'আতুরে নিয়মো নাস্তি।' ঘরে আগুন লাগ্‌লে সবাই মুটে মজুর,—পথের বাসিন্দা। যেমন করে হোক এখন আমাদের পেটের ভাত জোগাড় কর্‌তে হবে।

অনেকে নিশ্চয়ই খুব রাগছেন, এই ধর্ম্মপ্রাণ সাত্ত্বিক পরকালসর্ব্বস্ব জাতটাকে কিনা পশ্চিমেদের মত ভোগী হতে বলা। সর্ব্বনাশ!! এ কি ভয়ানক কথা!!! ভয়ানকই বটে তবে আমার দিক দিয়ে নয়, অন্য দিক দিয়ে। এত ধর্ম্ম ধর্ম্ম ভাল নয়। ধর্ম্মের এই বাড়াবাড়িতে ভণ্ডামীতে আর বিটকেলপনাতেই জাতটার এই দুর্দ্দশা। জগতকে যে ধর্ম্ম চালায় বা ধারণ করে তাই সৎ ধর্ম্ম, যা বাঁধে বাধা দেয় তাই অসদ্ধর্ম্ম; আমি এই বর্ত্তমান অসদ্ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করছি। মনুষ্যেরও একটা জীব ধর্ম্ম আছে, যেটা পুঁথির ধর্ম্মের চেয়েও বড়। আমরা এই জীব ধর্ম্মের অমান্য করে আজ এমন হয়েছি। সবেরই 'অতি' বড় খারাপ, এই ধর্ম্মের 'অতি'টা কিছু নয়। অতি-ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির রাজা একটা ধর্ম্মের কল হয়ে পড়েছেন, দশ দিক হতে ধর্ম্মশাসনের খোঁচায় ভয়ে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে রয়েছেন, সমাজের তাই হয়েছে। অপধর্ম্মের ভয়ে কাঁটা হয়ে হেটমুণ্ডে পাশায় সর্ব্বস্ব হারিয়ে বিশ্বের বাজদরবারে বসে আছি আমরা ধর্ম্মের এই পোষ্য-পুত্রটী। দারিদ্র-দুঃশাসনে তার আত্মশক্তির চুলের মুটী ধরে কাপড়টা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে বে-ইজ্জৎ করছে, আর ধর্ম্মের চোখরাঙ্গানীতে ভয় পেয়ে তার পাঁচ পাঁচটা স্বামী বসে তাই দেখ্‌ছে। স্ত্রীর ধর্ম্ম যাচ্ছে যাক্‌ কিন্তু নিজের ধর্ম্মতো বজায় থাক্‌ছে? রাজা যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানের অবনতি যুগের আদর্শ হতে পারেন না। মহাভারতীয় ভোগপ্রবল রাজসিক যুগে তাঁর মত ত্যাগীর আদর্শের মূল্য ছিল। এখন সে আদর্শ কোন উপকার করবে না।

যে ধর্ম্ম জীব-ধর্ম্মের বিরোধী, তা' হীন ধর্ম্ম। আমি মানুষ জীবধর্ম্মী; আমার পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, রোগে অনাহারে আমি জীর্ণ কঙ্কালসার, আমাকে জীব ধর্ম্ম পালন করে বাঁচতে হবে, এখানে খাওয়া, পরা, কাজ করা প্রভৃতিতে পদে পদে শাস্ত্রের বাঁধন, ধর্ম্মের শাসন, মেনে চলতে গেলে আমার বাঁচাই কঠিন। যা' করলে জীবন রক্ষে হবে, জীবত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত হবে, তাই নির্ব্বিচারে করতে হবে, খাদ্যাখাদ্য, তিথি, বার এ সব বিচার করলে আর চলবে না। মনে রাখতে হবে, পেটের দায়ে বিশ্বামিত্র ঋষি কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন, তাও আবার চাঁড়ালের বান্না। তাতে তাঁর ঋষিত্ব যায়নি। আমাদেরও যাবে না। "আতুরে নিয়মো নাস্তি"। হাভাতে আধমরা জাতের আবার ধর্ম্ম কি, বাচ্ বিচারই বা কি?

বাধা মেনে মেনে আমরা বাধার দাস হয়ে পড়েছি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার যে শক্তি বা চেষ্টা, তা' আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অহল্যা শাপে পাষাণী হয়েছিল। আমরা কার শাপে পাষাণ হয়ে পড়েছি, তা জানি না। আবার এই পাষাণেরও অষ্টপৃষ্ঠে হাজার বন্ধন। আর সেই বন্ধনকে আধ্যাত্মিকতার 'শিকে' মনে করে বেশ আরামে তাতে কুষ্মাণ্ডবৎ ঝুলছি।

তা' হবে না। এই বাঁধনগুলি টুটে ছিঁড়ে বেরুতে হবে—আর বেরিয়েই একটু লাফ্ ঝাঁপ্ করতে হবে; তা' না হলে অসাড় দেহে রক্ত চলবে না—বড নির্জীব, বড পঙ্গু এই জাতটি। মাথার উপর টীকটীকি, সুমুখে হাঁচি, দক্ষিণে যোগিনী, বামে শিয়াল,—এই সব নিয়ে 'অচল' হয়ে অচলায়তন গড়ে পড়ে থাকলে অধম হ'বার কি আর বাকী থাকবে?

অসাড়তা আধ্যাত্মিকের লক্ষণ নয়। কর্ম্মচাঞ্চল্য চাপল্যই আধ্যাত্মিকের লক্ষণ। আমরা একটা চুল ত্যাগ করতে পারি না, এক পয়সায় মরি আর বাঁচি; জুতো বয়ে খেতে পেলে সার্থক মনে করি—আবার বড়াই করি আমরা আধ্যাত্মিক। ওগো তা নয় গো তা নয়। **আমরা খুব ভোগাসক্ত, খুব ভোগ-পিপাসু; ভোগের বস্তু নেই, ভোগ করবার শক্তি নেই।**

তাই বলছি এখন আমাদের সমবেত চেষ্টা চোক্ ভোগের ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করতে আর ভোগের শক্তি অর্জ্জন করতে। এই দৈন্য না ঘোচালে আমাদের আর উপায় নাই। মাড়োয়ারীদের আমরা ঠাট্টা করে এসেছি 'মেড়ো', 'মেড়ুয়া' এই সব বলে। তাদের বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, তাদের মধ্যে বড় বক্তা,

সাহিত্যিক, প্রচারক, উকিল, ব্যারিষ্টার, পণ্ডিত, জন্মায়নি, তারা ফ্যাসনের দাস। তা বটে, কিন্তু সেই বুদ্ধিহীন মেড়ুয়া জাত অল্প বুদ্ধির ফিকিরে আজ আমাদের তাদের অতিথ্‌শালের ধারে কাঙ্গাল ভিখারী করে ফেল্‌ছে—তারা দেবে তবে খেতে পাবো। এর চেয়ে লজ্জার বিষয়—এই পণ্ডিত জাতের কি হতে পারে? তাদের লাখ্‌পতিরা কোমরে ময়লা কাপড় জড়িয়ে মাথায় পগ্‌গড় বেঁধে পথে পথে টাকা লুটে বেড়াচ্ছে, আর আমাদের 'অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণ' ধারীরা নাড়সাই ফুঁকে বায়স্কোপ থিয়েটার দেখে কষ্টের পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছেন।

এখন আর আমাদের এ পথ নয়, পুঁথি বই বন্ধ করে, ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে, ওদের মত ছোট বয়স হতে পয়সা রোজগার করতে হবে—এখন শুধু ধ্যান জ্ঞান হবে—'অর্থ', 'ঐশ্বর্য্য', 'ভোগ'। এই ভোগের পথেই স্বাস্থ্য, শক্তি, জ্ঞান, সুখ ও যা' কিছু।

একজন ফরাসী ভাবুক কি বলেছে শুনুন।—Utilitarian materialism, barren well-being, the idolatry of flesh and of the 'I' of the temporal and Mammon, are these to be the goal of our efforts, the final recompense promised to the labours of our race?—I do not believe it The ideal of Humanity is some thing different and higher But the animal in us must be satisfied first and we must first banish from among us all sufferings which is superfluous and has its origin in social arrangements before we can return to spiritual goods.

অর্থাৎ—সেবা, ভোগের পূজা, ঐশ্বর্য্যের দাসত্ব, বিষয়বুদ্ধি, নশ্বর ছোট 'আমি'র সুখ সাধন—এই কি মানব জাতির সমস্ত চেষ্টার আর সাধনার লক্ষ্য হবে? আর মানবজাতির কপালে কি এই চরম লভ্য বলে বিধাতা লিখে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই না—মানুষের আদর্শ এ হতে স্বতন্ত্র উচ্চতর কিছু। তবে এ কথা সত্য, মানুষের মধ্যে যেটুকু পশু অংশ আছে, তার ক্ষুধা, তার অভাব আগে মেটাতে হবে—আমাদের মধ্যে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার দোষে যে সব দুঃখ দৈন্য আছে, সে গুলিকে আগে দূর করতে হবে, আধিভৌতিক যা কিছু অভাব আছে, তা' মিটিয়ে, তবে আধ্যাত্মিকের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

ঠিক তাই। আমার কথাও এই। আমাদের মধ্যে সমাজের ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি হাজার বছরের জমানো ময়লাতে বিকল হয়ে গিয়ে নানা উৎপাত

ঘটিয়ে তুলেছে ; সে গুলোকে আগে সংস্কার করে ঠিক করতে হবে ; কেননা তাদের দোষেই আমাদের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক গতি রোধ হয়েছে। আধিভৌতিক অভাব গুলির আগে দূর করা দরকার হয়েছে। আমাদের মধ্যে যে পশুটী আছেন তাকে খাইয়ে দাইয়ে বলবান করে তুলতে হবে, তা' না করলে তার মেরুদণ্ড শক্ত হবে না। আর তা' না হলে, উপরের যে, দেবতা তার বাহন সে হতে পারবে না।

যে উপায়ে যেমন করে যা' খাওয়ালে এই নগ্ন পশুটি জাগবে তাই সদ্ধর্ম ও সদাচার সঙ্গত। বাকী যা' তার বিরোধী, তা' অসদ্ ধর্ম্ম। অর্থ রোজগার ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্যে চাষাগিরী, মুটেগিরী যা' দরকার, তাই করতে হবে, তাতে লজ্জা বোধ অসদাচার অধর্ম্ম।

এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এটি শাক্ত যুগ,—বৈষ্ণবী শাক্তের যুগ, সর্ব্বত্র শক্তির লীলা, শক্তিরই জয়। যে শক্তিমান্ সেই জয়ী। শাক্তের পক্ষে বীরাচারই ধর্ম্ম। বীরাচার মানে এমন সব খাদ্য খাওয়া—অনুষ্ঠান করা, যা' করলে শরীরে স্বাস্থ্য, শক্তি, লাবণ্য, উৎসাহ ফিরে আসে, বুদ্ধি খোলসা হয়, লোক অসুরের মত খাটতে পারে, ব্যাধিতে ভুগে মরতে হয় না। এক কথায় আত্মরক্ষা করতে পারে। কুষ্মাণ্ড সিদ্ধ ও দগ্ধ কদলীতে—তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের দরকার একটু আধিভৌতিকতা। আমরা সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য মুমুক্ষু, আমাদের জীবাত্মা যে, অবসন্ন, আগে তাতে প্রাণ সঞ্চার দরকার। তারই ফলে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আসবে।

আমাদের জাতকে সংসারে ভোগসর্ব্বস্ব হতে বলছি, এতে না কেউ ভুল বোঝেন, যে, দরিদ্র অক্ষম জাতের পক্ষে ভোগী হওয়াটা ভাল কি? কগ্ন দুর্ব্বল, দরিদ্র যে, ভোগ তার পক্ষে যে বিষের তুল্য। এ কথা সত্য, ভোগের বস্তু অর্জ্জন না করে, ভোগ শক্তি না বাড়িয়ে ভোগী হতে যাওয়া খুবই আত্মধ্বংসকর ব্যাপার। আমার কথা এই যে, আগে আমরা সংযত হয়ে মিতাচারী হয়ে, পরিশ্রম করে শক্তি ও ভোগ্য সঞ্চয় করবো, তারপর ভোগ করবো। যাদের ভোগ্য নাই, ভোগশক্তি নাই, তাদের ভোগের আশা আকাঙ্ক্ষা যে বাতুলতা।

তাই বলি সহজ সুগম উপায়ে আমাদের ধনবৃদ্ধি ও অন্ন সংস্থান আগে করতে হবে ; তারপর ভোগ, তার আগে নয়। যে লোক দু'টি পয়সাই রোজগার করতে পারে না, যার স্বাস্থ্য শক্তি নেই, তার ভোগবিলাস যেমন সাজে না, পক্ষান্তরে

সমূহ অনিষ্টের হেতু হয়, আমাদের জাতের পক্ষেও তাই। আমরা দরিদ্র, দুর্ব্বল, আমাদের এ অবস্থায় আগে ভোগ নয়, ভোগের আয়োজনই আগে।

বর্ত্তমান অভাবের অবস্থায় আত্মসাহায্যে ঘরের খাওয়ার গতানুগতিক প্রথা পদ্ধতি কি রকমে বদলাইয়া চলিলে আমরা এরি মধ্যে শরীরে একটু স্বাস্থ্য ও বল সঞ্চয় করিতে পারি, তাহার আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

ধূপ।

"ধূপ" রাণী নিরুপমার কবিতার বই। কবিতাগুলি কয়েকটি তরঙ্গে ভাঙ্গা; ভাগগুলির নাম,—প্রকৃতি, দুঃখ, গান, প্রেম, অভিযোগ ও বিবিধ।

ভুল করে মানুষ দুঃখই পায়, আমার কিন্তু ঠিক বিপরীত হয়েছে, আমি ভুল করে রাণীর অগুরুগন্ধ দেউলে পূজারতির শঙ্খনাদে গিয়ে পড়েছি। 'দিদি"র লেখক নিরুপমা দেবী ভেবে আমি রাণীকে চিঠি লিখেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে এমনি ভুল যেন নিত্য একবার করে আমার হয়। বই পড়ে রাণীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি রাণী হয়ে দুঃখীর চিন্তামণির শ্রীঅঙ্গনের এ শঙ্খখানি কোথা পেলেন?" সত্যই ধনীর ঘরে বাণী-পিঠের জাগা মেয়ে বড় দুর্লভ। তাঁর কবিতায়—

"নিমেষের লাগি মেটে কি না মেটে
গোপন মনের ক্ষুধা?"

পরম দয়িতের কাছে "ধূপ" জেলে এই হ'লো রাণীর প্রশ্ন। দয়িত উত্তর দিয়েছে, "ধূপের" পাতায় পাতায় নিবিড়ের "কালো মণির" জ্যোতি হয়ে সেই উত্তর জল জল করছে।

"পুঞ্জ পুঞ্জ আঁধারেতে
নিবিড় মধুর,
হিয়া মোর করিলি বিধুর।"

কালো মেঘের গায়ে দেখা এই হলো রাণীর "কৃষ্ণরূপ"। সেই শ্যাম বর্ষার আবার দেখ এই "জাগা" মেয়ের নব-রাধা দর্শন—

"বর্ষার বুক ভরা
এসেছ দুলালী মেয়ে,
তুমি শ্রাবণের ঐ কোল খানি ছেয়ে
এসেছ হৃদয়হরা।"

"তুমি কোন্ নয়নের জল
পড়িতেছ ঝরঝরি ?
কার লাবণ্যে চল্ চল
কণ্ঠের সাতনরি ?"

রবি বলেছেন, "অনেক মেয়েকে কবিতা লিখতে দেখেছি, তাঁরা বেশ রস দিতে পারেন, কিন্তু রূপ দিতে পারেন না। কিন্তু তোমার কবিতাগুলি রূপে, রসে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।" সত্যই রাণী নিরুপমা ছন্দের বৈচিত্র্যের নিরুপম শিল্পী। কিন্তু সব চেয়ে সুখদ এই মেয়ে-কবির জগৎ-সুন্দরের সঙ্গে চোখে চোখে চাওয়া চাওয়ি। যেখানে সেটি ফুটেছে সেখানটির তুলনা নাই। জগৎবধু যখন সন্ধ্যা সুন্দর, তখনকার কথা শোন—

"তখন গগন নীল পাথারে
ঢেউ তুলেছে হাওয়া,
ঐ অসীমের কোণে গেছে
হারা রতন পাওয়া।
তখন সবে একটি তারা
করছে আঁখি নত,
উঠছে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে
অশ্রু জলের মত।"

আমরা কবিতা লিখতে গিয়ে কয়েকটা দোষ করে ফেলি, তা'তে আমাদের মন-দেউলের বীণাধরা সারদার পদ্মচরণ ছবি ম্লান হয়ে যায়, কবির ব্যক্তিত্ব ফোটে না। রাণীকে উদ্দেশ করে সেগুলি বলি, তা'তে সব নূতন কবিরই লাভ হবে। প্রথমতঃ দ্বিজেন্দ্র বা রবির মত বড় কবির প্রভাবটুকু নিঃশেষে কাটিয়ে উঠতে হবে, বড় কবির ভাষা ভাব ও ভঙ্গির অনুকরণের আওতায় তোমার মনের অবগুণ্ঠিতা ভাবময়ী বধুর ঘোমটা খুলবে না, তোমার মৌলিকত্ব ঝাপসা হয়ে আসবে। সেখানে বাজবে যেন নিছক নিরুপমাই বাজে। দ্বিতীয়তঃ

ভাবের তুঙ্গ শিখর থেকে নাম্‌বে না। কবির ভাবের জানালা ক্রমাগত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। যে কোন কবির একটি কবিতা নিয়ে দেখ, তার হয় তো শুধু চারটি চরণের জন্য সে অমর হ'য়ে থাক্‌বে। তখন ঐ চারটি চরণ লিখতে তার অন্তর দেউলের জানালা খুলেছিল। আর বাকি লাইনগুলি হয়তো সাদাসিদে তেমন ভাব জলজলে নয়। নির্ম্মম হয়ে এইগুলি ছেঁটে ফেলতে হবে। আমরা মাঝে মাঝে ভাবের টানে লিখি, কিন্তু অনেক সময়ে লেখবার কামনার টানেই যা' তা' লিখি। তাই ভাব ওঠে আর পড়ে।

রাণীর নিখিলরসরসিকের সঙ্গে যা' কিছু পরিচয় তা' দুঃখ দিয়ে। দুঃখ যে তাঁর নিবিড় চুম্বন।

"তোমার পায়ে প্রণাম করে এই কথাটি বলতে এনু—
তোমার দেওয়া দুঃখভাবে আজ যে আমি জুড়িয়ে গেনু।"

কত জায়গায় যে দেবতার এই বেদনা জাগান স্পর্শ আছে।

"কেঁদে যেন তরে যাই,
বেশি করে তাই চাই
ব্যথা দিয়ে প্রেম জাগাতে।"

রাণী তাই দুঃখ-শরণকে ডাব্‌ছেন,—

"ওগো কালো। ওগো ঘন ঘোর
আমার হৃদয়মণি
—কালো মণি মোর।
দেখা দে রে অনুপম
দেখা দে সুন্দর।
দু'টি হাতে বক্ষ চাপি,
এ আঁধারে শুধু কাঁপি,
ওগো মনোহর।
শত নামে ডাক ডাকি
ওগো তুই শোন্,
আয় আয় আয় বধু।
আয় আঁধারের মধু!
মরণের ধন।"

রাণীর প্রেমও ঠিক এমনি অনির্ব্বচনীয়, ঠিক ঠিক জাগা মেয়ের ভালবাসা।

"থেমে যায় প্রলাপের মিছা কাণাকাণি,

* * * *

নয়ন মুদিয়া শুধু মন জানাজানি,
দু'জনার মাঝে শুধু দু'জনে প্রকাশ।"

প্রেম শেষে ভক্তিযোগে মনবধূ'ক না পেয়েও পেয়েছে, পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গমতীর্থে পৌঁছেছে। ভগবানের এই আশীর্ব্বাদী মেয়েকে বলি,—এ দীন দেশের "ঘুমন্ত মেয়েদের তোমার প্রেমস্পর্শের চুম্বনে জাগাও. মরা মেয়েদের বুকে নিজের প্রাণস্পর্শ দিয়ে প্রাণের বাতি জ্বাল, কলুষিতা বোনের গায়ের কাদা তোমার ভাবগঙ্গার ঢেউয়ে ধুইয়ে তাকে এমনি আশীর্ব্বাদী ক'রে নাও। তুমি জেগেছ যখন, তখন মেয়ে হয়ে এ কন্যাঘাতী দেশে মেয়ের কল্যাণব্রত নিয়ে বেঁচে থাক। অন্য কোন কাজ করে আর কাজ নেই।"

স্বেচ্ছাচারী।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত। মূল্য ||• টাকা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত।

উপন্যাস খানির গল্পাংশ এই—জমিদার কালিকামোহন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র কার্ত্তিককে বড় স্নেহের চক্ষে দেখেন। কার্ত্তিককে কলেজে পড়াইয়া তাহার হাতে স্বীয় কন্যা শৈলজাকে দান করাই তাঁহার অভিপ্রেত। শিবচন্দ্রও পুত্রের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কার্ত্তিক কলিকাতায় পড়িতে গেল। তাহার এক কলেজের বন্ধু আপনার পরলোকগত অন্ধ পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ কতকগুলি অন্ধ বালিকার শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক তাঁহার সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে গিয়া অন্ধ বালিকা সরোজকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কার্ত্তিকের প্রকৃতি চিরদিনই উদ্দাম ও অসহিষ্ণু। পরের কথায় আপনার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইলে তাহার মন সহজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। শৈলজা যে তাহার আশায় পথ চাহিয়া আছে, তাহার পিতাও যে শৈলজার সহিত তাহার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত, এ কথা সে ভুলিয়া গেল। অন্ধ বালিকা সরোজের কৃষ্ণচক্ষুর অন্তরালে যে অন্ধকারময় রহস্য লুকাইয়া আছে, তাহা বুঝিবার জন্যই সে পাগল হইয়া উঠিল। সরোজ কিন্তু শৈলজার সহিত

কার্ত্তিকের বিবাহের কথা জানিতে পারিয়া আপনার সুখের বাসনা উৎপাটিত করিয়া রক্তাক্ত হৃদয়ে কার্ত্তিককে বিদায় করিয়া দিল।

কার্ত্তিকের মুখে সব কথা শুনিয়াও শৈলজার মা বাপ তাহার সহিত কার্ত্তিকের বিবাহ দিলেন। শৈলজা হিন্দুঘরের মেয়ে, পতিগতপ্রাণা; কিন্তু কার্ত্তিকের মন ভরিল না। বাহিরে কোনরূপ অমিল না থাকিলেও তাহার ও শৈলজার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রহিয়া গেল। তাহার আপনার ইচ্ছা যে সার্থক হইল না, তাহাতে সে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া এই কল্পিত অপমানের জন্য আত্মীয় স্বজনের উপর প্রতিশোধ লইতে বসিল। বন্ধন তাহার কাছে অসহ্য, তা' সে স্নেহের বন্ধনই হোক, আর কর্ত্তব্যের বন্ধনই হোক। অন্ধরমণীর হৃদয়ের অন্ধকার রহস্য ধ্যান করিতে করিতে সে নিজেই ক্রমে অন্ধ হইতে লাগিল। যাহা অজ্ঞাত অস্পষ্ট ও দুর্লভ তাহার দিকেই কার্ত্তিকের তীব্র আকর্ষণ। সংসারের সব কাজেই তাহার অমনোযোগ। জমিদারী ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, শেষে আপনার স্নেহের ধন শিশুপুত্রকেও সে হারাইল। সহস্র চেষ্টাতেও শৈলজা স্বামীর মন পায় নাই, কার্ত্তিক চিরদিন তাহার স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিয়া আসিয়াছে। এবার পুত্র হারাইয়া শৈলজা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে চাহিল। সে কার্ত্তিককে বলিল—"আমার দিক থেকে আজ থেকে তুমি মুক্ত। আমি আর তোমায় আটকাতে চাই না। তুমি যেমন করে হোক, সুখী হও।" মুক্তি পাইয়া শ্রান্ত, স্বেচ্ছান্ধ, রোগক্লিষ্ট কার্ত্তিক এক দৌড়ে সরোজের কাছে গিয়া উঠিল। সরোজ কিন্তু অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া সুখী হইতে চাহে না। ভালবাসিতে পাইয়াই সে তৃপ্ত। সেবা শুশ্রূষার দ্বারা রোগমুক্ত করিয়া সে কার্ত্তিককে আবার শৈলজার কাছেই ফিরাইয়া লইয়া গেল। কার্ত্তিকেরও মোহ ঘুচিল। উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিই যে সুখ নয়, উচ্ছৃঙ্খলতাই যে মুক্তি নয়, এতদিনে সে তাহা বুঝিল।

গল্পটী বেশ উপভোগ্য। ভাষার সৌন্দর্য্যে ও নিপুণ লেখনীচাতুর্য্যে স্নেহ মমতামাখা গার্হস্থ্য চিত্রগুলিও সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। বন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা যে স্নেহ ও সমাজবন্ধন অধিকতর সত্য গ্রন্থকার ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। দেখাইতে গিয়া তিনি কিন্তু বলিতেছেন 'কার্ত্তিক জোর করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, যে, জগতের সমস্তই নিয়মের অধীন বটে কিন্তু আত্মাই একমাত্র স্বাধীন বস্তু। আত্মার একমাত্র সুখ আপনার স্বাধীনতাকে অনুভব

করা, * * * পূর্ণ স্বাধীনতাই মানবাত্মার স্ব স্বানুভব, তাহাই তাহার একমাত্র সত্য অভিব্যক্তি। * * * সে (কার্ত্তিক) বল প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে মানুষের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু এই জগৎছাড়া, স্বভাবছাড়া উচ্ছৃখলতা তাহাকেই যেমন আঘাত করিল, এমন আর কাহাকেও নয়।'

স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বাধীনতা কি এক জিনিস? যে স্বেচ্ছাচারী সে প্রবৃত্তির দাস, যে স্বাধীন সে প্রকৃতির প্রভু, স্ব-ইচ্ছার নিয়ন্তা। পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেই যে মানবাত্মার সত্য অভিব্যক্তি ঘটে, মানুষের জন্য নিয়ম, নিয়মের জন্য মানুষ নয়—একথাগুলা কি ঠিক নয়? স্নেহের বা সমাজের বন্ধনই কি মানুষের পক্ষে চরম সত্য? ব্যক্তি বিশেষের যেমন স্বেচ্ছাচারিতা আছে, সমাজেরও তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা আছে, স্নেহেরও তেমনি অত্যাচার আছে। সেগুলি নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়াই কি ধর্ম্ম? পণ্ডিত শিবচন্দ্র যখন কার্ত্তিকের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তখন কার্ত্তিকের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন কি?

নারায়ণের সাজি।

তিনটি নবযুগের মেয়ে।

তুরস্কে বড় কঠিন অবরোধ প্রথা বিদ্যমান। সেই সমাজ-প্রথার বিরোধী হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করা মানুষ হওয়া তুর্কী রমণীর পক্ষে এক রকম অসাধ্যসাধন বলিতে হইবে। ঔপন্যাসিক ও গ্রন্থকর্ত্রী হালিদ এদিব হানেম এই অসাধ্য সাধিয়াছেন। কুস্তুস্তনিয়ার (Constantinople) আমেরিকান স্ত্রী-কলেজে তিনিই প্রথম তুর্কী ছাত্রী, এবং সে দেশের নারী-আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। সুলতান আবদুল হামিদ ক্রোধে অধীর হইয়া এই দুঃসাহসী নারীকে পর্দার অবরোধে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। তুর্কিস্থানে ইয়ং তুর্কিদিগের বিদ্রোহের পর শ্রীমতী হালিদ কলেজে সসম্মানে নিজের শিক্ষা শেষ করেন এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি সংবাদ পত্রাদিতে তুর্কী জীবনের কাহিনী লিখিতেন এবং নিজের জীবনের দৃষ্টান্তে নারী-বোধন আন্দোলনের পোষকতা করিতেন। মহাসমর বাধিলে এই মনস্বিনী নারী আহতের হাঁসপাতালে

স্বেচ্ছাসেবিকা (nurse) হইয়া বহুতর তুর্কী রমণীকে সেই মায়ের কাজে ব্রতী করিয়াছিলেন।

গ্রীক সৈন্যের দ্বারা এডেনে তুর্কী প্রজার হত্যা ও উচ্ছেদের পর শ্রীমতী হালিদ ঘোর বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়েন। তাঁহার প্ররোচনায় বহুতর লোক এই বিপ্লব পথে আসিয়া মালটায় অবরুদ্ধ আছেন। বিদ্রোহের পথে নামিয়া এই নারী ছদ্মবেশে তুর্কী স্থান ত্যাগ করিয়া পথে গুপ্ত বাসের পর য়্যাঙ্গোলাতে আসিয়া বিদ্রোহী কেন্দ্রে যোগ দিয়াছেন।

জাপানের মেয়ে শ্রীমতী কাজি য়াজিমার বয়স ৮৮ বৎসর। ইনিই এ দেশের মাতৃ-বোধনের প্রথম পুরোহিত। জাপানী নারীদের সম্বন্ধে বিধি ছিল, যে, প্রৌঢ়কাল আসিলেই গৃহকর্ত্রী সকল ভার কন্যা বা পৌত্রীদের হাতে দিয়া পরাবলম্বিনী হইয়া থাকিবেন। জাপানী নারী যে সঙ্কীর্ণ ঘরের কোণ ছাড়িয়া বহির্জগতের কোন কাজে লাগিতে পারে, এ ধারণা জাপানে ছিল না। এই দুই বন্ধনই য়াজিমার শক্তিস্পর্শে শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

জাপানের দক্ষিণে কিউশা দ্বীপ তাঁর জন্মস্থান। শ্রীমতী য়াজিমা অভিজাত বংশের কুলবতী, তাঁহার স্বামী মাতাল ছিল, এবং দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি সমস্তই নষ্ট করে। য়াজিমা স্বামীর নিকট হইতে পৃথক হইয়া নিজের চেষ্টায় সাতটী পুত্র কন্যাকে লালন পালন করিয়া মানুষ করেন।

একটি মিশন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইয়া তাঁহার জীবনের আরম্ভ। ক্রমশঃ উন্নতি করিতে করিতে টোকীওর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রিন্সিপাল পদ লাভ করেন।

তিনি মদ্যনিবারণী-নারী-ইউনিয়ন স্থাপন করিয়া ৩০ বৎসর ইহার প্রাণ-স্বরূপ নেত্রী ছিলেন। জাপনী পার্লামেণ্টে এই সমিতি হইতে প্রতি বৎসর শিল্পালয়ের আইন (factory legislation), বিদ্যালয় ও সহরের ভদ্রপল্লী হইতে বেশ্যালয়ের পরিবর্ত্তন এবং জীবে দয়ার সম্বন্ধে আবেদন যাইত।

পতিতা যুবতীদিগের বহু উদ্ধারাশ্রম ও শিশু ও মাতৃরক্ষা মন্দিরের সহিত তাঁহার যোগ আছে। ১৯০৮ সালে যখন আমেরিকান নৌ-বহর জাপানে আসে, তখন প্রধানতঃ শ্রীমতী য়াজিমার চেষ্টায় সৈনিকদিগের মনোরঞ্জনের জন্ত গীশা (Geisha) নর্ত্তকী আনা হয় নাই।

ইনি এশিয়ার নবতন্ত্রের জাগা মেয়ে, যে প্রেম-বন্ধনে জগত এক দিন এক-ছত্রা ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত হইবে, য়াজিমা তাহারই অগ্রদূতী।

এই জুন মাসে জেনেভা নগরে আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলন বসিবে। শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডুর অধ্যক্ষতায় শ্রীমতী পি এন্ রায়, এন সি সেন, শ্রীমতী সাথিনাথান, শ্রীমতী এল্ রায়, শ্রীমতী ০ডি ঠাকুর, শ্রীমতী হাবিব, শ্রীমতী টাটা, শ্রীমতী গুলজার, শ্রীমতী মহম্মদ আলি, কুমারী টাটা ও কুমারী মেনাক্ষী মেহতা সম্মিলনীতে যাইতেছেন।

আন্তর্জাতিক নারী লিগ সরোজিনী দেবীকে কিংস্ওয়ে হলে বিরাট সভায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। শ্রীমতী বক্তৃতায় বলেন, "তোমরা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী, সহচরী হইতে চাহ না। নারীশক্তি পরতন্ত্র দশা হইতে বাহির হইয়া বিপ্লবে মাতিয়াছে। নারী ও পুরুষের জীবন কি পবিত্র বন্ধনে বাঁধা, কেমন করিয়া নারী তাহার সহধর্ম্মিণী, ভারতের নারীই তোমাদিগকে তাহা শিখাইবে ও বুঝাইবে, তোমরা জ্ঞান ভোগ ও প্রতিযোগিতা, দেবীত্বের বোধন করিতে তোমরা শিখ নাই। সন্তান কোলে মা যে সংসারের—জগচ্ছক্তির কেন্দ্র— পাবন মহাতীর্থ, ইউরোপ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। ভারত মায়ের পূজা করে, এই মাতৃপূজার প্রকৃত বোধনে কক্ষচ্যুত মানবসমাজ ধর্ম্মের পথ পাইবে।

—ডিমোক্রাট।"

জাপানের আদর্শ।

মার্চ্চ মাসের এসিয়ান রিভিউ (Asian Review) পত্রিকায় "জাপানের আদর্শ" শীর্ষক প্রবন্ধটি ডাক্তার তাদাওসি লিখিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এই,—

"আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের জীবন ধারার তিনটি রূপ আছে,—দর্পণ, মণি ও অসি ; এই তিনটিই জ্ঞান দয়া ও সাহস এই তিন গুণের প্রতীক মাত্র। জাপান রাজবংশের আদি নারী আমাটেরাসুও মিকামীর পুত্র দেহই এই দর্পণ, এই দর্পণে জাপান আপনাকে ফিরিয়া পায়,—জাতি-চৈতন্য আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হয়।

গ্রীসের যাহা লগস্ (logos বা নাদতত্ত্ব), চীনের যাহা তাও (Tao) ভারতের যাহা ধর্ম্ম, জাপানের তাহাই কোটো—koto। কোটো অর্থে বুঝায় বস্তু বা শব্দ, মাকোটো অর্থে সত্য বাণী বা অকপট ভাব, মি-কোটো অর্থাৎ ভগবান, শি-গোটো অর্থাৎ কর্ম্ম এবং কোটো-ওয়ারি যুক্তি বা বিবেক। "অকপটতাই আদি, যেখানে তাহা নাই সেখানে কিছুই নাই"—ইহার নাম

কনফুশীয় ধর্ম্ম বা Confucianism। জাপানের ধর্ম্মের কর্ম্মাঙ্গই শিণ্টোবাদ বা Shintoism; নিঃস্বার্থ কর্ম্মের যতরূপ সবই ইহার অন্তর্গত। Shintoism religion অর্থে ধর্ম্ম নহে, ইহার কোন রূপগত বৈশিষ্ট্য নাই, তাই সকল রূপই ইহার তরঙ্গলীলা।

চীনের তাও এবং আমাদিগের কোটোর যে মিলনাত্মক অভিব্যক্তি আছে, ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম আসিয়া এই দ্বিধারায় মিশিয়া ত্রিবেণীর সৃষ্টি করিয়া ছিল। চীন শোজো বৌদ্ধ আত্মনির্ব্বাণ কামী, কিন্তু দায়জো বৌদ্ধ আপন মোক্ষইচ্ছার সহিত জগতের হিতকামীও বটে। ভারতের নির্ব্বাণতত্ত্ব চীনে আসিয়া ইহার্থমূলক দায়জো তত্ত্বে পরিণত হইয়াছিল। ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক স্বর্গ এই দায়জোর অবনতির যুগের কথা, জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্টের জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিন্‌রান্‌ নিচিরেন্‌ ও দোজেন নামক তিন জন সন্ন্যাসী আসিয়া প্রকৃত বুদ্ধ-বাণী আবার জাপানে প্রচার করেন।

জাপানের জাতীয় ধারা এইরূপে চিনের তাও এবং ভারতের ধর্ম্মে পুষ্ট হইয়া এই যুগে পাশ্চাত্যের 'Logos বা বাণীর সহিত মিলিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রথম সজ্জাতে আত্মহারা জাপান মুগ্ধ হইয়া নিজেকে ভুলিয়া ছিল, ফলে হইয়াছিল ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ। কিন্তু কোন্‌ দেশে তাহা হয় নাই? রোম প্রথমে হিব্রুর শিষ্যত্ব করিয়া অবশেষে গ্রীসের শরণ লয়, এখন সারা ইউরোপ ফরাসীর প্রেরণায় অনুরঞ্জিত। জাপান অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু প্রাণ হারায় নাই।

জাপান আপন আকৃতি প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া ইউরোপের মুখ বা প্রকৃতি গড়িতে পারে না। তোমরা তোমরাই, আমরাও আমরাই, ইহা ধ্রুব সত্য। জাতীয় ধন বজায় রাখিয়া বিশ্বের হাটে দেওয়া নেওয়ার ব্যবসা চলিতে পারে। জাপানের রাজশক্তি এই জাতীয় ধারার মূর্ত্ত রূপ। জাপানে সম্রাট শাসক নহেন, তিনি প্রজার হৃদয়ের রাজা। মেইজি তেনোর (Meiji Tenno) রাজত্ব কালে জাপানে ইউরোপের রাজতন্ত্র প্রথম আসে, কিন্তু তাহা বিপ্লবে নহে, অন্তরের স্বতস্ফূর্ত্ত রূপান্তরে।

জাপান রাজতন্ত্র হইলেও গণতন্ত্রেরই রূপ। আমেরিকার গণতন্ত্র যেমন সে দেশের বিশেষ অভিব্যক্তি, জাপানের গণতন্ত্র সম্রাটশীর্ষক হইয়াও জাপানের বিশেষ জাতীয় সৃষ্টি।"

আমেরিকা আবিষ্কার !

ক্ষীর-নীর সাত সাগরের নিরুদ্দেশ কূলে ডিঙা বাহিতে গিয়া ক্রিষ্টফার কলম্বসই নাকি প্রথম পাতাল পুরীর এই অচিন দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সোনালি জাঁক জমাইয়া ইতিহাস খুব ডাগর হরফেই এ কথা লিখিয়া রাখিয়াছে। ক্রিষ্টফার নিজে কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে স্কাণ্ডিনেভিয়াবাসীরা তাঁরও অনেক আগেই এই ক্ষীণ-কটি লম্বা দেশটার খবর জানিয়াছিল। জমির জমাবন্দীতে পণ্ডিত ভূতত্ত্বনবিসেরা আজ আবার সে কথাও উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছেন। মাটী খুঁড়িয়া সূত্র খুঁজিয়া পাতিসা তাঁরা ঠিক করিয়াছেন, যে, মার্কিনের মালেকান স্বত্ব গোড়ায় চীনের ছিল—লাল-ইণ্ডিয়ানের আদিপুরুষ পূব-পৃথিবীর চীনাম্যান। মান্ধাতার পঞ্জিকায় লেখা সাল-শতাব্দীর কোনো একটা অজানা দিনে এই শ্লথ-শরীর আফিম-খোরের জাত ঢিলা আস্তিনের জামা আঁটিয়া, আটলাণ্টিকের চলোচ্ছল তরঙ্গ ভঙ্গের তরল তানে তরী দোলাইয়া গিয়া সুদূর ওপারে ঐখানে তাদের বসতি বাঁধিয়াছিল। দেহের হাল হদিস আর হাড় পাঁজরার কজি কব্জা মিলাইয়া দেখিয়া প্রত্ন ঐতিহাসিকেরা এ রকমের একটা সন্দেহ অনেক দিন আগেই করিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু পুঁথি পাঁজীর গণনায় বা কাগজে কলমে স্পষ্ট রকম কিছু লেখা না পাওয়ায় জোর করিয়া খবরটা বলিতে পারিতে ছিলেন না। সে দিন তা' খাঁটি খাঁটি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মেক্সিকো সহরের ১৭ মাইল উত্তরের সন জুয়ান টিউটি হুয়াকান নামক জায়গায় এখনকার কায়েমী জমির অনেক নীচে একটি আজটেক পিরামিড পাওয়া গিয়াছে। সেটী সুডোল—গোটা আছে। ভিতরে পাথর কাটিয়া হরফ খোদাই করা আছে। মেক্সিকোতে চীনের তরফের সরকারী নায়ক কং সিয়া কুয়াং এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। পাথর কাটিয়া শিল্পী সূর্য্য, চন্দ্র, নগর এই তিনটি কথা পরিষ্কার চীনা অক্ষরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছে। . - .

খবরটা পুরাতন-তথ্য সন্ধিৎসুদের সমাজে ভারি রকমেরই একটা সাড়া তুলিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কালিফর্ণিয়ার অধ্যাপক জন ফ্রায়ারও প্রচার করিয়াছেন, যে, খৃঃ পূঃ পাঁচ শতাব্দীতে চীন দেশের বৌদ্ধ "শ্রমণেরা" নির্ব্বাণ-মুক্তির নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ম নাকি আমেরিকায়ও আসিয়াছিলেন। আজটেক পঞ্জিকার সাল তারিখও গণা হইয়াছে—এশিয়ার জ্যোতিষেরই আদর্শে। এখানকার তত্ত্ব শাস্ত্রেও এশিয়া দর্শনের ভূমার ভাব বেশ স্পষ্ট রকমেই পাওয়া যায়। এই সব প্রমাণের উপর পণ্ডিতেরা চীনকেই প্রথম মার্কিন আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকার

করিতেছেন। পিরামিডের উপবকার ঐ খোদাই লেখা তো এখন সকলের উপর বড় প্রমাণ হইয়াই দাঁড়াইল। মেক্সিকো সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ কলিনসন এই লেখার রাসায়নিক ছবি লইয়া তাহাব একখানা Illustrated London Newsএর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেখানি অবিকল তাঁহার কাগজেব পৃষ্ঠায় ছাপিয়া দিয়াছেন।

(London News)

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

এসিয়ান রিভিউ।

টোকিও হইতে "এসিয়ান রিভিউ" নামক প্রতাচ্যের জাগরণের মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। কতকটা প্যান-এসিয়াটিক Pan-Asiatic ভাব লইয়া ইহার জন্ম, আজ অবধি তিন সংখ্যা বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহা জাপানে প্রকাশিত ও জাপানী লেখকের অর্থে ইহার ডালা খানি ভরা বলিয়া "এসিয়ান রিভিউ" অনেকাংশে জাপানী বড়েই রঞ্জিত, ইহাতে ঠিক ঠিক এসিয়ার বাণী—জাত্যভিমানশূন্য একপ্রাণতার কথা বলাও হয় নাই। তবু যাহা পাইলাম তাহাও কম নয়। নূতন তথ্যে পত্রিকাটি জলজলে, ভাবের idealismএর মৃতসঞ্জীবনী রসে বঞ্চিত হইলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্বন্ধের সহজ কার্য্যকরী কথায় এসিয়ান রিভিউ বড় সুপাঠ্য। আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া চীন জাপান ও কোরিয়া প্রভৃতির জীবন-ধারার সংবাদ এখানে বেশ পাওয়া যায়। পল ও মিরার মত উচ্চাঙ্গের আরও বহু লেখক সংগ্রহ করিলে "এসিয়ান রিভিউ"এর তত্ত্বেব দিকেব সামান্য যা' দৈন্য আছে ঘুচিয়া যাইবে। আমরা কায়মনে এসিয়ার এ নবজাত ভাব-শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

মোসলেম ভারত।

"মোসলেম ভারত" নবতন্ত্রের মুসলমানেব মনের কথার পসরা লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়াছে। এমন পত্রিকা বাঙ্গালী-মুসলমান লিখিতে পারে, ইহা আমাদের কম গর্ব্বের কথা নহে। এ পত্রিকার নাম হওয়া উচিত ছিল "মসলেম বঙ্গ", তবে "মসলেম ভারত" নাম দিয়া ভাবটি যদি ব্যাপক হয়, তবে আশীর্ব্বাদ করি সে নাম স্বার্থক হউক। আমরা আগে ভারতবাসী বা বঙ্গমাতার

কোলের ধন, তাহার পর হিন্দু বা মুসলমান, এই ভাবটি আরও মূর্ত্ত করিয়া তুলিলে সত্য সত্যই মসলেম ভারত জাতিকে নবজীবন দিবে। আর একটি কথা, তাহা মসলেম ভারতের কথায়ই বলি, "মূলটি যাহা কোর-আনের বাক্য, ব্যাখ্যা ও টীকা হইয়াছে তাহার সহস্রগুণ। এই যে আসলকে অতিক্রম করিয়া অতিরিক্তের বাড়াবাড়ি, এইটুকুই শাস্ত্রকারদের পাণ্ডিত্য, এই টুকুতেই যত ভেদনীতি ও মতানৈক্য।"

* * * * * *

ধর্ম্মের ভিতর যাহা সত্য (Essence) তাহা চিরন্তন, আর যাহা রূপ (form) তাহা সাময়িক।

"এবনে বোশদ বলিলেন, "আমি ধর্ম্মের সত্যকে মাথার মাণিক করিয়া তুলিয়া লই, কিন্তু আমি এই বিশেষ বিশেষ আকার বা রূপক মানিতে পারিব না। তুমি ইহুদি, তুমি সেই অনন্তকে পূজিতে যাইতেছ, তোমার উপাসনা-গৃহে তুমি বলিতেছ,—এই খানে না আসিলে কেহ পরিত্রাণ পাইবে না। খৃষ্টানও যাইতেছে সেই অনন্তকেই পূজিতে তাহার গির্জ্জায়; সে বলিতেছে এইখানে না আসিলে কেহ যীশুর কৃপা পাইবে না। মুসলমানও যাইতেছে সেই অনন্তকে অর্চ্চনা করিতে তাহার মস্‌জিদে; সে বলিতেছে এই ছন্দোবদ্ধ নমাজ ব্যতীত তোমার মুক্তির কোন আশা নাই। আবার দেখুন, ঐ হিন্দুও তাহার মন্দিরে শঙ্খ বাজাইয়া সেই পরব্রহ্মের ভজনা করিতেছে; তাহার মতে উহাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বৌদ্ধ যাহার কোন উপাস্য নাই, সেও একটা বলিবার কথা গুছাইয়া লইয়াছে।"

"যে আজীবন একটি ধর্ম্মের ভিতরই নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার চিন্তা ঐ ধর্ম্মের বাহিরে পৌঁছিতে পারে না। বাহিরের কথা ভাবিতে তাহার অন্তরাত্মা পাপের ভয়ে শিহরিয়া উঠে, কিন্তু বহু ধর্ম্মের সমাবেশ যে দেখিয়াছে, সে সীমার লঘুত্ব বুঝিয়াছে।"

"ধর্ম্মের দুইটি অঙ্গ সত্য আর রূপ।" বড় খাঁটি কথা। বৈচিত্র্যের কোন একটির মোহে অন্ধ হইলে চলিবে না। আবার সত্যের মোহে অন্ধ হইয়া রূপকে অস্বীকার করিলেও চলিবে না। বৈষম্য সৃষ্টির জীবন, এত ভঙ্গি এত রূপ এত অচেনার ভিড় বলিয়াই সৃষ্টি বা লীলা এমন মিঠা; সে লীলার নাগর আপনাকে কেবলি লুকাইয়া লুকাইয়া ধরা দিতে চায়। "তুমিও সে।" "এ যে তুমিও মোর!!", "ওগো, এ যে তুমিও বঁধু!!!" এইরূপ কেবল নূতন করিয়া চেনাচিনি, কেবল হারাইয়া হারাইয়া পাওয়া, সম্ভোগকে অফুরন্ত করিয়া তোলা—এই ত লীলা, এই ত ধর্ম্ম।

অধ্যাপক সহিদুল্লার "ভারতের সাধারণ ভাষা" সুপাঠ্য, ভাবিবার কথা বটে। কাজী আব্দুল ওদুদের "সাহিত্যিকের সাধনা" সকলের পড়া আবশ্যক। "সাহিত্যের এই দুই প্রকৃতি, চিরন্তন ও যুগধর্ম্ম।" তন্মধ্যে কাজি সাহেব চিরন্তনকে উচ্চ আসন ও যুগধর্ম্মকে নিম্ন আসন দিয়াছেন, এবং দেশীয় বৈশিষ্ট্যের কথা স্বতন্ত্র ভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই ত্রিধারার মিলনাত্মক সৃষ্টিই বিশ্ব-সাহিত্য; চিরন্তনের রূপ যে অগণ্য, যে যুগে যেখানে তাহা ফুটে, অপূর্ব্ব হইয়াই ফুটে।"

মোটের উপর "মোসলেম ভারত" বাঙ্গালীর সাহিত্যকে ধনে রত্নে ভরপুর করিবে; এ পত্রিকা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক।

বাল্যে স্বামী হীনা

(শ্রীসুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

এখন যদি সন্ধ্যা আমার
 সকাল হ'লো কবে?
ডাক্‌লো কখন আম্রশাখে
 কোকিল কুহু রবে।
ফুট্‌লো কোথায় রঙ্গীন হ'য়ে
 গন্ধ ভরা ফুল,
দিন না হ'তে দিনের আলো
 নিব্‌লো একি ভুল।
চোখ থাকিতে শুধুই চোখে
 দেখি অন্ধকার,
ভরা পরাণ শূন্য হ'লো
 এত অভাব যার!

২

কালো কেশ আর বাঁধবো নাক
থাক্‌বো এলো চুলে,
চাঁপা ফুলটি খোঁপায় দিতে
ভুল্‌বো নাক ভুলে।
সীঁথের ছিল রাঙ্গা সিঁদুর
হাতে কঠিন 'নোয়া',
এম্‌নি কপাল ভাঙ্গা আমার
তা'ও গিয়েছে খোয়া।
কোন্ সুখে গো থাক্‌বো ঘরে
কাজ কি হেন রূপে,
রূপ থাকিতে যদি এরূপ
পড়লো অন্ধ কূপে।

৩

লাগ্‌বে নাক আর তো প্রাণে
আসা যাওয়ার সুখ,
থাক্‌তে ক্ষুধা সইতে হ'বে
অনশনের দুখ।
এত আশার ভবের মাঝে
পড়ে থাকাই সার,
থাক্‌তে ঘরে ঘরের কাজে
নাইক তাড়া আর।
সকাল সাঁঝে হিয়ার মাঝে
লাগ্‌বে না ক বায়,
সাধ থাকিতে সাধের জিনিস
দেওয়া নেওয়াই দায়।

৪

কাজ নেইক এ ছার দেহে
এখন হ'তে যার,
তার গায়ে ত পায়না শোভা
সোণার অলঙ্কার।
কালা-পাছার কাপড় পরা
গেছে কালার সাথে,
সাধ মিটেছে, অসাধ শুধু
বাজ পড়েনি মাথে!
এখন যদি দিন দুপুরে
তিষায় হিয়া জ্বলে,
জল বিনে সে পুড়বে দেহ
'একাদশীব' বলে!

৫

ঘর না হ'তে কাব ভেঙেছে
খেলা ঘরের সাধ,
বল না পেলে কোন্ অবলা
রোধে প্রেমের বাঁধ।
জীবন-হারা জীবন লয়ে
থাক্‌বো ধরা মাঝে,
একা আমিই সইব জ্বালা
সকল গৃহ কাজে।
যথা তথায় ভারের মত
ঘৃণায় রবো পড়ে,
গাল শুনিতে জন্ম যেন
এক পা' যদি নড়ে!

এম্‌নি করে দিনের দিন
যাবে আমার কেটে,
বুকের মাঝে রবেই তৃষা
যায় না কেন ফেটে।
এখন হ'তে এ সংসারে
বেঁচেই র'ব মরে,
হারা পতির ভাস্‌বে স্মৃতি
সদা বাসের পরে।
রিক্ত হাতে অশ্রু সাথে
সিক্ত বসন ধরে,
মন্দিরে কে ড'ক্‌ দিল গো
পূজার বলি তরে!

বল্‌ছে কবি তোদের ছবি
নয় সে ভয়ঙ্কর,
বিধির শাপে যোরাই শুধু
পেয়ে গেলাম বর।
শুভ্র বাসে সাজায় কেবা
অর্ঘ্য-ফুল-ভার,
এগিয়ে গিয়ে খুল্‌তোকে আজ
মন্দিরেরি দ্বার।
স্বামীর উপর যে জন স্বামী
ধরায় জেগে রয়,
তোদের ছাড়া এ সংসারে
খোজ ক'রনা লয়।

৮

কি কুক্ষণে আজ্‌কে দেশে
বিচার গেছে চলে,
ফুটিয়ে দে' যায় মোদের আঁখি
তোদের চক্ষু জলে!
নিজের স্বার্থে কে দেয় বলি
ধরায় তুচ্ছ করে,
বসন ভূষণ ফেল্‌লি দূরে
জগৎ স্বামীর তরে!
কে বলে তোর সব গিয়েছে
তুই সবারি কাছে,
তোর ধরমে কশ্ম মোদের
সব পড়েছে পাছে!

পাত্র আবশ্যক।

—:•:—

দে সরকারের ঘরের একটী সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী আছে। ঘোষ বসু মিত্র বংশীয় সুশিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। দরিদ্র পিতা পণ দিতে অক্ষম। "নারায়ণ" কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

-:++:

"নারায়ণ কার্য্যালয়" ৪।১ নং রাজা বাগান জংসন রোডে উঠিয়া আসিয়াছে।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]   [ভাদ্র, ১৩২৭ সাল।

স্রোতস্বিনীর সঙ্কল্প।

[শ্রীনলিনী কান্ত সরকার।]

(গান)

আমি   চলেছি আজ প্রাণের নাগর

সাগর-বঁধুর টানে,

আপন-হারা পাগল-পারা

পিরীতি-বিভল প্রাণে।

ছেড়ে দেরে পথ ছেড়ে দে আমার,

গতি কি রোধিতে পারিবি?

হাজার বাঁধন ধরিলে সুমুখে

আর ত ফিরাতে নারিবি,

তোরা যদি সেথা যেতে চাস, বল,

মোর সাথে তবে গান গেয়ে চল,

পরাণ আমার মেতেছে আজি রে

ভরা ভাদরের বানে।

সকলের শোক দুখ বয়ে নিব
মম তরঙ্গ সঙ্গে,
হব পবিত্র সব আবর্জ্জনা
ধুয়ে নিয়ে মোর অঙ্গে ,
সে সকল মোর পতি-দেবতার,
চরণ পূজার হবে উপচার,
পাপ দূরে যাবে, পুণ্য না রবে
মিলনের মধু গানে।

সখীদের সাথে মিশিয়া গো পথে
বঁধুয়ার পায়ে লুটিব,
মিলে নাগরের সনে বিশ্ব-ভবনে
দুয়ারে দুয়ারে ছুটিব ;
ভুবন ব্যাপিয়া তুলিব গো তান,
সবারে শুনাব এ মিলন-গান,
ব'য়ে নিয়ে যাব পসরা আমার
জগতের মহা দানে।

নারী-স্বাতন্ত্র্য।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

পাশ্চাত্যে মেয়েরা যতটা পুরুষালী হইয়া উঠিতে পারে তার চেষ্টা করিতেছে, আর প্রাচ্যে মেয়েরা যতটা মেয়েলী হইয়া থাকিতে পারে তাই যেন চাহিয়াছে। এই দুইটাই সীমার বাহিরের জিনিষ। নারীকেও মানুষ হইতে হইবে, কিন্তু তার অর্থ পুরুষ হওয়া নয়। আবার নারীত্ব হারাইবে না বলিয়া সে যে "মেয়ে মানুষ"ই হইয়া থাকিবে এমনও কোন কথা নাই। পুরুষও মানুষ হইবে, মেয়েও মানুষ হইবে—দু'জনে হুবহু এক রকমের না হইলেও, আবার সম্পূর্ণ আলাদা রকমেরও নয়। কিন্তু এখন সমস্যা হইতেছে দু'য়ের মধ্যে কোথায় সেই ছেদরেখা টানিব।

আমাদের দেশে ছেদটা খুব সহজে স্পষ্ট করিয়াই টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেয়ে থাকিবে ঘরে, পুরুষ থাকিবে বাহিরে। মেয়েরা বাহিরে যাইতে পারিবে না—যদিই বা কখন কদাচিৎ যায় তবে পুরুষের ছায়ায় ছায়ায় চলিতে হইবে, থাকিতে হইবে গলগ্রহ হইয়া; আর পুরুষরাও অন্দরমহলে ঢুকিতে পারিবে না, যদিই বা ঢুকিতে চায় তবে যেন মেয়ের মুখোস পরিয়া মেয়েটি হইয়া তাহাকে ঢুকিতে হইবে,—পুরুষের পুরুষত্ব হারাইয়া। দুই জনের দুইটি আলাদা প্রাচীর-ঘেরা রাজ্য - মাঝে আনাগোনার একটা ছোট দরজা আছে কি নাই।

আমাদের দেশে পুরুষের জীবন একান্ত বাহিরে—আড্ডায় সমাজে সভা সমিতিতে কেবল পুরুষেরই সংসর্গে। জ্ঞানের চর্চ্চায়, কার্য্যানুষ্ঠানে, এমন কি আনন্দে উৎসবেও আমাদের সাথী হইতেছে পুরুষ। এ সব বিষয়ে নারীর স্থান নাই। নারীর কথা যখন মনে জাগে, তখন ফিরি ঘরে, ওসকল কথা ভুলিয়া গিয়া, ইহাদের মুখে ছিপি আঁটিয়া দিয়া আরম্ভ করি মেয়েলী কথা—ঘরকন্না, ছেলেপিলে, বড় জোর দুই একটা রসালাপ। মেয়েরাও বাহিরের কোন খবর রাখে না, স্বামীর জীবনের অর্দ্ধেকটাই তার অজ্ঞাত। বাহিরের জগৎ ডুবিল কি বাঁচিল সে দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন - ঘরের খাওয়া পরা চলিলেই সব হইল। মেয়েরা মেয়েদের সাথে জানে কেবল ঘরকন্নার কথা বলিতে, গালগল্প করিতে, পরের আলোচনা করিতে। পুরুষ যদি অন্তঃপুরে আসিয়া দৈবাৎ কোন গম্ভীর বিষয় সুরু করেন তবে মেয়েরা অগাধ সলিলে যেন আর ঠাঁই পায় না। *

এই বিচ্ছিন্নতার ফলে দাঁড়াইয়াছে কি? আর কোন ক্ষেত্রে মিলনসূত্র না পাইয়া পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কেবল শারীরিক ক্ষেত্রেই বিপুল বিকটভাবে দেখা দিয়াছে—স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এক যৌন সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠে নাই। পুরুষ ও নারীর মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ যে হইতে পারে সে কল্পনাও আমরা সহজে করিতে পারি না। পুরুষ নারীকে একত্র দেখিলেই আমাদের চোরের মন বোঁচকার দিকে ধায়—তাহাকে অশ্লীলতা উচ্ছৃঙ্খলতা কত কি নাম দেই। আমাদের শাস্ত্রকার তাই শাসাইয়া রাখিয়াছেন—পুরুষকে জানিবে আগুন বলিয়া, আর নারীকে জানিবে ঘৃত বলিয়া, দুটীকে কদাপি একত্র হইতে দিবে না। তাই ঘরে বাইরের সমস্যা আমাদিগকে এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে—

* আমি দেশের সাধারণ অবস্থার কথা বলিতেছি। বিশেষ কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির পক্ষে আমার কথা প্রযোজ্য না হইলে কেহ যেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া না উঠেন।

বাহিরকে যতদূর পারি বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছি, ঘরকে যত দূর পারি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়াছি। দুইএর যেন মুখোমুখী করিতে নাই।

অনেকে বলিবেন দেশের সামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র আমি দিতে পারি নাই। আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের গভীর অর্থটা আমার মোটা বুদ্ধিতে ধরা দেয় নাই। তাঁহারা বলিবেন আধুনিক ইউরোপের মত আমাদের ধর্ম্ম-প্রণেতৃগণ পুরুষ ও নারীকে একাকার করিতে চাহেন নাই। পুরুষ ও নারীর পৃথক পৃথক স্বভাব ও স্বধর্ম্ম জানিয়া সেই অনুসারে উভয়ের পৃথক পৃথক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের রাজ্য বাহিরেই, নারীর রাজ্য ঘরেই। এ কথার অর্থ কি? পুরুষের কাজ লোক সমক্ষে, নারীর কাজ গোপনে নীরবে। পুরুষ দিবে কর্ম্ম, নারী দিবে ভালবাসা। পুরুষ যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে, নারী কিন্তু সান্ত্বনা-বারি লইয়া ফিরিবে। কঠোরবৃত্তি, পুরুষত্ব যাহাতে প্রয়োজন তাহা পুরুষের ধর্ম্ম; কোমলতা কমনীয়তা নারীর ভূষণ। পুরুষের মস্তিষ্ক, পুরুষের বাহু জীবনের এক দিক, আর নারীর হৃদয়, নারীর কোমলহস্ত আর এক দিক। নারী ঘরেই থাকুক আড়ালে আবডালে থাকিয়া সেখান হইতেই সে ভাল রসসঞ্চার করিতে পারে, তীব্র রৌদ্রাতপে আসিয়া তাহাকে শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলিও না। নারীর অঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়াতেই পুরুষ সরস সতেজ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িতেছে—Love of Ladies, Death of warriors এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয়, ইউরোপ যখন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, বর্ণসঙ্করে একাকার উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই তখন সে আমাদের ভাবেরই ভাবুক ছিল।

তাই বলিয়া বলিও না নারীকে অবলা অশক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষের বল ও শক্তি এক ধরণের, নারীর শক্তি ও বল আর এক ধরনের। পুরুষের হইতেছে আক্রমণ করিবার বল (Active), নারীর হইতেছে সহ্য করিবার বল। আমাদের সমাজে সংসারের যে ভার তাহা পড়ে মেয়েদেরই উপর। পুরুষ যে যতটুকু পারে কেবল অর্থ আনিয়া দিয়াই খালাস। কিন্তু সংসারকে দক্ষতার সাথে চালান, সকল দুঃখ ক্লেশ আধিব্যাধির মধ্যে ধীর স্থির থাকিয়া সংসারের হালটি ঠিক ধরিয়া থাকা যে কতখানি শক্তির দরকার তাহা পুরুষে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুরুষের শক্তিতে ডাকহাঁক, বাহির চটক থাকিতে পারে—কিন্তু পর্দ্দার আড়ালে যিনি একটু উঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন সেখানে মেয়েদের মধ্যে কি নীরব সামর্থ্য কি অকাতর শ্রম কি

অটুট অধ্যবসায়, কি শালীনতা কি শোভনতা, মেয়েদের জন্যই সমাজ দানা বাঁধিয়া শক্ত সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর জ্ঞানের দিক দিয়া আমাদের মেয়েরা বিদুষী পণ্ডিতানী না হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিতে প্রকৃতজ্ঞানে - ধর্ম বিষয়ে - পুরুষের চেয়ে তাহারা কোন অংশে হীন নয়, অনেক স্থলে তাহারাই পুরুষের আদর্শ হইবার উপযুক্ত। নিরক্ষর হইলেই মুর্খ হয় না পাশ্চাত্যের মোহে পড়িয়া এই সহজ কথাটি আমরা এখন আর বুঝিতে পারি না। পুরুষের বিদ্যা পুরুষের মস্তিষ্ককে কৃত্রিম অস্বাভাবিক (sophisticated) করিয়া ফেলিয়াছে, আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি কিন্তু সহজ স্বাভাবিক সরল সতেজ। বেশী কতকগুলি কথা জানিয়া ফল কি? সে ত চপলতা চটুলতা মাত্র। আমাদের মেয়েদের মুখে খলিফৎ আন্দোলনের কথা অথবা পোলণ্ডের রাষ্ট্রনীতির কথা শুনিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? দরকার হয়, পুরুষ সে কথা লইয়া বাদ বিচার করুক। কিন্তু নারীকে আবার তাহার মধ্যে টানিয়া আনা কেন? নারীর কাছে চাই ধর্ম্ম কথা নীতিকথা আদর্শের কথা ভিতরের কথা। পুস্তকের বিদ্যা, খবরের কাগজের কাহিনী সব নারীর জানা নাই থাকিল। কিন্তু স্বভাবকে চরিত্রকে যাহা উন্নত করে মার্জ্জিত করে সেই সকলের সাথে পরিচয় থাকিলেই যথেষ্ট। পুরুষ বিজ্ঞান লইয়া থাকুক, নারী যেন তাহার জ্ঞান লইয়া থাকে। পুরুষ তাহার মস্তিষ্ক লইয়া থাকুক, নারী যেন থাকে তাহার হৃদয় প্রাণ লইয়া।

আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থাকে ধর্ম্মকর্ম্মকে আরও কতদূর যে আদর্শোচিত বলিয়া ব্যাখ্যান দেওয়া যাইত তাহা জানি না। কিন্তু যেটুকু দিয়াছি তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ইহা বাস্তবে কতদূর সত্য, আর সত্য হইলেও ইহাই চরম আদর্শ কি না? আমাদের জননীরা মমতাময়ী, ধৈর্য্যশীলা, শক্তিমতী, বুদ্ধিমতী, জ্ঞানশীলা, এই সব কয়টি গুণ আমাদের সমাজ পূর্ণমাত্রায় নারীকে দিয়াছে, কল্পনায় এ কথা সহজেই সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কষ্টিপাথরে এই সত্যকে যিনি ঘষিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি ইহার মধ্যেও অনেকখানিই—বেশীর ভাগই যে খাদ মিশিয়া আছে, তাহা চিনিতে পারিবেন। আর এ কথা যদি সত্য বলিয়াই জানি, তবে সে সত্য কেবল একটু ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার মধ্যে,—আপন সংসার, আপন পরিজন, আপনার স্বামী ও সন্তানের বাহিরে নয়। যে সব গুণের খেলার জন্য যথেষ্ট জায়গা, বহুল আশ্রয় নাই, তাহারা যে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে তাহা

ত খুব স্বাভাবিক। ক্ষেত্র যদি বড় না হয় তবে শক্তি আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। শুধু গভীরত্বের দোহাই দিলে চলে না—যে গভীরত্বের সাথে গতিবেগ নাই, যে গভীরত্বকে আটকাইয়া রাখা হয় কঠিন বাঁধের মধ্যে, সে গভীরত্ব বেশী দিন থাকে না, ক্রমে তাহা পাতলা হইয়া আসে, ক্রমে তাহাতে পচ্ ধরে। আমাদের নারীসমাজে কি তাই হয় নাই ?

নারীর কাজ নীরবে গোপনে, নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—এ সব কথা দিয়া আমরা চোখের ঠারে মন ভুলাইতে চেষ্টা করি মাত্র। এখানে আছে একটা আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়াস। নারীকে যথার্থতঃ হীন (untouchable বলিব কি ?) বলিয়াই মনে করা হয়, তাহাকে ছোট ক্ষেত্র ছোট বিষয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের নাম ও উপাধি দেওয়া হইয়াছে বড় বড়। হাতা কড়া লইয়া থাকাকে বলা হয় সংসার করা, পরিবারের কাহারও অসুখ-বিসুখের সময় পথ্যাদি দেওয়া বা শুশ্রূষা করাকে বলা হয় সেবাধর্ম্ম মহাপ্রাণতা, আর সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান জানাকে বলা হয় ধর্ম্মজ্ঞান। আমাদের এ কথায় একটু রং চড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ ইহা যে কতখানি সত্য তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পুরুষের ক্ষেত্র বাহিরেই হউক আর নারীর ক্ষেত্র ভিতরেই হউক, আমরা কি স্পষ্ট দেখিতেছি না পুরুষ নিজের ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, নারী তাহার ক্ষেত্রে ততখানি অগ্রসর হইতে পারে নাই, হওয়া তাহার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। যে সব নূতন ভাব নূতন চিন্তা নূতন প্রেরণা পুরুষ জাতিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, নারী যদি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিল তবে কি পুরুষ কি নারী কাহারই সার্থকতা হইবে কি ? সমাজের গোটা জীবন সতেজ সমুন্নত হইবে কি ? নারীকে আমরা সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকি—কিন্তু সে ধর্ম্ম কি ঘরের মধ্যে ব্রতপূজা আচার অনুষ্ঠান না শুধু সংসার পালন ? আমাদের মনে হয় মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে, জ্ঞানে ও প্রাণে—বাহিরে ও ভিতরে—একটা বিচ্ছেদ রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিরাট অসামঞ্জস্য, সমাজে ঢুকিয়াছে অস্বাস্থ্যের বীজ। যে ভয়ে ঘরে ও বাহিরের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছি, সেই ভয়ই আমাদের কাল হইয়াছে ; যে তুচ্ছ তাচ্ছল্য বা উদাসীনতার জন্য সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকেই পঙ্গু করিয়া রাখিতেছি তাহাতে অপর অর্দ্ধাঙ্গও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, সমাজশক্তি পুরা সামর্থ্য পাইতেছে না।

নারীর শোভা শ্রী, হ্রী, এই বচনের দোহাই দিয়া নারীকে অবগুণ্ঠনে মুড়িয়া

একটা জড় পুঁটুলি বানাইতে পুরুষেরা সচেষ্ট, ইহাতে নারীরও সুবিধা স্বস্তি হয় না, পুরুষেরও ভারটাই কেবল বেশী হয়। লজ্জা শালীনতা—শোভনতা হৃদয় ও প্রাণের বৃত্তি যে কেবল ঘোমটার অন্তরালে, ঘরের কোণেই বাড়িয়া উঠে এ সত্য মানিয়া লওয়া একটু কঠিন। তা ছাড়া পুরুষ যে সকল জিনিষকে কেবল আপনারই একচেটিয়া বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা সত্য সত্যই কতখানি তার একচেটিয়া, কতখানিতে বা নারীরও সমান অধিকার, সমান কর্ত্তব্যই আছে তাহাও বিচার করিবার বিষয়। নারী গৃহে গৃহিণী, শয্যাপ্রান্তে সখী, সেই নারীই আবার জীবনক্ষেত্রে সচিব, জ্ঞানের সাধনায় আর কিছু না হউক অন্ততঃ প্রিয়শিষ্যা হইবার যোগ্য নয়?

ইউরোপে আজ যে নারীর বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতরের কথা হইতেছে নারীর অন্তরাত্মার মুক্তির প্রয়াস। পুরুষের দেওয়া, নিজের মানিয়া লওয়া শতাব্দীর সংস্কার বা অভ্যাসকে নারী আর সনাতন স্বভাব বা ভগবানের বিধান বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না। অন্তরাত্মার অনুযায়ী নূতন ক্ষেত্র নূতন জীবন সে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। অন্তরাত্মার প্রথম মুক্তি-আবেগ তাই দেখা দিয়াছে বিদ্রোহের রূপে, শুধু উপরের চাপের বিরুদ্ধে আক্রোশের ভাবে। নারী তাই চাহিতেছে পুরুষের সকল প্রতিষ্ঠানকে অধিকার করিতে, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সর্ব্ববিষয়ে পুরুষেরই মত হইয়া উঠিতে।

ভারতে বাংলা দেশেও নারী-সমাজের অন্তরে এই রকম একটা বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি দেখিতেছি না? শুধু তাহাই নয়, পুরুষেরা নিজেরাই ইহাতে ইন্ধন জোগাইতেছে না কি? নারীকে বাহিরে জীবনের সঙ্গিনীরূপে না পাইয়া পুরুষের মধ্যেও যে অভাব গুমরাইয়া উঠিতেছে তাহার পরিচয় আজ কালকার সাহিত্যে—গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে—অজানিতে অতর্কিত-ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে। পুরুষের সে অভাব—সে অস্বস্তিবোধ জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়াও নারীকে গিয়া আঘাত করিতেছে। পুরুষের সে অভাব আজকাল বিবাহের বাজারে মেয়ের পিতামাতা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

মেয়েদের এই নবীন শিক্ষা দীক্ষা অনেকটা যে পুরুষেরই অনুকরণে হইবে, তাহা গোড়ায় খুবই স্বাভাবিক,—কারণ সজীব শিক্ষা দীক্ষার আদর্শ মেয়েরা কি মেয়ের পিতামাতারা আর কোথাও পাইতেছেন না। ইংরাজ এ দেশে আসিলে আমরা ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় যে রকম মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এও সেই রকম—পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা দেখিয়া মেয়েরাও তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে

আশঙ্কার বিশেষ কিছু নাই, ইহা আশারই কথা। এখন যেমন ইংরাজী বুলি কপচাইয়া আর আমরা তেমন গৌরব অনুভব করি না, সেটাকে প্রাণের ভাষা বলিয়া আর মনে হয় না, এখন স্বদেশের ভাষায় নিজের প্রাণের কথার খোঁজ করিতে ফিরিয়া চলিয়াছি, সেই রকম নারীও পুরুষের মুখস্ পরিয়া চলিতে পারিবে না, নিজের অন্তরাত্মার প্রয়োজনেই তাহার শরীর তাহার আয়তন গড়িয়া লইবে।

কিন্তু সকলের আগের কথা হইতেছে নিজেকে মানুষ ভাবা, নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া। আগে নর কি নারী নয়, আগে হইতেছে মানুষ। নারী অন্তরাত্মার পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে যাইয়া যদি আপাততঃ খানিকটা পুরুষের মত হইয়া উঠে তাহা নিরসন করিবার দরকার নাই। ভুল করিবার যার পথ অধিকার আছে, সেই ত সত্যকে পাইবারও পথ অধিকার পায়। আর সকল ক্ষেত্রে এ সত্যটি খাটিলে, নারীর পক্ষে এ কথা খাটিবে না কেন? নারী তাহার ভিতরের মানুষকে মুক্তি দিক আগে, পরে বুঝিয়া স্থির করিয়া লইবার সময় আসিবে সে নারী। প্রকৃত মনুষ্যত্বকে পাইলে প্রকৃত নারীত্ব আপনা হইতেই তাহার মধ্যে বিকসিত সজ্জিত হইয়া উঠিবে।

ঘরে ও বাহিরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে যে প্রাচীন পুরাতন প্রাচীর, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ফাটল ধরিয়াছে, জোড়া তালি দিয়া মেরামত করিলেও তাহা থাকিবে কি না সন্দেহ। সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে - খোলা ক্ষেত্রে স্বভাব-নিয়ত কর্ম্মই পুরুষের ও নারীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, ঘর বাহির, যদি দরকার হয় তবে তাহার পদ্ধতিটা সেই স্বভাব আপনা হইতেই ক্রমে ফুটাইয়া তুলিবে। পুরুষের রাজসিক অহঙ্কার নয়, নারীর তামসিক আনুগত্যও নয়—পুরুষ নারীর সম্বন্ধ উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিবে উভয়ের ভাগবত প্রেরণা, উভয়ের মধ্যে সাধারণ মানবপ্রকৃতির যে বিভিন্ন অথচ সামঞ্জস্য-বিধৃত গতি।

আগে চাই পূর্ণমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য, আত্মসংস্থা—Self determination, তবেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে হইবে প্রকৃত ঐক্য, সামঞ্জস্য। তা' না হইলে এক জন আর একজনের সত্তায় আত্মবলি দিবে মাত্র, উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইবে ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃসম্বন্ধঃ। নারীকে আগে গালাগালি দিতে হইলে বলা হইত স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসিনী অথবা স্বৈরিণী, ইহাতেই বুঝিতে পারি নারীর উপর পুরুষের কি ভাব, নারীর নিকট পুরুষে কি চায়? কিন্তু আজকালকার যুগে এ ভাব কতদূর চলিবে, তাহা চক্ষু একেবারে বুজিয়া না আছেন যাঁহারা তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন।

"ব্রজলীলা"

(শ্রীনীরদ রঞ্জন মজুমদার।)

"লীলা" বোঝ্বার আগে "ব্রজ" বুঝ্তে হবে। "ব্রজ" কি? পণ্ডিত ম'শাই বল্লেন—"ব্রজ্ ধাতু" যাওয়া। ব্রজ অর্থে পথ।

"ব্রজ" কি না বুঝ্লে 'লীলা" কি বোঝা যায় না। পরিষ্কার কিছুতেই হয় না, ঝাপ্সা হ'তে পারে। পরিষ্কার কেমন করে হবে? যে সমুদ্র দেখেনি, তাকে কে বোঝাবে সমুদ্রগর্জ্জন কেমন ধারা? যারা ইউরোপের সমরক্ষেত্র দেখেনি—সে দেশটা কি ছিল কি হয়েছে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি, তারা কেমন করে বুঝ্বে সে মহাসমরের ঝড় কি প্রচণ্ড। গাছপালা, পশু পক্ষী, নগর দুর্গ সব চূর্ণ হয়ে গেছে—তার বর্ণনা, তার ছবি কতটুকু ঝাপ্সা ধারণা দেবে?

"ব্রজ" অর্থে পথ। পথ কত রকম হ'তে পারে। সোজা পথ, বাঁকা পথ, চোরা পথ, উঁচু পথ, ঢালু পথ। সহরের বাঁধা পথ আর রেলষ্টীমারের পথ ছাড়া আর মানুষের পথের পরিচয়টা তো জানা নেই! রেলগাড়ীতে যেতে যেতে পাহাড়ের উঁচু আর ঢালু পথ দেখা গেল—পথের ধারণা কতটুকু হ'ল? পটে আঁকা ছবির চেয়ে একটুও বেশী নয়।—সে বনপথে চল্‌তে কত কাঁকর পায়ে বেঁধে, কত কাঁটা পায়ে ফোটে জান কি?

আর যে সব বর্ষায় লুপ্তপ্রায় "সেকেলে পথ।" নৌকাপথও তাই।

"ব্রজ" বুঝ্তে হ'লে এই "সেকেলে পথের" কথাই আস্‌বে - কবির "পথ যে আঁকা বাঁকা!"

আমরা আজ ষ্টীমার লাইন, রেল রোড, ট্রাঙ্ক রোড বুঝি। কাঁচা রাস্তায় "পদব্রজে" আস্‌তে বড় কষ্ট হয়, তাই পাকা রাস্তার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে দরখাস্ত করি। বৃন্দাবনে সে কালে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা ছিল কি না, ইতিহাস বা বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা লেখে না। আমরা যতই সভ্য হচ্চি, ততই পথের সঙ্গে পায়ের সম্বন্ধ কমে আস্‌ছে! বাঁধা রাস্তায়ই কি চল্‌তে পারি? দ্বিজেন্দ্রলালের "Awful goose"এরও সাধ্য নেই সে ধারণা করে! একখানা সাইকেল্ হয় না কত দুঃখ, ট্রাম ফেল কর্‌লে হায় হায় করি; মোটর ট্যাক্সি খুঁজি, ঘোড়ার গাড়ীর কড়ি বা taxটি বেশী দিতে হয় বলে কত দুঃখ—আর যদি "দীর্ঘ পথ" হয়। সভ্যতা

হু হু করে বাড়ছে—এরোপ্লেন হয়েছে, কিন্তু—ভুল না হয়—সোজা রাস্তার (aerial routes—আশমানী পথের) খোঁজখবর চলছে।

মানুষ আর দাস নয়—দাস ব্যবসায় উঠে গেছে যে! বিশ্বের শক্তির দাস আর সে নয়—সে চায় বিশ্বশক্তিকে দাস করতে—এত দর্প তার! সুখকে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পেতে চায়, দুঃখ পায় তাই তার হৃদয়-কন্দরে।

কল্পনার বলে আজ বায়স্কোপে বিলাতী 'ব্রজ" ও থিয়েটারে "লীলার" অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাবে আঁখি পল্লব দু'টি জুড়ে না গেলেও, করতালু ছুটি ঘন ঘন ক্ষিপ্রগতিতে 'জুড়িয়ে' দেয়! ভোগবিলাসিতার অভিনয়দর্শনের চোখ নিয়ে আধুনিক সভ্যতামোদীরা কেমন করে ব্রজের সন্ধান পাবেন?—লীলাদর্শন তো পরের কথা।

তবেই তো "ব্রজলীলা কি জম্‌বে না? ব্রজের সন্ধান পাব কেমন করে?"

পথ যে পথিকই চেনে, আর ঐ পথিকের দল তারাই—যারা পথে বেরিয়েছে! ব্যাকুলতা যদি এসে থাকে তবে বদ্ধদ্বার খুলে দাও, চেয়ে দেখ ঐ পথের পানে—অন্ধকার? হোক্ অন্ধকার।—নেই? আস্‌বে—আস্‌বে, পথিক আস্‌বে!

জলস্রোতের মত অবাধে দু'কূল প্লাবিত করে চল্‌তে আমরা ভুলে গেছি, আমরা বাঁধা খালে জলের স্রোত ছেড়ে দিয়েছি, তাই এই মরানদী বালুময় মরুশয্যা পেতে শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাকুলতার জোয়ার আবার এসেছে যদি, চেয়ে দেখ ঐ নীল-অন্ধকার আকাশের গাঢ় কৃষ্ণনীরদ কুন্তল ছড়িয়ে, শত বিদ্যুতের জ্যোতি গায়ে মেখে, বাঁশী বাজিয়ে পথিক এসেছে। বাঁধা খালের দরজা বন্ধ করে দাও, মরানদীতে আবার স্বভাব-সুন্দর জোয়ার আস্‌বে, বিপুল পুলক স্পন্দনে দু'কূল প্লাবিত করে লীলাময়ের জলদগর্জ্জন আবার মানুষের কানে পৌঁছবে।—এই লীলা।

মানুষের জড়তা ভাঙ্‌বার সময় তিনি আসেন—এই রুদ্র-মনোহর মূর্ত্তিতে। ওগো এরূপ যে নরসিংহের মূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুর দর্প ভাঙ্‌তে এসেছে—ভক্ত তুমি জেগে ওঠ, ছুটে চল; ঐ প্রলয়ের কেশরিগর্জ্জন সংবরণ করে বাঁশী বাজিয়ে প্রেমময় হরি বুকে তুলে নেবেন! বিশ্বশক্তির স্বভাব যে তোমার আমার এই হৃদয়ের কাতর ব্যাকুল ক্রন্দন দূর করতে, তিনি আনন্দের অমৃত-দূত তোমার দ্বারে কত পথে পাঠিয়ে দেন,—কেবল তুমি আমি থাকি দ্বার বন্ধ করে! ভক্ত-পথিক, সে অমৃত-দূতের সন্ধান পেয়েছ কি?

মানুষের শতদর্পের কন্দর্পমূর্ত্তি সেই দর্পহারীর অগ্নি-দীপ্তিতে ভস্ম হয়ে যায়। আগ্নেয়-গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে শত নগর শত দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়। যে অগ্নি নিয়ে মানুষের এত দর্প, আজ সেই অগ্নি ইউরোপের রণক্ষেত্রে সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়-শোণিতে বুঝি তাঁরই বুক পাতায় নির্ব্বাপিত হয়েছে। চৈতন্যময় যে প্রাণের ক্ষীণ দীপ্তিটুকু জ্বালিয়ে রেখেছেন, তা'তে এবার চৈতন্য-সঞ্চার না হ'লে ঐ মানব সভ্যতার অভিসম্পাত অচিরেই নির্ম্মূল হবে। বিশ্ব-মানব আজ দেশে দেশে সাড়া দিয়েছে, ইউরোপের রণনীতি চূর্ণ করতে জাতিসঙ্ঘ (League of Nation) অভিযান করবে।

আজ এই "ব্রজলীলায়" বংশীবাদকের যন্ত্র হয়ে তোমরা সবাই এস।— এস ইংরাজ, তোমার ধমনীতে যে বিশ্বমানবতার শোণিত দ্রুত প্রবাহিত রণনীতি বাণিজ্যনীতির অভিসম্পাত হ'তে বিশ্বমানবকে মুক্তি দিতে এস। এস ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ ফরাসী এস, তোমার রণনীতির উচ্ছৃঙ্খলতা ছেড়ে সাম্য-নীতির সঙ্গীতে বিশ্বমানবকে সঞ্জীবিত করতে এস। ফরাসী বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি রাশিয়া, তোমার ছিন্নমস্তা রুধিরাপ্লুত মূর্ত্তি সংবরণ করে তোমার বিশ্ব-প্রেমের বার্ত্তা নিয়ে ছুটে এস —তোমরা না যোগ দিলে ভারতের প্রাণের বৃন্দাবনে এ নূতন "ব্রজলীলা" যে জমবে না।

মুক্তি।

(শ্রীকচেন্দ্রনাথ দত্ত)

আমি কেমন করে সাধব প্রভু
এস আমার ঘরে ?
আমার দীর্ঘশ্বাসে পর্ণকুটীর
কাঁপছে ব্যথার ভরে

চোখের জলের জোয়ার এসে
পূজার ফুল যে গেছে ভেসে,
অজানা কোন্ অন্ধকারের
সাগর বুকের পরে।

কেমন করে পূজব আমি
চরণদুটি, ওগো স্বামি,
(আমার) সারাপ্রাণের প্রবল তৃষা
মিটবে কেমন করে ?

ওগো মর্ম্মব্যথাহারি,
ওগো বাঞ্ছাপূর্ণকারি।
(আমি) পথের ধূলায় রাস্তা জুড়ে
লুটিয়ে দিছি আপনারে,
(তুমি) দয়া করে আসবে যখন
আমার পথে পতিতপাবন,
(তোমার) চরণ দুটি পড়বে তখন
আমার বুকের পরে,
আমি তরব চরণ ধরে

অনন্তানন্দের পত্র।

ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখলাম, আকাশে যেন, কালো মেঘের বাণ ডেকেছে। গগনচারী দেবতারা তাড়াতাড়ি আপনার আপনার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে বসে আছেন ; একটা জোনাকির পর্য্যন্ত নামগন্ধ নেই। চারদিক একেবারে নিঝুম নিস্পন্দ। বুঝলাম আজ দেবলোকে কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আকাশের এই অন্ধকার রূপের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি, এমন সময় বেশ বড় একফোঁটা জল কোথা থেকে লাফিয়ে এসে আমার নাকে তিলক কেটে দিলে। সে দিন সন্ধ্যার আগেই আফিমের মাত্রাটা বেশ একটু চড়িয়ে ছিলাম। এ রকম বাঙ্-রসিকতায় মৌতাত চোটে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি, এমন সময় প্রথমে টপাটপ্ পরে ঝমাঝম্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

একে হাতে কাজকর্ম্ম নেই, তা'র উপর ব্রাহ্মণীও বাপের বাড়ী। সুতরাং ধর্ম্মচর্চ্চার এই উপযুক্ত অবসর ভেবে আলোটা একটু উস্‌কে দিয়ে মহাভারতখানা কোলের কাছে টেনে নিলাম।

বইখানি খুলেই দেখি বনপর্ব্বের মাঝখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাবিপদে পড়েছেন। ধর্ম্মরাজ যক্ষরূপ ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। যুধিষ্ঠিরের তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফাট্‌ছে, শাস্ত্র চর্চ্চার উপযোগী মেজাজ একেবারেই নয়। কিন্তু করেন কি। সরোবরের তীরে যা' দেখ্‌লেন তা'তে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যে বৃকোদরের হুঙ্কারে পাহাড় কেঁপে উঠ্‌ত, তাঁর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই, তিনি প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফের উপর কাদা লাগিয়ে সরোবরের তীরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব একেবারে ছিট্‌কে পড়েছে, তূণভ্রষ্ট পাশুপত অস্ত্রের উপর একটা কোলা ব্যাঙ বেশ আরামে বসে চক্ষু বুঁজে সঙ্গীত-আলাপ করছে। নকুল সহদেবের অমন ফুটন্ত ফুলের মত মুখ ছ'খানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রাণটা ভ্রাতৃস্নেহে কেঁদে উঠলো। ধর্ম্মরাজের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল বলেই কি অমন শূরবীরের মত ভাইগুলোকে প্রাণে মারতে হয়।

সহানুভূতিতে ফুলে উঠে আমার বুকখানা যেমনি ফোঁস কোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটাও নিবে গেল। শূন্য বিছানায় শুতে যাবারও বিশেষ প্রলোভন ছিল না; আর মনটাও ধর্ম্মরাজের অবিচারে একটু খারাপ হয়ে গেছলো; তাই চুপ চাপ করে সেইখানেই বসে রইলুম।

* * *

হঠাৎ মনে হ'ল আমার পিঠে যেন ছপাং কোরে একগাছা চাবুক পড়ল, আর কে যেন টিকির গোছা ধরে টান্‌তে টান্‌তে আমার শরীর থেকে মহাপ্রাণীটি বা'র করবার চেষ্টা করছে! আমি চীৎকার করতে গেলুম; কিন্তু মুখে কোন শব্দই হ'ল না। আমার ত ভয়ে অঙ্গ হিম হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছি—'এ আবার কার পাল্লায় পড়লাম'। এমন সময় শব্দ হল—"ভয় নেই, ভয় নেই, তুমি আমার কথাই ভাবছিলে, তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তুমি যুধিষ্ঠিরের ভাইগুলির জন্য ভেবে কাহিল হচ্ছিলে, কিন্তু ও প্রশ্নগুলি আমি অনেককেই জিজ্ঞাসা করিছি; আর যারা সদুত্তর দিতে পারেনি, তাদের সকলকারই ঐ দশা হয়েছে।"

তখন আমার হুঁস হ'ল; বুঝলাম ইনিই তা'হলে ধর্ম্মরাজ। একটু সাহসে

ভয় কোরে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু ধর্ম্মরাজ শাস্ত্রে ত সে কথা লেখে না!" ধর্ম্মরাজ একটু হেসে বল্লেন,—"লেখে বৈকি, তবে সে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা নয় বলে তোমরা মানো না। আমি সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাও যে জানি এটা স্বীকার করলে যে শাস্ত্রব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আর একটা কথা কি জান, আমি বহুরূপী বলে লোকে আমায় সব সময় চিন্‌তে পারে না।"

"ওঃ! তাই না কি। আমি ত জান্‌তাম আপনি বৃষরূপেই বুড়ো শিবকে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ান। আর কখনো বা বকরূপ ধরে পুকুরের পাড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান করেন।"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে একটা হেঁচকা মেরে বল্লেন—"এত বুদ্ধি না হলে আর তোমরা গোল্লায় যাবে কেন? এই যে সে দিন শূদ্ররূপ ধরে রুসিয়ার জার (Czar) কে ঐ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করেছিলুম তা বুঝি তোমরা বুঝতে পার নি?

আমি ত ভয়ে হাঁ করে ফেললুম। ধর্ম্মরাজ যে বুড়ো বয়সে বল্‌সেভিক হয়ে গিয়ে দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে বেড়াবেন, এ কথা আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কি করে বিশ্বাস করি বল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস হ'ল না। তখনও আমার টিকিতে হাত যে। ধর্ম্মরাজ কিন্তু অন্তর্য্যামী কি না, টপ্ করে আমার মনের ভাবটুকু বুঝতে পেরে বল্‌লেন—"আমি বল্‌সেভিক, টল্‌সেভিক কিছুই হইনি। ওটা আমার ইউরোপে এযুগের রূপ মাত্র। এমন দিনও আস্‌বে যখন বল্‌সেভিক-দেরই আবার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।"

ধর্ম্মরাজের প্রোগ্রামটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। বলসেভিকদের কথা ভেবে আমার পেটের পিলে তখনও চমকে চমকে উঠছিল। শান্ত দান্ত সাত্ত্বিক ভারতে একি কাণ্ড! আমি সবিনয়ে নিবেদন করলুম—"মহারাজ, কিন্তু আপনার পূজোর এতটা রক্তারক্তি কি ভাল হ'ল?"

ধর্ম্মরাজ আমার টিকিতে আর একটা পেল্লায় হেঁচকা মেরে বল্লেন—"বাবা, তোমাদের দেশের চাল কলার নৈবিদ্যের উপর নির্ভর করেই যদি আমায় বাঁচতে হ'তো, তা হ'লে ভগবান আমায় অমর করে সৃষ্টি করলেও আমাকে এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতে হ'তো। তোমরা আমার বকরূপটিকেই চিনেছ বলে সবাই বকধার্ম্মিক সেজে আলোচালের উপর দুটো ফুল ফেলে দিয়েই কাজ সারতে চাও। আমি কিন্তু আমার পাওনাগণ্ডা সুদে আসলে আদায় করে নিতে ভুলিনে।

তোমরা মরতে ভয় পাও বলে আমি ত আর মারতে ভয় পাইনে। ইনফ্লুয়েনজা, ম্যালেরিয়া ওলাউঠা এতেই আমার পুষিয়ে যায়। আমি একথার ঠিক উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না; তাই ধর্ম্মরাজকে একটু শ্লেষ করে বল্লুম—'হাঁ, আমি ভুলে গেছলাম যে আপনি দেবতাদের মধ্যে বিচারপতিও বটে, hangsman ফাঁস্থড়েও বটে।"

ধর্ম্মরাজ কিন্তু লজ্জা পাবার ছেলে নন। তিনি অম্লানবদনে বল্লেন—"দেখ, ও ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নয়। তোমাদের দেশে জজসাহেবদেরই যদি hangsmanএর কাজ করতে হতো তা হ'লে এখনকার চেয়ে তাঁরা ঢের বেশী সুবিচার কর্ত্তেন।"

এক্সিকিউটিভ (Executive শাসনবিভাগ) আর জুডিসিয়াল (Judicial বা বিচারবিভাগ) এর গোলমালের ভিতর আর বেশী গিয়ে কিছু লাভ নেই দেখে আমি কথাটা পাল্টে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"প্রভুপাদ! যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে দেখা হবার পর আমাদের দেশে আর কি আসেন নি?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"দেখ, কৃষ্ণাবতারে ভগবান যখন ক্ষত্রিয়কুল একেবারে নির্ম্মূল করে গেলেন, তখন এমন কি আমারও মনে একটু দুঃখ হয়েছিল। কুরুকুল আর যদুকুল যতই পাজি হোক, তোমাদের মত এমন অপদার্থ ছিল না। একটু নেশা ভাঙ খেত, তা থাক্, তাদের লিভার টিভার অত শীঘ্র পাকত না। তবে ভগবান তাদের স্বহস্তে যখন মারলেন, তখন তাঁর উপর ত আমাদের কথা কওয়া চলে না।"

এই বলে ধর্ম্মরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্লেন—"দেখ, সেই অবধি অনেক দিন আর মনের দুঃখে ভারতবর্ষে আসিনি। তারপর যখন এলাম তখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। মহানন্দ নামের একটা বুড়ো মড়াখেকো রাজা মগধের সিংহাসনে বসে আফিম খেয়ে ঝিমুচ্ছে; আর রাজপ্রসাদসেবী ব্রাহ্মণেরা খুব টিকি দুলিয়ে দুলিয়ে যজ্ঞের ভস্মে ঘি ঢালছেন, আর মহারাজের স্তবস্তুতি করছেন। সবকটার টিকি টেনে টেনে দেখলুম—"পরচুলোর সাজান" টিকি। টান দিতেই খসে এলো। কেবল একগোছা টিকি টানতে গিয়ে দেখলুম, হাঁ, টিকির মত টিকি বটে; একেবারে মগজ থেকে বেরিয়েছে। টিকিধারীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"পণ্ডিতজীর নাম?" ব্রাহ্মণ আমার আপাদমস্তক তীব্রদৃষ্টিতে দেখে বল্লেন—"কৌটিল্য"। সে রকম তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর ভারতবর্ষে বড় বেশী দেখিছি বলে মনে হয় না। হাঁ, একটা

মানুষের মত মানুষ বটে! নমস্কার করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি, পণ্ডিতজী, বার্ত্তা কি?

কৌটিল্য বল্লেন—"যারা ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়েও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয় তারাই এখন ভারতের রাজা।"

আমি বল্‌লাম—'বটে, কি আশ্চর্য্য!'

কৌটিল্য খুব চালাক লোক, আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। বল্‌লেন—"আশ্চর্য্য বৈকি! যাদের চারদিকে আগুন জলে উঠছে, তারাও ভাবছে যে অনন্তকাল ধরে ধরে বসবাস করবে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—'তাহ'লে এ রাজ্যে সুখী কে?'

কৌটিল্য একটু হেসে উত্তর করলেন—"যারা অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে নিজের হাতেই গড়ে তুলতে পারে, তারাই সুখী।"

আমি এবার শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"তার পন্থা কি?"

কৌটিল্যও একটু ভাবিত হলেন। শেষে বল্লেন—"দেখুন, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। ছোটখাট রাজারাজড়া দিয়ে এ কাজ হবে না। যাদের শূদ্র বলে রাজারা হেয় করে রেখেছে, ব্রাহ্মণেরা যাদের ছায়াও মাড়ায় না, সেই শূদ্রকেই আমি রাজা করে তুল্‌ব, ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে বসাব।'

সে দিন দেবতারাও বলেছিলেন—'ধন্য, কৌটিল্য, ধন্য।'

কৌটিল্যকে আশীর্ব্বাদ করে ফিরে এলুম, দেখলুম তখনও ভারতে ব্রাহ্মণের অভাব হয়নি।

তার বহুকাল পরে আবার যখন পদধূলি দিতে আসি, তখন দেখে এলাম ভারতের দরজায় মহম্মদ ঘোরী দেড় হাত লম্বা দাড়ি নিয়ে উঁকি মারচে। এদিকে এসে দেখি, রাজপুতেরা খুব বড় পাগড়ী বেঁধে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরে, খুব ধাড়াকা করে লাফালাফি করে বেড়াচ্চে। আমি ভাবলুম, বুঝি বা যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে। জয়চন্দ্রের রাজ-সভায় এসে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি মহারাজ, বার্ত্তা কি?"

জয়চন্দ্র বল্‌লেন—'আমার মেয়ে স্বয়ম্বরা হবে।'

আমি বল্লুম—'বেশ, বেশ, তবে আর আপনার মত সুখী কে?'

জয়চন্দ্র বল্‌লেন—'আজ্ঞে হাঁ; বিশেষতঃ পৃথ্বিরাজকে যে এরকম অপমান করতে পেরেছি, এতেই আমি সুখী।'

'অপমান করবার পন্থাটা কি?'

'ঐ দেখুন না, পৃথ্বিরাজের একটা মূর্ত্তি গড়ে দরজায় দরোয়ান করে রেখে দিয়েছি।'

বেশ দেখতে পেলুম, ভারতের আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে আসছে। আমায় লোকে বলে নির্ম্মম, কিন্তু এই ভ্রাতৃদ্রোহের ভবিষ্যৎ ফল ভেবে সে দিন আমারও চোখে জল এসেছিল।

ধর্ম্মরাজ এতক্ষণ একটানা বকে যাচ্ছিলেন। এইবার একটু অবসর পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—' চতুর্থ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন না যে?"

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"সে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? ভগবান যাকে মারেন, তা'কে যে কি করে অন্ধ করে দেন, তা' ত বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলুম। এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি?"

"মোগল বাদসাহদের আমলে কখনও এসেছিলেন কি?"

"একবার এসেছিলুম। আরঙ্গজেব তখন বুড়ো বাপের মৃত্যু কামনা করতে করতে দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্চে। 'হজরৎজী' যে রকম প্রচণ্ড ধার্ম্মিক তা'তে মোগল বাদসাহদের তক্তে যে ঘুণ ধরেছে, এটা আর বুঝতে আমার বাকি রইল না। তাঁকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যকতা বোধ করলুম না। তখন মোগল দরবারে একজন মারাঠী যুবকের কথা অল্পবিস্তর শোনা যাচ্ছিল, আমার মনে হল একবার লোকটিকে দেখে আসি। সহ্যাদ্রির পাদদেশে এসে দেখলুম এক দীর্ঘকায়, বীর-লক্ষণ-চিহ্নিত উন্নত ললাট, গৌরবর্ণ পুরুষ কল্পনার বলে ভবিষ্য ভারতের সৃষ্টি করছেন, আর মহাশক্তি তাঁকে আশ্রয় করে সমগ্র মহারাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করে তুলছেন। বুঝলাম এই শিবাজী। অনেক দিন পরে একটা খাঁটি মানুষ দেখে আমারও আনন্দ হলো। আমি আশীর্ব্বাদ কোরে তাঁকে আমার চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম। শিবাজী বল্লেন, 'মহারাজ, মুষ্টিমেয় তুর্ক এসে ভারতের ক্ষত্রিয় শক্তিকে পদানত করে রেখেছে, এই বার্ত্তা। যাদের জোরে তুর্ক সিংহাসনে বসে আছে, তারা স্বপ্নেও ভাবে না যে সংঘবদ্ধ হ'লে তারাই দেশের অধীশ্বর হতে পারে—এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি? এ মোহ যে ভেঙ্গে দিতে পারে সেই সুখী। আমি মহারাষ্ট্রের শক্তি উদ্বুদ্ধ করে, তাকে সমস্ত ভারতের কর্ত্তা করে দিব এই আমার পন্থা।'

এই কথা বলে ধর্ম্মরাজ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'শিবাজীর সঙ্গে আর কোনও কথা হ'ল না?'

ধর্ম্মরাজ বল্লেন—"না। আমি যা' ভয় করেছিলুম, তাই হলো। পন্থার

কথাটা শুনেই আমার মনে খটকা লেগেছিল যে মারাঠার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু থাকবে না। বর্গীর তরবারি একবার বিদ্যুতের মত সকলকার চোক ঝলসে দিয়েই আবার অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেখছ না, আজ পর্য্যন্ত সারা ভারতের উপর প্রভুত্ব করবার লোভ মারাঠীর মন থেকে ছুট্‌ল না ?"

"তার পরে আর এ দেশে আসেন নি, বোধ হয় ?"

"না। এখনও আসতুম না; তবে চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র দেখে হিসাব করে বল্লে যে ভারতের প্রায়শ্চিত্তের দিন নাকি শেষ হয়ে এসেছে। তাই একবার তোমাদের দেখে শুনে যেতে এলাম। আচ্ছা, তুমিই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। বল দেখি এখন বার্ত্তা কি ?"

ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে গেল। আমি বল্‌লাম—"দোহাই ধর্ম্মরাজ আমি রাজারাজড়া নই; আর রিফর্ম বিলের প্রসাদাৎ আমার রাজ-মন্ত্রী হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। আমি নিতান্তই গরীব ব্রাহ্মণ। শেষে আপনার পরীক্ষায় ফেল হয়ে কি বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণীকে অনাথা করবো ?"

ধর্ম্মরাজ হেসে বল্লেন—"তোমরা কি আর বেঁচে আছ যে তোমাদের মারব ?"

তখন আমি সাহস পেয়ে বল্লাম—"হঁা, তা বটে। আর আপনি যখন নাছোড়বান্দা, তখন আমার বিদ্যেটাই শুনে যান। এ দেশের প্রধান বার্ত্তা হচ্ছে এই বড় বড় লোকে বল্‌ছেন যে সভাস্থলে দাঁড়িয়ে ভাল ভাল ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে পারলেই চালের দর আর কাপড়ের দর একদম্ নেমে যাবে, ছেলেদের পেটের পিলে সেরে যাবে, সাদায় কালায় গলা ধরাধরি করে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বে; ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি আধিব্যাধি সব দূর হয়ে যাবে; এক কথায় ভারতে সত্যযুগ উপস্থিত হবে।"

ধর্ম্মরাজ খুব খুসী হয়ে বল্লেন—'বেশ, বেশ, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও—সুখী কে ?'

আমি বল্‌লাম—মহারাজ, এ কথার খুব সোজা উত্তর। এ দেশে সুখী শুধু মাড়োয়ারী আর (কম) বক্তা।

তখন তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল—"আশ্চর্য্য কি ?"

"আমরা যে এই বুদ্ধি নিয়ে এখনো বেঁচে আছি, এইটেই আমার কাছে সব চেয়ে বড় আশ্চর্য্য।"

ধর্ম্মরাজ—পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করে মাথা নেড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আচ্ছা, এখন পন্থা কি ?"

আমি ধর্ম্মরাজের পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বল্লুম—"মহারাজ ঐটে আমায় মাফ কর্‌তে হবে। পন্থা বাৎলে দিতে গিয়ে, কি বল্‌তে কি বলে ফেলবো, আমি আর এ বয়সে ঠ্যাঙ্গানি খেতে পারব না। আমায় রামে মারলেও মেরেছে, রাবণে মারলেও মেরেছে। উত্তর না দিলে আপনার হাতে মারা পড়ি, আর উত্তর দিলে কালই আমায়—"

হোঃ হোঃ হোঃ শব্দে এক বিরাট হাস্য করে ধর্ম্মরাজ আমার টিকিটা ছেড়ে দিলেন। দিতেই ঠক্‌ করে টেবিলের উপর আমার মাথাটা ঠুকে গেল।

* * * * *

হোঃ হোঃ হোঃ।

চেয়ে দেখি আমার ছেলেটা সুমুখে দাঁড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হাসচে।

"বাবা, এরই মধ্যে বসে বসে ঘুমুচ্ছো? ভাত খাবে না?"

"ভাত কি রে? ধর্ম্মরাজ চলে গেছেন?"

"সে আবার কে?"

"এই যে এতক্ষণ আমার টিকি ধরে বসেছিল"—বলে উঠতে গিয়ে দেখি যে গৃহিণী যে দড়িগাছটায় গামছা ঝুলিয়ে রাখতেন সে দড়ি গাছটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে, আর তার একটা মুখ আমার টিকির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

দ্বীপান্তরের কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ধর্ম্মঘট।

কালাপানির জেলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই আমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ, তাহাদের পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। দেশের জেলে ঐরূপ কোনও নিয়ম না থাকিলেও কালাপানিতে ঐ নিয়মই বলবৎ। জেল জগন্নাথ ক্ষেত্র—এখানে জাতি-ভেদ মরিয়া প্রায় প্রেতদশা লাভ করিয়াছে। তবে মুসলমানদের দাড়ি বা শিখের চুলে হাত দেওয়া হয় না; কিন্তু গোবেচারা ব্রাহ্মণের পৈতা কাড়িয়া লইতে

সবাই ক্ষিপ্রহস্ত। তাহার কারণ শিখ মুসলমান গোঁয়ার? ব্রাহ্মণ নিরীহ। যাই হোক, তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলসখানাকে ত্যাগ করিয়া আমরা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেলাম। মজার কথা এই কোনও ব্রাহ্মণকেই বিশেষ আপত্তি করিতে দেখিলাম না। এ জগতে যে পড়িয়া মার খায় তাহাকে মারিবার জন্ত সকলের হাত উসখুস করে। অনেক দিন পরে রামরক্ষা নামে একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ শুধু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলেন যে পৈতা না থাকিলে পান ভোজন করা তাঁহার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ; সুতরাং পৈতা কাড়িয়া লইলে তিনি জেলখানার অন্ন গ্রহণ করিবেন না। তিনি চীন শ্যাম জাপান অনেক ঘুরিয়াছেন জাতিভেদের গোঁড়ামী তাঁহাতে ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তবে কর্ত্তব্যবোধে পৈতা হরণের বিরুদ্ধে তিনি এত লড়িয়াছিলেন। দুর্ব্বলের কথা কে কবে শুনে? পৈতা তাঁহার কাড়িয়া লওয়াই হইল; তিনিও পানাহার ত্যাগ করিলেন। ৪ দিন নিরম্বু উপবাসের পর তাঁহার নাকে রবারের নল stomach pipe পুরিয়া দিয়া পেটে দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মাসাবধি কাল এইরূপ চলে। তখন একটা ধর্ম্মঘটের (strike) দমকা ঝড় বহিতেছিল, সেই উত্তেজনাবশে রামরক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত অনেক বাকবিতণ্ডা লড়াই করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের জেল হইতে কালাপানিতে আসিবার পূর্ব্বেই নানা কঠোরতায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইবার যক্ষার লক্ষণ দেখা দিল। অল্প দিন পরে যক্ষারোগের চিকিৎসালয়ে গিয়া তিনি যুগপৎ কারাযন্ত্রণা ও ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন।

যাক সে কথা। মরিয়া বাঁচিবার দুঃসাহস আমাদের কুলাইল না। মরিলাম না ত বটেই; অধিকন্তু জেলখানার খোরাক খাইয়াই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া রহিলাম। সেটাও বড় কম বাহাদুরির কথা নয়। রেঙ্গুন চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি, এ না হয় এক রকম চলে; কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা; চুপড়ি আলু; খোসা সমেত কাঁচা কলা ও পুঁই শাক; ছোট ছোট কাঁকর আর ইঁদুরনাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়; তরকারির বদলে তাহার ব্যবহার করিতে গেলে চক্ষে জল না আসে, বাঙলা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে এ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও বড় বিরল। আহাজে চারি দিন "চানা ও চুড়া" চিবাইতে চিবাইতে গিয়াছিলাম; সুতরাং পেটের জ্বালায় আমরা সে অন্নও বেশ হাসিমুখে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম।

জেলে ঢুকিবার পূর্ব্বেই জেলার সাহেব আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে

আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহা বা একত্র বসা নিষিদ্ধ; নিয়মলঙ্ঘনে শাস্তি অনিবার্য্য।

এইবার কাজকর্ম্মের পালা। কালাপানিতে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, আর সেগুলি সমস্তই সরকারী সম্পত্তি। সেই জন্য জেলখানায় প্রধানতঃ নারিকেল লইয়াই কারবার। নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তার বাহির করা ও তাহা হইতে দড়ি পাকান, শুষ্ক নারিকেল ও সরিষা ঘানিতে পিষিয়া তেল বাহির করা, নারিকেলের মালা হইতে হুঁকার খোল প্রস্তুত করা—এই সমস্তই জেলখানার প্রধান কাজ। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ ভিন্ন এখানে বেতের কারখানাও আছে; তাহাতে প্রধানতঃ অল্পবয়স্ক ছেলেরাই কাজ করে।

ঘানি ঘুরান ও ছোবড়া পেটাই সব চেয়ে কঠিন। আমাদের মধ্যে বীরেন্দ্র ও অবিনাশ নিতান্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন বলিয়া তাহাদিগকে দড়ি পাকাইতে দেওয়া হইল; অপর সকলের ভাগ্যে ছোবড়া পেটা মিলিল। সকাল বেলা উঠিয়া শৌচকর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরেই সকলে অন্ন বা "কঞ্জি" গলাধঃকরণ করিয়া "ল্যাঙ্গোটি" আঁটিয়া ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেককে বিশটা নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেওয়া হয়। বর্ণনাটি আর একবার দিই। একখণ্ড কাঠের উপর এক একটা ছোবড়া রাখিয়া একটা কাঠের মুগুর দিয়া তাহা পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটি নরম হইয়া আসে। ছোবড়াগুলি সমস্ত পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুসি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তারগুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটা গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথম দিন এই ছোবড়া পেটা ব্যাপারটা হাঁ করিয়া বুঝিতেই আমাদের অনেকক্ষণ গেল; তাহার পর পিটিতে গিয়া দেখিলাম হাতময় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন মাথা খুঁড়িয়া কোনও রকমে এক পোয়া তার প্রস্তুত করিলাম। অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে যখন বেলা তিনটার সময় কাজ দাখিল করিতে হাজির হইলাম, তখন দাঁত খিচুনির বহর দেখিয়াই চক্ষু স্থির হইয়া গেল। গালাগালিটা নির্ব্বিবাদে হজম করিবার সু-অভ্যাস কস্মিনকালেও ছিল না; আজ বিদেশে এই শত্রুপুরীর মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও গালাগালি সম্বল করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইতে হইবে ভাবিয়া যেন প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। আর সে গালাগালিরই বা কি বাহার! শরৎবাবুর কি একখানা বইএ পড়িয়া-

ছিলাম যে গালাগালিতে হিন্দুস্থানীর মত লম্বা জিহ্বা আর কোনও জাতির নাই। তাঁহাকে একবার পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়া ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিতে আমাদের সবিনয় অনুরোধ। হিন্দুস্থানীর সহিত পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচ মিশিয়া যে অমৃতের উৎস সেখানে খুলিয়া দিয়াছে, তাহার আস্বাদন একবার যাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে সেই মজিয়াছে। সাত জন্ম সে ভাষা চর্চ্চা করিলেও আমাদের দেশের হাড়ী বাগদী পর্য্যন্ত সে রসে সম্যক অধিকারী হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। বীভৎসতার মধ্যে এত রকমারি থাকিতে পারে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।

থাক সে কথা। ছোবড়া পিটিয়া, কচু পাতার তরকারি ও গালাগালি খাইয়া পাঁচ নম্বরে এক রকমে ত দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলাম; কিন্তু উপদেবতার দৌরাত্ম্যে ক্রমে জীবন প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। দেশের জেলে যেমন মেট ও কালাপাগড়ী, কালাপানিতে সেইরূপ warder, Petty Officer, Tindal ও জমাদার। সাধারণ কয়েদীই ৫।৭ বৎসর সাজা কাটিবার পর এই সমস্ত পদে উন্নীত হয়; কিন্তু কালাপানীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ কর্ম্মের ভার ও কর্তৃত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত। যমরাজ কারাধ্যক্ষের ইহারাই প্রহরী। ছেলেবেলা একজন সুরসিক বাঙ্গালী বক্তার মুখে শুনিয়াছিলাম যে যিনি "আষ্টে পিষ্টে" মারেন তিনিই "মাষ্টার"; আমারও সেইরূপে মনে মনে একটা বেশ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে "প্রহার" শব্দের সহিত "প্রহরী"র নিশ্চয় একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গালাগালি ও মারপিটে ইহারা প্রায় সকলেই সিদ্ধহস্ত। "রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে, দাও উহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তাফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই, অতএব উহার গোঁফ ছিঁড়িয়া লও; বকাউল্লার পাইখানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডাণ্ডা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও।" এইরূপ বহুবিধ সদযুক্তি প্রয়োগে তাঁহারা জেলখানার discipline রক্ষা করেন।

কয়েদীরা অনেক সময় গলার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া পয়সা কড়ি লুকাইয়া রাখে; নানারূপে অত্যাচার করিয়া কয়েদীর নিকট হইতে সেই পয়সার ভাগ আদায় করাই প্রহরীদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের ত পয়সা কড়ি নাই, আমরা যাই কোথায়? বারীন্দ্র নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ বলিয়া হাঁসপাতাল হইতে তাঁহার প্রত্যহ ১০ আন্স দুধ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের Petty Officer খোয়েদাদ মিঞার মুখে সেই দুধটুকু ঢালিয়া দিয়া তবে তিনি অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার পাইতেন। খোয়েদাদ একজন প্রচণ্ড নমাজী মোল্লা, পুরাদস্তুর "খোদাকা বান্দা"। তিনি

তাঁহার গোঁফছাঁটা মুখখানির মধ্যে দুধটুকু ঢালিয়া দিতে দিতে বলিতেন—"ইয়াঃ বিসমিল্লা। খোদানে কেয়া আজব চিজ পয়দা কিয়া!"

আরও বিপদের কথা এই, এ সকল অত্যাচারের প্রতীকার নাই। প্রহরীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ দিয়া কে আপনার ঘাড়ে ভূত ডাকিয়া আনিবে? আর মোকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে না পারিলে মিথ্যা মোকর্দ্দমার জন্য উল্টা সাজা খাইবার ভয়ও যথেষ্ট। রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে প্রাণ বাঁচে কিরূপে?

এইরূপে ছয় সাত মাস যাইতে না যাইতে নাসিক, খুলনা ও এলাহাবাদ হইতে ১০।১২ জন রাজনৈতিক কয়েদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বসমেত আমাদের সংখ্যা হইল প্রায় ২০।২২ জন।

এই সময় আমাদের ভাগ্যগগনে নূতন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপী এক ধূমকেতুর উদয় হইল। আমাদের কপাল এইবার পুরাপুরি ভাঙ্গিল। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই আমাদের জনকতককে ঘানিতে দিয়া তেল পিষাইবার ব্যবস্থা করিলেন। উল্লাসকরকে যে সরিষা পিষিবার ঘানিতে জোতা হইল তাহা অনেকটা আমাদের কলুর বাড়ীর দেশী ঘানির মত, আর হেমচন্দ্র, সুধীর, ইন্দু প্রভৃতি বাকি কয়জনকে যে ঘানিতে পাঠান হইল তাহা হাত দিয়া ঘুরাইতে হয়। প্রত্যহ এক একজনকে ১০ পাউণ্ড সরিষার তেল বা ৩০ পাউণ্ড নারিকেল তেল পিষিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া যায়; আর আমাদের যে কি দশা হইল তাহা মুখে অবর্ণনীয়। জেলের যে অংশে তেল পেষা হয় দুইজন পঠান পেটী অফিসার তখন সেখানকার কর্ত্তাকর্ত্তা। সেখানে ঢুকিতেই তাঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহার বদ্ধমুষ্টি আমাদের নাকের উপর রাখিয়া বেশ জোর গলায় বুঝাইয়া দিল যে কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিক না করিতে পারিলে তিনি আমাদের নাকগুলি ঘুসার চোটে থ্যাবড়া করিয়া দিবেন। কিন্তু নাকের ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাড়াতাড়ি কাঁধের উপর ৫০ পাউণ্ড নারিকেলের বস্তা ও হাতে একটা বালতি লইয়া কাহাকেও দোতালায়, কাহাকেও তেতালায় চড়িয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে ত কাজ নয়, রীতিমত মল্লযুদ্ধ। ৮।১০ মিনিটের মধ্যেই দম চড়িয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। রাগের চোটে মনে মনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ। একবার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝি এ জ্বালা মিটিবে, কিন্তু লজ্জায় তাহাও পারি-

পাম না। ১০টার ঘণ্টার পর যখন আহার করিতে নীচে নামিলাম, তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে আর কাণে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। প্রথমেই দেখিলাম বৃদ্ধ হেমচন্দ্র এক কোণে চুপ চাপ বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, কি রকম?" দাদা হাত দুখানা দেখাইয়া বলিলেন—"দারুভূতো মুরারি"। কিন্তু হাত দুখানা আড়ষ্ট হইয়া দারুময়ই হোক, আর পাষাণময়ই হোক তাঁহার মনের জোর কখন একবিন্দু কমিতে দেখি নাই। দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিতে, তীব্র যন্ত্রণার মাঝখানে অবিচলিতভাবে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতে হেমচন্দ্র একরূপ অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্রকে আত্মহারা হইতে কেহ বড় একটা দেখে নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন কেহ কেহ যা হউক কিছু একটা করিয়া ফেলিবার সংকল্প করিয়াছে, তখন হেমচন্দ্রই আপনার মনের বল তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে ২।৩ জন ব্যতীত স্বহস্তে ৩০ পাউণ্ড তেল পেষা সকলেরই সাধ্যাতীত। অনেক সময় অন্যান্য কয়েদীরা লুকাইয়া আমাদের সাহায্য করিত।

এইরূপে দিনের বেলা ঘানি ঘুরাইয়া ও রাত্রে আধমরার মত পড়িয়া থাকিয়া ত একমাস কাটিল।

একমাস পরে প্রথম দল বদলি হইয়া দ্বিতীয় দল ঘানি পিষিতে আসিল। অবিনাশ নিতান্ত দুর্ব্বল ও তাহার Tuberculosis হইবার সম্ভাবনা জানিয়া প্রথম বারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে কঠিন কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারের কর্ত্তা মেজর বার্কার তাঁহাকে বিনা পরীক্ষায় ঘানি পিষিতে পাঠাইলেন। এলাহাবাদের "স্বরাজ" সম্পাদক শ্রীমান নন্দগোপালকেও এই সঙ্গে ঘানিতে আনিলেন।

নন্দগোপাল পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়। দীর্ঘকায় সুপুরুষ ১২১ ক ধারায় অভিযুক্ত হইয়া ১০ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। তিনি ঘানিতে যাইয়া এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। প্রথমেই বলিলেন "অত জোরে ঘানি ঘুরান আমার পোষাইবে না, আমি সাধ্যমত আস্তে আস্তে পিষিব। নিজের হাতে নিজেকে সাজা দিব না।" ঘানি আস্তে আস্তে ঘুরিতে লাগিল; ফলে ১০টার মধ্যে তেলের এক তৃতীয়াংশও পেষা হইল না। ১০টার সময় নীচে আসিয়া সাধারণ কয়েদীরা ৫।০ মিনিটের মধ্যেই তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া লইয়া আবার কাজ করিতে ছুটে। ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আইন অনুসারে আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট

থাকিলেও কাজ পাছে শেষ না হয় এই ভয়ে তাহারা বিশ্রাম লইতে সাহস করে না। কাজ শীঘ্র শেষ হইলে হাত-পা ছড়াইয়া জিরাইতেও পায়। নন্দগোপালের সে ভয় নাই। পেটি অফিসার আসিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া লইবার জন্য তাঁহার উপর হুকুম জারি করিল। নন্দগোপাল তাহাকে স্বাস্থ্যনীতি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, যে, তাড়াতাড়ি আহার করিলে পাকস্থলীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, আর ১০ বৎসর যখন তাঁহাকে সরকার বাহাদুরের অতিথি হইয়া থাকিতেই হইবে, তখন কোনও কারণে তিনি আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া সরকারের বদনাম করিতে রাজী নহেন। জেলার সাহেবের কাছে রিপোর্ট পৌঁছিল, তিনি আসিয়া দেখিলেন নন্দগোপাল ধীরে ধীরে গ্রাস পাকাইয়া বত্রিশ দাতে চৌষট্টি কামড় মারিয়া এক এক গ্রাস গলাধঃকরণ করিতেছেন। খুব খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তিনি নন্দগোপালকে বুঝাইয়া দিলেন, যে, কাজ যথাসময়ে শেষ করিতে না পারিলে বেত্রাঘাত অনিবার্য্য। নন্দগোপাল নিতান্ত ভদ্রভাবে স্বাস্থ্যনীতির পুনরাবৃত্তি করিয়া জেলার সাহেবকে জানাইলেন, যে, সরকার বাহাদুর যখন ১০টা ১২টা পর্য্যন্ত আহার ও বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ত নিজে সে আইন ভঙ্গ করিবেনই না, অধিকন্তু জেলার সাহেবও যাহাতে সে আইন ভঙ্গ না করেন সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। বলা বাহুল্য জেলার সাহেবের অঙ্গ জুড়াইয়া দ্রব হইয়া গেল আর কি। তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মানে মানে প্রস্থান করিলেন। আহারাদি যথাসময়ে শেষ করিয়া নন্দগোপাল কুঠরীতে গিয়া ঢুকিলেন। পেটি অফিসার ভাবিল এইবার বুঝি কাজ আরম্ভ হইবে। নন্দগোপাল কিন্তু একখানি কম্বল লইয়া আস্তে আস্তে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। অজস্র গালাগালিতেও তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইল না, passive resistanceএ তিনি মহাত্মা গান্ধিরও গুরু। ১২টার সময় উঠিয়া নন্দগোপাল আরও এক ঘণ্টা ঘানি ঘুরাইলেন, যখন দেখিলেন যে বালতিতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড তেল হইয়াছে তখন বাকি নারিকেল বস্তায় বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজের ত অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে, বাকি অর্দ্ধেক এখন করিবে কে? নন্দগোপাল বলিলেন, "যাহার খুসি সেই করিবে। আমি ত আর সত্য সত্যই কলুর বলদ নই, যে, সমস্ত দিনই তেল পিষিব। দিনে ত ছয় পয়সারও খোরাক পাই না, তা ৩০ পাউণ্ড তেল পিষিব কেমন করিয়া!"

কর্তৃপক্ষ মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তর্জ্জন গর্জ্জন অনেক হইল; কিন্তু নন্দগোপাল নির্ব্বিকার পরমপুরুষের মত নিস্পন্দ। নন্দগোপালের নিকট

হইতে ৩০ পাউণ্ড তেল বাহির হইবার কোন আশাই নাই দেখিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে পায়ে বেড়ী দিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (till further order) কুঠরীতে বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

এদিকে সরিষার ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবিনাশের শরীর ভাঙ্গিয়া আসিল। দশটার পর তাহার আর কাজ করিবার সামর্থ্য থাকিত না। ইন্দু আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সবল; কয়েদীদের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিনাশের বাকি কাজটুকু সে করিয়া দিয়া কোন রকমে এ যাত্রা তাহার পাপক্ষয় করাইয়া দিল।

এইরূপে আরও এক মাস কাটিল। ইতিমধ্যে জেলার সাহেব নন্দগোপালের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, যে, চারদিন পূরা কাজ করিলে তিনি ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঘানি ঘুরান হইতে অব্যাহতি দিবেন। নন্দগোপালও রাজি হইয়া অল্লাধিক পরিমাণে অপরের সাহায্যে ৪ দিন পূরা কাজ দাখিল করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন।

এ নিষ্কৃতির আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিন পরেই আবার তাঁহাকে সরিষার ঘানি পিষিতে দেওয়াতে তিনি সে কাজ করিতে অস্বীকৃত হন। ফল—বেড়ি ও কুঠরী বন্ধ। হুকুম হইল সকলকে পুনরায় তিন দিনের জন্য ঘানি ঘুরাইতে হইবে। একে ত আমরা সকলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে আবদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যহ এই ঘানির বিভীষিকা। সকলেই বুঝিলেন যে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সুবিধা রকমের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া না লইতে পারিলে পোর্ট-ব্লেয়ারেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। সাজা ত আছেই, তবে আর নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দেওয়া কেন? অনেকেই এবার ঘানিতে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল।

কর্ত্তৃপক্ষও রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। জেলখানা ভরিয়া সে এক আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সাজার উপর সাজা চলিতে লাগিল। ৪ দিন কঞ্জিভক্ষণ ও ৭ দিন দাঁড়া হাতকড়ি, ইহাই সাধারণতঃ সাজার প্রথম কিস্তি। গুঁড়া চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢালিয়া দিলে যে সুখাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাই আমাদের "কঞ্জি"। তাহাই মাপিয়া এক এক পাউণ্ড করিয়া দিনে দুইবার খাইতে দেওয়া হয়, এবং কয়েদী কোনও উপায়ে আর কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইতে না পায় সে বিষয়ে কড়া পাহারা থাকে। জেলের শাস্ত্র অনুসারে ৪ দিনের অধিক এ কঞ্জি (penal diet) খাওয়াইবার নিয়ম নাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আমাদের উপর দয়ার আধিক্য-বশতঃই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক আমাদের মধ্যে উল্লাসকর,

নন্দগোপাল ও হোতিলালকে ১২।১৩ দিন এই কল্কি খাওয়াইয়া রাখা হয়। ১৯১৩ সালে যখন শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ক্র্যাডক পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান তখন নন্দগোপাল তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করেন; কিন্তু সাজা দিলেও জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ টিকিটে এ সম্বন্ধে কোনও কথা লিখেন নাই। জেলার সাহেবও অম্লানবদনে বলিলেন যে অভিযোগ মিথ্যা। সুতরাং ফল কিছুই হইল না। জেলারের বিরুদ্ধে কয়েদীর কথা প্রমাণ হয় না।

সাজার পর সাজা চলিতে লাগিল, নানা রকমের বেতীর পালা শেষ করিয়া আমাদের কুঠরীতে বন্ধ কর হইল। তাহারও একটু রকমারি আছে। সাধারণ কয়েদীদের কুঠরী বন্ধ করা হইলে তাহারা নীচে আসিয়া স্নানাহার করিতে পারে; অপর কয়েদীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবারও তাহাদের বাধা নাই। এখন নূতন আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে আমাদের সঙ্গে কেহ কথা কহিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সুতরাং নামে পৃথক কারাবাস (Separate confinement) হইলেও কার্য্যতঃ আমাদের পক্ষে উহা নির্জ্জন কারাবাস (Solitary confinement) হইয়া দাঁড়াইল। অনেককেই তিন মাস বা ততোধিককাল এইরূপ কুঠরী-বন্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইল।

অনেকেরই এই সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। একে পোর্ট ব্লেয়ারে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপ; জ্বরজারি লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আমাশয় সুরু হইল। কর্ত্তৃপক্ষও বোধ হয় ভাবিলেন যে ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন দরকার। সেই জন্য আমাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া জন কয়েককে করনেশন উৎসবের সময় জেলের বাহিরে Settlementএ পাঠান হইল। বারীন্দ্র গেল Engineering fileএ, অর্থাৎ রাজমিস্ত্রীর সহিত মজুরী করিতে; উল্লাসকর গেলেন মাটি কাটিয়া ইট বানাইতে, কেহ বা গেলেন জঙ্গলে Forest Departmentএর কাঠ কাটিতে, কেহ বা গেলেন রিকশ টানিতে, আর কেহ বা গেলেন বাঁধ বাঁধিতে।

আমাদের কিন্তু অদৃষ্টগুণে 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া দাঁড়াইল। জেলখানার মধ্যে কাজ যতই কঠোর হোক না কেন, সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট পুরা খোরাক পাওয়া যাইত, আর জল বৃষ্টিতে বেশী ভিজিতে হইত না। বাহিরে গিয়া সে সুখটুকুও চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্নে ১ হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ত করিতেই হইবে; অধিকন্তু রৌদ্রে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। একে ত পোর্ট ব্লেয়ারে বৎসরে ৭ মাস বর্ষাকাল, তাহার উপর জঙ্গলে জোঁকের উপদ্রব। জঙ্গলে কাজ করিবার ভয়ে কত লোক যে পলাইতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

একে ত এই কষ্ট, তাহার উপর পুরা খোরাক মিলে না। কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হয়। সাধারণ কয়েদী হইতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই এই চুরির কথা বেশ জানেন; কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হয় না। অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ঘুসখোর; সুতরাং এ চুরি-রোগের প্রতীকার নাই। সাধারণ কয়েদী ইহার বিরুদ্ধে সহজে কিছু বলিতে চায় না; কেন না সে বিলক্ষণ জানে, যে, মুখ খুলিলেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

রোগীর জন্য জেলের বাহিরে ৪টী হাঁসপাতাল; কিন্তু সেগুলি বাঙ্গালী Asst. surgeonএর তত্ত্বাবধানে বলিয়া চিফ কমিসনার কর্ণেল ব্রাউনিং আদেশ দিলেন, যে, আমাদের অসুখ হইলে আমরা সে সমস্ত হাঁসপাতালে যাইতে পারিব না, আমাদিগকে জেলে ফিরিয়া আসিতে হইবে। জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে বিছানা ও থালা বাটি ঘাড়ে করিয়া ৫।৭। • মাইল হাঁটিয়া আসা বড় সুবিধার কথা নয়। আর জেলে আসিয়াই বা সুচিকিৎসা কোথায়। হাঁসপাতাল সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট কুঠরীর মধ্যে আমাদের দিনে প্রায় ২২ ঘণ্টা পড়িয়া থাকিতে হইত; আর সেই কুঠরীর মধ্যেই একটি গামলায় আবার মলমূত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত। বৃষ্টির সময় পিছনদিকের ঘুলঘুলি দিয়া জলের ছাট আসিবার বেশ সুব্যবস্থা আছে, কিন্তু কুঠরীতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের তেমন উপায় নাই। ১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে যে জেল-কমিসন পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শন করিতে যান, তাঁহারা এই কুঠরীগুলির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন; এ গুলির নাকি সংস্কার শীঘ্রই হইবে।

যাক সে কথা। এত দিন আমরা ভাবিয়াছিলাম, যে, বুঝি জেলের বাহির হইতে পারিলেই আমাদের দুঃখ কতকটা ঘুচিবে; কিন্তু সে আশা এবার নির্ম্মূল হইল। আমাদের জন্য জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ; সাধারণ কয়েদী ক্রমে ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার বা লেখাপড়া জানিলে মুন্সি হইয়া কঠোর কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পায়; কিন্তু আমাদের সে পথও বন্ধ।

এক এক করিয়া প্রায় সকলেই ক্রমে বাহিরের কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া জেলে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। ইন্দুভূষণ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। তাহার বলিষ্ঠ শরীর কঠোর পরিশ্রমেও কখন কাতর হয় নাই; কিন্তু জেলখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপমানে সে যেন দিন দিনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে ছিল; মাঝে মাঝে বলিত—'জীবনের দশটা বৎসর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এক দিন রাত্রে সে নিজের জামা ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগাইয়া ফাঁসি খাইল। রাত্রেই জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে টেলিফোন করা হইল, কিন্তু পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা মিলিল না। সে দিন রাত্রে জেলারের সহিত যে সমস্ত প্রহরী ইন্দুভূষণের কুঠরীতে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বলিল, যে, তাঁহার গলার হাঁসুলিতে (neck ticket) একখণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু সে কাগজের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে আমরা জেলার সাহেবকে ঐ কাগজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। পরে ইন্দুভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে পোর্ট ব্লেয়ারের ডেপুটী কমিসনারের উপর ঐ ভার অর্পিত হয়। ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। ব্যাপারটা হযবরল হইয়া চাপা পড়িয়া গেল।

এই সময়ে অনেকেই কাজের তাড়ায় বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। উল্লাসকরও তাহাই করিলেন। তাঁহাকে রৌদ্রে ইট তৈয়ার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার হাঁসপাতালের যিনি Junior medical officer তিনি বলিলেন যে উল্লাসকরের রৌদ্রে কাজ করা সহ্য হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালী ডাক্তারের কথা গোরা Overseer সাহেব গ্রাহ্য করিবেন কেন? উল্লাসকরকে সেই কার্য্যেই বাহাল রাখা হইল, ফলে তিনি কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে শুধু পীড়নের ভয়ে কাজ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সাজার ভয়ে কাজ করিতে তিনি রাজী নহেন। তাঁহার ৭ দিন দাঁড়া হাতকড়ির ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সে সাত দিন আর পূর্ণ হইল না। প্রথম দিনই বেলা ৪॥০টার সময় হাতকড়ি খুলিতে গিয়া পেটি অফিসার দেখিল যে উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছে। তখনই তাঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইল। রাত্রে শরীরের উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়ে। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্ব্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদরোগগ্রস্ত!

জেলখানার প্রকৃত মূর্ত্তি যেন সেই দিন আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। বাঁচিয়া দেশে ফিরিবার ত আর আমাদের কোনও আশা নাই—কেহ ফাঁসি খাইয়া মরিবে, কেহ বা পাগল হইয়া মরিবে। আর যদি মরিতেই হয় তবে আর স্বহস্তে এই যন্ত্রণার বোঝা উঠান কেন? প্রায় সকলেই স্থির করিলেন যে যত দিন

আমাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয় তত দিন কাজকর্ম করা হইবে না। এদিকে আমরা ultimatum দিয়া তাল ঠুকিয়া মরিয়া হইয়া রহিলাম, ওদিকে কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের তূণ হইতে চোখা চোখা বাণ হানিতে আরম্ভ করিলেন।

বেশ একচোট গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইহার কিছু পূর্ব্বে চুঁচুড়ার ননিগোপাল ও ঢাকার পুলিনবাবু প্রভৃতি ৩।৪ জন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ননিগোপাল ছেলেমানুষ হইলেও তাহাকে ঘানি প্রভৃতি কঠোর কর্ম্ম দেওয়া হয়। সেও বাধ্য হইয়া ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। অন্য সকল কয়েদী হইতে পৃথক করিয়া আমাদের একটা আলাদা ব্লকে বন্ধ রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের উপর বাছা বাছা পাঠান প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। খাদ্যের পরিমাণ আরও কমাইয়া দেওয়া হইল, এবং যাহাতে আমরা পরস্পরের সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা চালাইতে না পারি সে বিষয়েও সতর্কতার অভাব রহিল না। পাইখানায় গিয়া পাছে কথা কহি সে জন্য সম্মুখে প্রহরী খাড়া থাকিত। কিন্তু বাঁধন বেশী শক্ত করিতে গেলে অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়, আর আইনের প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, শুধু ভয় দেখাইয়া তাহাদের আইন মানাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা প্রধানতঃ তিনটা জিনিস চাহিলাম—ভাল খাওয়া পরা, পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি ও পরস্পরের সহিত মেলামেশার সুবিধা।

মধ্যে ৪।৫ কুঠরী ব্যবধান রাখিয়া এক এক জনকে বন্ধ করা হইল। ফলে কথাবার্ত্তা আগে আস্তে আস্তে হইতেছিল, এখন চীৎকার করিয়া চলিতে লাগিল। হাতকড়াতে ঝুলাইয়া রাখিলেও মানুষের মুখ ত আর বন্ধ করা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষের যেন সাপে ছুঁচো ধরা হইয়া দাঁড়াইল। Prestige এর খাতিরে আমাদের আবদার শুনাও চলে না, আর এদিকে ধর্ম্মঘটও ভাঙ্গে না। এমন সময়ে আমাদের নূতন সুপারিন্টেনডেণ্ট বদলি হইয়া পুরাতন সুপারিন্টেনডেণ্ট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পরামর্শে চিফ কমিসনার আমাদের জন কয়েককে সহজ কাজ দিয়া জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা বলিলাম যে সকলকে যদি জেলের বাহিরে পাঠান হয় তাহা হইলে আমরা বাহিরে কাজ করিতে স্বীকৃত হইব, নচেৎ পুনরায় জেলে ফিরিয়া আসিব।

প্রায় ১০।১২ জনকে নারিকেল গাছের পাহারাওয়ালা করিয়া বাহিরে পাঠান হইল। নারিকেল গাছ সরকারী সম্পত্তি, তাহা হইতে নারিকেল না চুরি যায় ইহা দেখাই পাহারাওয়ালার কাজ। কাজ খুব সহজ, কিন্তু সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল, পাছে পরস্পর দেখা শুনা হয়।

জেলখানায় কিন্তু ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল। নন্দগোপাল ও ননিগোপালকে কিছু দিন পরে Viper দ্বীপে একটা ছোট জেলে বদলি করা হইল। সেখানে গিয়া ননিগোপাল আহার ত্যাগ করিল। জেল হইতে সকলকে বাহিরে পাঠাইবার যে কথা ছিল তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

এদিকে যাঁহাদিগকে জেলের বাহিরে কাজ করিতে পাঠান হইয়াছিল, তাহারও একজোটে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। পরস্পরের ঠিকানার সন্ধান লইয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইল। তিন মাসের সাজা লইয়া তাঁহারা জেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে জেলখানার ধর্ম্মঘট প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিরাশ হইয়া অধিকাংশই কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ননিগোপালকে ৪ দিন অনশনের পর জেলে ফিরাইয়া আনা হইল, নাকে রবরের নল পুরিয়া তাহার অল্প অল্প দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা হইল, পাছে সে মরিয়া গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বদ্‌নাম করে। সেবারকার ধর্ম্মঘটের কর্ম্মভোগের বোঝা ননিগোপাল, বীরেন প্রভৃতি দুই তিনটী ছেলেকেই বহিতে হয়। সাজার-পর সাজা খাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া একে একে সকলেই ধর্ম্মঘট ছাড়িল; শেষে একা ননিগোপাল যেন মরণপণ করিয়া বসিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, ননিগোপাল কঙ্কালের মত শীর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু আপনার গোঁ ছাড়িল না। যখন দেড় মাসের অধিক অনশনক্লিষ্ট, তখনও তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কোচ বোধ হইল না। দেখিতে দেখিতে Hunger strike ছড়াইয়া পড়িল এবং কর্ত্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ উল্লাসকর ও ননিগোপালের কথা দেশের কাণে আসিয়া পৌঁছিল। সংবাদপত্রে সে সমস্ত বিষয় আলোচনার ফলে ডাক্তার Lukis সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট তদন্তের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান। Lukis সাহেবের রিপোর্ট আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার রিপোর্টের ফলে উল্লাসকরকে মাদ্রাজের পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর সকলেও অল্পদিনের জন্য একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

ননিগোপালকেও অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহার বন্ধুবান্ধবেরা আহার করিতে স্বীকৃত করান, এবং ইহার অল্পদিন পরেই যাহারা তিন মাসের সাজা লইয়া জেলখানায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদিগকে আবার জেলের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ধর্ম্মঘটের প্রথম পর্ব্ব এইখানে সমাপ্ত হইল।

দ্বারকায়।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।]

কেন প্রিয়ে গঞ্জনা এ কেন এমন অভিমান ?
বারেক শোন কি আগুনে জ্বলচে সদা আমার প্রাণ !
রাজা হয়ে পাচ্ছি বিষম সাজা।
সুখের রাজা নয় এ দুঃখের রাজা
বল্‌লে তুমি ভাব্‌বে, প্রিয়তমে,
হয়ত মিছে কথা—
তোমরা শুধু জান' আমায় কর্‌তে পটু কপটতা !

সে এক সময় ছিল যখন কর্‌তে মধু মধুরতর
সত্য চেয়ে লাগ্‌তো মিঠে মিছে কথাই তখন বড় !
কথায় কথায় ফেল্‌তে চোখের জল,
চখের সে জল মুছ্‌তে আমার ছল
মান অভিমান নিয়েই' কাট্‌তো রাতি
তাতেই সে সুখ কত ?
দীর্ঘ দিনের বিরহ দুঃখ এই মিলনে মলিন হ'তো।

চাতুরীতেই সব মাধুরী নিত্য নব রইত ভরা
সোজা কথাই বাঁকা ছিল, ভাঙার খেলায় হ'ত গড়া।
টোকা মেরে ব্যথা দিতাম গালে,
বেঁকিয়ে দিতাম সিঁদুর টিপ্‌টি ভালে,
কবরীটির এলিয়ে দিয়ে বেণী
তিলক লেখা মুছিয়ে,
দেখ্‌তাম সাজের অতীত রূপ যে, সাজের সজ্জা ঘুচিয়ে।

নিত আদরে অনাদরের তুলে ধুয়া শতেক ছুতা
নাগরালীর চতুরালী— আজকে তার আর সুযোগ কোথা ?
মিলন-সুখের শাওন ধারার বেলা,
করেছি যা'র কতই হেলা ফেলা ;
আজ তা স্মরি শিউরে উঠি, প্রিয়ে,
কর গো প্রত্যয় ;
এই অদিনে এমন কথা মন-ভুলানোর জন্য নয় !

গোকুলবাসী গরীব গোপ ধনের কাঙাল বলি, সবাই
ভাব্‌চে বুঝি রাজা হয়ে পরম সুখেই দিন কাটাই।
এ রাজ-ভোগ ত রাজ্যপদও পেয়ে
বলি যদি, গোকুল ভাল এই চেয়ে,
মান্‌বেনা কেউ, বল্‌বে সবাই মিছে,
তোমরা কইবে ঠাট এ—
ভাল কিনা রাজ্য ছেড়ে রাখাল হওয়া মাঠে মাঠে ?

বাল্য আমার কাট্‌লো যেথায় স্নেহাদরের দুলাল হয়ে,
গাছের ছায়ায় মায়ের মায়ায় ধূলায় কাদায় সবার লয়ে,
যৌবনে মোর যৌবরাজ্য ভরে,
সখা সখীর প্রজা থরে থরে ;
আজ যে আমার সেই ঠাঁইটি ছাড়া
মরার বাড়া দুখ—
গোকুল আমার মহারাজ্য, গোকুল যে তাই শ্রেষ্ঠ সুখ !

নাইক' হেথা বংশীবট, পুলিননীপে দোলার বাঁধন,
দাদুর ডাকা ভাদর দিনে তমালতলে বাদর যাপন,
ঘুঘু ডাকা নিদাঘ দুপুর ছায়া,
ঝিলি মিলি মরীচিকার মায়া,
কোথায় সরল রাখাল সখার সঙ্গ,
কোথায় তুমি প্রিয়া ?
তাই ত' এ রাজগোষাক ছেড়ে পীত ধড়াই চাহে হিয়া !

উঁচু করে আমায় সবাই নীচু হয়েই থাকতে চায়,
অধিপতি নই গো আমি সবার অধম হারকার ;
কেউ তো আমার বসে নাক পাশে,
বল্‌লে ওরা নতশিরে হাসে,
রাজা বলেই আমায় ভাল বাসে।
বন্ধু আসেন যাঁরা
প্রাণ দিতে সব বারণ করে, প্রাণ বধিতে দেন তাড়া।

নাইক হেথা বাঁশীর বারণ, তাই বাজে না বাঁশী আর,
রাজ প্রাসাদের অবরোধে প্রাণ যে করে হাহাকার ;
দুঃখে এ তাই রুক্মে মুড়ে নিয়ে
প্রাণের দোসর করে আছি জীয়ে,
প্রেম যে মাগে আরাধিকা রাধা ;
তবে এ রুক্মিণী
এ যে ব্যথা এই বিরহীর স্বর্ণময়ী শরীরিণী।

নারী জাতির প্রতি।

[শ্রীমীরা দেবী]

নারীর সব চেয়ে বড় কাজ সন্তানকে গড়িয়া তোলা। মাতৃত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কিন্তু এই মাতৃত্বের অর্থ কি? কুকুর বিড়াল যে রকমে তাদের শাবকের মা হয় সংস্কারের তাড়নায়, অজ্ঞানের বশে, যন্ত্রের মত—তাকে কখনই মাতৃত্ব নাম দেওয়া যায় না। সজ্ঞানে যখন একটি সত্তাকে সৃষ্টি করিতে থাকি, ইচ্ছার বলে যখন একটি জীবকে নূতন দেহের আশ্রয়ে গড়িয়া বাড়াইয়া তুলিতে থাকি, তখনই প্রকৃত মাতৃত্বের আরম্ভ।

নারীর প্রকৃত কাজ হইতেছে আধ্যাত্মিক কাজ, এ কথা আমরা অতি সহজেই ভুলিয়া যাই।

সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা অন্ধ অজানা ভাবে তার দেহটিকে তৈয়ারী হইতে দেওয়াই সব কথা নয়। প্রকৃত কাজের আরম্ভ তখনই যখন চিন্তার ও ইচ্ছার শক্তিতে এমন একটি জীব আত্মা ভিতরে ধারণ করি ও সৃষ্টি করি যে পারিবে একটা আদর্শকে রূপ দিতে।

বলিও না এমন জিনিষ সত্য সত্যই করিবার শক্তি আমাদের নাই। প্রমাণ স্বরূপ এই রকম শক্তির অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ এ কথা বহু পূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্য্যবেক্ষণ চলিয়াছে যে বাহিরের চারিপাশের একটা মস্ত প্রভাব আছে। নারীকে সুন্দর শোভন জিনিষে ঘিরিয়া রাখিয়াই প্রাচীন গ্রীকগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের মতন এমন একটি অসাধারণভাবে সুন্দর ও সুসমঞ্জস জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

এই একই ঘটনায় ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তও অনেক আছে। গর্ভাবস্থায় কোন নারী একখানা সুন্দর ছবি বা একটি সুন্দর মূর্ত্তি বার বার দেখিয়াছে আর বিভোরে প্রশংসা করিয়াছে, পরে ঠিক সেই ছবি বা মূর্ত্তির অনুরূপ সন্তানের মাতা হইয়াছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। আমি নিজেই এই রকম কয়েকটি দেখিয়াছি। দুইটি ছোট মেয়েকে আমায় স্পষ্ট মনে পড়ে, তারা ছিল জমজ ভগিনী, খুবই সুন্দরী। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই বাপ মায়ের মতন তাদের

কিছুই ছিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া ইংরাজ চিত্রকর রেনল্ড্‌সের (Reynolds) অঙ্কিত একখানা প্রসিদ্ধ ছবি আমার মনে পড়িত। এক দিন এই কথাটা তাদের মা'কে আমি বলি, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যই, তাই, শুনে বোধ হয় আপনি আশ্চর্য্য হবেন যে, এরা যখন গর্ভে তখন রেনল্ডসের ঐ ছবিটির একখানি চমৎকার অনুকৃতি আমার শিয়রের দিকে টাঙ্গাইয়া রাখি। আর ঘুমের ঠিক আগে ও পরে জেগে উঠেই, সকলের শেষ ও সকলের প্রথমে আমার চোখ পড়্‌ত ঐ ছবি খানির উপর ; মনে মনে আমি আকাঙ্ক্ষা করতেম, আমার সন্তানদের মুখ যেন ঐ ছবির মুখেরই মত হয়। আমার মনস্কাম যে সিদ্ধ হয়েছে, তা'তো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন!" বাস্তবিক তাঁর সফলতার জন্ত তিনি গৌরব করিতে পারেন, তাঁর দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর সকল নারীও যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন।

দেহের ক্ষেত্রে যদি এমন সুফল পাওয়া যায়, তবে মনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বেশী ফল পাওয়া যাইবে। কারণ স্থূল জগতের উপকরণ হইতেছে জড়, শক্ত, সব চেয়ে কম নমনীয়, ইচ্ছামত ঢালাই করিয়া গড়া যায় না ; কিন্তু মানসিক জগতে কেবল ইচ্ছা ও চিন্তারই শক্তিতে সব হয়। তবে কেন বংশানুক্রমের পুনরায় পিতৃপুরুষের ছাঁচে গড়িয়া উঠার দুর্জ্জেয় বন্ধন নিয়ম সব আমরা মানিয়া লই ? এ সব নিজ নিজ স্বভাবের ধারণাটির উপর আমাদের অন্ধ ও অজ্ঞাত টান বই কিছুই নয়। আমরা ত চিত্তের একাগ্রতা ও ইচ্ছা-শক্তির সহায়ে, যত বড় আদর্শ কল্পনা করিতে পারি, তারই অনুরূপ এক মানব জাতিকে সৃষ্টি করিতে পারি। এই প্রয়াসের মধ্য দিয়া মাতৃত্ব প্রকৃতই অমূল্য ও পবিত্র বস্তু হইয়া উঠে ; ফলতঃ ইহারই মধ্য দিয়া আমরা ভাগবত কার্য্য করিতে আরম্ভ করি ; নারীত্ব এই রকমেই পশুত্বের এবং তার সংস্কারের উপরে উঠিয়া যায়— চলে প্রকৃত মানবত্ব আর তার শক্তির ঐশ্বর্য্যের দিকে।

এই প্রয়াস এই চেষ্টাই তবে আমাদের সত্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যকে চিরকালই সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বলিয়া মানা হইয়াছে ; কিন্তু আজ পৃথিবীর একটা নূতন ধারা পরিবর্ত্তনের দিনে এই কর্ত্তব্য যে আরও কত বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়।

জগতের ইতিহাসের একটা সাধারণ রকম পরিবর্ত্তনের মুখে একটা অসাধারণ মুহূর্ত্তে আমরা আজ দাঁড়াইয়া আছি। পূর্ব্বে মানুষ কোন যুগে বোধ হয় এমন ঘোর রেষারেষি, রক্তারক্তি, অরাজকতার ভিতর দিয়া যায় নাই।

তবুও ইহারই মধ্যে মানুষের বুকে একখানি তীব্র দীপ্ত আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও কখন হয় নাই। বাস্তবিক, যদি আমরা আমাদের অন্তরের বাণীর প্রতি কর্ণপাত করি, তৎক্ষণাৎ অনুভব করি ন্যূনাধিক্ পরিমাণে জ্ঞানতঃই যেন আমরা অপেক্ষা করিতেছি একটা নূতন ধর্ম্মরাজ্যের—সৌন্দর্য্যের, সুমনসের, সৌভ্রাত্রের রাজ্যের জন্য। পক্ষান্তরে, জগতের বাস্তবিক অবস্থাকে ইহার ঠিক বিপরীতই দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি ভোরের পূর্ব্বেই রাত্রি সব চেয়ে বেশী অন্ধকার। এই ঘোর অন্ধকার কি তবে আগতপ্রায় ঊষারই ইঙ্গিত হইতে পারে না? এমন ঘোর নিবিড় ভীষণ রজনী যখন আর কখন হয় নাই, তখন ঐ যেটি আসিতেছে তাহার মতন এমন উজ্জ্বল, এমন নির্ম্মল, এমন জ্যোতির্ম্ময় ঊষা কখন নাও হইয়া থাকিতে পারে। নিশীথের দুঃস্বপ্নের পরে জগৎ একটা নূতন চেতনায় জাগিয়া উঠিবে।

যে শিক্ষা সভ্যতা আজ এমন জাঁকজমকে শেষ হইতেছে, তাহার ভিত্তি ছিল মন—তর্কবল, যে মনের কাজ ছিল প্রাণশক্তি আর জড় দেহকে লইয়া নাড়াচাড়া করা। জগৎকে সে কি করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিব না। কিন্তু একটা নূতন ধর্ম্ম আসিতেছে, জ্ঞানময় আত্মার ধর্ম্ম, মানুষ-ভাবের পরে দেব-ভাব—আমরা সেই কথাই বলিব।

আমাদের সৌভাগ্য, এমন সঙ্কুল অনুপম সন্ধিকালে আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, ঘটনার ক্রমবিকাশ শুধু চোখ দিয়া দেখিতে থাকিলেই কি যথেষ্ট হইল? যাহারা অনুভব করে যে হৃদয় তাহাদের নিজের ও পরিজনের পরিধি ছাড়াইয়া আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে, চিন্তা তাহাদের আলিঙ্গন করিয়াছে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা স্থানগত সংস্কার ছাড়া আরও বেশী কিছু—এক কথায়, যাহারাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে তাহারা নিজের নয়, পরিবারের নয়, এমন কি দেশেরও নয়, কিন্তু তাহারা হইতেছে যিনি সকল দেশের সমস্ত মানবজাতির ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকট করিতেছেন সেই ভগবানের, তাহারা সকলেই জানে মানবজাতির জন্য, ঊষার আগমনীর জন্য তাহাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কাজে লিপ্ত হইতে হইবে।

এই যে বিপুল অশেষ বহুল কর্ম্ম, তাতে নারীর অংশ কোথায়? সত্য বটে, যখনই বড় বড় ঘটনা বৃহৎ কর্ম্মের কথা উঠে, তখনই রীতি হইতেছে পিঠ চাপড়াইয়া একটু খানি হাঁসিয়া নারীকে এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখা; অর্থ, এ তোমাদের কাজ নয়, ওগো অবলা বেচারা নিরর্থক জীব সব। আর

নারীও অন্ততঃ অনেক দেশে অবনতমস্তকে, শিশুর সরল প্রাণে, বোধ হয় বা আলস্যেরই বশে এই দুরবস্থাকে মানিয়া লইয়াছে। আমি জোর করিয়া বলিব এ তাদের ভুল। ভবিষ্যতের জীবনযাত্রায় পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে এ রকম ভেদ, এ রকম অসঙ্গতি আর স্থান পাইবে না। স্ত্রী পুরুষের প্রকৃত সম্বন্ধ হইতেছে সমান স্তরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের সাহায্য করা, ঘনিষ্ঠভাবে আদান প্রদান করা। এখন হইতেই আমাদের প্রকৃত স্থান জুড়িয়া আমাদিগকে আবার দাঁড়াইতে হইবে, আমাদের অধিকারকে আমাদের প্রকৃত প্রাধান্যকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—তাহা হইতেছে অন্তরাত্মাকে গঠন করা; আমরা আধ্যাত্মিক শিক্ষয়িত্রী। পুরুষের কেহ তাহাদের তথাকথিত সুবিধার দরুণ বৃথা গর্ব্ব করিতে পারে, নারীর বাহ্যিক দুর্ব্বলতাকে হেয় জ্ঞান করিতে পারে (এই বাহ্যিক দুর্ব্বলতাও সত্য কি না তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না) কিন্তু কে এক জন যে একটা বড় খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন, আমরাও তাহাই বলি, "পুরুষ যাহাই করুক না কেন, মহা-পুরুষ—অতিমানুষকেও জন্ম লইতে হইবে নারীরই গর্ভে।"

পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধরিবে নারী, এ মহা সত্য অকাট্য। কিন্তু এই সত্য লইয়া গর্ব্ব করিলেই চলিবে না; আমাদের বুঝিতে হইবে, ইহার অর্থ কি, জানিতে হইবে ইহার দরুণ কোন্ দায়িত্ব আমাদের উপর পড়িতেছে; যে কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে তাহাকে চিনিতে হইবে, অনন্যচিত্তে তাহার সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমানের জগৎজোড়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঠিক এই দিকটার কাজই আমাদের উপর পড়িয়াছে।

সেই জন্য, এই বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলতা ও তমিস্রার মধ্যে কি করিয়া শৃঙ্খলা ও আলোকের প্রতিষ্ঠা হইবে তার উপায় গুলি অন্ততঃ সেই উপায়ের মোটা মোটা ধারা সব—সকলের আগে বুঝিতে হইবে।

উপায় অনেক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—রাজনীতি, সমাজ-নীতি, চরিত্র-নীতি ধর্ম্মনীতি পর্য্যন্ত; কিন্তু কাজটি যে রকম বিপুল, তাহাতে মনে হয় না ইহার কোনটিতে পূর্ণ সফলতা পাইব। এক মাত্র যদি নূতন একটা আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত নামিয়া আসে, মানুষের মধ্যে তাহা নূতন একটা চেতনাকে গড়িয়া তোলে, তবেই কর্ম্মীদের পথ রুধিয়া রহিয়াছে যে সব প্রভূত বাধা বিপত্তি তাহা দূরীভূত হইবে। একটা নূতন আধ্যাত্মিক জ্যোতি, পৃথিবীর উপর একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব, ভগবানের একটা অভিনব

ভাব যদি এই জগতে প্রকট হয়, নূতন একটা রূপ বা বিগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে—তবেই অসম্ভব সম্ভব হইবে।

গোড়ায় যে কথা দিয়া আরম্ভ করিয়াছি, এখন সেই কথাতেই আসিয়া পড়িলাম—প্রকৃত মাতৃত্বের কি কর্তব্য, তার কথা। কারণ এই যে রূপটি আধ্যাত্মিক শক্তিকে ফুটাইয়া জগতের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিবে, এই যে নূতন আধার, নারী ছাড়া তাকে আর কে গড়িবে?

জগতের এই যুগসন্ধিকালে, আমাদের নিজের নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ যাহার মধ্যে চরম অভিব্যক্তি পাইয়াছে, শুধু এমন সত্তাকে জন্ম দিলে আর চলিবে না; প্রকৃতি দেবী গোপনে যাহার আগমনের সূচনা করিয়া দিয়াছেন, সেই ভবিষ্যৎ মানবের ছাঁচটি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যে সব মহাপুরুষের কথা আমরা শুনিয়াছি বা যাঁহাদিগকে জানিয়াছি, এমন কি তাঁহাদের অপেক্ষাও যাঁহারা মহত্তর, অধিকতর গুণী, অধিকতর প্রতিভান্বিত তাঁহাদের অনুরূপ করিয়া মানুষ গড়াও যথেষ্ট নয়, আমাদিগকে প্রয়াস করিতে হইবে মনে মনে ধারণা করিতে, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তিকে ক্রমাগত চালাইয়া লইতে, কি রকম কোথায় সেই চরম পরিণাম, সেই অতিমানুষ আকারে প্রকারে সকল সাজ সকল ছাঁচ অতিক্রম করিয়া যাইবে।

প্রকৃতির অন্তরে আবার একটা মহা-প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছে, সম্পূর্ণ নূতন একটা কিছু, অপ্রত্যাশিত একটা কিছু সৃষ্টি করিতে। এই প্রেরণাকে আমাদের চিনিতে হইবে, ইহার অনুসারে চলিতে হইতে।

প্রথমে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব এই প্রেরণা কোথায় আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে চায়। সে জন্য অতীতকাল কি শিক্ষা দিতেছে সেই দিকে তাকাইলেই সব বুঝিব।

আমরা দেখি প্রকৃতির প্রত্যেক পদচারণের ধাপে ধাপে, পৃথিবীতে প্রত্যেক নূতন শক্তি নূতন তত্ত্বের আবির্ভাবের সাথে সাথে এক একটা নূতন ধরণের জীবাধারের জন্ম হয়। সেই রকম মানুষেরও মধ্যে জাতি, জনমণ্ডল ও ব্যক্তি যুগ হইতে যুগান্তরে নূতন নূতন রূপ ধরিয়া উন্নতির দিকে চলিয়াছে, মানব জাতির গুরু যাঁহারা তাঁহাদের প্রয়াসে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত হইতেছে, নূতন জীবনে নূতন আধারে পুনর্গঠিত হইতেছে। এই সব রূপও প্রকৃতির একই নিগূঢ় বিরাট আদর্শকে লাভ করিয়া চলিয়াছে।

প্রকৃতিদেবীর এই আহ্বানেই আজ আমাদিগকে সাড়া দিতে হইবে। এই

সুমহান, এই সুবিপুল ব্রতে আমাদিগকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সুতরাং এই দুর্গম অচেনা পথে অগ্রসর হইবার ধাপগুলি যত স্পষ্ট করিয়া আগে হইতেই দেখিতে পারি তাহার চেষ্টা করা দরকার। .

সর্ব্ব প্রথম, আমাদের সাবধান হইতে হইবে যেন ভবিষ্যৎ-মানব, বা অতি-মানুষের কল্পনা করিতে গিয়া বর্ত্তমানেরই কোন ছাঁচ মাজিয়া ঘষিয়া, নির্দোষ করিয়া বা বড় করিয়া না লই। এই ভুল যাতে না হয় সে জন্য আলোচনা করিতে হইবে জীবনের ক্রমোন্নতির ইতিহাস কি শিক্ষা দিতেছে।

আমরা আগেই বলিয়াছি পৃথিবীতে একটা নূতন ধরণের জীবের জন্ম বার্থ হইতেছে একটা নূতন তত্ত্ব, চেতনার একটা নূতন স্তর, একটা নূতন শক্তি বা সামর্থ্যের আবির্ভাব। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে। নূতন জীব নূতন শক্তি ও চেতনাকে ব্যক্ত করিয়া লইয়া আসে বটে, কিন্তু সে তার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের অনেকগুলি গুণ বা বৃত্তি সেই সঙ্গে আবার হারাইতেও পারে। এই যেমন, প্রকৃতি শেষবার যে ধাপ অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, সেই সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নর আর তার অব্যবহিত পূর্ব্বগামী বানরে পার্থক্য কোথায়? বানরে দেখি প্রাণশক্তি (কর্ম্ম করিবার, ভোগ করিবার শক্তি) আর শারীরিক যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু এই ধরণের পূর্ণতা নূতন জীবটিকে পরিহার করিতে হইয়াছে। মানুষ আর সে রকম অত্যদ্ভুত কৌশলে গাছে চড়িয়া বেড়ায় না, গহন গহ্বরের উপরে ডিগ্‌বাজী খেলিয়া যায় না, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিয়া পার হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে সে পাইয়াছে বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, গাঁথিবার গড়িবার সামর্থ্য। ফলতঃ মানুষ পৃথিবীতে আনিয়াছে মনের, বুদ্ধির জীবন। মানুষ মূলতঃ হইতেছে মানসিক সত্তা—যে জীবটী মন-বস্তু দিয়াই গড়া। কিন্তু মানুষের সত্তার ঐখানেই শেষ সীমা নয়। আর সে যদি নিজের ভিতরে অনুভব করে যে তার মানস-জীবনের বাহিরে আরও জগৎ আছে, আরও সব বৃত্তি আছে, চেতনার আরও স্তর আছে,—তার অর্থ এই যে সে সব ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস, বানরে যেমন নরের মানসিক বৃত্তির সুপ্তাবস্থা।

এ কথা সত্য, সংখ্যায় খুব অল্প হইলেও এমন মানুষও আছেন যাঁহারা এই আর এক জগতে আমরা যাহাকে আধ্যাত্মিক জগৎ নাম দিতে পারি—তাহাতে উঠিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ আবার নিজের মধ্যে সেই জগৎকে মূর্ত্তিমান করিয়া লইয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই অসাধারণ,

ইঁহারা অগ্রগামী, মানুষকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সার্থকতা কোথায় সেই দিকে তাহাকে চালাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানুষ তাঁহারা কেহই নহেন। কিন্তু এদেশে ওদেশে, এযুগে ওযুগে, অল্প কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে যে জিনিষটি আবদ্ধ ছিল, ভবিষ্যৎ মানব-জাতির তাহাই হইবে সাধারণ স্বভাব।

বর্ত্তমানে মানুষ বিচারবুদ্ধি দিয়া তাহার জীবন পরিচালিত করে। মনের সব রকম ক্রিয়া তাহার সাধারণ কাজে লাগে। জ্ঞান লাভের জন্য পথ তাহার হইতেছে পর্য্যবেক্ষণ করা আর সিদ্ধান্তে পৌছা। তর্ক বৃত্তির সহায়েই সে জীবনে লক্ষ্য ও পথ নির্দ্দেশ করে—অন্ততঃ তার ধারণা এই রকম।

নূতন জাতিটি চালিত হইবে দিব্য দৃষ্টি দিয়া, অর্থাৎ অন্তরে আছে যে ভাগবত-বিধান তাহার সাক্ষাৎ অনুভূতির সহায়ে; এমন মানুষ আছে যাহারা বাস্তবিকই দিব্যদৃষ্টিকে জানে ও উপলব্ধি করে, অরণ্যের বড় বড় দুই একটা গরিলার মধ্যে যে বিচার বুদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এ কথাও আমরা নিঃসন্দেহেই জানি।

মানুষের মধ্যে, যে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি অন্তরাত্মার চর্চা করিয়াছে, আপন জীবন সত্তার সত্যধর্ম্ম বাহির করিবার জন্য সমস্ত তপঃশক্তি একমুখী করিয়াছে তাহাদের ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে এই দিব্যদৃষ্টি।

মন যখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, মার্জ্জিত মুকুরের মত নির্ম্মল বাতবিহীন দিনে জলাশয়ের মত নিষ্পন্দ—তখন উপর হইতে তারার আলো নিথর জলের উপর যেমন আসিয়া পড়ে, তেমনি সেই শান্ত মনের মধ্যে তুরীয়ের অন্তরস্থ সত্যেবশ্মের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে ও দিব্য দৃষ্টির সৃষ্টি হয়। নিস্তব্ধতার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিতেছে এই যে বাণী তাহাকে শুনিতে যিনি শিখিয়াছেন তিনি উহাকেই তাঁহার কর্ম্মের নিয়ন্তা করিয়া তুলিতেছেন আর সকলে, সাধারণ মানুষে যখন বিচার বুদ্ধির তর্কবৃত্তির জটিল গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া মরে, তিনি তখন সোজা তাঁহার পথে চলিয়া যান, দিব্য দৃষ্টি, উচ্চতর একটা সহজ সংস্কার জীবনের কুটিল আঁকে বাঁকে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া অব্যর্থভাবে চালাইয়া লয়।

এই যে বৃত্তিটি এখন অসাধারণ, এক রকম অস্বাভাবিক, নূতন জাতির কল্যা-কার মানুষের কাছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে সাধারণ ও স্বাভাবিক। কিন্তু এই বৃত্তির নিত্য-প্রয়োগে তর্কবুদ্ধির বোধ হয়ত কিছু খর্ব্ব হইবে। মানুষের যেমন আর নাই বানরের অপরিসীম দৈহিক ক্ষমতা, সেই রকম অতিমানুষও হারাইবে মানুষের অপরিসীম মানসিক ক্ষমতা—এই যে ক্ষমতার বলে সে পরকে ও নিজেকে প্রতারিত করে মাত্র।

মানুষের অতি-মানুষত্বের পথ তখনই উন্মুক্ত হইবে যখন উচ্চকণ্ঠে সে ঘোষণা করিবে যে যা কিছু এ যাবৎ সে প্রকটিত করিয়াছে, এমন কি তাহার এই গৌরবের ও গর্ব্বের বিচার-বুদ্ধি পর্য্যন্ত--আর তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এখন হইতে তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রয়াস হইবে ভিতরের ঐ মহাশক্তিকে উন্মুক্ত করা, বাহিরে আনা, বহাইয়া দেওয়া। তাহা হইলেই তাহার দর্শন-বিজ্ঞানশিল্পনীতি তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তাহার ভোগ ও কর্ম্মজীবন শুধু মনের প্রাণের লীলাখেলা-রূপে মনের প্রাণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না, কিন্তু সে সব হইয়া উঠিবে মনকে প্রাণকে ছাড়াইয়া আছে যে একটা বৃহত্তর সত্য তাহাকে আবিষ্কার করিবার, তাহারই শক্তিকে আমাদের মানবজীবনের মধ্যে খেলাইয়া তুলিবার উপায় বা যন্ত্র মাত্র। আর এই যে বৃহত্তর সত্যের আবিষ্কার, ইহা ত আমাদের প্রকৃত সত্তা ও স্বভাবের আবিষ্কার, কারণ ঐখানেই যে আমাদের সত্তা ও স্বভাবের পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।

আপনার এই অন্তরাত্মা আমরা এখনও পাই নাই, ইহাকে আমাদের পাইতে হইবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই অন্তরাত্মা নীট্শ যাহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন সেই তীব্র প্রাণশক্তি দৃঢ় কামনার বল নহে, ইহা হইতেছে একটা আধ্যাত্মিক সত্তা ও আধ্যাত্মিক স্বভাব। নীট্শের অতিমানুষের পরিকল্পনা জোরালো হইলেও বড় অসম্পূর্ণ ও ভাসা ভাসা, আমাদের অতিমানুষকে সে রকম করিয়া ভাবিলে চলিবে না।

ফলতঃ, যে দিন নীট্শ অতি-মানুষ কথাটি গড়িলেন, সে দিন হইতে যখনই এই কথাটি ভবিষ্যৎ-জাতির বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, তখনই ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক মনে নীট্শেরই দেওয়া চেহারাটি জাগিয়া উঠিয়াছে। সত্য বটে, তিনি যে বলিয়াছেন এই আধুনিক যুগের অসম্পূর্ণ মানুষের ভিতর হইতে অতি মানুষকে গড়িয়া তোলাই আমাদের প্রকৃত কাজ তাঁহার একথায় বিন্দুমাত্র ভুল নাই। "নিজের নিজত্বটি পাইতে হইবে"—এই যে সূত্রে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেটিকেও আর ভাল করিয়া বলা যায় না; কারণ এ কথার অর্থ, মানুষ নিজের সবখানি সত্য-সত্তা সত্য-স্বভাব এখনও পায় নাই, আর এই সত্তা এই স্বভাব পাইলেই তাহার জীবন চলিবে ভিতরের সহজ স্বতঃ প্রণোদিত ধারায়, অব্যর্থ সফলতার দিকে। কিন্তু তবুও নীট্শ একটা ভুল করিয়াছিলেন, আমরা যেন তাহা না করি। নীট্শের অতি-মানুষ হইতেছে বর্দ্ধিত মানুষেরই বিপুলীকৃত সংস্করণ, সেখানে বলই অতি-প্রাধান্য পাইয়াছে, আপন গুরু-

ভাবে মানুষের আর সকল গুণকে পিষিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের এ রকম আদর্শ হইতে পারে না। শুধু বলের উপাসনা মানুষকে কোথায় লইয়া চলে তাহা ত আমরা ভাল করিয়াই দেখিয়াছি--ইহার পরিণাম বলীয়ানের অত্যাচার আর সমস্ত ভূভাগের একটা ধ্বংস।

না, তাহা নয়। অতি-মানুষকে পাইবার উপায় পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-সত্তার বিকাশ। মানুষ যদি আত্মার ধর্ম্মে মণ্ডিত হইতে শুধু সম্মতি দেয়, তবে তাহার সব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, সমস্তই সুগম হইয়া আসিবে। মানুষ যখন নিজের নিজত্বকে পাইয়াছে, আপনার প্রকৃত স্বভাবটি অধিকার করিয়াছে তখন সেই অধ্যাত্ম-সত্তার জাগ্রত সত্যকে সহজ প্রেরণাভরে অনুসরণ করিয়াই সে পাইবে তাহার পূর্ণতর আধ্যাত্মিক জীবন। কিন্তু তাহার এই সহজ স্বতঃ প্রণোদিত প্রেরণা পশুর অন্ধ গুপ্ত-চেতন সংস্কারের মত হইবে না, তাহা হইবে দিব্যদৃষ্টি-সমন্বিত সম্পূর্ণ সচেতন।

সুতরাং যাহারা একটা আধ্যাত্মিক ক্রমপরিণামকেই মানুষের চরমগতি বলিয়া স্বীকার করিবে আর এইটিকেই তাহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবে, নবযুগের নূতন মানবজাতির তাহারাই হইবে আদি স্রষ্টা। মানব-পশু যেমন মনের রাজ্যকে মার্জ্জিত সমৃদ্ধ করিয়া আধুনিক মানব-জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সেই রকম আধুনিক মানব-জাতিও আত্মার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক মানব-জাতিতে পরিণত হইবে।

বিশেষ কোন ধর্ম্মমত বা আচার-অনুষ্ঠানের তখন আর সে মূল্য থাকিবে না। যাহার যে রকম রুচি সে সেই রকম মত ও পদ্ধতি অনুসরণ করিবে—কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু আসল জিনিষ হইবে ঐ আধ্যাত্মিক রূপান্তরে শ্রদ্ধা। আর সকলেই জানিবে বুঝিবে যে এই রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন শুধু যন্ত্রতন্ত্র দিয়া কেবল বাহিরের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দিয়া সম্পাদিত হইবে না; এই জিনিষটি প্রত্যেক মানুষ ভিতরে ভিতরে জীবনের মধ্যে গড়িয়া তুলিবে, ইহা না হইলে তাহা বাস্তব-সত্য কখন হইয়া উঠিবে না।

যাহারাই এই প্রয়াস করুক না কেন, কিন্তু নারীকেই সর্ব্বপ্রথমে এই পরিবর্ত্তন রূপান্তর সাধন করিতে হইবে। কারণ, নারীর উপরই এই বিশেষ কর্ম্মের ভার পড়িয়াছে, নূতন জাতির প্রথম নমুনা কয়টিকে জগতে জন্ম দিতে। সুতরাং এই কার্য্যটি করিতে হইলে নারীকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধনের সাক্ষাৎ স্থূল ফল কি। কারণ, শুধু বাহিরের পরিবর্ত্তনের

সহায়ে যেমন উহা হয় না, আবার কিন্তু বাহিরের পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকেও উহা বাস্তব জিনিষ হইয়া উঠে না।

এই সব মহা পরিবর্ত্তন যে শুধু জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য হইবে তাহা নয়, নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও হইবে।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসূত্র যেমন নীচে পড়িয়া থাকিবে, সেই রকম নৈতিক বিধি-নিষেধ, আচার-ব্যবহারের আইন কানুনও তাহাদের প্রাধান্য হারাইবে।

প্রকৃতঃ, মানুষের জীবনে সমস্ত নৈতিক সমস্যাটি উঠে তখনই যখন একদিকে প্রাণশক্তি আর প্রাণশক্তির আবেগ সব, অন্য দিকে মনের শক্তি আর তার যত আজ্ঞাবিধি, এই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। প্রাণের ইচ্ছাকে যখন মনের বল দমনে রাখে তখনই আমরা বলি সমাজের অথবা ব্যক্তির জীবনটা সৎ, নীতিপরায়ণ। কিন্তু প্রাণের ইচ্ছাবেগ আর মনের বল উভয়েই যখন সমান ভাবে আর একটা উচ্চতর কিছু, সেই অতি-মন, সেই তুরীয়ের পদানত হইবে, তখনই মানব জীবন আর একটা স্তরে উঠিয়া যাইবে, তখনই অতি-মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের আরম্ভ। অতি-মানুষের ধর্ম্ম বা বিধান আসিবে তাহার অন্তর হইতে, ইহা সেই দিব্যধর্ম্ম, সেই ভগবত বিধান যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির মণিকোটায় উদ্ভাসিত হইয়া সেই স্থান হইতেই তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করিবে। এই তুরীয় ধর্ম্ম বহুলরূপে প্রকাশিত হইলেও, গোড়ায় থাকিবে এক অদ্বিতীয়; ভিতরের একত্বের জন্যই এই ধর্ম্ম হইবে চরম শৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম।

মানুষ তার অহঙ্কার, কি শাস্ত্র বা রীতি অনুসারে আর চলিবে না, তাই সকল স্বার্থ প্রণোদিত উদ্দেশ্যকে সে বর্জ্জন করিবে। নিঃস্বার্থতাই হইবে তাহার স্বভাব। এ জগতে হউক আর অন্য কোন জগতে হউক কোথাও কোন ব্যক্তিগত লাভের জন্য কর্ম্ম করা তাহার পক্ষে একটা অচিন্তনীয় অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক কর্ম্মটি তাহার প্রণোদিত হইবে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তিতে, ভিতরের ভাগবত ধর্ম্মে, ইহারই হাতে সে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সহজে ছাড়িয়া দিয়া পাইতেছে অতুল আনন্দ। কোন পুরস্কার বা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই। তাহার চরম পুরস্কার ত সেই অন্তঃপ্রেরণার বশে কর্ম্ম করিবার জ্ঞানে শক্তিতে ভিতরের ভাগবত সত্তার সহিত এক হইয়া যাইবার যে আনন্দ তাহারই মধ্যে।

এই একত্বেই তাহার সামাজিক-জীবনও গড়িয়া উঠিবে। কারণ, নিজের মধ্যে ভাগবত সত্তার সন্ধান পাইলে, সে অপরের প্রত্যেকের মধ্যেও সেই একই

ভাগবতসত্তাকে স্বীকার করিবে; নিজের মধ্যে ইহার সহিত একীভূত হইলে, পরের মধ্যেও ইহার সহিত সে একীভূত হইবে; তখন সকলের সহিত সে শুধু অন্তরাত্মায়, মূল সত্তায় নয়, কিন্তু আবার জীবনের-রূপের বহিঃস্তর সমুদয়েও সেই একত্ব অনুভব করিবে। সে আপনাকে শুধু একটা মন, একটা প্রাণ অথবা একটা দেহ বলিয়া জানিবে না, সে জানিবে এই সকলকে ঘিরিয়া ধরিয়া আছে যে কর্ত্তা ও ভর্ত্তা সেই স্থির শান্ত অনন্ত আত্মাই সে নিজে; আর সে দেখিবে বাহিরে যত পরেরও জীবন মন ও দেহ তৎসমুদয়কে এই আত্মাই ধরিয়া রহিয়াছে, অনুপ্রাণিত করিতেছে। সে উপলব্ধি করিবে এই আত্মাই সকল সত্তার মধ্যে এক থাকিয়া স্রষ্টারূপে সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশের মধ্যে জীবাত্মার যে বহুলত্ব নানাত্ব দেখা দিয়াছে তাহা সেই ভাগবতসত্তা—ঈশ্বরেরই নানামুখ। প্রত্যেক জীবের মধ্যে সে দেখিবে ভগবানেরই মুখ এক এক রূপ লইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সেই ভাগবত তুরীয়-সত্তার মধ্যে সে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে, নিজের দেহ মনপ্রাণকে সেই সত্তার শুধু একদিককার চেহারা বলিয়া জানিবে; আর এখন যাহাদিগকে আমরা ভাবি পর, তাহাদিগকে সে শুধু ভিন্ন দেহে মনে প্রাণে নিজেরই সত্তা বলিয়া বোধ করিবে। সকলের শরীরের সহিত নিজের শরীরের একত্ব সে অনুভব করিবে, কারণ সে সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেছে যে সকল জড় সত্তা একটানা ঐক্যে বিধৃত। হৃদয়ে ও মনেও সে সকল জীবের সহিত সম্মিলিত হইবে। এক কথায়, সকলের মধ্যে সে নিজেকে দেখিবে ও অনুভব করিবে, নিজের মধ্যেও সকলকে দেখিবে অনুভব করিবে, এইভাবে একাত্ম হইয়া গিয়াই সে মানবসঙ্ঘে সত্যকার একতা সৃষ্টি করিবে।

অতি মানুষের বর্ণনা এই যতটুকু প্রয়োজন তাহা আমরা দিলাম, ইহার বেশী আর দিব না। আরও বিশদ ও বিশেষ ভাবে তাঁহার ছবিটি ফলাইয়া ধরিতে কিছু চেষ্টা করিব না। সে চেষ্টা যে শুধু বিফল হইবে তাহা নয়, কোন কাজেও তাহা আসিবে না। কারণ, সত্যের সাথে যতই মিল থাকুক না কেন, কতকগুলি কল্পনার মানস রচনার সহায়ে ভবিষ্যৎ মানব জাতিকে আমরা গড়িয়া তুলিতে পারিব না। সে জন্য, হৃদয়ে ও মনে আমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে অনন্য একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষার দেওয়া যে তপঃশক্তি ও অদম্য প্রেরণা, সেই সাথে ভিতরে রাখিতে হইবে একটা প্রশান্ত উন্মুখী অবস্থা— এক নূতন জাতি যে পৃথিবীতে আসিবার জন্য সচেষ্ট তাহারই ভাবে ভরপুর

হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে স্থিরচিত্তে অপেক্ষা হইতে হইবে। এই টুকু যদি করিতে পারি, তবেই ভবিষ্য সন্তানদের আবির্ভাবের সূচনা আমরা নিঃসন্দেহে করিয়া দিলাম, মানব জাতিকে ত্রাণ করিবে যাহারা তাহাদের সৃষ্টির অবলম্বন আমরা হইয়া উঠিলাম।

সুখের ঘর গড়া।

১

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

লোকনাথ মুখুয্যের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী যজ্ঞেশ্বরী বিধবা বড় মেয়ে কিরণশশী আর অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে তরুকে লইয়া বেতগ্রাম বা বেতগাঁর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। স্বামীর জীবিতকালে কলিকাতায় তাঁর কর্ম্মস্থলে এতদিন স্বামীর সঙ্গেই বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। একমাত্র ছেলে বিজয়কুমার কলিকাতায় চাকরী করিতে থাকিয়া গেলে তিনি অগত্যা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এতদিন গ্রামের বাড়ীতে তাঁর দেবর ভোলানাথ, পত্নী সৌদামিনী, ছয় বছরের ছেলে গোবর্দ্ধন ও অবিবাহিতা একটী মেয়ে নবনলিনীকে লইয়া বাস করিতেছিল। দেশের গ্রাম্য স্কুলে কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে আয় ব্যয়ের মাত্রা ঠিক রাখিয়া কোনো মতে সংসারটী চালাইতেছিল। জমি জমা যা' সামান্য ছিল তাহাতেই বছরের ভাতটার যোগাড় হইত। পুকুরের মাছ ও বাগানের ফল ফুলুরী আপনা হইতে যাহা জন্মাইত তাহাতেই দিনের তরীতর-কারীটা সংগ্রহ হইত।

ভোলানাথের ভয় হইয়াছিল ভ্রাতৃজায়া পৃথকান্নেই বাস করিবেন, উপরন্তু জমিজমার উৎপন্ন আয় হইতে অর্দ্ধেক ভাগ বসাইয়া তাহার মনো-পলিতে বাধা ঘটাইবেন। এমন যে ঘটিবে তাহা সে কালধর্ম্ম দেখিয়াই সিদ্ধান্ত-

করিয়াছিল। এটা যে আজকাল স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভোলানাথ ও তাহার পত্নী সৌদামিনী ইহার অন্তরূপ দেখিল। যজ্ঞেশ্বরী গ্রামে আসিয়া অস্বাভাবিক ঘটাইয়া বসিলেন। তিনি ছোট জা'কে ডাকিয়া বলিলেন—"সদু ঐ রোগা শরীর নিয়ে তোকে আলাদা রেঁধে খেতে হবে না—আমার কি গতর নেই? বসে খেতে এসেছি? আবার আলাদা হেঁসেলের কথা ঠাকুর পোর কাছে তুললি কি বলে?"

সৌদামিনী তো ভারি অপ্রস্তুত হইল। সে দাঁতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"না দিদি। তবে কিনা, দু'টো সংসার একত্র হলে তার ধাক্কা সামলাতে পারবে কি? বড় ঠাকুর থাকলে না হয়—।"

যজ্ঞে। বড় ঠাকুর নাই, বড় ঠাকরুণ তো মরে নি? তাঁর ছেলেও তো চাকরী করছে? খুড়ো ভাইপো এক সঙ্গে পয়সা এনে দিলে আর আমরা দু'বোনে গুছিয়ে চল্লে দু'জনেরই সুবিধা—নয় কি?

সৌ। তা' আর নয়।

যজ্ঞে। তবে আব কি? তুই ক'দিন জিরো—আর হাড় বার করতে হবে না; পেটের ছেলেটী মাই দুধ খাবে তার যোগাড় কর্—একটু খা দা ভাল করে—(গায়ে স্নেহের হাত বুলাইয়া) সদু কি হয়ে গেছিস্? এসেছিলি বের কনে যখন তখন যেন পদ্মফুলটী আর হয়ে গিছিস্ যেন হেঁসেলের নেতাটা। সদু' দিদিকে মনে করিছিলি না জানি—

সৌ। (বাধা দিয়া) না দিদি—বলু নি কিছু (সদুর চোখ ভিজিল।)

এই বলিয়া সৌদামিনী ভক্তিতে গদগদ হইয়া দিদির পায়ের ধুলো লইয়া কাজে গেল। সত্যই সে ভাবিয়াছিল অনেক। বড় জা' বড় লোক; দাস দাসী খাটাইয়া স্বামীর সংসারে এত দিন সে একাধিপত্য করিয়াছিল, ছোট জা' এই জন্য তাকে অন্য ভাবে বুঝিয়াছিল। সে এখন তার পরিচয় পাইয়া প্রথমে আশ্চর্য্য হইল, পরে বড় শান্তি বোধ করিল।

যজ্ঞেশ্বরী বিধবা মেয়ে ও কুমারী মেয়ে দু'টীকে সংসারের কর্ত্তব্য ভাগ করিয়া রুটীন্ করিয়া দিলেন। রুগ্না ছোট জা'কে তার শক্তি মত কাজ দিলেন। বাড়ীতে গৃহবিগ্রহ শ্রীধর ছিলেন; কিরণের উপর ভার পড়িল দেব সেবার। তরু মাকে রান্নার সাহায্য করিতে লাগিল। নলিনীর উপর কাজ দেওয়া হইল, বিছানা করা, ঘর দোর ঝাঁট পরিষ্কার করা, পান সাজা। সৌদামিনী ভাঁড়ারের ভার লইল; সকলের খাওয়া দাওয়া দেখা—অতিথ অভ্যাগতের খোঁজ খবর করা

এও তার ঘাড়ে পড়িল ; এঁ ছাড়া ইত্যাদি যা কিছু অবসর মত যে যেমন পারিবে এই ব্যবস্থা করা হইল।

ভোলানাথ চাকরীর উপর জমাজমি সম্পত্তির দেখা শুনার ভার লইল। সংসারের মস্তিষ্ক হইল যজ্ঞেশ্বরী ; মেয়েরা ও ছোট জা' এরা হইল ইহার হাত পা। বেশ সুখেই সংসার চলিতে লাগিল। বন্ধ ঘরের দ্বার জানালা খুলিয়া দিলে যেমন আলো বাতাসে ঘরটা উজ্জল হয়, যজ্ঞেশ্বরীর গৃহিণীপনায় এই ছোট্ট সংসারটী তেমনি স্বচ্ছন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ভোলানাথও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। তার যে ভয় হইয়াছিল তেলে জলে মিশ খাইবে না, সে ভয় একেবারে না গেলেও অনেকটা কমিল। তবু মানুষের মন! অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে সন্দেহটা মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল, সে মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া উঁকি মারিত। তার মনে খট্‌কা লাগিত ভ্রাতৃবধুর হঠাৎ আবার এ কি ভাব ? "যখন বৌদির সময় ভাল ছিল, তখন তো দেবরকে, বা জা'কে বড় খোঁজ খবর করতেন না। আজ বুঝি দায়ে পড়ে এত দরদ সোহাগ ?" যজ্ঞেশ্বরী বড় বুদ্ধিমতী, মধ্যে মধ্যে ভোলানাথের মনের ডুবন জল হইতে কথাটা উপরে ঘাই দিয়া উঠিত, তিনি তা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিতেন। কথায় তিনি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া কাজে প্রতিবাদ করিতেন। ভোলানাথের দুষ্ট সন্দেহটা অমনি তলাইয়া গিয়া ডুবন জলে মাথা লুকাইত।

ভোলানাথের মনে এই সন্দেহ জন্মাইবার মূলে একটা ছোটখাটো ইতিহাস আছে। সেটী হইতেছে এই। লোকনাথ যৌবনে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া চাকরী করিতে বিদেশবাসী হন। কলিকাতায় এক সওদাগরি আপিসে অল্প বেতনের চাকরীতে ঢুকিয়া, বুদ্ধি বলে ও সততা গুণে ও দক্ষতাফলে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আফিসের বড়বাবু হন। পত্নীর গৃহিণীপনায় ও নিজের মিতব্যয়িতা গুণে মাঝবয়সে কিছু অর্থের অধিকারী হন। চিরকাল তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক ছিল। সঞ্চিত অর্থকে মূলধনরূপে ফেলিয়া কারবার ফাঁদিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই অদৃষ্ট দোষে কারবারে ফেল হইলেন। অকৃতকার্য্যতায় ভগ্নহৃদয় হইয়া স্বাস্থ্য হারাইলেন। আপিসের মালিক কোম্পানী তাঁহাকে দয়া পরবশ হইয়া পুরা পেনশন দেন। বৎসর দুই পেনশন ভোগ করিয়া তিনি মারা যান। কোম্পানী তাহার জীবনব্যাপী সেবার পুরস্কার স্বরূপ তার ছেলে বিজয়কে ত্রিশ টাকা বেতনে এক কাজ দেন।

ভোলানাথ অনেক দিন হইতে দাদার অনুগ্রহে ও সাহায্যে ওই আপিসে ঢুকিতে চেষ্টা করেন। লোকনাথের ইচ্ছা ছিল না ভোলানাথ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে সামান্য বেতনের চাকর হয়। কেন না, ভোলানাথের বিদ্যা বুদ্ধিতে ভাল চাকরীর আশা ছিল না। লোকনাথ বুঝাইলেন—'গ্রামে যা' জমী জমা আছে, তাহারই দেখাশুনা কর, উৎকর্ষ সাধন কর, স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন কর; চাষবাস করিবার জন্য যা' অর্থ দরকার হয় আমি দিব।" ভোলানাথ এ সৎপরামর্শ অন্য ভাবে লইল। ভাবিল, দাদা তার উন্নতির বিরোধী। তিনি নিজে বড় চাকুরে হইয়া থাকিবেন, আর ছোট ভাইকে চাষা করিয়া রাখিবেন। এই ভাবের একটা উত্তর দিয়া অভিমান ভরে সে দেশে চলিয়া আসে। তদবধি সেও সাহায্য চাহিত না; লোকনাথও সাহায্য করিতে চাহিলে, লইত না। সে গ্রামে আসিয়া তত্রত্য স্কুলে ২০ টাকা বেতনে এক মাষ্টারী লইয়া সেক্রেটারী জমিদার পুত্রের মোসাহেবী করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

তার পর লোকনাথ বাবু মারা গেলে যজ্ঞেশ্বরী গ্রামের বাটীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করিলেন। কিরণ একটা মেসে থাকিয়া চাকরী করিতে লাগিল; কলেজে বি, এ পড়া শেষ করিতেও পারিল না। এ অবস্থায় যজ্ঞেশ্বরী দেশে আসিয়া বাস করাতে ভোলানাথের মনে স্বতঃই নানারূপ বিরোধী সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। তার ধারণা হইয়াছিল, দাদার এই প্রতিরোধিতা ও ঔদাসীন্যের মূলে যজ্ঞেশ্বরীর প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধি বিরাজমান ছিল। তাই সে যজ্ঞেশ্বরীর এই সদ্ভাব স্থাপন চেষ্টাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। ভাবিল, 'এটা বুঝি একটা চাল—'। কিন্তু মোটের উপর ভোলানাথ সাদা মনের সোজা লোক ছিল। মনের ভুল-সন্দেহকে খোরাক দিয়া পুষিয়া হিংস্র করিয়া তুলিবার মত তার চরিত্র ছিল না।

ভোলানাথের মেয়ে নবনলিনী তরুর চেয়ে দু'এক বছরের বড়, অর্থাৎ তরু তেরো, নলিনী চৌদ্দ কি পনেরো হইবে। দেখিতেও তরু নলিনীর চেয়ে ভাল।

বর্ষার সন্ধ্যা। সে দিন আবার রথের উৎসব। এক পশলা বৈকালিক বৃষ্টিতে বেয়াল-ভিজে হইয়া তরু ও নলিনী বাড়ী ফিরিয়া সরস চুলকে শুকনা করিতেছিল। দাওয়ায় বসিয়া যজ্ঞেশ্বরী কুটনা কুটিতেছিলেন। সৌদামিনী সেখানেই বসিয়া নবজাত কন্যার জন্যে কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। আর কন্যা তখন কিরণের কোলে আদর সোহাগ খাইতেছিল। কিরণ তাহার বগল

ছুটার ভিতর হাত দিয়া কোলের উপর দাঁড় করাইয়া সেই কচি নাসা-হীন, গালসর্ব্বস্ব লালাসিক্ত মুখখানাতে অজস্র সশব্দ চুম্বন বর্ষণ করিতেছিল; খুকী চুম্বন-বাণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোঁকস্‌কোঁ কোঁক্‌ করিয়া আপত্তি জানাইতেছিল। কিরণ তাহা না শুনিয়া আর একটা প্রবল চুম্বন দিয়া বলিল—"সত্যি কাকীমা তোমার মেয়েটি যেন ডলি পুঁতুল (মায়ের দিকে তাকাইয়া); নয় মা? এর নাম থাক ডলি।" ও বাড়ীর দক্ষবাউনি সিঁড়ির উপর বসিয়া এক খিলি পানের রসের সঙ্গে কতটা দোক্তার গুঁড়া মিস খাইতে পারে, কৌটা খুলিয়া অঙ্গুলীযোগে তাহারই পরীক্ষা মুহুর্মুহু করিতেছিল। গালভরা পানের রস মুখের মধ্যে ওষ্ঠাধরের সাহায্যে আগ্‌লাইয়া বদনবিবর ঈষৎ ফাঁক করিয়া অস্পষ্ট অর্দ্ধজড়িত স্বরে দক্ষঠাক্‌রুন টীপ্পনি করিলেন—"মেয়ে ছ্যালার আবার আদর দেখে বাঁচিনি—ভোলার এই তিন নম্বর হ'ল, তা' জানিস্‌ কিরি?

কির। আচ্ছা ঠান্‌দি, তুমি মেয়ে মানুষ হয়ে মেয়েছেলের নিন্দে করছ কি বলে?

দক্ষ। করবুনি? একশোবার। বাসর ঘর হ'তে পা না বাড়াতে সিঁদুর মুছিছিস্‌, নো খুইয়িছিস্‌—কি সুখে আছিস্‌ বল্‌তো? কি সুখে থাক্‌বি? ওই একটা ধেড়ে মেয়ে নলি ১৪ বছরী হয়ে রয়েছে—বাপ্‌ মিন্‌সের ভাত ওঠেনে মুখে।

বলিতে বলিতে প্রবল উত্তেজনায় সামাল না মানিয়া ঠাকরুণের দুই কস বহিয়া দোক্তাক্ত তাম্বুল-রস উগলাইয়া পড়িল, বিরাট রাজসভায় কঙ্কবেশী রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট কর্ত্তৃক পাশার দ্বারা আহত ঠোঁট হইতে রক্তস্রাব হাত দিয়া ধরিয়াছিলেন,—উদ্দেশ্য রক্ত ভূপতিত হইয়া বিরাটের অমঙ্গল না ঘটায়। দক্ষ ঠাকরুণ হাত দিয়া পানের পিক্‌ ধরিলেন, সেরূপ কোন নিস্বার্থ উদ্দেশে নয়, তাঁহার উদ্দেশ্য শ্বেত বস্ত্র খানিকে তাম্বুলরস-কলঙ্ক হইতে রক্ষা করা। বস্ত্রের সতীত্ব রক্ষা করিয়া ঠাকরুণ আরম্ভ করিলেন—

"মেয়ে ছ্যালার আবার আদর।—বলে সাধ্‌ করে?"

কিরণ দেখিল দক্ষ ঠাকরুণের এই প্রবল যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিবার তো নাই-ই; পরন্তু নিজেরা তার অকাট্য পোষক প্রমাণ রূপে সম্মুখে বর্ত্তমান! কাজেই কিরণ থামিয়া গেল, শুধু থামিয়া নয় আপনাদিগকে অপরাধী বুঝিতে পারিয়া অপ্রস্তুত হইল। ডলি ইত্যবসরে আদরের প্রাচুর্য্যে ও টেপাটিপির বাহুল্যে ভুক্ত দুগ্ধের কতকটা দধিরূপে বাহির করিয়া দিল। কিরণ তাহার প্রতীকারে ব্যস্ত হইল। নিরুত্তর হইবার একটা অছিলা পাইল।

যজ্ঞেশ্বরী মেয়ের মা। বিশেষ আবার দক্ষদেবীর বর্ণিত আদর্শের মেয়ের মা; তিনি কন্যা সন্তানের সম্ভ্রম রক্ষা করা কর্ত্তব্য বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন :—

"পিসিমার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে, আমি ওদের মা বলে না; অনেকেই আমার মত এমনি বিধবা ও কুমারী মেয়ের মা! আমি দেশের সমস্ত মায়ের হয়ে ওকালতি করছি"।

ঝগড়া আছে শুনিয়াই সুশিক্ষিতা যজ্ঞেশ্বরীর ধীর গম্ভীর রহস্যমাখা কথাগুলিকে ঠিক ভাবে ধরিতে না পারিয়া দক্ষ ঠাকুরুণ ভাবিলেন—এটা বুঝি তবে একটা বৈকালিক কুঁদুলের প্রলোগ বা গৌরচন্দ্রিকা। অথবা চ্যালেঞ্জ। দক্ষ পিছপাও ন'ন তাহাতে। কেননা এই নিতান্ত স্বদেশী আর্ট্‌টাতে দক্ষ ঠাকরুণ একটি পয়লা নম্বর ওস্তাদ। প্রারম্ভ, পাঁয়তাড়া, ভণিতা, যুদ্ধ, নিষ্পত্তি, গ্রাম্য কুঁদুল নাট্যের অভিনয়ে এই পাঁচটি অঙ্ক। দক্ষ স্বভাব-প্রতিভাবলে এই বিদ্যায় পারদর্শিনী—আট বৎসর বয়সে কৌমার্য্য শেষ করিয়া, গৌরীদানের পুণ্য-ফল-বলে পিতাকে ধন্যমান্য করিয়া দশম বৎসর বয়সে স্বামীকে হারাইয়া তদবধি ভাইয়ের স্কন্ধে চাপিয়া এই ত ৫০ বৎসর ধরিয়া গোবর ও গঙ্গাজলের সাহায্যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতঃ আর পল্লী-কোন্দল বিদ্যায় রসনার নানাবিধ কূট প্রয়োগবিধি শিক্ষা করতঃ দক্ষ ঠাকুরুণ চেত্‌লা মুলুকের নরনারীবৃন্দের পক্ষে একটা ভয়াবহ জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী—দক্ষদেবীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি কখনো দেখে নাই তেমন; তবে কিছু কিছু লোকমুখে বর্ণনা শুনিয়াছিল। ধাতেরও পরিচয় পাইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরীর কথাগুলির ভাব ও ধারা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমত্যা দক্ষদেবীর মুখ-সরোবর কলহমেঘের কুটীল ছায়ায় ঘোরাল হইয়া উঠিল :—"ঝগড়া করবার মত কি আর এমন বলিছি বাছা। তোমাদের ভাল ভেবেই বলিছি—তা বাছা তোমরা সহবে ঘরের মানুষ কি না, একটা কথার দাগ সয়না—"

সৌদামিনী দেখিল মেঘ উঠিল, সে দিদিকে চোখ টিপিল, যজ্ঞেশ্বরী জায়ের ইষারার গতিক বুঝিয়া কথাটার মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। বলিতে লাগিলেন,—"মেয়েছেলের তুল্য কি সন্তান আছে, পিসি। অথচ ওদেরই কপাল একবার ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না, আর এমন ঠুন্‌কো কপালও মা ওদের! সমস্ত জীবনটা ওদের আলো হয় স্বামীর একটি হাসিতে, একটু আদরে; আঁধার হয়ে যায় তার অভাবে—অনাদরে, বা রাগে; সেবা করে মরতে এরা; পুরুষের

জীবনকে সুবহ করতে এরা ; অথচ এরাই যেন বাড়ীর আপদ, বালাই। তুমিই বলনা পিসিমা ? তুমি, আমি, আমরা সব মেয়ে ছেলে ; আমাদের ভাগ্য আমরা কেন নিন্দে করবো ? সত্যি সত্ত্ব ! এমনো দেখেছি যে মায়ের ছেলে সব রকম বদমাইসি অত্যাচার উৎপাত করে বেড়াচ্ছে, কলঙ্কে বংশের বা বাড়ীর মুখ কালী করে দিচ্ছে, তবু ছেলে মায়ের কত আদরের। আর মেয়েটা যদি কপালদোষে তেরো ছেড়ে চোদ্দয় পা দিয়েছে, বা কুচ্ছিত হয়ে জন্মেছে, অমনি আর যাবে কোথা ?—”

যজ্ঞেশ্বরী খুবই সাবধানে সতর্ক হইয়া আলাপ সম্ভাষণ করিতে ছিলেন ; যে দিক দিয়া ব্যাধ আসিবে না ভাবিয়াছিলেন, ব্যাধ দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিক দিয়াই আসিল। ব্যাপার এই,—দক্ষদেবীর এক ভাইপো ছিল, পুত্রভাগ্য-বঞ্চিতা দক্ষের সমস্ত মাতৃস্নেহ তাহার উপরে পড়ে। কিন্তু দক্ষের এবং ভাইভাজের কপালগুণে ছেলে দশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ষোলো বছরের মধ্যে সমস্ত নেশায় এবং রসের চৌষট্টী কলায় কলাবিৎ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের সে এক ধুরন্ধর। গৃহস্থ মাত্রেই তার গৃহপ্রবেশকে শঙ্কার চোখে দেখিত। দক্ষ ভাবিল, যজ্ঞেশ্বরী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ইঙ্গিত করিয়া কথা বলিতেছে—আর যায় কোথা। তিনি স্বমূর্ত্তি ধরিয়া কোন্দলের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা তুলিলেন অর্থাৎ পাঁয়তাড়া ভাঁজিবার উপক্রম করিলেন। বলিলেন,—“সবার ছেলে যদি কলকেতায় চাকরী করতে না পারে বাছা, তা ব’লে পরের ছেলের কুচ্ছো করতে হবে তার কি কথা ?”

সত্ত্ব সন্ত্রস্তা হইল, আবার চোখ টিপিল। যজ্ঞেশ্বরীর সে ইঙ্গিতে চোখ ফুটিল। তিনি নিজের অসাবধানতা বুঝিলেন। বুঝিয়া দেখিলেন এই কোন্দল-অঙ্কুরটীকে সমূলে উৎপাটন না করিলে শান্ত-রসাস্পদ সেই গৃহস্থ প্রাঙ্গণটী অচিরে কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইবে। অপরাধীর মত বলিলেন—“না পিসিমা, আমি কারুর কোনো ছেলেকে নিন্দে করতে চাইনি—কাকেও ঠেস্ দিয়েও কথা বলতে যাইনি—আমায় ক্ষমা কর, মা—দেশের হালচাল দেখেই বলছি। আমার ছেলে ভালো, তাই কি বলতে পারি মা ? আর বলবই বা কোন্ মুখে ? সে দিন তো চোখে দেখলুম—নবীন মুখুজ্যের মা ওলাউঠা রোগে মলো, ব্যাচারী মড়া বার করতে পারে না—লোকের অভাবে ; তোমাদের মুটবেহারী ছিল বলেই তো তার গতি হলো। আহা বাছার কি উঁচু মন। আমার বিজয় হলে ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতো, ওজর আপত্তি করতো কতো ! চাকরী করে ; তার আর গুণ কি মা ? পেটের

তাদের জন্যে দাসত্ব করা সে আর ভাল কি ? তোমার হুটু কি দুঃখে গোলামী করতে যাবে—বল্ সদু ?—

সদু। তা আর বলতে !—আমি তো আছি আজ দশ বছর, দিদি ! তুমিই না হয় ছ মাস হল এসেছ ! মানুষের দায় দৈবিতে হুটু ঠাকুরপো একা এক শো ! সে বছর হারু কাকার রাখাল ছেলেটাকে সাপে কাটলো, কী সে বৃষ্টি ! এই এমনি রথের দিন, নয় না বলি ? কেউ রোঝা আন্‌তে গেল না, হুটু ঠাকুরপো ডোঙা বেয়ে দাঁইপুর থেকে রোঝা নিয়ে আসে। ব্যাটা ছেলের একটু আধটু খেয়াল থাকে—

দক্ষদেবীর দীপ্যমান ক্রোধবহ্নিতে এ রকম ভাবে বারিবর্ষণ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। আগুন আগুন ; জল, জল। দক্ষদেবীর নেত্রবহ্নি অচিরে নিভিল। নিভিবার আগে অগ্নি স্বধর্ম্মানুসারে দু'চারটে 'ভোঁস', 'ভোঁস' শব্দ যে না করিল তা, নয়। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হইল সদু। আজ দশ বৎসর যাবৎ সে এই রণরঙ্গিণী পল্লীচামুণ্ডার কোন্দলাভিনয় দেখিয়া আসিয়াছে ; বড় বড় দুর্দ্ধর্ষ পল্লী-দলপতিও দক্ষ ঠাকরুণকে দূরে দেখিলে সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যাইত। সে হেন দক্ষদেবীর ক্রোধবহ্নিতে পড়িয়া যজ্ঞেশ্বরী পতঙ্গ যে কি কৌশলে আত্মরক্ষা করিল, তাহা দেখিয়া সদু বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইল।

যজ্ঞেশ্বরী দেখিলেন—ভস্মের মধ্যেও সুপ্ত বহ্নি থাকে। সেটুকুও ঠাণ্ডা করিতে হইবে, আর শুধু তাই নয়, এই ধূমাবতীকে চিরপ্রসন্ন করিয়া রাখিতে পারিলে গ্রামে ও পাড়ায় বিনা ব্যয়ে একটা শান্তিরক্ষার কাজ হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পাশ্চাত্য রাজনীতির অভেদ্য উপায়—"ঘুষ দান" ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তরুকে বলিলেন—"তরু, আমার বাক্‌সে একটা সুর্ত্তির শিশি আছে, নিয়ে আয়।"

দ। ওমা ! তুইও এ সব খাস্ নাকি গো ?

য। না মা, খেতুম এক সময়, ছেড়ে দিয়েছি ; বড় গরম, খাতে সয় না, পেটের ব্যামো হয়—

দ। আমি পারলুম না বাপু ছাড়্তে। নইলে চলে না জানিস, বৌ। দু'দিন বাছা ভাত না খেয়ে থাক্‌তে পারি ; তবু এই ছাই নইলে এক দণ্ড চলে না—

য। জানিনে আবার ! ভুক্তভোগী যে। তুমি কেন ছাড়বে, মা ? খাতে সয় যখন। আমার রুক্ষু ধাত, সয়না।

তরু সুর্ত্তির শিশি আনিল। মা'কে দিতে গেল। মা বলিল—"দে তোর

ঠানদিকে—নিয়ে যাও পিসি, খেও; কাশীর মূর্ত্তি. কর্ত্তা দিয়েছিলেন এনে; খাইনি, পড়ে আছে। ভাবলুম, কেন বা নষ্ট হয়, মানুষকে দিলে কাজে আসবে।

সুপ্রসন্না দক্ষদেবী প্রচুর পরিতৃপ্তির সঙ্গে দান গ্রহণ করিলেন। পরে তরুকে দেখিয়া মন্তব্য করিলেন—"এ মেয়েটি তোর জানিস্ বৌ—যেন দুগ্‌গা পিরতিমে! বের কি কর্‌ছিস্?

ব। এর মধ্যে? এই তো মোটে তেরো? আগে নলির বিয়ে দি; তার পর তরি। নলি যে ওর চেয়ে বড়।

দ। বড়, না বড় ধেড়ে ধিঙ্গি! যেন তাল গাছটা। ভোলার তবু যদি ট্যাঁকের জোর থাকতো—

ব। ভোলার নেই; না থাকলো; তার দাদা, বৌদি, ভাইপোর ট্যাঁক্ তার সঙ্গে একত্র হলে জোর হবে বৈকি! আরো এক বছর যাক্।

দ। ওমা কি বলিস্ গো বৌ! অমনিতেই তো কত লোকে কত বলে! ছেলের-মা করে বে দিবি নাকি?

ব। বে না দিলেই কি সব বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে ছেলের মা হয়, পিসি? সে বাড়ী বুঝে হয়—। বড না হলে বে দেবো না, তা' লোকে যা' বলে বলুক। লোকের বলতে আটকাবে না তো। তবু যদি ঘর ঘর ধেড়ে মেয়ে না থাকতো·

দ। যাদের আছে তাদের মুরুদ নেই। তোর তো তা' নয় বাছা!

ব।' মুরুদ নেই মেয়ের বে দিতে; মুরুদ আছে ঘরের কেচ্ছা করতে। যোলো না হলে বে দিচ্ছিনি, পিসিমা! নিজেরা তেরো না হতে ছেলে বিইয়ে দেখিছি; নিজেরা জন্ম জখম হয়িছি। উঠ্‌তি বয়সের মুখে পোড় খেয়ে ছেলে বিইইছিহ্ যেন বেরালছ্যানা। ক'টা বা টিঁকলো? ক'টা বা গেলো। টিঁকলো আর কই! বিজয় আমার পঞ্চম গর্ব্ভের ছেলে।

দ। কে জানে, মা। তোদের সব সহুরে মান্‌সের সাহেবী ধরন?

ব। আমার যেন তাই। হরিষ তর্কলংকাবের ২০ বছুরী মেয়ে কেন ঘরে? একটা নয় দু'টো? সে তো সহুরে নগুরে বাবু নয়?

দ। পয়সা জোটেনে বলে। তাও বলি বাছা—ওরা কুলীন; কুলীনের ঘরে অমন থাকে। আমার মাসীদের বে হয়েছিল তিরিশ পেরিয়ে। তোমরা কি পার? এই সে দিন নীলাম্বর ঘোষাল তার মেয়েটাকে রাখতে না পেরে চৌদ্দ না হতেই পার করলে—

কিরণ। পার বলে পার! বৈতরণী পার একেবারে।

দ। ওমা অলক্ষুণে কথা শোন্।

ব। তাই বই কি মা! একটা বুড়ো ধরে দিলে, ৫৫ বছর বয়স মিনসের ; সাত্ সাত্টা পঞ্চপাণ্ডবের মত ছেলে। বৌ,ঝি নাতি পুতি। বৃহৎ সংসার। ছিঃ ছিঃ—মেয়েটার বয়স কত হবে, সদু ?

সদু। জোর চোদ্দ'! কত আর।

ব। তবেই না বাছা।

দ। তা কি করবে ? জাত মান রাখ্তে হবে তো ? তোদের যেন পয়সা আছে, গরমে আছিস্ কেয়ার করছিস্‌নি—গরীবের বুকের পাটার জোর হবে কিসে ?

ব। সেইটেই তো কথা পিসি। পয়সার জোব তো বাইরের জোর। খুঁটার জোর। মনের জোরই জোর। ও পাত্রে বে না দিয়ে আইবুড়ো রাখ্‌লে কি হতো ?

দ। ও মা। কি কথা লো বৌ! তিনপুরুষ নবকে যাবে যে ? শাস্তর মান্‌বিনি গা ?

ব। হরিষ তর্কলংকার কোন্ শাস্তর মেনে কুড়ী বছুরী মেয়ে ঘরে পুষেছে, শুনি মা ? তোমার মাসীরা তিরিশ বঁছব পর্য্যন্ত আইবুড়ো ছিল কোন্ শাস্তরের জোরে—বল না মা ?

দ। তারা যে কুলীন লো! শোন্ কথা—আহা তোর স্ফূর্ত্তি তো বেশ মা। বেশ বাস্ ছুটেছে—। আমরা কি ছাই খেয়েই মরি। পাবই বা কোথা মা ; ভাত জোটেনে পেটের।

নবনলিনী কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির। সে বলিল,—"ওমা ঠানদি বলে কি শোনো, পেটে ভাত জোটে না। এ দিকে কত লোক্‌কে শুদ দিয়ে টাকা দিচ্ছ যে ঠানদি ? জ্যাঠাই মা, জান ঠানদির কত টাকা আছে ; ও বাড়ীর কাকী বলে এক ঘড়া। আচ্ছা মা এক ঘড়ায় কত টাকা থাকে ?—"

দক্ষ। শুন্‌লি লা ছুট্‌কী তোর মেয়ের কথা। চোক্‌খাকীরা আমার খুব টাকা দেখে—

কিরণ। সত্যি ঠান্‌দি, তোমার এত টাকা কি করে হ'ল ?

দ। কোথায় টাকা বোন্! শুনিস্ কেন ?

নলি। ইঃ, আমি যেন জানি নি। ছুটু কাকার পৈতেতে অত লোক খাওয়ালে যে ?

দক্ষ। তা' ক্রিয়ে কাণ্ড দেনা করেও কত্তে হয়—তিনশো টাকা দেনা হয়েছে লো, জানিস্?

কিরণ। নাই বা এমন ক্রিয়ে কল্লে। দেনা করতে হ'বে?

দ। যাঃ যাঃ তোদের খিষ্টানি রেখে দে—হ্যালা বড় বৌ এ সব খিষ্টানি ঢং শেখালি মেয়েদের? খিষ্টানের মেয়ে নাকি?

য। কেমন লোকের মেয়ে ওরা!

দ। ওরা যেন ঔরসে জন্মেছে—তুই?

য। (হাসিয়া) পড়িলে মোগলের হাতে খানা খেতে হয় সাথে, জানই তো মা—

দ। ওমা কি ঘেন্না! সোয়ামী যদি অধম্ম অনাচার করে তাই কবতে হবে—। না বাছা! সোয়ামী মাথায় থাক্ ধম্ম কম্ম আগে—

কিরণ। আগেরটাই আছে তাই পিছেরটা সরে পড়েছেন—

সকলে খুব হাসিয়া উঠিল। দক্ষদেবী বুঝিলেন কি একটা আপত্তিকর ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সে রুখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল।

যজ্ঞেশ্বরী তখন একখানা লাউএর ফালি গোটা দুই কাঁচকলা ও একখণ্ড থোড় লইয়া বলিলেন "পিসিমা, এই নিয়ে যাও, বাগানের তরকারী—"।

ততক্ষণ পিসি মা রসনায় শান দিতেছিলেন; কিরণকে দু'কথা শুনাইতে। অকস্মাৎ অর্দ্ধপথে বাক্যবান কাঁচকলা আর থোড়রূপ ঘুষ-বানে কাটা পড়িল।

পর্জ্জন্যদেব আর একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিতেই দক্ষদেবী রসনা গুটাইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

(ক্রমশঃ)

বংশী-মুগ্ধা।

[শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।]

মধুরছন্দে মুরলীরন্ধ্রে
কে বাজায় ওরে, ও স্বর-গ্রাম।
ধা-ধা-ধা-ধা-ধা ধা—
রা ধা সা-মা মা ধা—
(বাজে) জড়িমা জড়িত ও কার নাম,
কে সাধে ওইবে, ও স্বর গ্রাম।
কোন্ নবোঢার হৃদয় গুঞ্জনে,
সুষুপ্ত প্রিয়ার আনন ঘিরে,
কম্পিত পাখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে,—
করে গতায়াত অবিরাম,
কে সাধে ওইরে ও স্বর-গ্রাম।
(যেন) প্রেম কপোতীর অস্ফুট কূজন
ঘুরি ফিরি মাগে কার পরশন,
(যেন) চারু শরদের বস্ত্র বয়ন
কাঁপে ছন্দে অঙ্গুলি চম্পক দাম,—
কে বাজায় ওরে ও স্বরগ্রাম।
(যেন) অস্ফুট কলির প্রস্ফুট গান
মৃদু সমুত্থিত ভিতরে ভিতরে,
পথ চলে কত প্রকাশে বাহিরে,
সুরভি নিশাস মিলিত সমীরে
চকিত বিস্মিত নিশীথ প্রাণ!
কে বাজায় ওবে ও স্বর গ্রাম।
(হল) অপূর্ব্ব কি ভাবে হিয়া নিমগন,
মধুময় সব—মাধুরী মগন,
কেন নয়নের আগে ফোটেলো এমন
নীল-কমল-নবীন-নীরদশ্যাম।

পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে নীল আঁধিয়ার
অন্তর চাহে যমুনার ধার ;
ওকি গাহে ? বুঝি মেঘ মল্লার ?
ভাসায়ে অম্বর দ্বীপ-দ্বীপান্তর
ভাসায়ে দুকূল-নগর-গ্রাম।
ওঠে ঐ ওরে ও স্বর-গ্রাম।
কাণে পশে শ্যামাবিহগীর গীতি,
মনে আসে শ্যাম তমালের বীথি ;
এ কোন শ্যামের শ্যামময় গীতি,
(বাজে) সা-মা-সা-মা-সা-মা সা—ম ,
কে বাজায় ওরে ও স্বর-গ্রাম

স্বাধিকার সাধনা।

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" পুরুষ-জাতি বিংশ শতাব্দীর অরুণাভাষ চক্ষে দেখিবামাত্রই এ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েদের তুলিবার চেষ্টা পুরুষদিগের নিজেদের উঠিবার চেষ্টার সহজাত বলিলেই হয়। বাঙ্গালীতে মনুষ্যত্ব যদি থাকিত, ভাবুকতার উদ্বেলিত মাধুর্য্য যতখানি চরিত্রবত্তার দৃঢ়স্থির মহত্ব তাহার শতাংশের একাংশও যদি বাঙ্গালীতে বৰ্ত্তিত,—তবে ত নারীশক্তির সমবায়ে জাতীয় শক্তিকে বাঙ্গলায় আজ প্রত্যক্ষই দেখিতাম। হা হুতাশ শুনিতেও হইত না, করিতেও হইত না। কিন্তু তাহাত নয়। ভাবুকতায় মহাসমুদ্র, চরিত্রে গোষ্পদ ইহাই বাঙ্গালীর ঘরে পুরুষের আজ বর্ত্তমান প্রকৃতি। ইহাদের হৃদয় দুয়ারে মেয়েদের অধিকার চাহিয়া হাত পাতা যে পণ্ডশ্রম, সে এই দেশকালপ্রচলিত প্রদত্ত স্ত্রী-স্বাধীনতার মাকাল ফলের মধুস্বাদ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছি। উঠিতে হইলে আজ প্রথম কর্ত্তব্য এই, যে,—আমরা মেয়েরা পুরুষ হইতে নিজেদের মানসিক

* "দ্বীপান্তরের বাঁশী" পাঠে লিখিত।

শক্তিতে বিন্দুমাত্রও ন্যূন মনে করিব না। আমরাও প্রবৃত্ত হইব হয় পুরুষের সঙ্গে চলিয়া, অথবা, তাঁহাদের টানিয়া লইয়াই এই চরিত্র লাভের তপস্যায়।

স্পর্দ্ধা! কেমন? কিন্তু বর্ত্তমান পূতিগন্ধময় গলিত দুর্দ্দশায় অন্ধকূপ হইতে জাতিটাকে টানিয়া তুলিতে হইলে এমনই স্পর্দ্ধার আজ প্রয়োজন। বিদ্যু-দীপ্তির মত এই চিৎ-প্রকাশ যাঁহাদের অজ্ঞানকে আঘাত করিবে মাত্র, বিনাশ করিবে না,—তাঁহারাই এখনও বলিবেন বটে স্পর্দ্ধা।. কিন্তু নিরুপায়। স্পর্দ্ধা আমাদের হইতে পারে, তাঁহাদেরও হইতে পারে, সে বিচার এখন স্থগিত থাক্। আমরা যাহা হইতে চাহিতেছি হইয়া চলিব। সকল অভিযানের, বিপ্লবের চিরন্তন সত্য আমরাও পাইয়াছি,—দুর্দ্দশা ও অপমান অপেক্ষা দুঃখ নির্য্যাতনই শ্রেয়ঃ, ইহা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

তবে এ কথা স্বীকার্য্য বটে আমাদের ত্রুটী যথেষ্ট আছে, ভাবুকেরা যতখানি চাহিবেন ততখানি পর্য্যন্ত চেতনার জ্যোতিঃ আমাদের কোনও দিনই হয়ত পৌঁছিবে না। কিন্তু আমাদের কি ইতর সাধারণ বা mass নাই? সকল জাতিরই অচেতন একটা নীচের স্তর আছে। আমাদেরও চিরকাল থাকিবে। থাকিবে বলিয়া নিখিল নারীজাতির জন্য মাত্র একটী পিঞ্জরের ব্যবস্থা হইতে পারে না; কোথাও হয় নাই। কেবল মাত্র আমাদের ছাড়া আর কোথাও এরূপ ঘটনা মিলিবে না।

জানি আমাদের সম্বন্ধে যে সন্দেহ সাধারণ তাহার মূলে খানিকটা দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু সেটা এত দুর্জ্জয় এবং প্রচণ্ড নয়, যে, তাহার জন্য আমরা চির দুর্ব্বোধ্য হইয়াই থাকিব। স্পষ্ট কথা বলিতে সেটার জন্য যদি সকল দায়ীত্ব ও অপরাধতার গ্রহণ করিতে এই যুগ-সন্ধিক্ষণে কেবল আমাদের ডাকা হয়, তবে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাশীলতাকে চেষ্টা করিয়াই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। আমাদের পক্ষ হইতে আমি বলি, তত্ত্বজ্ঞ ত দূরের কথা অতি সাধারণ বিশেষজ্ঞের কাছেও নারী-চরিত্র নামক অভিহিত পদার্থটা দুর্ব্বোধ্য নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের সেই চিরন্তন প্রবাদের সহিত আমি কোনও মতেই একমত হইতে পারি না। তবে এই যে দুর্ব্বোধ্যবৎ আপাতঃ অনুমান, ইহাও সহেতুক। আর সে হেতু যে কি তাহা বুঝিতে গেলে, পুরুষ, তোমাদের লজ্জিত হইবারই কথা। সে চেষ্টা করিও না। সত্যই বুঝিতে চাও! বেশ! ভাবিতে পারিবে কি উচ্চস্তরের পরমেশ্বর-ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া?—দেখিতে পাইবে তবে, কি দুরপণেয় কাম-কলুষ-কলঙ্ক কালিমায় যুগের পর যুগ তোমরা আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিকে

দারুণ হীনতার কৃষ্ণযবনিকার পশ্চাতে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিম্নমুখী করিয়া রাখিয়া আসিতেছ। মুক্তির স্বচ্ছতায় নির্ম্মল নিকলুষ নেত্রে চাহ দেখি নারীর পানে,—সূর্য্যালোকপাতে প্রভাত-সরোবর-বিকশিত নলিনীর মত চিত্ত কমলের সকল দল উন্মেলনে সে করে কিনা অন্তঃরহস্যের অযাচিত পূর্ণ প্রকাশ! কিন্তু জানি প্রকাশের কোনও প্রয়োজনই নাই। যে দিক দিয়া আমি আমার যুক্তিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছি ব্যবহারিক জগতের চিন্তা পদ্ধতি তাহার বহুদূরে পড়িয়া আছে।

সত্য বটে ব্যবহারিক জগতের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতাব একটা হুজুগ আসিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে। মেয়েদের তুলিতে পুরুষেরা চাহিতেছেন,—পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি সে আজ হইতে নয়, সে আজ শতাব্দী হইতে চলিল। সত্য-কার তোলা এতটুকুও তুলিতে পারিলেন না কেন? মার্ব্বেলের মেঝেয় যে মেয়ে গোবর লেপে সে মেয়েকে তাঁহারা বড়ই ঘৃণা করেন; দেড় হাত ঘোমটা আদৌ পছন্দ করেন না। কিন্তু যে মেয়ে টেবিলে কাঁটা চামচে ধরিতে শিখিয়াছে, যাহার ঘোমটা খসিয়াছে, তাহাদেরই বা স্ত্রী-প্রকৃতি তাঁহাদের সংসর্গে স্ত্রীজন সুলভ অসম্পূর্ণতা হইতে কতটা মুক্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? জাতীয় হীনতায় আঁধারে আলোকে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে সম অবস্থাতেই রহিয়াছে। আমাদের স্বাধীন এবং জেনানায় আবদ্ধ জীবন ইটের এপিট ওপিট মাত্র। ইহার কোনও অবস্থাটা হইতে আমরা অপরটাকে ঈর্ষা করিতে পারি না।

Female emancipation (স্ত্রীজাতির অবরোধ মোচন) নামক আন্দোলন এত দিন পর্য্যন্ত যে ভাবে চলিয়াছে, তাহার আসল মূর্ত্তিটা কি? আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আমার বোঝা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার বলাটা অকপট। মেয়েদের উন্নতির পক্ষপাতী শিক্ষিত উদার মতের হিন্দু সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। প্রথমতঃ একদল ভাবুক শ্রেণীর ভদ্রলোক। ইঁহাদের মস্তিষ্ক মধ্যে পাশ্চাত্য অভিমত—এমন কি সে গুলি যে সকল লেখকের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের অবিকল লাইন গুলি দিবারাত্র টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। ডিবেটিং ক্লবের টেবিলে তাঁহারা কণ্ঠধ্বনি ও করতালি ধ্বনি উভয়ের সহযোগে বিচিত্র বাদ্য তাণ্ডব সৃষ্টি করিতে ও করাইয়া লইতে পারেন,—ব্যবহারিক জগতের তাঁহারা কেহই নন। সেখানে বৃদ্ধা মাতামহীর প্রবর্ত্তিত মামুলি পদ্ধতি উল্টাইতে হইলে

যতটা দায়িত্ব ও কর্ম্মভার স্কন্ধে লইতে হয়, ভাবুক বেচারীরা তাহার অনুপযুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের উত্তেজনায় যেখানে যে প্রভাবই উৎপন্ন হউক, আপনাদের দিক হইতে তাঁহারা খাঁটি আছেন। বৈধ আন্দোলন ছাড়া অবৈধ পরিবর্ত্তনের পথে তাঁহাদের পা দিতে অতি বড় শক্রতেও দেখিতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ এক দল কল্পিতকর্ম্মা ব্যক্তি, ইহারা সুবিধাই খোঁজেন, সুখই চাহেন। মামুলী আচার ব্যবহার তাঁহাদের ইংরাজি আদব কায়দায় অভ্যস্ত পরিবর্ত্তিত আচার প্রণালীর জীবনে খাপ্ খায় না। আবার মেম লইয়াও দাম্পত্য জীবন চলে না, কারণ তাঁহারা ত সাহেবের চরিত্র অবলম্বন করিয়া সাহেব হন নাই, অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র আচার ব্যবহারটা। বাহিরের চটকে ভুলান এক কথা, আর অন্তরের স্বভাবে মিলাইয়া লওয়া আর এক কথা। সেই দিক হইতেই ঠেকিয়া, ঘা খাইয়া তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালী সাহেবের বিলাতী মেম পরিপাক হইবার নয়। বাঙ্গালী মেম গড়াই চাই। ইঁহাদের এই মেম গড়িবার চেষ্টাই মেয়েদের উন্নতি স্ত্রী স্বাধীনতা যাহা কিছু বল সব। এইরূপেই এই মেরুদণ্ডহীন ভাব ও মেরুদণ্ডহীন কর্ম্ম দুয়ের সমবায়ে পুরুষজাতি বিগত এক শত বৎসর ধরিয়া আমাদের ভুলিতেছে।

সুতরাং আমাদের হইয়া যতদূর চেষ্টা হইয়া গিয়াছে তাহা সবই ব্যর্থ। যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদেরও মধ্যে পদার্থের সত্যই অভাব। আজ আমরা তবে কাহাকে বিশ্বাস করিব? আমি বলি কাহাকেও নয়। হে বিদলিতা, পতিতা, সমাজ-প্রতিষ্ঠান-লগ্না পাষাণের জাতি।—তোমরা আত্ম নির্ভর অবলম্বন কর। নিজেরা জাগ, নিজেদের চেষ্টায় দাঁড়াও।

তোমাদের উন্নতির প্রতিপন্থী কেবল মাত্র টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্যগুলিই হইবে, তাহা ভাবিও না। কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিবে সব উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গিয়াছে। গোঁড়া বামুনেও সাহায্যার্থ অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। আবার ইহাও হয়ত দেখিবে যে বিলাত ফেরৎ দুর্জ্জয় ইংরাজি-বক্তা দিত্তা দিত্তা Agendaর কাপি বগলে করিয়া তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাচিয়া বেড়াইতেছেন! মোটের উপর হিন্দুর চিরন্তন হীনতা, জাতীয় প্রকৃতির ব্যভিচার ধর্ম্মের গতানুগতিক গ্লানিই আজ আমাদের শত্রু। কোনও ধর্ম্ম, কোনও পরিচ্ছদ, কোনও সমাজ দেখিয়াই শত্রুমিত্র বিচার চলিবে না। এই জন্যই বলিতেছি শুধু জাগা নয়, শুধু বক্তৃতা বা লেখা পড়া নয়—তপস্যারই আজ প্রয়োজন।

এতখানি কাজ করিতে হইবে এত বড় বাধা ঠেলিতে হইবে,—আবার

তাহা আমাদেরই নিজেদের। অথচ এই আমরা কাহারা ? এই খানেই বুক দমিয়া যায়। কিন্তু দমিবার প্রয়োজন নাই। ওগো, আমরা ত কতকগুলি স্ত্রী দেহের সমষ্টি নই। আমরা একটি মাত্র আত্মা। যতই অন্তঃসাধনার ফলে আমাদের স্ত্রীজনোচিত ভয়, পরস্পর অসূয়া, সঙ্কীর্ণতা ও দূরদৃষ্টির অভাব আমাদের আধার গুলি হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইতে থাকিবে, ততই অনন্তব্যাপী চিদাকাসে আমাদের এক এক জনের ইচ্ছা-শক্তি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পন সৃষ্টি করিবে, যাহার তরঙ্গ প্রবাহ নরকে মানিবে না, নারীকে মানিবে না, দেব প্রকৃতি, পশুপ্রকৃতি, পিশাচ, অসুর কাহাকেও মানিবে না ; সকলের মধ্যে বিচিত্র অভিলাষ জাগাইবেই জাগাইবে। আপনার জাতির কাজ করিতে হইবে,— সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য মহাপারাবার সম বাধা বিপত্তি। ভগিনী! আপনার লোল সুকোমল দেহলতা এলাইয়া দিয়া গুরু বক্ষভার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করিয়ো না। সহস্র সহস্র বৎসরের মরণকে সহসা জীবন-প্লাবনে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া নব আবির্ভাবের উল্লাস নৃত্য আরম্ভ করিতে যে নিথর জমাট আনন্দের হিমগিরি গড়া চাই, সে নির্ম্মাণ ত এতটুকুও চাঞ্চল্যের কাজ নয়। সে ধ্যান, গম্ভীর মৌন সে ধৈর্য্য, সে তিতিক্ষা, সে বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পের প্রসূতি অবিচলিত জ্ঞান, সেত সবই তোমাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এস নূতন করিয়া তবে নরজন্ম গ্রহণ কর ; মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে নারীকে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে আত্মসম্বিৎ মধ্যে পাইয়াছ, তাহাকে জীবন-যজ্ঞের অনল কুণ্ডে সমর্পণ করিয়া দাও। তাহার প্রতি অস্থিপঞ্জর ধিকি ধিকি জ্বলিয়া জীবন-বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখুক। চলুক তোমার তপস্যা।—ভবিষ্যৎ দেশ আমাদের এই বিচিত্র জীবন-সমস্যার সমাধানের জন্য যেমন নারী চাহিতেছে তাহার জন্ম হৌক্।

হায় হতভাগিনী নারী,—কি অবস্থা আজ তোমার! আত্মসংকোচের সংস্কারে তন্ময় হইয়া তুমি পরের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া লুকাইয়া ফেলিতেছ! কাহার জন্য? যদি পরের জন্য এ আত্মত্যাগ দেখাইতে পারিতে বুঝিতাম তুমি দেবী। কিন্তু তাত নয়। নিজেরই জন্য। আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতেছ পরের মধ্যে পরের জন্য নহে, নিজের জন্য। অথচ তোমার আমিত্বে "তুমি" বলিয়া একটা কিছু জন্মগ্রহণ করিয়া দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানরূপে জগতের শোভা সম্পাদন করিতেছে না। আবার "তুমি" বলিয়া অপর কাহাকেও যে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই পরিপুষ্ট আপনার সর্ব্বশ্রী সহযোগে যাহা সুষমাময় করিতেছে, তুমি তাহাও নহে। একি অনৈসর্গিক ভঙ্গী ? একি উৎকট ব্যভিচার।

ইহা কেমন করিয়া হইয়া উঠিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় বৈকি। নারীর কতকগুলি অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি ছিল, যে গুলি না থাকিলে সভ্যতা পরিপূর্ণ ও নির্দ্দোষ হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় সভ্যতা চলিয়া পড়িল নিম্নের দিকে। তখন সকল দেশেই অবনতির যুগে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল। পরাজিত শূদ্রের মত অসম্পূর্ণা নারীর ত্রুটিময় জীবন দাসত্বের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া গেল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতেরও দাসত্বের সূত্রপাত। এ রহস্য কে বুঝিবে? উচ্চাসনের দাস অন্তরের দাস সুলভ ঈর্ষা ও অত্যাচার প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত না হইলে তাহার নিম্নাসনের দাসের দুর্গতির মোচন নাই। আর উভয়েরই মনুষ্যত্ব একমুখী একতাবদ্ধ না হইলে জাতীয় পরাজয়েরও অবসান নাই।

ওগো শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা বিধান দাতা তথাকথিত মনীষিবর্গ, যাহা কোনও যুগে ভাব নাই তাহাই আজ ঘটিবে। যাহাদের মনস্তত্ত্ব অসীম পারদর্শিতা বলে দেখিয়া বুঝিয়া আপনাদেরই অনুকূলে তাহাদের জীবন নির্দ্দেশ রচনা করিয়াছিলে, তাহারাই আজ তোমাদেরও মনস্তত্ত্ব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে বিশ্লেষণ করিবে। তোমরা যদি তাহাদের প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার স্পর্দ্ধায় তাহাদের আত্মাকেও পঙ্গু করিতে পার, তবে, তাহারাও আত্ম-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে তোমাদের নাগপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে স্বাধিকার সাধনা আরম্ভ করিবে। সে দোষের নহে; সে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

নারীর জাগরণের ইহাই কারণ। তবে প্রতিশোধ শুনিয়া শঙ্কিত হইও না, সাধু। প্রতিশোধ নারীর নয়, যে, সে হিংসার সঞ্চারে তুমি বিবাক্ত হইয়া উঠিবে। প্রতিশোধ প্রকৃতির। ইহার মধ্যে ধ্বংসের প্রলয় নৃত্য নাই। যেটুকু চাঞ্চল্য আছে, —সেটুকু শুধু আবর্জ্জনার অপসারণের চেষ্টা মাত্র। সৃজনের উদ্দেশ আনন্দ।

আজ ভগবান মূর্ত্ত হইয়া উঠিবেন—সমবেদনার অমৃত প্রেরণায়। আপনাকে ভুলিয়াই নারী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল পুরুষের বিধান প্রদাত্রী কর্ত্তৃত্ব শক্তির মুখে। সে অবদান ব্যর্থ হইয়াছে। পুরুষ একাকী সম্পূর্ণ নহে, তাই সমগ্র ভাগবত বিধান তাহার প্রদত্ত বিধান ব্যবস্থায় বিকশিত হইয়া উঠে নাই। যে আত্মশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত জীবনে বাঙ্গলায় আজ তাহা স্বপ্নাতীত। সেই জন্যই এতদ্দেশের মানব সমষ্টির মধ্যে যে পরমেশ্বর ভাব কণিকা রূপবিম্বে বিকশিত হইয়া উঠিবার কথা,—তাহার বিলম্ব হইতেছে। Nation গঠন স্থগিত। আপনার অবদান সফল করিতে,—বাঙ্গালী জীবনের ভাগবত লক্ষ্য পরিপূর্ণ করিতে,—আজ প্রয়োজন হইয়াছে নারীর আপনার ভার

আপনার হাতে লইবার। আজ আমাদিগকে আর একবার নূতন প্রকারে আপনাকে ভুলিতে হইবে। এ এক অপূর্ব্ব বিভ্রমকর আত্মবিস্মৃতি; সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

আজ আমরা যাহা, সে নিজস্ব স্বতন্ত্র "আমরা" কিছু নহে; সে পারিপার্শ্বিক চাপ। চতুর্দ্দিক হইতে চোখ রাঙ্গানী ও ভীতিপ্রদর্শনরূপে লালসার ছদ্মবেশ চীন দেশের রমণীর পায়ের মত আমাদের মনটাকে দাবিয়া ছোট করিয়া দিয়াছে। ভীতির এই লৌহ নিগড় টানিয়া ফেলিয়া দিতেই হইবে। তার জন্য ইউরোপের অনুকরণে সফ্রেজিটের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি আমরা ধরিতাম, কিন্তু জানি তাহার প্রয়োজন হইবে না। জানি আমরা ভারত-রমণী। বল প্রয়োগের অন্য উপায় আমাদের আছে। সে বল আত্মিক বল। ঠিক্ ঠিক্ সেই বলের প্রয়োগই আমরা শিখি। আমাদেব তপস্যা তাহারই অনুশীলনের জন্য আরম্ভ হইবে—আমরা জীবনের এমন পথ আবিষ্কার করিব, যাহা অবলম্বনে ভারত শীঘ্রই বুঝিবে তাহার ধর্ম্মের বুজরুকির সনাতন কামিনী-কুহক অখডিম্বেরই সজাতীয় পদার্থ। উর্ণনাভের মত স্বরচিত বিষম বিষময় তন্তুতে জড়াইয়া পুরুষেরা নিজেরাই ইহার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহাদের দেখাইব,—হোমশিখার মত জ্যোতিষ্মান্ বহ্নিরূপ আমরা ধরিতে পারি কিনা, যাহার উত্তাপে আমাদের প্রতি সমুদয় অস্বাভাবিক বৃত্তি তাঁহাদের পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

দুর্ব্বলতার দিক ত কেবল আমাদের একার নহে, সে যে উভয়তঃ। সে দিকে প্রাণের তারে মীড় চড়াইতে থাকিলে, কেবল আমাদের হৃদয় তন্ত্রীই বিষম টানে ঝন্‌ঝনাইয়া উঠিবে, তাহা নহে; তাঁহাদেরও উঠিবে। শঙ্কাকে আমাদের দিক্ হইতে পুষিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এস আজ তীব্র নির্ব্বেদ হৃদয়োচ্ছ্বাসকে যে দিকে উথলিয়া দিতেছে সেই দিকেই চলিয়া পড়ি। ওদিকের মীমাংসা প্রকৃতি আপনিই করিয়া লইবেন। সাধারণ সমস্যার গুরুভার একা আমাদের মস্তকে কেন?

এক নূতন চেতনায় সতর্ক মনোবৃত্তিকে চারিদিকে সম্প্রসারিত করিয়া ভিতর ও বাহিরের সম্যক পরিচয়ে স্বাবলম্ব নারী এই লক্ষ্য অভিমুখে অভিযান জন্য একটা স্বতন্ত্র সমষ্টি-জীবন গঠন করুক,—জাতির প্রাণ-পুরুষের এমনি এক সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আমাদের চিদাকাশ অন্তরীক্ষ ধ্বনিত করিতেছে। তাহার স্পন্দনাবেগ যে বিদ্যুদ্বিকাশ উচ্ছ্বসিত করিবে সে উচ্ছ্বাস প্রাণেরই উৎস। সেই প্রাণের বহিরাবরণ দেহরূপে যদি কোনও প্রতিষ্ঠান বা institution গড়িয়া উঠে তাহা

অনৈসর্গিক নহে। বরং নিসর্গই তাহার সৃষ্টির কারণ বলা যাইতে পারে। তা যদি হয়, তবে, সেই নির্দ্দেশে সত্য সত্যই চলিলে, সে অনুষ্ঠান অমর অটুট।—তাহা নারী-মহিমারই-যোনিপীঠ।

বাঙ্গলার বাতাস প্রতিষ্ঠান গড়াইবার অনুকূল। এ বিষয়েও চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম না হইতে পারে। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা চলিবে। আমার বক্তব্য এই, যে, তাহা যেন season flowerএর মত ক্ষণিক না হয়। বনিয়াদ দৃঢ় হইবেই; অন্তরের মধ্যে এ ভরসা পাইলে তবেই কর্ম্মস্রোতে গা ঢালা আমার মতে শ্রেয়ঃ। উৎসাহটাকে হাওয়ার সঙ্গে তুল্য নিষ্ফলবেগ করা আমি সুষ্ঠু বিবেচনা করি না। বরং নীরবে প্রতীক্ষা অকৃত্রিম সঙ্কল্পকে হৃদয়ে দৃঢ়মূল করিয়া দেয়। সেই জন্যই আগে হইতে এ কথা বলিয়া রাখিলাম।

তার পর শেষ কথা। নিজেদের কাজ নিজেরা করিব তাহার অর্থ ইহা নহে যে পুরুষেরা আমাদের কর্ম্মরাজ্যের ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করিতে পারিবে না। পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জগতে প্রকাশিত বর্ত্তমান বিকৃত অস্বাভাবিক রূপটা আমার চোখে সমভাবেই বীভৎস। আমি চাই স্বাভাবিক অর্থাৎ ভাগবত রূপ, সে রূপে উভয়েই আমার কাছে এক। আত্মজ্ঞান যাঁহাদের উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের আমি নর-নারী নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিব আমার কাজে এবং আমার হৃদয়ে। উভয় জাতি পরস্পরকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে মঙ্গলের আবির্ভাব কোথায় হইল? আমার তপস্যা যে বিদ্যুদাগ্নির স্ফুরণ চমকাইবে, তাহা আঘাত করিতে থাকিবে উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী সংস্কারকে, একা কাহাকেও নহে।

হে প্রাণবন্ত পুরুষ, যাহারা সঙ্ঘের যজ্ঞ বেদীতে বসিয়া আমারই এই ব্রত মাথায় তুলিয়া লইয়া সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছ, আমি তোমাদের সকলকেই বরণ করিতে উদ্‌গ্রীব। আমার হাতের জয়ের মালিকা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। কিন্তু জানিও মনুষ্যের পরীক্ষায় যে তরল অগ্নিসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—সে কর্ম্মে নয়, প্রেমে নয়, জ্ঞানেই সম্ভব। আজ আমাদের Mandate বা নবজাগরণের রাজপাট যাহারা লইবে তাহারা নিত্যমুক্তের থাক।

পদ্মার পরীক্ষা।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

১

শোক বিহ্বলা রাজার মহিষী
অশ্রু রুদ্ধ ভাষে
কহেন ডাকিয়া 'জয়দেব' প্রিয়া
পদ্মাবতীর পাশে,
"পদ্মা, আমার যোদ্ধা ভাই সে
যুদ্ধে হয়েছে হত,
সহ-মরণেতে গেছে জায়া-তার
সাধ্বী সতীর মত।"
পদ্মা কহেন "সহমৃতা যায়
অতি দূর প্রেমভাবে,
প্রিয়-প্রেমাধীন যে পরাণ, সে যে
নিজে দেহ ছেড়ে যাবে;
যে কঠিন হিয়া লাজ তেয়াগিয়া
তথাপিও দেহে রয়.
মহারাণী, তারে তোমার বিচারে
দণ্ড উচিত নয়।"

২

ক্ষোভে অভিমানে রাজার ঘরণী
তনু কাঁপে থরথর,
যুগল গোলাপ বিকশিল যেন
রাতুল গণ্ডপর।
মঞ্জীর বাজে মৃদু রিনিঝিনি,
আলয়ে ফিরিয়া রাণী
তখনি বসিয়া প্রাণেশের পাশে
করিলা কি কাণাকাণি।

আশ্রিতা লতা মহিষী সবে না
এমন দর্প তার,
পদ্মার প্রেম সহে কি না দেখি
পরখের খুর ধার।

৩

সে দিন, ভবনে ভবনে বাজিছে সঘনে
সন্ধ্যার আগমনী,
প্রফুল্ল চারু নারীর অধরে
মধুর শঙ্খধ্বনি।
পদ্মা তাঁহার নির্জ্জন গেহে
বসিয়া অচঞ্চল
স্মরিছে নীরবে উপাস্য "রাধা
মাধবের" পদতল।
সহসা অদূর রাজগৃহ হ'তে
উঠিল আর্ত্তস্বর—
"কবি জয়দেব সন্ন্যাস রোগে
ত্যজিলেন কলেবর"।
কবির নামটী ধ্যানমগ্নার
ভাঙ্গে ধ্যান পশি কাণে,
অতর্কিতে কে নিরীহা হরিণী
বিঁধিল রে বিষবাণে?
শুনিয়া সাধ্বী বজ্রের মত
সুকঠিন সেই কথা—
ঢলিয়া পড়িল কুঠার-ছিন্না
স্বর্ণলতিকা যথা।

৪

রাজার ভবনে হাহাকার সনে
পুনঃ গেল সেই বাণী,
"জয়দেব জায়া জীবন দিয়াছে",—
শুনে' ধেয়ে আসে রাণী।

ছুটিয়া আসেন আপনি ভূপতি
অমনি কবির বাসে ,
দেখেন, লুটায় প্রাণহীন তনু
সন্ধ্যা দীপের পাশে ।
পীবর বক্ষে স্পন্দন টুকু
একেবারে গেছে থামি,
সন্ধ্যার মত মৃত্যু কালিমা
আননে এসেছে নামি ।
গতজীবিতার সীমন্ত সীমা
যেন গো উজল করে,
ইন্দুর মত সিঁদুর বিন্দু
হাঁসিছে পুলক ভরে ।

(৭) .

দাঁড়ায়ে রঙ্গিণী স্তব্ধ নিথর
অধরে সবে না কথা,
চিত্রিতা চারু প্রতিমা, অথবা
ভাস্কর কারু যথা ,
ভূপতি কহেন "কি নিঠুর অহো !
মিথ্যা তোমার ছল ।
নারীঘাতী আজি করিল আমারে
নারীর কৌতুহল ।
কবি বসে আছে বহিরুদ্যানে
কেমনে কহিব তারে,
বাণীর ছলনা মেরেছে তোমার
নির্দ্দোষী ললনারে ?"
বিস্ময়ে ভয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
প্রহরী রুদ্ধ-বাক্ ;
আসে সারি সারি যত পুর নারী
কেহ কহে "পড়ে থাক্

এ দেবীর দেহ, ডেকে আন কেহ
কবিরে কহিয়া সব,
পারিবেন এরি প্রেমাধার পতি
বাঁচাইতে এই শব।"

(৬)

জয়দেব আসি মুখে মধু হাসি
রাজারে চাহিয়া কন,
"রাধা মাধবের প্রেম রস গলি
জগিবে এ অচেতন।
পদ্মা, এখন হয় নাই শেষ
তোমার ঠাকুর সেবা
অমন করিয়া প্রাণ মন দিয়া
তাঁদের সেবিবে কেবা?
দেবদাসী তুমি, সেবার লাগিয়া
মৃত্যুরে কর জয়"
এতেক কহিয়া জয়দেব দিল
—তনুখানি পরশয়।
মৃতদেহ খানি শিহরি উঠিল,
পতির পরশ লভি'—
পদ্মা উঠিয়া দেখেন চাহিয়া
দাঁড়াইয়া যেন ছবি
নৃপ সনে আসি, রাজপুরবাসী
কুটীর দুয়ারে তাঁর।
'রাধা মাধবে'র জয়গীত বল
উঠে মুখে জনতার।

বাঙালীর আর্য্যামি।

(অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার এম,এ।)

গোঁড়ামিতে রবীন্দ্রনাথের গোরাকে পারিয়া উঠিবার জো নাই। সে নিজেকে পরম হিন্দু মনে করিয়া ফোঁটা তিলক ধারণ করিয়া হিন্দুয়ানীর মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি স্বরূপ সর্ব্বত্র হিন্দুত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেড়াইত। কিন্তু জানিত না যে সে খৃষ্টান আইরিষম্যানের সন্তান—ঘটনাচক্রে হিন্দুর ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের বাঙালী জাতিটিও ঠিক সেইরূপ। আর্য্যামিতে বাঙালীকে পারিয়া উঠিবার জো নাই। সে নিজেকে পরম আর্য্য মনে করিয়া সর্ব্বত্র আর্য্যামীর দোহাই দিয়া নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু গোরা যে পরিমাণ হিন্দু, বাঙালীও সেই পরিমাণ আর্য্য।

আমাদের দেশে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম দেখাইয়া দেন যে বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।

অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—"বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য্যজাতি-মোঙ্গোল কোল মোঙ্গুর দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ী, যাতে আর্য্যত্বের গরম-মশলাটুকু উপরে পড়েছে মাত্র; এ কথাটা স্বীকার কর্‌তে যেন কেমন লাগে। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নাকি শতকরা ১৩ জন মাত্র; যাঁরা ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির, তাঁহাদের মধ্যে দু'চার জন বড় গলায় "বাঙালী অনার্য্য" এ কথাটা বলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় তাঁরা মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ—অতএব আর্য্যত্বের গরম মশলার একটা কণা, অনার্য্য চাল ডাল ন'ন। আমি নিজে ব্রাহ্মণবংশীয়; কিন্তু আমার বিশ্বাস গরম মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে।"

বাঙালীকে অন্‌আর্য্য * বলিলে হয়তো বাংলার আর্য্যগণ মারিতে উদ্যত হইবেন। "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌"—এটা বিজ্ঞানের বেলায় খাটাইলে চলিবে না। তাই সত্যের খাতিরে গোটা কতক অপ্রিয় কথার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিতেছি। গালাগালির পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক—কিন্তু

* "অনার্য্য" শব্দটির সঙ্গে একটা বদ্‌গন্ধ জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সুনীতিবাবুর পদানুসরণে শব্দটি এইভাবে লিখিলাম। আর্য্যদের না হইলেই যে জিনিসটি খারাপ হইবে, এইরূপ ধারণা মূলেই পরিহার করিতে হইবে।

আমার কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা হইলেই ধন্য হইব। অবশ্য ইহার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিতে পারে—দেখাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতার সহিত মতমত কে মানিয়া লইব।

আমাদের মোটামুটি বক্তব্য এই—:

(১) আর্য্যামীর বড়াই করিলেও জাতি এবং ভাষা হিসাবে গোড়ায় আমরা আর্য্য নই।

(২) মূলে অনার্য্য বলিয়া আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নাই;—কারণ ৫।৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা হইলেও, অনার্য্য সভ্যতা নিতান্ত কম দরের ছিল না, আর্য্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার আগেই তাহা যথেষ্ট কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল এবং পরে আর্য্য সভ্যতাকেও বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

জাতি হিসাবে আমরা কি, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দ্রাবিড়ী-মোঙ্গোলীয় বলিয়াই আমরা একরূপ সাব্যস্ত হইয়াছি। রিজলী (Herbert Risley) সাহেব এই সব আলোচনা করিয়া আমাদের কাছে যথেষ্ট অপ্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ক অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইংরেজী গ্রন্থে জাতিবিষয়ে আমাদের স্বরূপ নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভূতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন জিনিস বাহির করিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনা আমাদের দেশে আরম্ভ হয় নাই। মাত্র অধ্যাপক পঞ্চাননদাস মহাশয় এদিকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একখণ্ড প্রস্তরে লিখিত কতকগুলি চিহ্নের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—তাহাতে "মানতো" গোছের একটা কথার সন্ধান পাইয়াছেন। ইহার অর্থ মানুষ বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিতেছেন। এই সকল যথার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে এদেশে অক্ষরের প্রচলন ছিল, তাহা প্রমাণিত হইবে। অক্ষরের সৃষ্টি কত সময় এবং সভ্যতা সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন বহু পূর্ব্বকালেই বঙ্গীয় সভ্যতা Further Indiaতে প্রচারিত হইয়াছিল।

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
"একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।
"সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
"তুই তো না মা গো তাদের জননী
তুইতো না মা গো তাদের দেশ।"

ইহা শুধু কবিকল্পনা নয়, ইহার মূলে সুদূর অতীতগামী ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। বিজয় সেনানী যখন হেলায় লঙ্কা জয় করেন তখনও বাঙলা দেশ আর্য্য সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে।

"পাণ্ডব-বর্জ্জিত" এই দেশ কি সেকালে কি একালে বরাবরই বাংলার বাহিরের লোকের দ্বারা ঘৃণিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীনতর ও নিম্নস্তরের সভ্যতার ধারা বজায় রাখিলেও অথর্ববেদ বেদ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে যেমন অনেক দেরী লাগিয়াছিল এবং ত্রয়ীবিদ্যাই আজও যেমন তাহাকে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ আমরা আর্য্যত্বের দাবী করিলেও, বাহিরের লোকে আমাদের সে দাবী অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমে ব্রাহ্মণেরা আমাদের বাড়ী ভাত রাঁধিতে আসিয়াও আমাদের ছোঁয়া হাঁড়াতে খাইতে চায় না। অন্ আর্য্যের আড্ডা দক্ষিণ ভারতেও বাঙালী ব্রাহ্মণের স্থান তফাতে।

পশ্চিমের কায়স্থের পৈতা আছে—এদেশে নাই। এদেশের কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়াই পরিচিত। তবে তাঁহাদের অনেকে বড় লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ মস্তকে হস্তামর্ষণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে "সৎশূদ্র" উপাধি দিয়াছিলেন। "দেব-বর্ম্মা"ই হই, আর "দেবী" উপাধিই লিখি, "দাস" নাম কায়স্থের ঘুচিল না। পৈতা নিলেও সে ব্রাহ্মণের চোখে দাস এবং সৎশূদ্রই আছে। এই গেল কায়স্থের কথা। বাঙলা দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণের জাতি নাই। কায়স্থেরা মসিজীবী ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের অনেক দেরী আছে। তাঁহাদের মত মালো, গোয়ালা প্রভৃতি জাতিও সমানভাবেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন। তার পর ব্রাহ্মণগণের কথা। আদিশূরের পাচ জন ব্রাহ্মণ আনার গল্প যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাঁচ জন ব্রাহ্মণী আনার কোনো উল্লেখ পাই কি? বাঙলার ব্রাহ্মণের আদিমাতা কে? ইহার জবাব কে দিবে?

মুষ্টিমেয় কয়েক লক্ষ ব্রাহ্মণ কায়স্থের কুলজী তো এই; বাকী সকলের

অন্ আর্য্যত্ব সম্বন্ধে তো কোনো গোলোযোগই নাই! যে দেশে শতকরা ছাপ্পান্ন জন অস্পৃশ্যজাতির লোক, সেখানে সংখ্যার অণুপাতেও আর্য্যের স্থান নাই। বাংলা দেশে যদি কেহ আর্য্য থাকেন্ তবে তাঁহারা যেন গাঁ শুদ্ধ লোককে একঘরে করিয়া বসিয়া আছেন।

যাহাদের লইয়া বাস্তবিক দেশ, বহু শতাব্দীর সহস্র সামাজিক বন্ধনের সাহায্যে এবং বুদ্ধিবৃত্তির বলে তাহাদিগকেই আমাদের তথাকথিত আর্য্যগণ চাপিয়া রাখিয়াছেন। সুখের বিষয় আজ জগতের চারিদিক ওলটপালট করিয়া সে অন্যায় অত্যাচারের মৃত্যু ঘোষিত হইয়াছে।

জগতে আর্য্য বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগের পরিচয় দেন, তাঁহাদের সকলেরই মাথার আবরণ একটা কিছু আছে, কিন্তু আমাদের আর্য্যত্বের সে নিদর্শন কোথায় উড়িয়া গেল? আমাদের অপেক্ষা আরো গরমদেশে তো মাথার আবরণ এখনো ব্যবহৃত হইতেছে। দৈহিকগঠন বেশভূষা এবং আচার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি করিলেই আমাদের আর্য্যত্ব সম্বন্ধে বেশ একটু সন্দেহ আসিয়া পড়িবে। বাঙ্গালীর অহঙ্কার আছে যে বুদ্ধিমত্তার সে সকলকে ছাড়াইয়া যায় এবং তাহার মত ভাবপ্রবণতাও কম জাতির আছে! এ কথার সত্যতা আছে, কিন্তু এই দুইটি Characteristic বা বিশিষ্ট গুণ সে কোথা হইতে পাইল? ভারতে এক মারাঠী ছাড়া অন্য কোনো জাতি চতুরতা। বাঙ্গালার সমতুল্য নয় বলিয়া আমার ধারণা। কিন্তু দুইটি জাতিই বোধ হয় বহুল পরিমাণে অন্ আর্য্য রক্তের মিশ্রণের ফলে এইরূপ হইয়াছে, ইহাই ত বোধ হয়। তারপর আর্য্যগণ বিজয়ীর জাতি দেশ জয় করিতে করিতে দুন্দুভি দামামা লইয়া রুধির রঞ্জিত পথেই তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। এ জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ অশ্বমেধ। রাণী কৌশল্যা ঘোড়া কাটিয়া পুত্রার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

"পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ॥
কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥"

কোমল তৃণ ভোজী ছাগশিশু বলিদানেই যাহার বীরত্বের অবসান সেই ভাবপ্রবণ জাতির মা কস্মিন্ কালেও কৌশল্যা নয়।

"ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এইটুকু বলা যায়, বেদের সময় হইতেই আর্য্য ভাষা অনার্য্যের ঘরে জাত দিয়েছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে শুদ্ধ করে জাতে

তোলা যায় না। একদিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষা—আর এক দিকে বাঙলা প্রভৃতি, এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায়, যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাংলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাংলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যত তদ্‌ভব, অর্থাৎ বৈদিক থেকে উৎপন্ন। বৈদিক ক্রমে প্রাকৃত হল, প্রাকৃত বাঙলা প্রভৃতিতে দাঁড়াল। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু একটানা ভাবে হয় নি। বাঙলা প্রভৃতির উৎপত্তি আর প্রকৃতি বিচার করলে এইটুকু বোঝা যায় যে, বৈদিক কালের 'জাত্' আর্য্যভাষীর বংশধরের মুখে মুখে বদলে এলে যে রকমটি এর রূপ দাঁড়াত, এর এখনকার রূপটি সে রকম নয়। আর্য্যভাষা অন্‌আর্য্যভাষীর দ্বারা গৃহীত হওয়াতেই এর পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হয় নি। আমরা আর্য্যভাষা বলি কিন্তু ঠিক প্রাচীন আর্য্য ধরণে আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি দ্রাবিড় ভাবে।" এই হইল অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

গোরাকে দেখিয়া যেমন বুঝিবার জো নাই যে সে অহিন্দু—আবার মজা এই যে সে জানিত না যে সে অহিন্দু—আমাদের জাতিটিকেও সেইরূপ বাহির হইতে বুঝিবার জো নাই যে তিনি অন্‌আর্য্য—এবং তিনি জানেনও না যে তিনি অন্‌আর্য্য।

পল্লী পত্র।

[শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র]।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার "নারায়ণে" গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার হরকরাতে "যশোহর" হইতে অন্যান্য গ্রামের সম্পর্কে পাঁজিয়ার কথা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। যথাসময়ে "যশোহরে" আমরা সংশোধন করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার কাগজের পাঠকদের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে না থাকে এবং জন্ম-পল্লীর এ মিথ্যা কলঙ্ক যাহাতে দূর হয় সেই উদ্দেশ্য পাঁজিয়া সম্বন্ধে নিম্নে কিছু লিখিতেছি। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে গ্রামবাসীরা গ্রামোন্নতির জন্ম কত দূর করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পাঁজিয়া যশোহর জেলার একটী অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম। হৃত-সম্পদ হইলেও সম্ভ্রমগৌরব তাহার এখনও অটুট। বাংলার এ দুর্দ্দিনে পাঁজিয়ার বৈভব নষ্ট হইলেও তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

যে জল-কষ্টের কথা আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিব। নিজ পাঁজিয়ায় অন্যূন ৫০টী পুষ্করিণী আছে। তাহাদের সকলের জল সমান ভাবে পানীয় না হইলেও জলকষ্ট আমরা কখনও ভোগ করি নাই, বর্ত্তমানেও করিতেছি না। তবে একেবারে বিমল পানীয় জল দুর্লভ, তাহা সত্য—তাহা তো আজ সারা বাংলার ব্যথা। তাহার বন্দোবস্ত অধিক সংখ্যক পুষ্করিণীর দ্বারা হয় না, বাড়ীতে বাড়ীতে জলের ব্যবস্থা করিতে হয়। গ্রামের মধ্যে ৫।৭টী পুষ্করিণী আছে যাহার জল বেশ ভাল, তবে গ্রীষ্মকালে অত বড় গ্রামের পক্ষে এগুলিও যথেষ্ট নহে। এই সময়ে ২।৩টী পুকুর স্নান ও অন্যান্য কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র পানের জলের জন্য প্রতি বৎসরই রাখা হয়। আরও যে ৮।১০টী পুকুর আছে, তাহা একটু সংস্কার করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে।

ইউনিয়ন কমিটির হাতে গ্রামের রাস্তাগুলি এবার বেশ ভালরূপ সংস্কার হইয়াছে। শুনিতেছি পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত সত্বরই করা হইবে।

এই গ্রামে গত ১৮৯৭ খৃঃ একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বেই একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় এত দিন পরে তাহার নিজস্ব বাড়ীতে আসিয়াছে। দালানের কাজও আরম্ভ হইয়াছে, সাধারণের অর্থ সাহায্যে উহা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে, এ আশা আছে। বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল গত কয়েক বৎসর বেশ সন্তোষজনক।

এখানে দুইটী সাধারণ পাঠাগারও আছে। এই দু'টীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাহাদের নূতন পথ—নবযুগের নূতন বাণী গ্রামময় ছড়াইয়া দিবার উদ্যম। প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ইংরাজী ও বাংলা বই যাহা যাহা দরকার তাহার যোগাড়ের চেষ্টা হয়। ইহাদের একটীতে ("বেঙ্গল লাইব্রেরীতে") National Literature এবং সরকারী ও বে সরকারী Reports এত বেশী আছে যাহা যশোহর জেলার অন্য কোন পাঠাগারে আছে কি না সন্দেহ। এখানে সাধারণ মাসিক ও সংবাদ কাগজ ব্যতীত আর্য্য, প্রবর্ত্তক প্রভৃতি গভীর দার্শনিক প্রবন্ধ সম্বলিত কাগজগুলিও আসে। ইহারা সপ্তাহে সপ্তাহে "জ্ঞানোন্মেষ" নামে একটি সভা করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহার আলোচনা করেন; এবং হাতে লিখিয়া প্রতি মাসে "জন্মভূমি" নামে একখানি কাগজ নিজেদের

মধ্যে প্রকাশ করেন। এইরূপ নানা সদুপায়ে গ্রামের এম,এ পড়া যুবক হইতে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত একটা সুন্দর প্রাণের যোগ সৃজন হইয়াছে—ইহার মূল্যও কম নয়।

সেবা ধর্ম্মের দিক হইতে গ্রামের যুবকেরা গত ১৩.২ সালে একটী "দরিদ্র ভাণ্ডার" স্থাপন করেন; সেই ভাণ্ডারের কাজ গ্রাম ও জেলা ছাড়াইয়া কালে কালে বহুদূরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উহার বাৎসরিক সভাতে কলিকাতা হইতে আসিয়া একবার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আর একবার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ অনেক গন্য মান্য লোক অনেকবার কলিকাতা হইতে ঐ সভায় কাযে যোগদান করিতে আসিয়াছেন। বহু কারণে যদিও ভাণ্ডারের বাহিরের কাজ এখনও বন্ধ আছে, তথাপি সেবার কাজ পূর্ব্ববৎ সমান ভাবেই চলিতেছে। ভাণ্ডারের কয়েক বৎসরের Reports আপনাকে এই সাথে পাঠাইলাম ইহা হইতে আপনি ভাণ্ডারের সকল বিষয়ের পরিচয় ধরিতে পারিবেন।

গ্রামের বড় অভাব একটী দাতব্য চিকিৎসালয়। বহুবার আমরা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছি। গ্রামবাসীরা স্বতন্ত্র চাঁদা মাসে মাসে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঐ বোর্ড কিছুই না করায় গ্রামবাসীরা অবশেষে Co-Operative চিকিৎসা-লয় স্থাপনে দৃঢ় সংকল্প হইয়া গত মে মাসে সদর সাবডিভিজনাল আফিসার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা করিয়া তাহার যথোচিত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐ কাজ সত্বরই আরম্ভ হইবে। গ্রামে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য একটী কৃষিসমিতি হইয়াছে। সহকারী Agricultural officer একবার সে কাজ পরি-দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

গ্রামে সকলের চেয়ে আদর্শ কাজ হইয়াছে, সেখানে দু'টী অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। উহাদের একটি বালকদের জন্য, অপরটি বালিকাদের। আজ ৩ বৎসর ইহাদের স্থাপনা হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগ বালিকা বিদ্যালয়ে মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য দেন। বালিকাদের সংখ্যা প্রায় ৮০; বালকের সংখ্যা ১২০ জনেরও কিছু বেশী। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বালিকাসংখ্যা এইরূপ হওয়া যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনই আশারও কথা। এ দু'টি বিদ্যালয়ে জাতি-ধর্ম্ম-

নির্ব্বিশেষে সকলকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমগ্র যশোহর জেলার মধ্যে অন্য কোথাও গ্রামবাসীরা নিজ খরচায় দু'টি অবৈতনিক বালক ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন আজও করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

আমাদের কাজ ক্ষুদ্র ও বাহিরে অপরিজ্ঞাত হইলেও আমাদের প্রাণ ও আশা ক্ষুদ্র নয়। গ্রামে জলকষ্ট দূর তো সামান্য কথা, 'গ্রামের কোন অভাবই না থাকে, তাহার জন্য গ্রামের যুবকেরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমাদের বড় আশার কথা, সেই যুবকদের দেশপ্রীতি ও স্বেচ্ছাসেবকতা। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া গ্রামের মঙ্গলের জন্য যাহা করা যায়, তাহা করিতে গ্রামবাসীরা কখনও পরাঙ্মুখ নহেন। জন্ম-পল্লীর কল্যাণের জন্য তরুণরা যখন বুক বাঁধিয়াছেন, তখন তাহা যে সম্পন্ন হইবে—এ আশা সকলে রাখেন; তবে সময় সাপেক্ষ। "যশোহরের" সংবাদদাতা স্থূল দৃষ্টিতে পাঁজিয়াকে দেখিয়াছেন তাই তিনি তার প্রাণের পরিচয় তো পানই নাই, এমন কি, বাহিরের সমস্ত জিনিষকেও ভুল বুঝিয়া আসিয়াছেন। আমার এ লেখাতে অহঙ্কারের কিছু নাই—যদিও গ্রামের অতি সামান্য বিষয়ের কথা বলিতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি—সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এ পত্র পাঠাইলাম। নিবেদন ইতি—

জীবন-যাত্রা

[আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।]

আজি চলিতে হইবে ছেড়ে—
জীবনের যত গভীর ব্যথা
আকুল কাঁদুনী শত কাতরতা
মায়ার নিরাশা মুক্তির আশা
ত্যজিতে হইবে যে রে
আজি চলিতে হইবে ছেড়ে—
যার যাহা কিছু বলিবার আছে
তাহারে বলিতে দে রে,
তোর নব জীবনের নূতন প্রভাত
আবার আসিবে ফিরে।

তোর কাঁদিতে হবে না আর ;
জীবণের ভয়, প্রাণের ভাবনা,
দিশাহারা তোর শতেক কামনা,
অলসে অবশে টুটিবে রে তোর
জীবনের শত ভার।
ওরে তোর কাঁদিতে হবে না আর !
পদে দলিবার বাসনা যাহার
তাহারে দলিতে দেরে ;
তোর নব জীবনের নূতন প্রভাত—
আবার আসিছে ফিরে।

তোর সময় বহিয়া যায়।
সুবাতাসে ঐ খুলে দেনা তরী,
প্রাণ-যমুনায় উঠেছে লহরী,
ওপার হইতে বাজিছে বাঁশরী—
ত্বরা করি আয় নায় ;
তোর সময় বহিয়া যায়।
সে হাটের মুলে তোর ভরা বুক
এ হাটে হাটুরে য়া' বলে বলুক
(তাহে) কিবা আসে, কিবা যায়।
ত্বরা করি আয় নায়।

এবার যাত্রী যায়।
লক্ষ তরণী সোণার কাছিতে—
বাঁধা যে রে এ-উহায় !
একই নেয়ে যেয়ে সকল তরীতে
এ অকূলে কূল দেয়।
বাহিতে বাহিতে আয়ু হ'বে তোর
বিকাবে ও হাটে সরবস্ব তোর
মরিতে মরিতে বাচিবি জীবন
সে মৃদঙ্গ স্বরময়।

ডাক তবে তোর মগন তুফানে
জীবন নৃত্যে তরণী যে টানে'
. —দিবানিশি তোর বন্ধু,
এ তিন ভুবনে সেই কর্ণধার
প্রলয় প্লাবনে রঙ্গ যাহার •
তারিতে এ ভবসিন্ধু।

সৈনিক-সীমন্তিনী।

[শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায়।]

প্রতি বৎসর বর্ষার অপগমে শরৎ যেমন তাহার সুষমা-সম্ভার লইয়া আসে, এ' বৎসরও বর্ষান্তে সে তেমনই আসিয়াছে। গগনে বর্ষার সে ঘনঘটা—সে হাঁকডাক আর নাই। ঘাট বাট আর তেমন পঙ্কিল নহে। এখন নির্ম্মল সলিলে শোভে বিকচ কুমুদ কহ্লার, উপবনে হাসে বন-শোভন স্থলপদ্ম। এমনই সুন্দর শরতে প্রতিবৎসর বঙ্গে রমণীয় শারদীয়া পূজার ঘটা। এ' বৎসরও মায়ের শারদীয়া আগমনীর দিন সমাগত। তিন দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বোধন হইয়া গিয়াছে। গতকল্য সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস ছিল। আজ সপ্তমী পূজা।

সময় সময়,—কি জানি কাহার প্রভাবে,—"মরা গাঙে" জোয়ার আসে, শুষ্ক তরু "মুঞ্জরিত" হয়। বুঝি তাঁহারই প্রভাবে প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে মৃত বঙ্গে অকস্মাৎ প্রাণের গঙ্গা জোয়ারে বয়,—দারিদ্র্যদীর্ণ, রোগ-শীর্ণ, কঙ্কালসার, মলিন বাঙ্গালীর মনে একটা স্ফূর্ত্তির 'কলকল ছলছল' ভাসিয়া উঠে। আজ এই সপ্তমীর সন্ধ্যামুখে কলিকাতা-নগরীর এক দ্বিতল কক্ষের সুন্দর অলিন্দে সেই শারদীয় আনন্দের হিল্লোল কূল ভাসাইয়া ছুটিতেছে। চম্পকবর্ণা, তন্বী, নবোঢ়া এক লোলনয়না ললনা পূজার রমণীয় পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া স্বহস্তে কেশ-প্রসাধন করিয়া মুকুরে আপন তাম্বুল-রঞ্জিত অধরশোভা নিরীক্ষণ করিতেছে, আর আপন উল্লাসে আপনি হাসিতেছে। তাহার মঞ্জুকেশে, সুগৌর ললাটে, লোল নয়নে, প্রফুল্ল আননে, বিলাস বসনে, সুচারু ভূষণে, অলক্তক চরণে বিভ্রম-

চলনে কি এক চাঞ্চল্যময় আনন্দলহর—শুধু হাসি শুধু হাসি। রমণী আপন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনি আপনহারা। তাহার প্রাণের উল্লাস, তাহার সসীম দেহ প্লাবিত করিয়া অলিন্দ ভাসাইয়া বুঝি শারদনীলে—তরঙ্গ তুলিতেছে। এমন সময় সেখানে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিল। কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের ছোট,—তাই তাহাতে ও তাহার দিদিতে সখীজনসুলভ সরল সরস আলাপের ঘটা। আজ তাহার এই উচ্ছ্বসিত উল্লাসের মাঝে দিদিকে পাইয়া সে মৃণাল বাহুতে তাহাকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিল এবং আনন্দ অবশ নয়নে বয়োধিকার মুখে চাহিয়া পাগলীর মত বলিয়া উঠিল,—"আয়, দিদি, আজ এই পূজোর আনন্দের দিনে তো'কে ভাল সাজে সাজিয়ে দেই, আর তোর চুলের নদীতে খোঁপার বাঁধ বেঁধে দেই।" বয়োধিকা গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন —"রাণী, তুই সাজ, তোকে বেশ মানায়।" কনিষ্ঠা ছাড়িবার পাত্রী নহে,— সে বলিল "না দিদি, আমার মাথা খা', তোকেও বেশ মানায়।" দিদির হাত ধরিয়া টানিয়া রাণী তাহাকে আয়নার কাছে আনিল এবং আপনার চিরুণী লইয়া তাহার কেশ প্রসাধনের উপক্রম করিল। জ্যেষ্ঠা শান্তভাবে কনিষ্ঠার হাত ধরিয়া বলিল—'এমনই সময় সুদূর দেশে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুঝছেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁর জীবন যেতে পারে; এমন সময় কি আমার বেশবিন্যাস কর্‌তে আছে, বোন্? 'ছেলে মানুষি' করিস্ নে। তুই নিজে সাজ। তোকে বেশ দেখাবেখন।' রাণী হো হো করিয়া হাসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"ছোট মা, ছোট-মা, শীগ্‌গির এখানে এস। দিদিমণি বোনাই বাবুর জন্যে কাঁদ্‌ছে গো কাঁদ্‌ছে। দেখ্‌বে এস।" রাণী চিররঙ্গময়ী। তাহার রঙ্গরহস্যে বাটীর সকলেই অস্থির, সকলেই তটস্থ;— ছোট-মাও-রাণীর হাসির লহরের সঙ্গী। রাণীর হাসি শুনিয়া এবং তাহার উল্লাস-চঞ্চল আহ্বানে ছোটমা একগাল হাসিতে হাসিতে ক্ষিপ্রচরণে অলিন্দে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাণী এক হস্তে দিদির অঞ্চল ধরিয়া অন্যহস্তে চিরুণী লইয়া হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর সাবিত্রীবালা শান্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে দেখিতে বাটীর সকল বালক বালিকা, কিশোরী যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে আসিয়া অলিন্দে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রাণী সকলকে বুঝাইয়া দিল যে এই সপ্তমী পূজার আনন্দের দিনে তাহার দিদি পূজার নূতন পরিচ্ছদ পরিবে না, চুল বাঁধিবে না, কারণ তাহার বর যুদ্ধে গিয়াছে। সকলে শুনিয়া তো হাসিয়া আকুল। একি সৃষ্টিছাড়া কথা! স্বামী কি কাহারও কখনও বিদেশে যায় না? স্বামী নাই বলিয়া এমন দিনে

মেয়েরা একটু সাজ পোষাক করিবে না। সকলেও হাসিয়াই আকুল,—সাবিত্রী কেবল নীরব—গম্ভীর। ছোট মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন - "হাঁ লো সাবি, আমি তো তোর মায়ের মত ; আচ্ছা,আমি বল্‌ছি এই পূজোর দিনে তুই পোষাক পর,—তাতে জামায়ের অমঙ্গল হবে না।" বাণী হাতে তালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া হাসিভরে বলিয়া উঠিল —"এইবার।" উপস্থিত আত্মীয়ার দল বলিল,—"হ্যাঁ, এর পর আর কথা কি। ছেলে বেলায় তোদের মা মরে যায়। তখন ছোট বউইত তোদের মানুষ করেছে লো, বিয়ে থা দিয়েছে,— এ'তোদের মায়ের বাড়া আত্মজন। মায়ের কথাই আশীর্ব্বাদ। এইবার সাজগোজ কর, সাবি।" ছোটমা পুনরায় বলিলেন,—"কি সাবি ? পর।" সাবিত্রী এতক্ষণ নীরব ছিল, সে অগত্যা বলিল, —"ছোট মা, মা কেমন তা' মনে পড়ে না. তোমাকেই মা বলে জানি,—কখনও তোমার কথার অবাধ্য হইনিক। আজ মা, তুমিও আমায় ও কথা বলো না। তিনি এখন বাসোরায়। মা, আমার কপালে কি ঘটেছে কে জানে। তিনি আমায় যে কাপড়ে রেখে গেছেন, তাই পরেই আমায় থাকতে দাও।" সাবিত্রী গম্ভীর মুখে ছল ছল চোখে ছোট মায়ের পদধূলি লইল। ছোট মা তখন রাণীকে বলিলেন,—"দে, রাণু, ওকে ছেড়ে দে। জামাই এসে ওকে সাজ পোষাক পরাবেখন্‌"। ছোটমা হাসিমুখে—"পাগলী মেয়ে আমার" বলিয়া সাবিত্রীবালাকে লইয়া গৃহকম্মে প্রস্থান করিলেন। বহু দিন হইতে জগৎটা অত্যন্ত পুরাতন বোধ হইতেছিল, কোনও বিষয়েই আর নূতনত্বের আস্বাদ পাইতেছিলাম না। হৃদয়ের অবসাদ একটু দূর করিবার জন্য গৃহশীর্ষে বসিয়া শারদ সন্ধ্যায় শারদীয়া পূজার দূরাগত বাদ্যধ্বনি শুনিতেছিলাম। এমন সময় রণগত-ভর্তৃকা বঙ্গবধূর ব্যবহারটি লাগিল বেশ। যেন বৈচিত্র্যবিহীন নীরস পৃথিবীর বুকে এক মনমজান বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠিল। এই কি —মধুবাতা ঋতায়তে, মধুং ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ?

যে যাহাতে একবার সুখ পায়, সে আবার তাহাই খোঁজে। পুষ্পলোভী ভ্রমরের এই ধারা। সঙ্গীতের সুরে একবার যে প্রাণের অন্তস্তল রাগমুখর করে, সে প্রাণ সেই সুরের লাগি বুঝি তাই পাগল হয়। সপ্তমী পূজার সন্ধ্যায় সাবিত্রী বালার ব্যবহারটি আমার নিরানন্দ প্রাণে সেই রাগময় সাধ জাগাইয়াছিল। অষ্টমী পূজার দিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় আমাদের বাটীর মেয়েরা ও রাণীদের বাটীর মেয়েরা একত্রে ঠাকুর প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই আমাদের এখানে উঠিলেন। বাটীখানি মুহূর্ত্তে বেশ একটু

আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল। হাসির তুফানে বুঝিলাম, রাণী আসিয়াছে। চন্দ্রবদনে চারু বসন চাপিতে চাপিতে, হাস্যচঞ্চল বঙ্কিম নয়নে চাহিতে চাহিতে, বিলাস-বিভ্রম চরণে রাণী আসিয়া অনতিবিলম্বে আমার কক্ষে উপস্থিত হইল। বুঝিলাম উদ্দেশ্য আমাকে প্রণাম করিবে। কিন্তু সোহাগে, আদরে, লজ্জায়, আহ্লাদে সে এমনই বিবশ, যে, আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া, কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, সুরভিত রুমালে স্বীয় মুখ আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহার হাসিতে হাসি মিশাইয়া আদরভরে বলিলাম—"যা যা, তোকে আর প্রণাম করতে হবে না। চিরদিন এমনই হেসে খুন হ'—এই আশীর্ব্বাদ বিনাপ্রণামেই করছি।" আমার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া আরও হাসিতে হাসিতে সে কক্ষ হইতে পলাইয়া যাইতেছিল। আমি বলিলাম—"বোস্ না রাণু, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে যে।" সে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কোন প্রকারে বলিল—"বলুন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোর দিদি ঠাকুর-প্রণাম করতে যায় নি?" আমার প্রশ্ন শুনিয়াই রাণী ত হাসিয়াই কুটপাট। অনেকক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সে বলিল,—"যাবে না কেন? ঐ তো ও ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। দিদির ঠাকুর দেখার কি ঢং।" রাণীর মুখের কথা আর বুঝা গেল না—তাহার হাসির ঢেউয়ে সব ভাসিয়া গেল। আমি বলিলাম—"হেসেই খুন তা কথা বলবি কি। হাসি রেখে খুলে বল্ না ব্যাপারটা কি?" কোন প্রকারে প্রকৃতিস্থা হইয়া সে বলিল সে ঢঙের কথা মনে পড়লে যে আর হাসি থামে না গো, তা সে কথা আপনাকে বলি কি করে, কাকু।" তাহার পর আনন্দাকুল কণ্ঠে, কখন হাসিয়া কখন থামিয়া, কখন চক্ষু তুলিয়া কখন চক্ষু ফিরাইয়া বাণা যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—কত সখীরা সাজিয়া গুজিয়া একগা গহনায় রূপ দেখাইতে আসিয়া ঠাকুর দেখার ছলা করিতেছিল। রাণীর দিদি তাহাদের কাহারও সহিত হাস্য পরিহাস রঙ তামাসা করে নাই। ঢুলীদের সেই নাচিয়া নাচিয়া ঢুলিবার মজার ভঙ্গী কেবা দেখে। পুরুত ঠাকুরের দীর্ঘ টিকির ফুলে একটা দুষ্ট ছেলে কেমন হাত দিতেছিল তাই কি দিদি একবার দেখিল। আর বাঙ্গাল বউদের বাঙ্গালে কথা —সে যা রগড়! দিদি কেবল দুই হাত জোড় করিয়া ঠাকুরের চরণের দিকে এক নয়নে চাহিয়াছিল। বোধ হয় মনে মনে ঠাকুরের কাছে বরের জন্যে—" রাণীর হাসির বাণ আবার ডাকিয়া আসিল। সে ঢং আমি যদি দেখিতাম তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে পেটের ভাত তুলিয়া ফেলিতাম। দিদির যা ঢং—যেন যোগ

পূজার সং। রাণী চলিয়া গেল। ভাবিতেছিলাম—রাণী যাহাকে ঢং বলিল, সে ঢঙের চণ্ডী কি আবার বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে? .

কিছু দিন হইতে আমার একটু অসুবিধা যাইতেছে। এই সহরে আমোদ আহ্লাদ ত বার মাস ত্রিশ দিন লাগিয়াই আছে; আর ছাই যত তামাসা কিনা রাত্রিকালে। বাটীর মেয়েরা সন্ধ্যার সময় তাড়াতাড়ি মুখে দু'টা ভাত গুঁজিয়া হেলিতে, দুলিতে বেশভূষায় জগৎকে মাতাল করিয়া আহ্লাদ করিতে যান, আমি সন্ধ্যায় আহার করিতে পারি না বলিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ঠাণ্ডা, শুষ্ক অন্নব্যঞ্জন কোনও প্রকারে উদরস্থ করি। এই ভাবে অন্য সকলের পৌষ মাসে আমার সর্ব্বনাশ অর্থাৎ কি না উপবাস ও নিরানন্দ। "খেতে উপোসে হাতী পড়ে"—আমি ত দুর্ব্বল মানুষ। আজ এই নবমীর রাত্রিতে সেই ভয়প্রদ উপবাসের আসন্ন সম্ভাবনা দেখিতেছি। কারণ, আজ সহরে ভয়ানক ব্যাপার। আজ নাকি রঙ্গমঞ্চে চতুঃপ্রহররজনীব্যাপী অভিনয়ের বিপুল আয়োজন! সন্ধ্যা ছয়টায় যার আরম্ভ, কাল বেলা আটটায় তার অন্ত। সন্ধ্যায় "পেয়ারের নজর", রাত দুপুরে "চাঁদে চাঁদে", তাহার পর "মানে মানে" "কণ্ঠহার" ও রাত্রি শেষে "প্রেম পরাজয়" সর্ব্বশেষে 'জয়দেব"। রাত্রির এই ছয়খানি নাটকের নৃত্যগীতের তরঙ্গ আমাদের বাটীতে এই দিবা তিনটার সময়েই বেশ উত্তাল ঢেউ তুলিতেছে। কেহ সাজ পোষাক পরিতেছেন, কেহ এধার ওধার করিয়া হাসি মুখে ঘুরিতেছেন, কেহ ক্ষীণ কটিতে রেসমী রুমাল খানি ভাল করিয়া গুঁজিতেছেন, কেহ বা হাসিতে হাসিতে পান সাজিতেছেন, আর আমার মুখ শুকাইতেছে —আজ আমার ভাগ্যে বুঝি নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা। একবার একটু সাহসে বুক বাঁধিয়া মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলাম—"সন্ধ্যায় ত অভিনয়ের আরম্ভ হবে, তা যা' হক দু'টো ডাল ভাত বেঁধে খেয়ে গেলে হ'ত না?" অমনই আমার দুই কিশোরী ভাগনী ছুটিয়া আসিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল—"তা'হলে জায়গা পাওয়া যা'বে না যে। টিকিট-কাটা আরম্ভ হ'য়েছে সেই সকাল বেলায়, তার খবর রাখ কি?" আমার অপরাধ গুরুতর।—সকাল বেলায় যে টিকিট-কাটা আরম্ভ হইয়াছে তাহাও কিনা আমি জানি না। কি করি—সেই অবধি মহা অপরাধীর ন্যায় নীরব হইয়া বসিয়া আছি। এক ঠোঙ্গা বাজারের লুচি ও তরকারী হাতে করিয়া আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ আসিয়া বলিলেন—"সেজ ঠাকুর-পো, একটা রাত বৈতো নয়, এই খাবার খেয়ে কাটিয়ে দাও। যে পাপ হয় সে আমার।" তিনি জানেন আমি জীবনে কখনও বাজারের খাবার খাই নাই,

তবুও দয়া করিয়া আমার পাপ স্বীয় স্কন্ধে লইয়া আমাকে উহা খাইবার জন্ত আদেশ করিলেন। তাঁহাদের সুখের পথে কণ্টক হইব না বলিয়া হাসিমুখে খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া বলিলাম—"তা' বৈকি, বৌদিদি, এক রাত্রি বৈত নয়, কেটে যাবে এখন।" মুখে ত বলিলাম "এক রাত্রি বৈ ত নয়" কিন্তু মনে বড় ভয় হইতেছিল,—আমার বড় ক্ষুধা, উপবাস করিতে বড় কষ্ট হয়। বধূ ঠাকুরাণী আমাকে রাজী মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে কণ্ঠহার দোলাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আমার ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া উপবাসের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে নবমীর বাজনা শুনিতে লাগিলাম। "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।" শীঘ্রই দুই খানি গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। ছেলেরা ছুটিয়া যাইয়া গাড়ীতে উঠিল। মেয়েরা উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় দেখি হাসির রাশি রাণী আসিয়া আমার কক্ষের দ্বারে উপস্থিত। সে হাসিয়া হাসিয়া অপাঙ্গে চাহিয়া কোন মতে বলিল—"কাকু, দিদি বড় কিপ্পিন হয়েছে। পয়সা খরচ হ'বে বলে আমাদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেল না। আমি কিন্তু অমন নই। কাকু, আপনি আমায় বেশী ভাল বাসিবেন।" স্থির হইয়া সকল কথা বলিবার সময় রাণীর ছিল না,—বিলম্ব হইলে রঙ্গালয়ে ভাল জায়গা পাইবে না। ঐ টুকু বলিয়াই সে রঙ্গভবে ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই বড় বড় শব্দে শকট দুই খানি চলিয়া গেল। একটু নির্জ্জনতা পাইয়া সাবিত্রীবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাবিত্রীবালা, তুমি গেলে না?" সে মাটির দিকে শান্ত নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"না, কাকা বাবু। যে পোড়া টাকার জন্ত যুদ্ধে প্রাণ দিতে গিয়েছেন সেই টাকা অমন ভাবে নষ্ট করতে প্রাণ সরল না।" আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সাবিত্রীবালা নিঃশব্দে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সাবিত্রীর কথাগুলি আলোচনা করিতে করিতে নবমীর বাজনা বড়ই মধুর লাগিতে লাগিল। আনন্দে ছাতে গেলাম। সুনীল গগনে নবমীর চাঁদ—সেও মধুর, জগদ্ব্যাপিনী জ্যোৎস্না মধুময়ী। আজ ক্ষুধার কষ্ট বোধ ত হইলই না,—তবে সে বধূ ঠাকুরাণীর বদান্যতা-প্রভাবে নহে, সে সাবিত্রীবালার "কৃপণতা"-গৌরবে।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে নলিনীদলগতজলবৎ সকল সুখই চিরচঞ্চল। আলোকের সহিত ছায়ার স্তায় হাসির সহিত রোদন নিত্য-বিজড়িত। গত রজনীতে আমার যে সুখ ছিল, আজ এই অপরাহ্ণে আর সে সুখ নাই। বিজয়ার সহিত আমার সেই সুখের বিজয়া হইয়া গিয়াছে। আজ যখন সকলে বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য

বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গ সাজাইতেছিল, তখন সাবিত্রীর স্বামীর দেওয়া সে তুচ্ছ লাল সাটী খানিরও বুঝি বিসর্জ্জন হইয়া যায়। কিছু পূর্ব্বে সাবিত্রীর ভাই আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে বাসোরা হইতে অনৈক সৈনিক দেশে ফিরিয়া নাকি বলিয়াছে যে চন্দ্রনাথ তুর্কীর সহিত সমরে নিহত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ আমাদের সাবিত্রী-বালার স্বামী। কেন এমন হইল? সাবিত্রী সতীত্বের গৌরবে মৃত পতির প্রাণ ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। আমাদের প্রতিপ্রাণা সাবিত্রীবালার প্রাণপতি চন্দ্রনাথ কেন তবে মরিবে? তবে কি যমরাজ আর অধুনা ধর্ম্মরাজ নহেন? কতক্ষণ যে এ দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলাম, জানি না, দেখি সাবিত্রীর ভাই বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাবিত্রী কি শুনেছে?" সে বলিল—"হ্যাঁ"। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনে কি বড় কাঁদছে?" 'না, খুকী কাঁদছিল, তাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে।" এই কন্যা যখন জননী-জঠরে, তখন কন্যার পিতা যুদ্ধে যাত্রা করেন। স্বামীর দেহাবসানের সংবাদ পাইয়া সাবিত্রীবালা না কাঁদিয়া সেই কন্যাকে শান্ত করিতেছে!

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। বিজয়ার বিষাদ-মিলনের পর বাঙ্গলায় এই প্রথম সুখ-সম্মেলন। আজ ভিতরে ও বাহিরে আনন্দ। বহির্জগতে আনন্দের সীমা নাই, আর অন্তর্জগতের আনন্দও অকূল—উচ্ছ্বসিত সীমাশূন্য। নীরেন্দ্র প্রতিম নীল নভোমণ্ডলে পরম রমণীয় সুধাকর। সুধাকরের রজত-ধবল সুধাধারায় বিশ্বজগৎ পরিপ্লাবিত। সে সুনীলে ও সুধাধবলে যে মধুরোজ্জ্বল শান্ত শোভার রচনা করিয়াছে, মানব মনও সেই শোভায় শোভাময় হইয়া অমল ধবল হইয়া গিয়াছে। আর সুমার্জ্জিত, ধূপ-গন্ধসুরভিত, পূত কক্ষে চিরচঞ্চলা কমলা দেবীর চারুহাসিনী মূর্ত্তি। জননীর নয়নে, আননে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-লহর লীলা করিতেছে। সেই আনন্দ লহরে ভক্তের প্রাণ হিল্লোলিত। গৃহদ্বারে, পুষ্পপতাকাশোভিততোরণ তলে বসিয়া সানাইদার তাহার বাঁশের বাঁশরীতে স্বর্গের সুর তুলিতেছে। অমল আকাশে, শুভ্র সুধাকরে, চারু চন্দ্রিকায়, কমলার কোমল মূর্ত্তিতে সুন্দর সানাইয়ের সুরে আমার জগৎ ভরপুর। বাড়ীর উৎসব-চঞ্চল বালক বালিকার নৃত্যের তালে তালে এই বৃদ্ধের মনও নৃত্য করিতেছে, তাহাদের ছুটাছুটিতে এই জীর্ণ ভগ্ন বাণাও ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছে। এ' যেন এক নূতন জীবন,—এ' যেন বার্দ্ধক্যে পুনর্যৌবন। বুঝি এইরূপ তরঙ্গেই শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, বুঝি এইরূপ চাঁদের আলোকেই "মরা গাঙে বাণ" ডাকে! আমার এ' ভগ্ন বীণায় আবার এই মধুর ঝঙ্কার কেন উঠিতেছে, জান?

আমার এই শুষ্ক তরু আজি আবার মুঞ্জরিত কেন, জান? আমি অন্তরের অন্তরে এমন করিয়া হাসিতেছি, নাচিতেছি, গাহিতেছি কেন, জান? ঐ সুনীল আকাশ, ঐ চারুচন্দ্র ঐ আনন্দময় বালক, ঐ উল্লাসময়ী বালিকা—ইহারাও আমার নিকট তবু কিছু পুরাতন। আমার আনন্দের কারণ বলি। এই কোজাগরী মাধবী-ধবল জ্যোৎস্না মাখিয়া রাণী আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—বসোরা হইতে সংবাদ আসিয়াছে- চন্দ্রনাথ ভাল আছেন। "বল্‌তে লজ্জা করে কাকু, চন্দ্রনাথ বাবু সেই সেপাইয়ের হাত দিয়ে দিদিমণিকে ভালবাসার চিহ্ন দুইখানি মোহর পাঠিয়ে দিয়েছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার দিদিমণির আজ খুব আনন্দ। তিনি এখন বেশ হেসে হেসে বেড়াচ্ছেন?" রাণীর হাসির তরঙ্গ ঠেলিয়া আমি কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারিলাম, সে, সাবিত্রীবালা কমলার চরণে মোহর দুইটি রাখিয়া পরিপূর্ণ নীরবে ও গম্ভীরে পূজার আয়োজন করিতেছেন। রুমালে মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া ধরা আনন্দে ভাসাইয়া রাণী চঞ্চলচরণে চলিয়া গেল। তদবধি আমি আনন্দসাগরে ভাসিতেছি, তবে ত জগৎ একেবারেই পুরাতন নহে, তবে ত জগৎ অসার, অসুন্দর নহে। ঐ এক নূতন আশা। এ' এক নূতন সুখ।, এ' যে আমার নবযৌবন॥

বর্ষা যখন নামে তখন বৃষ্টির পর বৃষ্টি বৃষ্টির পর বৃষ্টি,—যাবৎ শুষ্ক পৃথিবী না প্লাবিত হয় তাবৎ আর তাহার নিবৃত্তি হয় না। শুষ্ক হৃদয়কে সরস করিবার জন্য যখন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন ধারার পর ধারা, ধারার পর ধারা—যাবৎ হৃদয় না প্লাবিত হয় তাবৎ আর সে অনুগ্রহবর্ষণের অন্ত থাকে না। সেই সপ্তমীর দিবাবসানে লালসাটীর সুখ, সেই অষ্টমীর রজনীতে দেবীদর্শনের সুখ, সেই নবমীর নিশায় কৃপণতার সুখ, সেই কোজাগর পূর্ণিমায় সুসংবাদের সুখ, -আমার হৃদয় এখন সুখে পরিপূর্ণ। আমার প্রকৃতিই এই,—যখনই হৃদয়ে কোন সুখ উপস্থিত হয়, তখনই সেই সুখ যে সুখের সামান্য আভাসমাত্র, সেই পরম সুখের কথা মনে পড়িয়া যায়,আমি সেই পরম সুখের আশায় বসিয়া চলিতে চলিতে এক পরমানন্দ-ময় রাজ্যে উপস্থিত হই। কোথাও কেহ নাই—সুধু কক্ষটি বেশ নীরব, শান্ত; আমার প্রাণও বেশ নীরব শান্ত। এই নীরবতা ও শান্তভাবের মধ্যে যখন আপন-হারা হই তখন উন্মুক্ত দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভাল করিয়া চাহিতে না চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে সাবিত্রীবালা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে সেই লাল সাটী, হস্তে শাঁখা, সীমন্তে সিন্দুর, আর চরণে অলক্তক। যেন কোথায় যাইতেছে মুখে এই ভাব। সাবিত্রী সতত গৃহকর্ম্মেই নিরত

থাকত, অবসর তাহার বড় একটা হয় না,—আজ হঠাৎ তাহাকে আমার কক্ষে দেখিয়া আমি আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই ভক্তিভরে আমাকে প্রণাম করিল। আমি করযোড়ে মনে মনে সাবিত্রীবালাকে প্রণাম করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি সাবিত্রীবালা আমার সম্মুখে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিন্তু যেন চলিয়া যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক। জিজ্ঞাসিলাম "তুমি কি কোথায় যাচ্ছ?" সাবিত্রীবালা কি উত্তর দিত তাহা জানিবার সুযোগ আমার আর হইল না। মুহূর্তে হাসিতে হাসিতে রাণী আসিয়া আমার নীরব কক্ষ মুখর করিয়া ফেলিল। রাণীর হাস্য পরিহাস ও চাপল্য দেখিয়া সাবিত্রীবালা ধীরে ধীরে বাহিরে গেল। রাণী আসিয়া সাবিত্রীর সহিতও আমাকে আলাপ করিতে দিলই না, নিজেও গল্প করিবার অবসর পাইল না। তাহার দিদির বর চন্দ্রনাথ বাবু আর সে চন্দ্রনাথ বাবু নাই,—তাঁহার এখন প্রকাণ্ড শরীর, তাহার এখন সেনার পোষাক। আমি যদি সে রূপ দেখিতে চাই তাহা হইলে আমাদের জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পারি,—রাণীর এখন আর আমার নিকট দাঁড়াইয়া সকল কথা বলিবার সময় নাই, এখনই বাসোরার গোলাপ চলিয়া যাইবে, বিলম্বে তাহাকে আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হইবে না,—এই কথা বলিয়া বালা ছুটিয়া চলিয়া গেল। কক্ষমাঝে রহিল রাণীর রুমালের [illegible] গন্ধ আর তাহার হাসির উচ্ছ্বাস। ক্ষিপ্রগতিতে আমি আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইলাম। সাবিত্রীবালা স্বামিসঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাইতেছেন,—এই দৃশ্য দেখিব না ত দেখিব কি? এ যে চিরপুরাতন তবু বড়ই নূতন, সাবিত্রী-সত্যবান—উপাখ্যানের জীর্ণ কঙ্কালে পুনর্বার জীবন সঞ্চারিত হইতেছে,—এ যে গভীর আঁধারে উজ্জ্বল আলোক, এ যে গভীর নিরাশার মাঝে পরম আশা। ইহা দেখিব না ত কি দেখিব? তাই সেই সুখ-স্বরূপের স্পর্শানুভবের নবতরঙ্গে আমি সাবিত্রী সত্যবানের পুনর্জীবন দেখিতে বাতায়নে আসিলাম। ক্ষণপরে অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা সাবিত্রীবালা নববধূর ন্যায় লাজ-জড়িত-চরণে যানপার্শ্বে দেখা দিল। সৈনিক চন্দ্রনাথ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া শকটে উঠাইয়া দিলেন। শৌর্য্য-শোভিত ও ধৈর্য্য-মণ্ডিত হস্তের মিলন, এ যে বঙ্গদেশে একটু নূতন। সৈনিক চন্দ্রনাথ শকটে আরোহণ করিলেন। শকট চালক ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া শকট চালাইয়া দিল। মুহূর্তে সাবিত্রীবালা ও চন্দ্রনাথ নয়নপথ অতিক্রম করিলেন। হঠাৎ তখন আমার পুরাতন প্রাণে একটু নূতনত্বের সাড়া পড়িল,—একটা পুরাতন সঙ্গীতের এক কলি প্রাণ হইতে ছুটিয়া অধরপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। বাতায়নে গাহিতে লাগিলাম—

"তাপসেরই বামে ব'স লো তাপসী,
রাজভূষণ ত্যজ্য করে হও গো সন্ন্যাসী।"

স্বরলিপি।

(স্রোতস্বিনীর সঙ্কল্প।)

[কথা, সুর ও স্বরলিপি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

বাউল—একতালা।

সা বা । রা পা মা গা বা গা রা

চ লে — ছি — আজ প্রা ণে ব না

। । ধা মা । গা বা সা রা পা মা

গ র সা গ ব বঁ ধু র টা — নে

পা । । | পা ধা । ধা ধা । ধা ধা ণা

— — — | আ প ন হা রা — পা গ ল

ধা । ধাণাধা পা ধা পা মা গা মাগা

পা — বা— — পি রী তি বি ভ ল—

রা । মা পা । । | মা পা পা না না

প্রা — ণে — — — | ছে ড়ে দে রে প

। র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্জা র্রা

থ ছে ড়ে দে আ মা য় গ তি কি

র্সা র্সা র্রার্সা না ণা র্সা । । । | পা র্সা ।

রো ধি তে পা বি বি — — — | হা জা র

সা র্সা র্রা সা র্সা ণা ধা পা মা

বাঁ ধ ন ধ্ব সি লে সু খু খে

পা ণা ণা ধা পা পা গা পা মা । । । |

আ র তো ফি রা তে না রি বি — — — |

সা	ঋা	জ্ঞা	রা	পা	পা	মা	মা	গা	।
তো	মা	য	দি	সে	থা	যে	তে	চা	স্
মা	।	জ্ঞা	মা	মা	গা	ঋা	সা	ঋা	পা
ব	ল	মো	র	সা	থে	ত	বে	গা	ন
পা	মা	পা	। ‖	পা	পা	ধা	ধা	ধা	।
গে	য়ে	চ	ল্ ‖	প	রা	ণ	আ	মা	র
ধা	ধা	ণা	ধা	ধা	ণাধা	পা	ধা	পা	মা
যে	তে	ছে,	আ	জি	রে—	ভ	রা	ভা	র
গা	মাগা	রা	পা	মা	পা	।	। ‖		
রে	—র	বা	—	ণে	—	—	— ‖		

অবশিষ্ট অন্তরা দুইটির সুর প্রথম অন্তরার অনুরূপ।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

জাতিভেদ, চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগ, শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, জল চল ও খাদ্যাখাদ্য-বিচার— শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও সিরাজগঞ্জ "আয়ুর্ব্বেদ শান্তি" কুটীর হইতে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই চারিখানি পুস্তকে আমাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে পড়িবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক জিনিস আছে। যাহারা শুধু তিনগ্রন্থি পৈতার জোরে ব্রাহ্মণ সাজিয়া অপরের নিকট হইতে পূজার দাবী করিয়া বেড়ান; পরকে ছোট করাই যাঁহাদের বড় হইবার একমাত্র উপায়, তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক গুলি বিভীষিকাময়। তাঁহারা যে পৈতা ছিঁড়িয়া গ্রন্থকারকে শাপ দিবেন' ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমে তথা-কথিত উচ্চবর্ণের শ্রীচরণতলে দলিত ও মথিত হইয়া আসিতেছে, যাহারা চিরদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, যাহারা সমাজের সেবা করিয়া পুরস্কার স্বরূপ লাথি ঝাঁটা পায়, যাহাদের বুক ফাটা কান্না মুখে ফুটিতে পায় না—তাহাদের নীরব প্রার্থনার যদি কোন মূল্য থাকে তাহা হইলে, গ্রন্থকার

ভগবানের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। সামাজিক বর্ণবিভাগ যে মানুষেরই সৃষ্টি, এবং প্রথমে যে আদর্শ লইয়া সমাজ গঠিত হইয়াছিল, অভিজাত-বর্গ অহংকারের বশে যে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে, গ্রন্থকার অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা অহঙ্কারের বর্ম্ম পরিয়া সমাজের চূড়ায় স্ফীতবক্ষে বসিয়া আছেন, নীতি-কথা যে তাঁহাদের কঠিন চর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, এ দুরাশা আমাদের নাই। তবে নূতন সমাজ গঠন করিয়া বাঙ্গলায় যাহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন-প্রয়াসী সেই বজ্র-কঠোর ও পুষ্পকোমল-হৃদয় যুবকবৃন্দকে আমরা এই পুস্তক কয়খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরুণাচল মিশন।

বঙ্গদেশে সেই শ্রীচৈতন্যের বঙ্গদেশে আজ সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গ আসিয়াছে। আজ বাঙ্গালীর সমগ্র জীবন আবার ভগবন্মুখী। "সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন।" বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথা স্মরণ কর। ঈশ্বর কি? জীবনের সকল খরস্রোতা যে সাগরসঙ্গমে আপনাকে হারাইয়া চরিতার্থ হইবার জন্য কলস্বনে বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই পরম তত্ত্ব। যখন একই চূড়ান্ত সার্থকতার মোহন ছন্দে সমস্ত জাতীয় জীবন—সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জীবনও গাঁথা তন্ময় হইয়া নর্ত্তিত হইয়া উঠে, তখনই সামঞ্জস্য আসে।

কেন এমন হইল—কেন আজ বাঙলায় সে সামঞ্জস্য আসিতেছে বলিতে পার কি? জগৎসার দয়ানন্দ, পাবনার অনুকূল, ফরিদপুরের জগদ্বন্ধু, নবদ্বীপের ললিতা সখী কুমিল্লার ত্রিপুরের মা বাঙলার অরবিন্দ—কত বলিব?—কত উৎসব হইতে প্রেমামৃত উছলিয়া উঠিয়া বঙ্গদেশ যে ডুবাইতে চলিল! কে ঐরাবত আছ, এস এ শিবজটাবাহী মৃতসগর-সন্তান-সঞ্জীবক পাবন গঙ্গাস্রোত রোধ করিবে, এস। তোমাদের পাশ্চাত্যের শেখা রাজনীতি বুঝি টিকিল না। "এ জীবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?

"ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরুণাচল মিশন" পড়িতেছিলাম। কোন অনামী সাধক ইহার গ্রন্থকার, উৎসর্গপত্রে তিনি বলিতেছেন, "উন্নতি লাভের জন্য এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু "এহো বাহ্য আগে

আগে" চল, অমরধামে—"। অমৃতই এ যুগের সাধ্য, * * তন্নিমিত্ত নিঃশেষে দেহ মন ও আত্মা সমর্পণই এ যুগের সাধনা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভই এ যুগের সিদ্ধি। তোমরা সিদ্ধ হইয়া ভারতকে জাগাইবে, ভারত সিদ্ধ হইয়া জগৎকে জাগাইবে।"

দয়ানন্দ বলেন, "মনুষ্যত্ব দেখিয়া বিচার করিবার শক্তি এখন প্রায়ই মানুষের নাই। মালা তিলক গৈরিক ইত্যাদি বাহিক বেশভূষা দেখিয়াই লোকে সাধুতার বিচার করিতে বসে। এ স্রোত ফিরাইতে হইবে, খাঁটি মানুষ গড়িতে হইবে।"

"কেবল তাঁকে মা মা বলিয়া ডাক, আর কিসের সাধন ভজন? ভগবানের প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকে, মাছ মাংস খাও, যাহা ইচ্ছা কর কিছুতেই পতন হইবে না। অভিমান ছাড়া আর কিছুতেই সাধকের পতন হয় না। কামিনী কাঞ্চন না ছাড়িলে যদি ধর্ম না হয়, তবে জগতের কোটী কোটী লোক কখনই ধর্মপথে আসিবে না। ভোগ ও তাঁহার ত্যাগও তাঁহারই। প্রাণের ভিতর যদি তাঁহারই আলোক জ্বলে, প্রতি কার্য্যের মধ্যে যদি তাঁহারই সাক্ষাৎ দেখা যায়, তবে ভোগও বন্ধন হয় না। অনাসক্ত ত্যাগ, অনাসক্ত প্রকৃত সন্ন্যাস।

নারীজাতিকে অবগুণ্ঠনের আড়ালে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিলে, তাহাদের শরীরের যেমন উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না, দেহ রোগের আধার হয়, তেমনি তাহাদের মানসিক বলপ্রকাশ শক্তির সঙ্কোচ ও মানসিক অস্বচ্ছতা।"

দয়ানন্দের আশ্রমে নারীর "অবগুণ্ঠন উঠাইয়া দিয়া, কর্ম্মের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আনিয়া," মুক্তির মাঝে পুরুষের পার্শ্বে তাহাদের শক্তি উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করা হইতেছে। "অমৃত মন্দির" নামক গ্রন্থে আছে, এখানে নারী সত্যই দেবী। নারীকে পরমার্থ বলে শক্তিময়ী করিতে গিয়া অপযশ ও অপবাদে তাঁহাদের অত নিগ্রহ হইয়াছিল। নারীর শক্তি দর্শনে ক্ষিপ্ত হিন্দুসমাজ পুলিশে এই মিথ্যা সংবাদ দেয়, যে, ইঁহারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী। এইরূপ প্রতারিত পুলিশের দ্বারা আশ্রমবাসী স্ত্রী ও পুরুষ সাধকদের উপর যে সমস্ত ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী এই পুস্তক খানিতে বর্ণিত আছে।

দয়ানন্দের প্রচারের দুইটি দিক,—নারীর জাগরণ ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম সর্ব্ব-ভাব সমন্বয়।

মোসলেম-ভারত।

মায়ের পাদপদ্মে নূতন সন্তান দলের এ দ্বিতীয় অঞ্জলী ; জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা। রবীন্দ্রের ইউরোপ যাত্রায় কুমুদরঞ্জনের কবিতাটির বলিবার কথা আজ রাজনীতি-পাগল বাঙ্গলায় ক'জন বোঝে। "যেথায় তোমার স্বাধীন মানস শঙ্কা দেখায় শঙ্কারে", এই সত্য ভারত যে দিন বুঝিবে, সেই দিন এ শবদেহে জীবন ফিরিবে। যে জীবন্ত, 'অন্তরের যার সর্ব্ববন্ধন' ঘুচিয়াছে, তাহাকে বাঁধে কে! সাগরকে বেড়িবে কোন্ রজ্জু দিয়া কত কোটী যোজন শৃঙ্খলে ? দেবতার চরণ পূজিতে পথ পাইবে না, তাহার বৈরী হইবে কখন ? পশুকে জয় দেবতাই করিতে পারে, কারণ পশু যে তার বাহন।

"বাঁধনহারা" বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস—অবিবাহিত দ্বিপদ ; বিবাহিত চতুষ্পদ,—"একেবারে মাটির সঙ্গে জয়েন্। তারপর দৈবক্রমে যদি একটি সন্তান এসে জুটল, তা' হ'লে হ'ল সে একটি ষট্‌পদ মক্ষিকা—সর্ব্বদাই আহরণে ব্যস্ত। আর একটি বংশবৃদ্ধি হ'লেই অষ্টপদ পিপীলিকা * * * তারপর নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত গিন্নী যখন এক বস্তা সন্তান প্রসব করে ফেললেন, বেচারা পুরুষ তখন হয়ে গেল, একেবারে বহু পদ বিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো। কোন বস্তু নেই—ছুঁলেই জড়সড়!" বাঁধন-হারার বর্ণনাটি খাঁটি কবিত্বে মোহনীয়—"আবার যেখানে ইচ্ছা করে ধরা দিতে গিয়েছিস, সেইখানেই কার নিষ্ঠুর হাত এসে তোকে * * মুক্ত করে দিয়েছে। সে কোন্ চপল যেন তোর খেলার সাথী। সে কোন্ চঞ্চলের যেন তুই ছাড়া হরিণ!" মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তাহার পর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন জলতরঙ্গ আছে—উপমাগুলি মন মাতান।

নবযুগের কথা—"আজ আমরা * * নূতনের আশায় বাহিরের পথে নামিয়াছি। বাতাসটা কোনদিকে বহিতেছে, আকাশে মেঘ আছে কিনা, গগনে কতটুকু বেলা, তার খোঁজ করা দরকার। তাই এ নবযুগের কথা।

সকলের মধ্যে যে চিরন্তন সেই ভাঙে গড়ে—সত্যকথা। মানুষ ভাবে আমি গড়ি। তাই সে পুরাতনের মায়ায় পড়িয়া নূতনকে অভিসম্পাত করে। অতএব অতীত বর্ত্তমানের পাথেয় দিতে পারে না, "কাজের জিনিসটা হারাইয়া শেষকালে অকেজো জিনিস লইয়া টানাটানিই সার হয়।

আজ "গগনে পবনে একটা নূতন যুগের সাড়া পাই * * আমাদিগের

প্রাণের ভিতরকার নিত্য-ঝঙ্কৃত সুরের সঙ্গে তাহার সঙ্গত করি। মিথ্যা যাহা

* * *

তাহা ক্ষণস্থায়ী. মিথ্যার আড়ালে যে সত্যটা গোপন রাখা হয়, সেইটাই চিরন্তন।" মিথ্যার পঙ্কে সত্যের কমল 'বুঝি আজ ফুটিবে।' না ফুটিলে যে উপায়ান্তর নাই, নব শতদলের বটপত্র আমাদের গতি কি হইবে? আমরা যে আজ "বিশ্বের নিত্যকালের শাশ্বত ... সাধ দিব, কহিব তোমার আহ্বানকে আমরা হেলায় যাইতে দিই নাই।"

ঠিক বলিয়াছ ভাই, আজ একটি "চরম ও পরম" লক্ষ্য স্থির করিয়া জীবনের বসন্তের "রঙীন স্বপ্ন" দেখিতে হইবে। এটা যে পাগলের যুগ, সোজা মানুষের দিন গিয়াছে। সুসাধ্য সাধন ফুরাইয়াছে। যে স্বপ্ন দেখিতে ভয় পায় না, সেই পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইতে পারে, মূককে বাচাল করে। তবে এস ভাই আজ সকলে মিলিয়া মরা বাঁচাইবার বল ধরা সেই ত্রিলোকস্পর্শী ডাক দিই, মৃত প্রাণাঙ্গন সজীব হউক। চিরন্তনের সত্য বন্ধনে সকল বন্ধন টুটিয়া যাক, "বাঁধন হারা"র মগন মুক্তিতে ও প্রেরণায় সিন্ধু বুকে বাসনার মুক্তি লয় হউক, লয় হউক।

উপাসনা নব পর্য্যায়।

এই যুগ্ম মোহানায় সাগর-বঁধুর অপার নীল বুকখানি দেখাইবে বলিয়া উপাসনা নব পর্য্যায়ে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। আলোচনীর শেষ কথা অমোঘ সত্য—"চক্ষে অভিসার রজনীর নিবিড় অন্ধকারের কজ্জল এবং ভালে চির-নবীন পঙ্কতিলক ধারণ করিয়া, * * আমার শ্যামায়মান বনাস্তরালে স্বামুশুভ্র প্রস্তর বেদীর উপর নবনীরদ শ্যাম বিদ্যুতের চূড়া পরিয়া চির কিশোরের লীলা দেখাইব।" কিন্তু চির কিশোরের মুখে এমন স্থবির অথর্ব্বের কথা কেন? বঙ্কিমের নিবিড় রসসৃষ্টি কুন্দনন্দিনী যার ভাল লাগে না, সে কিসের তরুণ? "শুধু বিলাস ভোগ" বাঙ্গালীর থাকিলে ত বাঁচিতাম। নিত্য উপবাসী জীর্ণকন্থা কপর্দ্দকের কাঙালকে আর উপবাস কৃচ্ছ্র সাধন শিখাইও না, দু'টা ভরা জীবনের সুখ সমৃদ্ধির কথা শিখাও। তামস সাত্ত্বিকতা আমাদের সাজে বটে, রাজসিক জীবনের উদ্দাম শক্তিক্ষুব্ধ গতি দেখিয়া ভয় সহজেই হয়, কারণ আমরা যে সত্ত্ব হইতে তমে নামিয়া ঠুনকো মুক্তি চাহিয়াছিলাম।

এই নীলাম্বরের উৎসবমুখর রাজ-অঙ্গনে বাঙ্গালীর নদের গোরা শ্রীচৈতন্যের

ভাবে ভোলা নৃত্য যে সৃষ্টির লয়ে বাঁধা ; এ নৃত্যে কত ছন্দে কত নব বিভঙ্গে কত রস উঠে একবার বুঝিতে পারিলে হয়। সে মন্দির—কভু কান্ত কমনীয় কভু রুদ্রভীষণ কভু তুরীয়ানন্দতপ-নিরত বৈচিত্র্য জীবন্ত লীলার নীচে গোপন সৃষ্টির যুগ সঙ্গীত কি শোন না? কে আনিয়াছিল এ ভারতে বাঁধভাঙ্গা পশ্চিমে বান? বাঙ্গলা নহে কি? কে বাজাইয়াছিল ঘরে ফিরিবার-উৎসব-মঙ্গল মোহন মধুর বেদান্ত মৃদঙ্গ? সেও তো বাঙ্গালারই বাসন্তী-চন্দন দেবেন্দ্রনাথ। নব গায়ত্রী বন্দে মাতরমের ঋষি কি পঞ্চনদবাসী? হিন্দুত্বের নবনাবিস্মৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা ভূদেব চন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ কি মহারাষ্ট্রের লোক? আর এই এ যুগের বাঙ্গালীর আনা কাল বৈশাখীর পূর্ব্বের সেই মানবীশ্বর পূর্ণিমার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ চন্দ্র কোন আকাশের কোল আলো করিয়া উঠিয়াছিল বল দেখি? এখনও কি সে চাঁদ ডুবিয়াছে? এখনও যে নব উষার নব স্বপ্ন বাঙ্গলা দিবে বিশ্বাস না হইতে পারে। কাল বৈশাখীর আগের দিনও কি বুণাক্ষরে জানিত না বিশ্বাস করিতে কালিকার দিনে ভারতের আকাশ রাঙাইয়া প্রলয়াত্মক ঝড় উঠিবে?

"ভাব নিধির ভাব হবে নৈ কি রে!" মৃতসঞ্জীবন স্পর্শ আমরা চিনি না, চিনি শুধু সেই বসন্তের আনা ওইটা ভালাটে পাতার শোভা। আজ পঞ্চনদ মহারাষ্ট্র যে স্বদেশী করিতেছে সে কথা বলিতেছে, কত বৎসর আগে তা' রামমোহনের জাতি বলিয়াছিল। আজ বাঙ্গালীর গঙ্গায় যে ভরা জীবনের বান ভ'রে ডুবাইয়া আসিতেছে, তাহাও বুঝি ভারতের আঙ্গিনা হইতে অত বৎসরই লাগিবে।

যে দেশে উচ্চচূড় হিমাচল আছে, সেই দেশেই গভীর খাদ উৎরাইও পাওয়া যায়। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে তাহাও দেখিবে। মাড়ওয়াড়ার ব্যবসাবুদ্ধি থাকিতে পারে, বোম্বাইয়ে কর্ম্মনৈপুণ্য থাকিতে পারে, পঞ্চনদে জড়পিণ্ডের পেশীর জোর থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতিভার বাঙ্গালক ললাটে লইয়া বেহিসাবী ভাবের পাগল কোন্ জাতি বিদ্যুৎভরা মেঘের মেঘে পুনঃ পুনঃ ভাবতাকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে? তবু আলোচনার শেষের দিকে এই বাঙ্গালীর "নিতুই নব" প্রাণের কথাই আছে; তাহা পড়িয়া বড় সুখ হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্তের "ভাবধার কথা" তরুণ বাঙ্গালীর পাথের—জীবন পথে চলিবার আঁধার নাশিবার রংমশাল। শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টের "সর্ব্বজয়া"র তুলনা নাই। "এমন কি কারু হয়েছিল যে সুখই কারু সইল না—দুঃখের টানে দুঃখের বাঁশী শুনে দুঃখকে পাবার জন্য কেউ কি বেরিয়েছিলেন।" বিভূতি বাবু

আশীর্বাদ করুন বাঙ্গালী যেন তাই বেরোয়; এ জাতির সুখ আরাম তে-মহলাপুরী মটরগাড়ী মিলের ক্রোড়পতিত্বের সুখ যেন না সয়। সত্য সত্যই দুঃখ মানুষকে জাগিয়ে রাখে, ঘুমাতে দেয় না, জীবনের সৈঞ্জ "সে যে না চাওয়ায় ধন, সে যে দুঃখ।" 'সব হারানর পথে' ভৈরবের ভিক্ষার ঝুলি' কাধে দাঁড় করায় প্রভাতী ভৈরবীই বটে। 'এ মাণিক আমায় পেতেই হবে, সুখে স্বাচ্ছন্দ্য পেট ভরলে ভুমার সন্ধানে 'চির অপ্রাপ্য সাত সমুদ্র...' খুঁজতে যেতাম কি? বিভূতি বাবু স্বার্থক শিল্পী, যেমন ভাবুক তেমনি চিত্রকর। "রতনকুলি" সাবিত্রী প্রসন্নের লেখা, কলের মজুরের দুঃখে দহা জীবনের করুন ছবি।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

অরবিন্দের ভাবকণা।

একজন বিশেষ নিয়ন্তা আছে এ কথা ভাবতে কারো কারো বাধে, নিজেকে ভগবানের হাতের যন্ত্র ভাবাটা তার কষ্টকল্পনা বলে বোধ হয়, কিন্তু আমি ত দেখি প্রত্যেক মানুষের নিয়ন্তা তার নিত্য সহচর হয়ে রয়েছে, ভগবান্ যে শিশুর মুখে আধ আধ ভাষার কথা কয়, সে যে চাষার হাতের কোদাল দিয়ে কাজ করে, ঘুরে ফিরে এই ত কেবল আমার চোখে পড়ে।

যে-ভরা-ডুবীতে সবাই ডুবেছে ও ডুবছে, ভগবান্ কেবল সে তাই থেকে আমায় বাঁচায় তা' নয়; ঝড় তুলি সাগর বুকে সবাইকে বাঁচিয়ে ধু ধু রিক্ত মহাসিন্ধুতে আমার অবলম্বনের শেষ কাঠটুকুও যে ছিনিয়ে নেয়, সেও যে ভগবান্।

দুস্তর চেষ্টা ও দুঃখের দান অনেক সময় জয়ের আনন্দের চেয়েও বেশি; তবু জগজ্জয়ে বেরিয়ে কুশের চোখে বাঁধা-বাঁধা বিজয় মুকুটই চাইতে হয়।

যে মনে উচ্চাকাঙ্খা নাই, সে ত ভগবানের নিন্দা স্বষ্টি; কিন্তু জড়ের দেবতা (Nature) এই ব্যর্থ মনগুলি পেয়েছে সুখী এবং তাদের বংশবৃদ্ধি করেই প্রকৃতির আনন্দ, কারণ তারাই জড়ের রাজ্য বজ্রত চিরস্থায়ী করে রাখে।

দরিদ্র, অজ্ঞ, কুশিক্ষিত বা হীন কুলে জাত যারা, তাঁদের ইতর সাধারণ বলে না। যারা তুচ্ছ বস্তু ও মামুলী জীবন নিয়ে পরম নিশ্চিন্ততায় দিন কাটায়, তারাই সে নামের যোগ্য।

মানুষের সহায় হতে পার হও, কিন্তু তাদের শক্তিতে দীন করে দিও না, তাদের

প্রতি জনের জীবনের বিশিষ্টতা ও ধারা যেন তোমার স্পর্শেও অক্ষুণ্ণ থাকে; অপরকে নিজের কাছে চাও ত টেনে নিও, কিন্তু বিনিময়ে যেন তাদের পরম দেবত্বটুকু ফুটিয়ে তুলো। যে তা' পারে, সেই নেতা বা দীপারী,—সেই গুরু।

ভগবান এ সংসারকে রণপাগল যোধগণে ভরা রণক্ষেত্র করে রেখেছেন—এ ভূমি মহা কোলাহলে ভীম প্রয়াসে মুখর। সে নিত্য কুরুক্ষেত্র ধাম থেকে তুমি বিধিনির্দ্দিষ্ট মূল্য না দিয়ে পরম শান্তি চুরি কর্‌বে?

চূড়ান্ত সার্থকতা যদি পাও, তবে এই বুঝো তা'তে কি একটা গলদ আছে। কিন্তু সফলতার পরও যদি দেখ হাতের কাছে কাজের স্তূপ জড় হয়ে উঠেছে, তা' হ'লে মহানন্দে এগিয়ে পোড়ো। কারণ প্রকৃত পূর্ণতার পথে যে অনেক শ্রম মহা আয়াস রয়েছে—সে যে দূরের পাল্লা।

পথে বিশ্রামের আলস্যে ধীরগতিতে কাল হরণ করা বা পথের ঘাঁটিকে গন্তব্য বা লক্ষ্যস্থল বলে ভুল করার মত শক্তিহারী সর্ব্বনাশা ভ্রান্তি আর নাই।

"আর্য্য।"

পাত্র আবশ্যক।

মেয়েটি বার বৎসরে বিবাহ হইয়া তেরয় বিধবা হইয়াছে। জাতিতে বৈদ্য। যাহার সহিত বিবাহ হয় তাহার ছিল দুশ্চিকিৎসা ব্যাধী, বরের পিতা তাহা গোপন করিয়া রাখেন। মা বাপের আদরের কন্যা স্বামী কি ধন বুঝিল না, এই বয়সে জীবনের তার ভরা হাটে আগুন লাগিয়া গেল। কন্যা দেখিতে সুন্দরী; কোন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত যুবক এই কন্যারত্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে নারায়ণ অপিসে সংবাদ লউন।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৭ সাল।

হাসিয়ে দিলে।

[শ্রীকিরণচন্দ্র দরবেশ]

হাসিয়ে দিলে এবার ওরা,
হাসিয়ে দিলে ভাই,
সোনার সারা বিশ্ব জোড়া
কেবল নাকি ছাই!
কেবল খানিক ছাই রে,—ওরে
কেবল নাকি ছাই!
হাসিয়ে দিলে এবার মোরে,
হাসিয়ে দিলে ভাই!
তুমি আমি বাধু বুধু,—
আছি কেবল শুধু শুধু,
যত প্রবীন জায়গা জমীন্
তিলেক নাইকো ঠাঁই;
মদির বাতাস, উদার আকাশ,
তরুণ উষার অরুণ বিকাশ,
এ সব নাকি ভুলের প্রকাশ!—
কিছুই ইহার নাই।
হোঃ হোঃ হোঃ হাসিয়ে দিলে,
হাসিয়ে দিলে ভাই!

সৎ কি অসৎ—ভালো মন্দ,
মুক্ত কিম্বা নিছক বদ্ধ,
নাক কাণ আর আঁখির দ্বন্দ্ব,—
সন্দেহ তো নাই;
দেখ্‌চ যা' তা' সবই মিছে,
যা' দেখনি তাই যে আছে,
বুঝতে হবে আঁচে আঁচে
সবই পাঁচের চাঁই।
হোঃ হোঃ হোঃ হাসিয়ে দিলে,
হাসিয়ে দিলে ভাই।
বিরাট বিশাল শূন্য জুড়ে'
তুমি-আমি বেড়াই ঘুরে,
অ-কার আ-কার সব একাকার,
কে কার কিসের সাঁই?
আমরা নাকি পরম-ব্রহ্ম।
সেইটে জানা-ই চরম ধর্ম্ম!!
দেখে' নিজের মর্ম্ম-কর্ম্ম
ভরসা কিন্তু নাই!!!
হোঃ হোঃ হোঃ হাসিয়ে দিলে,
হাসিয়ে দিলে ভাই!

গোষ্ঠবিহারী।

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।]

বসুদেব কংসভয়ে, জন্ম রাত্রিতেই গোপরাজ নন্দের ঘরে, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সেইখানে মা যশোদার স্নেহে, নন্দের তত্ত্বাবধানে সুন্দর নন্দদুলাল দিনে দিনে বেড়ে উঠ্‌ছিলেন। তাঁকে কোলে পেয়ে নন্দরাণী আর সব বিস্মৃত হ'য়েছিলেন।

কাজ-ভুলনে দুলাল আমার বস্‌লে এসে কোলটি জুড়ে,
রচি তিলক, পরাই কাজল, দুধ মুখে দি' ঝিনুক পুরে।
দুধে ভরা যত কড়া, বলক ধরে উত্‌লে পড়ে,
উঠ্‌তে গেলে পাগল ছেলে, কেঁদে কেঁদে জড়িয়ে ধরে;
আবদারে তার রাণী হারে, হয়না যাওয়া, একটু দূরে॥
দেখে বৃথা অপচয় প্রাণে বড় ব্যথা হয়,
তিলেক যদি উঠে চলি, রক্ষা তবে নাহি রয়,
মাটীর পরে আপ্‌সে পড়ে, কাঁদন তুলে আটাস ধরে,
সেই কাঁদন বাজে, নূপুর বাজে, সকল পুরের অন্তঃপুরে॥
(মোর নিরালা অন্তঃপুরে॥)

এখন তিনি আর ছোট্টটি নেই, মায়ের কোলে শুয়ে থাকা, ঝিণুকে করে দুধ খাওয়া, ক্রমে বয়মর হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ান, তার পর টল্‌মল্ হাঁটতে হাঁটতে চৌকাঠ পার হ'য়ে যাওয়া, সিঁড়ি উঠ্‌তে নাম্‌তে পড়ে আছাড় খাওয়া, কেঁদে আটাস্ ধরা, দিন রাত সেই ধর্ ধর্ রাখ্ রাখ্, গেল গেল অবস্থা কাটিয়ে উঠে, এখন সবল সুস্থকায় সুন্দর তরুণ বালক। তবে এখনও তাঁর কাজল পরা, অলকা তিলকার সজ্জা শেষ হয়নি; তাঁর গলায় হার, কর-প্রকোষ্ঠে বলয়, রাঙা পা-দুখানিতে নূপুর এখনও বজায় আছে। শুধু খসিয়ে নেওয়া হয়েছে নাকের নোলক, আর সোণার বোর কোমর পাটা। মা, তাকে এখন সোণার রংএর পীত ধটী পরিয়ে দিয়েছেন। যশোদার কন্যা তো নাই, তিনিই সবে-ধন নীলমণি, তাই এই একমাত্রটিকে সাজিয়ে মায়ের সাধ আর মেটে না। কত রকমেই সাজান—কপালে চন্দনরচনা; নবকদলী-পত্রাঙ্ক, চন্দ্রকলার মত সুন্দর সেই শ্যাম-

ললাটে অমন মলয়ত্র বিন্দুগুলি কি শোভাই ধারণ করে। আবার তার মাঝে মাঝে রক্তচন্দন আর কৃষ্ণাগুরুর লিখন, তাদের শুভ্রতা আরো স্ফুটতর করে দেয়। এরি চারিদিকে কুঞ্চিত কুন্তল গুচ্ছের বেষ্টনী তিলক পুষ্পের ভ্রমরপুঞ্জের ললিত-কজ্জল শোভার চেয়েও মনোহর। সুগঠিত নাসার উপর একটি বিমল ধবল চন্দন রেখা, ক্রমে স্থূল হতে সূক্ষ্ম হয়ে এসেছে, সেই নাসিকার গঠন-পারিপাট্য যেন অবাক হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে। কিশলয়কোমল আরক্ত অধর, হাসি আর কলবাক্যই তার সৌন্দর্য্য; যখন বাল সুলভ সরল হাস্যে, অকারণ নিরন্তর আনন্দে সেই বিম্বোষ্ঠ দুখানি ঈষৎ অবারিত হয়ে, নবোদ্ভিন্ন দন্তগুলিকে শুভ্র মুক্তাবলীর মত প্রকাশ করে, তখন চোখ আর ফেরে না। চিবুকে, কপোলেও মা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। অরুণ-শিরা-তন্তু রঞ্জিত, সুকোমল সুগোল একখানি গালে একটি কৃষ্ণ টীপ, আর চিবুকের উপর রক্তচন্দনের একটি ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত করে দেন। কোকনদ-রাগ একটি গণ্ড শুধু আপন সৌন্দর্য্য অব্যাহত প্রকাশ করে, মা তাতে বারংবার চুম্বদান করেন। যত দিন গোপাল হাঁটতে শেখেন নি, তত দিন মা তাঁর ললাটে শিখিচূড়া বেঁধে দেন নাই,তখন শুয়ে থাকা আধ হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবার অবস্থা, তখন কপালের চুলগুলি একত্র করে সরু একটি বিনুনি গেঁথে, ছোট্ট একটি সোণার পুঁটে তাতে বেঁধে দিতেন। কিন্তু যে দিন হতে গোপাল ভাল করে চলতে শিখেছেন; সেদিন হ'তে তার চুলের উপর ময়ূরপুচ্ছ বেঁধে দিয়েছেন। যে দিন হতে বালক প্রথম অকম্পিত পাদ-ক্ষেপে সমর্থ হয়েছে, সেই দিন হ'তে মা তার মাথায় বিচিত্রবর্ণ বিচ্ছুরিত আলোক শিখার মত এই কলাপ-মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। উত্তর কালে তাঁরই যত্নপালিত এই পুত্র যে অখণ্ড রাজত্বের গৌরব অধিকার করবেন, এ যেন তারই সূচনা। ঐ যে তিনি গর্ব্ব-ভরে, গ্রীবা বঙ্কিম করে চলে বেড়ান, ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ান, তার সঙ্গে শিখি-চূড়ার এই হিল্লোল দোলনি, সব হেলা করা এই দৃপ্ত ভাবটি দিব্য মানায়।

যে দিন হতে বৃন্দাবনে শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, সে দিন হতে তাঁর ভালবাসবার লোকের অভাব হয়নি, যে কেহ সেই সুন্দর মুখখানি একবার দেখতো, সেই ভালবাসায় পড়ে যেত; পুতনার মত রাক্ষসী মারতে এসে, মরে পড়ে গেল। এমন দেখাই সে দেখলে, তার আর বাঁচা হ'ল না। সেই দুলালের খেলায় সাথীর অভাব কি হয়? পাড়া-পড়োশির সব ছেলেরি খেলার আড্ডা যশোদার ঘরে। রাত দিনই হুটোপুটি, ছুটোছুটি, লম্ফ ঝম্পের উপদ্রব, মন্থনী-দণ্ডের অপব্যবহার, আর দধিভাণ্ডের দুর্গতি নিরন্তই ঘটছে। একা মা এ দস্তির

দলকে সামলে উঠ্‌তে পারেন না। নন্দের কাছে নালিশে কোন ফল হয় না। যিনি মূর্ত্তিমান্ আনন্দ, তিনি কি কাউকে বেদনা দিতে পারেন? কিন্তু যশোদাকে মাঝে মাঝে এ কাজ করতে হয়। তিনি যে মা, তাঁকে যে পরিমাণ রক্ষা করতে হয়, মাত্রা অতিক্রম করা তাঁর সাধ্যের অতীত। আর তিনি যে সন্তানকে যশোদান করেন, তাই শাসনও তাঁকেই কর্‌তে হয়, কখনো উদূখলে বন্ধন, কখনো বা মন্থন দণ্ড দিয়ে তাড়না। গোপালের সঙ্গীরা কিন্তু শুধু ঘরেই খেলা করে না, তারা মাঠেও গরু চরাতে যায়। বনের ধারে কত কি দেখে, ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য, কুরঙ্গের ক্ষিপ্র গমন, বন্যগর্দ্দভের দুঃসাহস, ভুজঙ্গের সুন্দর ফণা আন্দোলন, তার লোল গতি আর চক্ষের দৃষ্টির অদ্ভুত আকর্ষণী। সেই মাঠে কেমন ফুলে ভরা কোমল ঘাসের বিছানা, বনের মাঝে লতাকুঞ্জের কি শোভা, কি শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া, পুষ্পের কি অপূর্ব্ব সৌরভ, পাখীর গান কি আশ্চর্য্য সুমধুর, তার প্রতি ঝঙ্কারে কেমন অজানিত অশেষ নীল আকাশের বারতা নিয়ে আসে। আর গাছে গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল, সুপক্ক অর্দ্ধ পক্ক-সেকি মনোহর বর্ণ, কত সুস্বাদু, কেমন মিষ্টরসে ভরপূর। গোবিন্দনাথ প্রতিদিন শোনেন আর মন তাঁর চঞ্চল হয়। প্রতিদিন মায়ের কাছে গোবিন্দের আর সখাবৃন্দের আবেদন নিবেদন চলে, "মা গোষ্ঠে যাব," "মা গোষ্ঠে যেতে দাও"। কিন্তু রাণী কিছুতেই মন স্থির করতে পারেন না, কেবলি মনে হয়, এখন গোপাল বড় ছোট; শক্ত কাজ পারবে না, কোথায় পড়বে, কোথায় হারান গাভী, বৎসের সন্ধানে গিয়ে পথ হারাবে, কি হবে, কে জানে? তবুও তিনি জানেন, যেতে দিতেই হবে; সে দিন নন্দনের রাখাল-সজ্জায় কোন অভাব যাতে না থাকে, তার জন্য মোহন মুরলী আর পাঁচন নড়ি, আগে হতে গড়িয়ে এনে তুলে রেখেছেন, যাত্রার দিনে নিজে হাতে দিয়ে দেবেন। বাঁশরীর সুরে গোপালের হারান গাভীকে ফিরিয়ে আনা হবে, নড়ির তাড়নায় বিপথ কুপথ-গামী গো-কুলকে পথ দেখাবেন। রাণীর মন ঠিক করা আর হয়ই না, আর এ দিকে দুলালের উপদ্রবে বৃন্দাবনবাসী দেশছাড়া হবার পথে দাঁড়িয়েছে। ঐ তিনি পথে কারো দধিভাণ্ড ভেঙে দিচ্ছেন, কোন গোপিকার ঘরে যত্নসঞ্চিত নবনীতটুকু চুপি চুপি নিঃশেষে চুরি করে খাচ্ছেন। আভীরগণ ভারে ভারে দুগ্ধ-কলস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—তাদের বড় ত্বরা, তারা শীঘ্র যাবে, হাটের সময় হয়ে এল বলে; এদিকে দুষ্ট ছেলেটি তাদের চলবার পথ পিচ্ছিল করে রেখেছেন, তারা যেমন দৌড়ে যাবে, অমি পথে গড়াগড়ি, ভাঁড় ভেঙে দুধ স্রোতধারায়

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ; রঙ্গ দেখে, নন্দলাল হাসতে হাস্তে বেঁকে পড়ছেন, তাড়া করলে গাছে উঠে মুখভঙ্গী করে বিদ্রূপ করছেন, আর তর্জ্জনী উদ্যত করে বলছেন, বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, যেমন আমায় না দিয়ে, নিয়ে পালাচ্ছিলি, ভাঙবে না ভাঁড় অম্নি যাবি ভেবেছিস্, পাওনা না দিয়েই পালান, কোথাকার চোর সব! অনুযোগ. অভিযোগ, অনুরোধ. বিরোধে শান্তপ্রকৃতি নন্দরাজ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। রাণীকে এসে বল্লেন, করছ কি? ছেলেটির উপদ্রবে দেশের লোকে যে ঘরছাড়া হবার উপক্রম। অবুঝ বালক, শিশুমতি, কাজ না পেলে অকাজ করে বসে, তাকে গোঠে পাঠাও, সে আপন কুলের কাজ করুক। আর দ্বিধা করা চলে না, যশোদা পতি আজ্ঞা পেয়েছেন, আনন্দের মধ্যে দিয়েই প্রিয়পুত্র তার প্রাপ্য যশ অর্জ্জন করবে, আর মা তাতে সাহায্য করবেন, আর বিলম্ব করবার অবসর কোথায়? গোষ্ঠে যাওয়া স্থির হল, এখন দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করলেই হয়। কুল-পুরোহিত ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখে গ্রহ-শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি করে স্থির করলেন আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে শুভ মঙ্গল বাসরে শ্রীনন্দনন্দন গোষ্ঠ যাত্রা করবেন। কেন কিনা 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা'—খনার অকাট্য বচন।

আজ সেই নবমী তিথির নির্ম্মল উষাকাল, শুভ অনুষ্ঠানাদি সম্পূর্ণ হয়েছে, তবু বিদায়-ভীরু মায়ের মন বার বার কেঁদে উঠেছে, অন্য দিন গৃহকর্ম্মে শ্রান্ত নন্দরাণী ঘুমিয়ে থাকেন, দুলাল আগে উঠে, তাঁকে জাগান। সব ঘরেই দস্যি ছেলের এ অত্যাচার প্রত্যহই আছে; ঘুমন্ত মাকে না জাগালে, তাদের জেগে সুখ হয় না, আর মা না জাগলে প্রয়োজনও যে সিদ্ধ হয় না; কে হাতে তুলে দেবে পরিধেয় পরিচ্ছদ, কে মুখে দেবে ক্ষুধার আহার্য্য, তিনি ভিন্ন আর কেউ তো যাত্রার উদ্যোগ সম্পূর্ণ করে দিতে অক্ষম! কিন্তু আজ নন্দদুলালের মনে কোন চাঞ্চল্য নাই, যা' চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়েছেন, তিনি অঘোরে ঘুমচ্ছেন, কিন্তু মায়েব ঘুম অনেকক্ষণ হ'ল ভেঙে গিয়েছে, শুধু তাই নয়, সে রাতে তাঁর ঘুম ভাল হয় নি, স্নেহপরায়ণ প্রিয় জনের মন নিয়তই অশুভ আশঙ্কায় ভীত, ছেলে ত যাবে; বনে মাঠে পথে ঘাটে কত বিপদ ঘটতে পারে, তাই কল্পনা করেই সারা রাত্রি তিনি নিদ্রাহীন।

সবে ঊষার প্রথম অরুণ রশ্মি দিক্-চক্রবালের উপর একটি দীপ্ত আরক্ত রেখা, দেবতার তর্জ্জনী সঙ্কেতের মত আপনাকে প্রকাশ করেছে, কুলায়ে কুলায়ে পাখীরা মৃদু বন্দনা-গীতি আরম্ভ করেছে, এমন সময় দূর হতে শ্রবণে প্রবেশ করল—

ভোরের আলো উদয় হ'ল,
জাগো গোপাল জাগো, ।
মায়ের আঁচল ধরা ছেড়ে, এখন বিদায় মাগো।
ধড়া চূড়া পরে নিয়ে বাঁশরীতে সুর দিয়ে,
মাঠের পানে চল'দুলাল দিনের কাজে লাগো ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবার উপায় তো নাই, যখন আলোক মন্ত্রের উদ্বোধনে নিখিল বিশ্ব জাগরিত হয়ে ওঠে, তখন কে ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে? যশোদা উঠে দ্বারের অর্গল মোচন করে দিলেন, সঙ্গীদের আহ্বান, সঙ্গীত যেমন কর্ণে প্রবেশ করল, তৎক্ষণাৎ শ্রীনন্দনন্দন শয্যাত্যাগ করে উঠলেন, ততক্ষণ রাখাল বালকগণ গৃহ প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়েছে।

মা যশোদা দুলালকে রাখালবেশে সাজিয়ে দেবার আয়োজন করে নিয়ে, সম্মুখে এনে বসালেন, মাথার ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশপুঞ্জের উপর বঙ্কিম ভাবে শিখীচূড়া বেঁধে দিলেন, গলায় বন ফুলের মালা পরিয়ে, দীর্ঘ নিবিড় পক্ষ্ম-শোভিত আকর্ণায়ত চক্ষু দুটি স্নিগ্ধ কাজল দিয়ে আরো টানা করে দিলেন, তুলি দিয়ে আঁকার মত সুঠাম তাঁর ভ্রূযুগল, একটু খানি কাজল বুলিয়ে আরো সুস্পষ্ট উজ্জ্বল করে তুললেন। নব চন্দন-পত্র লিখনে ললাট দেশ উদ্ভাসিত হ'ল, চক্ষু দুটি আনন্দে আজ অধিক উজ্জ্বল, রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি হাসির উল্লাসে বার বার খুলে গিয়ে সাদা দুধের দাঁতের বিকাশে আরো রাঙা দেখাচ্ছিল, সুন্দর আজ সুন্দরতর হয়ে উঠেছিলেন। পাখীরা গান গেয়ে একবার উড়ছিল, আবার বাসায় এসে বসছিল। সকলেই লক্ষ্য করলে দেখবেন সূর্য্যদেব যতক্ষণ পূর্ব্ব দিক্ বিভাগে, দীপ্ত সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হন, ততক্ষণ পাখীরা একেবারে বাসা ছেড়ে আকাশে উড়ে চলে না, তারা একবার যায়, আবার আসে; কিন্তু যেমি সূর্য্য কিরণ ধারা প্লাবনের মত আকাশ পৃথিবী পূর্ণ করে তোলে, অমি তারা ডানা মেলিয়ে দিয়ে গান গাইতে গাইতে অবাধে উড়ে চলে। রাখাল রাজের নেপথ্যবিধান সম্পূর্ণ হ'তে না হ'তেই আকাশে সূর্য্যদেবের উদয় সম্পূর্ণ হ'ল। ঊষার কিরণ হতে অরুণ নেত্রের স্বপ্নাবেশ দূর হয়ে গিয়েছে, এখন প্রভাত-তপনের জাজ্বল্যমান শুভ্র আলোক। বাছনিকে বিদায় দেবার পূর্ব্বে নন্দরাণী তাকে তৃপ্ত করে খাইয়ে দিবেন, তাই আহার্য্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন, আজকে তাকে প্রথম দূরে পাঠাচ্ছেন, মনটা ব্যাকুল হচ্ছে—আজকার শূন্য ঘর দ্বার বড়ই পীড়া দেবে—

ওগো আমার, সকল ভোলা, তোমায় কোলে করে,
নিখিল ভুবন রয় যে ভরা রইলে তুমি কোল ভরে' ॥
তোমার চোখের আলো নিয়ে
তারায় তারায় বার্ত্তা গিয়ে
কতই নূতন জগৎ আলো, কতই কি যে উঠছে গড়ে' ॥
সুনীল আকাশ শীতল বাতাস শ্যামল ধরা শান্তি নিবাস
আজকে সবই পূর্ণ আছে তোমায় বক্ষে তুলে ধরে ॥
মুখ-চাওয়া যে তুমি আমার, তাইতে তুমি বড় সবার,
জোয়ার উঠে স্নেহের ধারে ভাসায় দুকূল তোমার তরে ॥

প্রথমেই ডাক পড়ল আভীর বালকদের, আয় শ্রীদাম আয় সুদাম খাবি আয়; সবারি হাতে মিষ্টান্ন তুলে দিয়ে, সবার শেষে গোপালকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে, পাশে দাঁড় করিয়ে, তার মুখে খাবার তুলে দিতে লাগলেন। যে একবার মা হয়েছে সেই জানে, পরের ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে আগে তাকে না দিয়ে, নিজের ছেলের হাতে দেওয়া শক্ত কাজ, হাত উঠবেই না, পারাই যাবে না—

শিকেয় তোলা ছিল ননী,
না এলে গো ও বাছনি,
কি কাজ হত তার ?
কেই বা নিত হাতটি পেতে, ফিরত্ সাথে দিনে রেতে
শুধু শুধু পড়ে পড়ে নষ্ট হত ভারে ভার !
নন্দরাণী নিরানন্দ নাহি ছিল গীত ছন্দ
সবাই ছিল চুপটি করে, ঘর দুয়ারে অন্ধকার !
আধ কথা হাসির সুরে, গানের জোয়ার জীবন জুড়ে,
তোমার পায়ের নাচন নিয়ে নৃত্য করে চারি ধার ॥

আর একজন কাতর দৃষ্টিতে ছেলের খাবার দিকে চেয়ে দেখবে, তাতে বাছার অকল্যাণ হবে যে; যেখানে বড় ভালবাসা, সেই খানেই সবচেয়ে বেশী ভয়—ঐ বুঝি কার নিশ্বাস লাগল, কে চোখ দিল! মায়ের হাত রাত্রি দিনই ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন শুধুই বলতে চায় ষাট্, ষাট্,—মায়ের চোখ করুণ দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে চেয়ে কেবলি বলে 'জীব' 'জীব'!

আজ আর গোপালের খাবার দিকে মনই নাই, ননী চুরি করে রোজই খান, পাওয়া টুকুতে মন ভরে না, আজ মা যত বেশী করে দিতে চান ততই না-রাজি,

কেবল বলেন, "আর না মা আর যে পারছিনে" "পেট যে একেবারে ভরে গিয়েছে", "আর খেলে অসুখ করবে কিন্তু, শুনছ না, তখন দেখবে।" একবার মুখ এদিকে ফেরাচ্ছেন, আবার অন্য দিকে নিচ্ছেন, ভাণ করে ওয়াক্ তুলছেন, ওটা দুষ্টামি, পেটে আরও অনেক ধরত, কিন্তু মন আজ খাবার দিকে নেই। ঐ যে নতুন পথ, যেখানে রোজই যাবার ইচ্ছা, অথচ রোজই যাওয়া হয় না, আজ সেইখানে যাবার জন্যে প্রস্তুত, এখন মা জননী ছাড়লেই ছুট দেন। এক একবার বন্ধুদের দিকে আড়ে আড়ে চাইছেন, চতুর চাহনিতে হাসি ফেটে পড়ছে। রাণী যখন দেখলেন ছেলে আর কিছুতেই খায় না, তখন তার মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিলেন। এবারে দুলাল নাচ্‌ছেন, দৌড় দেন আর কি, মাকে যে প্রণাম করা দরকার, তাও মনে নেই। মা নিজের পায়ের ধুলো ছেলের মাথায় দিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করে বার বার শ্রীহরিকে স্মরণ করে, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, চিবুক স্পর্শ করে ললাট চুম্বন করলেন। যাবার মুহূর্তে মোহন বাঁশরী আর বাঙা পাঁচন নড়ি হাতে তুলে দিলেন। রাখাল বালকেরা গান গেয়ে তাকে ঘিরে নৃত্য করতে করতে যাত্রা করল। বার বার মধুর মুরলী ধ্বনি বাজতে লাগল।

যাবার সময় গোপাল মাকে বলে গেলেন "ভয় নেই মা—আমি বেশী দেরী করব্ না, বাঁশী দিয়েছ তাই বাজাব, শুনে বুঝবে আমি বেশ আছি।"

প্রথম দিনের সেই ছাড়া ছাড়ি, মানুষ হবার জন্যে, কর্তব্য রক্ষা করতে ছেলেকে দূরে পাঠান, এর মধ্যে যেমন বেদনা, তেমি বড় একটি নির্ম্মল আনন্দ আছে। মানুষ যাকে বড় ভালবাসে, বিশেষ আপন সন্তানকে, তাকে শুধু আপনার বলে, এক জনার জেনে পূর্ণ সুখ হয় না; তাকে দশের মধ্যে বড় করে, বেশী করে, আর সকলের তুলনায় সে সুন্দর, সে মহৎ, সে তেজস্বী সাহসী বীর, এই গুলি দেখতে, প্রমাণ করে নিতে, আরো ভালো লাগে। তাই যখন গোপাল চোখের অদৃশ্য হয়ে গেল, সাধারণ আভীর বালকদের মধ্যে তাঁর সুন্দর কিশোর তনয় যে কি অনন্যসাধারণ, কত অধিক সুন্দর, তা তিনি কাছে দূরে, সর্ব্বত্রই ভাল করে দেখলেন। সে যে, রাজার মত তেজোগর্ব্বে, সে যে পূর্ণ চন্দ্রের মত সব আনন্দময়, মাধুর্য্যময়, কিরণময় করে, অগ্রসর হয়ে চলল। তাই রাণীর চোখে সহসা জল ভরে এলেও তিনি তা ফেল্‌লেন না; আঁচলে মুছে, প্রফুল্লমুখে ঘরের মাঝে নিয়মিত কাজে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলেন। আজ বাছনি দূরে গেছে, তার আসন শয়ন শূন্য হয়ে তার প্রতীক্ষা করছে, তার ব্যবহার্য্য

তৈজসপাত্রগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তার অনুপস্থিতিতে যেন ব্যাকুলতা জানাচ্ছে। সবাই বল্ছে যেন, এসো, অধিকার কর, ব্যবহার কর, সার্থক কর। রাণী চারি দিকে ছড়ান খেল্না গুলি গুছিয়ে রাখতে লাগলেন, আজ আর কাজে মন লাগ্ছে না, ঐ গোপালের কাজই তাঁর সকল কাজের বড় কাজ, আজ সে দূরে গেছে, আর সব কাজই যেন মিছে মনে হচ্ছে—কতক্ষণে সে ফিরবে, এই ভাবনাই তাঁকে কাতর করছে।

সাথে সাথে চোখে চোখে রাখতে তোরে পরাণ চায়,
অদর্শনে শঙ্কা জাগে ধৈর্য্য সে হারায়।
সেই যে তোর ছেলে খেলা, সারাদিনের হেলা ফেলা
কাজ ফেলে ঐ খেলার মেলা বারে বারে মন ভুলায়।
ঐ পাগলের লাফালাফি ঘরে দোরে দাপা দাপি
পড়ে গেলে আঁচল ঝাঁপি বুকে এনে মুখ মুছায়।
মলিন মুখে এলে দ্বারে নয়ন যে আর ফেরে না রে
দোষী হ'লেও বারে বারে, ছেলের কবে মা ফিরায়?
মায়ের বুকের শক্ত পাটা, প্রাণ দিয়ে মা ছেলে বাঁচায়।

প্রথম দিনের গোষ্ঠবিহার নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা হল, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সাথীদের সঙ্গে রাখালরাজ ঘরে ফিরলেন। দূর হতে শিশুকণ্ঠের কলরব, আনন্দ-সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত বাঁশরীধ্বনি শুনে, গোক্ষুরোত্থিত ধূলিপাটল পথ দেখে, রাণী বুঝলেন দুলাল ফিরছেন। তিনি গিয়ে আগ বাড়িয়ে তাদের নিয়ে এলেন। আভীর-বালকেরা পথে হতেই বিদায় নিল, কিন্তু বিদায় নেব্যর কি সমারোহ। সবাই এসে মুকুন্দ লালকে জড়িয়ে ধরছেন, সবাই বলছেন, "কাল ভাই আবার এসো", "কেমন মজা হ'ল", "কেমন খেলা আজ" "ধেনুপাল যেমন শান্ত হয়েছিল, এমন তো কোন দিনও থাকে না।" "কাল এসো ভাই," "কাল এসো ভাই;" গোপাল কারো হাত ধরে নাড়া দিয়ে, কারো পিঠে গুম করে এক কিল বসিয়ে, কারো গলা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "ওরে আস্বো আস্বো এখন পালা, মাকে আর কতক্ষণ পথে দাঁড় করিয়ে রাখবি?" তার পর মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে, বাড়ীর ভিতরে এলেন। গোপালের মুখের দিকে চেয়ে মায়ের মনে ব্যথা বাজল; সারাদিন বনে ঘুরে, রোদে, অনাহারে, শ্রান্তিতে সেই পদ্ম-কোরকের মত সুন্দর পূর্ণ মুখখানি যেন চুপসে গিয়েছে, রসে টস্ টসে পাকা বিম্ব ফলের মত রাঙা ঠোঁট দু'খানি শুকিয়ে উঠেছে, সেই যে ঢল ঢলে, চোখের হাসিতে

উজ্জল, প্রতিভার দীপ্ত দৃষ্টি তা, যেন ম্লান বোধ হচ্ছে, চোখের কোলে খাত দেখা দিয়েছে, কালী পড়েছে। মাকে জড়িয়ে ধরে যখন বল্লেন, "মাগো ঘরে চল" তখন কণ্ঠস্বর শ্রান্তি ভারে যেন পীড়িত—বড়ই করুণ শোনাল। কিন্তু মুখ হাত ধুইয়ে, খাইয়ে মা যখন বুকের কাছে নিয়ে শুলেন, তখন গোপালের ফূর্ত্তি দেখে কে? অন্য দিন মাকে গল্প বলতে হয়, কত পুরাণ কথা শুনলে তৃপ্ত হন, আর আজ মাকে কথা বলতেই দিচ্ছেন না, প্রশ্ন করতেও না, কেবলি বলছেন, "শোন শোন", "আমি বলি" "আমি বলছি", সে বলার আর শেষই হয় না। সেই পথের কথা, বনের কথ, পাখীর ডাক, হরিণের নৃত্য, বানরের দুর্গতি, ধেনু বৎসের হাম্বারব; সে কি সুন্দর, তাদের লাফিয়ে বেড়ান কি চমৎকার, আর তাদের কত বুদ্ধি, অন্ধকারেও আপন মাকে হারায় না, ঠিক্ চিনে সাথে সাথে আসে। কথা কইতে কইতে হঠাৎ এক সময় কথা জড়িয়ে এল, চোখের পাতা ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগল, গোপাল ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই ঘুমন্ত মুখটির দিকে চেয়ে, তাঁর প্রাণাধিক যে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছে, এরি জন্যে নারায়ণকে প্রণতি করে মাও ঘুমিয়ে পড়লেন।

এখন গোপাল প্রতিদিন গোষ্ঠে যান, যথা সময়ে ফিরে আসেন, যদি বা কোন দিন ফিরে আসতে একটু আধটু বিলম্ব হয়, তবে দূর হতে বাঁশরী বাজাতে বাজাতে আসেন, সেই সুরলহরী মায়ের শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে, তিনি জানেন তাঁর মূর্ত্তিমান্ আনন্দ ঘরে এসে, এখনি কলহাস্যে, অজস্র কথার স্রোতে, মোহন নৃত্যে, মধুর নূপুর রবে, উচ্ছ্বসিত গীত ছন্দে, নিঃসঙ্গ নিরুৎসব গৃহকে আনন্দ-মুখর করে তুলবে। প্রদীপ জ্বলে উঠবে, সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাদ্যে, ধূপ সুগন্ধে মন্দির আমোদিত হবে।

নিত্য এই নিরাপদে গৃহে-প্রত্যাগমন ব্যাপার মায়ের মন ক্রমে নিঃশঙ্ক করে তুলল। যথাসময়ে বিদায়, নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম হয়ে যেতে না যেতে আবার সম্মিলন, সংশয় আশঙ্কা বিরক্তি অভিমান অনুযোগ কোন কিছুরি আর অবকাশ রাখল না। এখন রাণী নিশ্চিন্ত মনে গৃহ কাজ করেন, নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে অলিন্দে বাতায়নে কিম্বা সৌধছাদে প্রতীক্ষা করে থাকেন, রাখালগণের কণ্ঠস্বর দূর হতেই সংবাদ পাঠায়, ঐ আসছে, ঐ আসছে, রাণী গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ান, মাতা পুত্রে একত্রে গৃহ প্রবেশ করেন। এম্নি করে কিছু কাল কেটে গেল, অন্য দিনের মত আজও ভোরের সময় গোপাল হাস্তে হাস্তে গোপ-বালকদের সঙ্গে গোচারণে চলে গিয়েছেন। অন্য দিন কাছে কাছে ধেনু চরান, মাঝে মাঝে

বেণুধ্বনি শোনা যায়, মা নির্ভাবনায় থাকেন। আজ আর মূরলীর মধুর ধ্বনি শোনা যায় নি. পথ ঘাট সব নিস্তব্ধ, রোজ সে পথে কত লোক আসে যায়, কখনো গান, কখনো হাসি, কখনো কলহ, কখনো পসারির হাঁক ডাক শোনা যায়; কিন্তু আজ পথ বড় নীরব, পথিকের চলাচল নেই বল্লেই হয়। গাছের পাতায় মর্ম্মর শব্দ নাই, পাখীরা কলকূজনবিরত. কেবল মৃদু অস্ফুট ধ্বনি করছে। আকাশে মেঘ নাই তবু দিনের আলো ম্লান, বাতাস দীর্ঘ শ্বাসের মত মন্থর, পাখীরা চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না, আপন আপন কুলায় প্রহরী হয়ে বসে আছে, পাছে নীড়স্থিত নবোদ্ভিন্ন-পক্ষ তরুণ শাবকগুলি দুরাশা বশতঃ আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে গিয়ে শ্যেনের মুখে প্রাণ হারায়। রাণীর মনও বারংবার উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে. একবার মনে হ'ল গোপাল যেন মাগো বলে ডাকলে, গৃহদ্বারে এসে দেখলেন কোথ.ও কেহ নাই, আবার শঙ্কিতমনে, কম্পিত-পদে দ্রুত ফিরে এলেন, আজ কাজে মনঃসংযোগ হচ্ছে না, আহারের বেলা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবুও রাণী স্নান করতে চান্ না, পরিচারিকাগণ বারংবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তিনি কোনরূপে স্নানাহার শেষ করে, তাদের বিদায় দিলেন, দিনের নিয়মিত বিশ্রামে সে দিন আর রুচি হ'ল না, বৈকালিক প্রসাধন অসম্পূর্ণ রইল, তিনি বাতায়ন-প্রান্তে আশ্রয় নিয়ে পথের দিকে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে বসে রইলেন।

সেখান হতে বন পথ স্পষ্টতর দেখা যায়, সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছেন, আকাশ রক্তবর্ণ—যেন রোদন-অরুণ চোখের মত বেদনা-কাতর মনে হ'ল। শুভ গোধূলি লগ্নের আলোকে আজ সুবর্ণ দীপ্তির অভাব। সন্ধ্যা-বধূ গৈরিকে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়ে, ত্বরায় অপসৃত হলেন, তখনও চন্দ্রোদয়ের বহু বিলম্ব, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাই সহসা চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দূরে আর দৃষ্টি চলে না; অন্য দিন এমন সময় গোপাল বহুক্ষণ গৃহে ফিরে আসেন, কিংবা যদি বা এমন বিলম্ব হয়, দূর হতে বাঁশরী বাদন করেন, সেই ধ্বনি অতি লঘুপাদ দ্রুতবেগে তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে সান্ত্বনা বাণী শোনায়, সেই ত্বরান্বিত সুরলহরীতে তাঁর পুত্রের আগমন সংবাদ যেন তাঁর কাছে বহন করে আনে, তিনি সত্বর গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু আজ কাননপথ নিতান্ত নীরব, আভীর বালকদের হাস্যকৌতুকালাপও শ্রুত হচ্ছে না। বাঁশরী বাজে কোথায়? সহসা মৃদু নূপুরধ্বনি শুনে রাণীর সমস্ত বক্ষ আলোড়িত হয়ে উঠল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হল, ইচ্ছা ছুটে গিয়ে বাছাকে বুকে টানেন, কিন্তু পারলেন না, শরীর জবাব দিলে, সে আর

চলতে পারে না। ঐ যে এতক্ষণ তীব্র উৎকণ্ঠায় তাঁর সমস্ত শরীরমন চড়া সুরে বাঁধা বীণার মত একেবারে পঞ্চমে চড়ে ছিল, কিন্তু যেমি সহসা সে উদ্বেগের কারণ দূর হ'ল, অমি শিথিল তন্ত্রী যন্ত্রের মত অচল হয়ে পড়ল। মনে কেমন একটু অভিমানেরও উদ্রেক হ'ল—"আমি সারাটি দিন পথ চেয়ে বসে আছি, এই যে সহস্র বার ঘর বার করছি, আর এই ছেলে, সাথীদের সঙ্গে আমোদে প্রমোদে এমনি মত্ত, বনপথে নৃত্য করে ফিরতে এমনি উন্মত্ত, যে মায়ের বেদনার কথা ভাববার অবসরও হয় না।" এই অভিমান বশতঃ কেন যে গোপাল অমন, একক আসছেন, কেন সাথীদের পথে হতে বিদায় দিয়েছেন, কেন তাঁর নত দৃষ্টি ম্লান মুখ, সে কথা জিজ্ঞাসা করবারও প্রবৃত্তি হ'ল না। তিনি আপন মানই স্থির করলেন, এই দেরী করবার অপরাধে লজ্জাবশতঃ, কিংবা মায়ের কাছে অপরাধী সাজলে, এই অযথা বিলম্বের ক্ষমালাভের সুযোগ ঘটবে এই প্রত্যাশায় সে যেন একটা অভিনয় করছে। তাই রাণী গোপালকে তিরস্কার করলেন। এতক্ষণ গোপাল বিষণ্ণমুখে নতনেত্রে ছিলেন কিন্তু এই অন্যায় অবিচারে তাঁরও মন অপ্রসন্ন হল, মায়ের কাছে যে এগিয়ে আসছিলেন, নিবৃত্ত হয়ে বনের দিকে ফিরলেন।

গোপাল বন পথে যেতে আবার উদ্যত দেখে, মায়ের মান অভিমান সব কোথায় ভেসে গেল। গোপালকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে, আদরে সোহাগে, স্নেহে সম্বোধনে তাকে বিব্রত করে তুললেন। যে মা ছেলের মধ্যে যথার্থ ভালবাসা আছে, সেখানে মান অভিমান অভিনয় মাত্র, গোপালেরও বুঝতে বাকী রইল না, অত্যধিক স্নেহ বশতঃই মা ভর্ৎসনা করেছেন, মায়ের দুলাল মায়ের বুক ঘেঁসে দাঁড়ালেন।

গোকুলপতি গোবিন্দের সমস্ত ধেনুগণের প্রতি সম স্নেহ থাকলেও একটি বৎসকে তিনি বিশেষ যত্নে লালন পালন করেছিলেন, এই যে সতত তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, তার তত্ত্বাবধান করা, এই হ'তেই তার উপরে স্বভাবতঃই একটু অধিক মমতা হয়েছিল। গাভীটি বড় সুন্দর—

"ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।
বিভ্রতী শ্বেত-রোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্॥"

এই আবাল্যযত্নপালিত গাভীটি, আজ প্রথম বৎস প্রসব করেছে, সমস্ত দিন তাঁরা, সকল রাখালেরা মিলে তার পরিচর্য্যায় রত ছিলেন, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাকে একটি বৃক্ষমূলে রেখে, অন্যান্য গাভীদের একত্র করতে গিয়েছিলেন, ফিরে

এসে তাকে আর দেখলেন না, সমস্ত বন, মাঠ, পথ, তন্ন তন্ন করে বাড়ী ফিরতে হল, কিন্তু তাঁর দয়ার্দ্র চিত্ত যেন সেই গাভীর অনুসন্ধানেই ফিরছিল। এই উদ্বেগবশতঃ তিনি অন্য দিনের মত বংশীবাদন করতে বিস্মরণ হয়েছিলেন। আর যে তাকে অন্ধকার, হিংস্র প্রাণিসঙ্কুল বনমধ্যে অসহায় ফেলে রেখে, নিজে ঘরে এসেছেন, এ ব্যথা, আর এই আত্মপরতা তাঁকে বড়ই পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করছিল, কিন্তু উপায় কিছু ছিল না, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি চারিদিক ঘন তমসাচ্ছন্ন, চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা ব্যতীত আর কিছুরই সম্ভাবনা অসম্ভব। সঙ্কীর্ণ বনপথ অদৃশ্য, প্রান্তর সরোবর তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন, একাকার। তাই গৃহে ফিরলেন কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, চন্দ্রোদয়ে আবার তার অন্বেষণে বাহির হবেন। রাখালবালকদের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হবার আদেশও দিয়েছিলেন। মাকে কিন্তু সে কথা কিছু বলেন নি, চতুর বালকটি জানতেন, তাহলে সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। মায়ের সতর্ক প্রহরায় তাঁর ঘরের বার হবার সাধ্যও থাকবে না। তবে বার হতেই হবে; সুস্থির চিত্তে নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

মা সেদিন পরিশ্রান্ত গোপালকে সকাল সকাল ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেলেন। গোপাল সুস্থির হয়ে শুয়ে রইলেন, মাকে জানতেও দিলেন না যে জাগা আছেন। সারাদিনের পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠায় শ্রান্ত শরীর মন নন্দরাণী অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন, তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না, স্বপ্নেও ভাবেননি, গোপাল ধেনু ও বৎসের অনুসন্ধানে রাত্রে বাহির হবেন।

নিশীথ রাত্রি, চারিদিক নিসুতি হল, কোন শব্দ নাই, কারো ঘরে প্রদীপ জ্বলছে না, সকলেই নিদ্রার আরাম উপভোগ করছেন, গোপপল্লী নিস্তব্ধ, পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য। গোপাল উঠলেন, শিয়রের কাছে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, স্তিমিত প্রদীপালোক মায়ের মুখে এসে পড়েছে, তাঁর গভীর একাগ্র দৃষ্টিও সেই খানে গিয়ে পড়ল, কিন্তু মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল না। গোপাল বুঝলেন, মা এখন সহসা জাগবেন না, তিনি প্রকৃতই গাঢ় নিদ্রামগ্ন।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশ মেঘলেশহীন অগণ্য নক্ষত্রখচিত। মুক্ত বাতায়ন পথে গোপাল দেখতে পেলেন, রাত্রি শেষ চন্দ্রোদয়ের অদূর সম্ভাবনা, সেই প্রচ্ছন্ন আলোক আকাশের অন্ধকারকে স্বল্প ও স্বচ্ছতর করে এনেছে, কিন্তু ঘন বনশ্রেণী একেবারে মসীবর্ণ। পাছে মায়ের নিদ্রার কোন বিঘ্ন হয় তাই সম্মুখ দ্বার খুললেন না, সেই মুক্ত বাতায়নপথে সাবধানে লম্ফ দিয়ে গৃহপ্রাঙ্গণে নামলেন, তার পরে পথ সহজ। তোরণদ্বার অতিক্রম করে অগ্রসর হলেন পথের

বাঁকে, মাঠের মুখে, আভীর বালকেরা তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল, সকলে একত্রে চললেন ; আর অভিবাদন নাই, হাসি কথা স্থগিত, সকলেই নিঃশব্দ ধীর পাদক্ষেপে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করতে করতে এগিয়ে চললেন। মাঠের কোথাও কিছু দেখা গেল না, সে প্রান্তর বহু বিস্তৃত, শ্যামশষ্প সুকোমল, একেবারে দিগন্তস্পর্শী। বনের পথ ধরবার আগেই চন্দ্রোদয় হ'ল, স্নিগ্ধ নবনীতবর্ণ কিরণ কোমল স্পর্শে চারিদিক আলোকিত করল। বনপথে তরুশ্রেণীর ছায়া দেখে কেবলি ভ্রম হয়, ঐ বুঝি পাটলা আর বৎস শুয়ে আছে, দৌড়ে যান দেখেন কিছুই না শুধু ছায়া! বন প্রান্তর, তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেও যখন তাঁরা ধেনুর সন্ধান পেলেন না, তখন তাঁরা পদ্ম সরোবর প্রান্তে চললেন, পুণ্ডরীকাক্ষের এই স্থানটি বড় প্রিয়। তখন চন্দ্র অস্ত গিয়েছেন, সূর্য্যদেব উদয়ের আয়োজন করছেন। পূর্ব্ব দিগ্‌বিভাগ অরুণ-রাগরঞ্জিত, সরোবরের পদ্ম বনে বিকাশোন্মুখ কোরকাবলিকে বেষ্টন করে চারিদিক হতে ভ্রমরেরা মৃদু গুঞ্জরণ আরম্ভ করেছে। পথ ঘাট ক্রমে সুস্পষ্ট হ'ল ; ছায়া, আর ছায়া, অন্ধকার কোথায় দূর হয়ে গেল, দূর হতে দেখলেন পাটলা, পুচ্ছ তুলে দিশাহারা পাগলের মত আর্ত্তনাদ করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। অবোলা জীবের এই কাতরতা, এই হাম্বারব শুনে আভীর বালকগণ হাহাকারে কেঁদে উঠল, গোবিন্দের চক্ষু দুটি জলে ভরে এল, তিনি সজল চক্ষে পাটলার মুখের দিকে চাইলেন, সেও তাঁর মুখের মুখের দিকে চেয়ে আর চীৎকার করল না, তার ব্যথার সান্ত্বনার জন্যে সে যেন এতক্ষণ তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তাঁকে পেয়ে সুস্থির হয়ে রইল। গোবিন্দ তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন। নবজাত সুকুমার ধেনু শাবকটিকে আর পাওয়া গেল না, কোথায় গেল সে, কে জানে কোথায়?

এই যে ভারতে ভাগবতে পুরাণে রামায়ণে, বেণুবাদনতৎপর সুন্দর তরুণ বালকটির কথা শুনি, তিনি কি ছিলেন না, তিনি কি নেই? যিনি বংশীরবে আহ্বান করেন, পথ নির্দ্দেশ করেন, যিনি দয়াপরবশ, যিনি সাহসিক, হারাণ জীবকে উদ্ধার করবার জন্যে যিনি উদ্‌গ্রীব, তিনি কি নেই? তিনি তো আছেন, নিয়তই তাঁর বাঁশরীধ্বনি বলছে, 'আয় আয়।' পথহারাকে পথে ফেরাতে, সর্ব্বস্বহারা ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতে, শ্বাপদকবলিত দুর্ব্বল জীবকে উদ্ধার করতে তাঁর মোহনমুরলী নিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা শুনি না, শুনতে চাইলেও অপরে দেয় না, যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা বলেন ঐ যে ঘর ছাড়িয়ে পথে-পথে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াবার আহ্বান, ঐ যে খোলা প্রান্তরে, আঁধার অরণ্যে, পদ্ম-

সরোবরপ্রান্তে দেখবার, রহস্যভেদ করবার, সংগ্রহ করবার প্রলোভন ও একেবারেই বাজে, কর্ম্মনাশা বুদ্ধি। রাখালী করা ভদ্রসন্তানের কাজ নয়, পদ্মগন্ধে ত পেট ভরে না, আর বনের মধ্যে অহিনকুলের নিরত বিরোধ। ও বাঁশী শুনলেই কাঁশী ও নুপুর বাজনা একেবারেই বেজার। তার চেয়ে এই যে গোল গোল তাম্র রজত ও কাঞ্চনখণ্ডের বাজনা, এই শোন। " এর হিসাবে কোন গোল নেই, যা বলে তাই দেয়, কখনো কমতি হবার যোই নেই, ঐ আধলা তোমার কাছে আধপয়সার বেশী কিছুই নিতে পারে না, কাণাকড়িও না, আর ঐ যে সোণার রাঙা মোহর, ওর এক বড় সুবিধা, বাজার দর মাঝে মাঝে বেড়ে যায়, ষোলর জায়গায় আঠারও আসতে পাবে। ঐ শোন, ওরি বাজনা, দু'হাত ভরে পকেটে পোর, মজবুত লোহার সিন্দুকে মজুত করে রাখ, সুখে থাক্‌বে। কোন ভাবনাই থাক্‌বে না, ও এম্নি আসল জিনিস, মাঝে মাঝে ওর মেকিও দিব্যি চলে যায়, ধরা পড়ে না।

ঐ চক্‌চকে চাক্‌তিগুলো চাপা বন্ধ করে রাখলে অদিনে কাজে দেখে, দান, ধ্যান, দোল দুর্গোৎসব পাল-পার্ব্বণ কাঙ্গালী বিদায় আর মহোচ্ছব, ওসব শুধু বামন আর বৈরাগী বোষ্টমের ভুলিয়ে খাবার ফন্দী। মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে গুষ্টীশুদ্ধ কুঁড়ের দল পোষা, ওসব আলস্যের প্রশ্রয়, দুর্নীতির প্রচার, ওর দিক দিয়েই যেয়ো না। বহু কষ্টের সংগৃহীত অর্থ, পুঁজি করতে করতেই, জীবনে ভোগের অবসর যাঁর প্রায় শেষ হয়ে আসে, তিনি মনে করেন, আমার দিন তো গেল এক রকম, তবে দুঃখ কবে যা করলাম আমার ছেলেরা তাতে সুখে থাক্‌বে। মা বাপের তাতে সাধ যায় না? আহা, ছেলে যে প্রাণাধিক, মায়ের বত্রিশনাড়ি ছেঁড়া ধন। টাকা জমা থাক্‌বে সন্তান আরামে থাকবে, মোটরে চড়বে দশের মধ্যে একজন বলে গণ্য হবে, বিজুলি পাখার সদাই হাওয়া কেবলি খাবে, বিজুলি বাতির বাঁধা রোস্‌নাইয়ে সব অন্ধকার বিদায়, কোন ধাঁধাই থাক্‌বে না। (ঐ বিজুলি পাখা বাতির এইটুকুই আপদ। যতক্ষণ আছে, চলছে বেশ, বিগড়ে গেলে একেবারেই গুমট, আর দপ্ দপ্ করে জলতে জলতে খপ করে যেই নিভে যায়, অম্নি তুমি যে তিমিরে, আমি সে তিমিরে, আমীর ফকির এক হতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয় না।)

আর যার টাকা আছে, ছেলে নেই, তার প্রাণে কি সখ থাকে না? ম'লে দশ ভূতে লুটে খাবে, অমন সাধের ধন দেশের মধ্যে ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যাবে, এও কি সয়? তিনি পুষ্যি রাখেন, বংশ রক্ষা করবেন। কুলপাবক পুত্রটি প্রাপ্তে তু

ষোড়শ বর্ষে, রক্তপাতে রাঙান সোণার মোহরগুলি নিয়ে খোলাকুচির মত ছিনি মিনি খেলেন, বংশ কুলমর্য্যাদা সবই দিব্য রক্ষা হয়।

বাপরে ঐ ডাক কে শোনে? ঘর ছাড়ান কুলহারান, মানখোয়ান ডাক? পথে বনে মাঠে ঘাটে হাটে নাম রটনা। কলঙ্কের অঙ্কের লেখাজোখা নেই, ঐ রাধা রাধা আরাধনায় সদাই বাঁধা। ঐ ডাকের মান রাখলে, একুল, ওকুল দুকুল, গোকুল, কোন কুলেই আর ঠাঁই হবে না, দুর্গতির এক শেষ হ'লেও পোড়াবে না, তখন কেঁদে নাকী সুরে বল্‌তে হবে, "মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে।"—তাই তাঁরা ডাক শোনেন না, তুলো কানে পুরে তুলোটের পুঁথিতে মনোনিবেশ করে বসে থাকেন।

আর যাঁরা পুঁথি'পত্রের সহিত সম্পর্ক রহিত, অথচ স্বর্ণ মুদ্রার অভাবে তাঁরাও ডাক্ শোনেন না। দিব্যি ফুর ফুরে পেঁজা তুলো, আশী সিক্কা ভরী দরে আতরের গন্ধ ভুর ভুর করে সন্তর্পণে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে বসে থাকেন, সুগন্ধ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাঁদের আবিষ্ট ক'রে রাখে, ঈষদারক্তিম নয়নের মুদ্রিত করে, তাঁরা গোলাপী স্বপন দেখেন, পারস্য দেশের বসোরাই গোলাপ, সেকি সহজ সৌভাগ্য।

তবুত বাঁশরী নিয়তই বাজছে, নিয়তই বাজবে, সে আর্ত্তিহারীর বৈকুণ্ঠে থেকেও সুখ নেই, সেই গোপবালকের প্রাণসখা দীনবন্ধু, সেই রাধার কলঙ্ক অপনোদনকারী বৃন্দাবনচন্দ্র, সেই যিনি জীবন যুদ্ধে ভক্তকে বিজয়দান করবার জন্য স্বয়ং চতুর্ভুজ সারথি, যাঁকে তাড়িয়ে দিলেও বার বার ফিরে আসেন, ভৃগু-পদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করে যিনি গৌরব বোধ করতেন, তিনি যে কেবলি ডাকছেন, আয় আয়, আয় আয় ওরে অনাথ, ওরে আতুর, ওরে শ্রান্ত, ওরে শান্ত, ওরে ব্যাকুল, ওরে উদাসীন, আয় আয়। যে ডাক শুনে পথে বেরিয়ে, তার অনুচর হয়ে, যে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে, সে যে কি পায় তা দশে দেখে। আর যে, যেতে পারে না, কিন্তু বার বার মুখ বাড়িয়ে পথের দিকে দেখে, যাবার অবসর খোঁজে, যার মনে বেদনা জাগে, তার পাওয়া সে না বুঝলেও ঠাকুর দেখেন, ঐ বেদনা দিয়েই সে তাঁর আরাধনা করে, এক দিন তারও পথ খুলে যায়।

ঠাকুর আমায় পায়ে রেখো,
মনমোহন তোমায় ছেড়ে,
নয়ন কোথাও নাহি ফেরে
ওগো দয়াল দয়া করে
সেইটি শুধু দেখো দেখো!

তোমার আকুল বাঁশীর সুরে
সদাই হৃদি থাকুক জুড়ে
ডাকদিয়ে আর ভবঘোরে ঘুরিয়ে যেয়ো না কো
একলা ফেলে পথের মাঝে
পালিয়ে যেয়ো না কো।
তোমায় দিতে ননী-চোরা
কেবল চুরি করব মোরা,
দিন্ রাত সে মন্ত্রণাতে
চতুর তুমি সাথে থেকো॥

কিন্তু বেশীভাগ আমরা তাঁকে উপেক্ষা দিয়েই সম্মাননা করে থাকি। সে আহ্বান শুনিলে, সেই আয়ত নেত্রের করুণ নেত্রপাত, আমাদের মনকে স্পর্শও করে না, আমরা বিমুখ হয়েই বসে থাকি; কিন্তু যেদিন, আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী আশ্রয় দেয় না, ঘরে ঘরে দুয়ার রুদ্ধ হয়ে যায়, যেদিন আমরা উপেক্ষিত, প্রত্যাখ্যাত, আর্ত্ত, অসম্মানিত, জীবন নিতান্ত নির্ভর বিহীন, সে দিন, যাকে চিরদিন শুধু ফিরিয়েই দিয়ে আসছি, তিনিই বুক বাড়িয়ে কাছে আসেন, দুই হাতে জড়িয়ে আগলে ধরেন!

সকলে ছাড়িলে যেই আপনি দাঁড়ায় দ্বারে,
বল রে পাগল মন কেমনে ফিরাবি তারে?
বুকের শয়নে তোর সে দুলাল মেহে ভোর
নয়নে সে মনোচোর আলো ঢালে অনিবার।
তাঁরি বাঁশী শুনে চল, তাঁরে শুধু বল্ বল্
যে কথা অন্তরে তোর বলা হয় নাই কারে।
যা'রে তাঁরি সাথে সাথে, মুছারে আপন হাতে
তোরও নিয়ত ঝরা আকুল নয়ন ধারে॥

নন্দোৎসব।

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

সারা ভারতের মহা উৎসব
আজি গোয়ালার গৃহে রে।
ধেয়ে চলে তা'রা মহা আনন্দে
বাঁকে ক্ষীর ছানা নিয়ে রে।
কা'র মুখে দিবি ননী ছানা তোরা,
কোথা সে গোপাল, কোথা ননী চোরা?
আজিকার দিনে এমন করিয়া
র'স্ কা'র পথ চেয়ে রে!
আসে কি গোপাল! বাঁধা যে দুলাল—
গোয়াল, তোদের স্নেহে রে!
কটিতে তোদের হলুদ বসন,
বাঁকে পীত ধরা ঝুলায়ে
মত্ত হরষে বেড়াস্ মাতিয়া
কা'র মনটুক্ ভুলায়ে।
তালের বড়া ও পরম-অন্ন
সাজাস্ ও' তোরা কাহার জন্য?
রাখালের এঁটো ফলটি গোপাল
নিত যে দু'হাত আগায়ে,
গোপের হৃদয়—ব্রজের মাটিতে
আছে সে পা'দুটি বাড়ায়ে।
কালো ছেলে নয়, কেলে সোনা,—তা'র
বিরহে আঁধার মথুরা,
যমুনার কূলে তিতে আঁখি জলে
ব্রজের ঝিয়ারি-বধূরা!

বদ্ধ-কারায় নিপীড়িত মন—
মুক্তির লাগি সদা উচাটন
হৃদয়ে-হৃদয়ে ফণা বিথারিয়া
'গরজে পাপের গোখুরা।
কালিদহ আজ পৃথিবী অখিল
বিষে জর জর— আতুরা।
কচি দুই হাতে কে তুমি ভাঙিলে
কারার লোহার শিকলি।
হাসির ধারাটি কে তুমি পড়িলে
গোকুলের কূলে উছলি' ?
সরলতা আর বিশ্বাস খানি
গোপের হৃদয়ে কে দিলে গো আনি',
প্রেমের ফল্গু কে তুমি বহা'লে
গোপিনীর হিয়া উথলি।
ব্রজের গোপাল, নন্দ-দুলাল,
যশোদার প্রাণ-পুতলি।
দুধের কেঁড়েটি, দয়ের হাঁড়িটি,
ননীর পাথর বাটি রে!
কচি আঙুলের দাগ মাখা যেন
তোদের সকল গা'টি রে।
আজো যেন কোন গোপের বহুরী
দেখে, যদি কেউ করে ননী চুরি,
উদূখলে আর বাঁধিবেনা তায়,
করিবে গলার কাঁটী রে।
যেখানে গোয়াল—সেখানে গোপাল,
সেই সে ব্রজের মাটি রে।
সারা ভারতের সুখ উৎসব
আজিকে গোপের ভবনে,
মধুর মুখর করিতেছে তারা
আজিকার মধু লগনে!

লাখো গোয়ালার বাৎসল্যে যে
লাখোটি গোপাল হামা দেয় যে রে,
আজিকে গোকুল—দেখি সব ঠাঁই,
গোকুল সারাটি ভুবনে।
যশোদা, তোমার এসেছে গোপাল—
নবনীত দাও বদনে।

সুখের ঘর গড়া।

[অতুলচন্দ্র দত্ত।]

(২)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই মাস পরের কথা। সদুর ছেলে গোবর্দ্ধনের একটা ডাক নাম ছিল গোবরা। গোবর্দ্ধন কৈশোর লাভ না করাতে, আর দিন রাত ছেঁড়া কাপড় ময়লা গায়ে রুখু চুলে, বন বাদাড়ে, কাল কাটানোর জন্য তাকে গোবা নামেই ডাকা উচিত। গল্পের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন গোব্‌রার বয়স বাড়িবে, ভব্যতা আসিবে তখন তাহাকে গোবর্দ্ধন বলা যাইবে। তাবৎ নয়। একটা কথা—মানুষ ছেলের নাম রাখিলে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না; গ্রন্থকারের সে প্রিভিলেজ্ নাই। নায়ককে বা উপনায়ককে কমলকুমার না নাম দিয়া বক্কেশ্বর নাম দিলে, বা নায়িকাকে 'হেনা' 'ফেনা' 'এষা' 'ইলা' এ সব নাম না দিয়া রাইমণি, জগত্তারিণী নাম দিলে গ্রন্থকারকে বড় ফ্যাসাদে পড়িতে হয়। ফ্যাসাদ্ আর কি! গল্পটা আপাদশীর্ষ করুণ রসাত্মক হইলেও এই এক নামের বিভ্রাটে পাঠিকার মন হাস্য বা বিরক্তি রসে ভরিয়া যায়। ফলে ট্র্যাজেডীটীর অপঘাত হয়।

বাপের নাম ভোলানাথ আর ছেলের নাম গোবর্দ্ধন। এর কারণ আছে। গোব্‌রার কপালদোষে তাহার দিদিমা (মায়ের মা) তার জন্ম মাসেই তীর্থ যাত্রায় গিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া আসাতে পুণ্য সঞ্চয়ের আনন্দেও বটে আর ঘটনাটীকে চিরস্মরণীয় করিবার ইচ্ছাতেও দৌহিত্রের নাম রাখিলেন

গোবর্দ্ধন। বুড়া গিন্নির খাতিরেই হোক্ আর ভয়েই হোক্, কেহ এ নাম-করণ না-মঞ্জুর করিতে পারিল না। সম্ভ্রমে 'গোবর্দ্ধন' বিরাগ-বিরক্তিতে 'গোবরা' ও আদরে-দরদে 'গোবু' এই নামত্রয় ব্যবহার হইত।

এই গোবর্দ্ধন বাপমায়ের দৌর্ব্বল্যদোষে আর দিদিমার আদর প্রাচুর্য্যে ক্রমেই দুঃশাসন হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যাঠাইমা, দেখিয়া শুনিয়া তাহার সুশাসনের ভার লইলেন। যজ্ঞেশ্বরীর স্বভাবসুলভ কৌশলে ও মিষ্টব্যবহারে সে বশ মানিতে লাগিল।

রথতলার কাছে নিতাই আচার্য্যির পাঠশালা। নিতাইএর একটা ছোটখাটো মুদীর দোকান ছিল। সে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় চাল ডাল মুড়ীমুড়কী ইত্যাদি বিক্রয় করিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা পড়ুয়া জুটাইয়া তাহাদের বিদ্যাদান করিত। পেটে বিদ্যার চেয়ে পিঠে বেত্রলাভ বেশী হওয়াতে বালকবৃন্দ অধিকাংশ সময় নেউগীদের আমবাগানে দিবাবসান করিয়া বাড়ী ফিরিত।

যজ্ঞেশ্বরী একদিন নেউগীপুকুরে স্নান করিতে গিয়া গোবুকে এক আম্রকুল বৃক্ষের শাখায় আসীন দেখিয়া বুঝিলেন দেবর পুত্রের বিদ্যার দৌড় কোন্ দিকে। তিনি বাড়ী ফিরিয়া গামের ইংরাজী স্কুলে তাহার বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা করিলেন। এবং বাড়ীতে তাহাকে পড়ানোর ভার দেওয়া হইল কিরণশশীর উপর। ইংরাজী প্রাথমিক দু' একখানা বই পড়াইবার মত বিদ্যা কিরণের ছিল। কেননা তার স্বামী তাহাকে সখ করিয়া ইংরাজী শিখাইয়াছিল। তবে বেশী নয়। তার কারণ গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্বন্ধটা যে রকম ছিল তাহাতে সরস্বতীদেবী গতিক দেখিয়া অনঙ্গপত্নীকে আসন ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়েন।

যজ্ঞেশ্বরী মারধোর, ভয়প্রদর্শন, দন্তখিঁচন, গালিবর্ষণ প্রভৃতি বঙ্গজনক-জননী সুলভ পন্থা ছাড়িয়া অন্য পন্থা ধরিলেন। গোবরা জ্যাঠাইমার কাছেই সর্ব্বপ্রথম অপেক্ষাকৃত রুচিসঙ্গত 'গোবু' নাম লাভ করে। এবং 'গোবরা' নামের বদলে 'গোবু' নামের প্রয়োজনীয়তা যজ্ঞেশ্বরী সদুকে বুঝাইয়া দিলে গোবর্দ্ধন জ্যাঠাইমার উপর বড় প্রীত হয়। এই প্রীতির বাহ্যচিহ্নস্বরূপ কৃতজ্ঞতায় গোবু তাঁর বশ মানিল। সদু ইহাতে ভারি আনন্দ পাইল। একটা গুরুতর ভার তার মাথা হইতে নামিয়া যাইতে সে হাঁপ ছাড়িল। তার উপর দাদা বিজয়কুমার যখন ছুটীছাটাতে বাড়ী আসিবার সময় গোবুর জন্যে বিলাতি খেলনা আদি লইয়া আসিত তখন যে গোবু পিতৃকুলের চেয়ে পিতৃব্যকুলের বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িবে ইহা আর বিচিত্র কি? আর একটা কারণে

গোবু জ্যাঠাইমার বিনীত গোলাম হইয়া গেল। জন্মাবধি গোবর্দ্ধনের দেহখানি রোগপ্রবণ ও কৃশ ছিল। তাহাকে শমনের অরুচি করিবার মতলবে সদু ও সদুর মা নানাপ্রকার কবচে তাবিজে মাদুলীতে তাগাতে তাহাকে মুড়িয়া দিয়াছিল। গলায় দোদুল্যমান তামার একটা ছোট খাটো ঢাকের মধ্যে দক্ষদেবীদত্ত লক্ষ বামুনের পায়ের ধুলি ছিল। এত করিয়াও গোবরার দেহযষ্টিতে মেদ সঞ্চার হইল না। কফের ধাত তার দুটা নাসা বিবর দিয়া দিবারাত্রি নিজের অস্তিত্ব প্রভাব জাহির করিত। মাসান্তে ম্যালেরিয়া তাহার প্রভাবও প্রকাশ করিত। এডওয়ার্ড বটিকা, জজ্ঞ টনিক ও হেন্‌রী পাচন, কিছুতেই কিছু করিতে পারিত না। ঝাড়ফুঁক জলপড়ার তো অন্ত ছিল না।

যজ্ঞেশ্বরীর এক ভাই ডাক্তার ছিল। এই ডাক্তারটীর চিকিৎসা পদ্ধতির একটু বিশেষত্ব ছিল। ঔষধের চেয়ে পথ্যাপথ্যের ভিতর দিয়া তিনি রোগ সারাইতেন। যজ্ঞেশ্বরী ভাইয়ের কাছে এই অভিজ্ঞতাটী লাভ করেন। তিনি, গোবরের খাওয়ার দিকে নজর দিলেন। তার পড়াশুনার ভার, এবং উচ্ছৃঙ্খল অনাচার কমাইয়া দিয়া ভাল পুষ্টিকর একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; বিশেষ কিছু না; ওরি মধ্যে যেমন যা জোটে তাই করিলেন। বাড়ীতে একটা কঙ্কাল সার গরু ছিল। সে দুধ যত না দিত, চাট মারিত তার চারগুণ। যজ্ঞেশ্বরী তাকে খাওয়াইয়া, আর তার সেবা করিয়া তার চাটের মাত্রা কমাইয়া দুধের মাত্রা বাড়াইলেন। কতকগুলা হাঁস পুষিলেন, তারা পুকুরে চরিয়া আসিয়া ঘরে ডিম পাড়িত। এমনি করিয়া যজ্ঞেশ্বরী বিনা খরচায়, বিনা আড়ম্বরে সংসারের পোষ্যবর্গের খাদ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। গোবরের অন্যান্য উৎপাত অনাচার বন্ধ করিয়া কেবল মাছ ধরিবার পেয়ালটা বাহাল রাখিলেন। তিনি বলিলেন, 'গোবু যে মাছ ধরে আন্‌বে তার অর্দ্ধেক সে একা খাবে, বাকী আর সকলে খাবে।' গোবু এই প্রশ্রয় ও পুরস্কার ঘোষণায় বেশ একটু পুলকিত হইয়া উঠিল। মৎস্য বধের প্রাথমিক অবস্থায় গোবুর আদিম যন্ত্র ছিল, কঞ্চির ছিপ, আলপিন্ বাঁকানো বঁড়শী, আর ঘুঁড়ীর সুতা। জ্যাঠাইমার দৌলতে, সাজ সরঞ্জাম উন্নত সংস্করণের হইল।

দেবর ভোলানাথ একদিন তাহা দেখিয়া বলিল, "বৌদি বুঝি এ সব কিন্‌তে পয়সা দিয়েছ? সুবিধেই হলো, পুকুরটার আবার গড়েন পাড়, আর গভীর জল!

যজ্ঞেশ্বরী। ঠাকুরপো কোনো ভয় নেই। ছেলে ছেলে—একটা আধটা খেয়াল না রাখ্‌তে দিলে অতিষ্ট হয়ে উঠ্‌বে যে! নেবু বেশী কচালে তেতো হয়।

সব দৌরাত্মি বন্ধ কর্‌লে টীক্‌বে কি করে ভাই? আর পুকুরের জল যা বলছ,—ও কিছু না; বিপদ আপদ কোথায় নেই, আর কিসে হতে পারেনা?—সে যাক, তুমি আমাকে একটা মুনীষ মজুর ছদিনের জন্যে এনে দিতে পার?

ভো। কেন? কি করবে?

য। উঠানের পুব দিকটায় জায়গাটা পরিষ্কার করিয়ে একটু ঘিরে নেবো জায়গাটা পড়ে আছে দুচারটে ফুল গাছ লাগাবো মনে করছি। বিশ্রি দেখতেও বটে আর পড়ে আছে এমনি; কাজে লাগালে হয় না? ঠাকুর পুজার জন্যে ফুল পাওয়া যায়না—

ভো। কেন গোব্‌রাকে বল্লেই চৌধুরীদের বাগান থেকে এনে দেয়—

য। 'গোবরা' 'গোবরা' তোমরাও করবে? গোবু বল; গোবরা বল্লে ছেলে ব্যাজার হয় দেখনা?—চৌধুরীদের বাগান হতে ফুল আন্‌তে হবেনা, সেদিন ছেলে গিছলো আন্‌তে। ফুলতো ভারি। গোটা কত কল্কে আর দোপাটী এনেছিল—দরোয়ান মুখপোড়া ছেলের হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে ন্যায়—কেন লোকের বাড়ী চাইতে যাওয়া? ওতে তো পয়সা খরচ নেই, একটু মেহনৎ, রাশ্‌ রাশ্‌ গোবর পচে নষ্ট হচ্ছে ছাইগুলো ফ্যালা যাচ্ছে—সার করে লাগালে কাজ দেখ্‌বে।

গোবর সে সময় উঠানে বসিয়া পরম ধৈর্য্য সহকারে ছেঁড়া খবরের কাগজ ও সজিনা আটা দিয়া একটা শতছিদ্র ঘুঁড়ীর অঙ্গ সংস্কারে ব্যস্ত ছিল। ফুলগাছের নাম শুনিয়া পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল "জ্যাঠাইমা আমি অনেক ফুলগাছ এনে দিতে পারি; চৌধুরিদের ভুনি আর বাসু আমাকে দোপাটী গাঁদার কত বিচি দিয়েছে. আন্‌বো জ্যাঠাইমা দেখ্‌বে?"

য। এখন রেখে দাও নেবো' খন। কি বল ঠাকুরপো?

ভো। তার আর কি। পেহ্লাদ বাগ্‌দীকে ডাক্‌লেই আসবে।

এমন সময় পটলার মা বাড়ীর সাবেক বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল, "বড় মা দৈবজ্ঞ ওবেলা এস্‌বে সে কুন্‌ হলুদবাড়ী গাঁ আছে,সেখানকার মিত্তির বাড়ী গেছে।"

ভো। দৈবজ্ঞকে কেন বৌদি?

য। ডলীর অন্নপ্রাশনের দিন দেখতে—

ভো। কার অন্নপেশন্‌?

য। ডলি তোমার মেয়ে—

ভো। ডলির অন্নপেশন? তুমি কি খেপেছ নাকি বৌদি।

য। ক্ষ্যাপ্‌বার কি লক্ষণ পেলে শুনি?

তো। মেয়ে ছেলের আবার অন্নপ্রাশন।

য। কেন গা? মেয়ে ছেলে কি ছেলে নয় নাকি? (ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা ঠাকুরপো, আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে আর সত্বর অঞ্চলধারী অনুগত ভৃত্য হয়ে মেয়ে জাতের অপমান করছো কি সাহসে?

তো। (হাসিয়া) ঘাট্ হয়েছে বৌদি। না ঠাট্টা নয় অনর্থক বাজে খরচ কেন?

য। কাজের খরচ বাবুদের শ্রীমুখের খোবাকের বেলায় বুঝি? হবেই তো! বলবেই তো। তোমাদের কাছে আমাদের সৃষ্টিটা ভগবানের বাজে খাটুনী, বাজে খরচ -আমরা ব্যাচারী বাড়ীতে এসে জন্মালেই তোমাদের যত বিপদ হয়ে দাঁড়ায়।—মন্দ না? জন্মেছিলে কি পুরুষের গর্ভে? মাই দুধ খেয়ে বেঁচে উঠেছিলে কি পুরুষের?

তো। (হাসিয়া) মাপ কর বৌদি। মুখের মত হয়েছে।

য। সত্বর কাছে নাক-কান মলা খেয়ে মুনীষ ডাক্‌তে যাও—

তো। কি রকম খরচ হবে?

য। যেমন ক্রিয়া হবে তেমনি খরচ—

তো। শুনিই না—

এমন সময় সত্ব আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। চুপি চুপি দিদির কানে কানে বলিল—'কেন দিদি মিছে খরচ?'

য।—আ মর্! তুই ও ওই দলে মিশলি? থাম্ তুই আমি যদি খরচ করি তোর কি? আদর করে শুভদিনে ছেলের মুখে দুটো ভাত দিবি তাতে এত কেন আপত্তি শুনি?

তো। কত খরচ হবে?

য। ধর পাঁচশ?

তো। কি বলছ বৌদি? ঠাট্টা করছ বুঝি?

য। পাঁচশতে যদি ঠাট্টা হয়—পঞ্চাশ হোক্? এবার তো ঠাট্টা নয়?

তো। কাদের খাওয়াবে? কি খাওয়াবে?

য। এই পাড়ার ক'টি লোক, তা ছাড়া ধোপা, নাপিত, জনমজুর; বাউলও দুচারটি; কাঙ্গালী কিছু?

তো। কি খাওয়াবে—? লুচি মণ্ডা?

য। ভাত ডাল, মাছ, তরকারী, দই সন্দেশ—লুচি, মণ্ডা যখন পারবো তখন খাওয়াবো, লোকদেখানো আড়ম্বর কর্‌বার পয়সা নেই ভাই—

তো। তোমার জাতও যাবে, পেটও ভরবে না—

ব। কেন?

তো। জাননি এ গাঁয়ের লোকজনকে তো!—খেয়েও যাবে, নিন্দেও করবে; এই বলে নিন্দে করবে যে অমুকের ভাইঝির অন্নপেশন; খাওয়ালে কিনা ডাল ভাত?

ব। যার যেমন মুরদ। তাই-ই কে খাওয়ায়? নিন্দে করে, করুক না—লুচি খাওয়ালেই কি নিন্দুকের ঠোঁট বন্ধ হবে? নিন্দে করা ওটা কি জান ঠাকুরপো, জিবের রোগ।

তো। যাক্—রাঁধবে কে? এই এত লোকের কাণ্ড।

ব। আমিত আছিই; তবে সঙ্গে আর একজন হলে ভাল হয়; ওবাড়ীর দক্ষ পিসিকে বল্লে হয় না?

সদু। মাপ্ কর দিদি! খবরদার ও কথা তুলনা—

ব। কেন?

তো। বাপ্‌রে! বলবে কি জান—'পরের বাড়ী রাঁধুনীগিরি করতে যাব কি দুঃখে? বল্লে কি সাহসে?

ব। ও মা! তা কে জানে? সে দিন বলছিল যে যজ্ঞি বাড়ীতে রেঁধে খাওয়ানো তো ভাগ্যির কথা।—এ গাঁয়ে ক্রিয়ে কাণ্ডে দক্ষ বামনি নইলে কারুর চল্‌বে না—। এই অম্বল রোগ নিয়ে একশো লোকের ভাত তরকারী রেঁধেছি বউ—তাই শুনে ভাবলুম ডলির ভাতে ওকে ডাক্‌বো।

তো। হ্যাঁ—ওই রসনা দিয়ে উনি যা কিছু করে এসেছেন—ওই পর্য্যন্ত; বলনি যেন ওকে। রক্ষা কর—আমি বরং মাণিক চাটুয্যের বামুনকে কিছু দিয়ে আস্‌বো হালুইকর যদি পাই—

ব। ব্যবসাদার বামুনের হাতে লোক খাওয়াবো ঠাকুরপো?

তো। তাতে কি? এখনতো তাই হচ্চে—

ব। সরকার পাড়ার নন্দী বামনী আসবে না?

তো। তার আবার মুখও চলে, হাতও চলে—

ব। তার মানে?

সদু। বড় ঝগ্‌ড়াটী, তার উপর চুরি করে; হেঁসেলে খায়; তার নানান্ উৎপাত—

ব। ওমা সে কি লো? বামুনের ঘরের বিধবা যে—?

ভো। সে যাক্।—তুমি আবার এক হাঙ্গাম জোটালে—

য। হেঙ্গাম মনে হয় তুমি গিয়ে, তোমার মনিব সেক্রেটারী বাবুর আড্ডায় সে দিন বড়ে টিপো আর ছিলিম পুড়িও—আমরা দু যায়ে যা পারি করবো—মেয়ে এসে খেতো বসো।

ভো। যাচ্ছি। রাগ করনি বৌ দি। আচ্ছা; লোক দেখ্‌বো—এই বলিয়া সুশীল প্রস্থান করিল।

তরু আসিয়া বলিল—মা, দালে কতটা নুন দেবো?

য। এই মরেছে। নুন এখনি কি রে? সেদ্ধ হোগ্—

সদু। ওর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস্ করলে কি বল্‌তো?

য। বল্‌তো ওকে কি আর। আমার খোয়ার হতো; মাগী বল্‌তো, ওমা এ কোন মেয়ের মেয়ে গো। ডালে নুন দিতে জানেনা—।'

সদু। ও তো কালকের মেয়ে, ওর না জানারই কথা। কত পাঁচ ছেলের মা, নাতির ঠাকুমা তাই জানেন না—সত্যি দিদি। আমার বাপের বাড়ীতে এক উকীলের পরিবার (পাঁচ ছেলের মা তিনি) শুয়ে বই পড়ছেন্ ঠাকুর এসে বল্লে 'মা ঘি চাই'—গিন্নি বল্লেন 'ঘি কি হবে? কিসে দেবে?' ঠাকুর বের্ফাঁসে বলে ফেল্লে অম্বলে! বলেই ভয়ে ম্লো মরে। গিন্নি অমনি ভাঁড়াড়ের চাবিটা ছুড়ে দিয়ে বল্লেন 'বের করে নাওগে'।

ভো। গল্পের নায়িকা বুঝি তখন একটু কিছু করে বসেছিল; এত অন্যমনস্ক।

সদু। অন্যমনস্ক কেন? কিছু জানেনা রাঁধ্‌তে—

য। (মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া) শুনলে গা কন্তে।—অম্বলে ঘি দিওনি যেন; তা হলে তোমার শাশুড়ী উঠ্‌তে বস্‌তে আমার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করবে—সেদ্ধ হয়ে থাকুক, সাঁতলাবার সময় দিতে হয়—তুমি বসগে আমি যাচ্ছি।

নলিনী ছিল ঘরের উঠানে, ক্ষার দিয়া ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিতে ছিল। সে বলিল উঠিল; জ্যাঠাই মা, আর তোমার ফ্যানে ভাতে খেতে পারিনি।

য। খেতেই হবে।

ন। মাঁ গো, কেমন কেমন লাগে—

য। কেন কাল্ তো ফ্যান ছিল, জানতেই পারিস নি? বেশ খর খরে হয়েছিল।

য। আমাদের প্রথম প্রথম বিশ্রি লাগ্‌তো! জান তো কর্ত্তার গো ছিল

কেমন! খেতেই হবে;—মুখ বুজে খেতুম সব। বেজা তো দু চার দিন খাওয়া ছেড়েই দিলে। তার পর অভ্যাস হয়ে যায়—মাস কতক পরে মোটা চালের ভাত ফ্যান না ফেলে, ঘি দিয়ে বেশ লাগলো, তরকারীর মধ্যে আলু, না হলেও চলতো, শুধু মাছ, দাল্ তো ছিলই। শুক্তুনি দালনা, চড়চড়ি মচ্চড়ি হ্যান ত্যান বাহান ফরকোটে সময়ও নষ্ট, তেলঙ্গুন মসলার ছাদ, আর গাছপালাতে পেট ভর্ত্তি করা! এ অন্ন খেলেই কাজ বেশী। শরীর ভাল থাকে—পয়সার সুসার হয়।

নলি। আচ্ছা জ্যাঠাই মা, তবে সকলে তাই করে না কেন?

য। অভ্যাস যেমন। অনেক দিনের রুচি, ভাল হোক, মন্দ হোক্ ছাড়তে পারে না, একটু কষ্ট স্বীকার কর্‌লে—অনেক সুবিধে হয়, তা আমরা করতে রাজি নই; যেমনি আমাদেব পুরুষগুলি, তেমনি আমরা, সর্ব্ব বকমে খাঁটী সহধর্ম্মিণী!

মেয়েগুলি সকলে মা-জ্যেঠাইমাব কথায় হাসিয়া উঠিল।

ভোলানাথ আসিয়া কাপড ছাড়িয়া খাইতে বসিল। যজ্ঞেশ্বরী দেবরকে পরিবেশন করিলেন।

পাড়ার প্রসন্ন মুস্তফীর সধবা কন্যা যশোদাসুন্দরী, মধ্যবয়সী, ছেলে কোলে—বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া ভোলার খাওয়ার কাছে বসিল। তখন বেলা ৮৷৷৹ বা ৯টা হইবে; ভোলানাথকে তখন খাইতে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল,—হ্যাঁ ভোলাদা তুমি কি কোথায় যাবে নাকি?

ভো। না।

যশো। এখন খাচ্ছ যে?

ভো। গেরস্থর নতুন রাণীব হাল আইন্।

যশোদা এ রহস্য ভাবার অর্থ না বুঝিয়া একবার ভোলানাথের দিকে ও একবার যজ্ঞেশ্বরীর দিকে তাকাইতে লাগিল। তার ক্রোড়স্থ ছেলে—মায়ের বুকের কাপড় হইতে মাইটা টানিয়া বার করার জন্য ব্যস্ত; রমণীও ভাইয়ের সুমুখে বে-আব্রু হইবার লজ্জায় ছেলের দুরন্তপনাকে—একটি গালটিপ্‌পনীর যোগে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। সে স্তন্যানুসন্ধানও ছাড়িল না, উপরন্তু একটা বিটকেল স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল; যশোদা নিতান্তই বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, মুখপোড়া ছেলের জ্বালায় কোথায় দুদণ্ড বস্‌বার যো আছে? কেঁড়ে গলা ছেড়েছে—

কিরণ সুমুখের এক দাওয়ায় বসিয়া ঠাকুরের পূজার জন্য দূর্ব্বা ও তুলসী

বাছিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—পিসি তোমার নীলমণি চায় নবনী, তুমি দিলে গালটিপ্‌নি—ব্যাচারী না চেঁচিয়ে করে কি ?

যশোদা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া · ভোলানাথকে বলিল—রাণী কে ? কি আইন্ ?—হ্যাঁ দাদা ?

য। শোন ঠাকুরঝি—বেলা ১০টার সময় পেটে ভাতে—কাজে ছুটতে হয়, এই করে করে বদ্ হজমের রোগ জুটিয়েছেন, এত বলতাম যে দু-এক ঘণ্টা আগে খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে তার পর কাজে গেলে হয়—তা ওঁর-ও সুবিধে হয় না ; সদুও সকাল সকাল ভাত দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। আমি এসে অবধি এই করিছি ব্যবস্থা। ওঁর দাদার এমনি অসুখ হয়েছিল। আপিসের সাহেব ডাক্তার ব্যবস্থা করে দেন, বেরোবার দু-তিন ঘণ্টা আগে খাবে ; আর কম্ করে খাবে, তা হলেই সেরে যাবে ; আমি তাই শুনে সব কাজ ফেলে সেই মত ব্যবস্থা করলাম, ভালও হল। এর বেলায় তাই সেই ব্যবস্থাই করিছি—সদু এদ্দিন্ এটা কল্লে—

যশোদা। তা কি করে হয় ভাই ? বিছানা ছেড়ে উঠে বাজে কাজ সারতেই বেলা ৯টা—যাদের সংসারে একলা মেয়ে মানুষ—

যজ্ঞে। ও কি কাজের কথা দিদি ?—কাজের কাজে আগে সময়, বাজে কাজ পরে। স্বামী পুত্রের সুখ সুবিধা আগে তার পর অন্য কাজ। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জুতো লাথি খেয়ে, খেটে পয়সা এনে দেবে, তাদের সুখ সুবিধা আগে, না আমার, পূজা আহ্নিক, জপ্ তপ ছাই মাথা আগে ?

সদু। সকালে উঠে না নেয়ে কাপড় কেচে হেঁসেলে গিয়ে বস্‌লে—

য। কাপড় কাচলেই বা ছাড়লেই হলো—নাই বা নাইলে ?—ও তো শখ করে বসা নয়, দরকারে হেঁসেল নিয়ে বসা। করলে যদি বাড়ীর চাকর পুরুষদের একটু শরীরর ভাল হয় - করতে হবে না ? .

যশোদা। হয় না যে তা নয়, তবে সব তরকারী হয়ে উঠে না—

যজ্ঞে। কেন হবে না ?

যশো। ওই তো তুমি করেছ ? কি রেঁধেছ বল ? সুক্তুনি দাল্‌না চড়চড়ী ফ্যান্‌ভাত—

যজ্ঞে। আমি ইচ্ছে করেই ও সব করিনি, ইচ্ছে করেই ফ্যান্ ভাত করিছি—দেখছি—ওসব না রেঁধেও অল্প পয়সায়, অল্প পরিশ্রমে বেশী ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি কি না—আর কি দেবো ঠাকুরপো ?

"আর কিছু না" বলিয়া ভোলানাথ খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

যশো। তা অমন ক্যান ভাত কেন?

যজ্ঞে। ক্যান্‌টা বড় পোষ্টাই ঠাকুরঝি! ওটা ফেলে দিয়ে আমরা ভারি লোকসান করি—

যশো। ওমা বৌদি বলে কি। ক্যান পুষ্টাই? কথা শোনো; গরুতেই তো খায় জানি। এ সব তোমার হাল ফ্যাশান্ কলকেত্তাই চাল নাকি বৌদি? (সজোরে হাস্য)

যজ্ঞে। হলেই বা কলকেত্তাই? গয়না, কাপড় চোপড়ের ব্যালাই তো আমরা কলকেত্তাই ফ্যাসান না নিয়ে চল্‌তে পারি নি, ভাল বিষয়েই নেবো না কেন শুনি?

যশোদা তর্কে হারিতে ভাল বাসিত না; বিরক্ত হইয়া অন্য কথা পাড়িল। ছোট বৌ সদুকে ধরিল! "হ্যাঁলা ছোট বৌ, তোর নলি যে এক বছরে এক হাত করে বেড়ে উঠ্‌ছে—কি কর্‌ছিস্? বে টে দিবি নি?" সদু কি বলিবে? বুড়া মেয়ের মা হইলে পাড়ার বাক্যবাণ খাইবার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বরী উত্তর দিলেন:—

মেয়ে মানুষের কলা গাছের বাড়। বয়স হলেই বাড়বে বৈ কি? আহা বড় রোগা মেয়ে, আর একটু বাড়ন্ত মাডন্ত না হলে বে দিয়ে কি মেরে ফেল্‌তে হবে?

যশোদা। তা বটে বৌদি, আমাদের বিজ্‌লীর এই পনেরো, এর মধ্যে দুটো ছেলে। চেহারা যেন, শকুনির মত। কিন্তু তা বল্লে তো চলে না, বে দিতে তো হবে। লোক নিন্দে পেতে হবে যে—

য। তা হোগ্। লোক আর কে, তুমি আমার আমি তোমার নিন্দে করবো। এই তো? পাড়াগাঁয়ে আর সহর বাজারে তফাৎ এই দেখছি যে সহরে গায়ে পড়ে উপকার বা অপকার নিন্দে বা প্রেশংসা কেউ করতে আসেনা— এখানে পাড়াগাঁয়ে—অপকার বা নিন্দেটা গায়ে পড়ে করে; উপকার বা প্রেশংসাটি কেউ করেনা—ঠাকুরঝির এই ছেলেটি কোলে নাকি? খাসা গড়ন ছেলের? তরি একবার কোলে করে নিয়ে বেড়াতো তোর পিসি দুদণ্ড জিরোগ, কথা কোগ্। অনেক কাল পরে বনী ঠাকুরঝিকে দেখছি।

কৌশলে অন্য বিষয় অবতারণা করিয়া অপ্রিয় আলোচনায় মুখ বন্ধ করতঃ সমালোচকের অসন্তোষভাজন না হওয়ার এই যে বিদ্যাটি যজ্ঞেশ্বরী দখল করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া সৌদামিনী বিস্মিত ও ভক্তিমুগ্ধ হইয়া পড়িল।

যশোদা অযাচিতভাবে সহানুভূতি জানাইবার অবসর না পাওয়ায় ক্ষুণ্ণ যে

একটু না হইল, তা নয়। যা হোক যজ্ঞেশ্বরীর বাক্যকৌশলে সেও পরাজয় মানিল। কালো একটা বদ খদ্ চেহারার ছেলে তার, সকলেই নিন্দা করে। যজ্ঞেশ্বরী তাকে পুত্রপ্রশংসার মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়া দিল। সেও যদিও Come to scoff, but began to pray অর্থাৎ গাল দিতে এসে গান ধরে দিল।

কথায় কথায় যজ্ঞেশ্বরী যশোদাকে বলিলেন—'ঠাকুর ঝি, আমি তো পাড়া গাঁয়ে এতদিন ছিলাম না, যদিচ পাড়াগেঁয়ে মানুষের মেয়ে আর বৌ বটে; একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করতে চাই—

যজ্ঞেশ্বরীর মত ধনা কন্যা, ধনীপত্নী তাহার কাছে পরামর্শ চাহিতেছে ইহাতে যশোদার মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ হইল। সে বলিল—কি পরামর্শ বৌ? কিসের?

য। সন্থর খুকীর অন্নপেশন দেবো এই মাসে, জন ৬০।৭০ লোক খাবে—তা কাকে বাঁধবার জন্যে ডাকি বল দিকিন? স্বজাতির জন্যে যেন নিজে রাঁধলুম—বামুন কটি আছে—

যশোদা এপাড়ার, ওপাড়ার সেই পাড়ার যত বিধবা সধবা বামনী আছে সবার নাম মনে মুখে আওড়াইয়া তার পর বলিল—হয়েছে বৌদি, লোক পেয়েছি, এখন রাজী হলে হয়—

সন্থ। কে ঠাকুরঝি?

যশ। তারামণি, গোকুল চক্রবর্ত্তীর নাৎনি, নেউগীপাড়ার লো?

সন্থ। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝিছি, কিন্তু সে যে জমীদার বাড়ী কাজ করছে?

যশ। একদিন কিছু দিলেই ওখানে কামাই করতে পারবে—তাদের তো আর একটা লোক নয়, তিনটে চারটে বামুন। আর ওতো রাঁধেনা, ছেলেদের খাওয়া দাওয়া দেখে, রান্না ঘরের কাজ করে—আহা ছুঁড়ীটার কি কপাল?

যজ্ঞে। কেন?

যশ। ওমা। শোননি—তারি দুঃখের কপাল ছুঁড়ীর—তারামণির স্বামীর (হঠাৎ কি রোগে মারা যায়—,বেশ চাকরী বাকরী করছিল খুব স্বচ্ছল না হোক, অস্বচ্ছলে তো নয়, সুখে দুঃখে চলে যাচ্ছিল; বিধাতার এই বজ্রাঘাত আজ দুবছর হ'ল। দুটী ছেলে, একটী তার তেরো বছরের মেয়ে, আর কোলে একটা মেয়ে বছর তিনেকের; ছুঁড়ী) কোনোমতে বছর খানেক স্বামীর ভিটের থেকে তার পর চক্রবর্ত্তীর বোনের পিসির ঘাড়ে এসে পড়েছে; সে মাগী নিজই খেতে পায় না, তার ওপর এতগুলি পুষ্যি নিয়ে বিব্রত।

যজ্ঞে। ওর স্বামীর ভাই টাই কেউ নেই ?

যশ। কেন থাকবেনে ? দু-ভাই, ভাসুর আর দেওর ; দুজনেই কলকেতাতে বেশ চাকরী করে ; তারা ভার নিতে চায় না ; তাড়িয়ে দিয়েছে ; শুনলে আশ্চর্য্য হবে বৌদি যে কদিন ভাত দিয়ে ছিল তা কত ব্যাজার বিরক্ত হয়ে। বড় ছেলেটার বলে নাকি টাইফাই জ্বর হয় ডাক্তারের কথা বল্‌লে ভাসুর আর বড় মা বল্লে হাঁচলে কাশ্‌লেই ডাক্তার আনতে গেলে আমাদের আর পেটে খেয়ে টীকতে হবে না এই কলকাতা সহরে -'। ঝ্যাচারী তখন তার শেষ সম্বল স্বামীর সোনার ঘড়িটী বাঁধা দিয়ে টাকা আন্‌তে যায় তাতে দেওর বল্লেন ও তো... তাঁর একলার জিনিষ ছিলনা যে বাঁধা দেবেন ? বাবার ঘড়ি, ওতে আমাদেরও ভাগ আছে—দিলে না নিয়ে যেতে মুখপোড়া মিনসে !

যজ্ঞে। বল কি ঠাকুর ঝি। সত্যি ?

যশো। ওমা শোন কথা। আমি বানিয়ে বলছি না ? এই ছেলে কোলে মিথ্যে বলাবলি ভাই ? ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা করো—

যজ্ঞের। ছিঃ ছিঃ ছেলের দিব্বি করে ? এ রকম কথা মানুষে বল্‌তে পারে, বিশ্বাস হয় না যে ! তার পর ?

যশো। কলিতে অবিশ্বাসের কি আছে— ? তার পর—তারামণি ছেলেদুটো আর মেয়ে দুটো নিয়ে এসে পিসির কন্ধে পড়েছে—

যজ্ঞে। যায় কোথা বল ? মা, বাপ, ভাই কেউ যে নাই।

যশো। ভাই আছে বই কি ? সে পচ্চিমে কোথা রেল ইষ্টিশেনে ভাল কাজ করে গো ; তারামণি তিন চার খানা পত্র লিখে কোনো উত্তর পায়নি—শেষে কি করে পিসির আশ্রয়ে এসেছে—

যজ্ঞে। বয়স কত ?

যশো। কত আর হবে ? আমার চেয়ে দু এক বছরের ছোট বড় ; জোর ২৭।২৮ ; সোমত্ত বয়স, দেখতে যেন দুর্গা ঠাকুর। আর তার ছেলে মেয়ে, গুলো, বৌ, যেন হলুদ পোকা আহা চোখ জুড়াবার। কিন্তু খেতে না পেয়ে হাড় সার। ছেলে দুটোর পড়া বন্ধ ; মেয়েটা বছর দশ এগারো ! বে দিলেই হয় ; আহা যেন ছবিখানি। বুড়ী তো অথর্ব্ব ! তারামণি জমিদার বাড়ী কাজ করে ; মেয়েটাই রাঁধে বাড়ে ; ভাইদের খাওয়ায়, কোলের ছোট মেয়েটাকে মানুষ করে—ছেলে দুটী এগা ওগা করে ভিক্ষে করতো।

যজ্ঞে। এখন ?

যশো। এখন? বড়টি মার কাছে? আজ ছমাস হল, নয় লা ছোট বউ? রোদে, জলে, অনাহারে ঘুরে ঘুরে রোগ ধরলো, ছেলেটা মরে গেল! মেজটা জমীদার বাড়ী কি কাজ করে।

যজ্ঞে। পড়ে না?

যশো। কে পড়াবে?

যজ্ঞে। জমীদার মনিব—ইচ্ছে করলে পাবে না?

যশো। কত লোককে পুষবে ভাই? ওর মাকে তো দিচ্ছে ভাত কাপড়?

যজ্ঞে। সেতো খাটিয়ে নিয়ে, দয়া করে নয়? কত মোসাহেব পুষছে? হাতি ঘোঁড়া, কুকুর, দরোয়ান এদের মধ্যে ওই ব্রাহ্মণ ভদ্র সন্তানটির পড়ার খরচ কুলোয় না? জমীদার ভাই ভাসুর, মরুকগে, পিসি তো খুব বাহাদুর বটে।

সদু। বলে। শুনলে দিদি আশ্চর্য্য হবে। যখন তারামণি এসে দাঁড়ালো, ওর মেয়ের ভয়ে তো মরে যায়; বুঝি পিসি তাড়িয়ে দেয়,- বুড়া সমস্ত শুনে ভেউ ভেউ করে কেঁদে সারা,—কোলে টেনে নিয়ে ছেলে গুলিকে বল্লে—"আমার কাছে আরো আগে এলিনি কেন ভাই?" তারামণি বল্লে—"তোমার তো এই অবস্থা, আমি কি করে মাথায় এসে বোঝা হয়ে পড়ি?—" বুড়ী বল্লে— "বোঝা কি আমি বই? যার বোঝা সেই বয় মা . কে কাকে খাওয়ায়? কে কার অন্নদাতা, মা? ('আয়, আয়," হতভাগা এই সব সোনার চাঁদ ফেলে কোন যমের বাড়া গিয়েছে) ?—" এই বলে সব গুলি পুষছে—বুড়ী এখন খাটে কত? মান অপমান নেই, যেখানে দুপয়সা পায়, গতর খাটাতে যায়—ওদের মুখ চেয়ে—

যজ্ঞে। আর ওই মানুষকে তোরা গাল দিচ্ছিলি সে দিন?

যশোদা। যে বুড়ীর মুখ।

যজ্ঞে। মুখটাই দেখিছিলি—বুকটা না রে?

যজ্ঞেশ্বরী একটা দীর্ঘ গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। তার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। কি একটা মতলব করিলেন। মেয়ে কিরণশশী মায়ের ধাত জানিত, সে একা যেন আভাষে বুঝিল মায়ের মনে কি হইতেছে।

যশোদা চলিয়া গেল। আর সকলে যার কাজে গেল।

(ক্রমশঃ)

বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তি।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।]

বঙ্গসাহিত্যের যে স্তরে আমরা এখন উপনীত, তাহা বহু কাল ও ধর্ম্মের উত্থান ও পতন, সংঘাত ও প্রতিঘাত, বাদ ও বিসংবাদের পরিণতি। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে বঙ্গদেশের হিন্দু অহিন্দু নরপতি সম্বন্ধে কালে কালে অনেক সত্য মিথ্যা প্রচলিত হইয়াছে—তাহার মধ্যে হয়ত কিছু ঘটিয়াছিল, কোনোটির সম্বন্ধে উক্ত নৃপতিও হয়ত অজ্ঞাত, তাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে—ঐতিহাসিকগণ সত্যনিরূপণে তাহার জন্য সবিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের যে ইতিহাস আপনা হইতেই লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাহার জন্য অত বেশী সন্ধান হয়ত বা করিতে হইবে না। কারণ, যাহা মানব বিশেষের, তাহার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা মানব-সাধারণের চিন্তার এবং আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা তাহার মধ্যে সাহিত্যে কোন কিছুর দ্বারা তাহাকে বিবৃত করা যায় না।

দেশে, সমাজে এবং মানব-তন্ত্রের মধ্যে জাতীয় জীবনকে সংক্ষুব্ধ করিয়া যখনই যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি অমনি তাৎকালীন সাহিত্যে সকলেরই অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছে। চিন্তাফল-ভারাবনম্র জাতির জীবন-বৃক্ষ যেমনি কোনো কারণে চঞ্চল হইয়াছে, অমনি তাহা হইতে ভূপৃষ্ঠে শাখাচ্যুত ফলরাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে। এ গাছ যখন প্রবলতর বেগে দুলিয়াছে, তখন তাহা হইতে অপক্ক ফল ও যে না পড়িয়াছে, তাহাও বলা যায় না। মানব-মনে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা বসানই আছে, তাহার সম্মুখে যে কার্য্যই হইয়াছে, তাহারই প্রতিমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইয়া, সাহিত্যের negativeএ তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

শিল্পকলা সৃষ্টিতে বৌদ্ধ যুগই এদেশকে প্রথমে উদ্বুদ্ধ করে, বৌদ্ধযুগে বাংলা ভাষার কোনো প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায় না, কাযেই সে সাক্ষ্য বাংলা সাহিত্যে তেমন নাই-ও। আজ কালকার দুই এক জন পণ্ডিত যদিও প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, বৌদ্ধ-যুগেও বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সে

ভাষা যে বাংলা ভাষা, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে যাহাই হউক, বৌদ্ধযুগের পর হইতেই আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ যুগের শেষে, গৌড় যে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রবল আধ্যাত্মিক লড়াই বাধিয়াছিল, তাহাই যেন বঙ্গ সাহিত্যের ভাগ্য-সূচনা করিয়া দিয়াছিল। এই যে বৌদ্ধ-মঠে হিন্দুর মন্দির প্রতিষ্ঠা, - এক দেবতাকে বিদায় দিয়া অন্য দেবতাকে সংবরণ, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে অন্য সম্প্রদায়ের তীর্থ রচনা, এই যে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং নূতন পুরাতনের ঘাত প্রতিঘাত, ইহার ইতিহাস, সঠিক না পাওয়া গেলেও পরিবার মধ্যে কোনো শুভাশুভ ঘটনা ঘটিলে বাড়ীর লোকের মুখ দেখিলেই যেমন সাধারণতঃ ঘটনায় কতকটা আভাষ পাওয়া যায়, তেমনি —তৎকালীন বঙ্গ সাহিত্যে সে বিপ্লবের ইতিহাস কিছু পাওয়া যায়।

এই ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্য্য অনার্য্য শক হূন্ হইতে আরম্ভ করিয়া কত কত জাতির ধর্ম্মের এবং সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও পতন সংঘটিত হইল, কিন্তু এই যে বিরোধ এবং বিপ্লব ইহার মধ্যে কোথাও তিক্ততা বা অসামঞ্জস্য নাই। আর্য্যেরা অপূর্ব্ব নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা-প্রাখর্য্যে, এই অন্তহীন পারম্পরিক উচ্ছেদ উদ্যমকে এক নিবিড় শান্তি এবং সমন্বয়ের সাম্যে আপনাদিগের উদার মতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, মিলাইয়া মিশাইয়া, এক করিয়া, সসম্মানে বরণ করিয়া লইয়াছেন। নিপুণ পাচকের গুণে এই সব নিম উচ্ছে করলাও অপূর্ব্ব মুখরোচক ব্যঞ্জনরূপে আজ পর্য্যন্ত পরিবেশিত হইতেছে।

এই যে দ্বন্দ্ব, ইহার মূল কারণ দেবদেবীর পূজা-প্রতিষ্ঠা লইয়া। এক এক সম্প্রদায় আসিলেন, তাঁহাদের মনোনীত কোনো এক বিশেষ দেব-দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। অন্যদল তাহা প্রচলিত অভ্যস্ত ধর্ম্মমতের খাস্ জমিতে নূতনকে ইঁট গাড়িতে দিবেন না বলিয়া, অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। এই যে বিরুদ্ধাচরণ, ইহা শারীর বলে, অসির দ্বারা নয়, মসীর সাহায্যে। উভয় দলের যত বিবাদ, সব নিজ নিজ দেব-দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে। বৈদিকযুগে এই রূপে একে একে এই দেশে সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদিগের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার পর শিবপূজা চলিল। তারপর মাতৃকাপূজা, চণ্ডী কালী দুর্গা প্রভৃতি নারী শক্তি বা প্রকৃতি পূজার যুগ আসিল। তাহার্য্যে,

কল্পনায়, কাব্যে, গানে, সাহিত্যে যে সম্প্রদায় যত নিপুণ ছিল, তাহাদের প্রবর্ত্তিত মত তত শীঘ্র জয়ী হইয়া, তত বেশী স্থায়ীও হইয়াছিল। এই যে নিয়ত ধর্ম্ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন, ইহার কারণ আর কিছুই নয়—কেবল নূতন সম্প্রদায়ের জয়লাভ। কিন্তু এই যে বৈচিত্রময় অনবরত ধর্ম্ম বিপ্লব ইহার কোন একটিই স্বাধীন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, অথচ সব গুলিই বিপুল হিন্দু ধর্ম্মের অতিথিশালায় সকলের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়া চিরদিনের মত বসবাস জুড়িয়া দিয়াছে। প্রথম দিন যখন ইহারা তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্ম মতের স্থির সিংহাসন প্রকম্পিত করিয়া, উন্মত্ত জিগীষার বিপ্লবের রক্ত-নিশান উড়াইয়া রাজ্যের নগরপ্রান্তে মহাকোলাহলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, হয়ত তখন হিন্দু ধর্ম্ম-মতের বিরাট বারণ চকিত হইয়া দুই একবার শুণ্ড আস্ফালন করিয়াছিল, কিন্তু আর্য্য সেনাপতি আধ্যাত্মিক বণ চাতুর্য্যেব ফাল্গুনী—উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া, সন্ধি করাইয়া দিলেন এবং সেই হইতে উভয়েই বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া, আজও তাঁহার চরণে ভক্তি-কবদান করিয়' ধন্য হইতেছে।

বেদ আর্য্যদিগের উপব যথেষ্ট প্রভাবই বিস্তার কবিয়াছিল, কিন্তু সাহিত্য রচনা করে নাই। বেদান্ত তাহা কবিয়াছিল। কিন্তু বেদান্তের ধর্ম্মমতে জন-সাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পাবিল না। উৎসবহীন জ্ঞানমূলক শান্ত মায়াতীতকে, লোকের মনকে তেমন নাড়া দিল না বলিয়া, কেহ তেমন আদবও করিল না। তাহারা উৎসব চায়, রূপ চায় শক্তি চায়—কাযেই আরাধনার জন্য অন্যমতের প্রয়োজন হইল,—চণ্ডী আসিলেন। বৈদান্তিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে উগ্রচণ্ডা শক্তি মাতৃকার অভিষেক হইল। যাহাব যাহা নাই বা ছিলনা, সে তাহা পাইলে তাহার সম্যক ব্যবহার করিতে পারেনা; যেমন চির দরিদ্র হঠাৎ ধনশালী হইয়া উঠিলে, হয় সেই ধন যক্ষের মত পুঁজি কবে অথবা দুই দিনেই উঠাইয়া দিয়া পুনর্মূষিক হয়—ভোগে লাগাইতে পারে না। সেই চণ্ডী পূজার আবির্ভাবে তখন দেশবাসিগণের হৃদয় আনন্দে উল্লাসে ও উৎসাহে উদ্বেল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু চণ্ডীর শক্তিটি ঠিকমত উপভোগ করিয়া জনসমাজের সম্মুখে প্রকটিত করিতে পারিল না। চণ্ডী শক্তীশ্বরী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি প্রসাদ-ঐশ্বর্য্যময়ী হইল না, নিতান্ত দাম্ভিক এবং উচ্ছৃঙ্খল হইল বলিয়া লোকের প্রীতি অপেক্ষা ভীতিকেই সমধিক আকর্ষণ করিল। চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিকীর্ত্তনে দিকে দিকে নব নব গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। অনেক দিনের অবসন্ন হৃদয়-তন্ত্রীতে আবার আনন্দ সমারোহের তার, সুর-সপ্তকে

য়া পড়িল। চিরদিনই নূতনের একটা সদা মাদকতা থাকে, তখনও ছিল। পুরাতন পূজা-পদ্ধতি, যাহা ক্রমে ক্রমে সমস্তই বিরাট হিন্দু ধর্ম্মের বিপুল দেউলে পরগাছা হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রতি লোকের আর তেমন আস্থা ছিল না, সকলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথম যখন শিবপূজা চলিয়াছিল, তখন শিবের মধ্যে চণ্ডতা উগ্রতা ও একটা প্রবল সংহার শক্তি ছিল। পরে ক্লান্তের মত, সেই প্রচণ্ড দেবতা যোগ-সমাহিত শ্মশানের দেবতারূপে নির্গুণ স্থির ও নিশ্চল হয়েন। তাঁহার দেহ হইতে সে দিন যে শক্তি আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহা স্বতন্ত্র ভাবে শক্তিরূপে আবির্ভূত হইলেন। শক্তি ও শক্তীশ্বরী দুইটি পৃথক সত্তায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

প্রথমত এই যে শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল, এ শক্তিতে ন্যায় ধর্ম্ম বিচার নীতি পরিলক্ষিত হইল না। এ যেন ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্পন শক্তির মত একটা যথেচ্ছাচার বিচার-বুদ্ধিহীন প্রচণ্ড শক্তির পূজা। নৈসর্গিক উৎপাতে যেমন এক দেশের এক জাতির ধ্বংসের উপর দেশান্তরে জাত্যন্তরের অভ্যুদয়ও কখনো কখনো সম্ভব হয়, তেমনি চণ্ডীর-শক্তিও একটা প্রলয়শক্তির মত প্রচণ্ড ধ্বংস-লীলায় বহুদিনের নিশ্চেষ্ট অসাড় বৈদান্তিক অলস স্বভাবের উপর একটা কর্ম্মোদ্যমের জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল। সদ্যনিদ্রোত্থিতের মত বিমূঢ়াবস্থায় তাহারা তখন ভাবিবার চিন্তিবার কোনো অবসর পায় নাই - যাহা পাইয়াছিল অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহাই তখন তখন যদিও লইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে নাই।

বঙ্গদেশে এই যে নারীশক্তির চণ্ডীলীলা প্রবর্ত্তিত হইল, ইহাই বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যের গতিতে একটি নূতন বেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের এই যদৃচ্ছাচারিণী ধ্বংসলীলাবিলাসিনী শবকবরাসবারিণী চণ্ডী অনতিবিলম্বেই স্নেহ বাৎসল্য মাধুর্য্যের অমৃতময়ী সৃষ্টি-স্থিতি কুশলা সর্ব্বমঙ্গলা মাতৃমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইলেন। চণ্ডী—অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, উমা, লক্ষ্মী, প্রভৃতিতে শতধা বিভক্ত হইলেন। এই মঙ্গলময় চিরমাধুর্য্য-রসাভিষিক্ত দেবী মূর্ত্তিগুলি এ দেশবাসীর মনে মনে ভবনে ভবনে অচল আসন স্থাপন করিলেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, এবং এত দিনের বিভীষিকা-স্তম্ভিত মূক নানা কবিকণ্ঠে শতেক ছন্দে শতেক তান-লয়ে মাতৃমহিমা এক সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলা সাহিত্য অনেক দিনের অনেক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে বর্ত্তমান রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ

যুগের শেষ শয্যায় শৈবধর্ম্ম যখন আপন অধিকারের দাবী জানাইতেছিল, তখন বাংলা সাহিত্যের গতি এক ছিল। তাহার পর, এক উদাসীন নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যুগ। তৎপরে, সেই বিরাট নিশ্চেষ্টতাকে আহত করিয়া জাতির জাগরণকে উদ্বুদ্ধ করিতে শক্তি পূজার কাল। কিন্তু এমন মৃত্যুতাণ্ডব-প্রিয়া উচ্ছৃঙ্খল শক্তির পূজায় বাংলাদেশ যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন আসিল মঙ্গলময় মাতৃপূজার শুভলগ্ন। বাংলার সাহিত্য আপনার গতি আপনি দেখিতে পাইয়া বন্ধন মুক্ত স্বাধীন ভাবে সুপথে চলিতে আরম্ভ করিল।

দেশে যখন বহুদেব বাদ প্রচলিত ছিল তখন লোকের মন তাহাদের মধ্যে কোনো একটিতে আকৃষ্ট হইত এবং অনাহত বৈচিত্রহীন অবস্থায় তাহাতেই আবরণ লাগিয়া থাকিত। এতদ্দ্বারা লোকের কল্পনা তেমন উত্তেজিত হইত না। লোকের মন প্রথম সজাগ হইয়া সাড়া দিল, যেদিন ডমরুনিনাদে দেশে পিশাচ-পতি ভূতনাথের আগমনী গানে ঢাকে কাঠি পড়িল। প্রথম শৈবধর্ম্ম লোককে চেতাইয়া তুলিল—একটা পরিবর্ত্তন, একটা নূতনত্বের মদে,—কিন্তু তাহা আবার তেমনি অবসন্ন করিয়াও দিল। মদ্যপান করিবামাত্রই শিরা উপশিরার দ্রুত রক্ত সঞ্চালনে মন যত জোরে উত্তেজিত হয়, আবার নেশা কাটিলে তত জোরেই যেমন অবসন্ন হয়, তেমনি লোকে বহু দেববাদের শুষ্ক একঘেয়ে জীবনাতিবাহের মধ্যে নবীন শৈব ধর্ম্মকে খুব সোৎসাহেই বরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বেশী দিন রাখিতে পারিল না—বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের অবসাদ আসিয়া ঘিরিল। কাজেই মনকে ঠেলা দিয়া গুঁতা মারিয়া উঠাইবার মত, প্রচণ্ডতর শক্তির পূজা আনিতে হইল; কারণ নেশা যাহার দৈনিক, তাহাকে উক্ত মাদকের মাত্রা ক্রমশই বাড়াইতে হয়, নচেৎ সম মাত্রায় কোনো ফল হয় না।

উত্তরোত্তর এইরূপ মাত্রা চড়াইয়া উত্তেজিত হওয়ার পরিণাম অকালমৃত্যু, বুঝিতে পারিয়া লোকে তখন উত্তেজনার জন্য একটা স্থায়ী আনন্দের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। হাতের গোড়ায় নারীশক্তি ছিল, তাহার হস্ত হইতে উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসের শাণিত কৃপাণ লইয়া তাঁহাকে মাতৃমূর্ত্তির বরাভয় দিয়া দেখিল, যে এতদিনে তাহারা সত্য সুন্দর ও মঙ্গল পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে—চারি দিকে কোটি কণ্ঠে গীতে সঙ্গীতে কাব্যে তাহাদের আনন্দ-কোলাহল ধ্বনিয়া উঠিল। সেই আনন্দ-সঙ্গীত সাহিত্যের পাত্রে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন নিত্য রসের উৎস-ধারায় মহা মহোৎসবে দেশময় ছড়াইয়া গড়াইয়া উপচিয়া পড়িল।

শিব শক্তির ভীষণতায়, বৈদান্তিকের শুষ্কতায়, ভয়াল উষর মরুর উপর স্নিগ্ধ

সজল বর্ষা নামিল বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক এবং অসম্পূর্ণ, যদিও সেই বর্ষার ধারাভিঘাতে অদূর মরুপারের ক্ষেত্রগুলি সামান্য একটু সরস হইয়াছিল মাত্র। ইংরাজেরা ভোজনের আগে ক্ষুধা-বর্দ্ধক (appetiser) খায়, যাহা কেবল ক্ষুধার উদ্রেকই করে, ক্ষুধার উপশম করে না। এই মাতৃপূজার দিনেও তেমনি মানবের মনে একটা ক্ষুধার প্রবলতাই শুধু বর্দ্ধিত হইল মাত্র, কিন্তু আসল ক্ষুধা কিছুমাত্র কমিল না। এতদিন পীড়িত মনে কেবল দুষ্ট ক্ষুধারই যে সম্ভব হইতেছিল, এক্ষণে স্বাস্থ্যপূর্ণ সবল মনে তাহার স্বাভাবিক ক্ষুধাই জ্বলিয়া উঠিল। এই শক্তি-পূজায় আমরা অনেক উপরে উঠিয়াছিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যেন না-নীচে না উপরে, এমনি মাঝামাঝি একটা জায়গায়। অর্থাৎ যে-স্থান হইতে নামিতে আর ইচ্ছা হয় না, কেবল নিকটবর্ত্তী উপরে উঠিবার জন্যই একটা প্রবল একাগ্রতা হয়, অথচ একেবারে উপরের তালায় উঠাও শক্ত। মাতৃ-পূজার যুগে আমাদের মনের অবস্থা ছিল যেন আমরা এক হইতে অন্তরে যাইতেছি, জ্ঞানের এই বাৎসর্য্য শক্তির নিকট রাজকর দিয়া আমাদিগকে তাহার চিরদিনকার গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল। শক্তির পূজা করিয়া—অর্থাৎ শক্তিকে ভয় করিয়া, শক্তি অর্জ্জন করিবার অনিচ্ছা জন্মিল—শক্তির দাগ কাহারও মনে বড় পড়িল না। শক্তির পূজা টিকিয়াছিল শুধু লোকভয়ে, এবং অকারণ অনিষ্টপাতের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য; যেমন আজ পর্য্যন্ত শীতলা, ওলাই "চণ্ডী", মনসা প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা প্রচলিত। শক্তিকে বড় করিয়া ভয় করিয়া দেখিবার দরুণ, শক্তি সকলের মনের ধারণার বাহিরেই রহিয়া গেল। মানবের বিস্ময়াবিষ্ট আনন্দ নিজের মধ্যেই ক্রমশ শুকাইয়া-যাইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে বাঙ্গালা দেশের হৃদয় মনে একটা প্রবল আবেগ অথচ দেহ অবসন্নপ্রায় চলচ্ছক্তিহীন, ঠিক সেই সময়ে বৈষ্ণবের অমৃত নিস্যন্দিনী সঞ্জীবনী সুধা শ্রাবণ ধারায় বাঙ্গলার কাননে কান্তারে নগরে প্রান্তরে বহিরন্তরে নামিয়া দেশের পথ ঘাট বাট সব পরিপ্লাবিত করিয়া দিল। বাংলার নরনারী দেখিল যে, এতদিন তাহারা যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৈষ্ণব চিরন্তন নরনারীর হৃদয়ের নিত্য সত্য দুয়ারটি খুলিয়া দিল। মানব দেখিল —তাহার অন্তরে কুবেরের কোষ, অনকার সৌন্দর্য্য, জগতের স্থাবর জঙ্গম, সকলি সেখানে প্রচুর। তাহাদের মনের সমস্ত বাতায়নগুলি অকর্ম্মণ্য দক্ষিণাগত বাতাভিঘাতে একেবারে খুলিয়া গিয়া, নব বসন্তের চ্যুত-মুকুল সৌরভে কক্ষগুলি একেবারে ভরিয়া গেল। যে শ্যামশোভা জীবনারম্ভ হইতে অবলোকন

করিয়া কাঁদিয়া নয়ন যুগল বিশেষ কোনো আনন্দ না পাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—আজ আর চক্ষু সে বিস্তৃত বিপুল শ্যামশোভান্বিত ধরণীবক্ষ হইতে ফিরাইলেও ফিরিতে চাহে না। আজ যেন তৃণ-তরুলতায় পল্লব-দল-কিশলয়ে এবং বিহ্বল-হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় শোভা জাগিয়া উঠিয়াছে—যাহা চির-তরুণ, চির-মোহন, চিরন্তন। হাজার কণ্ঠে মানবের নিত্য সত্যশুভ সুন্দর উজ্জ্বল গীতি ভাসিয়া উঠিল। মাতৃ-পূজায় যাহা পৃথক সত্তায় ছিল, বৈষ্ণবযুগে তাহা এক হইয়া নিবিড় হইয়া গেল। এতদিন যে ভাব প্রাণে ছিল, এবার তাহা মনে আসিল, যাহা দেহে ছিল, তাহা হৃদয়ে পৌঁছিল। যাহা দূরে ছিল, তাহা নিতান্ত নিকটে আসিল। জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি যে ভাবকে এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ প্রেম তাহার দ্বারা জগৎ-সংসার ব্যাপিয়া লইল। জ্ঞান যাহা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, আজ প্রেম সেই সব ঘুলাইয়া দিল।

শত শত কবির কাব্যে, গায়কের গানে, ভক্তের আত্মনিবেদনে—বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি অগাধ অকূল ভাব সমুদ্রে পাড়ি দিল। অব্যাহত গতিতে বাংলার সাহিত্য দুর্ম্মদ বেগে ছুটিয়া চলিল, কোনো বাধাই মানিল না। সুর তরঙ্গিণী যখন ব্যোমপথ বিদারিয়া কোটি কোটি. আকুল নরনারীর কাতর আহ্বানে ব্যথিত হইয়া, এই শুষ্ক তপ্ত মেদিনীর ক্লিষ্ট বক্ষ পঞ্জরের উপর পতিত পাবন ধারায় উচ্ছ্বসিত আবেগে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ত্রিদিবনাথের ঐরাবতও সে বেগ ব্যাহত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব যুগের নব সাহিত্য প্রচুর ভাবৈশ্বর্য্যে চিরন্তন নরনারীর সুখ-দুঃখ-কাহিনীর অনাবিস্কৃত মহাসিন্ধুতে আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। যুগগুরুগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের শিষ্যেরা যেমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সহজ বিধি বিধানগুলিকে নানারূপ কূট টীকা এবং আধ্যাত্মিক অর্থে রহস্যসমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া নিজেদের উদরান্নের উপায়ান্তররূপে অবলম্বন করিয়া, জনসাধারণকে প্রতারিত করে, তদ্রূপ আদিম বৈষ্ণব-যুগের কাব্য-গীতিকায় যে সার্ব্বজনীন মঙ্গল ও সুন্দর সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে, তাহা ব্যক্তি-গত কামবিলাস-কাহিনীর কুরুচিতে একেবারে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজিও অনেক ধনুর্দ্ধর সমালোচকরথী সেইগুলিতে আধ্যাত্মিক অর্থ বসাইয়া পূর্ব্ব-কথিত শিষ্যদের মত সাহিত্য চর্চ্চার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং সেইগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলিয়া বুঝাইতে বৃথা প্রয়াস করেন।

সেই সব সমালোচক-পুঙ্গবগণ জানেন না যে, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কোথায় ও সাহিত্য কাহাকে বলে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, সেই সব উদ্ভ্রান্তমতি লোকদিগকে

কোনো লেখকই বুঝাইতে পারিবেন না যে তাঁহাদের সঙ্গে লেখকদের মতের অমিল কোন্ স্থানে। যে কখনও আম্রফল ভক্ষণ করে নাই, তাহাকে আম্রের স্বরূপ বোঝানো যেমন অসাধ্য—তেমনি যে সব তথাকথিত সাহিত্যিকের সাহিত্যের সৌন্দর্য্য জ্ঞান নাই, তাঁহাদের মাথায় সেই জ্ঞান দেওয়াও তেমনি অসম্ভব, মাছ ধরা জালে ময়দা চালা যেমন অসম্ভব। কিছুদিন আগে আমি কোনো একটি প্রবন্ধে * বৈষ্ণব সাহিত্যে পরবর্ত্তী যুগে যে কৃত্রিমতা আসিয়াছিল—যাহা সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী এই কথাটি বলিবার উপক্রম করিবা মাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে যে অমানুষিক কিচিমিচি উঠিয়াছিল, তাহার গোলমালে আমি আমার সে বক্তব্যটাকে চাপা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ, তাঁহাদের যুক্তি শুনিয়া কিছু জ্ঞান লাভ করিব—এই আশায়, কিন্তু সেই সব আলোচনাতে "আলো"র অংশ এতই কম ছিল যে, শেষোক্ত পদার্থে ঘটিত পিচ্ছিলতায় অতি কষ্টে দেহখানিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আজ এই সুযোগে, সুযোগ্য পণ্ডিত সংসদে প্রেমের সেই অসমাপ্ত কথাটিও সংক্ষেপে এইখানে একটু বলিব। বোধ হয়,—তাহা এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাহিত্যের গতি সাহিত্যের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে। সাহিত্য কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নহে, সর্ব্বদেশেই নানা নানা বিপত্তি, পতন অভ্যুত্থানের উচ্চ দুর্গ ভেদ করিয়া তবে বিকশিত হয়। মানুষ যেমন গায়ের জোরে অন্তরায় অপসৃত করিয়া চলে, সাহিত্য কিন্তু ঠিক গায়ের জোরে চলে না। তাহার নিজস্ব একটা জোর আছে। সে জোরটা কোনো দর্শনত নয়, কোনো তত্ত্ব নয়, কোনো জটিল রহস্য নয়, কোনো উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানের কথা নয়, নিতান্ত সহজ সরল একটা আবেগ মাত্র।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। নৈসর্গিক সৃষ্টি-লীলাতেও আমরা দেখিতে পাই যে—আকর্ষণে বিকর্ষণে, সংযোগে বিয়োগে, সৃষ্টির কার্য্য অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল চলিতেছে। আমাদের মনের মধ্যে যে জগৎ আছে, তাহা ভাবের জগৎ। এই ভাবের দেশেও সেই একই নিয়মে যে বিচিত্র সৃষ্টি চলিতেছে—তাহাই সাহিত্য। তবে বাহিরের সহিত অন্তরের জগতের প্রভেদ এই যে, বহিঃ সৃষ্টি নশ্বর, তাহা ঋতুতে ঋতুতে, যুগে যুগে, বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তনশীল, আর অন্তরের সাহিত্য-সৃষ্টি তাহা চিরকালের, তাই সে চিরদিনের নরনারীর অন্তরের বস্তু হইয়া থাকিয়া যায়। সাহিত্য-সৃষ্টি অমর।

* "নূতন বনাম পুরাতন বঙ্গ সাহিত্য"—প্রবাসী, ব ১৩২৫।মা

মানুষের মন বাহিরের সমস্ত অবস্থা, কাল ও পাত্র হইতে মধু আহরণ করিয়া অন্তরে বসিয়া তাহার সাহিত্য মধুচক্র নির্ম্মাণ করে। এই জন্য মনের জগৎ বাহিরের জগতের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। বহির্জগৎ পরিত্যাগ করিলে মনের জগতের কোনো অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ময়রা যেমন সবেদা, শর্করা, ঘৃত ছানা প্রভৃতি মাল মশলা লইয়া রসগোল্লা তৈরি করে,—অথচ রসগোল্লার মধ্যে সর্ব্বসমন্বয়ে উপরি-উক্ত উপাদান হইতে পৃথক্ একটা আস্বাদ জন্মে, কোনো একটিরও প্রাধান্য বা পৃথক্ সত্তার অনুভূতি হয় না, সেইরূপ মনও বাহিরের সমস্ত উপাদান লইয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করে, অথচ তাহাতে বাহিরের নশ্বর, জড়-কোনো পদার্থেরই প্রাধান্য থাকে না—সকল উপাদানের সংমিশ্রণে মনের কলা-নৈপুণ্যের গুণে—সে এক অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করে। এই যে সৃষ্টি, ইহাতে সাহিত্যকার সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের মনের মাধুরী মিশাইয়া ইহাকে সার্ব্বজনীন এবং অমর করিয়া তুলে—তবেই তাহা প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য হয়। ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্ব থাকিলেই, তাহা আর, সাহিত্য হইবে না—অন্য যাহা ইচ্ছা বলিতে পার।

ময়রা সন্দেশে যেমন নানাবিধ আকার দিয়া, বর্ণ দিয়া, নাম দিয়া, জনসাধারণের মধ্যে বাহির করে লোকের চোখ ভুলাইবার জন্য, তেমনি সাহিত্যেও নানা ছন্দ, রূপক, অলঙ্কার, উপমা, কলা ও সংস্কার আশ্রয় লইতে হয়। এ গুলিরও বিশেষ ভাবে প্রয়োজন আছে। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন—সাহিত্য সৃষ্টি তাহা হইলে কৃত্রিম এবং ইচ্ছা-প্রসূত। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে—সৃষ্টির ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং সহজ। এই ইচ্ছাকে ইচ্ছা করিয়া জানাইতে হয় না। উদ্ভিজ্জ পত্র-পুষ্প-ফলে-বীজে আপনার জাতি সৃষ্টি করিতেছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে উচ্চমত জীবের উর্দ্ধতন মানব পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে আপনার জাতি সৃষ্টি করিতেছে যেমন, তেমনি ভাবও ভাব সৃষ্টি করিতেছে। সৃষ্টিটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং স্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। না করিয়া থাকিতে পারে না—প্রকৃতির কঠোর বিধান অমান্য করিবার ক্ষমতা যেমন কাহারও নাই, তেমনি ভাবেরও নাই। বন্ধ্যা-নরনারী যেমন হাজার ইচ্ছা করিলেও সন্তান লাভ করিতে পারে না, তেমনি বন্ধ্য হৃদয় ভাব মাথা কুটিয়া মরিলেও আর একটি ভাবের জন্ম দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অহরহ ভাবের জন্ম-মৃত্যুর লীলা চলিতেছে। যাঁহারা সজাগ এবং ভাবুক—তাঁহারা কবি এবং

সাহিত্য-স্রষ্টা অভিধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার নবজাত ভাবগুলিকে স্নেহ-পরবশ হইয়া রক্ষা করেন, আর যাঁহারা চঞ্চল এবং উদাসীন—তাঁহারা আপনার ভাবগুলির ভ্রূণহত্যা করেন। রক্ষা করুন আর না-ই করুন, তাহাতে ভাবের জন্মের কোনো ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। আর একটি কথা এই যে,—মানবের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাই, আদিম উলঙ্গ শিশুকে একটু মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া সাজাইয়া বাহির করিবার সহজ প্রবৃত্তি দিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে আসল জিনিষের কোনো তারতম্য ঘটে না, কেবল বাহিরেরই চাকচিক্য একটু বাড়ে মাত্র। দেখিতে ভাল লাগে,—তাহাতে দোষ কি? এ সজ্জাই সাহিত্যের অলঙ্কার। বাটীর বাহির হইতে হইলেই, কিছু না কিছু একটু বেশ পরিবর্ত্তন করিতেই হয় যেমন, তেমনি যে ভাব নিজ বাটীর বাহিরে আসিবে তাহার একটা পোষাক সেজন্য অবশ্যই দরকার।

মানব যেমন মানবের কাছেই আদৃত, মনোভব ভাবও তেমনি মনের কাছেই চিরদিন গতিবিধি করে এবং ভাবের সঙ্গেই তাহার একমাত্র কুটুম্বিতা। মানুষ যেমন বিপুল মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে, বড় হইতে, উন্নত হইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, ভাবও তেমনি ভাবের সমাজে বড় হইতে চেষ্টা করে, মন বহুর মধ্যে বিচরণ করিতে ব্যস্ত, এবং চিরদিন মনের রাজ্যে ভাব সমাজে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া অমর হইতে যত্নবান্। এই যে মনের আকাঙ্ক্ষা ইহাই সাহিত্য-চিত্র ও সঙ্গীতে আবহমানকাল মনের মধ্য দিয়া পথ কাটিয়া বংশপরম্পরা প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব বল সঞ্চয় করিয়া কুটবলের মত আজ আমাদের মনের মাঝে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আদি কবির বা সাহিত্যকারের ভাব অমরতা লাভ করিয়া, ভাবের ধারা এবং গতি ঠিক বজায় রাখিয়াছে এবং আরও কতদিন রাখিবে—কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সেই ভাবের আলবালে আমরা আজিও, আমাদের নিজের ভাবিয়া, আমরা নিজ নিজ মন হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জলধারা অভিষিঞ্চন করিয়া বাঁচাইতেছি। কেন? না, সে যে আমারই একান্ত নিজস্ব। সে যে আমারি নিজের সুখের শিহরণ, পুলকের রোমাঞ্চ, দুঃখের অশ্রুধারা, বিয়োগের মর্ম্মভেদী জ্বালা, আশার সুখ-স্বপ্ন, নৈরাশ্যের তপ্ত মরু, ভয়ের হৃৎকম্প, ভাবনার অকূল পাথার, বেদনার নির্ব্বাতনা, ভরসার ঈপ্সিত, নন্দনের কাহিনী বহন করিয়া আনিয়াছে। অযোধ্যাপতি দশরথকুল-সূর্য্য রাম-চন্দ্রের সাথে পঞ্চবটীর বনে আমরা তাঁহার ব্যথাকে নিজের করিয়া অশ্রুবর্ষণ করি, অন্যায়-প্রপীড়িত পাণ্ডুপুত্র পক্ষের জন্য সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয়

ভরিয়া উঠে, অপর্ণা তপস্বিনী উমার কৃচ্ছতপঃসাধনে আমাদের আদর্শ গড়ি, কান্তা-বিরহ-বিধুর প্রবাসী যক্ষের ব্যাকুলতায়, আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ তাহারি সঙ্গে অপূর্ব্ব বেদনা পুলকে ব্যথিয়া উঠে। এই যে অতি নিবিড় একটি প্রাণের যোগ—ইহা দেশকাল পাত্রের ব্যবধান মানে না। ইহা চিরন্তন মানবের নিজস্ব, কাজেই অমর।

তবেই দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের গতি কেবল মনের মধ্যেই। তাহা দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান মানে না। যে সাহিত্যকে যত বেশীক্ষণ মনের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়, সে সাহিত্য তত বেশী বলবান্ এবং সজীব। অনেক সাহিত্য আমাদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সে যেন তৈলহীন দীপের মত, একটু জ্বলিয়াই দপ্ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যায়; আর তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও জ্বালাইতে পারা যায় না। তাহার কারণ, তাহা পথে আসিতে আসিতে আর তৈল পায় নাই লোকে আদর করিয়া দেয় নাই। যিনি পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহারি দেওয়া তৈলটুকু ফুরাইয়া গেল, আর দীপ নিভিল। এই যে সাহিত্য, বুঝিতে হইবে ইহাতে বহুমনের উপভোগ্য প্রাচুর্য্য ছিল না; ইহা নিতান্তই দরিদ্র, ইহাও সাহিত্য পদ বাচ্য হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণিক, যেমন দৈব নিয়মে অল্পায়ু সন্তান জন্মে। আর এক প্রকার সাহিত্য আছে, যাহা নিজেও ঐশ্বর্য্যশালী বটেই, তাহা ছাড়া, যাহাদের বাড়ী ঘুরিয়া আসিতেছে তাহারাই তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ইহাই হইল আসল সাহিত্য। দীর্ঘজীবী মানুষও যেমন বিরল, দীর্ঘজীবী সাহিত্যও তেমনি একই নিয়মে এত কম।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ হইতেই, তবে বহু ব্যক্তির সার্ব্বজনীন সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি, অবিচার, অসমানত্ব, বিক্ষোভ ও বিরোধ থাকে, যাহা অন্য ব্যক্তির অজ্ঞাত বা অপরীক্ষিত —সেই জন্য ব্যক্তি বিশেষের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কাহিনী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যকারের কার্য্য সেই নিজের কাহিনীকে বহুর উপযোগী করা; যাহা সকল কালে সকল মানবই আপনার বলিয়া অভিনন্দন করিয়া লইতে পারে। যেমন ফটোগ্রাফে আসল রূপটি, মাধুর্য্যটি, রেখাটি পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকে কিন্তু তাহার দেহ মধ্যস্থ রোগের বা বহুদিন পরের জরার বিকৃতি ও কুরূপের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি সাহিত্যকার কেবল সেই বেদনাটুকুকে এক সার্ব্বজনীন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দিয়া ধরিয়া দিবেন, যাহা লোকে চিরদিনই আপনার বলিয়া নিঃসংশয় চিত্তে অবাধে অপরের

মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। সাহিত্যকার স্বর্ণকারের মত সোণা গলাইয়া পিটিয়া, বাঁকাইয়া, খুদিয়া, জুড়িয়া, মুড়িয়া এমন অলঙ্কার গড়িবে—যাহা সকলেরই পছন্দ সই হয়, তবে সে ওস্তাদ মিস্ত্রী, ভাল কারিগর।

বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য মনের দুয়ারে ধাক্কা মারিবামাত্রেই ভাব উঠিয়া আসিয়া তাহাকে দুয়ার খুলিয়া দেয় এবং হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া সাদরে আপনার পাশে বসায়। ভাব, মনের স্বর্গে, বিশ্বকর্ম্মার সৌন্দর্য্য উপকরণ সরবরাহ করে মাত্র। ভাব পাথর কাটিয়া, পট আঁকিয়া, কাগজে লিখিয়া, সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য্য বাড়ীর কর্ত্তা, সে হাট বাজার করে, আপিস যায়, টাকা আনে আর তার বাড়ীর গিন্নি, রাঁধেবাড়ে, বাথে ঢাকে, সাজায় গোছায় এবং সকলকে খাওয়ায় পরায়। ভাব আবার খুব হুঁশিয়ার ওস্তাদ ও, সে এমন জিনিষ তৈরি করিতে চায় যাহা সকলেরই গ্রাহ্য হয়, যেন দোকানে অপছন্দ হইয়া পড়িয়া না থাকে। তাহাতে তাহার মানব মনের বাবসায়ে লোকসান্। কাযেই তাহাকে খুব ধীর হইয়া, চারিদিক বুঝিয়া সুজিয়া কাজ করিতে হয়। অধীর অসংযত হইয়া কাযে হাত দিল চলে না, তাহা হইলে অসাবধানতা বশতঃ হয়ত কোনো কোনো জিনিষ ঠিক মাপ সই না হইয়া ছোট বড় হইয়া যাইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে ভাবের নৈপুণ্য এবং একাগ্রতা যেমন চাই, সাহিত্য-সৃষ্টিতে সংযমেরও তেমনি প্রয়োজন।

এই সংযম আমাদিগকে উদ্দাম কল্পনার পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে বাঁচায়। অসংযত হইলে সৌন্দর্য্যও ঠিকমত উপলব্ধি করা যায় না। সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচিত হই, তাহাতে সংযম আছে বলিয়াই, তাহা আমাদিগের নিকট আজ পর্য্যন্ত আদরের। জৈব নিয়মে আহার নিদ্রা অপরিহার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত করিতে কেহ যদি অপরিমিত রূপে আহার ও নিদ্রায় প্রবৃত্ত হয়েন—তবে সে ব্যক্তির পরমায়ু বৃদ্ধি হয় কিনা, তাহা শরীর তত্ত্ববিদ্‌গণই সঠিক বলিতে পারেন। কিন্তু কাব্যে পুরাণে ইতিহাসে এই অসংযমের ফলে যে তত্তৎ ব্যক্তির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সাহিত্য সম্বন্ধেও, সে কথা খাটে। কালিদাসের মত কবিরও কোনো কোনো কাব্যের অংশ বিশেষে এইরূপ অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মানব মন তাহা গ্রহণ করিতে আজ পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া আছে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে সংযম ভিন্ন সৌন্দর্য্য রচনা হয় না, এবং যাহা সুন্দর নয় কাব্যে বা সাহিত্যেও তাহার আদর নাই। আবার এই সুন্দরই মঙ্গল।

কারণ সৌন্দর্য্যের সর্ব্ববাদী সম্মত একটা আদর্শ বা মাপ কাটি কোনো কালে ছিলও না, এখনও নাই—আর তাহার স্থির নির্দ্দেশ ও কিছু হয় না। তবে ইহা বোধ হয় অবিসংবাদী যে সৌন্দর্য্যবোধ কেবলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, বরং তাহার চেয়েও কিছু গভীরতর একটা অনুভূতি। এবং এই যে অনুভূতি—ইহা অনির্ব্বচনীয়, ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, ভাষাতীত অন্তরের একটা নিগূঢ় প্রবৃত্তিকে এ রস গ্রহণ করিবার জন্ত ডাকিতে হয়, একা ইন্দ্রিয়েরা তাহা পারে না। ফুলের সৌন্দর্য্য কেবল যে ফুলের দলে, বীজে অথবা গন্ধেই আছে, তাহা বলিলে ফুলের ঠিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধ হইল না; অথচ সমগ্র ফুলটিতেও তাহার সৌন্দর্য্য পরিসমাপ্ত নহে। ফুলটি দেখিতে দেখিতেই কুঁড়ির কথা, বীজের কথা, বোঁটার কথা, ফোটার কথা আপনা আপনি মনে আসে। ক্রমশঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুলাতীত একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য, একটা অনির্ব্বচনীয় সুকুমার পেলব সৌন্দর্য্য, আমাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার কুঞ্চিত বঙ্কিম দলগুলি, তাহার অননুকরনীয় মসৃণবর্ণ, তাহার পরাগরেণু তাহার গন্ধ, সেই আবেশে সব বিলুপ্ত হইয়া যায়—মনে হয়, ফুল যেন কোন এক অজ্ঞাত চিরসমৃদ্ধ জগতের রাজ কুমার, মৃগয়া করিতে আসিয়া যেন পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছে। রমণীর কান্তিতে সৌন্দর্য্য আছে, রমনীয়তা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য আমাদের মনে গভীরতম স্থায়ী ভাবকে উদ্বুদ্ধ করে না, তাহা কেবল তীক্ষ্ণ আলোক সম্পাতের মত ক্ষণেকের জন্ত চঞ্চল করিয়া তুলে মাত্র, কিন্তু সন্তানগর্ভা রমণীতে যে মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য আমরাদেখি—তাহাতে কি আমাদের মনে এক অপূর্ব্ব মঙ্গল রসের বার্ত্তা আনিয়া দেয় না?

যাহা নীচ হইতে আমাদিগকে উচ্চে লইয়া যায়, যাহা ক্ষণিক হইতে অনন্তে লইয়া যায়, যাহা অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যায়—তাহাই মঙ্গল। মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতি মানুষকে ছোট হইতে বড়য় লইয়া গিয়া, এমন জায়গায় পৌঁছাইয়া দেয় যেখানে সে সমস্ত ক্ষুদ্রতা, অল্পতা, এবং নীচতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া—এক অপূর্ব্ব অজ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান পায়। এ রহস্য দুই দণ্ডের জন্ত নয়, ইহা অনন্তকাল ধরিয়া উপভোগ করিলেও, কিছুমাত্র ব্যয়িত হইবে না। এই যে রহস্যময় অনুভূতি ইহার সীমা নাই শেষ নাই বলিয়া ইহা অমৃত এবং নিত্য।

সুন্দরই মঙ্গল এবং নিত্য—তাই আজ পর্য্যন্ত রাম সুন্দর, সীতা সুন্দর, ভীষ্ম সুন্দর, দধীচি সুন্দর, উমা সুন্দর, ত্যাগ ক্ষমা দয়া সুন্দর; প্রেম প্রীতি নিষ্ঠা সুন্দর। কারণ এই সবই মঙ্গল এবং নিত্য এবং সুন্দর। এই জন্ত সাহিত্যে

কেবল সৌন্দর্য্যের ঐ স্থান,—আর এই জন্য সাহিত্য নিত্য কালের মঙ্গলময়। যাহা অসুন্দর, তাহা সাহিত্যের অঙ্গে আভরণ না হইয়া আবরণ হয়, দুইদিনেই তাহা খসিয়া পড়ে।

বৈষ্ণব যুগের নব চেতনায় এইরূপ একটা সুন্দর সাহিত্য রচিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিছু হইয়াও ছিল। আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্য নামে নির্ব্বিচারে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহার অধিকাংশই অসুন্দর উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী; তাহা কেবল বিলাসিনীর আভাস ইঙ্গিতের মতই ক্ষণেকের জন্য মনকে হরণ করে মাত্র, মনকে বরণ করে না। কারণ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে সুরটি অতি প্রবল, তাহা সুরার মত মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে, হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব রহস্যময়ী মোহিনী অনুভূতিটিকে জাগাইতে পারে না। এ সুর সুরার মত চঞ্চল করিয়া তুলে মাত্র, ফুলের মত সুরভি দিতে পারে না। যেহেতু এ মোটা তারের সুর। মিলনের আনন্দের মধ্যে যে বেদনা, বিরহের ব্যথার মধ্যেও যে সুখ —নরনারীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এবং পরস্পরের মধ্যে যে জন্মজন্মান্তরের অটুট নিগূঢ় সম্বন্ধ—তাহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিগণ কেবল দেহের মিলনটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া এবং তাহাকেই সকলের চেয়ে উপরে আসন দেওয়ায়, পূজনীয় আদর্শ চরিত্র, অবতার কিম্বা সাক্ষাৎ ভগবান্ যাহাই বল, শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেম মিলন বিরহ ও আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই সাধারণ ধারণার অনুগামী তুচ্ছ দৈহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল সুরটি সুন্দর—অভাবনীয় এবং জগতের সাহিত্যের নূতন। বিষয়টি সুন্দর কিন্তু ব্যঞ্জনা সকলের সর্ব্বত্র সুন্দর হয় নাই। তিক্ত রস শারীর স্বাস্থ্যে উপকারী বলিয়া মানুষ নিমের পাতায় ঝোল খায়। নিপুণ পাচক তাহাকেই মুখরোচক করে, কিন্তু আনাড়ি তেতোর ঝোলে যদি তেতোকেই অতি প্রাধান্য দিয়া বসে, তাহা হইলে উক্ত ব্যঞ্জন মুখরোচক হওয়া দূরে থাকুক, রন্ধনকারীর বুদ্ধির প্রশংসা ও যেমন আমরা করি না, তেমনি নরনারীর মিলনে যৌন সম্বন্ধটিকেই যে কবি প্রাধান্য দেন তাঁহারও আমরা তেমনি বড় পক্ষপাতী হইতে পারি না। কারণ—মনও তাহাকে লইতে সঙ্কুচিত হয়।

আবার কাব্যগুলিকে আধ্যাত্মিকতার পোষাক পরাইয়া কোনো কোন সমালোচক সাহিত্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছেন, এবং একটি দলের কাছ হইতে হাততালি লাভ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেছেন। শ্বেতাঙ্গদিগের সভায় ইংরাজী পোষাকে ভারতবর্ষীয়দিগকে যেমন অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়, তেমন

বিসদৃশ বোধ হয় তাহাদিগকে আর কোথাও যেমন দেখায় না, তেমনি এইগুলি আধ্যাত্মিকতার পোষাকে আরও হাস্যকর এবং কুশ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চিরন্তন নরনারীর যে প্রাণের গোপন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাংলায় একেবারে নূতন; কিন্তু অধিকাংশ কবির সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অভাবে তাহা বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, আসল কবিরাও সর্ব্বত্র সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই, যে সংযমের অভাবে তাঁহাদের নয়ন সম্মুখ হইতে নিত্য সৌন্দর্য্যের মঙ্গলময় পটখানি যবনিকার অন্তরাল হইতে উঠিবার অবসর পায় নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখিলেন, শেষে তাহাই লিখিয়া রাখিয়া গেলেন; কিন্তু পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কেবলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। তাঁহারা নরনারীর দেহের সম্বন্ধেই এমনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে দেহাতীতের আর খোঁজই করিলেন না। কাযেই, সৌন্দর্য্যবোধের জীবনকাঠিটির অভাবে অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিতাই আজ নির্জ্জীব। বৈষ্ণবেরাই এ দেশে প্রথম নবযুগের সুর পাইয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার মূলটি সেই আনন্দাতিশয্যে এবং ভাবোন্মাদনায় যে একবার হারাইয়া ফেলিলেন, আর সেটির কেহ সন্ধানও করিলেন না অথবা তাহার কোনও উচ্চবাচ্যও হইল না। কি যে হারাইল তাহা যখন জানা গেল না, তখন কিছু যে হারাইল তাহাই কেহ গণ্য করিল না। সুতরাং মূল চাপা পড়িয়াই রহিল। উৎসবের মাতামাতির সময় লোকের হুড়াহুড়িতে কখন যে কুয়ার পাড় হইতে দড়ি বাল্‌তি কুয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে,—তাহা কাহারও হুঁস হয় নাই, তাহার পর লোকজন চলিয়া গেলে বাড়ীর লোক জল তুলিতে গিয়া যেমন প্রথম জানিতে পারে যে দড়ি বাল্‌তি কুয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে—তেমনি তখন উৎসবের সমারোহে যাহা চক্ষে পড়ে নাই, আর শান্তির দিনে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে বলিয়া, কেহ যদি এই ব্যাপার লইয়া অকারণ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে কেহই তাহার বুদ্ধির নিশ্চয়ই তারিফ করিবে না।

সাহিত্য যে নূতন গতিলাভ করিয়াছিল, তাহা দুর্গতিতে পরিণত হইল।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যই আমাদের বর্ত্তমান যুগ। সাহিত্যের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

* কলিকাতা "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"তে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পতিতা।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

অমর অতীত অতিথি আজিকে
  আমার হৃদয় দ্বারে,
মানস-পদ্মে চরণ পূজিয়া
  বরিয়া লইনু তারে,
দীর্ণ এ চিতে ধ্বনিবে কি হায়
  তাহার মহান গান ?
সে গানের সুরে উঠিবে কি পুরে
  শূন্য শতেক প্রাণ ?

কখন্ কবে সে বালিকা বয়সে
  বিবাহ—সোণার ফাঁস
সমাজ আমারে দিয়া উপহার
  করেছিল উপহাস।
মৃত্যু আসিয়া ছিঁড়িল বাঁধন
  মুক্ত করিল মোরে,
সমাজ আসিয়া, আবার হাসিয়া
  বাঁধিল লোহার ডোরে।

জীবনে যখন প্রথম জাগিনু
  দেখিনু আমি যে একা ;
বিধবা আখর ললাটে আমার
  হ'য়ে গেছে কবে লেখা ;
আমি পাপী আর অপরাধী তাই
  সংসার-কারাগারে
নিষেধের বেড়ি জড়াইয়া পায়ে
  মরিব জীবন-ভারে।

সকলের আছে হাসি-স্নেহ-রাশি
ভালবাসিবার সায় ;
আমার তাহাতে নাহি অধিকার,
হাসি-প্রেম—অপরাধ।
মঙ্গল-কাজে মানব-সমাজে
শেষ মোর পরিচয় ;
আমার দৃষ্টি বিষের বৃষ্টি
পরশ মৃত্যুময় !

সংসার-বুকে বহি' চলে ধীরে
অমর-জীবন-ধারা,
শত তৃষার্ত্ত মানব-পরাণ
তার মাঝে হ'য়ে হারা ;
ব্যাকুল প্রাণের আকুল তিয়াসা
মিটাইছে নিতি নিতি ;
নবীন চেতনা ভরিয়া পরাণে
গাহিছে অমরগীতি।

তৃষায় শুষ্ক পরাণ আমার
বসিয়া তটিনী-তীরে
বন্দিনী আমি,—শক্তি কোথায়
ঝাঁপাই অকূল নীরে ?
সবার যাহাতে আছে অধিকার
বিধাতার যাহা দান,
মানব আমারে বঞ্চিত করে
রাখিছে তাহার মান !

একদা সহসা আঁধার ভেদিয়া
তরুণ অরুণ সম,
কোথা হ'তে এক করুণ দেবতা
উদিল নয়নে মম ;

শুভ্র অমল মানস-মুকুল
ফুটিল তাঁহার করে,
প্রাণের অর্ঘ্য ঢালি দিনু তার
কমল চরণ-পরে।

প্রেমের পূজারি—পূজায় তাহার
প্রেম—সে জাগিল প্রাণে,
সারাটি হৃদয় বাজিয়া উঠিল
একটী মধুর গানে।
সেই এক দিনে বুঝিনু জীবনে
কেন মোর ভবে আসা ;
সার্থক হ'ল শত জীবনের
নিরুদ্ধ ভালবাসা।

আঁখি কচালিয়া ভ্রূকুটী মেলিয়া
সমাজ উঠিল বলে,
চকিত নয়ন মেলিয়া দেখিনু
দেবতা গিয়াছে চলে.
আমি যে পতিতা, পাপের মূরতি
শুধু সেই দিন হ'তে।
ঘৃণার পশরা বহিয়া মাথায়
চলেছি জীবন-পথে।

প্রাণ ভরে আমি ভালবেসেছিনু
এই মোর অপরাধ ,
ঘরে ঘরে তাই নাই মোর ঠাঁই
সবাই সাধিল বাদ।
জীবন-দেবতা-চরণ পূজেছি
এই শুধু মোর পাপ।
যে পূজায় আনে তোমাদের বর;
আনে মোর অভিশাপ।

একজন-পদে হৃদয় নিবেদি'
পতিতা হ'লাম আমি।
সেই মোর পতি, সে মোর দেবতা,
জীবন-মরণ স্বামী।
শত দেবতার চরণ পূজিয়া
তোমরা পতিত নও,
সংসার বুকে লুকাইয়া সুখে
শত ফুলে মধু খাও।

আমি জানি, আর সবার দেবতা
তিনিই জানেন ভাল -
তোমাদের কালী ছোঁয়নি আমারে
করেনি আমায় কাল।
সতীর-স্বরগ-আলোক জ্বলেছে
নিভৃত আমার প্রাণে,
'যে পথের শেষে পথ নাহি আর
ল'বে মোরে সেইখানে।

দেশের কথা।

প্রতিকার।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার।]

প্রতিকার কর্ম্মের পথে, এই পুরাণো কথাটা নূতন করে বলতে হবে।

দেশকে জাগাতে হ'লে প্রথমে চাই "গান"—এ গানে উন্মাদনার সুর চাই না, চাই সাধকের প্রাণ, অন্তঃকরণ, অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি। সমাজের শূদ্রশক্তি নিদ্রিত—ঐ নিদ্রিত নারায়ণকে সাধকই এক দিন জাগাবে। নরনারায়ণ আজ আর খাণ্ডব-দাহনের রুদ্রমূর্ত্তি হ'লে চলবে না—এখন গাণ্ডীবধারী শত শত

অর্জ্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নূতন গানে—"গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ" মহাবীরের এই ভ্রম দূর করতে হবে।

গীতার কর্ম্মযোগতত্ত্বে প্রবেশের পূর্ব্বে সাধকের চিন্তা এই যে, "সহজের পথ কি?" সহজ অবস্থায় মানুষ হাসে আবার কাঁদে—এই হাসি কান্নাই একটা জাতির প্রকৃত হৃদয়ের সাড়া দেয়, ঐ সুরটা যে না চিনতে পারবে গীতার "কর্ম্মযোগতত্ত্ব" ব্যায়ামকুশলীর কসরতের মত তার কাছে দুরূহ তত্ত্ব রয়ে যাবে। শুধু হাসি, শুধু কান্না মানুষের অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ। "সুখের আগুন" ছড়াবার আগে জানতে হবে—"আগুন ভেতর হ'তে জ্বলছে না বাইরে হ'তে লাগছে—ভারতীয় ঋষির প্রজ্বলিত হোমাগ্নি, না বারুদের গন্ধভরা ধূম? ভাষা-কুটীর আলোকিত করতে প্রদীপের দীপ্তিটুকুই অনন্ত বাধ্য, তাতেই জাগ্রত হয়ে এ জাতি আবার অমৃতের সন্ধান পাবে—কিন্তু ঐ ধূম অমৃতকে তীব্র বিষ—জাতির এ নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন করবে।

ঐ ধূমই যে ঐন্দ্রজালিক কুজ্ঝটিকা রচনা করেছে আমাদের দৃষ্টি আজ তাতেই অন্ধ, পল্লীর কুটীরের ক্ষীণ আলোকটুকু আর দৃষ্টিপথের পথিক হয় না। এ ইন্দ্রজালের সঙ্গে বোঝাপড়া চলবে না, এ জাল যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে দেশের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে।

কর্ম্মক্ষেত্র আজ সঙ্কীর্ণ—এক মুটো অন্নের জন্য আজ যেখানে আমরা কোলাহল করছি, সেই দেশেরই কৃষক এখনও এক বেলা না খেয়ে পৃথিবীর অন্নসংস্থানের জন্য দুর্ব্বল হাতের মুঠোতে লাঙ্গলটা চেপে ধরেছে—সেবাই যে তার প্রাণ, প্রাণ থাকতে তার স্বধর্ম্ম 'সেবাধর্ম্ম' সে ভুলবে না। আর আমাদের স্বধর্ম্ম কি? আমাদের স্বধর্ম্ম নেই, আমরা পরধর্ম্মী, পল্লীবাস ভুলে গিয়েছি, শিক্ষার মোহে ভুলেছি, দাসত্বে জীবন বিকিয়েছি। তবু আমরা যাদের ভুলেছি, তারা তো আমাদের ভোলেনি, আজও তারা মাথায় করে আম, তরীতরকারি নিয়ে পথে পথে হেঁকে যায়, ডাক দিয়ে আমরা দর কষাকষি করি, তাদের পল্লীর খোঁজটা নেওয়া দূরে থাক, তাদের দেহের প্রতিও দৃক্‌পাত করি না—তাদের এইটুকু তৃপ্তি, তারা যখন "মা" বলে ডাকে, তখন স্নেহ করুণামাখা দুটি চোখ আজও সে ডাকে সাড়া দেয়। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ঐ কৃষকই যুগ যুগান্তর ধরে মেনে চলছে।

কৃষক আজও স্বাধীন—লক্ষ্মণ সেনের গৌড় পরিত্যাগের পর, বৃটীশ শাসন পর্য্যন্ত কত রাষ্ট্রের ওলট্ পালট্ হয়ে গেছে—কিন্তু কৃষকের ঘরে সে সংবাদ

যায়নি; সে তার সেবা-ধর্ম্ম নিয়ে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে আছে—রাজা, জমিদার, ব্যাধি, সপ্তরথী যেমন করে অভিমন্যুকে ঘিরেছিল, আজ তেমনই করে তাকে ঘিরেছে—কোন ভীমশক্তি তাকে রক্ষা করতে পারছে না—তবু সে নিরস্ত্র নয়, হলচালনা তার চল্‌ছে—এক দিন তার অবসন্ন দেহটা ঐ মাটীর উপরই লুটিয়ে পড়বে—সেদিন আমরা কোন খবরই পাব না। কৃষকের গান থেমে গেলে আমাদের বৃহৎ চিন্তা নিয়ে কাজ হবে না, স্বাধীন চিন্তার উৎসটা রুদ্ধ হ'লে স্রোত আপনই থেমে আস্‌বে—আমাদের দর্শন, কাব্যকলা পৃথিবীর বড় বড় 'মিউজিয়মে' গিয়ে উঠ্‌বে।

আমাদের প্রথম কাজ কৃষককে বাঁচান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলের ঐ কাজ, ধর্ম্মবল, বাহুবল, অর্থবল দিয়ে রক্ষা করতে পল্লীর কুটীরে কুটীরে ফের গান গাইতে হবে। পল্লীর কুটীরে, পল্লীপথে, পল্লীর মাঠে গানের হাওয়া যখন আবার "ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যাবে," তখন বাংলার কৃষক দু'বেলা আহার পাবে,—শ্যামলতা, মাধবীলতা—পল্লীপথে, পল্লীকুটীরে আনন্দ-কুঞ্জ সাজাবে; সে দিন পৃথিবীতে বাংলার কৃষক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাবে, "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রবে বাঙ্গালী আবার খাওয়াবে; বাঙ্গালী কোন দিন না খাইয়ে শুধু খেয়ে তৃপ্ত হয়নি—আবার আমরা সায়েস্তা খাঁর সে স্বচ্ছলতার দিন ফিরিয়ে আন্‌তে চাই।

পল্লীতে ফিরতে হবে—কিন্তু পল্লীর সংস্কার করবার আদর্শ নেই! যা' ছিল তাই সাজাতে গেলে, "পুরাতনের উপর নূতন চূণকাম" করতে গেলে আবার ভেঙে যাবে, অতএব আদর্শ পল্লীর প্রতিষ্ঠা চাই।

নূতন পল্লী গড়তে হ'বে। যারা নূতন দিল্লী গড়ছে তারা গড়ুক, সেখানে নূতন পল্লী গড়বার পরামর্শ পাওয়া যাবে না; যারা নূতন পল্লী গড়তে ব্রতী হবে, তাদের নূতন দিল্লীর নক্সায় কাজ হবে না।

যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, অথচ অর্থ নিয়ে কি করতে হবে ভেবে পান না, এ কাজ তাঁদের। দেশের শিক্ষিত কৃতী সন্তানদের দিয়ে কাজ করাবার ভার তাঁদের উপর। অবশ্য দেশের সর্ব্বত্র আদর্শ গ্রামের প্রতিষ্ঠা একজনের কাজ নয় যেমন, তেমনই এক দিনেরও কাজ নয়—একাজ "সহজে" হ'বার নয়। দেশের সেবার সাধনার এই প্রকৃষ্ট অবসর, কাজ আরম্ভ করা চাই—ধীরে ধীরে এই আদর্শ গ্রাম বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামোপযোগী হ'লে সকল পল্লীর সংস্কার সাধন তখন সহজ হবে;—অন্ধকারে একটুখানি আলো পেলে সকলে আরও

আলো জেলে নেবে। পূর্ব্ব বাংলার ঝড়ে যার সূচনা হয়েছে, মঙ্গলময়ের সেই ইঙ্গিতটুকু বাংলায় সর্ব্বত্র বুঝে কাজ আরম্ভ করবার সুযোগ এসেছে। পুরাণ ভেঙ্গে তার বনিয়াদে নূতনের প্রতিষ্ঠা চাই।

আদর্শ গ্রামে স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিতে অসংখ্য ডাক্তার আছে, যারা দেশে কাজ না পেয়ে পশ্চিম ভারতে, বর্ম্মায় গিয়ে প্রবাসে সারাজীবন কাটান, শিক্ষার ভার নিতে ডিগ্রিধারী শিক্ষিত যুবকের অভাব নেই, কলকারখানা, কৃষিশিল্প চালাবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত যুবক যারা জার্ম্মান, আমেরিকাতে শিখে আসে, অথচ দেশে কর্ম্মক্ষেত্র পায় না, তাদের নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে, দলে দলে যুবকেরা সমুদ্রপারে বিজ্ঞান-শিক্ষা অর্জ্জনের জন্য যাবে; নূতন পল্লীতে আত্মরক্ষা ও শস্যরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র চাই দেশের নিরস্ত্র "বাঙ্গালী পল্টন্" সানন্দে সে শিক্ষা দেবার ও দেশরক্ষার ভার নেবে। এমন অসংখ্য কর্ম্মী-"শিল্পী" চাই, পল্লীরক্ষার সেবক চাই,—এই আদর্শ থেকেই পুরাতন পল্লীর সংস্কার সহজ-সাধ্য হবে।

দেশভক্ত ধনকুবের যাঁরা, তাঁরাই দেশে শত জেমসেদ নগর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাঁরাই এক দিন সেই তাম্রলিপ্তির বিলুপ্ত নাম আবার জগতে ঘোষণা করতে পারেন। কর্ম্মীর ডাক পেলেই দেশভক্ত যুবকের দল দলভুক্ত হবে। জ্ঞান ভক্তির উভয় তীর প্লাবিত করে কর্ম্মনদীতে বন্যা আনবার এই যুগ। যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ কর্ম্মের পথে ছুটে চলতে বাধ্য, কর্ম্ম না করলে তার "শরীরযাত্রা"ও নির্ব্বাহ হ'তে পারে না যে। নূতন পথ পেলেই যুবকের দল ছুটে চলবে অসংখ্য পথে—ঐ কর্ম্মের পথে, ধর্ম্মক্ষেত্রে।

ধনকুবেরের দান রাজধানীর বাইরেও অসংখ্য মাতৃপূজার অসংখ্য উপকরণ যোগাবে, রাজধানীর ভেতর বদ্ধ থাকলে চলবে না—ধনঞ্জয়ের পাশুপত অস্ত্রে লব্ধ ধনকুবেরের সঞ্চিত পারিজাত রাশির মত মাতৃপূজার মন্দিরে ধনরত্ন স্তরে স্তরে ভরে উঠবে। প্রতিকারের এই নূতন পথ।

স্নেহের টান।

[শ্রী——————।]

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমার প্রথম যৌবন। অল্প দিন হইল ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পশার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু সে জন্ম বিশেষ ভাবনাও ছিল না। সংসারে তখন আমার আপনার বলিতে কেহ না থাকিলেও শরীরে এবং মনে যথেষ্ট শক্তি ছিল। অর্থের অভাবই তখন সুখ বলিয়া মনে হইত। আজ জীবনের এই সন্ধ্যার এক একবার মনে হয় যে, যদি কেহ আমার সেই প্রথম যৌবনের শরীর না হউক মনটাকে অন্ততঃ, ফিরাইয়া দিতে পারিত, তবে আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ সানন্দে তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিতাম।

নদীর ধারে ছোট একখানি বাঙলা ভাড়া লইয়াছি। পূর্ব্বে ইহা এক জন নীলকর সাহেবের কুঠী ছিল। বাঙলার সম্মুখে তাহারই বিস্তীর্ণ নীলের ক্ষেত বর্ত্তমানে তিন চারিখানা পল্লীর খড় জোগাইতেছে। বাঙ্গলার পশ্চাতে নদীর সম্মুখে বাগান—ছোট একটি বাগান, সেই প্রস্তুত করিয়াছিল। বহু কাল অযত্নে থাকিলেও দুই একটি ফুল গাছ তখনও বোধ হয় আপনার পালন-কর্ত্তার উদ্দেশে দুই একটী ফুল প্রসব করিত। বাগানের মধ্যে ইজি-চেয়ারে বসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমি কবিতা পড়িতাম, মাঝিদের সারিগান শুনিতাম, নৌকার যাত্রীদের কথা ভাবিতাম, ওপারে কৃষকদের ঘরকন্না দেখিতাম—আবার কখনও বা শূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় কৃষক ঘরে ফিরিত; কৃষকপত্নী তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত। কৃষকপত্নী গরুকে জাব দিত, কৃষক তামাক খাইতে খাইতে নিবিষ্ট মনে তাহা দেখিত। মাঝিরা "পরের জন্ম কাঁদেরে আমার মন" বলিয়া গান গাহিয়া কোনও অজানা বিরহীর বেদনা প্রচার করিত। আকাশে চাঁদ উঠিত, তারা ফুটিত।

সে দিন রাত্রি কিছু বেশী হইয়াছে; অষ্টমীর চাঁদ ডুবু ডুবু। কৃষক-দম্পতীর গৃহের ক্ষীণ আলোক অনেক ক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে। দূরে জঙ্গলের মধ্যে সারমেয়ের চিৎকার আরম্ভ হইয়াছে এবং পল্লীর কুকুরগুলি তাহার যথাসাধ্য

প্রত্যুত্তর দিতেছে, এমন সময় বাহির দরজায় কে ডাকিল "ডাক্তার বাবু, ও ডাক্তার বাবু"।

"কে" বলিয়া আমি ঘরের দরজা খুলিয়া দিলাম। বারাণ্ডায় দরজার সম্মুখে একটি বালিকা আমার অপেক্ষা করিতেছিল। আমি এক পাশে দাঁড়াইতেই ঘরের আলোকরশ্মি একখানি সুন্দর মুখের উপর গিয়া পড়িল। বালিকা আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আমার মায়ের বড় অসুখ—আপনি শীগ্‌গীর আসুন।"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অনুনয়, দৃষ্টিতে একটা ভয়, একটা কেমন যেন ব্যাকুলতা মাখান ছিল। নিশীথে এই নির্জ্জন স্থানে বালিকাকে একাকী দেখিয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। নদীর ওপারে কৃষকপল্লী, এপারে বিস্তীর্ণ মাঠ; অথচ বালিকাকে ভদ্রঘরের বলিয়া বোধ হইল। তাহার পরিধানে একখানি জীর্ণ ঢাকাই সাড়ী। সাড়ীখানি বহু পুরাতন। আজকাল মেয়েরা এমন কাপড় পরে না। হাতে দু'গাছি বালা, বোধ হয় সোণার, তাহার স্থানে স্থানে গালা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বালিকা বোধ হয় বড় দূর হইতে আসিয়াছে—পথশ্রমে দুশ্চিন্তায় তাহার সুন্দর মুখখানি একবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল। জগতে তাহার আপনার বলিতে কেহ থাকিলে, এ রাত্রে এমন স্থানে তাহাকে একাকী আসিতে হইত না, তাহা নিশ্চিত। সীমন্তে সিন্দুর আছে কিনা ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম! ঢাকাই সাড়ীর এক প্রান্ত বালিকার মাথায় ছিল, তাহার কতকটা স্থান রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া "তোমার মাথায় কি হয়েছে দেখি", বলিয়া হাত বাড়াইতেই বালিকা একেবারে তিন হাত পিছাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিল "ও কিছু না।" তার পর কিছু ক্ষণ থামিয়া অনুনয়ের সঙ্গে বলিল "বড্ড দেরী হয়ে যাচ্চে ডাক্তার বাবু, একটু শীগ্‌গীর চলুন।" নির্জ্জন স্থানে যুবকের স্পর্শের ভয়ে বালিকা সঙ্কোচ বোধ করিল, অথবা মাতার অসুখের জন্য—নিজের আঘাত তুচ্ছ করিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আর পীড়াপীড়ি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের বাড়ী কোথায়"? ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে বহু দূরে আকাশের গায় একখানি গ্রাম দেখা যাইতেছিল বালিকা, সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "বনপুর"।

"বনপুর? সে ত অনেক দূর" বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই বালিকা কাতরভাবে বলিল, "বেশী দূর নয়, মাঠের রাস্তা দিয়ে গেলে খুব শীগ্‌গীর যাওয়া যাবে।" আমি আর দেরী না করিয়া তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে

করিতে পোষাক পরিয়া লইলাম। আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধ লইবার লোক থাকিলে বালিকা এই রাত্রিতে একাকী আসিত না - সুতরাং কিছু ঔষধ সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। তখন দূরে নৌকার উপর কোন সৌখীন যুবা গাহিতে ছিল—

না জানি কোন্ দূর দেশে
কোথায় চলেছি ভেসে
ধূ ধূ করে দুই পাশে
বিজন বেলা।

রাস্তার বাহির হইয়া বালিকার ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া গেল। দুই পাশে কাশের বন। তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্য গমনাগমনে ছোট একটু পথ হইয়াছে, তাহাও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। আমার বুটের তলায় কাঁটা গুলি মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। বালিকাকে আমার পিছনে যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া কণ্টকাবৃত গুল্মগুলি তৃণবৎ দলিত করিয়া তীরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক একবার ফিরিয়া ব্যাকুল ভাবে আমার মুখের দিকে চাহে— আবার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। আমার মনে হইতে লাগিল যে এমনি একটি দিনের প্রতীক্ষায়ই আমি এত দিন এখানে বসিয়া ছিলাম। আমার ডাক্তারী পড়া সার্থক মনে হইতে লাগিল।

আমার এখন ব্যাধিতে শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থচিন্তায় মুখশ্রী কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছে। আমাকে দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না যে, আমার এ শরীরে এক দিন বল ছিল, মনে পবিত্রতা ছিল, মুখে এমন একটা সরলতা মাখান ছিল যে সম্পূর্ণ অপরিচিত শিশুও আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দ্বিধা বোধ করিত না। আর আজ? আজ আমার নিজের সন্তানেরাও আমাকে দেখিলে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। এখন নিজে মরণের ভয়ে আকুল অথচ তখন প্রত্যহই জীবন দানের সুযোগ আসিল না বলিয়া আক্ষেপ করিতাম।

অনেক দূর আসিয়াছি। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, গাছের আগায় এখনও একটু একটু আলো আছে। মাঠ ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে আসিলাম। সমস্ত রাস্তা বালিকা আমার সঙ্গে কোনও কথা বলে নাই, আমি কিছু বলিলেও উত্তর দেয় নাই। এক খানি বহুপুরাতন বাড়ীর সম্মুখে গিয়া বালিকা বলিল, "ডাক্তার বাবু এই আমাদের বাড়ী"; বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়ী খানির অবস্থা এককালে খুব ভাল থাকিলেও বর্ত্তমানে যথেষ্ট শোচনীয়—চতুর্দ্দিকের ইষ্টক

স্তূপের মধ্যে দুইটী কক্ষ কোন গতিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই একটী ঘরের কাছে গিয়া বালিকা আমাকে চুপিচুপি বলিল "মা এই ঘরে আছেন, আপনি ভিতরে যান।" অনেকক্ষণ মাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, ভিতরে গিয়া কি দৃশ্য দেখিবে, ভাবিয়া বালিকা সহসা ভিতরে যাইতে সাহস করিতেছিল না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের মধ্যে রোগীর শিয়রের কাছে একটী মৃণ্ময় প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, একখানি জীর্ণ তক্তপোষে মলিন একখানি কাঁথা বিছাইয়া অস্থিচর্ম্মসার একটী রমণী শুইয়া আছেন। তিনি প্রৌঢ়া কিম্বা বৃদ্ধা প্রথম দৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ঘরের মধ্যের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে দুই একটী জিনিষ গৃহস্বামিনীর পূর্ব্ব-বৈভবের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। ঘরের দেওয়ালে একখানি মূল্যবান ধূলিধূসর তৈলচিত্র। চিত্রখানির চারিদিকে একটী শুষ্ক গাঁদা ফুলের মালা, মধ্যে একটী যুবকের প্রতিমূর্ত্তি। মুখাবয়বে বুঝিলাম উহা বালিকার পিতার। আমার নড়াচড়ার শব্দে জাগরিত হইয়া রমণী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু করিয়া উত্তর দিলাম, 'আমি ডাক্তার।' রমণী পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে বলিলেন "ডাক্তার আপনি? চিকিৎসার প্রয়োজন আমার অনেক দিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। আমাকে আর বাঁচাইতে চেষ্টা করিবেন না, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" তারপর একটুক্ষণ থামিয়া আমায় বলিলেন, "এমন সময় আপনাকে কে এখানে লইয়া আসিল?—একজন মানুষকে জীবনের শেষ কথা না বলিয়া যে আমি মরিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম "আপনার মেয়ে আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

"আমার মেয়ে?" বলিয়া রমণী আশ্চর্য্য ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর চক্ষু নামাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আজ দশ বৎসর হ'ল এই পাশের ঘরের একটা কড়িকাঠ তার মাথায় পড়ে তা'তেই সে'—বলিয়া রমণী চুপ করিলেন, তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি বিস্ময়ে বলিলাম, "সে কি? একটী মেয়ে যে আমাকে এখানেই নিয়ে এল। বাহিরেই সে দাঁড়িয়ে আছে। তারও মাথা কেটে গিয়েছে। পরণে একখানি ঢাকাই সাড়ি, হাতে দুগাছি সোণার বালা।" ব্যগ্রভাবে রমণী বলিলেন "একবার দেখান, ডাক্তার বাবু, একবার দেখান, জন্মের শোধ একবার দেখান।" বলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি

তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও জন মানবের চিহ্ন নাই। সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া-উঠিল। আর বাহিরে দাঁড়াইতে সাহস হইল না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে রমণী আগ্রহে দরজার দিকে চাহিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "পেলেন কি?" আমি বলিলাম "না।" রমণী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ভয় বিস্ময় ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন "না পাবারই কথা, এখনও সে আমার মায়া কাটাতে পারেনি। ওই বাক্সের মধ্যে এখনও তার বালা সাড়ি আছে, আজ দশ বৎসর সেগুলি আমি বুকে করে রেখেছি। পেটে না খেয়ে রেখেছি কিন্তু তা বেচবার কথা মনে হ'লে আমার বুক ফেটে যেত, আপনাকে—সেগুলি দিলাম, নচেৎ আমার গতি হ'বে না। আমার শিয়রে চাবি আছে" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বাক্স খুলিয়া দেখি সেই গালা বাহির করা সোণার বালা আর সেই ঢাকাই সাড়ি, তাহার এক প্রান্তে বহু কালের পুরাতন রক্তের একটা কাল দাগ রহিয়াছে। বিছানার দিকে চাহিয়া দেখি—রমণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাণশূন্য দেহ শয্যাতলে লুটাইতেছে।

তারপর বহুকাল অতীত হইয়াছে, সেই দিনটার কথা যেন স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু বালিকার সেই সুন্দর মুখখানি এখনও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়।

অন্তর্দ্ধানে

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।]

চোখের আড়াল রইলে বটে
মনের আড়াল নও,
চোখের পাতা বুঁজিয়ে গেলে
লুকিয়ে কমনে রও

এও কি তোমার খেলা—
মনের মাঝে লুকিয়ে কাটাও
সন্ধ্যা সকাল
ডাকলে সাড়া নাইক তোমার
আঁখির আগে কই ?
এই যে তুমি আমার মনে
কইছ কথা সংগোপনে
হৃদয় মাঝে শুধুই তুমি
অবাক হয়ে রই।
নয়ন মেলে চাইতে নারি
লজ্জা আসে মনে,
চোখের দেখা দেখতে চাওয়া
হৃদয় পোরা ধনে ?
ওগো হৃদয়-রাজ—
নয়ন মুদে হৃদয় ভরে
দেখ্‌ব তোমায় আজ।
অসীম হয়ে উঠ্‌লে ফুটি
ছাপিয়ে সারা প্রাণ,
চোখে দেখার খেদ মিটেছে
মনে বুঝার দিন এসেছে
হৃদয় বীণা তোমার সুরে
উঠ্‌ল গেয়ে গান।
নয়ন যাহার খোঁজ পেলে না
মন পেলে তার দেখা
আমার সকল প্রাণের পাণে
তোমার চরণ—রেখা।

আয়র্লণ্ডে ইংরাজাধিকার।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

আজকাল বক্তারা বক্তৃতার মুখে প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে আয়র্লণ্ডবাসি-দিগের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ডের সহিত মিলনপ্রার্থী তাহাদের ন্যায্য অধিকারটুকু না দিবার ফলেই আয়র্লণ্ডে যত মারামারি, লাঠালাঠির উৎপত্তি। ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাইলেই আয়র্লণ্ড শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ হইয়া উঠিবে। কথাটা বেশ আশাপ্রদ বটে; কিন্তু আয়র্লণ্ডের সমগ্র ইতিহাস একটু চোখ খুলিয়া পড়িলে কথাটা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। যেখানে ভৌগলিক সম্বন্ধ ভিন্ন আর সমস্ত সম্বন্ধ গায়ের জোরে পাতান, সেখানে কতটুকু অধিকার ন্যায্য আর কতটুকু অন্যায্য তাহা মীমাংসা করিবার উপযোগী দর্শন শাস্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আয়র্লণ্ডও সে কথাটা বেশ ভাল করিয়া বুঝে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়িয়া আসিতেছে। হোমরুল লাভের চেষ্টা সে নিয়মের ক্ষণিক ব্যতিক্রম মাত্র।

আয়র্লণ্ড বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া লিমারিকের (Limerick) পতন পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল আয়র্লণ্ডে রক্তারক্তি কখনও থামে নাই। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিগণ আয়র্লণ্ডকে শুধু রাজনৈতিক হিসাবে পরাধীন করিয়াই তুষ্ট ছিলেন না, ছলে, বলে, কৌশলে উহার আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতারও লোপ করিতে চেষ্টা করিতেন, আর আইরিসেরা প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই হোক, ইংরাজকে আপনাদের দেশ ও ধন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিত। এত দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব ইতিহাসে আর বড় একটা দেখা যায় না, কেননা ইহা শুধু "বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি" নহে, ইহা দুইটী জাতীয় প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। ইংরাজ যাহাকে বাহুবলে জয় করিয়াছে, তাহাকে কখনও প্রেমের বলে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; এমন কি প্রথম আয়র্লণ্ড বিজয়ের পর ইংরাজ রাজপুরুষেরা আইরিসদিগকে তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতেই দিতেন না। কিন্তু আইরিস প্রকৃতি অন্যরূপ। যে সমস্ত ইংরাজ দুই পুরুষ ধরিয়া আয়র্লণ্ডে গিয়া বাস করিত, আইরিস প্রকৃতির গুণে তাহারা একেবারে হাড়ে হাড়ে আইরিস হইয়া যাইত।

দেশের স্বাধীনতার জন্য খাঁটি আইরিসেরা যেমন প্রাণপণ করিয়া লড়িত, ইহারাও সেরূপ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বকৃতভঙ্গ ইংরাজ সন্তানের উপর আর খাঁটি ইংরাজের বিশ্বাস করিবার উপায় ছিল না।

লিমারিকের যখন পতন হইল, তখন ইংলণ্ড ভাবিলেন যে এত দিনে তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে, আয়র্লণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়েছে। বাস্তবিকই আয়র্লণ্ডের তখন আর উত্থান শক্তি নাই। সেই সুযোগে বাঁধনের উপর বাঁধন চড়াইয়া ইংলণ্ড আয়লণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড কয়েদখানা করিয়া তুলিলেন। আইনের চক্ষে আয়লণ্ডের ক্যাথলিক সমাজের অস্তিত্বই রহিল না। তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকলা বেশ নির্ম্মম ভাবেই ধ্বংস করা হইল। প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাহাদের উপর খবরদারি করিবার অধিকার পাইলেন। ইংলণ্ডের পোষ্যপুত্ররূপে তাহারাই হইলেন ঐ জেলখানার দারোগা। কিন্তু জেলখানার এমনি একটা গুণ আছে যে সেখানে ঢুকিলেই কয়েদীই হোক আর দারোগাই হোক, সকলকেই পুরা মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে সকল ইংরাজেরা আয়র্লণ্ডে শান্তিরক্ষকরূপে বাস করিলেন তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন যে খাঁটি আইরিসদিগের উপর অত্যাচার করিবার সুখটুকু তাঁহাদের আছে বটে কিন্তু ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা তাঁহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সাজিয়া তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে ছাড়েন না। ঘরের ঠাকুর হইলেই যে বিদেশের কুকুর হইতে হইবে এমন ত কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। তাই তাঁহারা সুর ধরিলেন যে আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অধীন হইয়া থাকিবে না। অনেক কথা কাটাকাটি চলিল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কখন বা রাগ করিলেন, কখন বা ভয় দেখাইলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টেরা বড় বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন অগত্যা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলেন। স্বীকৃত হইবারই কথা। কিছুদিন আগে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, পাছে আয়র্লণ্ডও সেই পথ ধরে, এ ভয় তাঁহাদের মনে যথেষ্টই ছিল। শুধু কথায় ভুলিবার পাত্র তাঁহারা নহেন। ফলে লিমারিকের পতনের পর একশত বৎসর যাইতে না যাইতেই ইংলণ্ডকে আয়র্লণ্ডের উপর কর্ত্তৃত্বস্বত্যাগ করিয়া এক আইন (Renunciation Act, 1783) বিধিবদ্ধ করিতে হইল। স্থির হইল যে আয়র্লণ্ডের লোকে আইরিস পার্লামেণ্ট ও রাজা কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন ভিন্ন অন্য কোনও আইন মানিতে বাধ্য নহে।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশটা যেন আবার একটু বাঁচিয়া

উঠিল। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প আবার মাথা তুলিল। জাতীয় পতাকা কাঁধে লইয়া আবার আয়র্লণ্ডের বাণিজ্যতরী সমুদ্রবক্ষে দেখা দিল। দেশের সৌভাগ্য বলিতে তখন অবশ্য প্রোটেষ্টাণ্টদিগেরই সৌভাগ্য বুঝাইত; কেননা আয়র্লণ্ডের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের ভার তখন তাহাদেরই হাতে ন্যস্ত। তবে ক্যাথলিক সম্প্রদায় নানা বিষয়ে কঠোর শাসনের অধীন হইলেও সে সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। মানুষ খেয়াল বা বিদ্বেষের বশে অপরের জন্য যতই কঠোর বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলুক না কেন, একসঙ্গে থাকিতে গেলে সে সমস্ত আর কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়া উঠিতে পারে না। ক্যাথলিকদিগের পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার না-থাকিলেও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলেন। দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে ক্যাথলিক, সেখানে ক্যাথলিকদিগের ভোট পাইতে হইলে, কাজেকাজেই প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে ক্যাথলিকদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। বাস্তবিকই ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি আইরিস পার্লামেণ্টের ঘাড়ের উপর বসিয়া না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব কঠোর আইনগুলিই তিরোহিত হইতে পারিত।

কিন্তু আয়র্লণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ডের প্রাণে সহিল না। ইংলণ্ড যখন প্রোটেষ্টাণ্টদিগের উপর আয়র্লণ্ডের কর্ত্তৃত্বভার দিয়াছিলেন তখন আশা করিয়াছিলেন যে আইরিসেরা চিরদিনের জন্য দুইটী পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়া থাকিবে। আইরিস জাতির পরকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতায় ইংরাজেরা বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়কার আর্কবিসপ বৌলটার (Archbishoh Boulter) তাই লিখিয়া গিয়াছেন:—The worst of this is that it tends to unite Protestant with Papist, and whenever that happens, good bye to the English interest in Ireland for ever", "এই সম্মিলনপ্রবণতার ফলে প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক এক হইয়া যায়, আর তাহা ঘটিলে ইংরাজের স্বার্থসংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া উঠে"। কিন্তু আইরিস কর্ত্তৃপক্ষের অতিবুদ্ধির দোষে রাম উল্টা বুঝিয়া বসিল। তাঁহাদের ধর্ম্মবিদ্বেষ শুধু ক্যাথলিকদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না; প্রেসবিটারিয়ানদিগকে ও তাহার যথেষ্ট ভাগ লইতে হইত। এই উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া আয়র্লণ্ডে "ইউনাইটেড আইরিসমেন" (United Irishmen) নামে এক নূতন দল গড়িয়া তুলিল। সমস্ত সম্প্রদায়েই যাহাতে আইরিস পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকারী হয়, অনেকদিন ধরিয়া তাহারা সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা

প্রাণপণে সে সংকল্পের বাধা দিতে লাগিলেন। শেষে আইরিসেরা বেশ বুঝিতে পারিল যে ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিলে আয়র্লণ্ডের যথার্থ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। "ইউনাইটেড আইরিসমেন" তখন গুপ্তসভায় পরিণত হইল! আয়র্লণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিবার ইহাই প্রথম চেষ্টা। ফরাসী "দিরেকতোয়ার" (Directoire) এর সহিত এই গুপ্তসভার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। স্থির হইল যে ফরাসীরা সৈন্য পাঠাইয়া আইরিসদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের সংবাদ ইংরাজ মন্ত্রিসভার কাণে উঠিল। তাঁহারা যে প্রতিকার ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে একাধারে হাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস রস সম্মিলিত। তাঁহাদের গুপ্তচরেরা আয়র্লণ্ডে গিয়া স্থানে স্থানে বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া লোকসাধারণকে গুপ্তসভায় যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদিকে আইরিস গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার ভাণ করিয়া দলে দলে আয়র্লণ্ডে পল্টন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। বন্দোবস্ত যখন বেশ পাকা হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারাই বিদ্রোহ ঘনাইয়া তুলিয়া তাহা নির্ম্মমভাবে দমন করিতে লাগিয়া গেলেন। আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দিয়া অবধি ইংরাজেরা একদিনও স্বস্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এইবার তাঁহারা এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার সংকল্প করিলেন। বিদ্রোহ ত শান্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আইরিস স্বাতন্ত্র্যও লুপ্ত হইল। ইংরাজেরা বুঝিলেন যে হয় আয়র্লণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে নয়ত উহাকে একেবারে ইংলণ্ডের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে হইবে। ইংরাজ মন্ত্রিগণ (Pitt ও Castlereagh) দেখিলেন যে আয়র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিয়া জনকত আইরিস সভ্যকে ইংরাজী পার্লামেণ্টভুক্ত করিয়া লইতে পারিলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আইরিস পার্লামেণ্টের বিনা সম্মতিতে ত তাহাকে উঠাইয়া দিবার উপায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তখন উৎকোচের ব্যবস্থা করিলেন। কাহাকেও বড় পদের লোভ দেখাইয়া, কাহাকেও পেন্সন দিয়া, কাহাকেও বা নগদ মূল্য ধরিয়া দিয়া, দুই দশ জনকে ভয় দেখাইয়া, উক্ত ব্যবস্থায় সম্মত করান হইল। সে সময়কার লোকসংখ্যার হিসাব ধরিলে আয়র্লণ্ডের যত জন সভ্য হওয়া উচিত তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক সভ্যও আয়র্লণ্ড হইতে লওয়া হইল না। সে সময়কার যে সমস্ত পত্রাদি আজকাল মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হইতে আইরিস পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিবার মূল কারণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মুখে মন্ত্রিবর্গ বলিতে ছাড়িলেন না, যে, এই সম্মিলন ব্যবস্থা উভয় দেশের মঙ্গলকামনাপ্রসূত।

উভয় রাজ্যের এক পার্লামেণ্ট হইয়া যাইবার পর আয়র্লণ্ডের অভিজাতবর্গ ও নেতৃবৃন্দ অনেকেই ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষাও ইংলণ্ডে হইতে লাগিল। ফলে দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা আর আইরিস রহিলেন না, ইংরাজ হইয়া গেলেন। আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ও দেখিলেন যে সমান রাজনৈতিক অধিকার হইতে ক্যাথলিকদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইলে ইংরাজের সাহায্য আবশ্যক। ইঁহাদের মিলনে "ইউনিয়নিষ্ট" (Unionist) দলের উৎপত্তি। যে অলস্‌টর (Ulster) এক সময়ে "ইউনাইটেড আইরিসমেন" দলের কেন্দ্র ছিল, তাহাই কালক্রমে "ইউনিয়নিষ্ট" দলের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মের গোড়ামি হইতেই এই সঙ্কীর্ণতার উৎপত্তি; সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্নপুষ্ট পাদরির দলও দিন দিন তাহা বাড়াইয়া তুলিতে ভুলিলেন না।

এদিকে ক্যাথলিক সম্প্রদায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। একে ত রাজনৈতিক দাসত্ব, তাহার উপর ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন; আর প্রতিকারের কোন উপায়ও হাতে নাই। দুঃখের বাঁধনে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহারাই ক্রমে "ন্যাসনালিষ্ট" (Nationalist) দল গঠন করিলেন। তাঁহাদের আন্দোলন নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বিজিত হইবার পর হইতেই যে আয়র্লণ্ডের দুর্গতির আরম্ভ এ কথা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হন নাই। স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা সৃষ্টির চেষ্টা যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম সোপান মাত্র—এ ভাবও তাঁহাদের রক্তে মাংসে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ড যখন প্রেমালিঙ্গনে আয়র্লণ্ডকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, "ইউনাইটেড আইরিসমেন" সভা তখনও একেবারে মরে নাই। রবার্ট এমেট একবার ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মরণ কামড় কামড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফলে তাহাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইল। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আইরিসদিগকে দমন করিবার জন্য নিত্য নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়া আসিতেছে। ক্যাথলিকেরা দিনকতক একটু চুপ করিয়াছিল; শেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হইতে ওকনেল (O'Connell) প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সহিত সমান অধিকার পাইবার জন্য বিপুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ওকনেল বৈধ আন্দোলনের একজন প্রধান পাণ্ডা। শুধু নৈতিক বলে জয় লাভ করা যাইবে এই কথাই তিনি প্রচার করেন; তবে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের ভয় দেখাইতেও ছাড়েন নাই। দেশময় উত্তেজনা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে ইংরাজ মন্ত্রিসভা বিচলিত হইয়া

পড়িলেন। পাছে যথার্থই বিদ্রোহ হয় সেই ভয়ে তাহারা ক্যাথলিকদিগকে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার দিয়া ফেলিলেন।

একবার কৃতকার্য্য হইয়া নৈতিক বলের উপর ওকনেলের অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। আয়র্লণ্ড যাহাতে পুনরায় স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পায় সেই জন্য তিনি আবার নূতন করিয়া আন্দোলন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে একসভা স্থাপন করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত ক্যাথলিক ও অনেক প্রোটেষ্টাণ্ট তাঁহার দলে আসিয়া জুটিল। দেশময় সভা সমিতির বৈঠক বসিল। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু নৈতিক বল প্রয়োগের ভয়ে আয়র্লণ্ডকে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট দিবার কোনই লক্ষণ দেখাইলেন না। অধিকন্তু ওকনেল স্থাপিত সমস্ত সভাসমিতির অধিবেশন একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া শেষে ওকনেল আপনার জনকতক বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এক হোটেলে প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজপ্রতিনিধি লজ্জার মাথা খাইয়া যখন তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন তখন ওকনেল এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া লিখিলেন—‘At breakfast, dinner and supper, let every Irishman recollect that he lives in a country where one Englishman's will is law.’ ‘প্রত্যহ আহারের সময় প্রত্যেক আয়র্লণ্ডবাসীই যেন স্মরণ রাখে, সে যে দেশে বাস করে সেখানে একজন ইংরাজের খেয়ালই আইন।’ ওকনেলের নৈতিক বল প্রয়োগ কিন্তু ক্রমাগতই ব্যর্থ হইতে লাগিল; শেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে গিয়াও তাঁহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

দেশের যুবকেরা কিন্তু নৈতিক বলের মোহিনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তাহারা ওকনেলের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ‘ইয়ং আয়র্লণ্ড’ দল গঠন করিল। ডেভিস (Davis), ডফি (Duffy) ও মিচেল (Mitchel) এই দলের নেতা। কোন সাম্প্রদায়িক অভাবমাত্র দূর করা তাহাদের লক্ষ্য নহে। ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট সকলকেই এক জাতীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আয়র্লণ্ডকে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্ব্বের সমস্ত আন্দোলন বিফল হওয়ায় দেশে তখন উৎসাহের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজও সর্ব্বতোভাবে আয়র্লণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের বীজ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অনুগ্রহে বিদ্যালয় সমূহ হইতে আয়র্লণ্ডের জাতীয়

"গেলিক" ভাষা বহিষ্কৃত হইল এবং আয়র্লণ্ডের ইতিহাস ও স্বদেশী কবিতার পঠন পাঠনও নিষিদ্ধ হইল। আইরিস্ জাতির প্রাণ যাহাতে ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই হয় সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটি হইল না। এ দিকে ব্যবসা বাণিজ্য ইংরাজের হস্তগত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। দারিদ্র্যে দেশ ভরিয়া গেল; দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল; কিন্তু দেশ হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ হইল না। দেশে থাকিলে যাহাদের অনাহারে মরিতে হয় তাহাদের দেশত্যাগ করা ভিন্ন আর উপায় কি? এই কারণে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক আয়র্লণ্ড ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

দেশের এই দুর্গতি দেখিয়া "ইয়ং আয়র্লণ্ডের" যুবকবৃন্দ দেশের লোককে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্মকুশল নেতার অভাবে সব আয়োজন বিফল হইল। মিচেল ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন, এবং অন্যতম নেতা স্মিথ ওব্রায়েনের (Smith O'Brien) বিদ্রোহ চেষ্টাও অচিরে বিনষ্ট হইল।

যে দেশে বৈধ আন্দোলনে কোন প্রতীকার হয় না, এবং জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার উপায়ান্তর নাই, সেখানে স্বতঃই লোকে রাজনীতির উপর ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। আয়র্লণ্ডেও কতকটা তাহাই হইল। সমস্ত চেষ্টা যে এতদিন ধরিয়া কেন বিফল হইতেছে, লোকে তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যদি দেশের স্বাধীনতা লাভের ফলে সাধারণ প্রজাদিগের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহারা শুধু জনকত নেতার কথায় অপরের সুবিধার জন্য প্রাণ দিতে যাইবে কেন? আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা সমস্ত দিন খাটিয়াও অনাহারে মরে, না হয়, জমীদারের উৎপীড়নে দেশত্যাগী হয়, আর বিলাসী জমিদারেরা কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ লইয়া বিদেশে বাবুয়ানি করিয়া বেড়ায়। কৃষকদের এই দুর্দ্দশা যদি না ঘুচে ত স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট পাইলেই কি তাহাদের প্রাণ শীতল হইয়া যাইবে? জনকত হোমরা চোমরাকে লইয়া দেশ নহে, তাহাদের আবেদন বা আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। যিনি এই নূতন ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নাম লেলর (Lálor) তিনি কৃষকদিগকে উপদেশ দিলেন,—"তোমরা জোর করিয়া জমি দখল কর। খাজনা দিও না। কেহ খাজনা আদায় করিতে আসিলে প্রতিপদে বাধা দাও।" প্রজাশক্তি জাগিলেই যে দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর এ কথা অনেকেই বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন যে জমিদারদিগের

সহিত মিলিতে যাইয়াই মিচেল ও ওব্রায়েনের বিদ্রোহচেষ্টা বিফল হইয়াছে। জমিদারেরা নামে আইরিস হইলেও কাজে আইরিস নহে। তাহারা বিদেশীর হাত হইতে মুক্ত হইতে চায়, কিন্তু দরিদ্র স্বদেশীকে দাবাইয়া রাখিতে পরাঙ্মুখ নহে। যে বিপ্লব প্রজাতন্ত্র-মূলক নহে, তাহা এ যুগে নিষ্ফল হইবেই হইবে।

একদিকে কৃষিজীবিদিগের এই আন্দোলন চলিতে লাগিল, অপর দিকে "ইয়ং আয়রর্লণ্ড" এর ভগ্নাবশেষ লইয়া একটী নূতন গুপ্তসভা গঠিত হইল। ইহার নেতারা সকলেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ষ্টিফেন্স ও ওমেলরীই প্রধান। বিপ্লব নিষ্ফল হইবার পর উভয়েই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্যারিসে ছিলেন। ষ্টিফেন্স (Stephens) আয়র্লণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ফিনিয়ান (Fenian) গুপ্তসভা গঠন করিলেন, ওমেলরী (O'Malory.) নিউ ইয়র্কে গেলেন। আমেরিকার অন্তর্বিগ্রহের সময় সহস্র সহস্র আইরিস উভয় দিকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধিকাংশই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ষ্টিফেন্স আমেরিকা হইতে অর্থ ভিন্ন অন্য কোনরূপ সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হন। অর্থ অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল, সুতরাং ষ্টিফেন্স যথাসময়ে তাঁহার লোকদিগকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতে পারিলেন না। এই লইয়া উভয় পক্ষে মনোমালিন্য হয়, কিন্তু তাহা সত্বেও সভার কার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের সৈন্তদিগের মধ্যে ১৩০০০ ও পুলিস বিভাগে ততোধিক ফিনিয়ান ছিল। কিন্তু সরকারী গুপ্ত পুলিসের হাত তাঁহারা এড়াইতে পারিলেন না। ষ্টিফেন্স ধৃত হইয়া জেলে গেলেন, সেখান হইতে তিনি প্রথমে ফ্রান্স ও পরে আমেরিকায় পলাইয়া যান। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নেতৃবৃন্দের অধীনে পুনরায় বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাও পূর্ব্ববৎ বিফল হইয়া যায়।

যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বিপ্লবের আয়োজন, তাহা ব্যর্থ হইল বটে কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আয়ার্লণ্ডের দুর্দ্দশার দিকে আকৃষ্ট হইল। গ্লাডষ্টোন আইরিস কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

তাঁহার আশা ছিল যে কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইয়া উঠিলে, তাহারা আর ফিনিয়ানদিগের সহিত যোগ দিতে যাইবে না। সে আশা কতকটা ফলবতীও হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর প্রকাশ্য ভাবে আয়র্লণ্ডে

বিদ্রোহের চেষ্টা হয় নাই। 'আইরিস সভ্যেরা পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিয়াই আপনাদের শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

পার্নেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আইরিস আন্দোলন আবার সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি শুধু প্রতিপদে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। আয়র্লণ্ড ও আমেরিকাকে এ কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হোমরুল স্থাপনের চেষ্টা জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান মাত্র। এই জন্যই ফিনিয়ানদিগের ভগ্নাবশেষ তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকটা নিজেরই দোষে যখন তাঁহার পতন হইল, তখন পার্লামেণ্টের আইরিস দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। লিবারেলদিগের ভোটের লোভে তাহারা পার্নেলকে নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করিল, কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমস্ত শক্তিই বিলুপ্ত হইল। তাহারা লিবারেলদিগের হাতে খেলার পুতুল মাত্র হইয়া রহিল।

বহুকাল পরে রেডমণ্ডের নেতৃত্বে আইরিসদল আবার সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু রেডমণ্ডের আদর্শ পার্নেলের আদর্শ হইতে পৃথক। পার্নেলের হোমরুলের মধ্যেও একটা স্বাধীনতার তীব্র গন্ধ ছিল। ব্রিটিস সাম্রাজ্যকে তিনি কখনও আপনার বলিয়া ভাবেন নাই। সাম্রাজ্যের সহিত আয়র্লণ্ডের যে কোন প্রাণের টান আছে এ কথা তিনি স্বীকার করিতেন না। সাম্রাজ্যের গৌরব তাঁহার দেশের গৌরব নহে। আয়র্লণ্ডের আন্দোলনকে তিনি আইরিস জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু রেডমণ্ড আয়র্লণ্ডকে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের অংশ রূপেই দেখিতেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যেরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া আসিতেছে তিনি আয়র্লণ্ডের জন্য তাহাই দাবী করিতেন। সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সংকল্প তিনি কখনও করেন নাই। কিন্তু আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না। হোমরুলবিল কাগজে কলমেই আবদ্ধ রহিয়া গেল। শেষে বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে নিজের দেশবাসীর নিকটেই "England's recruiting sergeant বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে হইল। পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিয়া কতটুকু পাওয়া সম্ভব তাহা পার্নেল ও রেডমণ্ড দেখাইয়া গিয়াছেন। যথার্থ ভাবে দেখিতে গেলে তাঁহারা সমগ্র আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধি নহেন। যাহাদের লইয়া দেশের তিন-চতুর্থাংশ সেই কৃষক বা শ্রমজীবীর প্রাণের ব্যথা তাঁহাদের কথায় সম্যক ধ্বনিত হয় নাই। তাঁহাদের আদর্শ ও কার্য্য

প্রণালীর মূলেই বিফলতার বীজ নিহিত ছিল। রেডমণ্ড যখন পার্লামেণ্টের দ্বারে হোমরুল ভিক্ষা করিতে ব্যস্ত, তখন হইতেই আয়র্লণ্ডের জন্য বিধাতা অলক্ষ্যে অন্য অস্ত্র শাণিত করিয়া তুলিতেছিলেন। উহার নাম সিন্‌ফিন্।

সিন্‌ফিনের ইতিহাস বারান্তরে আলোচনা কবিবাব ইচ্ছা বহিল।

প্রেমের জোয়ার

(গান)

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

আজকে প্রেমেব জোয়াব এল
মরা নদীর হৃদয় ছেয়ে।
নিয়ে আয় তোর নূতন তরী,
ওরে আমার নূতন নেয়ে।
এই বেলা সব গুছিয়ে নে না,
করতে হবে বেচা কেনা,
সকল দুয়ার ঘুরতে হবে
সকলে এক সাথে বেয়ে।
পাল তুলে' দে, পাল তুলে' দে,
ঐ যে রে ভাই পূবে' হাওয়া,
ভগবান আজ শুনেছেন তোর
কাতর প্রাণের সকল চাওয়া,
মিলিয়ে সবাই প্রাণে প্রাণ,
তোল দেখি, ভাই, নূতন তান,
চল দেখি, ভাই, সারি সারি
তোদের সারি-গানটি গেয়ে।—

বাধ-বিচার তো নাইকো কিছু,
সবারি আর পূরবে আশ,
আয়রে ছুটে' জগাই মাধাই,
আয়রে ছুটে হরিদাস ;
উঠেছে আজ নূতন সুর,
এ যে রে ভাই শান্তিপুর,
জেগেছে আজ নিত্যানন্দ
শ্রীচৈতন্যের পরশ পেয়ে।

সমাজের কথা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

এটা সাদা কথা, মানুষ একা থাকিতে পারে না, একা থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নর-বিদ্বেষী তাইমন (Timon) অথবা বিরাগী সন্ন্যাসীর কথা এখানে আমরা উল্লেখ না করিলেও পারি, কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে মানুষ বলা যায় না—ইঁহারা হয় 'অতি'-মানব আর না হয় 'অব'-মানব। আমরা বলিতেছি সহজ মানুষের কথা। সহজ মানুষকে জীবন রাখিতে ও চালাইতে হইলে দরকার অপর মানুষের সহিত সংস্রব, সহবাস, মিলন। সমাজ ছাড়া মানুষ নাই। মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ হইতে হইবেই। এখন এই একের সহিত অপর সকলের, প্রত্যেকের সহিত সমস্তের, ব্যষ্টির সহিত গোষ্ঠী ও সমষ্টির ঠিক সম্বন্ধটি কি ?

দুই জনকে এক সাথে থাকিতে হইলে একটা দা'ও-না'ও (give and take) সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এটিও স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমি আমার যা খুসী তাই করিতে পারি না, তুমিও তোমার যা খুসী তা করিতে পার না। নিজের স্বেচ্ছাচারকেই যদি জীবনের কেন্দ্র করিয়া তুলি তবে আমাদের পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে ; আর এই বিচ্ছিন্নতার, এই একান্ত একক-ভাবে জীবনের সার্থকতা নাই, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। এই জন্যই গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজের নিয়ম সব, তাহার বিধি নিষেধ,—তাহার শাস্ত্র। আমি ও আমি-ছাড়া অপর সকল, এই দুইটি সত্তার আদান-প্রদানে

মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে উভয়ের সংমিশ্রণ বা রসায়ণ যে তৃতীয় সত্তা তাহারই নাম সমাজ।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরস্পরের মধ্যে এই যে আদান-প্রদান, ইহারও আবার বিভিন্ন ধরণ আছে। গোড়ায় এই আদান প্রদান হইয়া থাকে অজ্ঞানতঃ, প্রয়োজনের বশে—এইরূপেই রীতি, আচার ব্যবহার বা unwritten law গড়িয়া উঠে, এবং এই 'অলিখিত' বিধানের প্রয়োগের জন্য দাড়ান দণ্ডকর্ত্তা রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। অজ্ঞানে, প্রয়োজনের তাড়নায় যখন সমাজ বাঁধিয়া উঠিতেছে তখন প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ থাকিবেই, এই রকম যুদ্ধেরই ফলে যেন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই আছে, শৃঙ্খলা চলন-সই রকম স্থাপিত হইয়া গেলেও, স্বেচ্ছাচারী যখন তখন উদ্ভূত হইতে পারে তাই তাহাকে গম্ভীর ভাবে বাঁধিবার জন্য বা অতি পরাক্রমশালী হইলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য দরকার হয় সমাজের একটা কেন্দ্রীভূত শক্তি, তাই হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট, সরকার, পঞ্চায়ৎ—সমাজের প্রতিনিধি। এই সমাজের প্রতিনিধিরাই পরে আবার নূতন নূতন নিয়ম কানুনের প্রবর্ত্তন করেন, সজ্ঞানে সমাজকে সংহত শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিতে চাহেন, যদি তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করেন সমাজ রক্ষার্থ তাঁহারা সমাজ-অন্তর্গত সকল ব্যক্তির উপর জোরজবরদস্তিও করেন।

এখনও মানব-সমাজ এই দ্বন্দ্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তিন দিক হইতে (triangular)। প্রত্যেক ব্যক্তিকে দ্বন্দ্ব করিতে হয় প্রত্যেক অপর ব্যক্তির সহিত আর সকলের সমবেত সমাজের একটা প্রাতিনিধিক শক্তির সহিত। ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির প্রতিযোগিতা আর্থিক বিষয়ে (economic) আর সমষ্টির সহিত তাহার প্রতিযোগিতা নৈতিক বিষয়ে। ব্যক্তি যে মুহূর্ত্তে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্যকে কিছু খর্ব্ব করিয়াই তাহাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু বাধ্য হইয়া এই যে সে নিজের উপর সংযম বা নিগ্রহ করিতেছে, ইহাতে তাহার প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমতি নাই। সমাজের মধ্যে থাকিয়াও তাহার প্রাণ তবুও চায় স্বচ্ছন্দগতি, যথেচ্ছকর্ম—বন্ধনের মধ্যে মুক্তি। পরে এই মুক্তি, স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের সহজতম অনুভূতি, প্রথম আস্বাদ মানুষ চায় নিজের অধিকার, মম-ত্বের মধ্যে। কর্তৃত্ব যতখানি বাড়াইতে পারিয়াছি—কর্ম্মক্ষেত্র, ভোগ্য বস্তুর উপর যত অবিসম্বাদী দখল আমার, নিজেকে ততখানি

স্বাধীন মুক্ত বলিয়া বোধ করি। মালথস্ (Malthus) যে বলিয়াছেন পৃথিবীর খাদ্যের অনুপাতে লোক সংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়া যাইতেছে,—কিন্তু সেজন্য লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগীতা (economic struggle) ততখানি চলিতেছে না যতখানি চলিতেছে প্রত্যেক মানুষের প্রাণে অধিকার বোধের ভিতর দিয়া যে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লিপ্সা আছে সেইজন্য। এনার্কিষ্টগণ (Anarchists) সমাজের বিধিবাধন বা রাষ্ট্রশক্তির আইন কানুন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে চাহিতেছে (moral struggle) তাহারও কারণ কেবল সমাজের বা সমষ্টির পীড়ন বা অত্যাচার নয়, অন্ততঃ ভিতরের কারণ নয়, ভিতরের কারণ হইতেছে—বাহিরের পীড়ন বা অত্যাচার হউক বা না হউক-- মানুষ চাহিতেছে সমাজের সমষ্টির মধ্যে ফিরিয়া আবার সেই আদিম প্রাকৃতিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের মত কিছু স্থাপন করিতে, এই স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছা-আচার স্পৃহার জন্যই সে বলিতেছে—Good government is no substitute for self-govornment.

কিন্তু বস্তুতঃ আদিম তন্ত্রে মানুষের পৌঁছিবার আর উপায় নাই, একবার যাহা পার হইয়া আসিয়াছি ঠিক তাহাতেই আবার ঘুরিয়া আসা সম্ভবপর নয়। মানুষ একলা থাকিবে না, একলা থাকিবার ফলে তাহার যে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারের অধিকার তাহাও সে পাইবে না। বহুর সাথে সমস্তের সাথে মিলিয়া মিশিয়া তাহাকে থাকিতে হইবেই—অথচ সে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য চাহিবে—এ সমস্যা মীমাংসা হইবে কিরূপে? তবে কি সমাজে থাকিলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ তাহার জীবনের সাথী, জীবন-অভিব্যক্তির উপায়? ডারউইনের (Darwin) struggle ও survivalই (দ্বন্দ্ব ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন) কি মানব সমাজেরও একমাত্র মূলতন্ত্র? সমাজের মধ্যে থাকিলে মানুষ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কখন পাইবে না, তবে তাহার সমস্ত প্রয়াস হইবে এই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারেরই জন্য যুদ্ধ করিয়া যাওয়া?

কিন্তু তাহা ঠিক বোধ হয় না। কারণ বলা যাইতে পারে, মানুষের সমাজ দ্বন্দ্ব প্রতিযোগীতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দ্বন্দ্ব প্রতিযোগীতাই সব কথা নয়। মানুষের মধ্যে সহযোগীতা বলিয়াও একটা জিনিষ দেখি। যদি দ্বন্দ্বই একমাত্র নিয়ম হইত, ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যের জন্য যদি সংঘর্ষকেই আবাহন করিতে হইত তবে সমাজ বলিয়া জিনিষটি বহুদিন আগেই লোপ পাইত। Competition শুধু নয়, co-operationও মানব-মনের, মানব-সমাজের একটা ধারা। মানুষ শুধু নিজের জন্য ভাবে না, পরের জন্যও ভাবে। মানুষ সমাজে থাকে ও থাকিতে চায়, কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্যও বটে। মানুষ নিজের শ্রীবৃদ্ধি যেমন চায়,

দেশের দশের শ্রীবৃদ্ধিও কি তেমনি চায় না? মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে, কারণ গোষ্ঠীর মধ্যে সে একটা আপনার বৃহত্তর সত্তা পায়, একান্ত নিজেরই সুখ সুবিধার জন্য নয়।

কথাটা আর একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। মানুষ মানুষের সহিত মিশিয়াছে কেবল প্রয়োজনের তাড়নায় নয়, একটা প্রাণেরই টানে। কিন্তু এই প্রাণের টান অর্থ কি? মানুষ মানুষকে ভালবাসে, একটা অহৈতুক স্নেহের ডোরে সমাজ ভিতরে ভিতরে বাঁধা আছে—ইহা কতখানি সত্য? বাস্তবে, প্রকাশে, কর্ম্মের মধ্যে আমরা মানব-মানবে কি পরিচয় পাই? আমি অপরের সহযোগ—co-operation চাই কখন, কেন অপরের সহিত সংযুক্ত হইতে চাই? একক থাকিলে স্বতন্ত্র আমি হইতে পারি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলা দুষ্কর। একলা থাকিয়া শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করি মাত্র, সংঘর্ষের যুদ্ধের মাত্রা আমার যত বাড়িয়া যায়, আমার জয়ের সম্ভাবনা ততই কমিয়া যায়। তাই ত গোষ্ঠীবদ্ধ হই। একই লক্ষ্যের একই স্বার্থের লোক লইয়া সংঘ গঠন করি—সুবিধার জন্য। ইহা যুদ্ধের কৌশল মাত্র; আমরা সতীর্থ, প্রাণের টানে নয়, প্রাণের দায়ে। মানুষ বুদ্ধিমান চালাক হইয়াছে শুধু সে পূর্ব্বের মত অথবা চিরন্তন স্বভাবের মত নিজেকেই চায়, তবে এখন সে চলিতে শিখিতেছে তাহার enlightened self-interest—উচ্চতর স্বার্থ অনুসারে।

সহযোগিতাও (co-operation) প্রতিযোগিতারই (competition) আর এক মূর্ত্তি। সহযোগিতার মূলে আছে স্বার্থই। নিজের নিজের লাভ বেশী হইতেছে যেখানে যেখানে, আমরা সেখানে সেই ভাবে সহযোগ দিতেছি ও চাহিতেছি। স্বার্থ যত বেশী সহযোগিতাও তত দৃঢ়। কিন্তু যখনই স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বার্থ দাঁড়াইয়াছে তখনই সহযোগও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এইরূপ ভাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী। বেশী স্বার্থ কোনদিনই এক সাথে বহুকাল টিকিতে পারে না। এক এক স্বার্থ আপন আপন দিকে টানিবেই, আপন আপন চরম সার্থকতার দিকে ছুটিবেই। প্রথমে ধরা যাউক গোষ্ঠীগত স্বার্থের কথা। ইউরোপের ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে পাই? ইউরোপের সমাজে বিভিন্ন যুগে চারিটি বৃহৎ সংঘশক্তির খেলা চলিয়াছে—রাজশক্তি, পৌরহিত্যশক্তি, সামন্ত-রাজ-শক্তি আর সাধারণ প্রজা-শক্তি। কিন্তু এই বিভিন্নশক্তি সমুদয় আপন আপন স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াছে, কোন বিশেষ শত্রুশক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য। এক যুগে যাহা মিত্রশক্তি অন্য যুগে তাহাই শত্রু-

শক্তি, এক যুগে যাহা শত্রুশক্তি অন্য যুগে তাহা মিত্রশক্তি হইয়াছে—চিরকাল এই-রূপ স্বার্থের দায়েই ভাঙ্গাচুরা চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-শক্তির মধ্যে এই রকমই দেখিতেছি সহযোগিতার তলে তলে প্রতিযোগিতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর আধুনিক যুগে সমাজের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি class war) সেখানেও সঙ্ঘবদ্ধ সকলে হইতেছে, সহযোগিতা বেশী দৃঢ় করা হইতেছে প্রতিযোগিতার জন্য, ভারতবর্ষেও একটা class war ঘটিতেছে। শ্রমজীবী ও মহাজনে সংঘর্ষ তেমন করিয়া এখনও ফুটে নাই, কিন্তু সামাজিক বর্ণের সংজ্ঞ সত্ত্বে, যেমন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে বেশাবেশি দেখা দিয়াছে। গোষ্ঠী বা সংঘের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা ব্যষ্টির দিকে তাকাই, সেখানেও দেখি সহযোগিতার বন্ধনকে কাটিয়া প্রতি-যোগিতার স্বাতন্ত্র্যের উপরই জীবনকে খাড়া করিবার একটা গতিধারা। ভারতে সমাজের কেন্দ্র (unit) ছিল একান্নবর্ত্তী পরিবার, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের মত দম্পতীই হইয়া উঠিতেছে একএকটা কেন্দ্র। কিন্তু এখানেও তাহার শেষ হইতেছে না। আমেরিকা যেন দেখাইতেছে দম্পতীর সম্বন্ধও ভাঙ্গিতে হইবে। দম্পতীর যে সহযোগ তাহাও ক্ষণিক, সুখ সুবিধার জন্য। স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পুরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সমাজকে ক্রমে দাঁড়াইতে হইতেছে। প্রত্যেককে নিজেরই দিকে দেখিতে হইতেছে, নিজেরই উপর ভর করিতে হইতেছে, নিজের দায়িত্ব নিজেকেই লইতে হইতেছে, নিজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি নিজেকেই করিয়া লইতে হইতেছে—chacun pour soi।

ইহা হইতেছে, আর ইহাই হওয়া উচিত। কারণ, নিজের শক্তিকে চিনিবার, বাড়াইবার ইহা একমাত্র পন্থা। ঘর্ষণে যেমন চন্দনের সৌরভ ফুটিয়া উঠে সেই রকম সংঘর্ষেই ব্যষ্টির প্রতিভা প্রজ্বলিত হয়। যে সমাজ যতখানি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ দিয়াছে, সেই সমাজই ততখানি উন্নত, জীবন্ত। সহযোগিতা (Co-operation) একটা চুক্তিমাত্র, যুদ্ধের একটা ছল বা কৌশল। মানুষ সহযোগী [illegible] সহযাত্রী চাওয়া তার উচিত- এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মস্ফুরণের [illegible]। [illegible] গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ মানুষের ব্যক্তিগত সার্থকতার অবলম্বন, [illegible]।

কিন্তু এ [illegible] যখন আদর্শ হইয়া পড়ে, যে জন্য ইহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা ভুলিয়া গিয়া ইহাকে স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লই, তখনই ধ্বংসের বীজ বপন করি। ব্যষ্টিধর্ম্মের উপরে যখন গোষ্ঠী বা সমষ্টিধর্ম্মকে চাপাইতে আরম্ভ

করি তখনই ব্যষ্টির, গোষ্ঠীর, সমষ্টির অবনতি সুরু হইল। একটা গোষ্ঠীকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া জর্ম্মনীর (State idea) তুলি অথবা সমষ্টিকেই ব্যষ্টির নিয়ামক করিয়াই তুলি (Socialism) তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া সমাজকেও মানুষকেই খর্ব্ব করিয়া তুলি। সুতরাং প্রতিযোগিতাকে যাঁহারা তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহারা সমাজ-প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে ত চলিতেছেনই, আদর্শেরও বিরুদ্ধে চলিতেছেন।

কিন্তু এখানে আবার আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, স্বতন্ত্রা ও প্রতিযোগিতায় যে সম্বন্ধে তাহা কি অঙ্গাঙ্গীব সম্বন্ধ? স্বীকার করিলাম ব্যক্তি চাহিতেছে স্বাতন্ত্র্য, আপনার পূর্ণ অভিব্যক্তি, কিন্তু তাহার অর্থই কি দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ? মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হইবার যে প্রেরণা, (Herd instinct) তাহা কি প্রকৃতির প্রয়োজনেরই তাড়নায় উদ্ভব হইয়াছে, না তাহার সঙ্গে অন্য রকম কারণও কিছু মিশ্রিত আছে? ফলতঃ আমরা বলিব, যাঁহারা সমাজকে দেখিতেছেন প্রতিযোগিতা, অসম্বৃত দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া (Red in tooth and claw) তাহারা মানুষের একটা দিকই শুধু দেখিতেছেন—স্থূলতর দিকটি, মানুষের প্রাণময় সত্তা, আর যাঁহারা সহযোগিতা বা অর্দ্ধেক দ্বন্দ্ব ও অর্দ্ধেক মিলনের মধ্য দিয়া দেখিতেছেন তাঁহারা মানুষের পাইয়াছেন মনোময় সত্তাটি। কিন্তু অন্ন প্রাণ ছাড়া, মন ছাড়া মানুষের আর কোন প্রেরণা নাই কি, আর কোন আবেগ, ইষণা শক্তি তাহার জীবনে ফুটিয়া উঠিতেছে না, জীবনের উপর প্রভাব রাখিয়া যাইতেছে না?

মানুষে মানুষে মিলিয়া যে সমাজবদ্ধ হইয়াছে তাহা জীবন সংগ্রামের চাপের ফল, তাহা বাহির হইতে জোর করিয়া দেওয়া ধর্ম্ম অথবা উহা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছল বল প্রণোদিত চুক্তি, শুধু এইটুকু বলিলে সব কথা বলা হইল না। পরের সাথে মানুষ মিশিতে চায়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু মেশার আনন্দের জন্য। অপরের সাথে মানুষ লেনা দেনা করিতে চায়, কেবল নিজের ভাণ্ডারকে বাড়াইবার জন্যই নয়, ইহাতে সে তৃপ্তি পায় বলিয়া। এই মেলামেশা, এই লেনাদেনার ফলে তাহার অনেক লাভ হইতে পারে, কিন্তু শুধু এই লাভের জন্য, এই লাভকেই সম্মুখে বা গোপনে উদ্দেশ্যরূপে রাখিয়া সে যে মেলামেশা লেনাদেনা করে, ইহাও সত্য নয়। মানুষের এক অংশে এক ক্ষেত্রে, প্রতিযোগিতা যেমন ধর্ম্ম, আর এক অংশে, আর এক ক্ষেত্রে সহযোগিতা তেমনই ধর্ম্ম, তেমনই আবার আর এক অংশে আর এক ক্ষেত্রে তাহার ধর্ম্ম একাত্মতা। এই একাত্মতা সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, অনুভব করে বলিয়াই, তাহার এই মেলামেশা, লেনাদেনা

সকলের মধ্যে থাকিয়া, সকলের সাথে চলিয়া ফিরিয়া, সে যেন বাস্তবিকই পায় নিজের এক বৃহত্তর সত্তা, গভীরতর জীবন, মহত্তর সার্থকতা। কেবলই দ্বন্দ্ব অথবা শুধু স্বার্থনিয়মিত সহযোগ, তাহার সত্তার, জীবনের বাহিরকার দৃশ্য, কিন্তু ভিতরে লুকায়িত আছে নিঃস্বার্থ অহৈতুক মিলনের আনন্দ, দ্বন্দ্বের মধ্যে, সন্ধির মধ্যেও এই মিলন আনন্দই বিপরীতভাবে, কিন্তু কখন আবার ঋজুভাবেই দেখা দিতেছে। পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করে, সন্তানের নিকট হইতে উপকার পাইবার আশায় নহে—এ রকম আশা সে স্নেহের মধ্যে জড়িত থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আসল মূল নয়, মূল হইতেছে সন্তানের উপর পিতামাতার নাড়ীর টান—হইতে পারে সন্তানের মধ্যে পিতামাতা আপনাকেই দেখে বলিয়া এই স্নেহ জন্মে, কিন্তু সেই 'আপন' পিতামাতার সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত 'আপন' নহে, তাহা হইতেছে সন্তানকে লইয়া সন্তানের সত্তার সহিত মিশিয়া গিয়া তাহার যে বর্দ্ধিত সত্তা। নিজের আত্মাই ভালবাসার উৎস বটে, কিন্তু সেই নিজের আত্মায় পরের আত্মাও জুড়িয়া গিয়াছে, সে আত্মা পরের আত্মা হইতে পৃথক খণ্ডিত অহঙ্কার নয়। তারপর যেখানে চোখে দেখিতেছি শুধু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, সে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের অর্থ হইতেছে মিলনের সামঞ্জস্যের চেষ্টা। ভিতরে একটা নিবিড় ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মনের প্রাণের বাধা ঠেলিয়া বাহিরে প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে, মনের প্রাণের বন্ধনকে মিলনের ভাব করিয়া তুলিতে যত্ন করিতেছে তাই এত দ্বন্দ্ব, এত সংঘর্ষ। মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় (will to live) আপনাকে বাড়াইয়া তুলিতে চায় (will to power) সেই জন্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই সমাজ থাকিবে ও চলিবে —ইহা অপেক্ষাও গভীরতর সত্য মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে চায় (will to love), পরের মধ্যে নিজের চারিদিকে নিজেকে পাইতে চায়, সেই জন্যই সমাজে গোষ্ঠী ও সঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য সে চলিয়াছে।

মানুষ চায় মানুষের স্পর্শ—পরের মধ্যে নিজের আত্মার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পরের মধ্যে নিজেকে পাওয়ার অব্যর্থ অনুসঙ্গ হইয়াছে নিজের মধ্যে পরকে পাওয়া, নিজের মধ্যে অপরের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ঠিক এই কথাটিকেই কিন্তু তাহার মন ও প্রাণ ঠিক বুঝিতে ধরিতে দেয় না, তাই সমাজের যত গোলমাল; এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া সমাজবন্ধনের, গোষ্ঠী বা সংঘ গঠনের চেষ্টা সে করিয়াছে বলিয়া সমাজ, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ ভাঙিয়া-ভাঙিয়া চলিয়াছে, ব্যষ্টিই ব্যক্তিগত অহংকারই হইয়া পড়িতেছে চরম-সাধনা ও সিদ্ধি।

নিজেরই মধ্যে নিজে মানুষ সম্পূর্ণ নয়, অন্ততঃ এই সম্পূর্ণতার প্রকাশের, বাহিরে খেলার জন্য চাই অপরের সংসর্গ। একার ভোগ হয় না, শক্তিরও ভোগ হয় না, ভালবাসারও ভোগ হয় না। কিন্তু দুই এর সংসর্গে প্রথমে চাগিয়া উঠে সংঘর্ষ। কারণ বাধা পাইয়াই মানুষ প্রথমে আপনার সম্বন্ধে সচেতন হয়, এবং আপনাকে বেশী করিয়া পাইতে চায় বলিয়া সম্মুখে একটা বাধাকেই সজীব করিয়া রাখার মধ্যে মানুষের এত আনন্দ। এই রকমেই সে নিজের নিজত্ব ও সামর্থ্য অনুভব করে, ফুটাইয়া তোলে। তাই মানুষ দেখি সংঘ সমাজ গড়ে যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য। কিন্তু এটা একটা বিশেষ স্তর মাত্র, একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা মাত্র। কিছু অগ্রসর হইলে, কিছু জ্ঞান হইলে আমরা দেখি, আমরা বুঝিতে পারি, নিজের নিজত্ব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাধার দরকার নাই, পর হইতে পৃথক বোধ করিবার, পরের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাইবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সহযোগিতা-তন্ত্রে এই কথাটি অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজের দুর্ভেদ্য গণ্ডীটা সেখানে একেবারে মুছিয়া না গেলেও কিছু মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। আরও অগ্রসর হইলে, আরও জ্ঞান হইলে, দেখি স্বাতন্ত্র্য অর্থ সংঘর্ষ ত নয়ই নয়, স্বাতন্ত্র্যেই শ্রেষ্ঠ মিলন, সমাজের, সংঘের মধ্য দিয়াই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। পরকে যতক্ষণ পর বলিয়া বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করি, পরও ততক্ষণ আমারই উপর চাপিয়া পড়িতে চেষ্টা করে, আমার স্বাতন্ত্র্য ততই তাহাতে খর্ব্ব হইয়া পড়ে, পাখা মেলিয়া তুলিবার ততই কম অবকাশ পায়। পরের মধ্যে আমাকে দেখি ও আমার মধ্যে পরকে দেখি বলিয়া পরস্পরের লেনাদেনা যখন সরল সহজ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূরিত হয় তখনই প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ শক্তি খেলিয়া উঠে। সকলের একাত্মতার মধ্যে প্রত্যেকেই দেখে, অনুভব করে একটা সুবৃহৎ মুক্তি, অনন্ত প্রকাশের অসীম প্রসার।

এই একাত্মতায় যখন পৌঁছি তখন প্রত্যেক এককের মধ্যে দেখি নিজেরই শক্তির, নিজেরই সামর্থ্যের প্রতিরূপ; আমার কর্ম্মের দ্বারা আমার নিজের কর্ম্ম ত উপচিত হইতেছেই পরের কর্ম্মও উপচিত হইয়া চলিয়াছে আবার অপরের কর্ম্ম তাহার কর্ম্মকে উপচিত করিয়া আমারই কর্ম্মকে উপচিত করিতেছে। মানুষের ভোগ সামর্থ্যের অনুযায়ী রসদের অভাব যে পৃথিবীতে আছে তাহা নয়, অভাব শুধু রসদের যথাযথ ভাগবাটরা বা বিলি বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত ঠিক মত যে হয় না, তাহার কারণ মানুষের একটা অমূলক আশঙ্কা একটা অধীর

ত্বরা, প্রাণের ও মনের ভাসাভাসা আবেগ। সামর্থ্য যতখানি বা প্রয়োজন যতখানি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আমাদের আকাঙ্ক্ষা ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠে, হজম যতখানি করিতে পারি না, গ্রাস করিতে চাই ততখানি। তাই আমাদের হয় ঈশপ কথিত ভেকের দশা—Ruat mole sua—নিজের ভারেই নিজে ভাঙ্গিয়া চুরমার হই। সকলের এ রকম ভাবের দরকার হয় না, এক জনের হইলেই যথেষ্ট। একদিকে অতিবৃদ্ধি হইলে, আরও অনেক দিকে অতিবৃদ্ধি হয়,—তার অপেক্ষা বেশী দিতে হয় অতি ক্ষয়, আকাঙ্ক্ষার অভাব, অবসাদ, দুর্ব্বলতা, হতাশা। কিন্তু সকলে মিলিয়া একই বিরাট অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। সকলের আত্মায়ী সম্বন্ধের ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি?

অনেকে হয়ত আশঙ্কা করিবেন এই একাত্মতার ফল হইতেছে একাকার অতিবৃদ্ধি ও অতিশয়ের হাত এড়াইতে গিয়া মানুষ হইয়া পড়িবে অতি সাধারণ (mediocrity)। কিন্তু তাহা হয় শুধু যখন বাহিরের আইন কানুন, বিধি নিষেধের জোরে এই একাত্মতা স্থাপন করিতে আমরা চেষ্টা করি। গোড়া হইতে, প্রত্যেক মানুষ হইতে সংঘ শক্তি গড়িবার চেষ্টা না করিয়া আমরা উপর হইতে একটা কেন্দ্রগত সংঘশক্তি হইতে সমাজকে, মানুষকে গড়িতে বা চালাইতে চেষ্টা করি। Socialism এর ভুল এইখানে যে সে বাহির হইতে একটা কেন্দ্রগত শক্তির চাপে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সাম্য ও মিলনের চেষ্টা করিতেছে। আমরা বলিয়াছি কেন্দ্রগত সমাজশক্তি ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে লেনা দেনার ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ঐ সমাজশক্তি দিয়া ব্যষ্টির লেনা দেনা নিয়মিত বা পরিচালিত করিতে না গিয়া, করা উচিত ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে লেনা দেনার ধরণের পরিবর্ত্তন, যাহাতে সমাজশক্তি পায় একটা নূতনতর উচ্চতর মূর্ত্তি। এই ভাবে ব্যক্তি হইতে ব্যষ্টি হইতে যখন আরম্ভ করি, ব্যক্তির, ব্যষ্টির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের সাহায্যেই সমাজকে গড়িয়া উঠিতে দেই, তখন দেখি সমাজ একাকার ও নয়, অতি-সাধারণ ও নয়, তাহা বহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাই গরিষ্ঠ। আর সে সমাজ যে প্রতিযোগিতা বা নামমাত্র সহযোগিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে এমনও কোন কথা নাই। মানুষ সমাজ গড়িয়াছে পরের সহিত মিলিবার জন্য, পরের মধ্যে থাকিয়া আপনার ও পরের শ্রীকে বিভূতিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, পরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নয়, পরের উপর আপনার প্রভুত্ব খাটাইবার জন্য নয়। এই শেষোক্ত পন্থায় যতদিন চলিয়াছে ততদিন তাই তাহার প্রকৃত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে নাই, ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা, তাই প্রকৃত সমাজ, প্রকৃত

সঙ্ঘ, প্রকৃত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইবার জন্য তাহার সাময়িক সমাজ সঙ্ঘ, গোষ্ঠী সব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির টানে তাই সে দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ছাড়াইয়া আর একটা বৃত্তি, আর একটা প্রেরণার আশ্রয় লইতে চলিয়াছে।

ভুল।

[শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।]

ভুল গো। সকলি আমার ভুল।
আমি ভুলের সাগরে ভুলে ডুবে' যাই
খুঁজিয়া পাই না কূল।
এ কানু-কাননে পশিনু কেমনে
ভাবিয়া না পাই দিশে,
ভুলিয়ে পা ফেলি ভুলে' কোথা চলি'
ভুলেরি আঁধারে মিশে।
সখি, মিছে মোরে দিস্ গালি।
যে পথে যাইতে শপথ আমারে
ভুলে সেই পথে চলি,
যে কথা ক'বনা সদা ভাবি মনে
ভুলে তাই আগে বলি!
দিনে শতবার ভুলিব না বলে'
ভাবি যে ঘরের কাজ,
বাঁশরীর রবে সব ভুলাইয়া
বঁধুয়া যে দেয় লাজ।
বেশ বানাইতে বসিনু সখি, সে
বেশ ত হ'ল না শেষ,
কানুর সে কালো মুরতি লুকায়ে
রেখেছে রে কালো কেশ!

চরণ-যাবক আঁখিতে দিয়েছি
কাজল পরেছি পায়,
নূপুর করেছি করের ভূষণ
কেয়ূর চরণে তায়!
ভুলিতে যাহারে সকল-ভুলেছি
দিনে দিনে সেই ছবি,
ভুলিবার ভয়ে বুকে জাগে সদা
যেন নবোদিত রবি।
কানুরে ভুলিতে এ তনু ভুলেছি
ভুলিতে নারিনু তায়,
এ ভুলের হাতে তরিব কেমনে
কহ না লো রাধিকায়!

জোনাকীর গরব।

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

চারিদিকে নিথর নিবিড় ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া রূপহীন কালো। মরণের মত বুঝি সুখদুখ দুই ঘোচান সর্ব্বনাশের মত দেখিবার নয় এমন যে অরূপ অস্পর্শ সেই কালোকে যে দেখিতে জানে সেই ধন্য। অপূর্ব্ব রস-শিল্পী শরৎচন্দ্র বলেছেন, "হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন - তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার! * * * রাধার দু' চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম।"

এমন যে কালোর দরশহারা পরশভরা পাগলকরা নিবিড়কান্তরূপ, তা' কে দেখায় বল দেখি? সে অদর্শন-দর্শন দেখায় ক্ষুদে ক্ষুদে তারা বা কণা কণা জোনাকী। গহন সত্যের সেই নীলাম্বরীখানি সোণার ঝিকমিকি ফুলকী জ্বেলে লাখে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকী। জগৎ-রাধার অভিসারের কালো শাড়িখানিতে জরির অলঙ্কারে চুমকি হ'ল মানুষের জ্ঞান॥ অনন্ত অনুপম ত্রিলোকভরা সে কালো মণি তেমনি দুজ্ঞে'য় থেকে যায়, দেখা যে হয় তা' নয়, বুঝি শুধু দেখার সাধ মেটে। শুধু মানুষের জ্ঞানের জ্যোতি-কণাগুলি গায়ে মেখে তার মাধুরী অফুরন্ত হয়ে পড়ে, সে ঝিকিমিকির ঢেউয়ে তার চক্ষুর অগোচর রূপ দুলে ওঠে। সে চোখোচোখী জোনাকীর কিন্তু হয় না, হয় তার, যে জোনাকী জীবন উৎরে গিয়ে কালোকেও দেখে, আর ঝিকিমিকিকেও দেখে।

এতটুকু আলোর ঘেরে জোনাকীর জীবন। সে যতই উড়ে চলে ঐ আলো, তার সঙ্গে যায়, যখন আলো দেয়—অনন্ত নিবিড়ের ঐটুকুই দীপ্ত করে দেয়। তা'তে কালোর সাগর দেখা হয় না, দেখা হয় সীমার মাঝে আপন অজ্ঞানকে। তাই আলোর পোকার এত অহঙ্কার। তা'কে ত কখন আঁধারে থাকতে হয় না, ঐটুকু একফোঁটা জ্যোতির ঝলকে সে ভাবে, যে, সে বিশ্বজোড়া অকূল অচেনাকে চিনে ও দেখে ফেলেছে।

জোনাকী আলোর গুঁড়ো বলে দিনের জগজ্জোড়া জ্যোতির বান সইতে পারে না। কারণ তা'তে যে তার গরব করবার বিন্দুটুকু হারিয়ে যায়, সে সত্তার জলুসভরা ধু ধু বিথারে আপনাকে কুড়িয়ে পায় না। আঁধারের জমাট কুহক তাকে জীবন দেয়, সে কুহকে জোনাকীর কেবল অনায়াসে ভেসে বেড়ালেই হ'লো, নিবিড় নিজেকে লুকিয়ে তার গর্ব্ব করবার গুঁড়োটুকুই জাগিয়ে তোলে। আর সে অসীম অরূপের অত চেষ্টা না বুঝলেও জোনাকীর দিন বেশ চলে, নিজের ব্যর্থ জ্বলাটুকু বুঝলেই বুকখানা ভরে ও ফুলে দশহাত হয়।

যুগে যুগে এই খেলা চলছে। যখন চোখধাঁধান আলো নিয়ে প্রকাশের যুগ আসে, তখন নিশাচর জোনাকীর বড় রাগ ধরে। সে কিছুই বুঝতে চায় না; বলে, "সেই বেশ ছিল,—গুঁড়ো গাঁড়া বালুর কণাগুলো সব দেখা যেত, বড়কে নেই করে কেমন সব কিলবিল করতে করতে জ্যোতির ধুলোর তরঙ্গ তুলে বেড়াত। এখন এই ত্রিলোক ডুবান ভূমা'র মাঝে আমি'র কুচোকাচা গুলোর গতি কি হবে?"

গাছের ডালটা হাতির খোরাক, পোকাটার খোরাক হ'লো পাতাটা

ফুটোটা। নবা যুগের মানুষ খণ্ড সত্যকে একান্তই আঁকড়ে থাকে, কারণ সেই একফাচ্চা মামুলি বুদ্ধি দিয়ে তাকে বেশ বোঝা যায়; দুই হাতের মুঠোয় তাকে আপনার পুঁটলীতে সঞ্চয় করা সহজেই চলে। আর সূর্য্যকে কুক্ষিগত করা, এক লাফে হেলায় সাগর লঙ্ঘান, বাণ মেরে ধরিত্রীর বুকে গঙ্গাধারার উৎস তোলা এ সব যুগান্তরের অসাধ্য সাধকের কাজ, এসব ঘটে যখন, সেটা যুগের রাজা—সত্য যুগ। বুকখানা অকূল করে সাগর-বঁধুকে ধরা সে কি সহজ কাজ? সমগ্রের প্রকাশ দেখে পূর্ণ জীবনের আস্বাদ নিয়ে টিঁকে থাকা কি যে সে জ্ঞানের সাধ্য?

রাজনীতি বুঝি, বুঝি না জীবন-নীতি। আম গাছের তামাটে পাতায় তরল রক্তিমা চাই, চাই না সব সবুজকরা ফুলে কিশলয়ে বন-ছাওয়া বসন্ত। সমগ্রে যে অমন কত লক্ষ অংশ ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে, তা' বুঝি না। বত ক্ষুদ্রের সকল বিকাশে যে পূর্ণের চূড়ান্ত সার্থকতা, তা' ধরতে না পেরে, নয় সবটা বাদ দিয়ে একটাকে চাই, অথবা বৈচিত্র্যকে মুছে দিয়ে চিরবিচিত্র পূর্ণকে দেখবার লোভে চোখ মেলি। ওটাকে ছেড়ে যে এটা নয়, আর এটার জাল বুনানীতে যে ওটার জন্ম, তা' কে বোঝায় বল দেখি? আম থাকবে না, তাল তমাল থাকবে না, লতার বেড়ে কুঞ্জ রচবে না; অথচ শ্যামায়মান বনভূমি চাই! এও কি কখন সম্ভবে? বৈচিত্র্য যে পূর্ণের জীবন, পূর্ণ যে এত ভঙ্গি এত রস এত নিতুই নব নিয়ে ভরপুর! তরঙ্গকে নদীর বুকে দেখতেই ত তার অত শোভা, অমন তরল ভাব-দ্রব ভারতকে না পেলে যে বঙ্গের ক্ষীরস্রোতা জীবন ব্যর্থ হয়। ভারতকে চাও, তা' হ'লে বাঙ্গলাকেও চাইতে হ'বে, বাঙ্গালী সার্থক বাঙ্গালী হয়েই তবে ভারতবাসী। নইলে সে আত্মঘাতী হয়ে ভারতের জীবনোৎসবে সুখ বিচিত্রতা আনবে কি করে? শিবাজী রামদাস তুকারাম কি মহারাষ্ট্রেরই নতুন সৃষ্টি নয়, তা'তে কি ভারতের গৌরব বাড়ে নি? শিখশক্তির সেই "ধন ধন পিতা দশমেসগুরু" মহানাদ কি পঞ্চনদেরই নিজস্ব ধন নয়? অংশেই পূর্ণের অভিব্যক্তি, শতটি দল ফুটিলে তবে পদ্ম।

আজ আমরা বিশ্বতন্ত্রবাদের দিনে ভারতকে জাগাতে তপস্যা করছি কেন? ভারতের চেয়ে ত বিশ্ব বড়। হাজার বড় হোক্, তবু এই চীন জাপান ভারত রুস ইংলণ্ড ফ্রান্সরূপ পাপড়িগুলি না হ'লে জগৎপদ্ম ফুটবে না। বড় আদর্শের মোহে ছোট্‌'কে নষ্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে বড়ও বে-ঘুচে যায়। আমার মত করে আমার বুক দিয়েই ত জগতের সাড়া পাই? কালোর দেবতা যুগান্তরে যখন সংসার- আলোর

আলো করে জেগে ওঠে, তখনও কুঞ্জে কুঞ্জে নানান পাখী আপন সুরেই জীবন-প্রভাতী মুগ-পুরবীতে গেয়ে যায়।

কে তোমার পর প্রিয় কে বড আপন ?
সব মন দলগুলি
স্তবকে স্তবকে মিলি
রচেছি কমল ফুল-তোমারে মোহন।

স্বরলিপি।

(প্রেমের জোয়ার)

[কথা, সুর ও স্বরলিপি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

মিশ্র ভীমপলশ্রী — একতালা।

| । । জ্ঞা মা পা পা মাপামা জ্ঞা ঋা
| — — আজ কে প্রে মের জো য়া র

ঋা সা । সা দা । । পা মাপা জ্ঞা মা ।
এ ল — ম রা — — ন দীর হৃ দ য়

পাদাপামা পা । | । । পা ণা ণা ণা ধা
হে—— য়ে | — — নি য়ে আর তোব নূ

ণা । র্সা পা দাণাদাপা পা পা ণাদা ।
তন — ত রী —— ও বে — —

পা মাপা জ্ঞা মা । পাদাপামা পা । |
আ মার নূ তন — নে—— য়ে — |

। । পা পা ণা ণা ণা র্সা ঋাসা ণা
— — এই বে লা সব গু ছি য়ে নে

ণা । । । ণা ণা র্সা র্সা ণার্সাণা দা
না — — — কর তে হ বে বে—— চা

পঞ্চ প্রদীপ।

কঃ পন্থাঃ।

পৃথিবীর সমস্ত জাতিই কোন না কোন আকারে উন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে, এখন আমরা কোন পথে চলিব? পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে জাতীয় উন্নতির কোন সাধারণ মাপকাঠি পাওয়া যায় না। রুষ, ফরাসী, জার্ম্মান্, ইংরেজ কেহই মানবের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে একই আদর্শের অনুসরণ করিতেছে না। তাহাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি বা অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকলা কোন এক নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। অথচ তাহারা সকলেই উন্নত। তাহাদের অনেকের মধ্যে সাধারণ সম্পত্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষের উন্নতি, অবনতি, সভ্যতার সাধনার মাপকাঠি হইতে পারে না। তবে ইহা জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। অনেক জাতি রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন হইয়াও মানবীয় সভ্যতার আদর্শের হিসাবে অনেক নীচে, এমন কি অনেক স্বাধীন জাতিকে আমরা অসভ্য আখ্যা দিয়াছি ও দিয়া থাকি। আবার কোন কোন জাতি গ্রীস ও ভারতবাসীর ন্যায় পরাধীন হইয়াও বিদ্যাবুদ্ধি ও সভ্যতা সাধনার দ্বারা বিজেতাকে জয় করিয়াছে। তাহা হইলেই হইল, বিভিন্ন জাতির জাতীয় উন্নতির আদর্শ বিভিন্ন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার হিসাবে আমরাও অনেক অসভ্য জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের মনুষ্যত্বের আদর্শ তাহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট? তাহা কখনই নহে। এ বিষয়ে ভারতের নবযুগ প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি প্রণিধান-যোগ্য, 'তিনটি বর্ত্তমান জাতির তুলনা কর যাহাদের ইতিহাস তোমরা অল্প বিস্তর জান। ফরাসী ইংরেজ ও হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, কর-ভারে পিষে দাও কথা নেই, দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে সেপাই কর আপত্তি নেই, কিন্তু যেই স্বাধীনতার উপর কেউ আঘাত করেছে অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদের মত প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে হুকুম চালাতে পারবে না এই হল ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চবংশ নীচবংশ রাজ্য শাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় তাহাদের সমানাধিকার।

ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসা-বুদ্ধি আদান প্রদান প্রধান। যথাভাগ ন্যায় বিভাগ ইংরেজের আসলকথা। রাজা কুলীন জাতির অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে

স্বীকার করে, কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সা ব্যয় করতে হয় তবে হিসাব চাইবে। রাজা আছ বেশ কথা, মান্য করি, কিন্তু টাকাটা যদি তুমি চাও ত তার কার্য্য কারণ হিসাবপত্রে আমি দু'কথা বলবো, বুঝবো তবে দিব। রাজা জোর করে কর আদায় করতে গিয়ে মহা বিপ্লব উপস্থিত করলেন। রাজাকে মেরে ফেললে।

হিন্দু বলছেন কি না রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—মুক্তি। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য। বৈদিক-বল, জৈনবল, বৌদ্ধবল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে একমত। ঐ খানটায় হাত দিও না দিলেই সর্ব্বনাশ। তা ছাড়া চুপ করে আছি।' বস্তুত পারমার্থিক স্বাধীনতাই আমাদের জাতীয় লক্ষ্য।

জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে সাধন করে তার পরে অন্যান্য কার্য্য। আমাদেরও সর্ব্বাগ্রে এই পরম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের এ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে এই আদর্শের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই সামাজিক জীবন [রাজনৈতিক জীবন ইহারই অন্তর্ভুক্ত] গঠন করিতে হইবে। আমরা যে নূতন রাজনীতিক জীবন লাভ করিবার জন্য আশান্বিত হইয়াছি, তাহার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতায় না রাখিলে আমাদের চেষ্টা ও সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

অনঙ্গমোহন দাস—নবযুগ (ভাদ্র)

আত্মপ্রতিষ্ঠা।

ব্যবহারিক জগতের মত অধ্যাত্ম সাধনাতেও যে তুমি পরমুখাপেক্ষী হইতে চাও? পরাধীনতার নিবিড় বন্ধন তোমার আত্মাকেও স্পর্শ করিয়াছে নাকি? স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, অন্তর্জগৎ হইতেও যদি নির্ব্বাসিত হইয়া থাকে—মুক্তি তোমার সুদূরপরাহত, কেবল অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে তুমি দাসখৎ সহি করিয়াছ এমন নহে, নিজের অন্তর উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য পরের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছ।

* * *

স্বভাব আমাদের এমনই হইয়াছে। বাহিরের অবস্থা—অন্তরকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে, পরের গোলামী না করিয়া জীবনযাত্রা যেমন আমাদের অসম্ভব, আত্মাকে পাইতে হইলেও, পরের পায়ে লুটাইয়া পড়া যেন অনন্যগতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ওগো প্রভু, আমায় মুক্তি দাও, তোমার পায়ের ধূলায় আমায় সার্থক কর, ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে এমনি দাস্যভাব যেন চরম সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা কি মুক্তি?—অন্তরে বাহিরে এমন করিয়া বাঁধা পড়িলে জাতির দুর্দ্দশা যে শোচনীয় হইবে—ইহাতে আর কথা কি আছে?

* * *

বজ্রপাতের মত কথাটা ভক্তমণ্ডলীর মাথায় গিয়া বড় বাজিবে, কিন্তু করা যায় কি? বাহিরের বন্ধন, বাহিরের আঘাতে বরং শ্লথ হইয়া পড়ে, কিন্তু অন্তরের বন্ধন সে যে ভীষণ, সে যে স্বভাব হইয়া দাড়ায়, তাহাকে অতি নির্ম্মম-ভাবেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। মানুষের চরণে মানুষ বাঁধা পড়িয়া, আত্ম-প্রকাশের পথে যদি বিঘ্ন উপস্থিত করে, তবে গড্ডলিকা প্রবাহের মত, এত বড় বিশাল জাতিটা মরণের দিকেই ছুটিবে, যদি জীবন আনিতে চাও, প্রতি ব্যক্তির আত্মমর্য্যাদা, স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটাইয়া তোল, প্রতি প্রাণ আপনার স্বরূপ আপনাকে উপলব্ধি করুক—নিজের সকল শক্তি অবধারণ করিতে, সকল সম্ভাবনা সাধন করিতে, প্রতি আধার উপযোগী হইয়া উঠুক—ইহাই না বর্ত্তমান সাধনার চরম লক্ষ্য?

* * *

তারপর বাংলায় মহাপুরুষের সংখ্যা হয় না। যে দেশে এত অবতার, এত মহাত্মার আবির্ভাব, সে দেশে মানুষ পেটের-জ্বালায় গলায় দাড়ি দিয়া মরে কেন? পুকুরের পাঁক তুলিয়া জঠর জ্বালা নিবায় কেন? ছেড়া ন্যাকড়া কোমরে জড়াইয়া কুলস্ত্রীগণ লজ্জায় অধোমুখী কেন?

* * *

স্বভাব আমাদের পরের পায়ে আপনাকে লুটাইয়া দেওয়া, কিন্তু বাংলার ধর্ম্মপুরোহিত যাঁহারা তাঁহাদিগকে আজ সত্য হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, ভক্তের প্রথম আবেগ নিঃশেষ করিয়া প্রত্যেকের জীবনে নিজের সকল অনুভূতি, সকল দর্শন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, গুরুর মত যদি ভক্ত না হয়, তবে ভক্ত আবার যখন গুরু হইয়া উঠিবে তখন তাহার ভাব আবার তদপেক্ষা অল্প শক্তি-সম্পন্ন হইবে, এইরূপে ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রে অধোগতিই তো অবধারিত। না, তাহা নহে, আজ এমন ধর্ম্মক্ষেত্র, এমন সাধনা নির্ম্মাণ ও প্রবর্ত্তন করা চাই, যেখানে মানুষ আপনার মধ্যেই অসীমকে উপলব্ধি করিবে, আপনাকে কোন অংশে অপরের অপেক্ষা হীন তুচ্ছ মনে করিবে না, একেবারে সকলকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

আমরা বাংলার ধর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ সাধনারই প্রবর্ত্তন দেখিতে চাই, ধর্ম্মকেন্দ্র-গুলিতে, একজনকে ভগবানের অবতার বোধে সহস্রজনের ভক্তবেশে অবস্থান দেশের উন্নতিসূচক নহে, যিনি অবতার তাঁরও কর্ত্তব্য সকলকেই অবতার করিয়া তোলা—নতুবা ভারতের অতীত ধর্ম্মপ্রবাহের মত বর্ত্তমান যুগধর্ম্মও জাতির জীবনে কোন স্থায়ী শক্তি দিয়া যাইবে না, অবতারের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য প্রশিষ্যগণ নেড়া নেড়ির দলে পর্য্যবসতি হইবে, আর মঠ মন্দিরগুলি ইদুর চামচিকা পেচক প্রভৃতি নিশাচরগণের বিচরণক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, নূতন বাংলাকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি।—প্রবর্ত্তক

অরবিন্দের ভাব-কণা।

অস্তির আনন্দ।

ভগবান যদি জীবনের বিরোধী—শুধু তুরীয়ের ভগবান ভাবের ধোঁয়া হ'তেন তা' হ'লে জড়ের চূড়ান্ত পরিণতি হ'ত নির্ব্বাণ। কিন্তু বুকভরা প্রেম, আনন্দ ও অস্তি জ্ঞান নিয়ে নির্ব্বাণে যে তার মীমাংসা হয় না।

এ দুনিয়াটা শুধু একটা গণিতের সিদ্ধান্তই নয়—যে তাকে নিয়ে কতকগুলি সংখ্যা ও ফাঁকা তত্ত্বের জের কষে কষে শেষে গিয়ে শূন্যে দাঁড়াব। কতকগুলি জড়শক্তির সমবায় বা সৃষ্টি বলেও ত এ জগৎ শেষ হয় না। এ যে আত্ম-প্রেমিকের আনন্দ—শিশুর খেলা—কোন্ সৃষ্টি-সুখমত্ত মহাকবির অনন্ত ভাব রচনা।

আমরা অবশ্য ভাবতে পারি, যেন ভগবান এক বিরাট গণিতজ্ঞ পুরুষ, সৃষ্টির কতকগুলি সংখ্যা নিয়ে এই বিশ্ব-অঙ্ক কষছেন, মহাভাবুক হয়ে কতক গুলি তত্ত্ব ও জড় শক্তির সংযোগে এই জগদ্রচনা করছেন; কিন্তু ভগবানকে তা' ছাড়া প্রেমিক বলেও ত পাই,—তিনি বিশ্বের এই লীলার 'গানের গায়ক— তিনি শিশু, তিনি কবি। চিন্তার—গবেষণার দিকটাই সব নয়; আনন্দের আস্বাদনও নিতে হবে। ভাব, শক্তি, অস্তিত্ব ও তত্ত্ব যে ফাঁপা ছাঁচ, ভগবানের স্বরূপের আনন্দে তা' ভরে না নিলে রূপ যে পাই না।

এ সব কথা রূপক বটে, কিন্তু জগতই যে সবার বড় রূপক। বিচারে ভগবানের তত্ত্ব পাই বটে, কিন্তু রূপকেই সে কঙ্কালে জীবনের ললিত ছন্দ ও তরঙ্গিত রূপ আনে।

শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে জগতের বিকাশ, কিন্তু অস্তির আনন্দেই জ্ঞান বা

তত্ত্বের জন্ম। অনন্তের ঠাকুর আপন আনন্দে আপনি আত্মহারা হয়ে ছিলেন, তাই ত এ জগদ্রচনা।

আত্মজ্ঞান ও আপন আনন্দই ত প্রথম জনক ও জগজ্জননী; শেষ চূড়ান্ত শিবত্বও যে তারাই। তাদের পারে তুরীয় যে আনন্দেরই মূর্চ্ছা—চিরজাগ্রতের ঘুমের কথা। বেদনা ও আত্ম-পর সে তো কেবল নতুন করে আবার কোথায় খুঁজে পাবার মুখেই আপনাকে হারিয়ে ফেলা—নিজের কাছ থেকে নিজের পলায়ন।

এই যে অস্থির সুখ—কালের মাঝে এর সীমা নাই; এ আনন্দ সিন্ধু অনাদি অকূল। রূপের তরঙ্গে ভগবান ছন্দময় হয়ে ছেন, আবার স রূপ-তরঙ্গ ভেঙ্গে নতুন ঢেউ তুলতেই তার এ আয়োজন।

তবে ভগবান কি? একটি অনন্তের উদ্যানে অনন্ত শিশু অনন্তের খেলা খেলছেন।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

স্বস্তিকা—কবিতাগ্রন্থ; শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত; মূল্য ।৶০ পৃঃ ১১১।

বইখানি চারিভাগে বিভক্ত—'নীরবে,' 'প্রসাদী পদচ্ছায়া,' 'পঞ্চপুষ্প' এবং 'নমস্কৃতি"

ধ্যানলোক—কবিতা গ্রন্থ; শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত, প্রাপ্তি-স্থান আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য বার আনা, পৃঃ ৯৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন। জীবেন্দ্রকুমার একনিষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার সকল কবিতার মধ্যেই ভগবৎ নির্ভর ও আন্তরিক ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্যান-লোকের অধিকাংশ কবিতাই এই ধরণের। স্বদেশ বিষয়ক কবিতা ও বৌদ্ধ ইতিহাস অবলম্বন করিয়াও কয়েকটি কবিতা লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছায়া অনেক কবিতায় পড়িয়াছে—'তলাসি' প্রভৃতি প্রাদেশিকতা বর্জনীয়।

জাতের বিড়ম্বনা—আর্য্য পাবলিশিং হাউসের "মুক্তিপথে"

সিরিজের প্রথম পুস্তিকা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; প্রাপ্তিস্থান— ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট-মার্কেট, কলিকাতা; মূল্য ৷৴০, পৃঃ ৩৭।

উপেনবাবুর লেখার পরিচয় নারায়ণের পাঠকবর্গকে নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। প্রতিভার পরশ পাথরে সবই সোণা হইয়া উঠে। ভারতে জাতি-ভেদের সৃষ্টি এবং তাহার পরিণাম বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কিরূপ হইয়াছে, গ্রন্থকার নিজ স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয় ভঙ্গীতে তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। জানি না এ অন্ধ জাতির চক্ষু তাহাতে খুলিবে কি না। প্রত্যেক স্বদেশহিতার্থী ব্যক্তির এই অমূল্য গ্রন্থ পড়া উচিত।

"পতাকা বাহক।"

'Standard Bearer"

"প্রবর্ত্তক প্রকাশক কার্য্যালয়" হইতে শ্রীঅরবিন্দের ভাবপ্রচারকল্পে সাপ্তাহিক কাগজ Standard Bearer—'পতাকা বাহক' বাহির হইয়াছে। বাৎসরিক মূল্য ৪৲ টাকা, প্রতিসংখ্যা /১০ পয়সা। কলিকাতায় কার্য্যালয় ৪।১ নং রাজা বাগান জংসন রোড; নগরের নগদ বিক্রয়ের জন্য শাখা কার্য্যালয় ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। কাগজখানি প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

"প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখা—Ourselves", "আমরা।" পতাকা বাহকের বলিবার কথা বিশদ ভাবে এই লেখাটুকুতেই আছে। নতুন যুগের নব ভাব নব মন্ত্র। জীবনের সবটুকু লইয়া পরমার্থের সূতায় গাঁথা মণির মালা, সামঞ্জস্যের সপ্তস্বরায় সব সুরের সঙ্গত—একত্রে সব রসের আস্বাদন এই ত তার কথা। ইউরোপের স্বাধীনতার কথা, সাম্য ভ্রাতৃপ্রেম জ্ঞান বিজ্ঞানের (science) কথা, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির সুখবিধানের কথা এতদিন শুনিয়াছ, মণ্ডলী গড়িয়া যন্ত্রের বিধানে জড়বিজ্ঞানের তপ্ত আলোকে মানুষকে সুখ দিতে গিয়া পাশ্চাত্য সুখস্বরূপ অন্তরধনকে আত্মবস্তুকে হারাইয়াছে। প্রাচ্য এসিয়া তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া ভারত এ পরমধনের সন্ধান রাখে; কিন্তু তপঃ-লোলুপ ভারতের চক্ষু জগত ছাড়িয়া অন্তরের দিকে ফিরান, তাই পরমের প্রতিমা হারাইয়া রূপ ভুলিয়া যাহার রূপ তাহাকেও সে হারাইতে বসিয়াছিল। The time has now come to heal the division and to unite life and spirit—জীবন ও জীবনস্বামীর এই বিরহের বেদনা এই যুগে ঘুচিবে।

প্রথম সমর্পণ-যোগের আদর্শে জীবন গড়া, তাহার পর নূতন কর্ম্মের অবতরণার জন্য সঙ্ঘ বা Spiritual commune রচনা। Its scope should be at once individual and communal, regional and national, and eventually a work not only for the nation but for the whole human people—ব্যক্তিকে ভাঙিয়া সঙ্ঘ নয়, প্রদেশকে মুছিয়া দেশ নয়, জগতকে ঘৃণায় তুচ্ছ করিয়া জাতি নয়। বাসিয়ার অর্থ ও ঐহিকসুখগত সঙ্ঘ নয়, অতীতে বা বর্ত্তমানের কোন মোহেই এ দেবজাতি মুগ্ধ নয়, কারণ ইহারা ভবিষ্যৎকে গড়িবে যুগকে প্রাণ দিবে—ব্যক্তিতে সঙ্ঘে জাতিতে জগতে ভগবানকে মানুষের মধ্যে বিকশিত করিয়া দেখাইবে।

"পতাকা বাহক" প্রতি সংখ্যায় এত নূতন কথা বলিতেছে যে, তাহা নারায়ণের এক সংখ্যায় দিবার স্থান নাই। যোগ-ধর্ম্মের দেবতা তরুণ বাঙ্গালী ইহা পাঠ করুন, অরবিন্দের সাধনা জীবনে সার্থক করুন, নারায়ণের এই প্রার্থনা।

"তারে নয়নেতে যায় গো চেনা।"

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।]

এ জাতির অঙ্গনে যে জগন্নাথের রথ এত দিন চলিতেছিল ধীরে ধীরে মন্থর শ্লথ গতিতে, তাহা আজ চলিতেছে কত দ্রুত। তখন এক নেতাই নিজের শৌর্য্যে পুরা এক পুরুষও রাজত্ব করিত, রথের কাছি সে একবার টানিত, সেই টানিয়া চলিত পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া। আর এখন এই নবীন কর্ম্ম-যুগে নারায়ণের রথ কুরুক্ষেত্রের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার চাকায় অশুন!! গতির ঘর্ঘরে জগত টলমল!!! এই দেখিলাম যে মানুষ কাছি ধরিয়া টানিতেছিল, পরক্ষণেই সে পথের পার্শ্বে ধরাশায়ী,—তাহার শক্তিতে আর কুলাইল না। আর একজন বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু বীর ভগবানের লীলারথের গতিবেগে নিমিত্ত স্বরূপ হইয়াছে। রথ কিন্তু চলিতেছে আপনি, লোকে কেবল ভাবিতেছে আমি টানিতেছি! ইহারাই নেতা, এই সাত্ত্বিক অহঙ্কারই, বড়র দীনতা—The last infirmity of a great mind.

এ রথ কত হাতে চলিয়াছে—রামমোহন, কেশব বঙ্কিম, সুরেন্দ্র নাথ, সে যক্সার ঈশ্বর চন্দ্রও ছিলেন। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগ—সেই উদাত্ত সামগানে কণ্ঠ মিলাইয়া অরবিন্দ, তিলক, বিপিনচন্দ্র। তাহার পর আগুন হাতে খেলিবার সাধ লইয়া আত্মভোলা পাগলের দল॥ সেই মরণ-সিন্ধু সন্তরিয়া বাঙলার জাগরণের ডাকে আজ আসিয়াছ গান্ধী! হে জননায়ক, ওগো রিক্তের দেবতা! তুমি কি এ অসাধ্যসাধন করিতে পারিবে? মরণের পরই যে অমৃতের যুগ॥ আজ যে মানুষে আর কুলায় না, জীব যে শিবত্ব না পাইলে এ সতীর শব কাঁধে লইয়া ত্রিলোক ঘুরিতে পারে না। এ রথ আমি টানিয়া লইয়া চলিব, এই অহঙ্কারে যে ওরা সব মরিয়াছে—

রথ কি চক্রে চলে?
যে চক্রেব চক্রী হরি
যাব চক্রে জগৎ চলে।

তাই বলি আত্মভোলা মহেশ্বর চাই! জগন্নাথের রথ অকিঞ্চন—ভিখারীতেই টানে। তোমরা বলিতেছ এতদিন উকিল ব্যারিষ্টার পণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞেও তো টানিয়াছিল। সত্যকথা; কিন্তু সেটা ছিল পলিটিশিয়ানের যুগ।

কিন্তু কবে মন-গুরু সবার অলক্ষিতে আমাদের কর্ণে মন্ত্র দিলেন—সে যে জীবনের মন্ত্র! তাই সমস্ত দেশ যাত্রার সাজা নকল বীর ছাড়িয়া আসল যোদ্ধাকে চাহিল, পথে পথে রব উঠিল "দে মানুষ—মানুষ দে।" যাহার যতটুকু জীবনের পুঁজি ছিল, সে ততটুকু পূজাই পাইল; দেশময় মরণ বাঁচনের সাড়া পড়িয়া গেল। মানুষ খুঁজিতে খুঁজিতে কত নেতাই না আসিল গেল, রক্তের ফাগে কত সঙ্কীর্ত্তন ভূমি রাঙা হইল, মরণের বুকে জীবন পাইবার জন্য কি হুড়াহুড়িই না পড়িয়া গেল! কিন্তু কিছুতেই বুঝি কুলাইল না।

কারণ এ যে ভগবানের রথ! তোমার নয়, আমার নয়—আপন মনে আমাদের বুকের উপর দিয়া জীবন লইয়া অমৃত সিঞ্চিয়া চলিতেছে! জীবনের মন্ত্র পাইয়া তোমরা মানুষ চাহিয়াছিলে, অমৃতের মন্ত্র পাইয়া কিন্তু আজ আবার দেবতা চাহিয়াছ। তাই আজ মানুষে আর কুলাইতেছে না।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া যে নরদেবতা অমৃত-যুগের কথা তোমাদিগকে শুনাইবে, তাহার ডাক এবার পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের ভ্রম কাটে নাই, তাই অন্তরস্থ দেবতাকে বুকে লুকাইয়া মানুষ হইয়াই জগন্নাথের রথ টানিবার এখনও এত সাধ। বামনের চাঁদে হাত তাহাও কি হয়? তবু যে ও'

হয়, তাহার কারণ—ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা লইয়াই সে লীলার দেবতার অনির্ব্বচনীয় খেলা। তোমার অহঙ্কার, আমার পাপ, উহার দীনতা, তাহার পুণ্য সব লইয়াই সে তাহার প্রেমের হাট ভরাট করিয়া তোলে। আমার কাছে আমার দোকানদারীটুকুই এত বড় হাটখানা সব, কিন্তু আমার মুদিখানার মত লক্ষ দোকান লইয়া তার সৃষ্টির হাটের বেচাকেনা খেলা।

তবু যুগের ডাক তো আছেই। ভগবান ত মানুষ হইয়াছেনই, মানুষকেও তো দেবতা হইতে হইবে। এ সন্ধিক্ষণে ত্রিদিব যে শুধু মরতে নামিয়া আসিবে তাহা নহে, জগতও ভূস্বর্গের মহত্বে বৈকুণ্ঠের সন্নিহিত হইবে—স্বর্গ পৃথিবী এক হইবে। তার রথ ত অবিরাম চলিতেছেই, তাহার মধ্যে আমার দিক হইতে রশি ধরিয়া টানাও কিন্তু আছে। তাই বুদ্ধিজীবী পলিটিশিয়ানের যুগের পর মানুষের যুগ, আর অমৃত মানুষের দিন ফুরাইয়া দেবতার কৃত-যুগ। আজ কুরুক্ষেত্র বুঝি সন্নিহিত, তাই রথ-সারথী শ্রীকৃষ্ণকে চাই। সে রাজার রাজা, তবু নিরস্ত্র। সে ষোড়শ গোপিনীর চিতহারী বংশীধারী, তবু অজেয় যোদ্ধা যদুকুল-শিরোমণি। সে কূটনীতিজ্ঞ শঠচূড়ামণি, তবু গীতামৃতের ঠাকুর। ভোগ ও ত্যাগের সঙ্গমভূমি জগচ্ছঙ্কীর্ত্তনের মহামণ্ডপে আজ যাহাকে চাই, সে হইবে নিখিলের প্রতিমা,—জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের বৈতরণী যে মনের মানুষের রাজীব চরণে তীর্থ রচিয়াছে, যুগ দেবতার রাজটীকা যাহার ললাট অপূর্ব্ব শোভায় শোভিয়াছে, জগতের প্রাণ এমন করিয়া যুগ যুগান্ত এত ভাবে এত বেদনায় যাহাকে চাহিয়াছে। "মনের মানুষ হয় যে জনা, (তার) নয়নেতে যায় গো চেনা।"

এত দিন পথে পথে ঘুরিয়াছ, পথের কথা বলিয়াছ, কোথায় পথ কোথায় পথ বলিয়া পাগল হইয়াছ। তাই লক্ষ্যের সন্ধান পাও নাই, কেবল পথকেই লক্ষ্য মনে করিয়া পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছ। লক্ষ্য যে অন্তরে, পথ যে বাহিরে। বাহিরের সাজসরঞ্জাম দিয়া যে অন্তর সাজান যায় না, অন্তরের রূপের দ্বারে বান ডাকিলে বাহির যে আপনি ভরিয়া উঠে। যাহার পরাণ ভরপুর, সে যে একটুখানি ডাকে বসন্ত জাগাইতে পারে, এতটুকু কুরূপ কালোপাখী, তাহার পিছু পিছু স্বয়ং ঋতুরাজ ঘুরে!

স্বদেশী, বয়কট, সন্ধি, বিগ্রহ, বর্জ্জন (Non-Co-operation), সাহচর্য্য (Co-operation) এ সব যে পথ। তোমরা শুধু পথ চেন, কৈ, লক্ষ্য ত চেন না। বল দেখি লক্ষ্য কি? যদি শুধু স্বাধীনতাই লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পাহাড়ী পাঠান কি স্বাধীন নয়? অথচ তাদের সভ্যতার স্বর্ণচূড় দেউলের কোন্

ইটখানি তাহাদের দান? আমরা যে লক্ষ্যে চলিয়াছি, রুষ, জার্ম্মান ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, জাপান—নিখিল জগত-প্রবাহ যে সাগরের বুকের টানে চলিয়াছে, তাহার তুলনায় স্বাধীনতাও যে পথ। মানুষ দেবতা হইবে; রূপে মধুতে, সোহাগে সম্পদে, অন্তর-লাবণী ও জ্ঞানে মানুষ যে পরশমণি পাইবে, তাহার অঙ্গ-বিভাই যে সর্ব্ববিধ মুক্তি।

পথকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিলে, তাই পথের পথিক এত দিন তোমাদের পথ দেখাইয়া চলিত—তোমাদের নেতা হইত। কিন্তু সে পথের যে তাহারা দুই দশ ক্রোশ ব্যবধান মাত্র চেনে, শতপদ ব্যবধান মাত্র গিয়া বলে, "আর জানি না"; হয়তো বা পথ বলিয়া বিপথেই লইয়া যায়। সমগ্র রাস্তাটি চলিয়া কিন্তু যে আলোর দেশে পৌঁছিতে হয় সেই সবটুকু যে চেনে সেই তোমাদের দিশারী, সেই ত চিরসঙ্গী। সে সঙ্গী যে সঙ্গেই আছে, শুধু চিনিয়াও চিনিলে না, এমন সুহৃদকে দেখিয়াও দেখিলে না। যাহাকে আমরা মনের মানুষ করিয়া অন্তরের সাধ আশার সহিত মিলাইয়া পাই, জাতীয়জীবনে সেই ত পারের মাঝি হইয়া প্রকট হয়। শতপদের দিশারীর হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে একদিন সমস্ত পথের—লক্ষ্যের দিশারীকে খুঁজিয়া পাইবে। জাতীয় জীবনের মণ্ডল বেদীতে যে দিন সে আসিয়া মধুহাস্যে স্বর্গের চাঁদ হাতে দিবার সাহসে দাঁড়াইবে, সে দিন দেশে মাঠের চাষী পথের ভিখারী হইতে রাজচক্রের রাজা অবধি তাহাকে চিনিবে, বলিয়া উঠিবে, "এই ত সে এসেছে, আমার অন্তর বাহিরের ডাকের মানুষ ত এসেছে।"

তোমার শুধু এংলো-স্থানের ইঙ্গবঙ্গ চেনে, আমার শুধু বাবু স্থানের নকল-নবিশ চেনে। কারণ আমরা ভারতের সাধনার প্রতিমা নই। গান্ধী যাহার পূর্ব্বাভাষ, সে যে এখনও আসে নাই। সাগরের সেই অকূলে পাড়ি জমাইবার নেয়ে আসিবে, ভাই আসিবে, তাহার তরী ভিড়াইবার ঘাট যে তোমাদের সবারই আঙ্গিনায়।

অগ্রহায়ণে নববর্ষের সংখ্যা হইতে বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রের আত্মকথা ক্রমশঃ বাহির হইবে। নাঃ সঃ।

নারায়ণ

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] [কার্ত্তিক, ১৩২৭ সাল

অপূর্ব্ব আগমনী।

[শ্রীকালিদাস রায়]

দোলায় চড়ে' আয় জননী
　　　রোদনে তোর বোধন বাজে।
অট্টহাসির কোলাহলে
　　　আয় এ ভীষণ শ্মশান মাঝে,
(তুই)　শ্মশান ভাল বাসিস বলি
　　　করলি এদেশ শ্মশানস্থলী
কুকুর শৃগাল ভূত প্রেত পাল
　　　পেত্নী পিশাচ হেথায় রাজে।
(রচি)　মড়ার কাঁথায় আসনটি তোর
　　　ভাঙা কলস নেড়ে বাজাই,
গাঁথি মহাশঙ্খ মালা
　　　করোটিতে অর্ঘ্য সাজাই।
শ্মশান ভরা শবের পল্লি
　　　রুদ্রাণী তোর বরণ করি
আয় মা এবার মহাকালী
　　　ছিন্নমস্তা তারার সাজে॥

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্য।

[অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার এম, এ,]

শুনিয়াছি বড় মামা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া মেডেল পাইলে চারি পাশের গাঁয়ের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাংলার এমন একটা দিন যে ছিল আজকালকার আপিসে আপিসে তাড়া-খাওয়া গ্রাজুয়েটের দল বোধ হয় স্বপ্নেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম গ্র্যাজুয়েট হইয়া বাংলার ভবিষ্যৎ দুঃখের পথ উন্মুক্ত করেন—তখন নাকি ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপ পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে গ্রাজুয়েট দলে দলে বাহির হইতেছে—অথচ একটাও তোপ পড়িল না দেখিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে বকেয়া তোপগুলি একসঙ্গে দাগিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পাশ হইলে গাঁয়ের লোক জড় হওয়া বা গ্র্যাজুয়েট হইলে তোপ পড়ার যুগ আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও যায় নাই। 'নিরস্ত পাদপের দেশে এরণ্ডও দ্রুম বলিয়া গণ্য হয়, আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের দেশে সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর ছড়াছড়ি—সবাই যদি সম্রাট হয়, তবে পদাতিক বা কে, আর প্রজাই বা কে? বাংলাদেশের রাজ্যবিহীন রাজা মহারাজ'র ন্যায় এই সকল সম্রাটকে সকল সময়েই ঋণের পিরামিডের মাথায় বসিয়া উঁচু হইতে হয়। সুখের বিষয় দেশের লোক জানে না—তাঁহারা কোথা হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন; অবশ্য তাঁহারাও বুদ্ধিমানের মত স্বীকার করেন না—কোন্ ধনাগার হইতে এই সম্পদ ধার করিয়া লইয়া থাকেন।

বাংলা সাহিত্য-সেবার প্রাইজ পশ্চিমের সরস্বতী টাকা হিসাবে বেশ মোটা কিছুই দিয়াছেন—দরিদ্রের জাতি, অত গুলি টাকা এক জায়গায় দেখিয়া আনন্দে আমাদের পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক দেশে মাত্র একজন ব্যারিষ্টার ছিল—পাড়াগাঁ হইতে লোক আসিয়া তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত;—কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে আসিলে এই প্রশংসমান পল্লীবাসীদের বিস্ময়-সূচক হাঁ-টা বোধ হয় এত বিস্তৃত হইত যে তাহাতে বজ্র ভঙ্গের মত মুখে একটা compound fracture হইয়া তাহাদের বাঁচিবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকিত না।

"তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন"

আমাদের দেশের সাহিত্য বলিয়া তাহাকে আদর করি, প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহার সেবা করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আসল ব্যাপারটা কি তাহাও হুঁস থাকা দরকার। সে খেয়াল না থাকিলে দীর্ঘজীবনে এবণ্ড হইয়াই কাটাইতে হইবে। আমরা চোখ বুঁজিয়া এই ভাবিয়া বসিয়া আছি যে ভারতের মধ্যে আমরাই অগ্রসর জাতি—ভারতের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সাহিত্য-গুরু আমরা। কিন্তু প্রদীপের নীচে কতটা অন্ধকার সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের দীপটি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে দীপালি উৎসবের আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে—আমরা আমাদের অচলায়তনের কোণে শিবরাত্রির সলিতাটি লইয়াই বসিয়া আছি।

বিশ্বসাহিত্যে আমরা কি দিয়াছি? রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কোন্ সাহিত্যরথী, বিশ্বের দরবারে স্থান পাইয়াছেন? আমাদের সাহিত্য-সম্রাটগণ সবই 'স্বদেশে পূজ্যন্তে',—'সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এমন সাহিত্যিক চাই, যিনি বিশ্বমানবের মর্ম্মের অন্তস্তম স্থানটিতে আঘাত করিয়া বাঙালীর নিজস্ব সুরটিকে জগতের কাণে পৌঁছাইয়া দিবেন। বাঙালীর সে সেক্সপীয়র, গেটে, ভিক্টর এখনো তো আসিল না।

আমাদের নিজের প্রাণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নাই। তাই ঠিক সুরটি ধ্বনিত হইতেছে না। কি একটা বিস্ময়ে অবাস্তবতায় আমাদের সাহিত্য মূক হইয়া রহিয়াছে। 'কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম বাঙ্গালার মুদীর দোকান হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানও বাঙ্গালার রচনায় নিজকে কত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের একতার প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র যে সাহিত্যে, সে ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী রাম প্রসাদের গান আজও বাংলার খোলা মাঠে রাখালের গলায় ধ্বনিত হয়, আবার কর্ম্মরত গৃহস্থের ব্যস্ত-জীবনের মাঝে বৈরাগীর খোল করতাল, বাউল ফকিরের একতারার সঙ্গে আসিয়া খানিকক্ষণের জন্য জীবনের দূর লক্ষ্যের আবছায়া চিত্রটা মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া যায়। কিন্তু আজ লোকের মধ্যে আমাদের সে সাহিত্য কই?

ইংরেজী ভাবে তৈরী, ইংরেজী সভ্যতার by-productদের জন্য একটা সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা ধনীর শখের শূন্যে ঝোলানো সুন্দর

আগাছার মতই শোভা পাইতেছে। দেশের মাটীতে তাহার শিকড় নাই—তাহার মাথাটা নীচের দিকে আর গোড়াটা উপরে। মালীর জলদানে তাহার পুষ্টি; ভানুর পবিত্র কিরণ ঝিলিমিলির ভিতর দিয়া তাহার গায়ে কালেভদ্রে লাগে—বাহিরের উন্মুক্ত হাওয়া পর্দার ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহাকে কখনো কখনো দোলায়—আকাশের বৃষ্টি হয় তো কোনো দিন অসাবধানতায় খোলা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার গায়ে ছাট দেয়—নিশার শিশির তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই নিরস্ত হয়, প্রকৃতি সে মণির মত উজ্জ্বল ঢল ঢল অলঙ্কার তাহার মাথায় পরায় না—আমাদের সাহিত্যের আজ এই অবস্থা।

সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই।

ধর্ম্মের স্থায়, স্মৃতির স্থায়, বিদ্যার স্থায় সাহিত্যেরও একটা শিক্ষা দিবার কাজ আছে। The object of writing a story is story-writing—গল্পলেখার সার্থকতা গল্পলেখাতেই এ সব কথা paradoxএর জন্য শুনিতে ভাল এবং বলাও বোধ হয় সেই কারণেই হয়। কিন্তু চরমে সাহিত্যের একটা উদ্দেশ্য তো আছে। সাহিত্যিকের নিকট সাহিত্য সৃষ্টি শুধু বাহে পাওয়ার মত, ক্ষিদে পাওয়ার মত—একটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাহার ভিতর আর্ট আছে, চেষ্টা আছে, ভাব আছে। থিয়েটারে ষ্টেজে দাঁড়াইয়া অভিনেতা যেমন দর্শকগুলিকে সামনে রাখিয়া অভিনয় করেন, সাহিত্যিকও পাঠকবর্গের হাততালির দিকে কাণ খাড়া রাখিয়া লিখিয়া থাকেন। দোপাটি উষায় গলা ফুলাইয়া স্ফূর্ত্তির জ্বালায় পাগল দোয়েলের মত আপন মনে গান করিবারই যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শাহারার মরুস্থানে কিম্বা আমেরিকার জঙ্গলে সাহিত্যিকদিগের জন্য একটা penal settlement বন্দী উপনিবেশ করিলেই ভাল হয়। লিখিয়া ছাপানই বা কেন? আর বিজ্ঞাপন দেওয়াই বা কেন? এ পর্য্যন্ত তো শুনিলাম না যে কোনো সাহিত্যিক নিজের গীতটি ছাপাইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন? অথবা ঠোঙা ঠোঙা সন্দেশ খাওয়াইয়া লোক ধরিয়া নিজের গীতটি শুনাইতেছেন? তাই সাহিত্য শুধু subjective বা অন্তরের নয়, সে একটা বহির্জগত বা objectএর নিকট তাহার সার্থকতা পাইতে চায়। কবি নিজে কবিতা লিখিলেই তৃপ্ত হন না—জগৎকে শুনাইয়া তৃপ্ত হইতে চান। জগৎকে যখন শুনাইতে চান—তখন জগৎ কি চায়, সেটাও একটু মনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে বই কি।

অবশ্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল পাত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক বিশ্বমানবের

চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবে। তাহার সৃষ্ট চরিত্র হয় তো স্মৃতিশাস্ত্র বা সমাজের আইন মাফিক না হইতে পারে। না হওয়াই স্বাভাবিক, মানুষের জন্মটাও তাঁহাকে পরামর্শ করিয়া হয় নাই, তাহার জীবনটাও লজিকের যুক্তি অনুসারে চলে না। সে মানুষ—একটা আস্ত জ্যান্ত জানোয়ার এবং লজিকের syllogism নয় বলিয়াই—তাহার জীবনটা এই একটা পাগলের খেয়ালের মত রহস্যের মত হইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যের অন্তরালে উঁকি মারিতে গিয়া বিফল চেষ্টায় যে সৌন্দর্য্যরসের অবতারণা—তাহাই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

আমাদের সাহিত্যে এই সকলের কথা খুব কমই আছে। নাটক, নভেল এবং কবিতার ভরে বাংলা সাহিত্য যায় যায় হইয়াছে। নাটকের চরিত্র গুলি যেমন অস্বাভাবিক, অভিনয়ও তদ্রূপ। যে নায়কের চরিত্র ভাল সে একবারে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত—ভাজা মাছখানি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া খাইতে জানে না—আবার যাহার চরিত্র খারাপ সে একেবারেই সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। যেন স্মৃতি শাস্ত্র মাফিক স্বর্গ নরকের উপযুক্ত করিয়া ইহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃষভের মত সুর হইলেই বীররস হইল, আর নাকি সুরে প্যাঁ প্যাঁ করিতে পারিলেই করুণ রস—আর কাতুকুতু দিয়া কোন গতিকে হাস্যরস জাগাইতে পারিলেই, শ্রেষ্ঠ নাটককার।

একটা মেস, একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী ও লম্পট একটা ছোকরাই আমাদের নভেলগুলির পুঁজি। বেদেরা যেমন একটা ভালুক, একটা রামছাগল, আর একটা মর্কট লইয়া বাজি দেখাইয়া পয়সা উপায় করে—আমাদের নভেল লেখাও কতকটা সেই ধরণের। এতদিন কলিকাতার মেসে থাকিলাম—ঠাকুর চাকরের আদর যত্নে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইবার উপক্রম করিল—কিন্তু পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে কোনো দিন "লভ্" করিবার সুযোগ পাইয়া এ নীরস জীবনটা সরস হইতে পাইল না তো। আমাদের সমাজ শাসিত বৈচিত্র্যহীন জীবনে 'লভের' অবসর নাই, তাই কলিকাতায় আনিয়া মেসে ফেলিয়া লভ্ ঘটাইতে হইবে-ই—না হইলে যে plotটা খাড়া হয় না। পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল সমস্যা জীবন্ত হইয়া সমাজে দেখা দিয়াছে—বার্নার্ড বা হাউপ্টম্যান্ প্রভৃতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই সকল সমস্যার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনে কোর্টসিপ নাই, elopement নাই, পরের স্ত্রী লইয়া বলনাচ নাই, বিধবা বিবাহ নাই, সধবা বিবাহও নাই, divorce নাই, যুদ্ধ নাই, রাজ্য

নাই,—সমাজ বিপ্লব নাই—কি লইয়া নভেল লিখিব? এক বালবিধবার সহিত প্রেম—সে আর কত রকমে লেখা যাইবে? তাই পরের সমাজ হইতে ধার করা আইডিয়া লইতে হয়—কিন্তু বাঙলার মাটিতে সে গুলি নিতান্ত আগাছার মতই রহিয়া যাইতেছে।

জাতীয় জীবনের, সমাজ জীবনের প্রসার না হইলে, চঞ্চলতা না আসিলে, সমস্যা দেখা দিবে না—সমস্যা না আসিলে যুগ সাহিত্যের আবির্ভাব হইবে না।

কবিতার ভিতর দিয়া আমাদের সাহিত্য ফুটে নাই। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই পশ্চিমের পাকা শিষ্য। মিল্টন, বায়রণ, সেলি প্রভৃতির ভূত এই সকল লেখার পিছন হইতে উঁকি মারে। Sublime conception আমাদের সাহিত্যে নাই—Lyric genius বা গীতি-কবিত্ব আমাদের আছে বটে কিন্তু অনেক স্থলেই হরিনাম কোর্ত্তন দিয়া টপ্পা গাহিয়া আমরা সে গীতি-প্রতিভা নিঃশেষ করিয়াছি। রাধা কৃষ্ণ না জন্মাইলে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন কবির পেশা উঠিয়া যাইত।

"সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি।"

আমাদের কবিতার সম্বল এই কয়টি। আমাদের জাতের চরিত্র যেমন হালকা, সাহিত্যও তেমনি হালকা। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন ইহা কাঁচা বয়সের লক্ষণ—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহা ইঁচোড়ে পাকার লক্ষণ। এই কাঁচা অবস্থায় পাকা বন্ধ করিতে হইবে। বাঙলার সাহিত্য-প্রতিভা চিরন্তন শাশ্বত রসের অনুগামী সাহিত্যের সৃষ্টি করুক। তৃষ্ণাতুর পথিককে শুধু এক গেলাস ঘোলের সরবৎ না দিয়া তাহাকে স্বর্গের অমৃতবারি দানে তৃপ্ত করুক। দু'দিনের কথা ভুলিয়া চিরসত্য, বিশ্বজনীনকে অবলম্বন করিয়া মানব জীবনের এবং জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হোক—তবেই আমাদের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে, জগতের নিকট আমাদের মা আদৃত হইবেন, বিজয়ের বরমাল্যে বিভূষিত হইয়া আবার আমরা অমৃতের অধিকারী হইব।

পতিতা।

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়।]

নয়নের জলে হৃদয়-শোণিতে
লিখন লিখেছি আজি,
ব্যথার কুসুমে দেবতা পূজিতে
ভরিয়া এনেছি সাজি,
সরমের বাঁধ ভেঙ্গেছে আজিকে
অশ্রু-সাগর-বান,
মরমের সাধ প্রাণের কাহিনী
গাহিব খুলিয়া প্রাণ।

তোমরা শুনিবে ওগো জ্ঞানী গুণী
আমার প্রাণের কথা?—
পাপের পঙ্কে হীনতা-পঙ্কে
লুপ্ত মরম ব্যথা?
তোমরা বুঝিবে এ প্রাণের জ্বালা
কলঙ্ক-কালী-মাখা
সারা জীবনের নয়নের জলে
নিবিবে না যার শিখা?

অভাব-দৈন্যে স্বভাব কাহারে
পাসরিয়া মান-লাজে
জনমি মানবী কবে যে কেমনে
সাজিনু দানবী-সাজে।
সমাজ দেউল নির্ব্বাসি তার
—সে কথায় কার কাজ?—

জ্বালাময় পাপ জীবনের কথা
ব্যক্ত করিব আজ।

হেথায় আসিয়া একি দেখি হায়
একি ঘোর পরিহাস!
সমাজের যারা মাথার মাণিক
তাদের হেথায় বাস!
দিনের আলোকে রক্ত-তিলকে
যাদের ললাট শোভে;
রাতের আঁধারে পাপের সাগরে
তারাই আবার ডোবে!

রূপের বেসাতি মেলায়ে বসেছি
রূপ নিয়ে বেচা-কেনা;
এ দেহ বিকায়ে ধর্ম্ম লুকায়ে
শুধিছি পাপের দেনা।
এ রূপের হাটে লালসার কড়ি
কাহারা জোগায়, জান?
সমাজের নাটে যারা নটবর
যাদের তোমরা মান

আমরা অধম, আমরা পতিতা,
আমরা ঘৃণার পাত্রী!
নরকের আলো জেলেছি এ ভবে
আমরা নরক-যাত্রী।
এ নরক-পথ সুগম করিয়া
কে দেয় তাহা কি জান?
ধন-মান-শীলে কুলীন বলিয়া
যাদের তোমরা মান!

সভার মাঝারে আমাদের নামে
নয়নে বহ্নি ছুটে,
গোপনে লুকায়ে এ চরণ-তলে
তাহারাই এসে লুটে।
দিবসে মোদের নয়নে হেরিলে
কুঞ্চিত হয় দেহ,
নিশীথে মোদের পরশ লাগিয়া
কতই তাদের স্নেহ।

তাহাদের হাতে শাসন-দণ্ড
বিধাতার প্রতিনিধি
সমাজ-সাগর মন্থন-ধন
তাহারা অমল নিধি।
সে সব রতনে অনেক যতনে
রেখেছ তোমরা বুকে,
তাদের আদেশ বহিয়া মাথায়
যাপিছ জীবন সুখে।

বারেকের তরে এ জীবনে মোর
করিল না কেহ ক্ষমা,
মুছাতে অশ্রু সরিল না হাত
স্নেহ—দয়া নিরুপমা।
পিচ্ছল পথে হাসিতে হাসিতে
ঠেলিল মোদের সবে,
পাপের পঙ্কে ডুবায়ে ধরিল
কৌতুক হাসি রবে।

একবার যদি আঁধার ঘুচাতে
জ্বালাতে জ্ঞানের দীপ,
ঘৃণার কালিমা মুছায়ে ললাটে
পরাতে স্নেহের টীপ;

সারাটি জীবন তোমাদের সেবা
সাধনা মোদের হ'ত,
সফলতা লভি' পূর্ণ হইত
বিফল জীবন-ব্রত।

এ প্রাণের জ্বালা তোমাদের হায়
জানাইয়া কিবা ফল?
পাষাণ গলিবে তোমরা হাসিবে
হেরি এ চোখের জল।
বারেক তোমরা ভাবিলে না মনে
রহিল মনের খেদ,
পাপ-পুণ্যের সীমারেখা কোথা
সাধু অসাধুর ভেদ।

আমাদের ঘৃণা করিবার আগে
একবার ভেবে দেখ
যদি বাকী থাকে নয়নের কোণে
এক ফোঁটা জল-রেখ।

অনন্তানন্দের পত্র।

যে বার প্রথম গুজরাতে যাই তোমার মনে আছে? গাড়ীতে জনকত গুজরাতী ব্রাহ্মণ, কয়েকজন মারাঠী আর বাকি হিন্দুস্থানী। একা আমিই সবেধন নীলমণি বাঙ্গালী। গাড়ীতে গল্প বেশ জমে এসেছে। একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ মালা জপ করতে করতে শোনাচ্ছিলেন যে তাঁর ছেলে না ভাইপো গায়কবাড়ের রাজ্যের একজন মস্ত অফিসার। মালার একটা দানা দেখিয়ে বল্লেন যে সেটা আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ; এক গির্নার পাহাড়

ছাড়া সে রকমটী আর ভূ-ভারতে অন্য কোথাও পাবার জো নেই। সেটী ধরে একলক্ষ বার জপ করলেই হয় মহাদেব, না হয় নন্দী, অভাবপক্ষে মহাদেবের ষাঁড়টি এসে হাজির হবেনই হবেন। একজন হিন্দুস্থানী তাঁর কথায় সায় দিয়ে বল্লে যে অযোধ্যাজীতে সেঁটুরাম বাবাজীর কাছেও ঠিক ঐ রকম আর একটী রুদ্রাক্ষ আছে। বাবাজী নাকি তীর্থভ্রমণ করতে করতে আবু পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে বাবাজীর সেবায় তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠ ঠাকুরের এক চেলা বাবাজীকে এ রুদ্রাক্ষটী বখ্‌সিস করেন। প্রতি সোমবার আর শুক্রবার পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে রুদ্রাক্ষটীর পূজা করতে হয়, আর তার এমনি মহিমা যে কোন ছোট জাত যদি সেটীকে চোখে দেখে ত চৌদ্দ দিন, না হয়, চৌদ্দ মাস, না হয় চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে সে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবেই যাবে।

পাশেই আর এক গুজরাতী উদ্ধানেত্র হয়ে গুন্ গুন্ করে ভজন গান করছিলেন। হিন্দুস্থানীর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বল্লেন 'দেখ্‌লে! তবু আজকাল লোক ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশ্বাস করতে চায় না।

গাড়ী সেই সময় একটা ষ্টেশনে এসে লাগতেই জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাপড় পরা একটী লোক গাড়ীতে ঢুকে চুপ করে এক পাশে এসে দাঁড়াল। আমাদের মালাধারী গুজরাতী পুরুষ তাকে নিজের ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলেন বুঝতে পারলুম না। বেচারা উত্তর করলে—"মাড়"। তার পর ভানুমতীর ভোজ-বাজীর মত যে অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটল তা' না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দু'জন গুজরাতী তড়াং কোরে লাফিয়ে একেবারে গাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়লেন। তাঁদের মাথার পাগড়ী গুলো গড়াতে গড়াতে আরও পাঁচ সাত হাত এগিয়ে গেলো। যিনি ভজন গাচ্ছিলেন তাঁর ভক্তির উৎস একদম্ বন্ধ হয়ে গেল। "আরে রামঃ" বলে হুঙ্কার করেই তিনি পাশের গাড়ীতে টপ্‌কে পড়লেন; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীর দলও গাড়ী খালি কোরে যে যে দিকে পারলে অন্য গাড়ীতে পালালো।

যে লোকটী গাড়ীর এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? লোকটী বললে—'বাবুজী, আমি মাড'। তখন মনে পড়ে গেল যে বোম্বাই অঞ্চলে মাড়েরা অস্পৃশ্য জাতি। তাই বেচারা গাড়ীতে উঠতেই সবাই আপনার আপনার জাত আর ধর্ম্ম বাঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল। কোথায় গির্ণার, কোথায় আবু পাহাড় ঘুরে ঘুরে ধার্ম্মিকেরা যা' কিছু

পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন, আজ একটা 'মাড়ে'র সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তা'ত আর নষ্ট কর্‌তে পারেন না। 'মাড়' বেচারাকে টেনে আমার কাছে বসাতে ধার্ম্মিকেরা আমার দিকে এমনি দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন যেন আমি এই মাত্র চিড়িয়াখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।

সেদিন আমার চোখের সুমুখ থেকে একখানা পর্দ্দা সরে গেল। ছেলেবেলা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বার সময় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের কাছে এসেই আমার বিধাতার উপর ভারি রাগ হতো। মনে হতো—হায়, হায়! ওদিন পাঠানেরা না জিতে যদি মারাঠারা জিততো। আজ কিন্তু মাড়ের দুর্দ্দশা দেখে মনে হলো পাণিপথে মারাঠারা জিতলে ভারতে বর্গীদের রাজ্য হতো বটে—কিন্তু তা' হলে আজ এই ক'জন ধার্ম্মিক পুরুষ মিলে মাড় বেচারাকে গাড়ী থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতো। ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রীও তার সুবিচার করতেন কি না সন্দেহ! নিজের অঙ্গকে পঙ্গু করতে আমাদের জোড়া মেলা ভার।

আর এ রোগ কি শুধু বর্গীদের? বাঙ্গলা, মাদ্রাজ, হিন্দুস্থান—এক চেয়ে আর সরেশ; এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। আলমোরায় এক সাধুরের মঠে একবার বসে আছি, এমন সময় এক পাদরীসাহেব তাঁর কতকগুলি দেশী শিষ্য সমেত সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে ১৪।১৫ বৎসরের একটী ছেলে ছিল। সে যে কি মোহে পড়ে খৃষ্টান হয়েছে তা' জানবার আমার ভারি কৌতূহল হ'লো। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ কথা ও কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"বাবা, তোমার বাড়ীতে কি মা বাপ নেই? তুমি ধর্ম্মের কি বুঝেছ যে হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যা বলে ছাড়তে গেলে?" ছেলেটী একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—"বাবাজী, ধর্ম্মের আমি কিছুই জানিনে। আমার মা বাপই আমাকে খ্রীষ্টান করে দিয়েছে। প্রায় বছর দুই হ'ল আমি একবার বড়দিনের সময় পাদরীসাহেবদের আড্ডায় বেড়াতে যাই, পাদরীসাহেব আমায় আদর করে খাবার খেতে দেন। খেয়ে দেয়ে আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বললাম—'মা, আমি পাদরী সাহেবদের বাড়ী খানা খেয়ে এসেছি।' মা শুনে কাঁদতে লাগলেন, বাবা বললেন আমার নাকি ধর্ম্ম চলে গেছে; আমায় আর বাড়ীতে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে আর কোথায় যাই? সেই অবধি পাদরীসাহেবের সঙ্গেই আছি।"

দেশাচারের ভয়ে যে সমাজে মা বাপের মন থেকেও দয়া মায়া স্নেহ মমতা শুকিয়ে গেছে, সে সমাজ সজীব না মরা? মরা বললে আবার বন্ধুরা চটে উঠেন,

তাঁরা বলেন যে সমাজকে অমন ব্যাং খোঁচানি না করে খুব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল করতে হয়। তাঁরা এ কথা বুঝেন না যে যাদুর গায়ে হাত বুলাবার সময় আর নেই। এ তো বুদ্ধির অভাব নয়, এ যে প্রাণের অভাব। যারা জ্ঞানপাপী তাদের বুঝিয়ে কিছু হবে না। দুঃখ-যন্ত্রণার তাপে গলিয়ে তাদের নূতন ছাঁচে ফেলে ঢালাই করতে হবে। পুরাণ বচনের বনিয়াদ উপড়ে ফেলে সত্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নূতন সমাজ গড়তে হবে। এখন যা' আছে এ তো ধর্ম্ম নয়; ধর্ম্মের ভ্যাংচানি; পারলৌকিক স্বার্থপরতা, নিজেদের ক্ষুদে ক্ষুদে স্বার্থের পুঁটলির উপর বড় বড় নামের ছাপ মেরে ধর্ম্মের বাজারে ভাল মাল বলে চালান করবার চেষ্টা। হায় রে, ভগবান কি এমনই বোকা যে দু'টো সংস্কৃত বচনে ভুলে গিয়ে আমাদের রেহাই দেবেন? তা' যদি হ'তো, ত এই হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজের পিঠে গুঁতোর উপর গুঁতো বর্ষণ হচ্ছে কেন? শাস্ত্রে লেখে ধর্ম্মের ফল সুখ। আমরা যদি এত বড় ধার্ম্মিক ত আমাদের লাঞ্ছনা আর দুঃখ ভোগের নিবৃত্তি নেই কেন? জগতের সবাই দু'পায়ে হাঁটে, আর আমরাই শুধু কেঁচো, কৃমির মত বুকে হেঁটে মরছি কেন? পরকালের সুখের জন্য? যে ভগবান ইহকালে আমাদের জন্য কেবল ঝাঁটা আর লাথির ব্যবস্থা করেছেন, তিনি যে পরকালে আমাদের জন্য মেঠাই মোণ্ডার বরাদ্দ করে দেবেন, একথা সংস্কৃত অক্ষরে ছাপা পুঁথিতে দেখলেও যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

আমাদের দেশের ছেলেরা তাই ধর্ম্ম আর কর্ম্মের দোটানায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। যে সব আচার অনুষ্ঠান সনাতন ধর্ম্মের মুখোস পরে আমাদের বুকের উপর বসে গলা টিপে দম বন্ধ করবার জোগাড় করে তুলেছে, সে গুলির মধ্যে যে সনাতনত্বের একান্ত অভাব এ কথা স্পষ্ট করে বলবার সময় এসেছে। ধর্ম্ম যে নাক টেপাটিপি বা নাড়ী শোধনের কসরৎ নয়, সাড়ে সতর কাহন কড়ি দিয়ে তা' যে ভট্টাচার্য্য মশায়দের দোকানে কেনা যায় না, ধর্ম্মের চাপে মানুষের আড়ষ্ট বা আধমরা হয়ে উঠা যে একান্ত আবশ্যক নয়, ডিগবাজী খেতে খেতে ভবপারে ছিটকে পড়াই যে ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এ কথা যতদিন লোকে না বুঝবে ততদিন ধর্ম্মের আর কর্ম্মের সামঞ্জস্য যে কি করে হ'বে তা' ত খুঁজে পাই নে। পদি পিসির ধর্ম্ম দিয়ে যাঁরা ছেলেদের পেট ভরাতে চান, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ গতির মধ্যে যাঁরা অসাত্ত্বিকতার গন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠেন, শূদ্রস্পৃষ্ট হলে যাঁরা ভগবানকে পর্য্যন্ত পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে তবে জাতে তুলে নেন, তাঁরা

যে ধর্ম্ম মন্দিরের পাহারাওলার ব্যবসা সহজে ছাড়বেন, তা' ত মনে হয় না। তবে আশা এই যে ভগবানের একটা নাম দর্পহারী। মানুষ আপনার চারিদিকে অহঙ্কারের বেড়া দিয়ে রেখেছে—একদিন না একদিন তিনি তা উপড়ে ভেঙে ফেলে দেবেন। সারা জগৎজুড়ে ভাঙনের মড়মড়ানি শোনা যাচ্ছে, এ দেশও কি বাদ পড়বে?

আগমনী।

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

ওই দেখ নাথ! শরৎ এসেছে
দুখের ঢেউ মাখি',
কাশের গুচ্ছ শাদা মেঘ গুলি,
ফেলে নদীকূল ঢাকি।
কেটে গেল গোটা একটি বছর,
তিনটি দিনের দেহ অবসর,—
মাতার আনন, পিতার চরণ
কেমনে না দেখে' থাকি।
স্বর্গের রথে শরৎ এসেছে
দুখের ঢেউ মাখি'।

পথ চেয়ে চেয়ে বসে' বসে' মাতা
ফেলিছে আঁখির লোর!
বৈরাগী তুমি, বুঝিবে কেমনে
মরমের ক্ষত মোর!
পাষাণ বাপেরও গণ্ড বহিয়া
অশ্রু নিঝর পড়িছে ঝরিয়া,
প্রাণ খানি সারা বেঁধেছে যে তা'রা
দিয়ে শোণিতের ডোর!

পথ চেয়ে মাতা দিন গণে আর
ফেলে নয়নের লোর।

চাল কড়ি দিয়া শোধ কি গিয়াছে
জনকের সেই ঋণ।
মায়ের মুখটি মেয়ের মনে যে
পড়িতেছে নিশিদিন।
হিমালয়-পথে, ঘাটে, বনে গাছে
শত পাকে মন জড়াইয়া আছে,
এখনো বাহুতে রাঙা শাঁখা দু'টি
আছে সেথাকার চিন্।
চাল কড়ি দিয়া শোধ কি গো হয়
জনকের সেই ঋণ।

অভিমানী ফুল—শেফালী ফুটিয়া
লুটিয়া পড়িছে ধূলে,
আশা অপেক্ষায় ভাবুক্‌বাসীরা
রয়েছে নয়ন তুলে।
পর্বতের হাওয়া, পর্বতের গান,
সাড়া দিয়ে যেন চেতাইছে প্রাণ,
মন্ত্র পড়িয়া হিন্দুরা করে
বোধন বিল্ব-মূলে।
অভিমানী ওই দুলালী শেফালী
লুটিয়া পড়িছে ধূলে।

বঙ্গ দেশের কৃষক কুলের
হরষের সীমা নাহি,
স্বর্ণ ক্ষেত্রের আল পথে তা'রা
ফিরে আগমনী গাহি'।

মোর অন্নের থালা নিয়ে তা'রা
বণ্টন করে ঘুরে পাড়া-পাড়া,
খালি হাতে শেষে কাঙালের বেশে
থাকে মোর পথ চাহি'
মাটির মানুষ কৃষক কুলের
হরষের সীমা নাহি।

বুড়ো বরে পড়ে তাই হ'ল মোরে
এতখানি হতাদর।
মনে পড়ে সেই মায়ের কান্না,
আঁখি দুটি ঝর—ঝর্।
খাও গিয়ে লাড্, মাখ ছাই গায়,
যাও যথা তথা যেথা মন ধায়,
তিন দিন তবু মায়ে ঝিয়ে ছু'য়ে
জুড়াইব অন্তর।
বুড়ো বরে পড়ে' জানিনা যে হ'বে
এতখানি হতাদর।

ধর্ম্ম কি সত্যই বাধা?

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রাবণের নারায়ণে "ধর্ম্মের বাধা" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া—

"গান শুনে গান মনে পড়ে—
অশ্রুপাতে চোখে আসে জল"

(কামিনী রায়)

আমারও গোটাকতক কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তাই এই আলোচনার অবতারণা।

তাঁর প্রবন্ধের নামটী পড়িয়াই হয়তো অনেকে চমকাইবেন—কারণ ধর্ম্ম যাহা তাহাতে ত মানুষকে ধারণই করে বাঁচাইয়াই রাখে, তাহা কি কখন বাধা স্বরূপ হইতে পারে? যাহার মূল বার্ত্তাই হইল এই মরণধর্ম্মীদের মধ্যে অনন্ত জীবনের সংবাদ আনিয়া দেওয়া, তাহাই হইল জীবন পথের বাধা।

কিন্তু এমনি মানুষের মন, এমনি তাহার আন্তরিক স্থিতিশীলতা যে যাহা সে একবার ধরিয়াছে তাহা সে সহজে ছাড়িতে চায় না। চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের লীলা পরিবর্ত্তনের "আনন্দ-কোলাহল, তবু সে অবুঝের মত চোখ ঢাকিয়া বলে না—না কিছু না, ওসব ভুল মায়া মিথ্যা। সত্য কেবল আমি যাহাকে অবলম্বন করিয়া আছি তাহাই।" পলে পলে তাহার "ধ্রুব" সতীদেহের গলিত অংশ কালের বিষ্ণুচক্রে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবু তাহার সংজ্ঞা নাই। আর যদিই বা সংজ্ঞা হইল, তখন সে তিন চক্ষু এক করিয়া যোগস্থ হইয়া বসিল। হায়রে মায়া! হায়রে ভয়! যাহা গতিশীল তাহাকে গতি বলিয়া স্বীকার না করাই যে তাহাকে না পাওয়া। যার নাম জগৎ তাহার "ধর্ম্মই" হইল ত গম্ ধাতু হইতে। অথচ এমনি ত মানুষের, বিশেষতঃ এই ধার্ম্মিক দেশের ধার্ম্মিক মানুষের মন যে সেই ধর্ম্মকেই করিয়া তুলিল স্থাণু, অচল, স্থিতিশীল। এখন এই অচল পাথরের বিশাল মত ঠাকুরটা তাহাকে আপন পায়ের ভারে কোন্ পাতালে পাঠাইবে কে বলিতে পারে?

যাক, অতুল বাবুর প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য এই যে কাহারও কাহারও মতে আমরা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জাতি। সেই আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যেই আমরা আমাদের দৃষ্টি Dickens-এর Bleak House-এর Mrs Jellibyর মত দূর অতীন্দ্রিয় লোকের উপর নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছি। এদিকে সমস্ত ভোগ, ঐশ্বর্য্য সম্পদের যে প্রকাণ্ড হাট আমাদের ছিল তাহা দিনে দিনে ভাঙ্গিয়া কালস্রোতে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে,—

"এ শুধু ঊষর বালুকা ধূসর

মরুরূপে আছে মরিয়া।" (প্রবাসী)

তাই তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন যে এখন আমাদের দৃষ্টিটা অধ্যাত্ম জগতের দূর নক্ষত্র লোক হইতে নামাইয়া প্রতিদিনকার নিতান্তই ডালভাতের জগতের উপর ফেলিতে হইবে।

তাঁহার মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমার কোন অমিল না থাকিলেও যাহা তিনি আমাদের জাতীয় অপটুতার আব নিৰ্জ্জীবতার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন সেই বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

তিনি বলিয়াছেন যে আমরা আধ্যাত্মিক জাতি। ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা সৰ্ব্ববিষয়ে চিরদিন আধ্যাত্মিক ছিলাম কিনা এখন সে কথা তুলিতে চাই না, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছুতেই ত নিজেদের আধ্যাত্মিক বলিতে পারি না। যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিদ্রায় কাটাইতেছে তাহারা যদি আধ্যাত্মিক হয় তাহা হইলে তেলাপোকাও পাখী—এবং ভেকও হস্তীর স্বজাতি।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আত্মবোধ জিনিষটা কি এতই সহজলভ্য যে দু'বেলা আধপেটা খাইয়া এবং উপরওয়ালার বুটের ঠোকর নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া বলিব যে "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং", যাঁহাকে জানিলে অতিমৃত্যুকে হস্তামলকবৎ পাওয়া হয়।

না—আধ্যাত্মিকতা এই দুর্ব্বল প্রাণহীন জাতির নিকট হইতে দূরে অতিদূরে চলিয়া গিয়াছে। কবে যে গিয়াছে জানিনা, তবে এইটুকু জানি যে এই প্রাণহীন শবদেহে আত্মা আর বাস করেন না। এই অশুচি অপবিত্র শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরই আছে, ভূত প্রেতই আছে, পিশাচ যাতুধানই আছে, দেবতা নাই। এখন এই শ্মশানে যাহারা সাধক হইবেন তাঁহাদিগকে শব-সাধনায় সমস্ত ভয় সমস্ত বিপদের মধ্যে বসিয়া মহাশক্তির সাধনা দ্বারা এই শবকেই শিবে পরিণত করিতে হইবে, এই শবের মধ্যেই প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। এই পথে উত্তর সাধক থাকে ভালই, না থাকে তবু ' সৰ্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া" তাহাকেই অস্বীকার করিয়া প্রাণকে জাগাইতে হইবে। মহাশক্তির আবির্ভাবে প্রাণের স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের শাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের উল্লেখ আছে তাহার প্রথম বর্গই হইতেছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের পর অর্থ, অর্থের পর কাম, কামের পর মোক্ষ। অর্থ আর কামকে, ধর্ম্ম আর মোক্ষের মধ্যে রাখার একটা অর্থ আছে—অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। অর্থ আর কাম যদি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং পরিশেষে যদি ঐ দুই বস্তু মোক্ষের মধ্যে আপনাদিগকে লীন না করে তাহা হইলে তাহাদের যে কি ভয়ঙ্কর ফল হয় তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক সভ্যতা। এই ভদ্রবেশী বর্ব্বর সভ্যতা অর্থকে পরমার্থ এবং কাম পূরণকে পুরুষার্থ করিয়া যে বিপদ্ ঘটাইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বুঝাইবার দরকার নাই। কিন্তু আমাদের

জীবনের আদর্শ বোধ হয় এই ছিল, যে আগে ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া নিজের জীবনের গোড়াপত্তন স্থির ভূমির উপর করিয়া লও। তার পর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কামনা পূরণ কর। তারপর নিজের চারিদিকে যে স্বকৃত বন্ধন জুটাইয়াছ, কামনা পূরণের সেই স্বকৃত বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর হও। যাহার বন্ধন বোধ নাই, তাহার পক্ষে মোক্ষের অনুভূতিই আছে কিনা সন্দেহ। যে বন্ধন তুমি সৃষ্টি করিবে, তাহা যদি প্রথম হইতে সজ্ঞানে স্বকৃত বলিয়া অনুভব করিতে করিতে নিজের চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তাহা কখনই পূর্ণ বন্ধনের হেতু হইবে না। সেই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ অর্থ আর কামের আগে পিছে ধর্ম্ম আর মোক্ষকে চৌকি দিবার জন্য বসাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম জিনিষটা বাঁধে বটে, কিন্তু সজ্ঞানে। অজ্ঞানের ধর্ম্ম নাই, অন্ততঃ ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অজ্ঞানের নয়। আমাদের ধর্ম্ম যতদিন জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যতদিন স্বাধ্যায় ব্রহ্মচর্য্য গুরুগৃহ বাসাদি দ্বারা, জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা, জীবনের প্রারম্ভকে কুসংস্কারমুক্ত, প্রাণপূর্ণ শক্তিশালী করিয়া লওয়া হইত ততদিন ধর্ম্ম শাস্ত্রকারাগারে বদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিককেও অন্ধতামিস্রের মধ্যে আবদ্ধ করে নাই। ধর্ম্মের প্রধান কার্য্যই ছিল আত্মার্শক্তিসম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করিয়া দেওয়া। তাই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই আপন আপন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনের পূর্ব্বে দ্বিজ হইয়া অজ্ঞতার গণ্ডী হইতে জ্ঞানের দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারে অর্থ ও কামের পূরণের জন্য প্রবেশ করিতেন। কিন্তু মূলের সেই যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সেই আত্মাভিমুখী গতি চিরদিনই তাঁহাদের সকল কর্ম্মের মধ্যে আত্মার মুক্তির সুরটুকু জাগাইয়া রাখিত। তাই তাঁহারা ভোগের মধ্যেও আত্মাকে নিত্যমুক্ত বুদ্ধস্বভাব অনুভব করিতেন, ত্যাগের মধ্যেও করিতেন। তাই তাঁহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন এই আত্মার পূর্ণ শক্তিকে অনুভব করিতেন তখন মোক্ষের দিকে যাইতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেন না। তাঁহাদের কর্ম্ম ছিল ধর্ম্মের জন্য এবং ধর্ম্ম ছিল মোক্ষের জন্য। এবং সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে আত্মানুভূতির সুর থাকার দরুণ কোন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ হয় নাই। তাই তাঁরাই ছিলেন আধ্যাত্মিক যাঁহারা—

"কোনো খানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সকল বিশ্ব করেছেন ভেদ।" (রবীন্দ্র)

কিন্তু আজিকার দিনে এই অর্দ্ধমৃত তমঃপ্রকৃতির কর্ম্মবিমুখ জাতিকে যদি আধ্যাত্মিক বলা হয় তাহা হইলে "আধ্যাত্মিক" কথাটার এমন অপমান করা

হইবে, যাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমস্ত আধ্যাত্মিকেরাই লজ্জিত হইবেন।

শুধু কোনো গতিকে প্রাণ ধারণ করাই যদি গৌরবের কারণ হয় তাহা হইলে এখনো অনেক প্রাগৈতিহাসিক প্রাক্‌প্লাবনিক জীব জগতে বাঁচিয়া আছে! তাহারাও তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতার দাবী করিতে পারে।

যাহারা আপনাদের ক্ষুদ্রদেহ, এবং সেই দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়া কোনো বৃহত্তর ভাবকেই আপনাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারিল না, তাহাদের মধ্যে অনুভূতিময়, প্রসারণশীল, বিস্ফোৎসারী সর্ব্বংসহ আত্মা নামক মহাশক্তিশালী কিছু আছে এ কথা বলিলে সকলেই হাসিবে।

যখন এই জাতির আত্মজ্ঞান ছিল তখন ইহার দেহে মনে প্রাণে শক্তিও ছিল। বৈদিক যুগে যাইবার প্রয়োজন নাই, বৌদ্ধ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত অন্ধ্রাদির ক্ষত্রিয় যুগের মধ্য দিয়া মুসলমানগণের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে সময় আমরা প্রবলভাবে ভোগী, সেই সময়ই আমরা প্রবলভাবে ত্যাগী। যখন আমরা সমুদ্রযাত্রা করিয়া সুমাত্রা যাভা চীন জাপান হইতে বাণিজ্য সম্ভারে দেশলক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি, তখনি আমরা অন্তরের ধ্যানসাগরে পরমাত্মকূলের উদ্দেশে জীবাত্মাকে সাধন-তরণীতে প্রেরণ করিয়াছি। সহস্র কর্ম্ম যখন আমাদিগকে অজগরের মত শত পাকে বেষ্টন করিয়াছে সেই সময় বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ কুমারিল্ল চৈতন্য নানক কবির জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত বন্ধনকে অবহেলায় ছেদন করিয়াছেন। তখন কর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মের বাধা স্বরূপ হয় নাই, ধ্যান আমাদের কর্ম্মের সহায়ক হইয়াছে, আচার আমাদের আত্মাকে পাঁকে না ডুবাইয়া পূত পবিত্র করিয়া সমস্ত বিপদ বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্য শক্তিশালী করিয়াছে। যখন আমাদের আত্মা ছিল, তখন ধর্ম্মও ছিল, কর্ম্মও ছিল—তাই তখনি আমাদের ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই শিল্প, তখনকার বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান সমস্তই পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তাই তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত খুঁড়িয়া গুহা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই কঠিন প্রস্তর হইতেই দেবতাকে খুঁদিয়া বাহির করিয়াছি, আবার যম নিয়মের কাঠাতার মধ্যদিয়া গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং যিনি তাঁহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। তখন যিনি রাজা ছিলেন তিনি বিশ্ববিজয়ও করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে বিশ্বজিৎ কিমিচ্ছক ব্রত করিয়া সমস্ত রাজ্যের সহিত রাজমুকুটও দান করিয়া শ্মশানে চণ্ডালের কর্ম্মকেও বরণ করিয়াছেন, না

হয় বৈরাগীর পীত বস্ত্র, রক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই শ্রুতি বাক্য সফল করিয়াছেন। বৈশ্যও তখন "ত্যাগায় সম্ভৃতার্থ" হইয়া বৈরাগীর ভিক্ষা পাত্রে শ্রাবস্তিপুরের দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য সংস্থই দান করিয়াছে। যখন অর্জ্জুনের শক্তি ছিল, তখন দান করিয়াছি, এখনকার মত "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া ত্যাগ ধৰ্ম্মকে ভেঙ্গচাই নাই।

আত্মার স্বভাব দুই,—আপনাকে জানা এবং আপনাকে ছড়াইয়া দেওয়া। দুই কার্য্যেই শক্তি চাই এবং শক্তির প্রয়োগের দ্বারা কৰ্ম্মক্ষেত্রের সংঘর্ষে আত্মার স্বানুভব বৃত্তি চরিতার্থ হয় অর্থাৎ কৰ্ম্ম করিয়া আত্মা আপনাকে জানিতে পারে এবং এই জানাই আনন্দ। কৰ্ম্মক্ষেত্র হইতে আপনাকে কুড়াইয়া পাওয়াই আনন্দ। আবার এই কুড়াইতে হইলেই ছড়াইতে হয়, আপনাকে দিতে হয়; এই দানেও আনন্দ। কৰ্ম্মের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া, সেই ছড়ান আপনাকে কুড়াইতে হয়। এই ছড়ান এবং কুড়ান হইতে আত্মার দুই স্বরূপের উপলব্ধি হয়, সে এই রূপেই বুঝিতে পারে যে, সে এক সঙ্গে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, ভোক্তা এবং ভোগ্য, 'অণোরনীয়ান্' অথচ 'মহতো মহীয়ান্'। সে এক সঙ্গে একবারে একক অচল একরূপ ও সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ সচল বহুরূপ এবং পরম স্থূল। সে এক সঙ্গেই গুহামুখে এক এবং বহির্মুখে বহু।

আত্মা একদিকে যেমন অচলপ্রতিষ্ঠ, অপরদিকে তেমনি নিত্য-চঞ্চল নিত্য-পরিণামী। একদিকে সে সর্ব্বকারণকারণং রূপে তুরীয়, আবার আর একদিকে কার্য্যরূপে লোকে লোকে কালে কালে বহুধা প্রবহমাণ। সাগর যেমন আপনার মধ্যে স্থির অথচ কোটী কোটী স্রোতে ও তরঙ্গে, লক্ষ লক্ষ স্থান ভেদে বহুধা বিভক্ত, আত্মাও তেমনি ব্রহ্মভাবে একেবারে অচ্যুত, অপরিণামী, আবার জগৎ-ভাবে সদা পরিণামী।

আত্মার এই দুই ভাবকে এককালে এক সঙ্গে না স্বীকার করিলে তাঁহাকেই অস্বীকার করা হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন বশতঃ ইহার এক দিকটাকে, অচল অপরিণামী দিকটাকেই স্বীকার করিয়া জগৎপ্রপঞ্চকে শশ-বিষাণের ন্যায় বলিয়া ধরিয়াছিলেন, তেমনি আত্মার কেবলমাত্র পরিণামিত্বকেই স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান জগৎ-সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সত্য ঠিক এই উভয়কে ধরিয়াই বসিয়া আছেন। তিনি অচলও বটেন সচলও বটেন,—সদাগতি কালের দিক হইতে তিনি সদা ক্ষর, সদা পরিণামী অথচ কালাতীত ভাবে তিনি অক্ষর। আবার দেশ ভাবে তিনি অনন্ত কোটী জড়ে

জীবে বিভক্ত হইয়া আছেন, অথচ ব্রহ্মভাবে তিনি দেশাতীত হইয়া একমেবা-দ্বিতীয়ম্। পরমাত্মায় এই দুই বিরোধী তত্ত্ব একত্র আছে বলিয়াই তিনি বুদ্ধি-গ্রাহ্যেন্দ্রিয়ং বস্তু। জীব যখন সমাধিদ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে তখন সে বুঝিতে পারে সকল প্রকার বিরোধী গুণই তাহাতে আছে। এবং তখনই সে সতেজে বলে যে ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।

জীব তখনি আধ্যাত্মিক পদবাচ্য হইতে পারে যখন সে ধর্ম্মে মুক্ত, কর্ম্মে মুক্ত, জ্ঞানে মুক্ত, যখন সকল কর্ম্মেই তাহার আত্মাকে জাগ্রত করে, সকল ধর্ম্মই তাহার মূলধর্ম্ম অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ ভাবকে জাগায় এবং তাহার সমস্ত জ্ঞান তাহার মূল জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সূত্রে 'মণিগণাইব', গাঁথিয়া উঠে। সে যখন পূর্ণভাবে অভয়কে প্রাপ্ত হয় তখনি সে আধ্যাত্মিক। আত্মার পক্ষে ভয়ই প্রধান বাধা, তাই সে যখন ভয়ানাং-ভয়ংকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তখন সে আধ্যাত্মিক। এবং তখনি তার পূর্ণ ত্যাগের সঙ্গে পূর্ণ ভোগ আরম্ভ হয়। অন্য সর্ব্ব প্রকার ত্যাগই হয় রাজস না হয় তামস। সে সমস্ত ত্যাগ বন্ধনেরই কারণ, কারণ তাহাতে দুঃখ এবং জড়ত্বকেই আনয়ন করে, আপনার স্বরূপকে আবৃত্ত করে।

যে ত্যাগ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ত্যাগে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রকাশস্বভাব সাত্ত্বিক ত্যাগ। নহিলে "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া ত্যাগ করিলে তাহাতে আত্মারও তৃপ্তি হয় না, মনেরও স্বস্তিলাভ হয় না। তাহাতে জড়তা আসিয়া মনকে তিক্তরসে পূর্ণ করিয়া আত্মাকে অবসন্ন করে। আমরা যে 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টি'র বড়াই করি, তাহা ঐ 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'-রই নামান্তর মাত্র। বলিরাজা যতক্ষণ অহংকার তৃপ্তির জন্য দান করিতেছিলেন ততক্ষণ ত্যাগের ফল যে পরমার্থলাভ তাহা তাঁহার হয় নাই। তিনি যখন অহংকারকে ত্যাগ করিয়া আত্মাকে পরমাত্মার পদে পূর্ণভাবে দান করিলেন, তখনই বিষ্ণুর যে পরমপদ তাহাই আপনার শীর্ষদেশে অর্থাৎ আপনার আত্মার মধ্যে পাইলেন। সেই সময় হইতেই সেই পরমাত্মা তাঁহার দুয়ারে দ্বারী হইয়া রহিলেন। বলিরাজ বলী ছিলেন বলিয়াই এই পূর্ণত্যাগে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

আত্মাকে যদি হৃদয়গুহাশায়ী জীবনারায়ণ বলিয়াই ধরা যায় তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে যে দুর্ব্বলের কাছে সে নিজেই নিজে অস্তিত্বহীন। তাহার আত্মো-পলব্ধি নাই—সে নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিজেকেই জানিতে পারে না। মন

বলিতেছে 'এই কর্ম্ম কর', কিন্তু ভয় বলিতেছে, 'পারিব না', যাহার মনে এইরূপ ভাব প্রবল সে যে কি করিয়া আপনাকে জানিবে তাহা বুঝিতে পারি না।

এই জন্য বলিতেছি যে ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ এই কথাটার অর্থ আমরা ভুলিয়াছি। আত্মার যাহা ভোগ, তাহা ত্যাগই, কারণ আত্মার একটা স্বভাবই হইতেছে ব্যাপকতা। বহির্ম্মুখে সে সমস্ত জগতের উপর আপনাকে ছড়াইয়া সমস্ত জগতের সুখ দুঃখ আনন্দের মধ্যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া এক কথায় সমস্ত জগৎকে আত্মলীন করিয়াই সে অত্যন্তম্ সুখমশ্নুতে। এই জন্যই ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই শ্রুতি বলিতেছেন,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ ঈশা বা পরমাত্মার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত কর, তারপর ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।

ধনের ভোগই যেমন ধনের ব্যয়, তেমনি এই পরমধন আত্মার ভোগই হইতেছে ত্যাগ। কিন্তু এই ত্যাগ কখন সম্ভব ?— যখন সমস্ত জগতের উপর সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানাদির উপর আত্মবোধ ছড়াইয়াছে তখনি।

কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, সর্ব্বজ্ঞানলোলুপ, সদানন্দ কোথায় সেই আত্মবোধ ? কোথায় সে আধ্যাত্মিকতা যাহাতে আমাদের পূর্ণত্যাগী পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ করিবে ? কোথায় হে কোথায়। প্রতিধ্বনিও বলিতেছে কোথায় গো কোথায় ?

অতুলবাবু বলিয়াছেন যে, আমাদের ধর্ম্মই জাতীয় গতিপথে বাধা স্বরূপ হইয়াছে। আমি বলিতেছি তাহা নয়। ধর্ম্ম এই হতভাগ্য দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাই এই মরণোন্মুখ অবস্থা। যাহারা পরের দুঃখ দূরের কথা, নিজের দুঃখই পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারে না, দৈহিক সামাজিক এবং জাতীয় সকল রকম দুঃখ যাহারা নির্ব্বিবাদে ভ্রান্ত সাত্ত্বিকতার দোহাই দিয়া সহ্য করিতেছে, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক বলা আধ্যাত্মিক বলা শুধু যে ভাষার অপব্যবহার তাহা নহে, আমাদের চিরন্তন জাতীয় সাধনারই অপমান। যাহারা এই চির-বহমান কালকে কেবল অতীতের মধ্যেই দেখিতে পায়, যাহারা সম্মুখের চক্ষু দুটাই বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে, যাহারা জানে না যে আমরা প্রতিনিয়ত সমস্ত অতীতকে বহন করিয়া বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, যাহারা পঞ্চানন শিবের কেবল পশ্চমমুখ, ঊর্দ্ধমুখটাকেই মুখ বলে, অন্য মুখগুলি মুখই না বলিয়া যাহাদের ধারণা, সেই Lotus eaters-এর দলের মধ্যে যে দিন

রুদ্ররূপী কালাত্মা জাগিবেন, সে দিনকার সেই দক্ষযজ্ঞের দারুণ দুর্দ্দিনে যদি ছাগমুণ্ড পাইয়াও ইহারা বাঁচিতে পারে, তবে হইলে তাহাকে সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। সেদিন এই ত্রিকাল-সত্য জগতের কঠিনত্বের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে তাহাদের মাথাটা না গুঁড়া হইয়া যায়, ত্রিকালসত্য আত্মার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

তাই আজ এই ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন দেশে, এই পরমদীনতার পরম হীনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া কাতর ভাবে বলিতেছি, হে আত্মা, হে জগৎপ্রাণ, হে জগৎশক্তি, হে বিশ্বসাগরশায়ী তুমি এস, আর আমাদের পক্ষে ঘুমাইয়া থাকিও না। জাগ হে, নাথ, জাগ—আমাদের পথ দেখাও, আমাদের ভবিষ্যৎকে চোখের সম্মুখে ধর।—

সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে,
কে করে এই তটিনী পারাপার?
অকূল হতে এসগো আজি কূলে,
দু'কূল দিয়া বাঁধগো পারাবার,—
ধর্ম্ম আর কর্ম্ম সাবধানী
উড়ায়ে দিবে উতলা করা বাণী।

সাধু হরিদাস ও পতিতা

[শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।]

ওগো ও সাধক বর,—
তোমারে মজাতে পাপের ছলনে
একি ব্যথা আজ বেজে ওঠে প্রাণে,
সারা দেহ মোর কি জানি কেন গো
কাঁপিতেছে থর থর।

কি জানি আবেগ ভরে,—
আঁখি দুটী মোর আসিছে মুদিয়া
সব ছলা কলা যেতেছি ভুলিয়া,
অবনত শির লুটাইতে চাহে—
ও দুটী চরণ পরে।

কে যেন বাজায়ে বাঁশী,—
আয় আয় করি ডাকিছে আমারে
বৃন্দাবনের কুঞ্জ-দুয়ারে—
যমুনার জলে সিনান করিতে
ভাবের লহরে ভাসি।—

একি নব ভাবোদয়,—
গুমরি' গুমরি' মরমের তারে
ওই নব সুর বাজে বারে বারে
এ কিরে পরাণ-গলান রাগিণী,—
চারিধারে মোর এম।—

ও কি গো মধুর নাম—
কণ্ঠে তোমার উঠিছে কেবল
ভাবেতে বিভল চোখে বহে জল
গোলোক হইতে অমৃত যেন রে—
ঝরিতেছে অবিরাম।—

আর না ফিরিব ঘরে,—
দেহ অনুমতি ওগো মহাজন
লুটাইতে হেথা পাপ তনু মন
ও দুটী চরণ সেবিতে কেবল,
রাখিয়া—মাথার পরে।

কহিবে কি মোরে ক্ষমা ?
আমি যে ধরার কলুষ আঁধার
পাপেতে মানবে টানি অনিবার
আমি যে ঘৃণিতা ডাকিনী সমান
আমি যে অধমতমা।

ধীরে ধীরে বলে সাধু হরিদাস—
শান্ত মুরতি খানি,—
তোমার মতন ভকত নেহারি
আপনা ধন্য মানি,—
"এসগো জননী কুটীরে আমার
যশোদার রূপ ধরি,
স্নেহের পীযূষে সন্তানে তব
দেও গো হৃদয় ভরি।"

দিশারী বা নেতা কে ?

[শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।]

আজ রাজনীতির আসরে মহাত্মা গান্ধীর জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। তিনটি মত এ আসরে ঠেলাঠেলি করছে, কেউ বলছেন, "রাজা যা' দিয়েছেন তাই নাও, তার পর আরও চাও"; কেউ বা বলছেন, "না, যেটা রাজা দিয়েছেন, সেটাকে বাগিয়ে ধরে ঠেলা করে তাই দিয়ে ঠেলিয়ে রাজার কাছ থেকে আরও অধিকার বের কর"; আর তৃতীয় দল অর্থাৎ মহাত্মার দল বলছেন, "কিছু নিও না, রাজার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বস, তা' হ'লেই দায়ে পড়ে রাজা সেধে পুরো স্বরাজ্য দিয়ে যাবে"। এই তিনটি মতের মধ্যে জাতীয় সভার অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর মত—বর্জ্জন নীতিরই জয় হয়েছে।

একটা মুমূর্ষু জাত বেঁচে উঠে যতটা নড়ে চড়ে হাত পা ছোড়ে, সবটাই

তার জীবনের লক্ষণ। কোনটাই ব্যর্থ যায় না, দুর্ব্বল দেহে জীবনের নব প্রবাহ উষ্ণ রক্তের প্রথম গতি ঐ রকম নাড়া দিয়ে যায়, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অস্বাভাবিক হলেও, লক্ষ্যের হিসেবে তার অনেক খানি ব্যর্থ হলেও সেটা চাই। একটি মেয়ের একমাত্র নাড়ীছেঁড়া ধন মরেছিল, সে সেই অবধি কাঁদে নি, চুপ করে বসে থাকতো। ডাক্তার দেখে মেয়ের মাকে বলেছিল, "যদি মেয়েকে না হারাতে চাও, ওকে ধরে ওর বুকে খুব মারো, ব্যথা দিয়ে কাঁদিয়ে দাও।" অসাড়তা মৃত্যুর লক্ষণ. কান্না হাসি ছুটোপাটি ছুটাছুটি জীবনের চিহ্ন। এ জাতটার সর্ব্ব-অঙ্গ ভরে সাড় এসেছে, এইটুকু হ'লো আশার কথা।

কিন্তু শৈশবে যা' সাজে, যৌবনে তা সাজে না। রাজনীতিতে আমরা কি আজও বালক ? পঞ্জাব হিন্দুস্থান মধ্যপ্রদেশ আর দেশের মুসলমান আজ এই প্রথম রাজনীতি শিখছেন, তাই তাঁদের এত মারামারি,ঢলাঢলি, বোতল বগলে রাজপথে এত হল্লা সাজে। ওদের বোধ হয় ওটা চাই, কারণ সাধারণ লোকের মধ্যে দেশ বলে একটা টান রক্তে মাংসে অস্থি মজ্জায় চারিয়ে যাওয়া চাই। মহামতি কর্জ্জন বাঁচিয়ে ছিল বাঙ্গলাকে, ডায়ার আজ বাঁচালো পাঞ্জাবকে। তোমরা মণ্টেগু সাহেবের স্তুতি কর, আসলেও মণ্টেগু সাহেব মন্দ লোক নন। কিন্তু আমার মতে লর্ড কর্জ্জন ও জেনারাল ডায়ারের মত সুহৃদ আমি ত আর দেখি না। ডায়ার সুচিকিৎসকের মত অসাড় মায়ের বুকে মেরে মেরে ব্যথা দিয়ে এ জাতটাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। তাই আজ মা ছেলের মধ্যে বসেছে—শ্রী ক্রি না এই সমষ্টিবদ্ধ দেশ-আত্মা, আজ সন্তানের কল্যাণে তাই দশভূজা।

কবি রবীন্দ্র নাথ বিলাতে গিয়ে চেষ্টা করছেন যাতে মণ্টেগু সাহেব ভারতের বড় লাট হয়ে সুব্যবস্থা করতে এ দেশে আসেন। রবীন্দ্র কবি, প্রেমিক, শান্তির সাধক, তাঁর প্রেরণাও সত্য। বিশ্ব নিয়ন্তার বাঁশীর সুর কত রন্ধ্রে, কত সপ্তকে বাজছে, তার সব কি আমরা ধরতে পারি। কিন্তু এখনও এ জাতি ভাল করে বেঁচে ওঠে নি, আর বাঁচবার উপায় ব্যথা দুঃখ দারিদ্র্য—কশাঘাত। সুখের ঠাকুর, মঙ্গলময় ভগবানকে সেই চেনে যে তাঁর হাতের কাজ মাথায় নিতে পেরেছে। ব্যথা পেয়ে পেয়ে, আগুনে জলে সুখশয্যা ছেড়ে তোমাদের মানুষ হ'তে হবে। তবে তো তোমরা প্রেমের একচ্ছত্র মহারাজ্য গড়'বে। যে ঘুমের মাতাল, এখনও চোখ থেকে যার তন্দ্রা ঘোচে নি, তার মাথার তলায় উপাধান দিতে নাই ; তার গায়ে হাত বুলিয়ে চামর ঢুলালে সে আবার ঘুমে ঢলে পড়বে। সুখ যে আমাদের সয় না, দুঃখই সয়। আজ রুষ জার্ম্মান্ ফ্রান্স ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড আমেরিকা

—বিশ্ব ভূভারত জুড়ে বেদনার সাড়া শুমরে শুমরে উঠছে, তোমরা সুখ নেবে কেন? এখনও যে পশুকে মানুষ হ'তে হ'বে, মানুষকে দেবতার কোঠায় উঠতে হবে; এখনও যে দুঃখ-সুন্দর ঘরে ঘরে বিষের বাটীতে করে অমৃত বিলাচ্ছেন।

এখনও তোমাদের হৃৎপিণ্ড ফেটে টস্ টস্ করে রক্ত ত পড়ে নি। তোমরা কাঁদ, সে যে সস্তা করে সখের কান্না, যাত্রার কৌশল্যা সেজে প্যালা কুড়োবার লোভে রামবনবাসের সেই বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না। সে দিন শ্রীযুক্ত আশু চৌধুরীর কাছে একজন মাড়ওয়াড়া বলছিল, "তুম লোক সাহেব বেওকুফ হো, নন্-কো অপারেশন জবান সে পাস কর দেও, পিছে চাহে কুছ মৎ করো"—তোমরা বাবু বেকুফ, নন্-কো অপারেশন পাস ত করে দাও, শেষে না হয় কিছুই কোরো না।" আর একজন মাড়ওয়াড়ীকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "বাপু হে, তোমরা তো মহাত্মা গান্ধীজীর চেলা, নন্-কো-অপারেশন করবে; বিলাতী মাল আমদানী বন্ধ করবে কি?" মাড়ওয়াড়ী উত্তরে মুখের কাছে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি ধরে দিল। সভা সমিতির উত্তেজনা প্রায়ই এই ধরণের ব্যাপার, কালীঘাটে শপথ করে স্বদেশী কাপড় পরার মত বিড়ম্বনা। যত লোক সেই পুরান স্বদেশীর দিনে মায়ের চরণ স্পর্শ করে শপথ করেছিল, তার অর্দ্ধেক যদি সে পণ রাখতো, তা' হ'লে দশটা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল চলতো। তবু উত্তেজনার কাজ আছে, পনর আনা ব্যর্থ হ'লেও এক আনা সার্থক। এই পথে ভাব আসে।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কারা স্বরাজ নেবে? সে মানুষ কোথায়? যারা অন্তরে বাহিরে মুক্ত নয়, তারা দেশের মুক্তি আনবে কি করে? অর্থাৎ যা' আমরা চাচ্ছি, এটা কি বিলাতী স্বরাজ না ভারতের বা প্রাচ্যের কিছু? এমন মানুষ আছে, এমন জাতও আছে যাকে বাঁধা যায় না, কারণ সে কায়ে মনে জানে মুক্ত। সে বোঝে না বাঁধন কি।

আমার কাছে গুটি কয়েক পাঞ্জাবী এসেছিল; তাঁরা নন্-কো অপারেশন বা সাহচর্য্য-বর্জ্জন সম্বন্ধে বল্লেন, 'দেখ, আমরা শিখরা কয়েকবার কাবুল জয় করি, কিন্তু সব করবারই ফিরে আসতে হয়, টি'কতে পারি নাই। পাঠানদের দেশ জ্বালিয়ে দাও, গ্রাম নগর অধিকার কর, তারা বনে পাহাড়ে গিয়ে পালিয়ে থাকবে, আর তোমাদের এক একটি করে মারবে। কারণ তারা বাঁধন বোঝে না। তাই বলছি দেশে ভাব অস্থিমজ্জাগত হয় নাই।" সে যুগে পাঠানদের সম্বন্ধে একথা সত্য ছিল, এখন সীমান্তের অনেক পাঠান জাতই ইংরাজের অধীন। কিন্তু পাঞ্জাবীর এই কথা কয়টিতে একটা প্রকাণ্ড সত্য নিহিত

আছে। কিন্তু যে মুক্তির কথা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বল্লেন, সে পশুর মুক্তি, বনের বাঘ ভালুক, আন্দামানের বুনো "জারয়াওয়ালা"ও ঐ রকম মুক্ত, তাই মানুষ নয় তাদের মেরে মেরে নির্ব্বংশ করে, নয় বনে খাঁচায় তাড়িয়ে রাখে। সুন্দর বনে বাঘ মুক্ত, পাহাড়ে পাঠান মুক্ত।

আর এক মুক্তি আছে যা' মনুষ্যত্বের মুক্তি; এই হিসাবে আইরিশ ও পোল (Poles) মুক্ত। পরাধীন অবস্থায়ও এই দুই দেশ বড় বড় মাথাওয়ালা মানুষ গজিয়েছে, আজও আইরিষ জেনারাল বিনা ইংরাজ বাহিনী চলে না। এরা একদিন মুক্ত হবেই, অথবা মুক্তির পথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই রকম মানুষের মুক্তিই এত দিন পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সভ্যতার শেষ কথা ছিল। আমার মুক্তি আর সুখ চাই, এই কলরব এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জগতে ক্রমাগত নরকজ্বালা চলছে। যত মুক্তির তৃষ্ণা, তত বাক্তির নদী। তা'তো হবেই, কারণ "আমার" বলে কোলের কাছে ঝোল টানতে আরম্ভ করলে ত আর রক্ষা নাই, স্বার্থের টানাটানিতে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি বড় একটা দেখা যায় না। ক্রোধ লোভ বলে প্রবৃত্তি গুলোকে নাই দিয়ে মাথায় চড়াবে, অথচ ন্যায় বুদ্ধি ও পরের জন্য দরদ রাখবে—এ রকম মনের অবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক (individualistic) সভ্যতায় সম্ভব নয়।

তাই এবার পাশ্চাত্যের সভ্যতা গমকে দাঁড়িয়েছে। সঙ্ঘ বা community এসে ব্যক্তি বা individualকে মুছে দিচ্ছে। এটা একটা প্রতিক্রিয়া, অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন কুকুর, তার তেমনি মুগুর চাই, তাই এত দিনকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শত্রু হয়েছে আজ সঙ্ঘ-বাদ। কিন্তু মানুষকে মুছে বা খর্ব্ব করে সমাজ বা রাষ্ট্র হয় না, আবার সমাজ বা রাষ্ট্রকে গোণ করে মানুষ বড় হ'লে কাজ চলে না। দুইএর মিলন চাই, সামঞ্জস্য চাই, দুই এরই অবাধ স্বচ্ছন্দ মুক্তি চাই। তা' কিসে হয়? এই সমস্যা আজ জগতের সামনে এসেছে বলেই আজ যুগসন্ধিক্ষণ। বুঝি বা সন্ধি কাল পেরিয়ে যুগান্তর আরম্ভ হয়ে গেছে।

এই নব-যুগ আনবার জন্যে মানুষের মধ্যে চাই দেবতার মুক্তি। তোমার অন্তর রাজ্যে কংশের কারাগারে দেবতা শৃঙ্খলিত আছে, তাকে ছেড়ে দাও, সে অভিনব মাধুর্য্যে ফুটুক। পশুর মাঝে মানুষ বদ্ধ আছে, মানুষের মাঝে দেবতা বাঁধা আছে। মানুষকে মুক্তি দিলে পশুর থাক থেকে উঠে যাই, আর দেবতাকে রেহাই দিলে ঋষির পদবী পাই। এই মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি, অন্তর মুক্ত হ'লে সে মানুষ স্বরাট হয়, তার স্বরাজ্য আপনিই গড়ে উঠে। যে দেশে এত বড় আদর্শ

—এত বড়, বন্ধনহীনতার বার্তা এসে সকলের জীবন অন্নবিন্দুর রঙে দিয়েছে, সে দেশকে বাঁধে কে? সে যে জগৎকে চালাবে বিশ্ব আলো করে নতুন সভ্যতার বাল রবি যে তারই উদয়াচলে উঠবে।"

আমাদের ধারণা মানুষ এত বড় একটা জানোয়ার নয় যে তার চার হাত পায়ে শাস্ত্রের দড়িদড়া, গলায় আচার ধর্ম্মের শিকল,মুখে লোকলজ্জার ঠুলি, আর পিছনে চুরাশি নরকের উদ্যত ঠ্যাঙ্গা না থাকলে সে পশু সংসার-উদ্যান তছনছ করে দেয়। আমরা কিন্তু ভাবি তাই, আমরা পশু চিনি, মানুষ চিনি না,মানুষের মহত্ত্ব গরিমা বুঝি না। তাই এ দেশে দড়ি বাঁধা পশু জন্মায়; সমাজ ও শাস্ত্রের গণ্ডীটুকুর মাঝে নিরীহ একঘেঁয়ে ধর্ম্মভীরু জীবনযাপন করে, আহার নিদ্রা মৈথুন করে তারা চলে যায়। গরু, ভেড়া, ঘোড়া, হাতি এই সব পশুর জীবনে দেখবে সনাতন কাল থেকে তারা নিরুদ্বেগে ঐ রকম ঘাস খেয়ে পুরান জীবনের ক-য়ে দাগা বুলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কিন্তু মানুষ বলেই এত নিয়ম এত শাস্ত্রের শিকল ছিঁড়েও সে বদলায়, বুদ্ধ এসে যজ্ঞধূম নিবিয়ে দেয়, শঙ্কর এসে শূন্যবাদের ভণ্ডামী থেকে জগতকে বাঁচায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এসে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে। তাই বলি রাজনৈতিক বন্ধন ত আছেই, আমাদের সমাজের পাথর Social domination যে আরও ভয়ানক; ধর্ম্মের বদ্ধ স্রোতহীন পানাপুকুর যে ততোধিক প্রাণঘাতী! গতি না থাকলে জীবন—কি ব্যক্তির, কি সমাজের, কি জাতির সকলের জীবন যে মৃত্যুমুখী হয়। গতিকে যে মানে না বা ভয় করে, সে যে সৃষ্টির দেবতাকে ভুলে গেছে।

এই সর্ব্বপাশমুক্তির কথা যে বলবে সেই আমাদের জীবন-পথের দিশারী, সেই আমাদের নেতা। আর আমরা পথের মানুষ নই, এখন আমরা লক্ষ্যের মানুষ, এইটে একবার মনে প্রাণে বুঝি। ওগো তোমার—"সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেও না ফিরে।" অবাধ অনন্ত দিকহারা মুক্তির মাঝে যে বড় হয়, সেই ত দেবতা! বেঁধে যাকে ভাল রাখতে হয়, সে তো মানুষ নয়, সে যে পশু। বন্ধনের লোভ, খাঁচার মোহ, ত্যাগ করা চাই; বন্ধনকে সহজ সুখকর অনায়াস বাঁধিগৎ বলে ভালবাসি বলেই আমরা বদ্ধ, মুক্তির উধাও অনন্ত কূলহারা ব্যাপকতাকে ভয় করি বলেই আমরা বদ্ধ। এস ভাই, একবার দুর্ব্বার মুক্তিকে ভাল বাসতে শেখ, অনিশ্চিতের মহাযাত্রাকে বুকে ধরবার সাহস প্রাণে ধর, সৃষ্টির ঠাকুরকে বিশ্বাস কর—দেখবে,

"ভগবান আজ শুনেছেন তোর
কাতর প্রাণের সকল চাওয়া।"

মন্ত্র।

[শ্রীকণকভূষণ সেন গুপ্ত।]

তোমারি রূপে তোমারি রসে
　তোমারি গন্ধ দিয়া,
পূর্ণ করহে পূর্ণ করহে
　পূর্ণ কর এ হিয়া।
ওহে.　　সিন্ধু তীরের
　স্বর্ণ পুরের
　　দিব্য মহাজন,
ওহে　　অন্ধ কারের
　পর পারের
　　দীপ্য মহাধন!
চিত্ত আমার তোমার দ্বারে
　রাত্রি করিছে গিয়া,
মুগ্ধ করহে মুক্ত করহে
　কৌশলে পরশিয়া।

ভিখারী।

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।]

(১)

দৈনিক "সন্ধ্যার" স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে—"নগদ ১০০৲ টাকা পুরস্কার, ৪ বছরের একটি ছেলে হারাইয়া গিয়াছে, রং ফরসা চেহারা মোটা সোটা, জোড়া ভুরুর মাঝে একটি বড় তিল আছে, যে সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

তারা সুন্দরী দেব্যা।
৪৯নং বারীন্দ্র স্কোয়ার, ভবানীপুর।

(২)

রহিম রোজ "সন্ধ্যা" কাগজখানা পড়িত। বিজ্ঞাপনটা হঠাৎ চোখে পড়িল। সে ভাবিল—"ছেলেটি যদি ফিরে দিই তা হ'লে নগদ ১০০৲ টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু অতে আর কদিন চল্‌বে—তাছাড়া শালারা পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে আমার ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিই, কত ১০০৲ টাকা আনবে—এ ছেলেকে সেই অবস্থায় দেখলে লোকের দয়া হবেই।"

(৩)

রহিমের মা হীরা বেওয়ার রূপযৌবনে ভাঁটা পড়িয়াছিল। গুণ্ডামি করিয়া রহিমের সংসার চলিত এবং নেশার খরচ আসিত। জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সে শুনিল তাহারই দলের এক বন্ধু তাহার মার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া গহনাপত্র টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছে—কেবল বন্ধুর মা বলিয়া খাতির করিয়া প্রাণে মারে নাই। গুণ্ডামির উপর রহিমের ঘৃণা হইয়া গেল। সে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু জেল-ফেরতের ভাল কাজ আর কোথায় হইবে? অবশেষে কসাইখানায় একটা কাজ পাইল। সেখানে থাকিতে থাকিতে হাতের আঙুলগুলি কুষ্ঠরোগে নুলো হইয়া যাওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া কাজ ছাড়িতে হইল।

(৪)

রহিম কোকেন খায়, মধ্যে মধ্যে তাহার পিয়ারীর বাড়ী এক একবার যায়—আর এক অভিনব ব্যবসা করে। এই ব্যবসা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরেই সে তারা সুন্দরীর ছেলেটিকে চুরি করে। একদিন পুরোদস্তুর নেশা করিয়া আসিয়া সে ছেলেটিকে chloroform করিল—এবং তাহার হাঁটুর শির গুলি কাটিয়া ফেলিল এবং চোখ দুটি অন্ধ করিয়া দিল। কি জানি কি কারণে সে এই কাজটি সাদা চোখে করিতে পারিত না—তাই নেশায় বিভোর হইয়া আসিত। তাহার ব্যবসাই হইয়াছিল—ছেলেমেয়ে চুরি করিয়া তাহাদিগকে অঙ্গহীন করা এবং রাস্তায় বসাইয়া তাহাদের পাওয়া ভিক্ষাতে খরচ চালানো। শিয়ালদহ, হাওড়া, হ্যারিসন রোডের মোড়, ধর্ম্মতলা, কালীঘাট প্রভৃতি নানা স্থানে সে তাহার এই রোজগারের কলগুলি বসাইয়া রাখিয়া যাইত। তাহাদিগকে ২বেলা বাসায় লইয়া গিয়া স্নেহ যত্নে খাওয়াইত—আবার রাখিয়া যাইত।

(৫)

রহিমের মা বলিত—"বাবা, কার জন্ম এই পাপ করিস, ওকাজ আর করিস

নে, ভিক্ষে মেগে খাবো সেও ভাল। তুই তো বাবা, একটা বিয়েও করলিনে!" রহিম বলিত—"মা কুলীনের খাড় আর বাড়িয়ে কি হবে, আর এখন কে-ই বা বিয়ে দেবে, আর এই যে ছেলে-মেয়ে গুলো এদের ভারই বা কে নেবে। মরণ পর্য্যন্ত আমাকে এদের নিয়েই থাকতে হবে। আর মা, এতে পাপই বা কি? চটের কল তো দেখনি, সেখানে হাজার হাজার লোককে খেটে কল ওয়ালারা পয়সা করছে, গাড়োয়ান ঘোড়া গরু খাটিয়ে পয়সা করছে—আর মা তোমায় খেতে দেওয়ার জন্য আমি এদের না খাটিয়ে বসিয়ে রেখে দু'পয়সা রোজগার করছি—এতে খোদা আমার উপর চটবেন না। এতে যদি পাপ হয় তো দুনিয়াই পাপে ডুবে আছে!"

(৬)

তারা সুন্দরী একমাত্র পুত্র হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়াছিলেন। অভাগিনী বিধবা পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার কামনায় রোজ কালীঘাটে মায়ের পায়ে ফুল চন্দন দিয়া আসিতেন। কতদিন কাটিয়া গেল—সন্তানের দর্শন আর মিলিল না। ভাবিলেন মরিয়া গিয়াছে—আর পাইব না। আর মাকে ফুল চন্দন দিয়া কি হইবে? কাল হইতে আর আসিব না। ভিখারীর জ্বালায় ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন—তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে দিতে আর কখনো মন্দিরে আসিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন—এমন সময় কোমল কণ্ঠে, একটি বালকের চীৎকার ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল—"মা, মা, আমায় কিছু দিয়ে যাও, আমার যে মা, নড়ে খাবার সাধ্যি নেই।"

(৭)

বারবার কাতর কণ্ঠে মা মা ডাক শুনিয়া তারা সুন্দরী ফিরিয়া চাহিলেন—মনে হইল যেন এ চেনা-সুর, অনেকদিন আগের শোনা। ভিক্ষা দিতে কাছে গিয়া মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—সংজ্ঞা হারাইবার পূর্ব্বেই "বাছারে আমার—" এই কথা কয়টি জননীর মুখ হইতে অস্পষ্টভাবে শোনা গেল। বালকের অন্ধ নয়ন গলিয়া মাতার মূর্চ্ছিত ম্লান বদনে পড়িয়া অশ্রুধারার প্রয়াগ রচনা করিল।

আগমনী

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকার]

(গান)

আমার স্বপন তোরা শুনবি যদি
হেথায় বারেক আয় রে।
আমি একা পড়ে' কেউ কাছে নাই,
কারে বা শুনাই রে!
দেখলাম শীতল করে দিল ধরা
একটি মলয়-বায় রে,
তার পরশ পেয়ে পশু পাখী সব
নেচে নেচে যায় রে!
অমনি মৃত তরু মুঞ্জরিত
শাখা-প্রশাখায় রে,
তারা ফুল-বাসে সাজিয়ে তনু
কারে যেন চায় রে।
তাইতে হঠাৎ ভানু দিলেন দেখা
ঐ পূর্ব্বাশায় রে,
তার কিরণ মেখে মনের সুখে
সব নূতন গাথা গায় রে।
ওরে মাঝখানেতে মায়ের মূর্ত্তি
কোটি ভানু বাইরে,
সেই কোটি ভানু মায়ের জ্যোতিঃ
চৌদিকে ছড়ায় রে।
আমার নিশার শেষে দেখা স্বপন
সত্যি হবে ভাই রে,
আমি সেই অবধি জেগেই আছি,
আঁখি মুদি নাই রে।

ওরে আয় ছুটে ভাই আয়রে সবাই,
মায়ের আগমনী গাই রে,
আয় মায়ের ছেলে আন্‌তে মায়ে
চল মায়ের ধামে যাই রে।

সুখের ঘর গড়া।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]।

তারামণির কাহিনী শুনিয়া অবধি যজ্ঞেশ্বরীর নারীহৃদয়টী পরের দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল। আর তার পিসির মহত্ত্বের কথায় সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পাড়া গাঁয়ের দৈন্যের পঙ্কিল জলেও যে এমন হৃদয়-পদ্ম ফুটিতে পারে যজ্ঞেশ্বরীর সে বিশ্বাস ছিল না। নিজের হৃদয় দর্পণে পরের দুঃখের ছবি দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁর বড় ইচ্ছা হইল এই বৃদ্ধাকে স্বচক্ষে দেখেন ও এই দীন দরিদ্র সংসারটীর সহিত একটা স্নেহের সম্বন্ধ পাতান। অঞ্চলে কিছু মিষ্টান্ন বাঁধিয়া, কিছু অর্থ লইয়া তিনি বড় মেয়ে কিরণ আর দেবর-ঝি নলিনীকে বলিলেন, "চল, কিরণ চল না, নেউগী পুকুরে নেয়ে আসি গে"—নেউগী পুকুরের জলের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে তখন আষাঢ়ের মাঝামাঝি, দিঘির ছায়া ঘোরালো, কালো কুচকুচে কাকচক্ষু জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, ধারে ধারে সাদা লাল কত শালুক ফুটিয়া নিশার আকাশে তারার মত বাহার দিয়াছে। চার পাড়ে ঘন নারিকেল গাছের কুঞ্জ, বাতাসে তাদের চূড়া গোঁ গোঁ করিয়া দুলিতেছে। পুব ধার দিয়া জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়ক, সড়কের উপর স্নানের বাঁধা ঘাট; ঘাটের উপর থামওয়ালা ছাদ নাবাঙা। পুকুরের উত্তরেই গা ঘেঁসিয়া নেউগী পাড়া; নেউগী পাড়া বেতনাঁরই উত্তরাংশ।

নেউগী পুকুরে স্নানসুখ এ বাড়ীর ভাগে রোজ বড় ঘটে না। এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় স্নান করিতে আসা গৃহস্থ মেয়েদের ঘটেই না, যদি আবার নিজের পাড়ায় ডোবা পুকুর থাকে। নেউগী পুকুরের নাম শুনিয়া তরুরও মন নাচিয়া উঠিল। সে বলিল, 'মা, আমি যাব, মা?"

য। তুই আজ নয়; কাল তোকে নিয়ে যাব; নলি পথ চেনে, ও আমার সঙ্গে যাক্—

তরু। [illegible] আমিও যাব।

যজ্ঞেশ্বরী ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "কি নলি? আবার বলতো?" তরু মাকে চিনিত। যজ্ঞেশ্বরী বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও বাঙ্গলার ধাতের মা নয়। তাঁর ইচ্ছাই আইন। তরু মায়ের স্বর শুনিয়াই আবদার প্রত্যাহার করিল। আচ্ছা মা কাল যাব—বলিয়াই চম্পট্ দিল। সৌদামিনী দেখিল ও শিখিল। এই আবদার নলিনী তার কাছে করিলে সেদিন মায়ে ঝিয়ে একটা ছোট খাটো কুরুক্ষেত্র বাধাইত।

কিরণ ও নলিনী যজ্ঞেশ্বরীকে আগে করিয়া চলিল। পথে যজ্ঞেশ্বরী দেবর-কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নলিনী, তারামণিদের বাড়ী চিনিস্? ওই যে কে ব্রহ্ম ঠাকরুণ কোন্ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে?"

ন। হ্যাঁ চিনি জ্যাঠাই মা; কতদিন্ ওদের খিড়কির বাগানে শিউলিফুল কুড়ুতে গিইছি—

য। তারামণির মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে?

ন। একটু একটু হয়েছে, ভাল হয়নি; বড্ড লাজুক জ্যাঠাই মা—আমাদের বাড়ী আস্তে বলেছিনু, তা চুপ করে থাকে; বলে কখন যাব, রাঁধতে বাড়তে হয়।'

কিরণ। মেয়েটা কত বড় রে?

ন। আমাদের চেয়ে ছোট, বেশ দেখ্‌তে দিদিমণি, তোমার মত [illegible]—তোমার চেয়েও ফর্শা। গয়না কিছু পরে না। হাতে দু'টো রাঙ্গা গালার চুড়ী, আর কিছু না জ্যাঠাই মা; ওর মা গয়না দেয়নি?

য। মা দিতে পারেনি বোধ হয়, ভগবান দিয়েছেন অনেক—ঠিক্ পথে যাচ্ছিস্ তো?

ন। বাঃ! আমি বুঝি জানিনি, ওই তো রথতলা, শিবু কামারের হাপরশাল আর একটু খানি গেলেই হবে—বাঁধা ঘাটে নাইবে তো?

য। আগে তারামণিদের বাড়ী যাব।

ন। সেই ঘাটের কাছেই তাদের ঘর।

কি। মেয়েটার নাম কিরে নলি?

ন। সন্ধ্যামণি! কি নাম তার ঠিক নেই। ওর মা ডাকে সনুনি বলে, ঠাকুরমা বলে 'মণি'।

কি। তুই বলিস্—মনমিছরি—ওরুকে আন্‌লে হতো মা—

য। তোর কাকী একলা থাক্‌বে? কাল আসবে'খন।

কথা কহিতে কহিতে তিনজনে ব্রহ্ম ঠাকরুণের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের আগড় ঠেলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্ম ঠাকরুণ তখন শাগ্ বাছিতেছিলেন। সন্ধ্যামণি রান্নাঘর হইতে কিসের জন্য বাহিরে আসিয়াছিল। দুইজন অপরিচিতা ও পরিচিতা নলিনীকে দেখিয়া সন্ধ্যা কিছু বিস্মিত ও বিব্রত হইল। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া একমনে কাজ করাতে ব্রহ্ম ঠাকরুণ অভ্যাগতাদের দেখিতে পান নাই; বয়সধর্মে চোখের ও কাণের দোষ হওয়াতেও ইহাদের আগমন সংবাদ তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ে পৌঁছায় নাই। কাণের দোষ আবার বিশেষ-রকমের বেশী। নলিনী অগ্রসর হইয়া- "কি সন্ধি কি কর্‌ছিস্?"—বলিয়া নিজেদের আগমন সূচনা করিল। সন্ধি তবু নির্ব্বাক ও স্থিরদৃষ্টি। যজ্ঞেশ্বরী অগ্রগামিনী হইয়া ব্রহ্ম ঠাকরুণের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন—'পিশিমা, তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এলাম- ব্রহ্ম ঠাকরুণ শাগ হইতে চোখ তুলিয়া কান ফিরাইলেন—বলিলেন, "না বাছা, বেড়াতে আর কই গেলাম, গেলে কি চলে? যাবই বা কোথা বাছা?"

নতমুখী সন্ধ্যা যজ্ঞেশ্বরীকে বলিল—"আস্তে আস্তে কাণের কাছে বলুন, ঠাকুরমা ভাল শুনতে পায় না"। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন পিসিমার কাণ শুধু শোনে না; অন্যায় করিয়া ভুল শোনে ও গোল বাধায়। তিনি কাছে গিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমরা মা মুখুয্যে বাড়ী থেকে এসেছি, ভোলানাথ মুখুয্যে ও-পাড়ার; —তার বড় ভাজ আমি; তোমাদের পুকুরে নাইতে যাচ্ছিলাম, তা' ভাবলাম তারামণির পিসিমার পায়ের ধূলো নিয়ে যাই।

বে। এস মা লোকনাথের স্ত্রী তুমি? লোকনাথ আর গোকুল যে খুব বন্ধু ছিল, বস মা, এসেছ দেশে তা শুনিছি, তা বাছা চোখ কাণ খেয়ে বসে আছি, যাব যে একবার দেখতে শুনতে তা পারিনি।

য। তুমি কেন কষ্ট করে যাবে, পিসি? আমরাই তো আসবো—

বে। তা' আসবেই তো, দীনদুঃখী বলে তো তোমাদের গরব ছ্যাটা: নেই, লোকনাথ ভোলানাথ দু'ভাই-ই, সাক্ষাৎ ভোলানাথই বটে। কোথায় লোকনাথ আর কোথায় গোকুলনাথ। ভাই ভাজ গুষ্টিকে যমের মুখে তুলে দিয়ে এই দেখ মা ভূষণ্ডী কাগ্ হয়ে বসে আছি। যাবার নাম নেই। মণি কোথা লো, তোর জ্যাঠাইমাকে বসতে জায়গা দে—চোখ্ নেই যে দেখবো—তেমন করে। তৃতীয়

চোখে একটা চশমা সুতো দিয়ে মাথার পিছনে আটকানো ছিল। সেটাকে নাকের উপর ঠিক ভাবে ধরিয়া ব্রহ্ম ঠাকরুণ মুখ তুলিয়া কিরণ ও নলিনীকে দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—এটীতো ভুলুর মেয়ে—না? কি নাম মনেও নেই—

য। নবনলিনী—

ব্র। হ্যাঁ, তাই বটে; ওটি কি তোমার মেয়ে?

য। হ্যাঁ মা, বড় মেয়ে কিরণ শশী।

ব্র। ও যে দুধের ছেলে বউ! এর মধ্যে এই দশা করে বসে আছে?—হায়রে। হায়রে! বস্ দিদি—কি দেখতে এলি মা? তৈরি হয়ে পোঁটলা নিয়ে বসেছিনু—নৌকো ছাড়বো, এমন সময় ভগবান বল্লে "এই নে বোঝা; আবার সংসারে ঢোক,—এর মধ্যে কোথা যাবি?" আবার মা পায়ে বেড়ী হাতে দড়ি;—গোকুলের মেয়ে তারামণি বিধবা হয়ে ছেলেপিলে নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো! দিনান্তে মা আমারই জোটে না; কোথা থেকে এতগুলি পেট ভর্ত্তি করি? ওর ভাসুর দেওর ঠাই দিলে না, ভাই মুখপোড়া জগু ছোড়া—গোকুলের পেরথম পক্ষের ছেলে, সেও খোঁজ করলেনে—যার কোথা ছুঁড়ী কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে? যার বোঝা সে বয়, মা! আমরা শুধু হাতের কল। তা মা বেশ করিছিস্ দেশে এসেছিস্—তোরা যদি থাক্‌বিনি আসবিনি, আস্‌বে কি কত গুলো শ্যাল কুকুর চোর ছ্যাঁচড়।

য। তারা ঠাকুরঝি কোথা পিসিমা?

ব্র। আর কোথা? মনিব বাড়ী হাঁড়ি ঠেলতে গেছে। গোকুলের মেয়ের কপালে এও ছিল, আর আমার বসে বয়ে তাই দেখতে হচ্ছে! বেলা তিন পহর গেলে, একবার আসবে মেয়েটাকে দেখতে, আবার সন্ধ্যার আগেই চলে যাবে। সোমত্ত মেয়েকে মা পেটের ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি করতে পাঠিয়েছি। গতর নিজের থাক্‌লে তা কি করতে দিতুম, মা।

সন্ধ্যা তখন রান্না ঘরের কাজ হইতে একটু অবসর লইয়া নলিনীর সহিত আলাপ অছিলায় আগন্তুকদের দেখিতে আসিল। যজ্ঞেশ্বরী সন্ধ্যাকে এক দৃষ্টে দেখিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিলেন। কী সে আদরের ডাক, অত ছোট ডাকটীতে তত স্নেহ তত প্রীতি যে থাকিতে পারে সে পূর্ব্বে তাহা অনুভব করে নাই। সে কাছে আসিল। যজ্ঞেশ্বরী তাহার মাথাটীর ঘ্রাণ লইয়া আঙুল দিয়া রুক্ষ চুলের জট ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন:—"পিসিমা, তারাদিদির খাসা মেয়েটী, এত ছোট মেয়ে রাঁধতে পারে?"

ব্র। না পারলে চলবে কেন মা? আমাদের তিনটী প্রাণীর রান্না বৈত নয়। তরু তো ও-বাড়ীতে খায় না, এখানে সিদে নিয়ে আসে। ওই মেয়েই রাঁধে—

এমন সময় তারার চার পাঁচ বছরের মেয়ে উষামণি— ধুলা কাদা মাথা নধর দেহটী লইয়া কতক গুলা ছেঁড়া লতাপাতা লইয়া ঠাকুরমার কাছে উপস্থিত। সেও ঠাকুরমার দেখা দেখি দৈনিক শাকান্নের শাক সংগ্রহে বাহির হইয়াছিল। বেড়ার পাশ হইতে কতকগুলা ঘাস ও বুনো লতাপাতা লইয়া ঠাকুরমাকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়া, বাড়াতে অপরিচিত লোকের আবির্ভাব দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যজ্ঞেশ্বরীর ও কিরণের চিত্ত সেই অতি সুন্দর অথচ দুগ্ধাভাবে অপুষ্ট কায় শিশুটীকে দেখিয়া বাৎসল্য রসে ভরিয়া উঠিল।

য। এটী বুঝি তারা দিদির কোলের মেয়ে?

ব্র। হ্যাঁ মা! ভগবানের শাস্তি! ভাগ্যের—

য। বলনি পিসিমা।

যজ্ঞেশ্বরী উঠিয়া গিয়া খুকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। উষামণি (খুকী) প্রথমটা অপরিচিতের সঙ্গে প্রথমদর্শনে 'পিরীতি' অবৈধ বুঝিয়া আপত্তি করিবার মন করে, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরীর স্নেহস্পর্শের ভিতর দিয়া দু'টী অপরিচিত হৃদয়ের মধ্যে তৎক্ষণাৎ কি একটা অজানা বোঝা পড়া হইয়া গেল, উষামণি এই গায়ে-পড়া আদর গায়ে মাখিয়া লইল। তারপর যখন যজ্ঞেশ্বরী অঞ্চল হইতে নারিকেল-নাড়ু কয়টা বাহির করিয়া তার গুটীদুই উষাকে ঘুষ দিলেন, তখন সদ্ভাব স্থাপনের পথে আর কোনো বাধাই রহিল না। Entente cordiale পুরাদমে ঘটিল। মিষ্টান্নের বাকী অংশটা সন্ধ্যামণির হাতে দিয়া যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন, "মা মনি তুমিও কিছু খাও"। মনি খাইল না, ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাইল। কিরণ বলিল, 'খাও দিদি, লজ্জা কি?'

স। ননি এসে খাবে—

ননি সেই ভাইটী সন্ধ্যারই ছোট। জমাদার বাড়াতে সে কাজ করে। যজ্ঞেশ্বরী এই ছোট্ট মেয়েটীর ভ্রাতৃস্নেহে ও বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিলেন। দারিদ্র্যের কাঁটা গাছের এইগুলি অমূল্য ফুল!

য। পিসি মা তাক দিদিকে দেখতে, আর একদিন আসবো, খোকাও যেন সে দিন থাকে? কখন থাকে তারা—?

ব্র। (অন্যমনস্ক থাকায় শুনিতে না পাইয়া) হ্যাঁ খোকাও খাবে, বৈকি। ও তেমন নয়, বৌমা! তাকে না দিয়ে খাবে না—

য। তা' বল্‌ছিনি পিসিমা। খোকা বাড়ী আসে কখন? তার ঠাকুরঝিই বা কখন আসবে?

ব্র। এই দুপুরের পর, দু' এক দণ্ড যা' থাকে এসে, তাও রোজ নয়?

য। পিসিমা আমার ছোট বা বল্‌ছিল তুমি খুব ভাল ব্রতকথা বল্‌তে পার, আমি মাঝে মাঝে এসে শুন্‌বো মনে কর্‌ছি, শোনাবে?

ব্র। কিসের কথা বল্লে? শুন্‌তে কি পাই সব কথা বাছা।

য। (মুখ কাণের কাছে লইয়া গিয়া) তোমার মুখে ব্রত কথা শুন্‌বো মনে কর্‌ছি।

ব্র। তা বেশ তো, এসনা, আর অপ্‌সর এখন তেমন আছে কি মা? ওপাড়ায় হীর মিত্তির, কালী চৌধুরী, ওদের মেয়েরা আসে কথা শুন্‌তে তা এসনা মা—বসেই তো থাকি। উঠ্‌ছ নাকি?

য। যাই নাইতে, আবার রান্না বান্না আছে।

ব্র। এস মা!··তারু এলে একদিন যেতে বলবো, যাবেই বা কখন—

য। না তাকে যেতে হবে না; আমি এখন রোজ এই পুকুরে নাইতে আস্‌বো, এলে দেখা করে যাবো।

এই বলিয়া যজ্ঞেশ্বরী খুকীকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া সন্ধ্যামনির চিবুকে হাত দিয়া চুম খাইয়া তাকে আড়ালে লইয়া গিয়া হাতে টাকাটী দিয়া বলিলেন—'ভাই বোনে সন্দেশ খেয়ো'—। এই বলিয়া তাহারা অদৃশ্য হইলে সন্ধ্যা ঠাকুরমার কাছে আসিয়া বলিল,—

স। 'কে ওঁরা ঠাকুরমা?

ব্র। নলির জ্যাঠাই। ওপাড়ায় বাড়ী, লোকনাথের পরিবার; তোরা তো ওদের কখনো দেখিস্‌ নি, চিন্‌বি কি করে? আহা খাসা মানুষ; যেন অন্নপূর্ণা ভগবতী। কেমন লোকের বউ আর কেমন লোকের স্ত্রী।

স। বেশ ভালবাসে ঠাকুরমা! একটা টাকা দিয়ে গেল, বল্লে 'ভাইবোনে সন্দেশ খেয়ো'। বলিয়া টাকাটী ঠাকুরমার হাতে দিল।

ব্র। বটে? তা বেশ দিদি! দেবতা না মানুষ? আহা বেঁচে থাক্‌ লোকনাথ এম্‌নি মানুষই ছেল, বৌও হয়েছে তেম্‌নি—তা যা এই শাগ্‌ গুলো নে যা—আমি মালায় বসি; খুকী কোথা? কোথাও বেরুস্‌নি দিদি—বাইরে তোঁদড় এসেছে!

খুকী ভোঁদড় নামক অপরিচিত জীবটীকে না দেখিয়াই শুধু নাম শুনিয়াই ভয় করিতে শিখিয়াছিল। সে সম্মতি জানাইয়া—নারিকেল নাড়ুর প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

*　　　*　　　*　　　*

ঘাটে আসিয়াই ঘাট দেখিয়া মায়ে ও মেয়েতে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গলার পল্লীসুন্দরীর ভাণ্ডারে অন্ন নাই থাক্, স্বাস্থ্য নাই থাক্ অঙ্গে এখনো সৌন্দর্য্য অঢেল। আজন্ম নগরবাসে অভ্যস্তা বজ্রেশ্বরী এবং কিরণশশী মুগ্ধ নয়নে পুকুরের সেই বীচিবিক্ষোভিত কালো জলে নারিকেল গাছের গতিশীল সাপের-মত কম্পমান ছায়ার খেলা, আর অফুরন্ত ফুটন্ত শালুক ফুলের মেলা দেখিতে লাগিলেন।

কি। কি জল মা! মরি মরি! দেখেই যেন গা হিম হয়ে যায়—

নলিনী গ্রাম্যবালিকা—শিশু বয়স হইতে তার পুকুরের জলের সঙ্গে পানার মত নিবিড় সম্বন্ধ। সে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আর মুহূর্ত্তে সাঁতরাইয়া দশবিশ হাত চলিয়া গেল। কিরণের কাছে তার সেই জলকেলী বড় সুন্দর লাগিল। কিন্তু তার ভয়ও হইল, সে আজন্ম নগরে লালিত পালিত, পুকুরের ছোট্ট সংস্করণ কলতলার চৌবাচ্ছার সঙ্গেই তার যা কিছু আর মত পরিচয়। অগাধ জলভরা এত বড় পুকুরে অবলীলায় সাঁতার দেওয়া মেয়ে ছেলের পক্ষে তার কাছে একটা দুঃসাহসের কাজ। সে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এক কোমর মাত্র জলে গিয়া আর পা বাড়াইল না। নলিনী হাঁসের মত ভাসিতে ভাসিতে দূর হইতে চঞ্চল কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—'দিদি শালুক নেবে?'

কি। নেবো, আন্তে পারবি?

ন। খুব খুব; কত চাও?

ব। খাসা মেয়েটী তারামণির না, কিরণ?

কি। ভারি চমৎকার! যেন ধুলাকাদা মাখা হীরের টুক্‌রা—আমাদের মত হলে ওকে বৌ করতে, মা?

ব। না হলেও করতে রাজী আছি—

কি। আর খুকীটী?

ব। একই পেটের তো—? কিন্তু সব চেয়ে যা খুব দেখুন ওদের ঠাকুরমা বুড়ী, বেহ্ম পিসি!—এমন মানুষও এখনো আছে—তাকে ঠাকুরঝি রাধুনীগিরি করছে? আমার স্বামীর বাল্য বন্ধুর মেয়ে! কি করে চোখে দেখবো—?

কি। না কল্লেই কি করবে, মা? উপায়ান্তর কি? ছেলেকটাকে মানুষ করতে হবে তো?

য। নলি, ও নলি —পোড়ামুখী—চলে আয়?

কি। (হাসিয়া) কি মুখী? মায়ের সব নতুন নতুন গাল।

য। পোড়ামুখী মেয়ে ছেলেকে বল্‌তে নেই। নে শিগ্‌গির সেরে নে— নলি ফিরে আয়—কলসীটা আন্‌লে হতো—খাসা জল।

কি। উঠ্‌তে ইচ্ছে করছে না—

য। সত্যি মা! জলে যে বলে শরীর শুদ্ধ করে তা ঠিক—শরীরের মনের পাপ যেন ধুয়ে যায় -তা সত্যি কথা শরীরটা প্রসন্ন হলে মনটাও তাই হয়।

ফিরিয়া আসিয়া নলিনী একবোঝা শালুক লইয়া গর্ব্বভরে দিদিকে অর্ঘ্য দিল। কিরণ ফুল দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

য। তোরা ওঠ্ আমি আহ্নিক সেরে নি—

দুই বোনে স্নান সারিয়া জল ছাড়িয়া উপরে উঠিল। ভিজা কাল চুল হইতে মুক্তা ছড়াইতে ছড়াইতে দুই জনে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আহ্নিকনিরতা যজ্ঞেশ্বরীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সরকারী বাঁধের রাহী লোকেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে সেই বাঁধাঘাটে আসিয়া জল খাইত, বিশ্রাম করিত; অনেক দূরান্তের রাহিলোকেরা পাড়ের বাগানে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইত, তাহাদের সুবিধার জন্য একটা ছোট মুদীর দোকান ঘাটের গায়েই করা হইয়াছিল। তাহাতে মুড়ী মুড়কী, মণ্ডা, বাতাসা, চিনি এই সবই থাকিত, হাঁড়ী, কাঠ, চাল ডাল, নুন তেলও যার যেমন দরকার পাইত। বাঁধ পার হইয়া ধানের ক্ষেত, কত যে বড় তার আর সীমা নাই, শেষ নাই। যেন একটা মাঠ সমুদ্র। দিগন্তে গিয়া ক্ষেতে আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু' একটা সঙ্গহীন তাল মাথা তুলিয়া যেন নির্জ্জনবাসের দণ্ড ভোগ করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে কিরণের চোখ এমন অবাধ দৃশ্য সম্ভোগ কখনো করে নাই। সে কৌতূহলী মনটাকে রাশছাড়া করিয়া দিয়াছে, দু'টী চোখের ঘাড়ে চাপিয়া মনটা আকাশে বাতাসে, মাঠের সবুজে ছুটাছুটী করিতেছে। নলিনীর এ সবে ভাবোদ্রেক হয় না, সে নিজের হাতের শালুকগুলার কোন্ কোন্‌টা তরুকে দিবে তাহারই মানস বন্দবস্ত করিতেছিল।

এমন সময়ে হঠাৎ কিরণের যোগভঙ্গ হইল, "সরে দাঁড়াও তো মা, একটু রাস্তা দাও, তা বাছা—" বলিয়া দুটী রমণী কিরণের মনটাকে চোখ হইতে কানে

ফিরাইয়া আনিল। কিরণ ব্যস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অগ্রগামিনী ওই কথা কয়টী বলিবার পর রাস্তা সাফ্ হইলে, পশ্চাৎগামিনী বলিলেন—'ছুঁসনে বাছা!' যার ছোঁয়াকে ভয় সে স্নানশুদ্ধা, যিনি ভয় করিতেছেন, তিনি অস্নাতা, সুতরাং অশুদ্ধা!! ছ'বোনে যথাসম্ভব উহাদের শুচি বাঁচাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রমণীদ্বয় নীচে নামিয়া গেল। জলে পা ডুবাইয়া ধাপে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল:—

চাপা অস্ফুট প্রশ্নে কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল—'এঁরা কে রে নলি?'

ন। ঐ পাড়ায় বাড়ী, একজন শুঁড়ীদের বৌ, আর একজন ভট্টচাজ্জি গিন্নি;—ঐ যে কাল মত মোটা, নাকে নথ, গায়ে খুব গয়না, ও হলো জগন্নাথ শুঁড়ীর বৌ—আর ওই ফরসা মত, ও হলো জীবন ভট্টচাজ্জির পরিবার, জমিদার বাড়ীর পথে আসতে সেই যে বাগানটা দেখলে যেখানে পঞ্চমুখী জবা ফুটে আছে' সে ওই শুঁড়ীদের বাগান।—

কি। (হাসিয়া) নাইতে এসেছে না গায়ের আলো দেখাচ্ছে?—বাবা, গয়নার ঘটা দেখ।

ন। ও তো কি দিদি। ওর মেয়ে, শ্যামকিশোরী, সে দিন ভগবান চাটুজ্যের বাড়ী খেতে গিছলো, তার শুধু চোখ দুটী ছাড়া আর সব সোণামোড়া, তাকে ধরে বসাতে হয়, ধরে তুলতে হয়। তাদের সঙ্গে একটা গিছলো বাক্স নিয়ে। এটা খুলছে, ওটা পরছে; খালি খালি গয়না বদলানো হচ্ছে! সভায় বসবার একরকম, খেতে বসবার একরকম, আবার যাবার সময় এক রকম।

কি। ঝাঁটা মার্! চল এগিয়ে গিয়ে শুনি কি কথা হচ্ছে—মা কখন আস্বেন?—

দু'ধাপ নামিয়া দুজনে গিয়া দাঁড়াইল। শুঁড়ী বৌ আর ভট্টাচার্য্য পত্নী গল্প করিতে করিতে অপাঙ্গে নবাগতাকে দেখিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে উপরে দণ্ডায়মানা দুটি মেয়েকে দেখিতেছে। নলিনী ভট্টাচার্য্য গিন্নির চেনা, তাকে ডাকিয়া পরিচয় জানিতে খুবই ইচ্ছা কিন্তু সাহস পাইতেছে না।

ঠিক এমন সময় এক নীচ জাতীয়া বৃদ্ধা কোমরে একটা বোঝা লইয়া একটি বৌ ও একটি ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুইজনেই মুসলমানের মেয়ে, বেশ ভূষায় বুঝা গেল। সরকারী সড়কের ইহারা রাহী। খুবই শ্রান্ত ক্লান্ত, ঘাটের জলে তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বৌটি একহাতে একটি বদনা ও অপর হাতে ছেলেকে লইয়া ঘাটে নামিল, বৃদ্ধা বোঝা নামাইয়া

উপরে বাঁধা মেঝেতে বসিয়া ময়লা মোটা কাপড়ের আঁচল দিয়া মুখ পুঁছিয়া হাওয়া খাইতে লাগিল।

মুসলমান বৌটি ঘাটের জলে জপনিরতা হিন্দু-বিধবা ও স্নাননিরতা হিন্দু সধবাকে দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া থামিয়া গেল ও কি করিবে ভাবিতে লাগিল। তাহার হাতে বদনা দেখিয়া শুঁড়ী-গিন্নি নৎ নাড়িয়া ও পুরুৎ-গিন্নি চোখ পাকাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—থাম্ ছুড়ী দেখছিস নি, আমরা নাইছি? আস্পদ্দা দেখ! এই ঘাটে এসেছে!—পাড় দিয়ে জল তুলতে কি হয়েছিল?" ধমক খাইয়া বৌ ব্যাচারী একেবারে এতটুকু! গর্জ্জন শুনিয়া যজ্ঞেশ্বরীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দৃশ্য দেখিয়া ব্যাপার বুঝিলেন। পিপাসা কাতর দুটি মানব প্রাণী—নারী ও শিশু—মুসলমানের ঘরে জন্মিবার অপরাধে তৃষ্ণার জল পানেও তার স্বাধীনতা নাই। হায়রে জাতি! হায়রে ধর্ম্ম! যজ্ঞেশ্বরী বৌটিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা এই দিক ঘেঁসে নাম এসে – এস এই দিকে?' বৌটি সেই স্নেহপূর্ণ সাদর আহ্বানে কতকটা আশ্বাস পাইল, কিন্তু পুরুৎ-গিন্নির ধমকের ভয়ে এক পা অগ্রসর হইবার ভরসা পাইল না। সে তর্জ্জনকারিণীদের দিকে একবার সভয় দৃষ্টিপাত করিল; উদ্দেশ্য জানা তারা কি বলে। তারা তো যজ্ঞেশ্বরীর দুঃসাহসে অবাক।

য। এই দিক দিয়ে এসে পাশ থেকে নাও না তুলে? আহা তেষ্টার জল।

পু-গি। ওমা সে কি গো? মুছলমান যে?

য। হলিই বা মা। কাগ্ বগের চেয়ে ভাল তো? তেষ্টার জল চায়, মানুষ তাতে বিঘ্ন ঘটালে পাপ হবে যে বাছা—

শুঁ-গি। তা বলে মুছলমান—জল ছোঁবে? আমরা রইছি ঘাটে? বেশ কথা তো বাবু তোমার?

এই বলিয়া দু'জনে জল হইতে উঠিয়া ধাপের এক কোনে সরিয়া গিয়া জড় সড় হইয়া বসিল। মুখে বেজায় ব্যাজারের ভাব, চোখে বিরক্তির বিষ। বৌটী ছেলের হাত ধরিয়া অতি সন্তর্পণে জলের দিকে অগ্রসর হইল। ছেলেটার হাতে বদনা দিয়া বৌ তাকে জল তুলিতে ইসারা করিল। সে জলমগ্ন পিচ্ছিল ধাপে পা দিয়া বদনা ডুবাইতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দিলেন তার হাতের বদনাটা লইয়া নিজে কোমর জলে নামিয়া ভাল জল ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বৌটীর হাতে দিয়া বলিলেন, 'নাও মা—'। বৌটী বদনা ও ছেলে লইয়া পরম কৃতজ্ঞতা ভরে যজ্ঞেশ্বরীর দিকে

তাকাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। নলিনী জ্যাঠাইমার দুঃসাহসিক অনাচার দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ জ্যাঠাই মা, ওরা যে মুছলমান গো" ?

যজ্ঞেশ্বরী "জানি মা, বাড়ী গিয়ে গঙ্গাজল পরশ কল্লেই হবে", এই বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন 'বাড়ী চল'। তিনজনে ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিল। পুরুৎ গিন্নি ও শুঁড়ী মহিষী তো হিন্দু বিধবার কাণ্ড দেখিয়া অবাক। যজ্ঞেশ্বরী ও কিরণ উপরে আসিয়া মুসলমান বুড়ীকে কি দু একটা প্রশ্ন করিলেন। নলিনী ম্লান শালুকগুলাকে আর একবার জলে চুবাইয়া লইতে লাগিলে পুরুৎ গৃহিণী চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'হ্যাঁলা ও তোর কে' ?

ন। ওনি আমার জ্যাঠাই মা আর ও তাঁর মেয়ে—

নলিনী উঠিয়া গেলে, তিনজনে বাড়ী ফিরিলেন।

পুরুৎ গৃহিণী যজ্ঞেশ্বরীর এই দুঃসাহসিক ও ইচ্ছাকৃত নীরব ...ীয় একটা প্রচণ্ড ঘা খাইল। গ্রামের ছেলে বুড়া নারী ছাগী যাহার শুচিবাইএ তটস্থ, জমীদার গোষ্ঠী যাহার নজরদান, তাহাকে একজন অনাথা বিধবা মেয়ে এমনি করিয়া আমলে না আনিয়া অগ্রাহ্য করিয়া গেল, ইহার আঘাত শক্তিশেলের চেয়েও অসহ্য। তিনি বলিলেন—দেখলে, শুঁড়ীবৌ মাগীর আচরণটা। গরবে মাটীতে পা পড়ছে না যেন। হোক না সতীর চাকরের পরিবার গা। চাকরীর পয়সার এত গরব, ঝাঁটা মারি গরবের মুখে। ...সেছেন এসেছেন সায়েবী ঢং দেখাতে,—

শুঁ-গি। জাত জন্মেও বিচার আচারের ধার ধারেনে—নাক ? বড় লোক তো আমরাও আছি গা।

পু-গি। বলে কিসের সঙ্গে কি। জুনু যদি না ফলনা বেঁচে থাক্‌তো—তারপর নিজের পুকুর হলে না জানি আরো কি করতো। অবাক্ কল্লে মা। আহ্নিক হচ্চিল না ঢং হচ্ছিলো।

শুঁ-গি। তাই আর একটা না হয় ডুব দে। ছ্যা মা ছ্যা। আমরা তো জেতে ছোট তবু জাত ধর্ম্ম বোধ আছে, বিচের আচার করি -

পু-গি। তা' আর বলতে বোন, জাত হয় মনে, বংশে জন্মালেই কি হয় ?

তৃতীয় ব্যক্তি কেহ সেখানে থাকিলে এই কথার সহিত কাজের অসঙ্গতিটা লক্ষ্য করিয়া খুব একটু হাসিত, আর সাহস থাকিলে সেটা বুঝাইয়া দিত।

তাহা হইল না। কাজেই দুজনে মিলিয়া বাকী সময়টা যজ্ঞেশ্বরী-চরিত্রের নিরভূশ আলোচনা করিয়া স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিল।

পু-পি। কল্‌মা ভট্‌চাজ্জির বাড়ীর অপমান করাটা কেমন তা দেখাচ্ছি! প্যাদা বেরুবে। (ক্রমশঃ)

অন্তরে।

[শ্রীযামিনীরঞ্জন শিকদার]

কোথা নীরবতা কোথা কোলাহল?
কোথায় অমৃত কোথা সে গরল?
কোথা মরু কোথা ভূমি সে শ্যামল?
অন্তরে শুধু অন্তরে।

কোথায় আলোক কোথা অন্ধকার?
কোথায় পুলক কোথা হাহাকার?
কোথা শান্তি কোথা অমর দুর্ব্বার?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথা সে বিজয় কোথা পরাজয়?
কোথা সে সাহস কোথা সেই ভয়?
কোথা সে স্বর্গ কোথা সে নিরয়?
অন্তরে শুধু অন্তরে!

কোথা উত্তেজনা কোথা অবসাদ?
কোথা চির সুখ কোথায় বিষাদ?
কোথায় হুঙ্কার কোথা আর্ত্তনাদ?
অন্তরে শুধু অন্তরে?

কোথা সে অন্ধতা। কোথা সে নয়ন ?
কোথায় হর্ম্ম্য কোথা সে শ্মশান ?
কোথা সে উন্নতি কোথায় পতন ?
অন্তরে শুধু অন্তরে।

কোথায় সুপ্তি কোথা জাগরণ ?
কোথায় মুক্তি কোথায় বাঁধন ?
কোথায় বিচ্ছেদ কোথায় মিলন ?
অন্তরে শুধু অন্তরে।

কোথা দুর্ব্বলতা কোথায় শকতি ?
কোথায় সে ঘৃণা কোথা সে ভকতি ?
কোথা আশীর্ব্বাদ কোথায় প্রণতি ?
অন্তরে শুধু অন্তরে।

কোথা মোহ মায়া কোথা দিব্য জ্ঞান ?
কোথা সে হীনাত্মা কোথা মহাপ্রাণ ?
কোথা সে পিশাচ কোথা ভগবান ?
অন্তরে শুধু অন্তরে।

পুরুষোত্তমের পত্র।

[শ্রীপুরুষোত্তম শর্ম্মা।]

সহকারী সম্পাদক ভায়া,

বলি দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে কিছু মৌতাত ধরলে নাকি ? তোমার এমন মতিভ্রম কেন ? ভাত্রের "নারায়ণ" পড়ে তোমার উপর মনটা এমনি চটে গেছল— ইচ্ছা হ'ল দিই ওই শ্রীমুখে খানিকটা কালী ছিটিয়ে, যাতে ও কালামুখ ভদ্রসমাজে আর না দেখাতে পার। কিন্তু দোয়াতে কলমের অৰ্দ্ধেকটা ডুবিয়ে কালী যখন

ছিটিয়ে দিয়েছি, তখন দেখি তুমি সেখানে নেই, আর কালীর ফোঁটা গুলো আমার মুখেই লেগেছে। সেই জন্তে রেগে তোমাকে এই কড়া চিঠিটা লিখে ফেললুম। এ মাসের "নারায়ণ" খানা নারী স্বাতন্ত্র্য, নারীশক্তির প্রতি, স্বাধিকার সাধনা প্রভৃতি আজগুবি পাগলামীতে ভরিয়েছ। নেশার ঝোঁকে এই সনাতন নির্জীব শান্তির দেশে কোথাকার অশান্তি টেনে আনছ? আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌ছি যে অবিলম্বে "নারায়ণের" বুকে নারী বিজয়গর্ব্বে বিরাজ করবেন: কিন্তু এ রকম কথাতো ছিল না। শ্মশানে ভাঙ্‌খোর শিবের বুকে শ্মশানেশ্বরী বিরাজ করুন, তা'তে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের হিন্দুর ঘরে নারায়ণের বুকে যে কোনদিন লক্ষ্মী বিরাজ করবেন একথা তো শাস্ত্রে লেখেনা। লক্ষ্মীতো চিরকাল নারায়ণের পদসেবা করবার জন্ত সেবাদাসা মাত্র! কিন্তু তোমার এই পাগলামীর ফল শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, মৌতাতের মোহাচ্ছন্ন চোখে তা' তুমি ঠিক দেখ্‌তে পার্চ্ছনা; সেই জন্ত কলমের খোঁচা—অর্থাৎ কেরানী জীবনের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে তোমার দৃষ্টিটা একটু ফুটিয়ে দিতে চাই।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজশাস্ত্র যাঁ'রা গড়ে ছিলেন তাঁদের বিষয়ে আর যা'ই মত ভেদ থাক, তাঁ'রা যে পুরুষ মানুষ ছিলেন আর বেশ বিচক্ষণ পুরুষই ছিলেন, নারীদের বিষয়ে তাঁ'রা যে সকল পরিপাটী বিধি ব্যবস্থা ক'রে গেছেন সে গুলো দেখলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। তাঁরা এত মাথা ঘামিয়ে আমাদের জন্ত যে সুবিধা গুলো ক'রে গেছেন, বুদ্ধির দোষে সে সব কেন খোয়াবে? না বুঝে শুঝে তুমি যে সব বিষয়ে চোখ বুঁজে বুঁজে ঘাড় নাড়ছ, সে সব ব্যাপার যদি বাস্তবিক ঘটে তাহ'লে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হ'বে, সেই কথা বলি শোন।

প্রথমেই, "পতি পরম গুরু"—যে কথাটা শুনলে আমাদের এই মুমূর্ষু প্রাণেও একবার আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায়—এ কথাটার মূল্য বিশেষ কমে যাবে। বলি তুমি তো আমাদের জাতেরই, ঘরের কথা জানতে তো আর কিছু বাকী নেই। পরম গুরুর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ স্থানেই যে গুরুত্ব কিছুই পাওয়া যায় না একথা জান তো। কিন্তু মেয়েরা ঐ মন্ত্রটা আউড়ে আউড়ে এমনি মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়েছে যে শতরূপে হীন ও কলুষিত চরিত্রের মধ্যেও তা'রা চোখ বুঁজে গুরুকে দেখবেই। কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়ে ভাবতে শেখালেই তা'রা বুদ্ধির দাঁড়ি পাল্লায় চড়িয়ে আমাদের ওজন করতে থাকবে। আর তার ফলে—বুঝছ তো—বিশ্বের সমক্ষে পরম গুরু একেবারে পরম লঘু হ'য়ে দাঁড়াবে। তার পর

এক ঘোর বিপদ—সে Testimonialএর অর্থাৎ সুপারিস চিঠির বিপদ। বাঙ্গালীর দাসত্বময় জীবন Testimonialএর বিপদ যে কি ভীষণ তা' বোঝ তো? যেখানেই যাও,—সুপারিস চিঠি Testimonial চাই। বিদ্যার, বুদ্ধির, চরিত্রের, টাকার,—আর এসব যদি কিছুই না থাকে অন্ততঃ Fair complexionএর বা ফর্সা চামড়ার—Testimonial চাই। কিন্তু ঐ একটা জায়গা আছে—ছাঁদনাতলা—সেখানে বাঙ্গালার ছেলেদের কোনোরকম Testimonial এখনও দরকার হয় না, অথচ সেখানে মস্ত বড় একটা দাও বেওয়ারিশ হ'য়ে পড়ে আছে। একটু সাহস ক'রে এগিয়ে যেতে পারলেই, অর্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা লাভ। কিন্তু তখন অর্দ্ধেক রাজত্বের আশা তো ত্যাগ করতেই হবে, তার ওপর রাজকন্যার কাছে যে রকম পরীক্ষা দিতে এবং Testimonial দাখিল করতে হ'বে সে সব কথা ভেবে ভাবী বংশধরগণের জন্য আমার চোখে জল আসছে। তারপর মিথ্যা আস্ফালন করবার ও ধমকাবার লোক তখন আর পাওয়া যাবে না। কোনো সাহেবের হাতে মার খেয়ে এসে, 'আজ এক শা—সাহেবকে আচ্ছা দু'ঘা দিয়েছি', হাত না নেড়ে একটু ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে এসে দেশের উন্নতির ব্যবস্থা ক'রে এবং ইত্যাদি রকম নানা মিথ্যাকথাগুলি ব'লে এখন আমরা আমাদের গৃহিণীদের মনে যে গৌরবের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করি, সেটা চিরদিনের জন্য একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। কারণ তখন তা'রা সব দেখবে, জানবে ও বুঝবে। আবার এখন চারিদিক থেকে অপমানিত হ'য়ে এসে আমরা যেই সব অপমানের ঝাল কারণে অকারণে গিন্নিদের ওপরেই ঝেড়ে থাকি। কিন্তু তখন তাঁদের ধমকাব কি? তাঁদের কাছ থেকেই তিরস্কার খাবার ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকতে হবে। এখনও যে তাঁদের কাছে ধমক খাই না, আমিতো অন্ততঃ এত বড় মিথ্যা কথাটা বলতে পারব না। কিন্তু এখন যে সব বিষয়ে তাদের তিরস্কার লাভ করি, দেখেছি সে সব বিষয়ে তাদের উপদেশ শুনলে সাংসারিক উন্নতি বেশ অবাধে হ'তে থাকে। আমার অসাবধানতায় কেমন ক'রে ভ্রাতৃবধূর বংসরে একখান ক'রে গহনা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা কি রকম অন্যায় ভাবে বেশী খাচ্ছেন, এ সমস্ত বিষয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে চোখ ফোটাতে তাদের মতন ওস্তাদ তো আর দেখি না। তখন গঞ্জনা তো খাবই কিন্তু সে গঞ্জনা মেনে চললে সাংসারিক উন্নতি হওয়া চুলোয় যাক—সাংসারিক দুর্দ্দশা পদে পদে হবে। কারণ তখন তাঁরা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকবেন না। আমি বেশ দেখেছি একটু বেশী বিদ্যা বুদ্ধি

হ'লেই মানুষ কি রকম যেন ক্ষেপে যায়। তখন মাথা ঠাণ্ডা করে সে আর ঠিক নীতিকথা বলতে পারে না। তারপর আর এক বিষম বালাই বাড়বে। সব জায়গাতেই আমাদের এখন ত্রুটি হ'লেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, কেবল ঐখানে এ বালাই একেবারেই নেই, বরং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরাই তাঁদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎটা সুদ শুদ্ধ আদায় করে থাকি। এখন খাদ্যাখাদ্য যা ইচ্ছা খাচ্ছি, গম্যাগম্য সকল স্থানেই যাচ্ছি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যা ইচ্ছা করছি, কোন জবাবদিহির দরকার হয় না। কিন্তু তখন প্রত্যেক অন্যায়কাজের জবাবদিহি করতে করতে আমাদের একেবারে কেষ্টোর নামে জবাব দিতে হবে। এখন "ভাগ্যবানের বৌ মরে" এই মহাবাক্যের সত্যরক্ষার জন্যে আমরা মুখে বিধবাদের কল্যাণার্থে একাদশীতত্ত্বের গভীর ব্যাখ্যা করতে করতে কুমারীদের উদ্ধারার্থে ক্রমান্বয়ে বিবাহের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি প্রয়োজন হলে চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত বাহির করে থাকি। অনেক জায়গায় পুরাতন সংস্করণ নিঃশেষ হবার আগেই নূতন সংস্করণ বাহির করে থাকি। কিন্তু তখন প্রথম সংস্করণ বাহির করাটাই একটা মহা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। ক্রমেই পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, আর একটা কথা বলেই পাততাড়ি গুটুব। বলি ভায়া হে, বাঙ্গালীর তো সবই গেছে, আমার বলতে আর আছে কি? ওই একমাত্র আঁচলে-গেরো গিন্নীটা আছেন, যাকে এই মৃত্যু-অন্ধকারে হাৎড়ে গললগ্ন করে বাঙ্গালী গলা ছেড়ে বলতে পারে—"ওগো এটা আমার।" সেই একমাত্র নিছক আপনার জনকে পর করে দেবার জন্যে তোমার এত চেষ্টা কেন? আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি বঙ্গ-সংসারের উপর কালাপাহাড় মূর্ত্তি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টায় আছ। তোমাদের এই রকম উপদ্রব বেশী দিন চালালেই ঘর বাহির সব এক হয়ে যাবে। আমাদের এত কষ্টে আর খরচায় তৈরী, কত যত্নে ও বুদ্ধি করে চারিদিক আঁটা সনাতন ঘরগুলো সব ভেঙ্গে মাঠ হ'য়ে যাবে, আর সেই খোলা মাঠে বাঙ্গলার নরনারীতে মিলে ম্লেচ্ছকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। ভায়া, এখনও সময় আছে দুর্ম্মতি সংযত কর। ভাল ছেলের মত জপ কর আর ওঁদের দিয়েও জপাও "নারী নরকের দ্বার, পুরুষবর্গের দ্বার"—"পতি পরমগুরু—পতি পরমগুরু"।

পুঃ—দাদা, এতে অনেক ঘরের কথা লিখে ফেলেছি—দেখো যেন ভুলে ছাপিয়ে দিও না। তা' হ'লে ওঁদের কাছে মুখ দেখানো ভার হবে।

প্রেম-মূলে।

(শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী)

যদি, তুলসীর মালা বক্ষে ধরিলে
পরশ মিলিত তা'র
তাহা হ'লে গলে দোলাতেম যে গো
তুমি তুলসীর ঝাড় ;
পাথর পূজিলে মহেশের পদ
মিলিত যদি গো, তবে
পাহাড় পূজিতে জগতে হ'ল না
কুন্ঠিত কেবা হ'বে ?
ভজনে পূজনে মেলেনা গো তারে
ফেরে সে যে প্রেম চেয়ে
শুধু প্রেম-মূলে যমুনার কূলে
কিনেছে আহীর মেয়ে।

বাঙ্গালী কি আর্য্য ?

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত]

কথাটা অনেক দিন হইল শুনিতেছি। পুরাতন দল "মোক্ষমুলর বলেছে আর্য্য" এই কথাটাই ধরিয়া খাস্তেরজমা হইয়া বসিয়া আছেন আর যে কেউ আমাদের অনার্য্য বলিতে যান তাঁহাদিগকে গালিগালাজ করিতেছেন। আর নূতনের দল সমান ক্ষেপিয়াছেন আমাদের অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় অনেক দিনের পর কথাটা আবার তুলিয়াছেন।

এ প্রশ্ন শুনিয়া আমার প্রথম মনে হয় এ কথা লইয়া এত মাতামতি বাড়াবাড়ি কেন? আর্য্যই হই অনার্য্যই হই, আমরা যে বাঙ্গালা সেই বাঙ্গালীই যখন থাকিব; তখন একথা লইয়া এত চেঁচামেচি কেন। অনার্য্য হইলেই ব্যাবিলনী কি ইজিপ্টীয়, কি ঈজিয় কি হিট্টাইটদিগের মত গৌরব হয় না, আধুনিক জার্ম্মানী বা প্রাচনী

চীনের সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসা যায় না। আর আর্য্য হইলেই এমন কিছু কুলীন হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে আর্য্য সভ্যতার যে গৌরব ছিল, এই সব অনার্য্য জাতিদের গৌরব তা'র চেয়ে কোনও অংশে হীন বলা যায় না। বর্ত্তমান কালেও অনার্য্য জাপান গৌরবে কোনও তথাকথিত আর্য্যজাতি হইতে হীন নহে। পক্ষান্তরে আর্য্য বংশীয় বর্ব্বর প্রাচীন জর্ম্মাণ বা স্কান্দিনেবিয়ান জাতি যে খুব একটা উন্নত জাতি ছিল তাও বলা যায় না। তবে এ কথায় আমাদের বর্ত্তমান বা অতীতের গৌরবের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। আমরা ছোট না বড় সেটা নির্ণয় হইবে আমরা বাঙ্গালী হিসাবে কতটা কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি তাই দিয়া। আমাদের প্রাচীন গৌরব কি ছিল সেও প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তিকলাপ দিয়া। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়াছিল, না আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল, না এই দেশের মাটিতে জন্মিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালীর গৌরবের ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

এই কথাটা মনে রাখিয়া কেবল অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ভাবে এ কথার ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা সত্যে উপনীত হইতে পারিব।

হেমন্ত বাবু বলিয়াছেন আমরা অন্‌—আর্য্য। মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় রক্ত আমাদের শরীরে প্রবল। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যরক্তের যে মিশ্রণ আছে তাও অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? আমরা একটা মিশ্র জাতি এটা খাঁটি সত্য। সেজন্ত আমাদিগকে অন-আর্য্য বলিতে হয় বল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর্য্যজাতি কোথায় আছে? গ্রীসের আর্য্যের যে কতটা বেশী পরিমাণে ইজিয় (Aegian) জাতির সঙ্গে ভেজাল ছিল, সেটা আজকাল খুব বেশী পরিমাণে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া রোম, জর্ম্মাণী স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া প্রভৃতি যত আদিমকালের আর্য্য-নিবাস ছিল, সে সব কোনও স্থানেই খাঁটি আর্য্যজাতি ছিল না। আজও কোথাও আর্য্যজাতি নাই। নৃতত্ত্ববিদের শাস্ত্রে 'আর্য্য' কথাটা আর মনুষ্য জাতির শ্রেণী বিভাগে শুনা যায় না। আর্য্যবাদ এখন "Aryan heresy" বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং আমরা আর্য্য নই এ কথা যেমন সত্য, এ জগতে কোথাও আর্য্য জাতি নাই, সে কথাটাও তেমনি সত্য। এই আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কত প্রাচীন কালে এই আর্য্যজাতির রক্তের ভিতর ভেজাল আরম্ভ হইয়াছিল। বেদের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে নানা মুনির

নানা মত। তাহা ছাড়া বেদ যে কোথায় রচিত হইয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগে সব চেয়ে প্রাচীন দু'টি আর্য্যজাতির কথা আমরা পাই, একটি মিটানী রাজ্যে আর একটি ব্যাবিলনের ক্যাসাইট বংশে। সে প্রায় চার হাজার বছরের কথা। তখন দেখিতে পাই মিটানীর রাজা দশরট্ট (দশরথ ?) তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন ইজিপ্ট রাজের সঙ্গে। ক্যাসাইট রাজা কাদাশমান—এনলিল ইজিপ্টের রাজা তৃতীয় আমেন হেটেপকে কন্যা দান করিবার জন্য কড়া তলব পাঠাইয়াছিলেন।* রাজায় রাজায় যখন এমনি হইত তখন ছোটখাট লোকের মধ্যে "দুষ্কুলাদপি" স্ত্রীসংগ্রহণ হইত না কে বলিবে। পক্ষান্তরে শূদ্র ও অনার্য্যের ভিতর হইতে যে স্ত্রীসংগ্রহণ হইত এবং তাহাদের পুত্রেরা পুত্ররূপে পরিগণিত হইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদের কড়াকড়ি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে হইয়াছিল। সকল দেশেই আর্য্যজাতি এমনি করিয়া আর্য্যেতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

যদিও নিঃসংশয়ে এ কথা এখনো বলা যায় না, তবু মনে হয় আর্য্যজাতি এক সময়ে ভূতপূর্ব্ব অপসিরিয়ান্ ও হিটাইট সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে যে স্থানে আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সেই স্থানে পূর্ব্বে নানাজাতির বাস ছিল, ব্যাবিলনের সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা ও সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয় সভ্যতা সজীব ছিল। আর্য্য-জাতি ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে হউক পরে হউক এই সমুদয় জাতির সহিত অনেকটা মিশিয়া হইয়া গিয়াছিল, একথা সত্য হইলে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারাও যে খাঁটি আর্য্য ছিলেন এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। অথর্ব্বাঙ্গিরসের ভিতর যে সব আচার অনুষ্ঠান পাই, ঋগ্বেদেও যে সমুদয় আচার অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত পাই, এর ভিতর অনেকটা যে এই সব অন-আর্য্য জাতি হইতে গৃহীত নয় তাহা কে বলিবে ?

আর্য্য জাতির বিবাহ বিধান হইতে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য এবং আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানান্তরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রাহ্ম বিবাহই আদিম আর্য্য বিবাহ পদ্ধতি।†

* Hall, History of the Middle East p 257 61

† প্রতিভা ১৩২৫—'প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান'।

আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিধি অনার্য্য জাতিগণের বিবাহ বিধান হইতে ধার করা। আসুর বিবাহে কন্যা মূল্য দিয়া ক্রয় করা হয়। আসুর জাতির (Assyrian) মধ্যে কেবল এই উপায়েই বিবাহ হইত, তাহা আমরা জানিতে পারি। রাক্ষস বিধান অদ্যাপি ভারতের বহু স্থানে অসভ্য জাতি-দিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহা ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের নিকট ধার করা এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দ্রাবিড় দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রাক্ষস নামক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ আছে পাণিনীও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহও ঐরূপ গান্ধারবাসী গন্ধর্ব্ব জাতি হইতে গৃহীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি আরও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, এই সমস্ত বিজাতীয় হীন বিবাহগুলিকে আর্য্য সংস্কার দ্বারা শোধিত করিবার চেষ্টায়ই দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। আসুরাদি বিবাহ দ্বারা কেবল মাত্র লৌকিক উপায়ে নারীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আর্য্য বিবাহের প্রধান ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর অদৃষ্ট সম্বন্ধ। সেই অদৃষ্ট সম্বন্ধ সূচিত করে শাস্ত্রীয় সংস্কার। সুতরাং নিকৃষ্ট বিবাহগুলিকে সংস্কার শোধিত করিয়া বিশেষভাবে আর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া লইয়া যে বিবাহ পদ্ধতির সৃষ্টি হয় তাহারই নাম দৈব আর্য্য ও প্রাজাপত্য। পরবর্ত্তী কালে, ইহাতেও যখন কুলাইল না তখন আসুরাদি বিবাহকেও সংস্কারযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। বসিষ্ঠের মতে আসুরাদি বিবাহে সংস্কার না হইলে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। এই উপায়ে অনার্য্য অনুষ্ঠান সংস্কৃত করিয়া আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে সমীকৃত করিয়া গ্রহণ করা হইত।

সুতরাং আর্য্যজাতি যে 'অন-আর্য্য' জাতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট ভাবে গোড়া হইতেই মিশিয়া গিয়াছিল এবং "অন-আর্য্য" জাতির নিকট আচার অনুষ্ঠান অনেক ধার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলেই বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর অনার্য্যত্ব প্রমাণ হইল না। শরীর হিসাবে মানুষ একটা উচ্চ অঙ্গের পশু, কিন্তু অন্তরের হিসাবে সে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। এই অন্তরটাই হইল মানুষের বেশীর ভাগ। পশু হিসাবে মানুষের বিভাগ এবং তার মনের হিসাবে বিভাগ সব সময় মিলে না। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকের কুলজী দেখিলে শেষে গিয়া ঠেকিতে হইবে একটা ফরাসীর নামে। জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্টের পূর্ব্বপুরুষ একজন স্কটলণ্ডবাসী।

তাই বলিয়া, কাণ্টকে স্কচ এবং মার্টিনোকে ফ্রান্সী বলিয়া বর্ণনা করিলে যে ভুল হইবে সে বিষয় কি সন্দেহ আছে ? মানুষের মন দেখিয়া তার Culture-এর হিসাবে যে জাতিবিভাগ সেটা পশুবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র।

নৃতত্ত্ববিদ্ আর্য্যজাতি বলিয়া বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির কোনও বিভাগ স্বীকার করেন না ; কিন্তু আর্য্যভাষা ও আর্য্য Culture এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। আমরা আর্য্য কি অনার্য্য, আমাদের পশুত্ব হিসাবে এ কথার কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু আমাদের Cultureএর দিক হইতে এ প্রশ্নের একটা সার্থক উত্তর দেওয়া যায়। বাঙ্গালার মন, তাহাদের Culture আর্য্য কি না এই কথাটাই অনুশীলনের যোগ্য। নাক চোখের মাপ দিয়া বাঙ্গালীর আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না।

বাঙ্গালীর শরীর মঙ্গোল হউক বা দ্রাবিড় হউক বা কোল হউক, তার মন জ্ঞান ও আচার আর্য্য কিনা এইটাই জিজ্ঞাস্য।

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। কোনও জাতির Culture সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে প্রধানতঃ সমাজের শার্ষস্থানীয় শ্রেণীগুলির আচার, বিজ্ঞান, ভাষা ও ধর্ম। নিম্নস্তরের মন দিয়া সমস্ত সমাজের Culture বিচার করা যায় না। নিম্নস্তরের যে জাতীয় জীবনের উপর কোনও প্রভাব নাই এ কথা বলি না, কিন্তু সে প্রভাব গৌণ। প্রধানতঃ নিম্নস্তরই উচ্চস্তরের নিকট তাহাদের Culture প্রাপ্ত হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে যে কোনও জাতির আর্য্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে আমাদের একথা প্রমাণ করিতে হইবে না যে তাদের মন তাদের আচার অনুষ্ঠান, তাদের ভাষা সমস্তই ঠিক তিন চার হাজার বছরের পূর্ব্বেকার আর্য্যজাতির সঙ্গে আগা গোড়া মিলিয়া যায়, কালবশে প্রভেদ হইবেই। তা ছাড়া আর্য্য সভ্যতা তাহার অনার্য্য আবেষ্টন হইতে যে অনেক জিনিষ আপনার ভিতর টানিয়া লইবে তাহাও নিশ্চয়। এই ধার করা মাল যদি আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য জীবনের আদর্শের সহিত সমীকৃত হইয়া থাকে, বল কথা, এই ইতিহাসের মূল প্রাণের প্রবাহটা যদি আর্য্যের প্রাণ হয় তবেই আর্য্যত্ব বজায় থাকে। ডিমটি ফুটিয়া যেমন পাখীটি হয়, সমাজের ক্রমবিকাশ কখনই সেরকম হয় না। সমাজ বাড়িতে হইলে পরিণত জীব-শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে তাহার সমস্ত বাহ্যিক আবেষ্টন হইতে। সুতরাং আর্য্য জাতির চিন্তা ভাব ও আদর্শের স্রোত পদে পদে চতুর্দ্দিক হইতে আর্য্যেতর জাতির ভাব-চিন্তা ও

আদর্শ লইয়া পুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ছাগল ঘাস খাইয়া শরীর পুষ্টি করে বলিয়া যেমন ছাগল ঘাস হইয়া যায় না, আমরা পাঁঠা খাইয়া শরীর পোষণ করিয়া পাঁটা হইয়া যাই না, তেমনি আর্য্য সভ্যতা ও cultute অনার্য্য আচার অনুষ্ঠান লইয়া নিজের পুষ্টি করিয়াছে বলিয়া সে অনার্য্য হইয়া যায় না। আসল প্রশ্ন এই যে প্রাণের ধারার মূল প্রবাহটা আর্য্য না অনার্য্য।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া বাঙ্গালীর চিত্তজগৎ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই সেই কথাটা বিচার্য্য। চিত্তজগতের নানা প্রকাশের দিক হইতে একথা বিচার করা যাইতে পারে। একটা দিক আমাদের ভাষা। ভাষা-তত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে আমাদের ভাষাটা তামিল তেলেগুর সামিল। সংস্কৃতের সামিল নয়। আমি ভাষাতত্ত্ববিৎ নহি, কিন্তু একথাটা অসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিব না। কারণ সুনীতি বাবুও একথা অস্বীকার করেন না, যে, বাঙ্গলা ও প্রাকৃত প্রধানতঃ সংস্কৃতের বিকৃতি, সংস্কৃত ভাষা ভিন্নজাতির মুখে যাইয়া যেমন বিকৃত হইতে পারে তেমনি বিকৃতি। এইটুকুই আমার প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞার পক্ষে যথেষ্ট। একথা যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গলা ভাষা আর্য্যবংশীয়।

আমাদের চিত্ত-জগতের আর একটা প্রকাণ্ড অংশ আমাদের সামাজিক জীবনে পাই। আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে স্থায়ী এবং দৃঢ় বন্ধন আমাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিষেধ, ধর্ম্ম ও ব্যবহার। এই দিকটা আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। বাঙ্গালী হিন্দুর উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে জীবনের প্রত্যেক বড় ও ছোট ব্যাপার যে স্মৃতির বিধান দ্বারা নিয়মিত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে স্মৃতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া বেদের আমল হইতে রঘুনন্দন বা শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত একটা না একটা জীবন্ত ধারার সন্ধান পাই। তার প্রাণশক্তি ও কেন্দ্র আর্য্যের প্রাণ। আর্য্য ঋষিগণ যে আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, আমাদের আহ্নিকার নিত্যকৃত্য এবং অষ্টাদশ সংস্কার প্রভৃতি সকলই সেই আচারাদি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন না হইলেও তাহারই পরিণতি মাত্র। দৈনিক জীবনে চিন্তার ভাবে জীবনের ছোট বড় সকল আদর্শে আমরা সেই আর্য্যের প্রাণে অনুপ্রাণিত। এই সকল আচার অনুষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে স্থানে স্থানে ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,

কোথাও বা বাহির হইতে কোনও নিয়ম বা অনুষ্ঠান ইহার ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে সমীকৃত হইয়া, আর্য্যসভ্যতার ভাবে ভাবিত হইয়া তবে সমাজে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এদিক হইতে দেখিলেও দেখিতে পাই যে আমরা দ্রাবিড় হই বা মঙ্গোলীয় হই, আমাদের Culture, আমাদের সভ্যতা, আর্য্যসভ্যতা। বুদ্ধদেবকে যখন শুদ্ধোদন পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, যে, আমি তোমার পুত্র নহি, আমি পূর্ব্ববুদ্ধদিগের বংশধর। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলকে আমাদের এমনি উত্তরই দিতে হইবে।

বাঙ্গালীর চিত্তজগতের, চাইকি সমস্ত ভারতবাসীরই চিত্তজগতের, এমন কতকগুলি প্রকাশ আছে যাহার মূল আমরা প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। তাই বলিয়া এগুলিও যে ভারতীয় আর্য্য সমাজ বলিতে যে প্রাচীন মিশ্র সমাজ বুঝি, তাহার ভিতর ছিল না একথা জোর করিয়া বলা অসম্ভব। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে যে সমসাময়িক সকল সামাজিক তথ্য ধৃত আছে এমন কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে। সে সময়েও সমাজের তলায় তলায় এমন সব তথ্য ছিল, যাহা কোন শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের মেয়েলী শাস্ত্র ধরা যাইতে পারে। এই যে আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারভূয়িষ্ঠ শাস্ত্র ইহার বেশীর ভাগের কোনও কথা বেদে পুরাণে নাই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ইহা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত স্ত্রী-শূদ্রের লৌকিক ধর্ম্মে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। আপস্তম্ব তাঁহার ধর্ম্মসূত্রের শেষে বলিয়াছেন গ্রন্থে যাহা লেখা হইল তাহা ছাড়া অন্যান্য তথ্য স্ত্রীলোকদিগের নিকট শিখিতে হইবে। ইহা কি এই মেয়েলী শাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত নয়? হয়ত এ ইঙ্গিতে বুঝিয়াছেন অর্থশাস্ত্র। কিন্তু তাহা হইলে বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি উদ্দেশ কেন? তা' ছাড়া, আমরা জেন্দ আবেস্তা হইতে দেখিতে পাই যে প্রাচীন পারশিকদের মধ্যে আমাদের চলিত মেয়েলীশাস্ত্রের অনেকগুলি তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। সুতরাং এই মেয়েলীশাস্ত্রও যে প্রাচীন কালের ধারা প্রসূত এবং ইহার মধ্যে বাহিরের যে জিনিষ তাহাও যে প্রাচীন ধারার সহিত সমীকৃত একথা বলা যাইতে পারে।

তারপর, আমাদের দেশে অবস্থাগতিকে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সব ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায়ের যে আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ধারার সহিত কোনও সংযোগ ছিল না একথা কেহ বলিতে পারি না।

তাহার কতকগুলির মূল হয় তো আমাদের লৌকিক সংস্কারের, চাই কি প্রচলিত মঙ্গোলীয় সংস্কারের, উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেগুলি যখন আর্য্যধর্ম্মের সহিত সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল তখন তাহার বলে বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যেতর জাতি হইতে প্রাপ্ত একথা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না।

সুতরাং আমাদের চিত্তজগৎ হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়। পশুহিসাবে আমরা কোন দলে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমরা খাঁটি আর্য্য নই তাহা নিশ্চয়। কেবল তাহাই নয়, খাঁটি আর্য বলিয়া কোনও জাতি জগতে নাই এবং আর্য্যত্বের মূলে মানবজাতির কোনও শ্রেণী বিভাগ করা চলে না। কাজেই আমরা আর্য্য কি না, এ কথার উত্তর কেবল Cultureএর দিক হইতেই দেওয়া চলে। সে হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়।

জাপানী পুরাণ।

[শ্রীশরৎচন্দ্র পাল]

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে জাপান দেশীয় মত এই যে মনুষ্যের সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতে বহুসংখ্যক দেববংশ ছিলেন। এই দেববংশের সর্ব্বশেষ বংশধর কেবলমাত্র আইজানাগী নামক এক ভ্রাতা ও আইজানামি নাম্নী এক ভগ্নী অবশিষ্ট ছিলেন। পরে এই ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ হইতে জাপান ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বহুসংখ্যক দেবদেবীর উৎপত্তি হয়। এই দেবগণের মধ্যে এক জনের জন্ম সময়ে আইজানামি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে তাঁহার স্বামী আইজানাগী পরলোকের দ্বারে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। আইজানামিও তাঁহার স্বামীর সহিত ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সেইস্থানের দেবদেবীগণের পরামর্শ ও অনুমতি লইবার জন্য প্রবেশ করিলেন। আইজানামির ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার স্বামী আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিজের মাথার চিরুণীর একটী দাড়া

ভাঙ্গিয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া সেই অন্ধকারময় পরলোকের দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে উহার স্ত্রী এক ভয়ানক শবদেহে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন; এবং তাহার মধ্য ভাগে ৮ জন বজ্রদেবতা অবস্থিত রহিয়াছেন। সেইজন্য জাপানীদিগের ৮ এই সংখ্যাটী, আমাদের দেশের ও সংখ্যা ও ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ সংখ্যার ন্যায় গর্হার্থ ও কুলক্ষণসূচক।

আইজানাগি বিফলমনোরথ হইয়া জাপান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নদীজলে অবগাহন করিয়া নিজদেহ শুদ্ধ করিয়া লইলেন। এই সময় তাঁহার নিজদেহ হইতে ৩জন দেবতার উৎপত্তি হইল। এই তিনজন দেবতার মধ্যে প্রথম তাঁহার বাম চক্ষু হইতে সর্য্যার বিলাসিনী স্বরূপ আমাতেরাসু দেবী, পরে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু হইতে চন্দ্র দেব এবং শেষে তাঁহার নাসিকা হইতে প্রচণ্ড এবং মহাশক্তিমান পুরুষ সুসানুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। এই তিন সন্তানের মধ্যে তাঁহাদের পিতা এই জগৎ সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া দিলেন।

জাপানদেশীয় প্রাচীন ও পৌরাণিক মত এই যে সূর্য্য আমাতেরাসু নাম্নী দেবী কর্ত্তৃক পরিচালিত হন। জাপানী ভাষায় আমাতেরাসু অর্থ স্বর্গ প্রভা বা স্বর্গের প্রভাকর এবং ইঁহা হইতেই জাপান রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্র নিজ উদ্ধত প্রকৃতি ও প্রবল পরাক্রান্ত ভ্রাতা সুসানুদেবের অনুগত। জাপানে জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে একটী শশক আছে এবং উহা পিষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য সর্ব্বদা একটী হামান চন্দ্রমণ্ডলদিস্থায় চাল গুঁড়া করিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে এই শশকের ধারণাটী চীনদেশ হইতে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু পিষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য চাল গুঁড়া করিতেছে এই ধারণাটী জাপানবাসীর নিজস্ব কল্পনা শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত যে সূর্য্যমণ্ডলে একটী ত্রিপদ বিশিষ্ট বায়স বাস করিয়া থাকে। (জাপান দেশীয় মতে চন্দ্রস্ত্রীলোক)।

এই ত গেল জাপানের পুরাবৃত্ত।—এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, কারণ এই বিষয়ে কিছু জ্ঞান না থাকিলে বর্ত্তমান কালে জাপানবাসীদিগের মধ্যে নানাবিধ সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সকলেই বোধ হয় জানেন যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম, শিন্তোধর্ম্ম, কনফিউসিয়ন ধর্ম্ম এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্মই প্রধান। ইহাদের

মধ্যে প্রথম ৪টী, তাও, শিন্তো, বৌদ্ধ ও কনফিউসন ধর্ম্ম জাপান জাতির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মটী প্রথম ভারতবর্ষ হইতে চীন, চীন হইতে কোরিয়া ও পরে কোরিয়াবাসীর নিকট হইতে জাপানবাসীরা গ্রহণ করেন। জাপানের ইতিহাসে কথিত আছে যে ৫৫২ খৃঃ অব্দে হ্যাকুসাই নামক একজন কোরিয়ান রাজা মিকাডো-কিনমেইকে বুদ্ধদেবের একটী স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকের কতকগুলি কাগজ-পত্র উপহার দেন। মিকাডো এই নবধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক থাকিলেও তাঁহার পুরাতন শিন্তোধর্ম্মাবলম্বী (Conservative Shintoists) মন্ত্রিদল, তাঁহাকে রাজসভা হইতে এই প্রতিমূর্ত্তি অপসারিত করিতে অনুরোধ করেন। মিকাডো অগত্যা এই মূর্ত্তিটী সোগানোইনামে নামক কোনও এক ভক্তকে উপহার দেন। তিনিই তাঁহার গ্রাম্য আবাসটীকে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধমন্দিরে পরিবর্ত্তিত করেন।

শিন্তোধর্ম্ম।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে ইহা একটী বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ ইহার কোনও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপুস্তক কিম্বা নীতিসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থও দেখা যায় না। জাপানে শিন্তোধর্ম্মের উন্নতির সময়কে তিনটী পৃথক যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মোটামুটী বলিতে গেলে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রথম যুগ বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়। এই সময়ের প্রচলিত সাধারণ সামাজিক নিয়মাদির মধ্যে 'ধর্ম্ম' বলিবা কোনও সতন্ত্র বিধি ব্যবস্থা ছিল না। তখন রাজবংশীয় পূর্ব্বপুরুষদেব ও অন্যান্য মৃত মাহাত্মাদের পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হইত। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জাপানীরা ক্রমশঃ জীবিত রাজাকেও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। চেম্বারলেন সাহেব আরও বলেন যে শিন্তোধর্ম্মের উত্থানের প্রথম যুগে এই ধর্ম্মটী কেবলমাত্র একটী রাজনৈতিক, তথা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি বিশেষ ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সময় হইতে শিন্তোধর্ম্মের দ্বিতীয় যুগ গণনা করা যায়। সেই সময় শিন্তোধর্ম্ম নবপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। চেম্বারলেন সাহেব আরও বলেন যে এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মনোবিজ্ঞান অতিশয় প্রগাঢ় ভাবাপন্ন, ইহার ক্রিয়া-পদ্ধতি অতিশয় বিচিত্র ও ইহার

নীতিশাস্ত্র সবিশেষ উন্নত ছিল। এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণভিত্তিসম্পন্ন শিন্তোধর্ম্ম উন্নত বৌদ্ধধর্ম্মের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষমহইল। ৫০০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিন্তোধর্ম্মের অন্ধকারময় দ্বিতীয়-যুগ। শিন্তোধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ও এই নব প্রভাবান্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাও ধর্ম্মের নিকট দাঁড়াইতে পারিল না। তাহাদের পুরোহিত সকল ভবিষ্যৎকথন এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কেবলমাত্র রাজপ্রাসাদে "একুইসে ও ইজুমোর" ন্যায় ২।৩টী বিখ্যাত ও প্রধান মন্দিরে শিন্তোধর্ম্মকে সরল ও স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যাইত। কিন্তু তাহাও অধিকদিন সেভাবে থাকিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব শিন্তোধর্ম্মের মধ্যে এত গভীরভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছিল যে শিন্তোধর্ম্মের নিজস্ব পার্থক্য বোধক লক্ষণসমূহ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মে লীন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাদের সংমিশ্রণে "রিওবুশিন্তো" নামক অন্য এক নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। শিন্তোধর্ম্মের তৃতীয়যুগ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি গণনা করা হয়। ইহাকেই বিশুদ্ধ শিন্তোধর্ম্মের পুনর্জীবন লাভের সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক পরিচালিত শান্তিময় রাজত্বকালে জাপানের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের দেশের অতীত কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সময় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলির অনুসন্ধান, প্রাচীন ইতিহাস ও কবিতাসকলের পুনর্মুদ্রণ এবং প্রাচীন দেশভাষার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় হইতেই ধর্ম্মান্দোলনটী একটী রাজনৈতিক এবং স্বদেশানুরাগসূচক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও কনফিউসনধর্ম্ম বিদেশীয় বলিয়া অনাদৃত হইতে থাকে। এই সময়ের প্রসিদ্ধ শিন্তো পণ্ডিত সকল যথা মাবুচি (খৃঃ ১৬৯৭ ১৭৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত) মতুরি (খৃঃ ১৭৩৭—১৮০১ খৃঃ পর্য্যন্ত) এবং হিরাতা (খৃঃ ১৭৭৬ -১৮৪৩ পর্য্যন্ত) ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষার প্রভাবে শিন্তোধর্ম্মকে একমাত্র রাজকীয় ধর্ম্মের পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। এই সময় শত শত মন্দির যাহা পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম বা রিওবুশিন্তোধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল সেগুলি শোধিত করা হইয়াছিল (Purified) অর্থাৎ বৌদ্ধবিভূষণ বর্জ্জিত করিয়া ঐ মন্দিরগুলির রক্ষার ভার শিন্তোসম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু শিন্তোধর্ম্মের ভিত্তি সেরূপ সুদৃঢ় না থাকায় এবং তাহার অন্তঃসারবিহীন ধর্ম্মোপদেশ জনসাধারণের মনে সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষম

হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম পুনরায় জয়লাভ করিল। শিন্টোধর্ম অদ্যাবধি রাজধর্ম বলিয়া পুজিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী ছায়ার ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

কন্‌ফুসিয়সের ধর্ম্ম।

খৃষ্টযুগের প্রারম্ভে যখন চীনদেশের সভ্যতা ও তাহার সহিত অন্যান্য বিষয় জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময়ে কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্ম জাপানে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে আইইয়াস্থ নামক একজন বিখ্যাত যোদ্ধা, যিনি নিজে বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতিপোষক ছিলেন; তিনি কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল সর্ব্বপ্রথম জাপানী ভাষায় মুদ্রিত করেন। ইহার পর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ২৫০ বৎসরের মধ্যে দেশের বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই কন্‌ফিউসন্ আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কন্‌ফিউসন্ ধর্ম্মের ব্যবস্থাসকল প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইলেও উহার নীতিশাস্ত্রের উক্তিগুলি এখনও পর্য্যন্ত জাপানের সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। এমন কি প্রচলিত দেশ ভাষার মধ্যেও ইহার প্রভাব অল্প বিস্তর দেখা গিয়া থাকে।

তাও ধর্ম্ম।

তাও ধর্ম্ম কি কিম্বা ইহা বলিতে কি বুঝায় তাহা বলা সুকঠিন। এমন কি জাইন সাহেব ও তাঁহার China and Chinese নামক সুবিখ্যাত সর্ব্বজন-আদৃত পুস্তকে বলিয়াছেন যে তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াও ইহার কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এরূপ অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীন কালের কোনও অজ্ঞাত সময়ে চীনদেশীয় একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তিনি উত্তরকালে লাওস্থনামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে খৃঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জীবিতাবস্থায় অন্যান্য উপদেশের সহিত জন সাধারণকে এই একটী উপদেশ বিশেষ-ভাবে শিক্ষা দেন যে কেহ অসদব্যবহার করিলে তাহার পরিবর্ত্তে সুব্যবহার করিতে হইবে। এক্ষণে তাঁহার জন্ম, বংশ এবং জীবনচরিত সম্বন্ধীয় কথা সকল কালক্রমে সঞ্চিত শতশত বর্ষের জনশ্রুতিতে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। এরূপ কথিত আছে যে তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে একটী জাতীয় প্লাবনের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার লিখিত 'তাওতেচিঙ্' নামক একখানি গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া

পাশ্চাত্যদেশে অন্তর্হিত হন। কিন্তু এই পুস্তকখানি যে তাহার দ্বারা রচিত তাহা বিশেষ কারণ বশতঃ স্বীকার করা যায় না। এস্থলে 'তাও' এই কথাটীর অর্থ প্রধানত "উপায়" বা "উন্নতি" বুঝায়, সেই জন্য লাওস্থন লিখিত গ্রন্থের মূলতত্ত্বটিকে "উন্নতির পথ" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দেব দেবী।

এক্ষণে বৌদ্ধ, শিন্তো ও কন্‌ফিউসিয়াস্‌ ধর্ম্মের দেবদেবীর বিষয় যৎসামান্য মাত্র কিছু উল্লেখ করিব, কারণ ইহাদের দেবদেবী অসংখ্য। এই তিনটী মহৎ ধর্ম্ম হইতে যে সকল দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে সেই সকল দেবদেবীকে অদ্য বধি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে আমি কেবল মাত্র ফুকুজিন অর্থাৎ ৭টী সৌভাগ্য দেবতা ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক লক্ষণ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

১। ফুকুরোকুজো এবং জুরোজিন ইহারা উভয়েই অস্বাভাবিক বৃহদাকার মস্তিকের জন্য প্রসিদ্ধ। উভয়ের পার্শ্বদেশে একটী করিয়া জান ও দীর্ঘায়ুর চিহ্ন স্বরূপ হরিণ ও সারস পক্ষী অবস্থিত। 'বনদেবতা 'দাইকোকু' ইহাঁদের পার্শ্বদেশে এবং সম্মুখে অবস্থিত। চাউলের বস্তা সকল ধনদেবতার পরিচায়ক। 'এবেসু' হস্তে একটী মৎস্য ধারণ করিয়া আছেন। ইনি সততার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতিপোষক স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন। 'হোতেই'—প্রকাণ্ড অনাবৃত উদর, পৃষ্ঠে একটী থলি এবং হস্তে একটী পাখা ধারণ করিয়া আছেন। এই চিহ্নগুলি তৃপ্তি ও ভ্রাতৃত্বসূচক।

বিসামন—যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। এক হস্তে একটী বর্শা ও অপর হস্তে একটী ক্ষুদ্র মন্দির লইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইনি যুদ্ধের দেবতা।

বেনতেন—যুবক যুবতীরা ইহার পূজা অতি আগ্রহের সহিত করিয়া থাকেন। সমবেত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ইনি একমাত্র দেবী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা এবং ইনি রতিদেবী নামে পরিচিতা। ইহা ছাড়া রান্নাঘর, পাইখানা, শুইবার ঘর, গৃহ প্রবেশের পথ, পাতকো হাঁড়ি কলসী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী অসংখ্য দেবদেবী বিদ্যমান আছেন।

পুরোহিত বর্গ।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় শিন্তোধর্ম্মে পুরোহিত সম্প্রদায় আছেন। প্রত্যেক পুরোহিত এক এক দেবতার তত্ত্বাবধানে থাকেন। চেম্বারলেন সাহেব বলেন

মিকাডো তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যের পরিচালিকা আমতেরাসু দেবীর নিকট হইতে যে আর্শি তরবারি ও মণিমাণিক্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেগুলি ইহাদের সর্ব্বপুরাতন মন্দিরে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার এক কন্যা সদাসর্ব্বদা ঐ মন্দিরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু কোন্ মিকাডোর রাজত্বকালে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল চেম্বারলেন সাহেব বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই।

সমাজের কথা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

। এস্বাতন্ত্র্যতার উপর নূতন সমাজকে দাঁড়াইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে, ধরিতে হইবে আপন আপন আত্মাকে। আত্মা কথাটি শুনিয়া কেহ ভড়কাইবেন না, ইহা খুব রহস্যময় প্রহেলিকা কিছু নয়; যাঁহারা ইহাকে ঐরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিব, কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিব না। মানুষের আছে প্রাণের দায়, মানুষের আছে মনের তাড়া, সেই রকমই মানুষের আছে আত্মার প্রেরণা অর্থাৎ তাহার নিগূঢ় স্বভাবের গতি। নিজের এই সবচেয়ে ভিতরকার সত্তা ও প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া তবে কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রত্যেকে যদি আপন আত্মার প্রেরণায় পূর্ণ ও মুক্ত ভাবে আপনাকে চলিতে দেয়, করিতে থাকে যদি 'স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম', তবে আর সংঘর্ষের কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ, সংঘর্ষের সম্ভাবনা হয় তখন যখন এক জনের দেখাদেখি সকলে মিলিয়া একই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় সন্ধ্যাজে ঢুকিয়া পড়ি ও ছুটিয়া চলি; ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয় তখন যখন জিনিষের উপর আমাদের সমস্ত দৃষ্টি ও লোভ যাইয়া পড়ে কিন্তু ভুলিয়া যাই যখন ভিতরের স্বভাবের টান। তাহা না করিয়া, যদি আগে ভিতরটার সাথে বুঝাপড়া করি, যদি অন্তরাত্মার দাবী অনুসারে চলি তবে দেখিব কত

বিচিত্র রাস্তা আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে, আমাদের সমবেত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে, প্রত্যেকের চারিদিকে হাঁফ ছাড়িয়া চলিবার যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছে। পথের, কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যূনতা যে আমরা অনুভব করি, বাস্তবিক পক্ষে তাহা পথের বা কর্ম্মক্ষেত্রের প্রকৃত অভাব ততখানি নয় যতখানি তাহা আমাদের অসহিষ্ণুতা; সম্মুখে যাহা কিছু পাই তাহা লইয়া ধরিয়া পড়িবার যে ব্যস্ততা তারই ফল।

তার পর অন্তরাত্মার ধর্ম্মই হইতেছে মিলন, ঐক্য। মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ দেহের প্রাণের ও মনের ক্ষেত্রে—যতক্ষণ থাকি এই-কয়টির মধ্যে ইহাদেরই দাবী দাওয়াকে চরম করিয়া তুলি, ইহাদেরই টানে নিজেকে হারাইয়া ফেলি, ভাসাইয়া দেই ততক্ষণ একরোখা স্বাতন্ত্র্য হয় আমাদের লক্ষ্য, ছল ও বল হয় আমাদের উপায়। কিন্তু ইহাদের উপরে যদি উঠিয়া যাই, যদি দেখি অনুভব করি ইহাদেরও ভিতরে পিছনে আছে আমার প্রকৃত সত্তা আমার প্রকৃত স্বভাব তখন সেই সঙ্গেই দেখিব অনুভব করিব যে আমা ছাড়া অপরেরও আছে তাহার দেহের প্রাণের মনের অধীর দাবী দাওয়ার উপরে ভিতরে বা পশ্চাতে আমারই মত একটা নিভৃত সত্তা ও স্বভাব। আর এই দুই সত্তা ও দুই স্বভাব দাঁড়াইয়া আছে এমন একটি স্তরে যেখানে তাহাদের মিল অব্যর্থ, কারণ সেখানে তাহারা একই জিনিষের দুইটি দিক বা প্রকাশের ভঙ্গী। সেই স্তরে সর্ব্বদা সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রহিলে, আমাদের পরস্পরের নীচের দন্দ্বের স্তরগুলিও ক্রমে ক্রমে পায় একটা নিবিড় অটুট সামঞ্জস্য। প্রত্যেকে যখন আমরা এই অন্তরাত্মার ভর করিয়া থাকি, ও সেই অনুসারে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের টানে আপন আপন পথ ও ক্ষেত্র করিয়া চলি তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈচিত্র্য লইয়া হইয়া উঠে সমষ্টির বা সঙ্ঘের পৃথক অথচ সম্মিলিত অঙ্গ চেষ্টা (organic function)।

প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে, কোথায় এই অন্তরাত্মা, কোথায় এই নিগূঢ় নিবিড় মিলনধর্ম্ম, বাস্তবে তাহার ত চিহ্ন কিছু দেখিতে পাই না, ইহা যে কল্পনা আকাশ কুসুম নয় তাই বা কে বলিল? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রত্যেকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা চাই নিজের ভিতরে, আপন আপন মণি কোটায়। ভাল করিয়া স্থিতধী হইয়া দেখিলে প্রত্যেকেই কি নিজের নিজের মধ্যে এই রকম একটা মুক্তির ঐক্যের সামঞ্জস্যের ভাব অনুভব করে না? বাহিরের চাপ হইতে, দেহের তাড়া

প্রাণের দায়, মনের সংস্কার হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইলে কখন কোন মুহূর্ত্তে মানুষ কি এই রকম একটা উদার দিব্যসত্তার সন্ধান পায় না? প্রত্যেকেই পায়, তবে বিশ্বাস করে না, প্রত্যেকেই মনে করে এ জিনিষটি নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল, বাস্তবসত্য যাহা তাহার একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এ সন্দেহ কেন হয় না, যে তাহা সত্যও হইতে পারে? এই নিভৃত সত্যকে বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিবার কোন অবকাশই যে আমরা দিই না। উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ—সেই রকম এই অন্তরাত্মার সত্যও প্রত্যেকের মধ্যে উঠে, উঠিয়া আবার বুদ্‌বুদের মত বিলীন হইয়া যায়; পাগল নির্ব্বোধ আখ্যা পাইব বলিয়া আমরা কাহারও কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি না, তাহা লইয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে বুঝা পড়া করিতে চাই না, নিজের নিজের মধ্যে তাহাকে আটকাইয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলি। দুই এক জন কবি ঋষির মুখ দিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ে, আমাদের প্রাণের তন্ত্রী একটা তখনই বাজিয়া উঠে কিন্তু যত সত্বর পারি সুবোধ হইতে চেষ্টা করি, কবিকে ঋষিকে বাহবা দিয়া সরিয়া পড়ি।

ফলতঃ বাস্তবে যে অন্তরাত্মার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায় নাই তাহার কারণ আমাদের এই নিষ্ঠার অভাব। প্রথমতঃ আমরা ইহাকে ভাল করিয়া দেখিতে বুঝিতে চাই নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার স্থাপনের জন্য বিশেষ কোন প্রয়াস করি নাই। সমাজকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছি নীচের প্রকৃতি স্বভাবতঃ যে রকম ভাবে তাহাকে গড়িয়া লইয়াছে সেই ভাবেই। আমাদের ভিতরের অনুভবকে, উচ্চতর প্রেরণাকে বলি দিয়া বাহিরের নিম্নতর তাড়নাকেই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু বলা যাইতে পারে সমাজ যখন এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, এই ভাবেই চলিতেছে, তখন সমাজের এইটিই সনাতন নিয়ম; অন্তরাত্মার ধর্ম্মে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার নিষ্ঠাও আমাদের নাই চেষ্টাও নাই, ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে সমাজ-সত্তার মধ্যে এমন একটি অঙ্গীভূত বস্তু আছে যাহা ঐ জিনিষটিকে চাহে না, চাহিতে পারে না। কোন না কোন রকম সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত—দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ না থাকিলে সমাজও থাকে না।

কিন্তু ইহা শুধু আমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের কথা। সমাজ একভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে আর একভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, এ কথা প্রাণ আমাদের বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও ইতিহাস যে ইহার সাক্ষ্য বা ন্যায়-শাস্ত্র ইহার প্রমাণ দিবে এমন বোধ হয় না। মানুষ তাহার অভ্যাস ও সংস্কারকে

যতই দৃঢ় অব্যভিচারী সনাতন—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ—বলিয়া ধরিয়া লউক না কেন, কোন অভ্যাস কোন সংস্কারই তেমন নয়। অভ্যাসের সংস্কারেরও পরিবর্ত্তন হয়,—ব্যক্তিরও হয়, গোষ্ঠীরও হয়। আমি এমন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি চৌদ্দপুরুষ শুধু চৌদ্দ কেন, সমস্ত পুরুষ বোধ হয়, যাহার ছিল নিরামিষাষী আর নিজেও অর্দ্ধেক জীবন ভরিয়া ছিলেন তাই কিন্তু এখন হইয়াছেন পরম আমিষ-ভক্ত। জাতির পক্ষেও, ফরাসী জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি পরম রাজভক্ত—ফরাসী কেন, পৃথিবীতে এক সময়ে মানুষ মাত্রই বোধ হয় রাজা ছাড়া রাজ্যের কল্পনা করিতে পারিত না, অরাজকতা অর্থ ঘোর বিশৃঙ্খলতা এনার্কিজম্—কিন্তু এখন সেই ফরাসীজাতির রাজভক্তি কোথায়, আর মানুষেরও সেই রাজার অভাব অর্থ অরাজকতা এ ধারণা কোথায়? কিন্তু বলা যাইতে পারে এ সব সংস্কার বা অভ্যাস মানুষের খুব গভীর স্তরের জিনিষ নয়, ইহারা ভাসা ভাসা উপরের উপরের, তাই ইহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব। ইহারা যে সনাতন নয়, তাহা আগে হইতেই ধরা যায়, কারণ, কোন না কোন দেশে, কোন না কোন কালে মানবজাতির মধ্যে ইহাদের ব্যভিচার অবশ্যই দেখা যায়। অভ্যাস অর্থাৎ habit or custom এক জিনিস, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অর্থাৎ instinct আর এক জিনিষ। প্রথমটির পরিবর্ত্তন হয়, হইতেছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির পরিবর্ত্তন কখন হয় না। আমিষপ্রিয়তা, রাজভক্তি, আভিজাত্য-পূজা অথবা আমাদের নানা নৈতিক আদর্শ সবই বিশেষ বিশেষ দেশকালের অভ্যাস ও রীতি; কিন্তু অহমিকা, স্বার্থবোধ, ব্যক্তিগত বিজিগীষা অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল ব্যাপী সনাতন ধর্ম। কোন দেশে কোন্ কালে কোন্ সমাজে দেখিয়াছি ইহাদের পরিবর্ত্তে মিলন সামঞ্জস্য একাত্মতা আধ্যাত্মিকতা স্থান পাইয়াছে, নূতন ব্যবস্থা আনিয়া দিয়াছে? এ কথার উত্তর এই, প্রথমতঃ, অভ্যাস আর সহজাত বৃত্তির মধ্যে একটা কাটাছাঁটা পার্থক্যরেখা সব সময় টানিয়া দেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় উহারা দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জিনিষ নয়, প্রভেদ যাহা তাহা শুধু মাত্রাগত। অভ্যাস বেশী রকম অভ্যস্ত হইলেই আসিয়া দাঁড়ায় সহজাত বৃত্তিতে। অভ্যাসের পত্তন একটা যুগের আরম্ভে আর সহজাতবৃত্তির আরম্ভ বোধ হয় একটা কল্পের আরম্ভে—প্রথমটি মানুষের প্রাণে কিছু বাহিরের স্তর ছুঁইয়াছে, দ্বিতীয়টি আরও একটু ভিতরে গিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু দুইটির কোনটিই যে মানুষের নিবিড়তম সত্তার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এমন বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমরা

যাহাকে অন্তরাত্মার ধর্ম্ম বলিয়াছি, তাহা প্রত্যেক মানুষই ভিতরে ভিতরে অথবা ভিতরের সত্য বলিয়া স্বীকার ত করেই, তা'ছাড়া বাহিরে সমাজ প্রতিষ্ঠানে কখন কোথাও তাহার যে প্রকাশ হয় নাই বা তাহার স্থাপন চেষ্টা হয় নাই, এ কথাও বলা যায় না। ধর্ম্মরাজ্য বা Utopia যে মানুষের কল্পনাতেই আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই। আর কোথাও না হউক, অন্ততঃ আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে, বৌদ্ধসংঘ, খৃষ্টীয় চর্চ্চে এই রকম একটা শুদ্ধতর গোষ্ঠী-বন্ধনের ইঙ্গিতই কি পাই না? হইতে পারে, এখানে জিনিষটি ছিল সংকীর্ণ, উহার কর্ম্মক্ষেত্র অল্পপরিসর, উহা সমাজকে লইয়া নয়, সমাজের বাহিরে আর একটা সমাজ গড়িবার প্রয়াস আর সেই জনাই পূর্ণ ফলদায়ক বা বেশী স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের কথা, মানুষের মধ্যে সংঘর্ষাত্মক সমাজ নহে, মিলনাত্মক সমাজ গড়িবার প্রেরণাও একটা স্বভাব, দ্বন্দ্বই মানুষের স্বভাবের শেষ বা সম্পূর্ণ তথ্য নহে।

সন্ন্যাসীরা সমাজের বাহিরে এক রকম দেব-সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যদি সমাজের ভিতরে ঐ দেব-সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিতেন, তবে বোধ হয় আরও বেশী সফল হইতেন। দেব বা আধ্যাত্মিক সমাজকে গড়িয়া যদি উঠিতে হয় তবে দরকার দুইটি জিনিষ, দুইটি দিক হইতে যুগপৎ দুইটি শক্তির প্রয়োগ বা খেলা। প্রথমতঃ ভিতরের দিক, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে চাই একটা শুদ্ধি, মনকে প্রাণকে নূতন শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠায় ভরপুর করিয়া তোলা, একটা দেবভাবের আবির্ভাব, আত্মার প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ বাহিরের দিক অর্থাৎ ভিতরের ভাবটিকে জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে ফলাইয়া ধরিবার জন্য সুযোগ সুবিধা অবকাশ রচনা করিয়া দেওয়া, প্রতিষ্ঠান সকলকে নূতন ভাবের উপযোগী নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে থাকা। আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রথমটির উপর সব জোর দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়টির উপর নজর দেন নাই, তাই সমাজ প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, ভিতরের ভাবটিও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অতি সঙ্কুচিত হইয়া মলিন ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আর আধুনিক কালে সোসিয়ালিষ্ট ও বোলসেভিকগণ জোর দিতেছেন বাহিরের কাঠামটির উপর, এই জন্য তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল যে হইবেন এমন মনে হয় না।

আমরা ভিতরের দিকের কথাটা আপাততঃ বলিব না। বাহিরের দিকের সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই। ভিতরটা তৈয়ারী হয় ভিতরের জোরে আত্মগত সাধনায়, একথা সত্য হইলেও বাহিরের বিধানও যে এই ভিতরের সাধনার সহায়,

তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বাহিরের সুযোগ ও সুবিধা, ভিতরের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেয়। বিশেতঃ যখন একটা গোষ্ঠী বা সমষ্টির নূতন দিকনির্ণয়, স্বভাবের পরিবর্ত্তন চাই তখন বাহিরের ব্যবস্থার প্রয়োজন আরও বেশী হইয়া পড়ে। সুব্যবস্থা সহজেই সুপ্ত আত্মাকে, মানুষের আপাততঃ কল্পনাগত আদর্শকে, ভিতরের নিবিড়তম ভাবকে প্রকাশিত করিবার জন্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ধারা খুলিয়া দেয়, অন্ততঃ সম্ভাবনার মাত্রাকে বাড়াইয়া দেয়। অন্যপক্ষে কুব্যবস্থা ভিতরের ভাবকে চাপিয়া রাখে, নিস্তেজ করিয়া ফেলে —অনেক সময়ে দেখা যায়, ভাব ভিতরে পাকা হইলেও বাহিরের দুর্ব্যবস্থার কঠিন আবরণ একটা তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকাশ হইতে দিতেছে না। বলা যাইতে পারে অবশ্য, ভিতরটা ঠিক হইয়া আসিলে বাহিরটা আজ না হউক কাল নিশ্চয়ই ঠিক হইয়া আসিবে, তাহা যদি না হয় তবে বুঝিতে হইবে ভিতরটা এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু আমরা বলি ভিতর ও বাহির একদম ছাড়াছাড়ি নয়—ভিতর বাহিরকে সৃষ্টি করিয়া আনিতেছে যেমন সত্য কথা, সেই রকম বাহিরও ভিতরকে প্রকাশ করিয়া আনিতেছে সত্য কথা—বিশেষতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে আমরা বলিতেছি, ব্যক্তিগত সাধনার কথা নয়, কিন্তু সমষ্টিগত সাধনার কথা। মানুষের স্বভাব যেমন সমাজ-প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়াছে, তেমনই এই সমাজ-প্রতিষ্ঠানের রূপই সেই স্বভাবকে গড়িয়া না তুলুক অন্ততঃ বজায় রাখিয়াছে। বোলশেভিকগণ বলেন মানুষের চিরন্তন স্বভাব বলিয়া কিছু নাই, মানুষের স্বভাব হইতেছে অভ্যাসের ফল; এক রকম সমাজে এক রকম ব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে থাকিতে মনুষ্যের এক স্বগুণ হইয়াছে, সেই সমাজ সেই ব্যবস্থা উলটাইয়া দাও, সে আবার নূতন সমাজে নূতন ব্যবস্থায় থাকিতে থাকিতে নূতন অভ্যাস নূতন স্বভাব অর্জন করিবে। এ কথা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না—কিন্তু ইহা যে আংশিক ভাবে সত্য তাহা বিশ্বাস করি।

ব্যক্তিগত অহংস্বাতন্ত্র্য, প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ কতখানি মানুষের অন্তরের প্রকৃতি, সনাতন স্বভাব—আদিম সত্তাগত পাপের (Original sin) ফল, আর কতখানি বাহিরের চাপ প্রয়োজনের তাড়না, গতানুগতিক অনুসরণেচ্ছার ফল তাহাও দেখিবার বিষয়। ক্ষেত্রজ্ঞ চাই অর্থাৎ যিনি আত্মাকে, নিজের গভীরতম উচ্চতম সত্তাকে চিনিয়াছেন, ধরিয়াছেন, সেখানে পাইয়াছেন অটুট শান্তি, বিশ্বের সহিত সম্মিলন সামঞ্জস্য, কিন্তু সেই অনুরূপ ক্ষেত্রকেও চাই, পরে নয়, ঐক্যই সাথে

—সমুচিত ক্ষেত্রই অনেক সময়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে সচেতন করিয়া তোলে, প্রকৃতির দাবীই অনেক সময়ে পুরুষকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে।

আধুনিক যে সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে নিজেকে আত্মাকে চিনিবার সুযোগ মানুষ পায় না। তুমি আমি যে জীবন চালাই যে কর্ম্ম করি তাহা যেন ভিতরের সত্তার সম্পূর্ণ অনুমোদন পায় না, তাহা যেন ভিতরের আর একটা প্রেরণা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, এ যেন দশচক্রে পড়িয়া ভগবানের ভূত হইয়া যাওয়া। আমার ভিতরের আনন্দ অনুসারে আমার জীবন-প্রতিষ্ঠান আমার কর্ম্মজগৎ রচিত হইতেছে না, জীবনের কর্ম্মের একটা ধরা-বাঁধা কঠিন নিরেট ছাঁচের মধ্যে আমাকে ঢালাই হইতে হইতেছে, যাহা কিছু আনন্দ এই রকমে জোর করিয়া পিষিয়া তবে বাহির করিতে হইতেছে। সমাজ-আয়তনে কয়েকটী মাত্র বড় বড় রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, চলিতে ফিরিতে হইলে সকলকেই সেই কয়েকটিকে আশ্রয় করিতে হইবে। জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি জিনিষকে প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু সে সকলকে অপ্রয়োজনীয় বোধে একপাশে হয়ত আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেককে তাই নিজের বহু অঙ্গ অকাজের বলিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে হইতেছে, একই রকম ছাঁচের মধ্যে ঢুকিতে হইতেছে; পথের প্রাচুর্য্য নাই, প্রত্যেকের ধরণ ধারণও এক রকমের হইয়া পড়িয়াছে, ফল যে হইবে সংঘর্ষ অহংমত্ততা তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

আমি কবি-প্রাণ, কিন্তু আমাকে হইতে হইতেছে দর্শনের প্রফেসর অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদক। আমার আছে চিন্তাশক্তি, কিন্তু আমাকে করিতে হইতেছে কেরাণীগিরি। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমি প্রতিভা দেখাইতে পারি, আমাকে হইতে হইতেছে উকিল। আমি রাজ্য চালাইতে পারি, কিন্তু খাটাইতেছি কুলি। এই রকম একটা ভীষণ বর্ণশঙ্কর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়াছে। নিজের ভিতরের দিকে তাকাইবার কাহারও অবসর নাই, নিজের আনন্দ কোথায় ও কিসে, নিজের সহজ ধর্ম্ম কি, অন্তরাত্মার গতি ও প্রেরণা কোন দিকে তাহা দেখিবার বুঝিবার ফাঁক কোথাও পাই না, একটা ব্যস্ততার ত্রস্ততার ধূম ও কুহেলিকা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সব রন্ধ্র যেন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, চারিদিকে তাহারই একটা নিবিড় নিরেট যবনিকা বিরিয়া রহিয়াছে। আপন আনন্দ আপন ধর্ম্ম বুঝি না, সম্মুখে যাহা পাইতেছি, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই একটা বিপুল ঘূর্ণীবায়ুর পাকে পাকে আপনহারা হইয়া ছুটিয়া

চলিয়াছি। স্বধর্ম পাইতেছি না, পাইতে চাইতেছি না, সকলের ঘাড়ে চাপিয়াছে একটা পরধর্ম, তাই আসিয়াছে নিরানন্দ, সঙ্ঘর্ষ। নিজেকে আত্মাকে ধরিয়া জীবন সৃষ্টি করিতেছি না, আনন্দ নয় লাভ, স্বধর্ম নয় স্বার্থই হইয়াছে কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই জীবনে কর্ম্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে মিথ্যাতার কৃত্রিমতা ক্ষুদ্রতা ও অসহিষ্ণুতা দৈন্য ও গৃধ্নুতা।

কিন্তু সমাজের কাঠামকে ছাঁচকে যদি এমনভাবে বদলাইয়া দিতে পারি, যে প্রত্যেকে আপন আনন্দের পথটি অনুসরণ করিবার, নিজের ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করিবার, নিজের অন্তরাত্মাকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় তবে দেখিব শুধু লাভের স্বার্থের পথে আর কেহ তত সংজ্ঞে চলিতে চাহিতেছে না। সমাজের গঠন যদি এমন হয় যে তাহা কেবল কয়েকজনের, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয় পরন্তু নির্ব্বিশেষে সকলের প্রত্যেকের জন্য, সমাজ-ব্যবস্থা যদি এমন উদার হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে, প্রত্যেকব্যক্তির দেয়কে এমন কি অলসের আলস্যকে পর্য্যন্ত* – গ্রহণ করিতে পারে, আপন স্থিতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যবহারে লাগাইতে পারে, তবে দ্বন্দ্বের সঙ্ঘর্ষের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক হইতে বিভিন্ন, আপন ধর্ম্ম আপন কর্ম্ম রচিয়া প্রত্যেকেই সমাজের ভাণ্ডারে আনিয়া দিতেছে নূতন নূতন সম্পদ। বর্ত্তমান সমাজে কিন্তু সম্পদ কেউ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না—নূতন ত দূরের কথা, সকলেই যোগাইতেছে ভেজাল, ভেজালে কে কত চালাকী করিতে পারে তাহা লইয়াই চলিয়াছে মারামারি লাঠালাঠি। কিন্তু অন্তরাত্মার ধনসৃষ্টিতে সংঘর্ষ নাই, কারণ সেখানে বৈষম্য নাই, সকলেই সেখানে সমান, সকলের সৃষ্টিরই সমান মর্য্যাদা সমান মূল্য—পরের ধনে সেখানে আমরা ঈর্ষান্বিত নই, কারণ নিজের ধনেই তখন আমরা প্রত্যেকে ধনী।

এ সমাজ-ব্যবস্থা আসিবে কেমন করিয়া, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? সমাজ-ব্যবস্থার যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে ভাবে, যে হেতুতে এই নূতন পরিবর্ত্তনও হইবে সেই ভাবে, সেই হেতুতে। বাহিরে প্রাচীন ব্যবস্থার অসম্ভব অসহ্য চাপ আর ভিতরে সমষ্টিগত অন্তরাত্মার একটা নূতন মুক্তির প্রেরণা, ফলে সেই

* Cf Bertrand Russel, "Roads to Freedom"—পৃঃ ১১৪, ১৭৯-১৮০। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমাদের আরও বলিবার রহিল।

চাপ ও প্রেরণার মাত্রা অনুসারে একটা ওলট পালট ও নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি। ইহা অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

এই সমষ্টিগত অন্তরাত্মার উদ্বোধন এই সমাজগত নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা হয় বোধ হয়ত প্রথমে কয়েকটি ব্যক্তির মধ্যে, অগ্রনী যাঁহারা, ভবিষ্যতের প্রতিনিধি যাঁহারা, দৃষ্টি যাঁহাদের মুক্ত, শ্রদ্ধা যাঁহাদের অটুট, সাহস যাহাদের দুর্জ্জয়, শক্তি যাঁহাদের অমিত, সাধনা যাঁহাদের অখণ্ড।

বিশ্বরূপ।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

কনককাঞ্চন ছড়ায়ে পড়িল একদা বসন্ত প্রভাতে
বিশ্বের এই সভাতে,
শাখে শাখে শাখে আবাহন-গান
কোকিলকণ্ঠ-কুহরিত তান
শিহরিত দিক স্নিগ্ধ মলয় বাতাসে
সুন্দর সেই আকাশে।

আম্র-মুকুল-গন্ধ মদিরা ছেয়েছে পবনে পবনে
এ শান্ত চারু লগনে,
সে মদিরা পানে অলিকুল ভোর।
মুছি আঁখি দুটী খুলি দিয়া দোর
বাহির হইনু দাঁড়াতে গগন তলাতে
সুন্দর সেই প্রভাতে।

সহসা একি রে বাধন-গ্রন্থি হৃদয়ের গেল টুটিয়া!
জগত আসিল জুটিয়া!
পিক-কুল-তান অলিকুল গীতি
গাহে তারা একি শুধু মোর স্তুতি।
আম্র-মুকুল-গন্ধ-মদিরা বিবৃত এই দেহীতে
আমি ঢাকা সেই মহীতে!

বাক্যহীন ওই নভোমণ্ডল নামিল আমাতে আসিয়া
কহিল আমারে হাসিয়া
তুমি আছ তাই আছে মোর স্থান
তুমি চলে গেলে জীবনের দান
রবে না আমার ; হব না দীপ্ত আলোকে
প্রভাতের এই পুলকে ;

চেয়ে দেখ এই অন্তরে মোর প্রত্যেক পরমাণুটী
তব মূরতিরই অণুটী
অঙ্কিত কত চিকণ জালে
পড়ে থাকে তাই দৃষ্টি আড়ালে
তুমি হাস তাই আমি হাসিময় আভাতে —
সন্ধ্যা উষায় নিশাতে।

একি মোর রূপ দেখালে আজিকে হে মোর হৃদয়-দেবতা,
একি অদ্ভুত বারতা।
জুড়ে আছি এই বিশ্বের সভা।
দীপ্ত আলোকে সে যে মোরই প্রভা।
গগন পবন হাসে শুধু আমি হাসি যে
আমি-ময় চারু মহা এ।

সাহিত্যে অনুভূতি।

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এম, এ]

শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্যে স্বভাবতঃই একটা পার্থক্য রহিয়াছে এবং সাহিত্যকে শিল্প হিসাবে বিচার করিতে চাহিলে এই পার্থক্যটী সম্যকরূপে বুঝিয়া লওয়া দরকার। বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি জড়প্রকৃতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

জগতের অথবা বাস্তবের বহিঃপ্রকাশের উপর এবং এই বহিঃপ্রকাশকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতিরিক্ত করিয়া তুলিলেও, ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া গেলেও,—ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞান জ্ঞানের সীমা বাড়াইয়া চলিয়াছে। শিল্পসৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে, সে বহিঃপ্রকাশকে সত্যের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অধ্যাত্মসত্তার সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে,—ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে চায় ;—বাহিরের বাস্তবতা পর্য্যন্ত অধ্যাত্মজীবনের প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া পড়ে। *

বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত সাহিত্যের যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় তাহার একটী কারণ এই যে এইরূপ সত্যে মানুষের হৃদয় শান্তি পায় না। জড়বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও তাহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা যেন সত্যের স্বরূপ তাহার নিকট ধরা পড়িতেছে না। সেই জন্য কেবল জ্ঞানের দিক হইতে,—দর্শন ও বিজ্ঞানের রীতিতে,—সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে অন্য কোনও প্রণালীতে, অনুভূতির দ্বারা, ভাব ও কল্পনার সাহায্যে, হয়ত বা প্রজ্ঞার অন্তর্দৃষ্টি লইয়া, সত্যের সহিত একটী নিবিড়তর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়, তাহাকে অধিগত করিয়া আপন করিয়া লইতে চেষ্টা করে। আমাদের বাহিরে ও ভিতরে প্রাণের যে লীলা নিত্য স্ফুরিত হইতেছে, জ্ঞানের দ্বারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে আমরা পারি না, অথচ ইহাকে মূর্ত্ত করিয়া দেখিবার, স্ফুটতর করিয়া ধরিবার আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা তাহারও নিবৃত্তি নাই। † এই

* "In Art, the sensuous is spiritualized i. e. the spiritual appears in sensuous shape"! "Art liberates the real import of appearances from the semblance and deception of this bad and fleeting world, and imparts to phenomenal semblances a 'higher reality, born of mind" "Genuine reality is only to be found beyond the immediacy of feeling and of external objects." "The higher an artist ranks, the more profoundly ought he to represent the depths of heart and mind" Hegel's Introduction to Fine Arts, translated by Bosanquet.

† "It is to the very inwardness of life that intuition leads us." "The intention of life, the simple movement that runs through the lines, that binds them together and gives them significance escapes it (i, e, our eye or Intellect). This intention is just what the artist tries to regain, in placing himself back within the object by a kind of sympathy in breaking down by an effort of intuition, the barrier that space puts up between him and his model" Bergson's Creative Evolution.

আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা মানুষকে সর্ব্বদাই শিল্পসৃষ্টিতে নিয়োজিত করে এবং স্থূল বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। বহিঃপ্রকাশ লইয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আলোকচিত্র লইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইবার পর চিত্রশিল্পের কোনও সার্থকতা থাকিত না এবং সাহিত্য আমাদের নিকট শুধু কল্পনার খেলা, অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইত, মনোবিজ্ঞান ও সমাজনীতি পাঠ শেষ করিয়া সেক্ষ-পিয়রের নাটক পড়িবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতাম না কিম্বা ছায়াবাজী পুতুলের নাচ দেখিয়া যেমন আমোদ উপভোগ করি, সেইরূপ একটী ক্ষণিক মোহের তাড়নায় সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইতাম; এবং তাহা হইলে আজ রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পূজিত হইত না। ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও গভীরতম সত্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই, ইহার মিথ্যা কল্পনাও বাস্তব জীবনের সত্যের চেয়ে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও মূল্যবান, —অতীত ভারতের সমস্ত ইতিহাস বিলুপ্ত হইলেও প্রাচীন ভারতের আত্মা চিরকালের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল এই মানবজীবনের প্রকৃত বাস্তবতা অন্তরের মাঝেই মিলিতে পারে এবং বাহিরের বাস্তবতাও সেইখানে গেলে নিত্য বস্তুতে পরিণত হয় নতুবা শুধু বহিঃপ্রকাশ লইয়া আমাদের কোনও তৃপ্তি নাই।

এমন কি বাহ্যপ্রকৃতিকেও,—বাস্তবকেও,—জ্ঞানের দ্বারা বর্ণিত দিয়া আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না,—প্রত্যেক জিনিষকে বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ডিত করিয়া ফেলি; তাহার নিজের সত্তা হারাইয়া তাহার গুণগুলিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাহিত্যিক এইরূপ জ্ঞানসৃষ্ট জগতের সহিত প্রাণের সম্পর্ক পাতাইতে চান,—প্রত্যেক জিনিষের বিশিষ্টতা ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। শিল্পসৃষ্টি একদিকে যেমন বহির্জগতের বাস্তবতাকে অধ্যাত্মসত্তায় মিশাইয়া বাহ্য দ্রব্যের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই বহিঃপ্রকৃতির এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। যিনি শিল্পী তিনি তাঁহার বিষয়ের সহিত অভেদাত্মবোধ করেন বলিয়া বিষয়টীকে সমগ্রভাবে দেখিতে পারেন, ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া গুণরাশিতে পর্য্যবসিত হয় না*। আমরা যাহাকে বাস্তব বলি,

* "One must transport one's self by an effort of sympathy to the interior of that which becomes" Bergson "The intelligence aims at the universal, the law, the thought and notion of the object * * * It

অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা যাহা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ব্যক্ত, শিল্পী তাঁহার একপ্রাণতা লইয়া তাহার ভিতরের স্বরূপটী, অন্তরের স্পন্দন,— তাহার মধ্যে সৃষ্টির যে একত্ব ও বিশিষ্টতা দীপ্যমান, সেইটাকে অনুভব করিবার চেষ্টা করেন, অনুভূতির সাহায্যে প্রত্যেক জিনিষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। পদার্থের এই যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য—ইহাকে জ্ঞানে স্ফুট করা যায় না। এবং অন্যদিকে শিল্পসৃষ্টিতে অধ্যাত্মসত্তার রূপে যে অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—ইহাও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত জ্ঞানের দ্বারা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য শিল্পী অথবা সাহিত্যিক মুখ্যতঃ জ্ঞানের কথা বলেন না,—তিনি তাঁহার অনুভূতির গভীরতা সৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলেন;—এবং সমালোচক ও পাঠক তাহাদের রুচির বিভিন্নতা অনুসারে অনুভূতিমূলক এই অখণ্ড সৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জ্ঞানলব্ধ সত্যে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে।*

সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে এমন কি প্রাত্যহিক জীবনে এই অনুভূতি যে কতরূপেই প্রকাশ পাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বালকের ক্রীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম শিল্পসৃষ্টিতে জ্ঞানের চেয়ে অনুভূতিই বিশেষভাবে বিদ্যমান। সৃষ্টির উদারতা, তাহার প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, যখন মানব-হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাহাকে উর্দ্ধে টানিয়া লয়,—কোন অজ্ঞাত মহত্ত্বের সূচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে,—তখন সেই ভাব কত ধর্ম্মে, কত সাহিত্যে, কত সঙ্গীতে, কত দেবালয়ের ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে যে নিজেকে ব্যক্ত করে কে বলিতে পারে? মানুষ মানুষের সঙ্গে চিরকালই মিশিতেছে, প্রীতি ও ও প্রেমের সূত্রে পরস্পরকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে—দেনা পাওনা, আনাগোনা মেলামেশার অন্ত নাই,—কিন্তু মনুষ্য-চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য ত সরল হইয়া উঠে না, একটী চরিত্রও কেন আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না? শিল্পী যখন তাঁহার একপ্রাণতা লইয়া মানুষের দিকে তাকান,—অনুভূতির দ্বারা তাহাকে ধরিয়া ফেলেন,—তখনই সে সজীব, মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে, সৃষ্টির বিশিষ্টতা

transforms it within the mind, making a concrete object of sense into an abstract matter of thought and so into something quite other than the same object." Hegel.

* "Nor is it a scientific productive process which passes from sense to abstract ideas or thoughts; rather the spiritual and the sensuous side must in artistic production be as one" Hegel's Aesthetiks.

তাহাতে প্রকাশ পায়,—শিল্পীর প্রাণের বেগ তাহার চরিত্রের বিভিন্ন প্রকাশকে সংযুক্ত করিয়া ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। ইংরাজ-কবি সেক্সপিয়র এমনই করিয়া তাঁহার সৃষ্টচরিত্রের মধ্যে নিজেকে লোপ করিয়া দিয়াছেন যে আজ তাঁহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনেকের চক্ষেই পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, যে শস্যশ্যামল কোমলতা, প্রাণের যে অপার তৃপ্তি, ভোগের যে বিপুল বিরতি, শিক্ষার যে গূঢ় তত্ত্ব লুকায়িত ছিল তাহা ধরা পড়িল যখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রাণের সুর মিলাইতে পারিলেন। কবির কথা প্রকৃতির ভাষা হইয়া দাঁড়াইল।

এমনই করিয়া শিল্পীর চক্ষে জগৎ নূতন করিয়া সৃষ্ট হইতেছে,—এবং বাস্তব সত্তাকে অন্তরের আলোকে গভীরতর বাস্তবে পরিণত করিতেছে। ইহাকে জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেই তাহার সবটুকু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক, যে জ্ঞানের ভিতর কোনও রন্ধ্র নাই,—কার্য্যকারণ পরম্পরার নিগূঢ় বন্ধনে যাহা আবদ্ধ,—যাহার কোথাও কোনও ফাঁক দেখিতে পাই না,—অনুভূতি যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না,—ভাব ও কল্পনার লীলাভূমি হইতে যাহা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত,—সেইরূপ জ্ঞানের সহিত শিল্প বা সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর নহে।* হাজার চেষ্টা করিলেও কেহ অঙ্কশাস্ত্রকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করিতে পারিবেন না এবং অন্যান্য শাস্ত্র যতই অঙ্কশাস্ত্রের সান্নিধ্যে গমন করে, যতই জ্ঞানে স্ফুট হইয়া উঠে ততই সাহিত্য হইতে দূরে পড়িয়া যায়। সুখের বিষয় এই যে আমাদের সমস্ত অধ্যাত্মসত্তা অঙ্কে, বৈজ্ঞানিক সত্যে, পরিণত হইতে এখনও বহু দেরী,—যে দিন তাহা হইবে, সে দিন মানুষ শুধু নির্ব্বিকার জ্ঞান,—ভুলভ্রান্তিহীন, রাগমোহ-বিবর্জ্জিত কলের পুতুল, হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ একটী আদর্শ আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যে ক্রমশঃই স্থান পাইতেছে এবং বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে চাহিতেছে।

* Bergson's Introduction to Metaphysics. "What is true of Mathematics is true also of every study, so far forth as it is scientific, it makes use of words as mere vehicle of things, and is thereby withdrawn from the province of Literature. Thus Metaphysics, Ethics, Law, Political Economy, Chemistry, Theology cease to be literature in the same degree as they are capable of a severe scientific treatment" Newman's Address on Literature.

কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য কেবল জ্ঞানের উপর রঙ ফলান নহে। মনের সহজ অনুভূতি হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি ;—সেক্সপিয়র যে বেকন্ অপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন,—এ কথা বলা যায় না অথবা এস্‌কাইলসে আরিষ্টটলের পাণ্ডিত্য আরোপ করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না ; কারণ তাঁহারা অনুভূতির গভীরতা দিয়াই,—অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে—সাহিত্য রচনা করিয়াছেন ;—জ্ঞানের কথা তাঁহারা বলেন নাই—প্রাণের ভাষা ব্যক্ত করিয়াছেন।* প্রতিভার একটী অব্যাখ্যাত রশ্মি সহসা বিচ্ছুরিত হইয়া প্রত্যেক সত্তাকে শিল্পীর সত্তায় পরিণত করে, এবং তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলে। কেমন করিয়া যে বিষয়ের সহিত এই সমপ্রাণতা স্থাপিত হয় তাহা বলা যায় না,—প্রতিভার অজ্ঞাত রহস্য বলিয়াই তাহাকে মানিয়া লইতে হয়।

জ্ঞান দিয়া ধরিলে সাহিত্যকে ঠিক বুঝা যায় না, কারণ জ্ঞান বিশ্লেষণমূলক। নীতিবাদী পণ্ডিতের পথ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সাহিত্য বুঝিতে চান, তাঁহাদিগকে শুষ্ক তর্কের মধ্যেই থাকিয়া যাইতে হয়। নৈয়ায়িক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের বাহিরের কথা, তাহার জ্ঞানের ভিত্তি, বলিয়া দিতে পারেন ; কিন্তু যে সরসতা যে সূক্ষ্ম অনুভূতি তাহাতে প্রাণসঞ্চার করে, তাহার ধার তাঁহারা ধারেন না। কোনও কিছু বুঝিতে হইলে যে জ্ঞানের বাহিরে যাওয়া আবশ্যক হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের বিচারে সত্যাসত্য, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়—সমস্তই বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। "সোণার তরীর" আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি ? অর্থাৎ ঐ কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ কোন্ আধ্যাত্মিক তত্ত্বটী

* "A poet is the most unpoetical of any thing in existence, because he has no identity ; he is continually in for, and filling, some other body". Keats's Letter to Woodhouse. "There are two modes of the apprehension of reality. The one way is the way of the understanding, the way of science. The other is intuition, insight, sympathy—the way of art" Wildon Carr's Philosophy of Change. "The specific genius of a poet does not lie in reflection but in imagination. Poetry is not the expression of ideas or of a view of life ; it is their discovery or creation, or rather both discovery and creation in one Shakespeare's imagination gradually discovered or created in his stories a meaning and a mass of truth about life, which was brought to birth by the process of composition, but never preceded it in the shape of ideas, and probably never, even after it, took that shape to the poet's mind" Bradley's Oxford Lectures

রূপকের সাজে সাজাইয়াছেন, ইহার বিচার সাহিত্য হিসাবে তেমন সমীচীন নহে। কারণ যদি কোনও কবিতা লিখিবার সময় কবির মনে কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অথবা সত্য স্ফুট হইয়া উঠে,—তাহা হইলে শিল্পসৃষ্টিতে ভাব ও রূপের যে অখণ্ড মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই* তাহার মধ্যে যেন একটা ব্যবচ্ছেদ আসিয়া পড়ে,—রূপকে আর ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না, একটীর সহিত আর একটীর প্রাণের সম্পর্ক থাকে না,—রূপ ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়;—সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য এইরূপ কবিতাতে থাকিতে পারে না। কবি তাঁহার সমস্ত অধ্যাত্মসত্তা লইয়া, প্রাণ দিয়া, বর্ষার একটী বিশেষ চিত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন, তখন যে সুপ্ত চেতনা, যে অনুভূতির গভীরতা তাঁহাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল, হৃদয়ের যে অব্যক্ত বেদনা, জীবনের যে ব্যর্থ সাধনা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল, হঠাৎ কোন মুহূর্ত্তে বাহিরের একটী চিত্রের সংস্পর্শে কেমন করিয়া যে তাহারা মূর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—কবি নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই; এবং সেই জন্য শুধু ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়া নহে,—এমন কি প্রাকৃতিক কোনও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াও নহে,—কিন্তু অনুভূতি দিয়া, কবির সুরের সহিত সুর মিলাইয়া—"সোণার তরী" বুঝিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস যদি গীতার ব্যাখ্যা অথবা নৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য নিতান্তই অল্প হইয়া যায়। মানব-চরিত্রকে গুণের সমষ্টি করিয়া দেখা সাহিত্য সৃষ্টি নহে,—ভিতর হইতে বাহিরে চরিত্রের স্ফুরণ, অনুভূতি দিয়া চরিত্রের গতি-নির্দ্ধারণই সাহিত্যের অঙ্গ। বাস্তবিক, সাহিত্যিক গুণের চেয়ে জিনিষের সত্তাকেই বিশেষ করিয়া ধরিতে,—প্রত্যেক বিষয়ই সমগ্রভাবে দেখিতে চেষ্টা করেন; কাজে কাজেই তাঁহার দৃষ্টিতে পাপের পঙ্কিলতার মধ্যেও স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা লক্ষিত হইতে পারে। সামাজিক অথবা নৈতিক মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায় মাপিয়া লওয়ার

* "It would be possible in poetical creation to try and proceed by first apprehending the theme to be treated as a prosaic thought, and by then putting it into pictorial ideas, and into rhyme, and so forth; so that the pictorial element would simply be hung upon the abstract reflections as an ornament or decoration. Such a process could only produce bad poetry for in it there would be operative as two separate activities that which in artistic production has its right place only as undivided unity." Hegel

চেষ্টা বৃথা, কারণ ঐগুলি সাহিত্যিকের নিকট পৃথক্ ভাবে উপলব্ধ হয় না, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া বিকাশের মধ্য দিয়া সৃষ্টির একত্ব সম্পাদন করে, আর সমাজ নিজের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে-এগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিতে বসে।

সাহিত্যিক কোনও "নৈতিক সমস্যা" পূরণ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি মানুষকে তাহার লৌকিক ধর্ম্ম ও নীতির চেয়ে বড় করিয়া দেখেন, তাহার স্বভাবের প্রকাশের চেয়ে তাহার স্বভাবকেই বেশী করিয়া মানেন। তিনি জানেন যে জিনিষের প্রকৃত সত্তা, তাহার সমগ্রের একটা অনুভূতি ছাড়া শুধু বহিঃপ্রকাশে ধরা পড়ে না। মনুষ্য-চরিত্রের গুণাবলী একত্রিত করিয়া এবং কর্ম্মজীবনের একটা সম্পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াও মানুষকে পাওয়া যায় না। সাহিত্যে শিল্পীর অধ্যাত্মসত্তা অনুভূতিলব্ধ স্বভাবসৃষ্ট মনুষ্যের মধ্য দিয়াই মুখ্যতঃ প্রকাশ লাভ করে। সৃষ্টির মহত্বই এই যে শত অপূর্ণতা, দোষ ও অন্ধকার স্বচ্ছন্দে ধারণ করিয়া সে নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তাহার অপূর্ণতা তখনই বুঝিতে পারি, যখন তাহাকে সমগ্র হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখি। সৃষ্টির অর্থাৎ বিকাশের দিক হইতে দেখিলে ধুতুরার ফুলও যেমন সম্পূর্ণ, গোলাপও তেমনই সম্পূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া ধুতুরার বাহিরের সৌন্দর্য্য গোলাপের মত নহে। উভয়েতেই যে শক্তিগুলি সমন্বিত হইয়া বিকাশ ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের এই বিকাশের ধারাতে কোনও অসম্পূর্ণতা আসিতে পারে না—কারণ যে পরিণতির সমাপ্তি ইহাতে দেখিতে পাই তাহার পক্ষে আর অন্য কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য সাহিত্য-সৃষ্টিতে জর্ম্মান কবি গ্যয়টে প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা আরোপিত করিয়াছেন। সেক্সপিয়রের ওথেলো-চরিত্র যেমন অমোঘসূত্রে গ্রথিত আয়াগো চরিত্রও তদ্রূপ। অন্তরের সম্পূর্ণতা উভয়েরই আছে। আদর্শ দিয়া বিচার, বাহির হইতে বিচার—এইরূপ বিচারে সাহিত্যকে সব সময়ে ঠিক বুঝা যায় না। শিল্প সৃষ্টি মাত্রেই যে সম্পূর্ণতা আছে বাহির হইতে দেখিলে, শুধু জ্ঞানের সাহায্যে—তাহার সম্যক উপলব্ধি না হইতে পারে, কারণ ভিতর হইতে দেখিয়া, বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়া ইহাকে বুঝিতে হয়। পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সাহিত্যে নাও থাকিতে পারে কিন্তু এই অন্তরের সম্পূর্ণতা, সাহিত্য যদি শিল্পসৃষ্টি হয়, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে। সেক্সপিয়রের সাইলক-চরিত্র যখন খৃষ্টীয় সমাজের সম্পর্কে বিচার করিতে বসি তখন তাহা অসম্পূর্ণ, পাপদুষ্ট ও ঘৃণ্য বলিয়া বোধ হয়। আবার

যখন সেই চরিত্রকে ভিতর হইতে দেখি, শিল্পীর একপ্রাণতা লইয়া চরিত্রের গতিটী নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করি ;—শত শতাব্দীর অত্যাচার পুঞ্জীভূত হইয়া কিরূপে যে ন্যায়-ও আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহাকে যদি মূর্ত্ত করিয়া দেখিতে চাই,—তখন সেই চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি ধরা পড়ে এবং এক অজানিত মহত্ত্বে সে চরিত্র ভরিয়া উঠে,—তখন তাহা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ। ভিতর হইতে দেখিলে রোহিণী-চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ইহা নহে যে সে অসতী হইয়াছিল, কিন্তু যখন রোহিণী তাহার সুখ-লালসার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়া গোবিন্দলালের নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিল, তখন দেখিলাম তাহাকে হত্যা করিবার বহুপূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আত্মাকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার দেহের মৃত্যু তেমন ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হইল না। রোহিণী-চরিত্রের এই অসম্পূর্ণতায়, তাহার অন্তরের এই দৈন্যে কোনও অবশ্যম্ভাবিতা দেখি না, কারণ তাহার চরিত্রের বিকাশ দেখিয়া এরূপ অনুভব করিতে পারি না, যে, ইহা ছাড়া আর কিছু হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সামাজিক হিসাবে ধরিলে, নীতির মানদণ্ডে মাপিয়া লইতে গেলে, কপালকুণ্ডলা চরিত্র অসম্পূর্ণ,—নারীত্বের অর্দ্ধবিকাশ,—কিন্তু যখন বাহিরের সমস্ত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অন্তরের মহিমাটুকু, তাহার স্বভাবের পরিণতি অনুভব করিবার চেষ্টা করি, তখন সে চরিত্রের সম্পূর্ণতা উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই একটা সম্পূর্ণতা, একটা বিকাশের পরিণতি দৃষ্ট হয়,—তাহা হইতে কিছু বাদ দিলে অথবা তাহাতে কিছু যোগ করিলে তাহার প্রকৃতিই ভিন্ন হইয়া যায় ; সে তাহার সমগ্র সত্তা লইয়া, স্বপ্রকৃতির অনুগামী হইয়া যে সঙ্গতিতে ও সামঞ্জস্যে ফুটিয়া উঠে, তাহাকে তাহার নিজের দিক হইতে বিচার করা চলে না, এবং সাহিত্যিক তাহার সহানুভূতিমূলক কল্পনা দিয়া সেই বিকাশের সৌন্দর্য্যটীকেই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, ন্যায়ের আসনে বসিয়া তাহাকে বিচার করিতে চান না,—জীবনের সুবিধা অসুবিধার দ্বারা তাহাকে খর্ব্ব করেন না। বহুবিধ শক্তি একত্রিত হইয়া যে বিকাশের সমন্বয় সাধিত করে এবং যে একত্বে ও বৈশিষ্ট্যে পরিণতিলাভ করে তাহাকেই সৃষ্টি বলিতে পারি এবং দেখিতে গেলে যেখানে সৃষ্টি সেখানেই সৌন্দর্য্য, তাহা অন্তর্জগতেই হউক আর বহির্জগতেই হউক। সৌন্দর্য্যের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না,—যাহা সুন্দর তাহা সুন্দর ইহা ছাড়া আর কিছু বলা উচিত নহে,—তবে এইমাত্র বলিতে হয় যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি আছে এবং সৃষ্টির মূল ভাবটীও

তাহাই।* বিজ্ঞান সৃষ্টির এই সঙ্গতি জ্ঞানে স্ফুট করিতে চায়, শিল্পী বা সাহিত্যিক ইহাকে রূপে অভিব্যক্তিপ্রদান করিয়া ভাবের উদ্রেক করে। এই অর্থে সত্য ও সৌন্দর্য্য এক। শকুন্তলা-চরিত্র একটী সৃষ্টি,—অর্থাৎ অন্তরের সহিত বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাত,—কিম্বা কতকগুলি বিশেষ শক্তির সমন্বয়ে চরিত্রের যে ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য পরিণতিলাভ করিয়াছে তাহা যেমন আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া সৌন্দর্য্যবোধ জাগাইয়া দেয়; আর একদিকে শকুন্তলা নাটকও তেমনই সৃষ্টি কারণ এখানেও ঠিক্ সেই একই প্রকারে ভাবের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমালোচক বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া এই শক্তিগুলিকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে গুণে পরিণত করিয়া আড়ষ্ট করিয়া ফেলেন। সাহিত্যিক ভিতর হইতে শক্তির এই লীলাভিনয় অনুভব করিয়া বাহিরে সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি স্বরূপ তাহাকে উপলব্ধি করেন। সেই জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাণের যে স্ফূর্ত্তি আছে,—সৃষ্টির যে আনন্দ ইহাতে সদা সাহিত্য প্রবাহিত,—তাহা অনুভূতি ছাড়া সমালোচনায় ঠিক ধরা যায় না।

সৃষ্টির এই অন্তর-মাধুর্য্য সহসা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না; কারণ-অভ্যাসের জড়তা ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। শিল্পীর মুক্ত আত্মা যতই এগুলি কাটাইয়া সৃষ্টির রহস্য অনুভব করিতে পারে, সাহিত্য ততই সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে। জীবনের সামান্য সামান্য দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে অথবা বাহ্য-প্রকৃতির অতি তুচ্ছ প্রকাশের ভিতর যে কত ভাব ও সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের নিকট প্রতিভাত হইত না, যদি শিল্পীর অনুভূতি আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া না দিত। সাহিত্য এইরূপে মুক্তির স্বাদ বহিয়া আনে,—মনুষ্য-চেতনা মুক্ত করিয়া, প্রসারিত করিয়া দেয়। বৈদিক ঋষিরা প্রভাতের সূর্য্যোদয়ে, উষার অরুণ আলোকে যে মহৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন,—তাহা আমাদের জীবনের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে, সেই বিস্ময় ও আনন্দ আমাদের প্রাণে জাগে নাই; তাহার মধ্যে কোনও অপরূপত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কখন্ কোন্ জিনিষ যে কেমন করিয়া আমাদের দৃষ্টিতে অভিনব ও অপরূপ হইয়া উঠে আমরা বলিতে পারি না। যখনই কোনও বিকাশের ধারা শক্তির সমন্বয়, বা প্রাণের বেগ আমাদের অনুভূতির মধ্যে আইসে, তখনই যেন সমস্ত তুচ্ছতা অপসারিত

---

* Balfour's Address on the Beautiful. "Reality is a perpetual growth, a creation pursued without end." Bergson.

হইয়া ভাবের প্রস্রবণ খুলিয়া যায় এবং অতিসাধারণ ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেও একটা নূতনত্ব দেখিতে পাই, তাহাদিগকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ্‌ ও রবীন্দ্রনাথের সামান্য বিষয়ের রচনাতেও যে অভিনবত্ব দেখা যায়, তাহার ইহাই কারণ; এবং সেই একই কারণে সেক্ষপিয়রের অতিতুচ্ছ চরিত্র-গুলির মধ্যেও প্রায়শঃই সৃষ্টির অপরূপত্ব লক্ষিত হয়।

বাস্তবিক, ভিতর হইতে যাহা সুন্দর, বাহির হইতে দেখিলে তাহাকে সব সময়েই সুন্দর বলা যায় না। অন্তর্দৃষ্টির অভাবে, অনুভূতি ছিল না বলিয়া, মেকলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই—এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই সাধারণ পাঠকের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সৃষ্টি যখন কোনও সত্তাকে বাহিরে স্ফুট করিয়া তুলে, তখন তাহার ভিতরকার সঙ্গতি বাহিরের বৃহত্তর সামঞ্জস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে। প্রকাশের সৌন্দর্য্য রূপে ও বর্ণে, বিকাশের মাধুর্য্য প্রাণের স্ফুরণে,—সংযত একটা গতির ক্রমিক আভাসে। প্রকাশের দিক, বাহিরের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য এতই সহজে চক্ষে পড়ে যে শিল্পীর অনুভূতির সাহায্য ব্যতিরেকে বিকাশের দিক্‌টা আমরা ধরিতেই পারি না। আমাদের উদ্যান পুষ্পের বিচিত্র বর্ণসম্ভারে যে ফুলটী একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে, তাহার নিজের ভিতরেও যে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হিল্লোলিত, সে দিকে আমরা একবার তাকাইয়াও দেখিনা। মানুষকেও তেমনই পারিবারিক, সামাজিক, অথবা অন্য কোনও বৃহত্তর সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখি,—সেই জন্য তাঁহার চরিত্রের ভিতরের সঙ্গতি, বিকাশ-মাধুর্য্য, আমাদের নিকট সম্যক্‌ লক্ষিত হয় না। আদর্শের পূর্ণতার মধ্য দিয়া চরিত্রের প্রকাশ, আর আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ভিতর হইতে চরিত্রটী ফুটাইয়া তুলা—এ উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এবং একই সাহিত্যিক উভয় প্রকারেই যে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার কোনও মানে নাই,—কিন্তু ভিতরের এই সঙ্গতি, সৃষ্টির রহস্য, সাহিত্যে যত কম থাকে, ততই শিল্প হিসাবে তাহার মূল্য কমিয়া যায়। সুন্দর অসুন্দর, সুশ্রী কুশ্রী,—এইরূপভাবে জগৎকে বিভক্ত করিয়া লইতে পারেন তিনি,—যাঁহাতে অনুভূতির সম্পূর্ণতা আছে;—যিনি শুধু প্রকাশের মধ্যে নহে, বিকাশের দিক হইতেও সমস্ত পদার্থকে দেখিতে পারিয়াছেন। এই জন্য আদর্শের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্যের পরিমাপক নহে, এবং আদর্শ হিসাবে নিম্নতর চরিত্রেও সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই,—সাহিত্যেও যেমন, অন্যান্য শিল্পেও তেমন। মহা-

প্রাণ সক্রেটিস্ নাকি দেখিতে অতি কদাকার ছিলেন,—কিন্তু প্লেটোর কাহিনীতে তাঁহার যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, যদি কোনও চিত্রকর তাঁহার চিত্রে অন্তরের সেই মাধুর্য্যটী কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিফলিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে চিত্র-শিল্পের সার্থকতা কোথায় ?

বাহিরটা আমাদের নিকট এতই স্পষ্ট যে কোনও পদার্থকে তাহার বাহিরের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমরা স্বতঃই ব্যষ্টির উপলব্ধি সমষ্টির মধ্য দিয়া পাইয়া থাকি। সেইজন্য সাহিত্যে দুই প্রকার সৌন্দর্য্যানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়—সমষ্টির আর ব্যষ্টির, প্রকাশের আর বিকাশের। পারিবারিক জীবনের সামঞ্জস্যের মধ্যে কর্ম্মের যে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়,—তাহা পাই রামায়ণে,—বিরহ-বেদনার অন্তরগূঢ় তাড়নায় ভাব-বিকাশের যে মাধুর্য্য তাহা পাই মেঘদূতে। সাহিত্য একদিকে পরিবারে, সমাজে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে যে বহুবিধ শক্তির একত্র সমাবেশ তাহাদিগকে সৃষ্টির ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্তি দিতে চাহিয়াছে, আর একদিকে ব্যষ্টির বিকাশের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া সমষ্টির সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার সংযোগ স্থাপন করিতে চাহিতেছে। এই সমাবেশের মাধুর্য্য যেমন সহজেই আমাদের চক্ষে পড়ে, বিকাশের মাধুর্য্য তেমন সহজে ধরা পড়ে না,—কারণ একটীতে আমাদের যে সৌন্দর্য্যানুভূতি হয় তাহার ভিত্তি অনেকটা জ্ঞানের উপর,—অর্থাৎ আদর্শের স্থৈর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে। আর একটীতে ঐ সৌন্দর্য্য মুখ্যতঃ অনুভূতিমূলক,—ভাবের বিকাশে ও প্রাণের লীলার মধুর স্ফুরণে।

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে অনুভূতি ছিল না, এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ অনুভূতি ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না এবং ইহাও সত্য যে প্রাচীন সাহিত্য সর্ব্বত্র একই প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। কিন্তু মোটের উপর এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় যে প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞানের সহিত অনুভূতির একটী সামঞ্জস্য ছিল, এবং উভয়ের মধ্যে এই সঙ্গতি স্থিতিমান সমাজে যতটা সম্ভব গতিমান সমাজে ততটা সম্ভবপর নহে। সমাজের রূপ যেখানে শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আদর্শের স্থিরতা সেখানে আসিতে পারে না ; যেখানে প্রাণের গতি মুক্ত হইয়াছে, সেখানে ব্যষ্টিকে সমষ্টির গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা চলে না। আমাদের দেশে কিম্বা পুরাতন গ্রীস ও রোমে, সমাজের ধর্ম্মের অথবা রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে বিযুক্ত করিয়া ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি তেমন হয় নাই। মানুষকে তাহারা ঠিক মানুষভাবে বুঝিতে ততটা চেষ্টা করে

নাই যতটা একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের কুক্ষিগত করিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছে ;—মনুষ্যত্বের বিকাশ সমাজ ধর্ম্ম কিম্বা রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংহৃত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ সমাজে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির দ্বন্দ্ব রূঢ় হইয়া উঠে না;—সর্ব্বত্রই একটা শান্ত সংযত ভাব, বিরোধের একটা সমন্বয়, পরিণতির একটা বিপুল তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে ভাবের আতিশয্য, কল্পনার প্রাবল্য অথবা আবেগের বিহ্বলতা প্রায়শঃই নাই—তাহাতে ত্যাগের মধ্যে শান্তি, বৈরাগ্যের মধ্যে ভোগ। এ সাহিত্য সৃষ্টির অপরূপত্ব তত দেখে নাই, যেমন দেখিয়াছে সুশৃঙ্খলার সৌন্দর্য্য ; বিকাশের ধারা লক্ষ্য না করিয়া প্রকাশের দিক্‌টা স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছে ; সমাজের গতির বেগ সংযত করিয়া, স্থিতিকেই স্থায়িত্ব দিতে চাহিয়াছে। তখনকার সাহিত্যে অনুভূতি প্রাধান্যলাভ করে নাই কারণ যে বিকাশের ধারা আমরা এখন আমাদের জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি, তাহা তখনও সম্যক দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যেদিন হইতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ আরব্ধ হইয়াছে, সেদিন হইতেই সাহিত্যের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়াছে। ইংলণ্ডে অনুভূতিমূলক সাহিত্যের আরম্ভ জ্ঞানের নবযুগে, এবং ইহার বৃদ্ধি ব্যক্তিত্বের প্রসারের সহিত,—সেইকালে যখন এক অদম্য স্ফূর্ত্তি ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে সহস্রধা বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সে ইহার আরম্ভ ফরাসী বিপ্লবের সময় এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা রুসো—যিনিই প্রথম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন। আমাদের দেশে অনুভূতিমূলক সাহিত্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এখনও হয় নাই তবে বঙ্গ সাহিত্যের গতি যে, এইদিকে একটু অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রাণের আবেগে মানুষ যখন সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহির হয়,—পরম্পরাগত সংস্কার হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া ফেলে, তখন তাহার সাহিত্যে সংযম ও শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। সে নিজের ভিতর যে অবারিত গতি অনুভব করে, যে বিকাশের মাধুর্য্য তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহা অনুভূতি ছাড়া ধরা যায় না। এই উদ্বেলতা, মানসিক ঔৎসুক্যের এই চাঞ্চল্য আপনিই তাহাকে ভাব ও কল্পনার আতিশয্যে লইয়া যায় এবং সৃষ্টির অপরূপত্ব তাহার চক্ষে ফুটাইয়া তুলে।

প্রাচীন সাহিত্য যাহা চাহিয়াছিল তাহা অনেকটা পাইয়াছে, আধুনিক সাহিত্য যাহা চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না। প্রাচীন সাহিত্য ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির একটা সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে পারিয়াছিল, আমরা ব্যষ্টির বিকাশ-মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া তাহার সহিত সমষ্টির সমাবেশ-মাধুর্য্য সংযুক্ত করিতে

চাহিতেছি ; ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্ফুটতর করিয়া এক মহাসাম্যের সন্ধানে ফিরিতেছি, আমাদের একদিকে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ আর একদিকে রাষ্ট্রের বন্ধন ; একদিকে জাতীয় স্বাধীনতা আর একদিকে জগৎব্যাপ্ত শান্তি ; - জীবনের প্রত্যেক চেষ্টার ভিতর এইরূপ একটা নিগূঢ় দ্বন্দ্বে আমাদের সমস্ত কর্ম্মই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে,—আমাদিগের কোনও দিকেই স্থিতি নাই, কেবল গতির আভাস। যে ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে তাহার সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানব সমাজ ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে,—চারিদিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া কিছুতেই যেন বৃহত্তর সাম্য স্থাপিত করিতে. পারিতেছে না,—বৈষম্যকে কেন্দ্র করিয়া সাম্যের জন্ত খুঁজিয়া মরিতেছে। এই সময়ের সাহিত্য স্বভাবতঃই অনুভূতি-মূলক হইবে, ইহাতে কর্ম্মের সম্পূর্ণতা, বৃহত্তর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য অর্থাৎ সমষ্টির সমাবেশ-মাধুর্য্য কিম্বা আদর্শের স্থৈর্য্য তেমন থাকিতে পারেনা, যেমন ইহাতে পাই বিকাশের সৌন্দর্য্য, অন্তরের সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতা অর্থাৎ সৃষ্টির অপরূপত্ব বা অনির্ব্বচনীয়তা। এইরূপ সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে, ইহাকে বাহির হইতে দেখিলে চলিবে না ;—ইহার কথা জ্ঞানে ঠিক্ স্ফুট করা যায় না ; অনুভূতির সাহায্যে ইহার অন্তরের বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে ও সমালোচনায় তেমন জটিলতা নাই ; অনুভূতিমূলক সাহিত্যের গূঢ় তাৎপর্য্য, সমালোচনার পর সমালোচনা বাড়িয়া গেলেও, হৃদয়ঙ্গম হইতে চাহে না। প্রাচীন সাহিত্যের শুদ্ধ শান্ত ভাব, সেই নির্ম্মল সংযত মাধুর্য্য, যেন শরতের জলহারা মেঘের শুভ্রহংসগতি,—এ সাহিত্য হইতে পাইবার চেষ্টা বৃথা :—ইহা হৃদয়ের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া বর্ষার জলদ-গম্ভীর স্বরে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলে,—ইহাতে কল্পনার কি প্রাবল্য, ভাবের কি উন্মাদনা ; সমস্ত বন্ধন টুটিয়া, সমাজ ও ধর্ম্মের আবরণ উন্মোচন করিয়া মত্ত ঝটিকার মত মনুষ্য-হৃদয়ের নগ্ন সৌন্দর্য্য ইহা প্রকাশ করিতে চায়,—প্রকৃতির গূঢ় কথা, মৌন সংবাদ,—ইহা কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করে,—সকলের অনাদৃতকে আদরে অন্তরে তুলিয়া লয়—এইরূপে মানসিক ঔৎসুক্যের তাড়নায়, আবেগের উচ্ছ্বাসে জীবনের কন্দরে কন্দরে ঘুরিয়া সম্পূর্ণতার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজেকে ক্ষয়িত করিয়া ফেলে,—ইহাতে নিবৃত্তি নাই, শান্তি নাই,—আছে কেবল প্রাণের অবারিত গতি, মুক্তির আনন্দ· বিকাশের সার্থকতা।

সাহিত্য সৃষ্টিতে অন্তরের· যে সম্পূর্ণতা দেখা যায়, বাহিরের আঘাতে—অবস্থার বিপর্য্যয়ে—তাহা খর্ব্ব হইতে পারে না'। সাহিত্যের জয় পরাজয়,

সার্থকতা অসার্থকতা - কর্ম্মের কষ্টিপাথরে কষিয়া লওয়া যায় না। সংসারের ব্যর্থতা সাহিত্যের সার্থকতায় পরিণত হইতে পারে,- এখানে যাহা অবজ্ঞাত, সাহিত্যে তাহা আদৃত। যে পূর্ণতা সাহিত্যে প্রাণলাভ করে তাহা আমাদের সকলের মধ্যেই নিহিত আছে। সাহিত্যিক অন্তরের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, বাহিরের জয়-নিনাদে তাঁহার বিজয়-বার্ত্তা ঘোষিত হয় না। মহাত্মা যীশু যেদিন কণ্টকের মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, দুঃখ ও অপমানকে জীবনের সর্ব্বোত্তম রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার রুধির প্লাবিত মুখের দিকে তাকাইয়া, পদদলিত ধর্ম্মের সেই পরাজয় দেখিয়া,- কে মনে করিয়াছিল যে এক অপরূপ গৌরবে ধর্ম্ম মণ্ডিত হইয়া চিরকালের জন্য নরনারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল? কডেলিয়া যেদিন পিতৃভক্তি ও প্রেমে প্রণোদিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন, সেদিন আমাদের মনে হইতে পারে যে তাহার সমস্ত জীবনই বৃথা হইয়া গেল। কারাগৃহে বৃদ্ধ লিয়রের হৃদয়-জ্বালার অসম্বদ্ধ প্রলাপ চারিদিকে নৃশংসতার অট্টহাস—সেই গভীর দুঃখ ও শোকের মধ্যে সান্ত্বনার কিছু পাওয়া যায় না,—মনে হয় এ সংসার যেন শয়তানের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু কেমন করিয়া যে হৃদয়ের এই দৈন্য কাটিয়া যায় বলিতে পারি না:- শোকের সেই প্রলয় ঝঞ্ঝা সমস্ত হৃদয়াকাশ নির্ম্মল করিয়া যে প্রেম-জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলে তাহা স্বর্গে হইলেও মর্ত্ত্যের। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেমের সার্থকতা প্রেমে, যে পুণ্যের এমন একটী অজেয় শক্তি আছে যে পরাজয়ে ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না,—পাপের মলিনতা ইহাকে ম্লান করে না,—ইহা নিজের গৌরবেই নিজে মহিমান্বিত। আবার যে দিন ভ্রমর দীর্ঘ বিরহের অবসানে মৃত্যুর মিলনপ্রতীক্ষায় বহুকাল হইতে অবরুদ্ধ তাঁহার সেই বাতায়ন খুলিতে বলিলেন,—সেদিন প্রেমের যে করুণ সুর তাঁহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিতেছিল,—সাধের কুঞ্জকাননের শোচনীয় পরিণামে তাহার ঝঙ্কার নষ্ট হইল না, গোবিন্দলালের উপস্থিতিও তাহাকে নিবিড় করিয়া দিতে পারিল না। সে-প্রেম যে নিজেকেই নিজে ভরিয়া দিয়াছিল,—গোবিন্দলাল ত তাহার উপলক্ষমাত্র,—তাহার সাফল্য, বিকাশের মাধুর্য্যে, প্রকাশের তৃপ্তিতে নহে।

ক্রমশঃ।

কর্ম্মের বাঁশী।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

বনের পাখী খাঁচার পাখীকে পল্লীর আমবনে ধানের ক্ষেতে ফিরতে ডাক্‌ছে —কিন্তু খাঁচার পাখীটার সে লোহার শিকগুলোর প্রতি মায়া বসেছে, তাই সে আজ অবাধ স্বাধীনতার চিন্তা করতেও প্রাণভয়ে কাঁপছে, এমনই একটা জড়তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে!

"চল" বল্লেই যে চলা যায় না—দ্বার মুক্ত হ'লেও যে যাওয়া যায় না- যাবে যে তার মনটা রয়ে যেতে চায় না—বন্দীরও দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের স্মৃতি-জড়িত কারা শৃঙ্খলের প্রতি মমত্ব জন্মে যায়।

স্বভাব থেকে ছিন্ন করে যে বন্ধন, তাই শৃঙ্খল—কিন্তু যে বন্ধন স্বভাবের কোলে স্থিতি দেয়, সে শৃঙ্খলা যে না মানে সে উচ্ছৃঙ্খল। সমাজের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলের চির বিরোধ। সংসারের বিশৃঙ্খলার জন্ত দায়ী সমাজ-বন্ধন নয়, সমাজবন্ধনকে "পাশ কাটিয়ে" চলে, সংসার সমাজের প্রতি মমতাহীন, সংসার-বন্ধন-মুক্তি-প্রয়াসী সন্ন্যাসী, অথবা ভোগবিলাসী—যারা চিন্তা, যত্ন, শ্রদ্ধা, মমতা দিয়ে কোনদিন সংসারের সংস্কার করলে না।

এ নবযুগে 'আদর্শ পল্লী"র প্রতিষ্ঠা চাই; আদর্শ ঠিক হ'লেই পল্লী সহস্র সহস্র বনলতার মত আপনা আপনই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌বে।

ফুলগাছের প্রাণটা হওয়া চাই অফুরন্ত—টবের ফুলন্ত গাছে দখিন হাওয়া প্রাণের ঢেউ তুল্‌তে পারলেও সে ঢেউ অফুরন্ত প্রাণের অভাবে স্থায়ী হবে না; টবের গাছের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির লালসা আমাদের ভোগের লালসার সঙ্গে তুলনীয়; গাছটা যেমন যখন তখন স্থানান্তরিত হয়, আমরাও তেমনই উচ্ছৃঙ্খল, আমাদেরও স্থিতির স্থিরতা নেই; আজ স্বভাবের বন্ধনে তাকে একস্থানে বাঁধ্‌লে পরে যে সে বাঁধন তার পক্ষে শ্রেয়, তার অফুরন্ত প্রাণের শক্তিটার ফলেই যে সে বাঁধা পড়ে, এই সঙ্গে কথাটা তাকে বুঝ্‌তেই হবে; বিজ্ঞানের বলে আমরা টবের গাছে যত বড় ফুলই সৃষ্টি করি না কেন, আমাদের সে গৌরব স্থায়ী হবে না;— গাছটার অফুরন্ত-প্রাণের সত্তার সাজিয়ে দেওয়াই আমাদের বড় কাজ—গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়াই আমাদের গোড়ার কাজ। মানুষকে অসুখী করা প্রকৃত

শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; যে শিক্ষার ফলে মানুষ অসুখী হচ্ছে, মানুষের অতৃপ্তি বাড়ছে, সম্ভোগে সুখী করতে পারছে না, সে ব্যর্থ শিক্ষা ত্যাগ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। প্রতীকারের পথ নির্দ্দিষ্ট না হ'লে "তাল সাম্‌লান" দায় হবে।

আমরা দর্প করি কিসের? বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা, হাবভাব নিয়ে "ওদের মত হ'তে চাই" কেন? যে নিদ্রিত শূদ্রশক্তি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলে আক্ষেপ করছ, সে অক্ষম হয়েও আজও তোমার জাতীয়তা রক্ষা করছে, ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়িয়া আফগান জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সহিত তাহা তুলনীয় হ'তে পারে—তোমাদের হাতে সে জাতীয়তার গৌরব রক্ষার ভার থাক্‌লে এত দিনে এই সুসভ্য জাতিকে কাঙাল সাজ্‌তে হ'ত। বাংলার কৃষকের আর আনন্দ নেই, তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছে! তাকে জাগাতে এবার পল্লার মাঠে যেতে হ'বে। বক্তিয়ার লক্ষ্মণসেনের গৌড়-সিংহাসন অধিকার করার সেই একদিন আর বৃটীশ রাজত্বের এই একদিন; কত রাষ্ট্রবিপর্য্যয় হয়ে গেল ঘুমন্ত কৃষকের ঘুমের ঘোর কেউ ভাঙ্‌লে না। আমাদের "বাঙ্গালী" নাম নিয়ে বাঁচ্‌তে হ'লে তাদের মাঝে এবার তাদের মত হ'য়ে ফিরে যেতে হবে। পল্লীর কুটীরে বাস করতে হবে। আমরা আজ বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার গৌরবমুকুট প'রে আস্ফালন না করে দেশের ধূলা মাথায় তুলে নেব; "বাবু" আমরা, "চাষী" হতে হবে—কোন অপমান নেই, পেটের দায়ে একটুকরা রুটীর জন্য বাদশা ঔরঙ্গজেবকে রাজস্থানের গিরিসঙ্কটে একদিন মণিময় মুকুট ধূলায় নামিয়ে কাঁকর চিবুতে হয়েছিল। পুরাণো সমাজের সংস্কার করতে একেবারে নূতন "আদর্শ-সমাজ" গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'ক। আমাদের জীবনের কেন্দ্রটাই বদ্‌লে দেওয়া আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ—আমাদের সভ্যতার কেন্দ্রটা পল্লী থেকে সরে সহরের মোহাবর্ত্তে পড়ে বিকল হয়েছে। বাঙালী বিজাতির সৃষ্ট সহরে দাসত্ব করে প্রতিদিন সহর-বাসেরও অযোগ্য হয়ে পড়ছে—স্বাস্থ্যে, বুদ্ধিতে, ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব্বপ্রকারে। আমরা আত্মশক্তিতে নির্ভর করে ছোট বড় "আদর্শ পল্লী" সৃষ্টি করতে চাই—তার মাঝে আমরা একদিন প্রতিকুটীরে স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্রে ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে দেব, দরিদ্রের বাহুতে শক্তি, উদরে অন্ন, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি ভরে দেব। আমরা অক্ষম বলে সংশয় না আসে যেন, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে আমরা যে কোন বড় কাজই করতে পারব। ইংরাজ-বণিক সম্প্রদায় কলিকাতা নগরী গড়ে তুলেছে, আজ মাড়োয়ারী বণিকরা দেশের মাটী কিনছে, আমাদের মাটী ছাড়বার কি এই সময় হ'ল? এ যুগে

বাঙালী বলে পরিচয় দেবে যে, পল্লীর মাটীর ঘরে বাস করবার জন্য তার প্রাণ কাঁদবে। যদি সভ্যতার বিনিময়ে যশ আর অর্থ ই চাই ত, আমরা দুনিয়ার হাটে দুদিনেই কাঙাল হয়ে যাব।

সাদা-টবে ঢাকা সবুজ তৃণরাশি যেমন ফ্যাকাশে হয়, অমন সাদা আমরা হব না, আমরা আলো হাওয়ার মুক্ত রাজ্যে নবদুর্ব্বাদলশ্যামই থাকব।

দেশ যদি স্বচ্ছন্দে ভোগের আয়োজন চিরকাল সম্মুখে তুলে ধরতে পারত, তাহলে না হয় কোন আপত্তি ছিলনা। ভোগের জন্যই আমরা দাসত্ব করতে সহরে এসেছি, দাসত্ব মোচন হয় নি, ভোগও তো হয় নি!—পল্লীর দেবতাকে ভোগ না দিয়ে আমরা ভোগ করতে গেছি, পারি নি,—দারুণ অক্ষমতার লজ্জায় ধিক্কারে এ ভোগ সর্ব্বস্ব জাতির প্রাণ ভরে উঠেছে। পল্লীর কৃষককে যারা প্রাণ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে বাঁচাত, তারা আজ ভোগের লালসায় ছুটে এসেছে—ব্যর্থ শিক্ষা ও ভোগ সুখদাতার স্তুতি, আর পল্লী-সমাজের নিন্দা বেশ বিনিয়ে করতে শিখেছে! ও'দিকে অবাধে আজ যারা পল্লীর "সোমনাথ-মন্দির" লুণ্ঠন করে নিচ্ছে, তাদেরই ভিক্ষান্নে আত্মরক্ষা করে বিলাসীর নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহের জন্য সবাই আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছি। রূপের মাদকতায় তৃপ্তি নেই—অর্থসামর্থের অভাবে অক্ষমতা ও অবসাদ অষ্টাঙ্গে বেষ্টন করছে—তবু এই ভোগবিলাসিতার মোহ ও দাসত্ব ঘুচ্‌ছে না, সুখকরকে ছেড়ে হিতকরকে বরণ করা হচ্চে না।

সব জড়তা, সব অবসাদ, সব আশঙ্কা একবার ঝেড়ে ফেলে "চলতেই" হবে—মাথার উপর ঝড়ঝাপটা দেখে খাঁচার মমতা করলে চলবে না। চল্‌বার আগে চল্‌বার ইচ্ছা চাই, চল্‌বার শক্তিটা চল্‌তে চল্‌তেই আস্‌বে; মুক্তি পেয়েই বেশী ছুটলে অসাড় পাখা বইতে পারবে না যে, সে কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

ঐ শোন, কর্ম্মের বাঁশী বেজেছে—"বনের ফুল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে যত যত বড়ই হ'ক না তার অফুরন্ত প্রাণ মলিন হয়ে আসছে। তার সবটুকু নির্য্যাস বিদেশী লুটে নিয়ে তার সভ্যতার রুমালে ফোঁটা ফোঁটা মাখাচ্ছে। আমাদের কাজ যত বড় করেই করিনা কেন, একথা ভুললে চলবে না, সে কাজ শেষ করবার ভার "নূতনের হাতে" দিয়ে যেতে হবে—এমনই রূপ-রস-গন্ধ ভরা কত প্রস্ফুটিত ফুলের পাপ্‌ড়ি পরে ঝরে পড়বে—আবার নূতন বৃন্তে নূতন সৃষ্টি বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু আমাদের প্রাণটা ঐ টবে-ঘেরা সঙ্কীর্ণতার সীমার মধ্যে যদি ধরা থাকে, তবে ফুল যত বড়ই হ'ক না কেন, ফুলগাছের প্রাণ

অকালে ফুরিয়ে আসবে। রস যতক্ষণ থাকবে—ফুল, পাতা, ডাল পালা সবই থাকবে, তবে ক্রমশঃ মলিন হয়ে আসবে—কিন্তু অন্ধকার মাটির নীচে রস আহরণ করছে যে কর্ম্মী শিকড়গুলি, তারা একদিন স্বাভাবিক কারণে অসীম শক্তি সঞ্চয় করে সমাজ বন্ধন ভাঙবেই ভাঙবে, সে ভাঙন রোধবার শক্তি ভগবানের সৃষ্টিতেও নেই।

বড় বড় লোকের বড় বড় কথায় কিছু কাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কবি কর্ম্মী কারো কথা দেশ শুনেও শুনলে না। সমাজের জড়তা ভাঙবার কথা বলে রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা না পেয়ে জাতির কাছে কৃতঘ্নতা বেশী পেয়েছেন। কর্ম্মীর আদর্শ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় "খাঁচার পাখী" বলেই বোধ হয় কোন "খাঁচার পাখী" তাঁর কথা কানে তুললে না, ভয় ত ভাঙল না, সাহসও হ'ল না তিনি "বনের পাখী" হ'লে বোধ হয় নিরুপায়দের একটা উপায় হ'ত।

শেষ কথা।—আমরা শাস্ত্র মানতে চাই না, অথচ "শাস্ত্র" লিখে ফেলি—আমাদের "শাস্ত্র" কেউ না মেনে তর্ক করলে আমরা ভারী চটি। আমরা যা লিখি, তা কোনদিন কেউ যেন শাস্ত্রবাক্য বলে মাথা পেতে না নেয়—হৃদয় যেটুকু গ্রহণ করবে সেইটুকু নেওয়াই এ লেখার সার্থকতা—মাথা পেতে নিলেই চিরকাল "বোঝাই" বইতে হবে, সত্য যেটুকু তা অন্তরের পরশ পাথরে কষে নিতে হবে। চিরকাল যে তা "সত্যই" থাকবে, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। স্থান কালের ব্যবধানে অনেক বড় বড় সত্যকেও সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করতে হয়েছে। আজ যেখানে কেবল সাগরের নীল জল, কতকাল পরে সেখানে আবার সারি সারি দ্বীপের ছড়া ছড়া মালা কাশীর গঙ্গাপ্রবাহে প্রসাদী ফুল বিল্বপত্রের মত ভাসবে।

নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ।

বিশে পাগলার চিঠি।

দাদা, তোমরা ত জান আমি শাস্ত্র পড়া ছেঁদো কথা মোটেই কইতে পারিনে। সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের চুল-চেরা বিতর্ক আর পুরাণতন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি বা সাধনের তত্ত্বপ্রসঙ্গ, এতে আর কালক্ষেপ করতে মোটেই

রুচি হয় না। তবু এ হতভাগাকে আবার কাগজে লেখবার জন্তে পীড়াপীড়ি কেন? তোমরা কি জান না যে লোকে সত্যি কথাটা সোজা করে চলতি ভাষায় শুনতে বড়ই নারাজ। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পারিভাষিক শব্দের হেঁয়ালী রচনা করলে তবে তা' বেশ শ্রুতিমধুর হয়। * * *

কেমন করে ভগবান এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন বা স্বয়ং এই বিশ্বসংসার-রূপে সৃষ্ট হয়েছেন তা বোঝাবার জন্তে এত বুদ্ধি 'খরচ নাই' বা করা গেল? দর্শনকারেরা যুক্তিপ্রমাণের লাঠির উপর ভর দিয়ে কি-হাত নানাভঙ্গীতে somersault খেতে খেতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী দামী জিনিস এতটুকু ভাগবত-প্রেরণাযুক্ত সরল প্রাণের সহজ বিশ্বাস। পণ্ডিতের পাহাড়-প্রমাণ শুষ্ক শাস্ত্র-জ্ঞানের চেয়ে মূর্খের এতটুকু রসাল বিশ্বাস লক্ষগুণে বেশী ভারি। সাংখ্যকার ষাট হাজার বছর তপস্যা করে যে দর্শন লাভ করেছিলেন তার ভিতর হাজার সত্যি কথা থাক,—যদি দর্শন না থাকে, অনুভূতি না থাকে—তবে তাতে তোমার আমার কি আসে যায়? বৌদ্ধ মায়াবাদ বা শূন্যবাদকে খণ্ডন করবার জন্তে শঙ্করাচার্য্যকে বাধ্য হয়ে ঐ বৌদ্ধ মায়াবাদীরই ভাব ও যুক্তির ভাষাকে অবলম্বন করে যে সব জটিল যুক্তিজালের অবতারণা করতে হ'য়েছিল, তা' শুনে আজকার যুগে তোমার বিশেষ লাভ হবে না। আমার প্রাণের ভিতরের বিরাট পুরুষকে ছেড়ে, আমার বুকের ঠাকুরের পাগল-করা বাঁশীর ডাক না শুনে কি জন্তে কেতাবী-যুক্তিতর্কের ঘর্ঘর শব্দে সাধ করে কান ঝালাপালা করতে যাব? সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ আর শঙ্করের মায়াবিজড়িত একপুরুষবাদ যখন প্রচারিত হ'য়েছিল, তারপর যে এতটা কাল কেটে গেল তা বৃথা কাটেনি। ঐ দর্শনগুলোর যুগের পর থেকে জগন্নাথের সৃষ্টিচক্রের রথের চাকাগুলো ক্লান্ত হ'য়ে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অথবা শঙ্করের তিরোভাবের পর পিছন দিকে হটে গিয়েছে, এমনতর একটা ধারণা করবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছিনে। সে চাকার গতি চিরদিনই অবাধ, আর চিরদিনই সামনের দিকে। একদল সুপণ্ডিত লোকে কিন্তু প্রাচীনের প্রতি বেজায় অনুরক্ত হ'য়ে নবীনকে অবজ্ঞা করে আসছেন। তাঁদের হাতে একটা করে দূরবীণ আছে। যখন ভারত-গৌরবের দিকে তাঁরা দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, তখন সেই দূরবীণের সোজা দিকটা দিয়ে দেখেন, আর সব বড় বড় দেখতে পান; আর হাতের গোড়ায় নবীনের দিকে যখন তাকান, তখন তাঁরা ঐ দূরবীণটা ঘুরিয়ে উল্টো করে দেখেন—তাই নিকটের জিনিষগুলো হাজার বড় হ'লেও ছোট দেখায়।

আবার সত্যযুগ আসছে এ কথা বলে, সেই প্রাচীনকালের সত্যযুগটি অথবা সেই রকম একটা কিছু কালচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আসছে, এমনতর একটা আশঙ্কা করবার কোনই কারণ নেই। সেই সেকালের সত্য যুগটি যতই কেন আমাদের গৌরবের সামগ্রী হোক না, সেই যুগে মানুষের জীবন যতই কেন সুন্দর হোক না, আমরা সে যুগের যতটুকু জানি, তাতে সেই সত্যযুগকে মানুষের চিরন্তন আদর্শ যুগ বলে মেনে নিতে পারি না। সেই আদর্শ অনুসারে খুব বড় বড় করে গ্রামে গ্রামে নিত্য দু'চার মণ ঘি জ্বালিয়ে আমরা পুরাতনের প্রতি সমাদর দেখাতে পারবো না; অথবা দেদার গরু-ঘোড়া কেটে তাদের রক্তে দেবতাদের তৃপ্তিসাধন করতেও প্রস্তুত নই। নদনদীর তীরে গৌরকান্তি মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘনাসা আর্য্যগণ সামগানে ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলতেন—এই কথা শুনেই আমরা আবার নদীর তীরে তীরে বেদমন্ত্র আওড়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে মোটেই রাজি নই, অথবা তাঁদের সমাজে নিয়োগপ্রথা বা ঐ ধরণের যে সব প্রথা ছিল, আজ এই এমন দিনেও সেই সকল প্রথাগুলোকে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, সত্যযুগের প্রথা বলে খাতির করে আমাদের সমাজের মধ্যে চালিয়ে দিতেও পারবো না। মোট কথা অনুকরণ কারুরই করবনা—তা' সাহেবদেরও না, আর আমাদের অতি-গৌরবের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদেরও না। অনুকরণ মানেই আত্মহত্যা। সাহেবদের অনুকরণ করে মরতে বসেছি, অতএব সে ভুল না করে, এস আমরা সেকালের পূর্ব্ব-পুরুষদের অনুকরণ করি, এমনতর একটা কথার নির্ব্বিচারে অনুসরণ করলে মস্ত একটা ভুল করা হবে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে—সাহেবরাও মানুষ, আর আমরাও মানুষ। আমরা যদি মানুষ না হতেম, তা হ'লে না হয় একটা নূতন বা পুরাতন মানুষের দলের অনুকরণ করে মানুষের মত একটা অভিনয় করবার চেষ্টা করা যেত! আমরাও যখন মানুষ, কারুর অনুকরণ করে আমাদের প্রাণ আমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে তাও নয়, কারুর দেখাদেখি আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি না, মনোবুদ্ধ্যাদি পঞ্চকোষের এক আধটা আমাদের কম আছে তাও নয়, তবে কি কারণে আমরা নিজেদের অবাধ চিন্তাপথকে রুদ্ধ করে, নিজেদের প্রাণশক্তিকে, স্বাধীন জীবনগতিকে ব্যাহত করে, ফ্যাশানের খাতিরে অনুকরণ করতে গিয়ে সং সাজতে যাব? * * *

আমরা সেকালের সত্যযুগকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করবো, সেই যুগের ঋষিদের হৃদয়ের পূজা দেব, তাঁদের গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবো—

এসব হ'লো স্বতন্ত্র কথা ; আর তাঁদের যাগযজ্ঞ, সাধন পদ্ধতি, রীতিনীতির বোঝা মাথায় করে জীবনটা দুর্ব্বহ ভারগ্রস্ত এবং বা তাঁদের শাস্ত্রস্তূপের পুথি পুথি বিধি নিষেধের কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়া, এ হ'লো স্বতন্ত্র জ্ঞান কথা। * * * যে সত্য যে ভাবে তাঁরা পেয়েছিলেন, সেই সত্যের উপর দাবী করে চিরকাল পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়ে নির্ব্বিবাদে তাই ভোগদখল করতে থাকবো, এত বড় একটা ফাঁকি প্রকৃতির আদালতে একান্ত অগ্রাহ্য।

পুরাতনের পূজা করবো, পুরাতনকে শ্রদ্ধা করবো সে বিষয়ে দুটো মত কোথাও নেই, থাকা উচিতও নয়। * * * কিন্তু তাই বলে তাঁদের জীবন-যাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানগুলি, তাঁদের আচার-ব্যবহার, তাঁদের আশা-ভরসা যাই নকল করতে যাব, অমনি আমাদের প্রাণের ভিতরের স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ম্প্রকাশ দেবতাটির অপমান করা হবে। মানুষের প্রাণের যিনি প্রাণ, মনের যিনি মন, তাঁর ভাণ্ডার যে অফুরন্ত আর অনন্ত বিচিত্রতাময়। নিত্য নূতন নূতন রসের প্রকাশ করে এই বিরাট সৌন্দর্য্যের হাটে নিত্য এমনি নূতন আর বিচিত্র শোভার বিকাশ করছেন যে এই আনন্দের লীলার ভিতর এতটুকু এক ঘেয়ে ভাব প্রবেশ করতে পারছে না। তাই বলি ভাই, একটা নূতন কিছু দেখলেই শিউরে উঠে এ বিচিত্র খেলার যে আনন্দ তা থেকে বঞ্চিত হ'য়ো না। আমার যে হৃদয়স্বামী সে যে চির নূতন—তাই তাঁকে পেয়েও পাওয়া হয় না। আর তাঁকে পাওয়া না পাওয়া যে মোটেই আমাদের হাতে নয়কো। তিনি যখন কৃপা করে ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কাছে যতটুকু যে ভাবে প্রকাশিত হন, মানুষ তাঁকে ততটুকুই জানতে পারে। তিনি হনুমানের কাছে যে ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিলেন, লক্ষ্মণ বা বিভীষণের কাছে সে ভাবে হন নি। আবার এদের সকলের কাছে যে রূপে আর যে ঐশ্বর্য্যে ব্যক্ত হয়েছিলেন, তার সঙ্গে গোপীদের কাছে প্রকটিত রূপৈশ্বর্য্যের কতই পার্থক্য। একই মূর্ত্তি, শ্রীদাম-সুদাম দেখেছিল একভাবে, আর পঞ্চপাণ্ডব দেখেছিল আর এক ভাবে। এইরূপ প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রকাশিত তাঁর লীলার মধ্যে একটা স্পষ্ট বিশিষ্টতা আছে,—একই সাধকের মনোমধ্যে নিত্য নূতন খেলা হিসাবে নিত্য নূতন বিচিত্র রসতরঙ্গের আবির্ভাব। যেমন ব্যষ্টির সাধনায় তিনি নিত্য নূতন তরঙ্গ তুলে সাধককে আনন্দের পুলক থেকে পুলকান্তরে নিয়ে যান, তেমনি আবার সমষ্টির কাছেও—সমাজ বিশেষ ও জাতিবিশেষ এবং বিশ্বমানবের কাছেও—যুগভেদে তাঁর অভিব্যক্তির রকম আলাদা আলাদা। মানুষ যে ভাবে যতটুকু নিজ অন্তরকে

বিকশিত উন্মুক্ত ক'রেছে, অন্তরদেবতা ঠিক সেইভাবে ততটুকুই নিজেকে প্রকাশিত করেছেন।

দাদা, সবাইকে খুব হাঁক-ডাক ক'রে বল যে আজিকার মানুষের চেয়ে ভাগ্যবান্ মানুষ কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেনি। আমার বলবার শ্রবণ ধারণে বিদ্যাবুদ্ধির সংস্রব নেই; তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ যে আগে তোমরা এই কথাটা মানুষকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল, যে সৃষ্টি-ব্যাপারটা ক্রমবিকাশশীল, কাল যত অগ্রসর হচ্ছে, সৃষ্টির মধ্যে ভগবদ্ভাবের ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য ততই অধিক পরিমাণে প্রকটিত হ'চ্ছে। আরও বল, যে ঋষিরা কোনও একটা অতীত যুগবিশেষে অকস্মাৎ পথ হারিয়ে ধরায় এসে প'ড়েন নি, সকল যুগেই তাঁরা এসেছেন, আর বর্ত্তমান যুগের ঋষিরা যারা এসেছেন বা আসবেন, তাঁরা পূর্ব্বগত ঋষিদের চেয়ে ঢের বেশী ভাগ্যবান্। চিন্তা কি? একবার ব'লে যদি না বোঝে, শতবার বল। যতক্ষণ না বোঝে, ততক্ষণ প্রেমপূর্ণ আকুলহৃদয় নিয়ে সকলের পায়ে ধ'রে ধ'রে বল, যে এই পূর্ণলীলার যুগে মানুষ অতি অল্প আয়াসেই ঋষিত্ব লাভের অধিকারী। —সংসঙ্ঘী (আশ্বিন)

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল,]

শাস্ত্র বলেছেন, বৈরাগ্যমেবাভয়ং— আমিও সেই অভয়কে বুকে নিয়ে সারাসংসার ঘুরে বেড়ালাম এবং সেই জন্যই বোধ হয় অভয়কে আর খুঁজে পেলাম না। কোথায় হে ভয়ানাং ভয়ং, কোথায় তুমি ভীষণং ভীষণানাং? তোমায় যে খুঁজেই পাই না প্রভু! পুরাণে পড়েছিলাম এক দৈত্য নারায়ণকে হত্যা দেবার জন্য সারাসংসার তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছিল। ঠাকুর কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে সেই দৈত্যের বুকের মধ্যেই চুপ চাপ ঢুকে বসে ছিলেন। দৈত্য বেচারী সারাসংসার খুঁজে তাঁকে আর না পেয়ে শেষে যাই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে বসেছে অমনি তার বুক থেকে বেরিয়ে ঠাকুর সাগরতলে গিয়ে লুকুলেন। আমারও তাই হয়েছে নাকি? তাহলে ত' চুপ করে বসা হবে না, বসলেই ত' সে বুক থেকে বেরিয়ে দেখা দেবে।

আমি এই রকম একটা তর্কই বোধ হয় অজ্ঞানে ক'রে ফেলেছিলাম, এবং সেই সিদ্ধান্তই এখনো আমার পেয়ে বসে রয়েছে।

যাই হোক চলন্ত মন্দিরে অচল ঠাকুরকে অজ্ঞাতে বহন করে, আমি যেবার কেদার বদরি নারায়ণ পথে চলছিলাম তারই কথা বলব। পাহাড়ের পথে চলার আনন্দে আমার ভয়ঙ্কর ঠাকুর অভয় মূর্ত্তিতে পদে পদে ধরা দিচ্ছিলেন তবু ধরতে পারিনি। অরূপ ঠাকুর বহুরূপে আমায় ধরা দিচ্ছিলেন তবু দেখতে পাইনি। তবু বাইরের না-ধরাটাকে অন্তরের ধরা বলে ধরে নিতে, বাইরের না-দেখাটাকে অন্তরের দেখা বলে ধরে নিতে আমার অন্তরের অন্তর এক মুহূর্ত্তও বোধ হয় ভুল করেনি। কিন্তু এমনি আমার পাগলপ্রাণ, এমনি আমার বৈরাগী মন যে সব পাওয়াকে ত্যাগ করে ছুটেই চলেছিল। বন্ধুর পথে ক্লেশের পথে ভয়ের সেই পরম বন্ধুকে ক্রমাগত পেয়েও আমার মনটা যে কিছুতেই তাঁকে পাওয়া বলে স্বীকার করেনি, এখনও যে সেই চির-অপাওয়াই রয়েই গিয়াছে! যাক—যাক—তাই হোক!

কিন্তু আমিও ত' ছাড়ছিনে। সাত রাজার ধন পেতেই হবে, নইলে কি মরব নাকি? কিছুতেই মরা হবে না আমি অমৃতের ছেলে যে, মরব কি করে? ও কথা যাক—

এইবার যার কথা লিখিব সেই আমার সন্ন্যাস-জীবন-আকাশের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য। কিন্তু দুদিনের জন্য সেই আলোর সাহচর্য্য পেয়েছিলাম; তবু তাকে আমার সইল না। তার উজ্জ্বল আলোককে মায়ার ছায়ায় কোমল করে নিতে গিয়ে তাকে হারাতে বাধ্য হইছি। সে আমার জীবনের দিকচক্রবালের তলে নেমে গিয়েছে, আর কি উঠবে, আর কি দেখা হবে!

তার সঙ্গে দেখাটাও এক অদ্ভুত রকমে হয়েছিল। ভিক্ষা করে ফিরবার মুখে একটা অতিথিও জুটিয়ে এনেছিলাম—একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত বালক।

আমি আমার ভোজ্য প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করিছি, বালকও ক্ষুধাতুর নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করছে, আমি কেবল আমার শাঁখটার একটা দীর্ঘ ফুৎকার দিয়ে নামিয়ে রেখেছি, এমন সময় পার্শ্বে চেয়ে দেখি জটাজুটসমাযুক্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি,—আমার নিবেদিত আহার্য্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়াইয়ে আছেন। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি এমন সময় তিনি আমার ত্যক্ত আসনে উপবেশন করে ওঁ ব্রহ্মার্পণমন্ত্র বলে আহার করতে আরম্ভ করলেন।

ক্ষুধাতুর বালকটীর কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম, হয়তো মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য্যনারায়ণও থমকে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত

মানুষটার অদ্ভুতকার্য্য দেখছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিকে দৃষ্টি না করে ভোজন পাত্রটী নিঃশেষে শেষ করে আচমন করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মৃদু হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ওঁ তৃপ্তোস্মি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

চাওয়া নেই, চিন্তা নেই, অমনি এসে যা' সুমুখে পেলে তাই খেয়ে চলে গেল ? সভ্যতার ধার ধারে না, নিয়মের ধার ধারে না, না বলে না কয়ে পরের জিনিষকে আপনার করে নিয়ে ব্যবহার করলে। দয়া ধর্ম্ম নেই, কোনো বন্ধন নেই, অথচ এমন প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যে হঠাৎ বারণও করা গেল না।

পাহাড়ের সংকীর্ণ আর পিছল রাস্তায় আমি কোনো দিকে না চেয়ে চলছিলাম, এমন সময় দূর হতে একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। আমিও দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখলাম হাত দশ বারো নীচে একটী স্ত্রীলোক অতিকষ্টে একটা পাহাড়ে লতা ধরে ঝুলছে, হয় ত আর একটু হলেই সে পড়ে যাবে। আমি আরও চমকে দেখলাম সেই আমার অদ্ভুত সন্ন্যাসীটীও হাসি হাসি মুখে সেই দিকে চেয়ে আছে। কেউ কোনো রকম সাহায্য করছে না। আমি আর কোনো কথা না বলে আমার প্রকাণ্ড মুরাঠাটা খুলে দেশে এক জনকে বল্লাম "এটা ধর, আমি নেমে গিয়ে ওকে উঠিয়ে আনছি।" ষণ্ডা ষণ্ডা মানুষগুলো আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারা বোধ হয় এত বড় দুঃসাহস করতে কাউকে কখন দেখে নি। বিশেষতঃ এতো মানুষকে ধরে রাখার শক্তি কারু ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ পিছল আর সঙ্কীর্ণ পথে পা বাধাবার মত কিছুই ছিল না। কেউ যখন ঐটুকু মাত্র সাহায্য আনস্ক করলে না, এমন কি আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল, তখন আমি ঐ অদ্ভুত মানুষটীর দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ বল্লেন,—মায়া মায়া !

মায়া ! হোক মায়া, আমি আর থাকতে পারলাম না, তার হাতে আমার মুরাঠার একটা দিক ছুড়ে দিলাম। সেও যেন কলের পুতুলের মত সেটা চেপে ধরলে ! কিন্তু কি তার শক্তি ! একটু হেললেও না, অনায়াসে দুটো মানুষকে টেনে ওপরে তুলে ফেলে খোঁৎ খোঁৎ করে চলতে আরম্ভ করলে। আমিও সঙ্গ নিলাম।

মাঝে মাঝে যখন জিজ্ঞাসা করেছি যে বাঙ্গালীদের সাহায্য না করা কি তাদে

হচ্ছে, সে কেবলি হেসে বলেছে, "পাপের বন্ধন যদি বন্ধন হয়, পুণ্যের বন্ধন কি বন্ধন নয়? মায়া—মায়া—মায়া! আবার মায়ার বশবর্ত্তী হব কেন?"

মায়া। জীব রূপে শিব নিজে হাত পেতে ভিক্ষে চাচ্ছেন, সাহায্য চাচ্ছেন, আর আমি বলব মায়া—ভেলকি—মিথ্যে! ঐ যে মেয়েটী ছেলে কোলে করে পথ চলতে পথের ধারে বসে পড়ল, তার দু' বছরের ছেলেটা পথের ধারে ওলাউঠায় মারা গেল, কেউ তার দিকে চাইলে না এইটেই কি মায়া কাটানর পথ? তবে যারা এই দুর্গম পথ সুগম করবার জন্য মাঝে চটী করে রেখেছেন, ধর্ম্মশালা করে রেখেছেন, তাঁরাও ত মায়ারই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

* • • •

কিন্তু তখন যে মায়া কাটাতেই বেরিয়েছিলাম। কত সময় পাহাড়ের ধারে বসে হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভায় মগ্ন হয়ে গিয়েছি, দিগন্ত বিস্তৃত তুষারের উপর সূর্য্য রশ্মির খেলা দেখতে দেখতে পথ হাঁটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মনোরম প্রদেশের শোভায় গাম্ভীর্য্যে আপনাকে হারিয়ে শুধু বাহিরটার মধ্যেই ডুবে গিয়েছি, তবু সেই পথের বন্ধুটী আমায় ত্যাগ করেন নি। সে বাহিরের সব মায়া ত্যাগ করেছিল, কিন্তু এই কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধুটীর মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। কেন তা' জানিনে, তবু সে আমায় ভাই বলে স্বীকার করেছিল, আমিও তাকে দাদা বলে, বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, বুঝি খুব ভালও বেসেছিলাম। কিন্তু সংসার ছেড়েও, যার জন্য সংসার, সেই ভালবাসাকেই সত্য বলে স্বীকার করে ফেলেছি, মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার নি. এটা কিন্তু তখন সাহস করে স্বীকার করতে পারি নি।

• • • •

কেদারে পৌছে, সকলেই যেমন মন্দিরের মধ্যে ঢুকে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, আমরা দুজনেও প্রায় তেমনি করেই কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি অন্ততঃ তখন মনে মনে বলেছিলাম, "পেলাম, ওগো পেলাম, তোমায় পেলাম!"

বন্ধু আমার অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য, তার নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করলে না। তারও বৈরাগ্যের অনুরাগ তার গোপন প্রাণের চিরন্তন ভুল গুলিকে একেবারে গলা টিপে মারতে পারেনি। সেও যেন চোখের জল দিয়ে স্বীকার করলে, যে, ভুলের ওপরই যেন জগতের যত সৌন্দর্য্য যত রস যত আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। ঐ শিলাময় বিগ্রহের কঠিনত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, সসীমত্বের মধ্য দিয়ে একটা

অন্ততঃ অস্তিত্বের আভাব পাওয়া গেল। যেন কে আমায় বলে দিলে যে যাকে ছোট মনে করছ তারই মধ্যে দিয়ে যদি বড়কে দেখতে পাও, তা'হলে আর ভয় কি—ভয় কোথাও নেই, কোথাও থাকতেই পারে না। ভয়টাই মায়া, মিথ্যা—যেখানে যাও সেইখানেই এই ভয়ের মধ্যে অভয়কে দেখতে পেতে পার। যা' তোমায় বাধা দিচ্ছে, যা'কে নিতান্তই ছোট বলে, সসীম বলে অবজ্ঞা করছ, সেই ছোট্ট নিতান্তই—চাক্ষুষ মধ্যকার, কঠিন পাথরটুকুই তোমার অসীমের মধ্যে প্রবেশের দরজা। প্রত্যেক বস্তু বস্তুই স্ব-স্বত্বের মধ্যে দৃষ্টিপ্রসারণের গবাক্ষ।

সেই ছোট্ট পাথরটুকুকে ছুঁয়েই "আমি নগাধিরাজ" ধ্রুব নামা হিমালয়ের স্পর্শ পেলাম। আমি অভয়কে পেলাম, সুন্দরকে পেলাম, আনন্দকে পেলাম।

* * * * *

হতভাগা দেহটা বন্ধুর অনুসরণ করলে এবং কিছুদিন পরেই কনখলে ফিরে এসে আমার বন্ধুর গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হল। তারপর এই পথে বেরিয়ে সবাইকে যা' করতে হয় তার সমস্তই আমায় করতে হল। শম, যম, দম, নিয়মের সমস্তই পালন করলাম, নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই শেষ করলাম। তারপর ছ-মাস ধরে একটা ছোট ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে শরীরটাকে এমন শুকিয়ে তুল্লাম, যে, নিজেই নিজেকে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আহার সংযম করাত করতে প্রায় অনাহারে গিয়ে ঠেকেছিল। তারপর ক্রমশঃ সেটাকে বাড়াতে বাড়াতে যখন স্বাভাবিক আহারে এসে পৌঁছলাম, তখন আমার শরীর যেন একটা কিসের তেজে সমস্ত বাহিরে জ্বলতে আরম্ভ করেছিল। একটা তত্ত্বকে আর একটা তত্ত্বে মিলতে মিলতে—সংসারটা যে ভুয়ো এবং আমি যে প্রায় সেই ভুয়োর সামিল, একটা অস্তিত্বমাত্র, এই জ্ঞানটা আগুনের অক্ষরে নিজের ওপর লিখে ফেলেছিলাম। বন্ধুই কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে পেত, আর কেউ নয়। কিন্তু এমনি করে সংসারটা মিছে করে তুলেও সেটার যখন কিছুতেই অন্ধকার মরল না, তখন গুরু আমায় নবরাত্র করালেন—৯ দিনের জন্য একটা ঘরের মধ্যে একদম একলা বন্ধ করে রাখলেন। সেই নয় দিনের পর আমি হোম শেষ করে যখন বাহিরে বেরিয়ে এলাম তখন আমার শরীরটাও যেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, সারা সংসারও যেন তেমনি প্রাণহীন ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল।

কিন্তু বন্ধু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "বাঃ। তোমার মুখ দেখেই বুঝছি

পারছি তুমি লব্ধকাম হয়েছ। আজ জোর করে বলতে পারি, তোমার পূর্ণ সন্ন্যাস হয়েছে, আজ তোমার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'—তোমার জন্মও সার্থক।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না—কিন্তু আমার অন্তরের অন্তর হতে কে যেন বুঝে—'আর পারিনে'। আমি ফিরে দূরে যেখানে হিমগিরি তুষারের আভাসে চকমক করছিল, সেদিকে চেয়ে রইলাম। কি যে সারা সংসার আমার কাণে বলছিল তা মনে নেই, সমস্তই যেন ছায়া ছায়া। ছায়া ছায়া ফাঁপা ছায়া—সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই, আমি আছি কিনা যেন তারও ঠিক নাই।

তাই বলে এটাও সত্য নয় যে এই কৃচ্ছ্রের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্যে কোনো সুখ পাইনি। এমন একটা ভয়ানক মাদকতা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে আমি এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করিনি। এই যে চব্বিশটা তত্ত্বকে নিয়ে রাতদিন খেলা করা, এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আত্মানুভূতি আত্মকর্তৃত্বানুভবের সুখে আমায় মাতাল করে তুলেছিল। আমিই একমাত্র 'অচলং ধ্রুবং', বাদবাকী সমস্তই চঞ্চল ও পরিণামী।

কিন্তু সেই সুখ যে কতখানি, তার অনুভূতি নিজে না করলে কিছুতেই বোঝাবার জো নেই। অথচ নিজবোধগম্য সেই রসে আমার চিত্ত যেমন এক দিকে সরস হয়ে উঠেছিল তেমনি আর একদিকে সে যে প্রচণ্ড শুষ্কতা অনুভব করছিল, এ কথা প্রথম প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে বুঝতে পারিনি। ক্রমশঃ মনের একটা দিক যতই আত্মবশ হয়ে "ন কিঞ্চিদপি" চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠছিল, আর একটা দিক তেমনি একটা ভীষণ একত্বের শুষ্কতায় পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করেছিল। একদিক দিয়ে যেমন প্রচণ্ড সুখকে অনুভব করেছিলাম আর একদিক দিয়ে তেমনি সজোরে আমার সেই চিরকালকার আশার বস্তুর সঙ্গে—দুঃখের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে পীঠাপীঠি ভাবে আপনাকে অনুভব করেছিলাম। অথচ সে কথাটা ধরতে পারিনি; বুঝতে পারিনি কিসের অভাব? কার অভাব? আমি যখন সমস্ত বহুত্বকে অখণ্ড একত্বে পরিণত করছিলাম তখন কিসের চিরন্তন ক্রন্দন আমার পিছনে লেগেই ছিল? সেই মহাসুখের পেছনে যে দুঃখ বিপরীত মুখে বসেছিল সে কে গো? তাকে ত কেউ দেখিয়ে দিলে না?

* * *

যিনি পরম এক, তিনিই হয়ত নিজের একত্বের মধ্যে বহুত্বকে অনুভব করতে না পেরে আমারই মধ্য দিয়ে বহুত্বকে অনুভব করেছেন।

গুরু আশীর্বাদ করলেন। আমিও তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বন্ধুর

কাছেও বিদায় নিলাম। বন্ধুকে বল্লাম, যে, যদি এ তত্ত্বের মীমাংসা করতে পারি তা' হলে নিশ্চয়ই তাকে সে তত্ত্ব বোঝাব। সেও হেসে বল্লে—"মায়া—মায়া—অনাদি মিথ্যা—তোমার দেখছি এ মায়ার হাত হতে নিস্তার নেই।"

আমি উদাস ভাবে বল্লাম "হয়তো নেই—হয়তো কারুরই নেই। তোমারও নেই, আমারও নেই, হয়তো গুরুদেবেরও নেই।"

বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"আমিও বেঁচে থাকব, আবার দেখা হবে, নিশ্চয়ই হবে। তখন কি বল শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।"

উপাসনা—ভাদ্র, ১৩২৭।

অরবিন্দের ভাবকণা।

জীব ও শিব।

প্রকৃতির কোলে নেমে আসবার ভগবানের এই যে আকুলি বাকুলি, তা ঘুচবার নয়; মানুষেরও ভগবানের স্বরূপ লাভের এই যে ঊর্দ্ধগতি, তাও মুছবে কে? সসীম ও অসীমের এই চিরদিনের সম্বন্ধ। যখন দেখে মনে হয় এ উহার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, তখনও বুঝবে সে অভিমান নিবিড়তর মিলনের সূচনা মাত্র।

মানুষের মধ্যে জগৎ-প্রকৃতি আপনার বিষয়ে সচেতন হয়, সে কেবল নিজের জীবন মধুর পূর্ণ দিকে উন্মুখ হয়ে ফুটিবার জন্য। এই জগৎ প্রকৃতি আপন উপভোক্তার সহিত অজ্ঞানে মিলন আছে, এ দশায় তাহার জীবন ও চেতনা নিত্য-মিলনের মধ্য হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আবার তাহার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকেই চায়। জীব-প্রকৃতি ভগবানকে জানে না, কারণ সে যে আপন স্বরূপ দেখে নাই। যখন সে আপনাকে চিনবে তখন সে অবিমিশ্র অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দে ভরে উঠবে।

একের মধ্যে হারান নয়, কিন্তু একের মধ্যে পাওয়াই এ লীলার কৌশল। জীব ও শিব, জগৎ ও জগদতীত তখনই এক হয়, যখন তু'জনে চোখোচোখী হয়—এ উহাকে জানে। তু'জনার ভেদই অজ্ঞানের কারণ, এই অজ্ঞানই বেদনা।

মানুষ অন্ধের মত খোঁজে, এমন কি সে যে তার পরম সম্পদকে খুঁজছে তাও

সে জানে না, কারণ সে যে জড়-প্রকৃতির অন্ধকারে এ যাত্রা আরম্ভ করেছে। যখন সে ক্রমশঃ দেখতে আরম্ভ করে, তখনও অবধি জীবনের এই যে অন্তর-আলোক ক্রমশঃ জাগছে—বাড়ছে, তার জ্যোতিতে তার দু'নয়ন বহুক্ষণ ধাঁধিয়ে অন্ধ থাকে। ভগবান—তাহার সেই অন্তরদেবতা ও, প্রথম প্রথম সে খোঁজার সাড়া ধীরে ধীরে দেন। কোলের শিশু যখন হাতড়ে হাতড়ে মাকে খোঁজে, সে অন্ধ প্রেমের স্পর্শ মা যেমন সম্ভোগ করে, ভগবানও তেমনি জীবের এ অজ্ঞান চাহেন, সে অজ্ঞানের মাধুর্য্য সম্ভোগ করেন।

প্রকৃতি ও ভগবান খেলায় মত্ত—এ উহার প্রেমে বাঁধা দুইটি বালক বালিকা। দু'জনে দু'জনের দেখা পেলেই তারা দৌড়ে লুকায়, দু'জনে দু'জনের চোখের অন্তরাল হয়, কারণ তার পরই ত প্রেমের জনকে আবার খোঁজার, আবার পিছু নেওয়ার, আবার ধরে ফেলার সুখ আছে।

সেই শিব জীব হয়ে প্রকৃতির কাছে লুকিয়ে আছেন; দ্বন্দ্বে, চেষ্টায়, বল-প্রয়োগে অনিশ্চয়তার সুখে প্রকৃতি-বধুকে অধিকার করবার জন্যে মানুষ হয়ে তার এ আত্মগোপন। সর্ব্বাতীত বিশ্বময় মানুষই ত ভগবান, সে আপনার পরম সত্ত্বার কাছ থেকে মানুষের কাঠামোর মধ্যে লুকিয়েছে।

লোমশ দেহে চতুষ্পদের ওপর পশু হয়ে মানুষেরই ছদ্মবেশ। কীট সেও মানুষ—কিলবিল করে গুড়ি গুড়ি যাচ্ছে তার মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের দিকে। কীটের থেকেও আরও জড় বস্তু—সবই মানুষের অপরিণত তনু। নিখিল চরাচর সবই যে মানুষ—সেই পরম পুরুষ।

মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি ?—যাকে কেহ কখনো গড়ে নাই যার বিনাশ নাই, সেই আত্ম-ধন আপনার উপাদানে মন ও দেহ গড়ে আপনি রূপ নিয়েছে।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

মন্দির।

"মন্দির" কবি কিরণচাঁদ দরবেশের কবিতাগ্রন্থ, মূল্য ১৷৹ টাকা। আমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি আর তাহার পর মিলন, এই যে আত্ম-নিকুঞ্জে অভিসারের পথটুকু, ইহার বর্ণনা কত অভিসারিকা কত ভাবে কত রূপকে দিয়েছে।

মন্দিরেও আমার দরবেশ দাদা তাঁর কুঞ্জ-পথ-কথা তাঁহার মনের মত করিয়া দিতে গিয়া মন্দির লিখিয়াছেন। শিশু একা থাকিলে আপনার বাঙ্গা বাঙ্গা ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পা লইয়া খেলা করে, জগৎ-শিশুর আপনাকে লইয়া তেমনি এই খেলা। সে আপনি বঁধুয়া, আপনি দয়িত, আপনি মিলন। ভেদ রচিয়া রচিয়া আপনাকে তাহার এই অফুরন্ত করিয়া আস্বাদন। সে যা' করে, আনন্দের স্রষ্টা ভক্তও তাই করে। এই দরবেশ-কবি তাই মন্দির-পথবর্ত্তী হইয়া তাহার ধাপ রচিয়া রচিয়া আপন রাস-কথা মধুময়ী করিয়া বলিতে পাগল। কারণ এখানে বলাই যে চলা, চলাই যে পূজা, পূজাই ত পাওয়া—সব তুঁহু তুঁহু।

আগে বাহির, তার পরে অন্তর, সব শেষে মিলনের নিবিড়তা। তাই কবিতাগুলি জ্বালা বেদনা বিরহ বহিয়া বহিয়া পাপ বন্ধন অপরূপ ভয়ে বাহিয়া রহিয়া ক্রমশঃ নিবিড় মিলনে মধুর হইয়াছে। মন্দিরের শেষাংশ তাই বড় মধুমাখা—"মধু হতে মধুতর কি এক তু।" দরবেশ কবির বেদনার কথা শুন :-

"বুলাইয়া দাও তপ্ত এ বুকে
সকল রঙের তুলি।"

দেখ সে-রস-রসিকের কান্নাও কি মিষ্ট! মিষ্ট ত হইবেই, কারণ তখন হইতেই ত সাধকের প্রাণ দয়িতের অঙ্গগন্ধে পাগল :—

কেন "সকলের সুরে তোমার বাণীটি রচিছে মোহন মায়া।"

"বহু বিলাসত একের মাঝারে
একেলা তুমি হে সাই।"

তবুও তুমি পাই কি না পাই অমর মীড়ে বড় সুখের বেদনা বাজিতেছে, সংশয়-দোলা মিলনের কবিকে ব্যাকুল করিয়াছে;—

"বল গো পাগল করা কোথায় তুমি,
কবে গো পড়ব ধরা চরণ-চুমি।
গাই গো গাহ গাহ হিয়ার দোলে
লহ গো লহ লহ শীতল কোলে।

"কার এ বীণার সুর,
প্রাণ করে ভরপুর,
টুটে বন্ধনের গ্রন্থি, মিটে যায় চাওয়া।"

ইহাকেই বলে "হারায়েছি পেয়েছি বা আজও বুঝি নাই।" তাহার পর মিলনের বাহু-বন্ধনে গিয়াও এই ভয় বিড়ম্বনার কথা সাধকের মনে হইতেছে—

এত দিন ভয়ে ভয়ে
দিনগুলি গেছে রয়ে
তব সনে এ মিলন হয় কি না হয়।

তার পরই নিবিড় প্রেমের কান্ত-মন নিবিড়তা। তুমি-আমি যে দেশে "আমিত্ব নাশ" আর কবির ভাল লাগে না,—

আমি ভাবি বঁধু যেথা নাই আমি
সে দেশে কেমনে থাকিবে হে তুমি?
তুমি-আমি এক-মালার গাঁথুনী
আছি এক সাথে দুলিতে।

যাহাকে দয়িত-সমর্পিত —Consecrated জীবন বলে, তাহার কত অনির্ব্বচনীয় মাধুরী যে মন্দিরে আছে, তাহা আর কি বলিব। প্রেমের মধ্য দিয়া দুঃস্বপ্ন-কবি নববুগের সমর্পণ যোগে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে এমন কি এ জড় দেহটিও প্রিয়ের লীলা-সুখ লাগি—

ওগো মোর প্রিয়তম
তোমার সুখের সাগর হইয়া
বঙ্গ করিব মন।
আমার অঙ্গ তব তরঙ্গে,
রসময় তুমি খেলিছ রঙ্গে
আমি বিনে আর কে আছে তোমার
মধু হতে মধুরিম—।

তব আহ্লাদে আমি গো হ্লাদিনী,
সঙ্গিনী তব কাজে,
তোমার বিপুল-শ্যামল সুঠাম
আমাতেই চির লভিছে বিরাম,
না জানি কতই অতুল আরাম
বিহরে এ হিয়া মাঝে।

তারপর ভাল জিনিস হচ্ছে নজরুল ইসলামের "বাদল বরিষণে" ।—"আমার এই বেদনা বর্ষার সুরে বাঁধা "এটা শ্রাবণ মাস, না ? আর, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে ।"

এই বর্ষায় ব্যথিত প্রনের শেষে কাজরীর সঙ্গে দেখা—সে "কাজরিয়া" কালো—শ্যামাঙ্গিনী । প্রথম দর্শনে মন হারান যে কি জিনিস তা' লেখক বেশ বলেছেন—"এই এক পলকের আধখানি চাওয়ায় কেমন করে মানুষ এত চির পরিচিত হ'য়ে যেতে পারে ?" * * "নীদের ... দূর্বায় দাঁড়িয়ে বিজুরী-বেণীদোলনে সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কাঁচা ঘাসের আর সবুজ ধানের গান । * * * দেখলাম সেই কালো কাজরিয়া—দোলনা ছেড়ে আমার পানে সজল চোখের চেনা চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে ।"

"যে কথাটি হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও বলা হ'ত না, এক নিমেষে চারটি চোখের অনিমিখ চাউনীতে তা' বলা হয়ে গেল ।"

তারপর মিলনের আশা পেয়ে নিজে কুণ্ঠিত হয়ে তার কান্না । সে বড় অপূর্ব্ব জিনিস । "মর কারী কাজরীয়া হ—ওগো সুন্দর, আমি কালো ।" রূপহীনার এই বেদনা বড় সুন্দর বেজেছে । এমন আকুল প্রণয়ে মিলন কদাচিৎ হয়, কারণ এত প্রেম যে নিজেই নিবিড়তম মিলন, নিজেই নিজের সার্থকতা । তাই—"সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্তে * * শ্রাবণ প্রাতে ধানের মাঝে বসে গাইছি,—"আমার নয়ন ভুলানো এলে ।" তাই এ কাজরী প্রণয়ের পরিণাম হ'লো—"বাদল ভেজা তারই স্মৃতি ।"

তরিকুল আলমের লিখিত "আমাদের শিক্ষা সমস্যা" ভাববার জিনিস । তবে তিনি নূতন কাউন্সিলের দেশী বিশ্বাধারের শিক্ষা-চক্রে... অপূর্ব্ব চিত্রটি দিয়েছেন, তা' সম্ভব হ'ত যদি দেশে শিক্ষার আসল লক্ষ্যটা— চরিত্র বা মনুষ্যত্ব গঠন হ'তো । মানুষের অন্তর বাদ দিয়ে Soulless শিক্ষার প্রতিকারের জন্য দু'একটি অনুষ্ঠান কেউ যদি গড়তে পারে, তা' ... ... পাওয়া যেতে পারে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছেলে এ সব ... পুতুলদের দ্বারা অত খাটুনী সম্ভব নয় ।

হেমলতা দেবীর "বোঝা বওয়া" অপূর্ব্ব সামগ্রী । এমন বেকার প্রেমিক— এমন পরের ভারবহন পরবশ মানুষের ছবি যিনি আঁকতে পারেন, তাঁর লেখনী ধন্য । "বোঝা বওয়া" উঁচুদরের গল্প-কবিতা ।

সুরেশ চন্দ্রের "নবীনের গান" এবারকার "মসলেম ভারতে" উঁচু

বাসীর যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য (যেমন জলের বিশুদ্ধতা রক্ষণ, গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী, খাদ্যাখাদ্যের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা, সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়) সেইগুলি গ্রন্থকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সদুদ্দেশ্য সফল হইলে আমরা সুখী হইবে।

তিলকের তিরোভাব—লোকবার স্বর্গীয় মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলকের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ওজস্বিনাভাষায় লিখিত কবিতা। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান ভাষা-পরিষৎ লিমিটেড, ২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ৵১০।

অর্চ্চনা।—শ্রীজিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক সঙ্গীত গুচ্ছ। প্রাপ্তিস্থান ১৯১২ এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ৶০ আনা।

সরল পশুপালন।—শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত জি, বি, ভি, সি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান স্নেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ৮৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০ আনা।

এ পুস্তকখানিতে গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের বাসস্থান, সাধারণ স্বাস্থ্য, পীড়ার লক্ষণ ও ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার যথাসম্ভব গাছগাছড়া প্রভৃতি দেশী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের দেশে দেবতাজ্ঞানে ফুল দিয়া গো-পূজার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার অভাবে গো-বংশ যে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে, সেদিকে কাহারও বড় একটা দৃষ্টি নাই। সুতরাং মুখে পূজা করিয়াই আমরা স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে ব্যস্ত। এ অবস্থায় এ পুস্তকখানি পড়িয়া ও ইহার উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া কৃষক ও অন্যান্য গৃহস্থেরা যদি গৃহপালিত পশুদিগের অবস্থার একটু উন্নতি সাধনে তৎপর হন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

এবার হইতে আমরা প্রতিমাসে নারায়ণে **অবনীন্দ্র আর্ট স্কুলের ছবি** একখানি করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। তিন রঙা ছবি বড় ব্যয়সাধ্য, তথাপি বন্ধু ও গ্রাহকগণের আনুকূল্যের ভরসায় আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি।

অগ্রহায়ণ হইতে **বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রের আত্মকথা** আরম্ভ হইয়া ধারাবাহিক চলিবে।